সাহিত্য।

মাসিকপত্র ও সমালোচন।

শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি
সম্পাদিত।

ত্রয়োদশ বর্ষ।

১৩০৯।

কলিকাতা।
২।১ নং রামধন মিত্রের লেন, শ্যামপুকুর, সাহিত্য-কার্য্যালয় হইতে
সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত
ও
৩০/৫ মদন মিত্রের লেন নব্যভারত-প্রেসে,
শ্রীভূতনাথ পালিত কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

প্রবন্ধের বর্ণানুক্রমিক সূচী

চিত্রশালা ;—

লেখকগণের নামানুক্রমিক সূচী

সাহিত্য।

মাসিকপত্র ও সমালোচন।

শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি
সম্পাদিত।

ত্রয়োদশ বর্ষ।

১৩০৯।

কলিকাতা।
২।১ নং রামধন মিত্রের লেন, শ্যামপুকুর, সাহিত্য-কার্য্যালয় হইতে
সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত
ও
৩০/৫ মদন মিত্রের লেন নব্যভারত-প্রেসে,
শ্রীভূতনাথ পালিত কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

প্রবন্ধের বর্ণানুক্রমিক সূচী

চিত্রশালা ;—

লেখকগণের নামানুক্রমিক সূচী

জননী।

KUNTALINE PRESS.

স্বপ্ন।

তখনো হয় নি সন্ধ্যা, বিমল আকাশ,
কোমল যেন গো মোর প্রিয়ার বরণ—
ঢালিতেছে মৃদু মধু, স্বর্ণের আভাস
চুম্বি' সরোবর-জল, আম্রের কানন।
তখনও আসেনি প্রিয়া, প্রাণ পেয়েছিল
সেই আলো-মাঝে শুধু প্রিয়ার আভাস!
আম্রশাখা দুলাইয়া বহেছিল বায়,
বসেছিনু প্রিয়া লাগি' প্রেম-প্রতীক্ষায়!

তার পর এল সন্ধ্যা ধূসরবরণ।
আমার প্রিয়ার যেন বক্ষের অঞ্চল,
ঢেকে দিল দেহ হিয়া ধরণী গগন!
করে' দিল সর্ব্ব মন অধীর চঞ্চল!
বাড়াইনু আলিঙ্গন!—প্রিয়া আসে নাই,
পাঠা'য়ে দিয়াছে শুধু প্রিয়ার স্বপন!
কাননের মাঝে শুধু পাখী গান গায়,
প্রাণ ছিল প্রিয়া লাগি' প্রেম-প্রতীক্ষায়!

তার পর সন্ধ্যা গেল, আসিল রজনী,
পরশি' সকল দেহ প্রিয়ার কুন্তল
হিয়া মোর দিশাহারা!—আঁধার ধরণী!
'ওগো ঢাক, ঢাক মোরে প্রসারি' অঞ্চল!'
কোন শব্দ নাহি, হায়! প্রিয়া আসে নাই,—
প্রিয়ার কুন্তল-স্বপ্ন এনেছে রজনী!
তখন বহিল ঝড় বসন্ত-বাতাস
তৃষার্ত্ত ভরসা-ভরা ধরণী আকাশ।

তখনো গভীর রাত্রি ধরণী ছাইয়া,
প্রিয়ার গভীর সেই প্রেমের মতন!
পাখীরা কানন-শাখে ছিল ঘুমাইয়া
ও কি—ও কি দেখা যায়—ছায়া না স্বপন?—
এলো মেলো চুলে ঐ প্রিয়া আসিয়াছে
আবেশে অঞ্চল তার ভূমে লুটাইয়া!
এখন যে প্রভাতের পাখী গান গায়,
প্রিয়া মোর চলি গেছে কখন কোথায়?

পর্ব্বতের পুত্র।

পর্ব্বতের কন্যা সংজ্ঞাটি হিন্দু পাঠক পাঠিকাদিগের অপরিচিত নয়। স্বয়ং পার্ব্বতীই প্রমাণ। পূতসলিলা গঙ্গা যমুনাও পর্ব্বত-দুহিতা; কিন্তু ইহাঁরা কন্যা কি না, তাই 'গোত্রান্তরিতা'— কেহই পিতৃকুলস্থা নহেন। সাধারণ নিয়মানুসারে পুত্র স্বগোত্রেই থাকে। সুতরাং পর্ব্বতের পুত্র বলিলে পর্ব্বতই বুঝিতে হইবে। কথাটি নিতান্ত নূতন নয়, কারণ আমাদের পুরাণাদি গ্রন্থে মৈনাকাদি অনেকগুলি গিরি-সুতের কীর্ত্তিকলাপ বিবৃত হইয়াছে। আমি এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে হিমালয় ও শিবালিকের দৃষ্টান্ত দ্বারা পর্ব্বতে পর্ব্বতে কি প্রকারে পিতৃ-পুত্র সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইতে পারে, তাহাই বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

অতি প্রাচীন কালে—বোধ করি কোটি কোটি বৎসরেরও পূর্ব্বে,—হিমগিরি 'পৃথিবীর মানদণ্ডের স্বরূপ' না হউক, অন্ততঃ বর্ত্তমান আসিয়া খণ্ডের মেরুদণ্ডস্বরূপ একাকী দণ্ডায়মান ছিলেন। তখন জীবের সৃষ্টি হয় নাই। আমাদের আদিমতম মৎস্য-অবতারের নিশ্চয়ই লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বের কথা বলিতেছি। পাদমূলেই মহাসমুদ্র,—জননী ভারতভূমি তখনও সেই দিগন্তব্যাপী মহাসাগরের অতলগর্ভে নিহিতা। গিরিবর তখন চিরতুষারমণ্ডিত,—বরফ্ গলাইবার মত উত্তাপ তখনও হয় নাই, সুতরাং তখনও গিরিগাত্রবাহিনী বারিধারার অর্থাৎ আধুনিক নদনদীসমূহের সৃষ্টি হয় নাই। গঙ্গাদেবী গিরিশের জটায় নিহিত ছিলেন কি না, পুরাণোক্ত প্রবাদ ব্যতীত তাহার অন্য প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু গিরীশ-কিরীটে যে বহুকাল নিস্তব্ধে বিরাজ করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তখনও সমুদ্র-বক্ষে মেঘের সৃষ্টি হইত; বর্ত্তমানের তুলনায় অধিক মেঘই হইবার সম্ভাবনা; কারণ মহাসমুদ্র অত্যন্ত সমীপস্থ ও দিগন্তব্যাপী ছিল। কিন্তু পর্জ্জন্য দেব বারিবর্ষণ করিতেন না, গিরিবরশীর্ষে কেবল তুষাররূপ পুষ্পবৃষ্টি করিতেন। তুষারস্তূপের উপর প্রতিনিয়ত তুষারসম্ভার-সঞ্চয়জনিত চাপে ক্রমে বরফরাশি পর্ব্বতগাত্রে নিম্নাভিমুখে গতিশীল হইতে লাগিল। এই প্রকার গতিশীল বরফস্তূপকে ইংরাজীতে Glacier কহে। গতিশীল বলিলাম, কিন্তু বেগবান বুঝিও না; বৎসরে দুই চারি হাত চলিলে যথেষ্ট চলিয়াছে, বুঝিতে হইবে।

যাহা হউক, নিম্নে সাগরতীরে অনবরত বরফস্তূপ আসিয়া উপচিত হইতে লাগিল। কিন্তু উহা অবিমিশ্র বরফ নয়। গিরিগাত্রবাহী বরফরাশি গিরিসংবদ্ধ প্রস্তর ও মৃত্তিকাখণ্ডসমূহকে নিজের অঙ্গীভূত করিয়া চলিতে থাকে; সাগরে ঝাঁপ দিবার সময় ঐ অবান্তর পদার্থগুলিকে সঙ্গে লইয়াই ঝাঁপ দিয়া থাকে। সকলেই জানেন, জল অপেক্ষা বরফ লঘু, তাই জলের উপর বরফ ভাসে। এইরূপ ভাসমান বরফগুলিকে ইংরাজীতে Iceberg বলে। বরফই অধিক, তাহার তুলনায় শিলাভাগ অতি অল্প, সুতরাং শিলাও সাগরবক্ষে ভাসিতে থাকে। কিন্তু নানা কারণে ভাসমান বরফ অল্পায়ু। উহার অপেক্ষা জলের উত্তাপ অধিক, সুতরাং জলসংস্পর্শে বরফ ক্রমেই গলিতে থাকে; জলের তরঙ্গ-সংঘাতেও ইহার আয়ুঃ-ক্ষয় হয়। হিমগিরির পাদবিচ্যুত বরফস্তূপ ভাসিতে ভাসিতে উত্তর হইতে ক্রমে যতই দক্ষিণে আসিত, জলের উত্তাপবৃদ্ধির অনুপাতে বরফের ততই ধ্বংস হইত। অবশেষে ভাসমান-বরফ এমন এক স্থানে উপনীত হইত, যেখানে উহার বরফত্ব বজায় রাখা আর সম্ভব হইত না; তখন, সেই যে পাথর ও মাটি উহার কাঁধে চড়িয়া আসিতেছিল, সেগুলি সুতরাং সমুদ্রতলে নিহিত হইয়া যাইত। বহু সহস্র—সহস্র কেন?—বহু লক্ষ বর্ষ ব্যাপিয়া এই প্রক্রিয়া চলিয়া থাকিবে। ইতিমধ্যে পৃথিবীর উত্তাপ বর্দ্ধিত হওয়ায় হিমালয়ের স্কন্ধদেশের বরফ গলিয়া জলরূপে প্রবাহিত হইতে থাকিল। সেই প্রবাহের সঙ্গে গড়াইয়া গড়াইয়া পর্ব্বতবিচ্ছিন্ন প্রস্তরাদি বহু দূরে আসিয়া পঁহুছিতে লাগিল; কিন্তু ইতঃপূর্ব্বে পূর্ব্ববর্ণিত প্রণালীতে বরফবাহিত প্রস্তরের প্রাচীরবৎ যে স্তূপ সংগঠিত হইয়াছিল, তাহাকে অতিক্রম করিতে পারিল না। এইরূপে সমুদ্রতীর হইতে কিঞ্চিৎ দূরে তলনিহিত প্রস্তরাদি-গঠিত একটি অনুচ্চ পর্ব্বতের সূত্রপাত হইল। আমাদের শিবালিকের পক্ষে ইহাই গর্ভাধান। তখনও লোক-লোচনের অন্তরালে ভ্রূণরূপী শিবালিক সাগরগর্ভে যেন যোগনিদ্রায় অভিভূত।

বর্ত্তমান গঙ্গা সিন্ধু মহানদীসমূহের মহানায় bar নামক যে চড়া দেখিতে পাওয়া যায়, উহাদের সৃষ্টি শিবালিকের গর্ভাধানেরই অনুরূপ। নদীস্রোত সমুদ্রে মিলিত হইলেই বেগবত্তার হ্রাস হয়, সুতরাং বালুকাদি পদার্থের সূক্ষ্ম কণা বহন করিবার সামর্থ্য রহিত হয়; কাজেই ঐ সকল স্রোতোবাহিত পদার্থের চড়া পড়িয়া যায়।

অতঃপর ভূবর্ত্তুলের স্বাভাবিক সংকোচে সাগরতল স্থানে স্থানে বসিয়া গেল, আর তাহারই সামঞ্জস্য রাখিবার জন্য সাগরতল অন্যত্র পূর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ হইয়া

উঠিল। যে জল এত দিন প্রায় সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া ছিল, তাহা এখন গড়াইয়া গিয়া অপেক্ষাকৃত নিম্নাংশসমূহে একত্রিত হইয়া বর্ত্তমান খণ্ডসাগররূপে পরিণত হইল, সঙ্গে সঙ্গে ভূপৃষ্ঠের অবশিষ্টাংশ ক্ষিতিরূপে পরিদৃশ্যমান হইল। অন্যান্য ভূখণ্ডের ন্যায় ভারতভূমিরও তখন জন্ম হইল বটে, কিন্তু ঠিক এখনকার মত ত্রিকোণাকার হইল কি না সন্দেহস্থল।

ভারতক্ষেত্র উর্দ্ধোত্থিত হওয়ায় শিবালিকও সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা উঠিয়া পড়ে—এই কারণে অদ্যাপি ইহার অঙ্গীভূত স্তরগুলি উত্তরাভিমুখে ঝুঁকিয়া আছে, দেখিতে পাওয়া যায়। স্তরাভ্যন্তরে যে সকল প্রস্তরখণ্ড পাওয়া যায়, তাহা প্রায়ই গোল বা বৃত্তাভাসাকৃতি; ইহাতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, উহারা জন্মস্থান হইতে স্রোতঃ-প্রবাহিত হইয়া গড়াইয়া গড়াইয়া আসিয়া বর্ত্তমান স্থানে উপনীত হইয়াছে। এখন উহাদিগকে দেখিলে উহাদের আদি জন্মস্থান হিমগিরির কোন স্থানে, তাহা সহজেই নির্ণয় করা যায়। আদি স্থানে বহু দূর পর্য্যন্ত একই প্রকারের প্রস্তর পাওয়া যায়, এবং কোথায় কোন্ প্রকারের পাথর আছে, ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ তাহা নিরূপণ করিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু শিবালিকের ন্যায় মিশ্র পর্ব্বতের একই স্থানে দণ্ডায়মান থাকিয়া পঞ্চাশ জায়গায় পঞ্চাশ রকমের পাথর দেখিতে পাওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। সুতরাং স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, আদি গিরি হিমালয়ের বিপুলাঙ্গের রেণুসমূহ পুঞ্জীভূত হইয়া শিবালিকের দেহ গঠিত করিয়াছে। পিতৃ-পুত্র সম্বন্ধ নয় কি?

পর্ব্বতের সম্বন্ধ ও বয়োনির্ণয়ের আরও কয়েকটি উপায় আছে। তন্মধ্যে fossil বিচারই সর্ব্বপ্রধান। স্তরনিবদ্ধ যত পাহাড় পর্ব্বত দেখিতে পাওয়া যায়, সমস্তই জলগর্ভজাত। ফলতঃ কেবল জলের নীচেই স্তর নির্ম্মিত হইতে পারে,—অন্যত্র নহে। প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্ত্তে সাগর হ্রদাদির তলদেশে স্তর-সৃষ্টি ক্রিয়া চলিতেছে। আমাদের বঙ্গোপসাগরে গঙ্গা, ইরাবতী, মহানদী, গোদাবরী প্রভৃতি নদীসমূহ প্রতি মুহূর্ত্তে যে বালুকা ও মৃত্তিকারাশি ঢালিয়া দিতেছে, উহা সমস্তই সাগরতলে স্তরে স্তরে বিন্যস্ত হইতেছে। কিন্তু কেবল কি মাটিই যায়? কত জীব জন্তু ভাসিয়া যাইতেছে, কত তরু-লতা-গুল্ম, কত ফল-ফুল-কাণ্ড-পল্লবাদি। ও দিকে সাগরবাসী অসংখ্য জীব ও তলজাত অগণিত উদ্ভিদ্ অহরহঃ মরিতেছে, অথবা জীবদ্দশাতেই মৃৎ-প্রোথিত হইতেছে। এ সব যায় কোথায়? বহু লক্ষ বৎসর পরে, যখন আজিকালিকার পলি মাটি ভূ-চাপ প্রভৃতি বহুবিধ কারণে প্রস্তরে পরিণত হইবে, তখন সেই পাথর ভাঙ্গিলে, ঐ

সকল জৈব পদার্থের ছাঁচে ঢালা প্রতিকৃতির ন্যায় অবিকল পাথরের প্রতিকৃতি দেখিতে পাওয়া যাইবে। ইহাকেই ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ fossil বলেন। ইহাই হইল প্রকৃতির ইতিহাস, রোজনামচা, বা album ; মা যেন নিজ সন্তানগুলির আশৈশব ফটোগ্রাফ সংগ্রহ করিয়া অ্যালবমে বসাইয়া রাখিতেছেন। লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে উহাদের কিরূপ আকৃতি প্রকৃতি ছিল, অ্যালবমের ঠিক পৃষ্ঠা উল্‌টাইলেই তাহার অভ্রান্ত নিদর্শন পাওয়া যাইবে ;—যারা সকলের আগে ছিল, তাদের মূর্ত্তি প্রথম পৃষ্ঠায় দেখিতে পাওয়া যায় ;—এইরূপে পরে পরে সকলেরই মূর্ত্তি মায়ের 'অ্যালবমে' আছে।

কোনও পুরাতন অ্যালবমের সকল মূর্ত্তি আজ জীবিত দেখিতে পাওয়া যায় কি ? হায় ! তখন ছিল, এই সে দিনও যে ছিল, কিন্তু আজ আর নাই—আছে কেবল এই নিদর্শন,—এমন কত প্রিয়সখার মূর্ত্তিই না দেখিতে পাই। প্রকৃতির অ্যালবমও ঠিক ঐরূপ। অতি পুরাকালে প্রকৃতি যাহাদিগের সৃষ্টি ও পালন করিতেন, আজ তাহাদের অনেকেরই তিরোধান হইয়াছে ; আবার আজ যাহাদিগকে লইয়া 'ঘরকন্না' করিতেছেন, ইহাদের মত শ্রেষ্ঠগুণসম্পন্ন সন্ততি তখন ছিল না। কিন্তু অ্যালবম্ অভ্রান্ত ভাষায় বলিয়া দিতেছে, কাহার পরে কোন্ কল্পের আবির্ভাব। মৎস্য-কূর্ম্ম-বরাহ-বামন-নৃসিংহ প্রভৃতি পুরাণপ্রসিদ্ধ কল্পসমূহের ভূতত্ত্ব ও জীবতত্ত্বঘটিত রহস্য আছে কি না, সে কথা বলিতে সহসা সাহস হয় না, কিন্তু সাদৃশ্য অতি বিস্ময়কর। যাহা হউক, এই অ্যালবমের টুকরা যেখানেই পাওয়া যাউক, উহার অভ্যন্তরস্থ ফসিল-রূপী প্রতিকৃতি দেখিলেই, উহা কোন্ কল্পের অন্তর্গত, তাহা নিঃসংশয়ে বলিয়া দিতে পারা যায়। অতি পুরাতন অ্যাল্‌বমে নিতান্তহীনাবস্থ জলজীবের প্রতিকৃতিমাত্র; ক্রমে শ্রেষ্ঠতর জলজীব শম্বুকাদি, আরও উচ্চে কর্কটাদি, তৎপরে মৎস্য, তৎপশ্চাৎ বহুবিধ ও অতিকায় সরীসৃপাদি, ইহারই পরে অর্দ্ধপক্ষী ও অর্দ্ধসরীসৃপ এক প্রকার অদ্ভুত জীব, তদনন্তর খাঁটি পক্ষী, সর্ব্বশেষে লোমশ জীব। এখন যে সকল লোমশ জীব লইয়া আমরা বসবাস করিতেছি, ইহাদের সকলের প্রতিকৃতি আজও অ্যাল্‌বমে উঠে নাই। আমরা—ধরাখানকে শরাবৎ দেখি যে আমরা—এতই আধুনিক যে, আমাদের ফটোগ্রাফ মা আজও develop করেন নাই—এখনও উহা হয় ত সাগরতলস্থ dark-roomএ সযত্নে রক্ষিত আছে। আমরা হয় ত develop হওয়া পর্য্যন্ত বাঁচিব না, কিন্তু তাতে তত ক্ষতি নাই। অ্যাল্‌বমে উঠিবে নিশ্চিতই,—তাহা হইলেই ত ইতিহাস বজায় থাকিল।

এখন আমাদের হিমালয় ও শিবালিকের বয়সের কথা বলি। হিমগিরি এতই প্রাচীন যে, তাহাতে ফসিল আদৌ পাওয়া যায় নাই। বহু অংশ স্তরনির্বদ্ধও নয়। বস্তুতঃ যখন হিমালয়ের সৃষ্টি হয়, বালিকা প্রকৃতির তখনও অঙ্গ-সৌষ্ঠব হয় নাই, তিনি তখনও জীবপ্রসব-সমর্থা হয়েন নাই। পক্ষান্তরে, শিবালিকের স্তরসমূহে বর্ত্তমান হস্তীর পূর্ব্বপুরুষ এক অতিকায় জীবের কঙ্কাল-ফসিল পাওয়া গিয়াছে। কলিকাতার যাদুঘরে ঐরূপ একটি ফসিল রক্ষিত আছে, অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন। এ প্রকারের ফসিল যে নিতান্তই আধুনিক, তাহা পূর্ব্বেই প্রতিপাদিত হইয়াছে। আমাদের প্রতিবাসী হাতী বাবুর স্বর্গীয় পিতার আদ্য-শ্রাদ্ধোপলক্ষিত বৃষকাষ্ঠ যখন গ্রামের তেমাথা পথে পাওয়া গিয়াছে, তখন কর্ত্তাটির স্বর্গারোহণ বড় অধিক দিনের ঘটনা নয়, এ অনুমান অসঙ্গত কি? সুতরাং শিবালিকটি যে ভূধর-সমাজে নিতান্তই দুগ্ধপোষ্য, তাঁহাতে সন্দেহ হইতে পারে না।

এখানেই প্রবন্ধ শেষ করা উচিত ছিল। কিন্তু যাহার জন্ম-কোষ্ঠী লইয়া এত বাগ্‌বিতণ্ডা করিলাম, তাহার সম্বন্ধে আরও দুই চারিটি কথা না বলিলে, অন্ততঃ গ্রহবিপ্রের মনস্তুষ্টি হইতেছে না।

শিবালিক পাহাড় হিমালয়ের পাদমূলে প্রায় সর্ব্বত্রই আছে, কিন্তু অনেক স্থানে হিমালয় হইতে পৃথক্ অবস্থিত নয়, এই জন্য পৃথক্ সংজ্ঞা দেওয়া হয় নাই। পঞ্চনদের বিপাশা-তীর হইতে নহিনীতালের নিম্নে কাঠগুদাম পর্য্যন্ত যে অনত্যুচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী হিমালয় হইতে কিঞ্চিৎ দূরে অবস্থিত, অথচ হিমালয়-শ্রেণীর সমান্তরাল দেখিতে পাওয়া যায়, সাধারণে তাহাকেই শিবালিক বলিয়া জানে। এই শ্রেণীর দৈর্ঘ্য প্রায় ৪০০ মাইল, বিস্তার ১০ মাইল হইতে ৩৫ মাইল পর্য্যন্ত। উচ্চতা আধুনিক সাগরবক্ষ হইতে ৩৫০০ ফিটের অধিক নয়। ইহার দক্ষিণার্দ্ধ নিতান্তই বন্ধুর, স্থানে স্থানে একেবারেই প্রাচীর-বৎ 'খাড়া ঢাল', সুতরাং প্রায়ই দুরারোহ। পক্ষান্তরে, উত্তরার্দ্ধ দেখিতে প্রায় সমতলের ন্যায়। এটা কতকটা পিতৃধারা বলিতে পারা যায়। হিমগিরিরও উত্তরভাগ অর্থাৎ তিব্বত দেশ প্রায় সমতল; আর দক্ষিণাংশ, অর্থাৎ আমা-দের দিক্‌টা বন্ধুর ও উচ্চ প্রাচীরবৎ।

হিমালয় ও শিবালিকের মধ্যবর্ত্তী ব্যবধানভূমিস্বরূপ উপত্যকাকে চলিত ভাষায় 'দূন' বলে। কিন্তু সমগ্র ৪০০ মাইল ব্যাপী একটি দূন নাই—ইহার

অবস্থিত, আর যে দুন তন্নিবন্ধন 'দেহরাদুন' নামে সুপরিচিত, তাহাই সর্ব্ব-প্রধান। যেমন মিছরীর ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সকল দানার আকৃতি একই প্রকারের, সেইরূপ সকল দুনের ভৌগোলিক অনুকৃতি প্রায়ই মহাদুন তিব্বতেরই অনুরূপ। প্রত্যেকেরই উত্তরে ও দক্ষিণে উচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী, আর প্রায় প্রত্যেক দুনেই পূর্ব্ব ও পশ্চিম-বাহিনী দুইটী নদী প্রবাহিত দেখিতে পাওয়া যায়। তিব্বতে ব্রহ্মপুত্র ও সিন্ধু,—দেহরাদুনে অশন ও শোভনা। শোভনা হরিদ্বারের তিন ক্রোশ উত্তরে গঙ্গায় মিলিত হইয়াছে,—অশন রেণুকা নামক প্রসিদ্ধ শৃঙ্গের সান্নিধ্যে যমুনায় জীবন সমর্পণ করিয়াছে। অধিকাংশ দুনই এইরূপ।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল।

গঙ্গোত্রী।

প্রিয়-দর্শন! অদ্য ২২শে ভাদ্র শনিবার অনুমান অপরাহ্ন ৩।৪ টার পর গঙ্গোত্রীতে আসিয়া পঁহুছিলাম। এ দিকে বেলা ৩।৪টা, সূর্য্যদেবের সঙ্গে দেখা শুনা নাই; সূর্য্যদেব পশ্চিম গগনের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া পর্ব্বতের অন্তরালে পড়িয়াছেন; কেবলমাত্র চতুর্দ্দিকস্থ আলোকরাশি সূর্য্যের অস্তিত্বের পরিচয় দিতেছে। কি পাণ্ডা, কি সাধু, কি যাত্রী, সকলেই স্বকীয় আবাসস্থানে যাইয়া অগ্নিকুণ্ডের চতুর্দ্দিকে উপবেশনপূর্ব্বক নানাবিধ কথাবার্ত্তায় নিশির অপেক্ষা করিতেছে। আমরা ১০।১২ জন লোক, কাহারও আহার হয় নাই; শীত প্রাণকে কণ্ঠাগত করিয়া ক্ষুধার হস্ত হইতে অব্যাহতি দিয়াছে; তবু প্রাণ বোঝে না, কি করি, সুতরাং পাণ্ডাদের অনুরোধে আমরা সকলেই কিছু কিছু আহার করিলাম, কিন্তু গৃহ হইতে আর বাহির হইলাম না। গৃহ হইতে গঙ্গা মাতাকে দর্শন ও প্রণাম করিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বেই শয়ন করিলাম। রাত্রে খুব সুনিদ্রা হইয়াছিল। প্রাতঃকাল হইয়াছে, তবু ঘুম ভাঙ্গে না। পাণ্ডারা গাত্রোত্থান করিয়াছেন, গঙ্গা-মন্দিরের দ্বার খোলা হইয়াছে, মন্দিরে মঙ্গল-আরতি হইতেছে, গঙ্গা ঘোরতর অব্যক্ত গভীর নিনাদে শঙ্খ, ঘণ্টা ও অপরাপর বাদ্যরবকে মধুর করিয়া তুলিতেছে। যাত্রীদের মধ্যে কম্পান্বিতকলেবরে কেহ গঙ্গাস্তব-পাঠ, কেহ ভজন, কেহ বা

মঙ্গল-আরতি গান করিতেছেন। অলসতা আর আমাকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না; আমি কুটীর পরিত্যাগ করিয়া গঙ্গাতীরে আসিয়া বসিলাম।

প্রাতঃকাল; ঘড় শীত; শয্যা-পরিত্যাগ একান্ত ক্লেশকর। কিন্তু তীর্থে আসিয়াছি, আর জড়তা ভাল দেখায় না। অতিকষ্টে শয্যা পরিত্যাগ করিলাম। আমার বাসস্থান ভগীরথশিলার উর্দ্ধবর্ত্তী কুটীরে। গাত্রোত্থান করিয়া ভগীরথের তপস্যা-স্থান দর্শন করিলাম। এই ভগীরথশিলায় সূর্য্যবংশীয় রাজা সগরবংশের উদ্ধারার্থ গঙ্গাদেবীর তপস্যা করিয়াছিলেন; ভগীরথের উগ্র তপস্যায় প্রীত হইয়া পতিতপাবনী ভাগীরথী নাম ধারণ করিয়া স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্যে আগমন করিয়াছিলেন। অদ্য প্রাতঃকালে আমি সেই স্থানে উপস্থিত; কি সৌভাগ্য! আবার এই গঙ্গোত্রী হইতে ১৮ মাইল পূর্ব্বে সুমেরু। সুমেরুর এক অংশের নাম শ্রীমুখ। এই শ্রীমুখে গোমুখচিহ্ন হইতে গঙ্গাদেবীর উৎপত্তি। সুমেরুর চতুর্দ্দিকে রুদ্র-হিমালয়, বসুরূপ, স্বর্গারোহণ প্রভৃতি হিমমণ্ডিত পর্ব্বতশৃঙ্গ। এই স্বর্গারোহণ বোধ হয় পাণ্ডবদিগের স্বর্গারোহণ-পর্ব্বত হইতে পারে। এই পর্ব্বত গঙ্গোত্রীর পূর্ব্ব দিকে। পূর্ব্ব দিক প্রকাশিত হইয়াছে, সূর্য্যদেব সুমেরুশৃঙ্গে উদিত, উদয়-সময়ে প্রভাকর হীরকখণ্ডের ন্যায় সুমেরুমস্তকে শোভা পাইতেছেন, এবং প্রভা-করের প্রভা সুমেরু-অঙ্গে প্রতিফলিত হওয়ায় মেরুশৃঙ্গ স্বর্ণবৎ প্রতীয়মান হই-তেছে। দেখিতে দেখিতে নিমেষের মধ্যে সূর্য্যকিরণ রুদ্রহিমালয়, বসুরূপ ও স্বর্গারোহণ প্রভৃতি হিমাবৃত পর্ব্বতাঙ্গ যেন স্বর্ণবস্ত্রে আবৃত করিয়া মুহূর্ত্তের জন্য সুসজ্জিত করিয়া দিতেছে। আজ পাষাণময় পর্ব্বতও আনন্দময়! সকলই স্বর্ণ রৌপ্য ভূষণে বিভূষিত। হিম-বিহারী কস্তুরী মৃগ আনন্দে এ দিক ও দিক ছুটা-ছুটি করিতেছে; মুণাল প্রভৃতি স্বর্ণ, রৌপ্য, গৌর, রক্ত, হরিত ও কৃষ্ণ বর্ণে চিত্রিত বিচিত্র বিহঙ্গমগণ আনন্দে সুমধুরস্বরে গান করিতেছে, আর প্রতিধ্বনি লয়ে লয়ে মিশাইয়া সমস্বরে তান ধরিতেছে।

এ কি! হঠাৎ এমন হইল কেন? সূর্য্য সুমেরুশিরে হিরণ্ময় মণিরূপে শোভা পাইতেছিলেন, সহসা উর্দ্ধ আকাশে উঠিলেন; পর্ব্বতসমূহ শুভ্রবর্ণ ধারণ করিল; মুণাল প্রভৃতি বিহঙ্গমগণও পর্ব্বতাঙ্গে লুকাইল; আর মেরু পর্ব্বতের নিম্নশ্রেণীস্থ পর্ব্বতশ্রেণী আবরণহীন বিষম-মূর্ত্তি শুষ্ক পাথর হইয়া গিয়াছে! ইহার কারণ বুঝিয়াছি। পর্ব্বতদুহিতা গঙ্গা ভগীরথের দৃঢ় তপস্যা, ভক্তি ও গভীর প্রেমে বিগলিতা ও দ্রবময়ী হইয়া কপিল-শাপে ভস্মীভূত সগরবংশের উদ্ধারের জন্য সাগরসঙ্গমোদ্দেশে কপিল ঋষির আশ্রমের দিকে ছুটিতেছেন।

আই উচ্চ পর্ব্বতের এত বিষাদ! অপর দিকে বড়ই আনন্দ! আজ যেন প্রকৃতিদেবী গঙ্গার অভ্যর্থনার জন্য নিম্ন পর্ব্বতশ্রেণীকে চিরহরিত দেবদারু বৃক্ষ দ্বারা আপাদমস্তক সুসজ্জিত করিয়াছেন। দেবদারু ও চীরবৃক্ষ সরলভাবে ও ছত্রাকারে শাখা-বিস্তার করিয়া আকাশমার্গে ঊর্দ্ধে উঠিতেছে, আর বিহঙ্গম-কুল নানা ছন্দে গঙ্গাস্তব পাঠ করিয়া গঙ্গার অভ্যর্থনা করিতেছে। নিম্নে গঙ্গাদেবী ঘোর ও গভীর গর্জ্জন করিতে করিতে পর্ব্বতাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত করিয়া সাগরের উদ্দেশে চলিয়া যাইতেছেন। উচ্চ বরফমণ্ডিত পর্ব্বত দুহিতার শোকে অধীর হইয়া নির্ঝরিণীরূপ প্রপাতে গঙ্গাদেবীকে স্বকীয় দুহিতৃবিচ্ছেদ জানাইবার জন্য অভিষিক্ত করিতেছেন, কিন্তু তাহার ফলে হিতে বিপরীত হইতেছে; সেই নির্ঝরিণীসমূহ গঙ্গার বেগ বর্দ্ধিত করিয়া গঙ্গাদেবীকে আরও উত্তেজিত করিতেছে।

ভগীরথশিলার পরই রুদ্রশিলা। এখানে আসিয়া ভাগীরথী শিবজটায় আবদ্ধ হইয়াছিলেন। কালের এমনই মাহাত্ম্য যে, আজ সেই রুদ্রশিলার একাংশে এক কুটীর নির্ম্মিত হইয়াছে, আর সেই কুটীরে আমার বাস, এবং কুটীরে বসিয়াই তোমাকে এই পত্র লিখিতেছি। ভগীরথ ও রুদ্রশিলার মধ্যে একটুকু সমভূমি আছে। সেই সমভূমিতে গঙ্গামন্দির, পাণ্ডাদিগের বাসগৃহ, রন্ধনশালা, আর দুই একটি ধর্ম্মশালা। মন্দিরের মধ্যে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী প্রতিষ্ঠিত; গঙ্গা শ্বেতবর্ণ প্রস্তরে নির্ম্মিত। এই তিন মূর্ত্তির বামে ও দক্ষিণে ভগীরথ ও শঙ্করাচার্য্যের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। এই মন্দির ও মন্দিরস্থ দেবতা নাস্তিক-ত্রাস শঙ্করাচার্য্যের প্রতিষ্ঠিত। গঙ্গা-মন্দিরের দক্ষিণে রুদ্রশিলার একাংশে গঙ্গেশ্বর নামক মহাদেব প্রতিষ্ঠিত। গঙ্গামন্দিরের ঊর্দ্ধদেশে পর্ব্বতাঙ্গে গণেশ ও কালভৈরবের মূর্ত্তি; এই মন্দিরদ্বয়ের ঊর্দ্ধদেশে সদাব্রত ও কতিপয় ধর্ম্মশালা। উত্তরখণ্ডের প্রধান তীর্থমাত্রেই একটি বা ততোধিক সদাব্রত আছে। এই সদাব্রতে সাধু ও ব্রাহ্মণমাত্রই তিন দিবসের আহারীয় প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সুতরাং এই সব সদাব্রতের কল্যাণে যাত্রীদিগকে বিশেষ কষ্ট সহ্য করিতে হয় না। বিশেষতঃ যাহারা ভিক্ষাজীবী ও তীর্থপর্য্যটক, তাহাদিগের পক্ষে সোনায় সোহাগা। গঙ্গোত্রীর এ দিক ও দিক ১৪।১৫ মাইলের মধ্যে দোকান বা লোকালয় নাই। আবার যাঁহারা তীর্থভ্রমণে বহির্গত হইয়া পরান্ন গ্রহণ করেন না, তাঁহাদিগের বড়ই কষ্ট ছিল। প্রায় ৪।৫ বৎসর হইল, গঙ্গোত্রীর সদাব্রতের অধ্যক্ষ খাস গঙ্গোত্রীতে একটি দোকান খুলিয়া দিয়াছেন। যাঁহারা সদাব্রতে আতিথ্য

গ্রহণ না করিবেন, তাঁহারা এই দোকান হইতে আহারীয় সামগ্রী কিনিয়া স্বচ্ছন্দে এখানে বাস করিতে পারেন। এই মহাতীর্থে ত্রিরাত্রির অধিক কেহই প্রায় বাস করেন না। সম্মুখে পতিতপাবনী গঙ্গা; গঙ্গাস্নান করিয়া গঙ্গাদর্শন কর, তৎপরে অন্নছত্র হইতে ভোজ্যবস্তু গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মশালায় যাও; তথায় প্রায় অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত থাকে, তথায় রন্ধন করিয়া ভোজন কর ও বাস কর। এখানে কিছুরই অভাব নাই। দাতারা তীর্থযাত্রীদিগের সকল অভাবের মোচন করিয়া দিয়াছেন।

এখানে গঙ্গার পরিসর দুই শত ফুটের মধ্যে। এই স্থান হইতে দুই শত হস্ত পশ্চিম দিকে একটি কাষ্ঠনির্ম্মিত সেতু আছে। এই সেতুর বাম দিকে কেদারগঙ্গা কেদারনাথ হইতে গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছেন। এই উভয় নদীর সঙ্গমস্থানে একটি ধর্ম্মশালা আছে।

গঙ্গোত্রীর অর্দ্ধ মাইল পশ্চিম দিকে গৌরীকুণ্ড। এই গৌরীকুণ্ড একটি গঙ্গাদেবীর বৃহৎ কীর্ত্তি। গৌরীকুণ্ডের জলভাগ হইতে তীরদেশ চারি শত হস্ত উচ্চ। এই পর্ব্বত নিখুঁত পাষাণময়, মৃত্তিকার লেশও নাই। ভাগীরথী স্রোতোবেগে এই কঠোর পাষাণ ভিন্ন করিয়া নিম্নে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এই অবতরণস্থানকে গৌরীকুণ্ড কহে। গৌরীকুণ্ডের মধ্যস্থলে একটি শিবলিঙ্গ আছে; প্রায় পঁচিশ হস্ত ঊর্দ্ধ হইতে এই ভাগীরথীপ্রপাত ভীম গর্জ্জনে কুণ্ডস্থ রুদ্রদেবের মস্তকোপরি নিপতিত হইতেছে; রুদ্রদেবও যেন ভাগীরথীকে মস্তকে ধারণ করিয়া বালকবৎ জলক্রীড়া করিতে করিতে ফুৎকারে ফুৎকারে জলময়ী জাহ্নবীকে ঊর্দ্ধে নিক্ষেপ করিয়া জলক্রীড়া করিতেছেন। সেই সহস্র সহস্র জলকণা যুগপৎ ঊর্দ্ধে উঠিয়া আবার রুদ্র-মস্তকে পতিত হইতেছে। সেই জলকণাসমূহে সূর্য্যকিরণসম্পাতে বোধ হইতেছে, সতী অনেক দিন পরে পতিকে পাইয়া রুদ্রকণ্ঠে নানা রঙ্গে চিত্রিত রামধনুর সোহাগ-হার পরাইয়া দিতেছেন! আর এই অপূর্ব্ব দৃশ্য লুকাইবার জন্যই যেন সবেগে মুহুর্মুহুঃ জল নিক্ষেপ করিয়া তীরস্থ বৃক্ষরাজিকে আকুল করিয়া তুলিতেছেন।

এই গৌরীকুণ্ড হইতে গঙ্গাদেবী একবারে নিম্নে অবতরণ করিয়া নিম্নগা শব্দের যাথার্থ্য সপ্রমাণ করিতেছেন; ইহার পর গঙ্গার গভীর গম্ভীর গর্জ্জন ও বৃক্ষরাজির অন্তরালে পারদরেখাবৎ বক্রগতি ভিন্ন আর কিছুই দর্শন বা শ্রবণের গোচর হয় না। এই গঙ্গোত্রীতে বৎসরের মধ্যে ছয় মাস কাল খুব সমারোহ; পূজা অর্চ্চনা, যাত্রীদিগের গমনাগমন ও বাদ্যধ্বনিতে এক রকম সরগরম হইয়া

থাকে। আর যেই কার্ত্তিকী পূর্ণিমা উপস্থিত হয়, অমনই পাণ্ডারা গঙ্গামূর্ত্তি লইয়া মার্কণ্ডেয় নামক স্থানে পলায়ন করে। রাস্তা, ঘাট বরফে পরিপূর্ণ হয়, লোকের গমনাগমনের উপায় থাকে না; গঙ্গোত্রী নির্জ্জন হইয়া যায়; পশুপক্ষীও এখানে থাকে না; কেবল দেবতারাই ছয় মাস কাল এখানে অবস্থিতি করেন। কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতে গঙ্গোত্রীর পট অর্থাৎ গঙ্গাদেবীর দরজা বন্ধ হয়, এবং বৈশাখের অক্ষয়-তৃতীয়ার দিবস পট খোলে। এই স্থান হইতে ১৩।১৪ মাইল নিম্নে পাণ্ডাদিগের বসতিস্থান। পাণ্ডাদিগের বাসগ্রামের নাম মার্কুণ্ডেয়। মহর্ষি মার্কণ্ডেয় এখানে তপস্যা করিয়াছিলেন; তাঁহারই নামানুসারে এই স্থানের নাম মার্কুণ্ডেয় হইয়াছে। এখানে গঙ্গাতীরে একটি গঙ্গামন্দির আছে। সেই মন্দিরে বৎসরের মধ্যে ছয় মাস কাল গঙ্গাদেবীর পূজা হইয়া থাকে। গঙ্গাদেবীর পূজক পাণ্ডারা গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ; কিন্তু ইহাদের আচার ব্যবহার চাল চলন আমাদের দেশীয় ব্রাহ্মণের অনুরূপ নহে। ইহারা সদাসর্ব্বদাই পাজামা ও চাপকান পরে, শিরে উষ্ণীষ বাঁধে, জুতা ও মোজা ব্যবহার করে। ছয় মাস একেবারে স্নান করে না। ইহার মধ্যে যাহারা নিষ্ঠাবান, তাহারা মাথায় জল দিয়াই স্নানের কার্য্য শেষ করে। ভাগীরথী-দশহরার দিবস একবার অবগাহন স্নান করিয়া থাকে। বস্ত্র ছিন্ন না হইলে আর পরিত্যাগ করে না। ইহারা পশমী ও উলী বস্ত্র ব্যবহার করে। বাড়ী ঘর এত অপরিচ্ছন্ন যে, পাণ্ডাদের গৃহে গমন করিলে অন্নপ্রাশনের অন্ন উঠিবার উপক্রম হয়। কিন্তু ইহাদের মধ্যে ফোঁটাকাটার বড়ই ধুম। পাণ্ডামাত্রই ফোঁটা কাটিবে, এবং ২।১টা সংস্কৃত শ্লোক মুখস্থ করিয়া রাখিবে। ইহাদের আহারীয় সম্বন্ধে বড় একটা বাদ বিচার নাই। অন্ন ও ডাল ভিন্ন ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের প্রস্তুত রুটী তরকারী ও ঘৃতপক্ক দুগ্ধপক্ক সমস্ত জিনিসই আহার করিয়া থাকে। ইহারা দেখিতে খুব সুশ্রী, সবল ও দীর্ঘজীবী। পাণ্ডাদিগকে দেখিলে ব্রাহ্মণ বলিয়া ভক্তি হয়। গঙ্গোত্রীর পাণ্ডারা বড়ই দরিদ্র। যে বৎসর অধিক যাত্রী হয়, সেই বৎসর কষ্টেসৃষ্টে দু'বেলা আহারীয় পায়; নতুবা অনেককে একাহারী থাকিতে হয়। দরিদ্রতার দরুণ ইহারা কিছু লোভী, কিন্তু অল্পে সন্তুষ্ট। দুইটি টাকা পাইলেই ইহারা যথেষ্ট বলিয়া মনে করে। যাত্রীদিগের জন্য ইহারা প্রাণপণ করে। পূর্ব্বে গঙ্গোত্রীর মন্দিরে কোন সু-ব্যবস্থা ছিল না; যে যাহা পাইত, সেই তাহা আত্মসাৎ করিত। কিন্তু সম্প্রতি টিহরির রাজার অনুরোধে পাণ্ডারা সমবেত হইয়া একটি সুন্দর নিয়ম করিয়াছে। গঙ্গোত্রীতে যাত্রীদিগের নিকট কোন পাণ্ডা কিছু প্রার্থনা করিতে পারিবে না;

যাত্রীরা ইচ্ছা করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক যাহা দিবে, তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে। মন্দিরে যে যত দক্ষিণা দিবে, বা পূজার দ্রব্য সামগ্রী দিবে, তাহা পঞ্চায়তে জমা হইবে। সেই দ্রব্য সামগ্রী ও অর্থ দ্বারা গঙ্গামাতার পূজা ও অর্চ্চনা সম্পন্ন হইয়া যাহা কিছু উদ্বৃত্ত থাকিবে, তাহা পাণ্ডারা ভাগ করিয়া লইবে। এই নিয়ম অব্যাহত রাখিবার জন্য পাঁচ জন প্রধান পাণ্ডা নিযুক্ত আছেন, তাঁহারাই ভোগরাগের বন্দোবস্ত করিয়া থাকেন। আর এক জন ধন-রক্ষক নিযুক্ত আছেন, তিনি ধন রক্ষা করেন। এই স্থানের পাণ্ডারা শিবকল্প শঙ্করাচার্য্যের আনীত। টিহরির পথে ডেরাডুন হইতে গঙ্গোত্রী ১৪৯ মাইল। পথিমধ্যে দোকান ও ধর্ম্মশালা আছে। রাস্তাটি মন্দ নহে। তবে হিমালয় পর্ব্বতের উপর দিয়া রাস্তা। এই রাস্তায় চড়াই ও ওতরাই আছে। কিন্তু সেই চড়াই ও ওতরাই মারাত্মক নহে। সকল স্থানে দোকান নাই; অতএব পথিকদিগের পক্ষে এক দিবসের আহারীয় সঙ্গে রাখা উচিত।

ডেরাডুন হইতে গঙ্গোত্রী যাইবার আরও ২।৩টি রাস্তা আছে। কিন্তু সেই সকল রাস্তা জঙ্গলে পরিপূর্ণ ও ক্লেশকর। পথিমধ্যে গ্রাম ভিন্ন আশ্রয়স্থান নাই। বৃক্ষমূলে বা নদীতটে নিশাযাপন করিতে হয়। সুতরাং নিম্ন প্রদেশের যাত্রীদিগের পক্ষে টিহরির রাস্তাতেই গঙ্গোত্রী যাওয়া পরামর্শসিদ্ধ। কলিকাতা হইতে ডেহরা পর্য্যন্ত রেলওয়ে আছে। ডেহরা হইতে রাজপুর পর্য্যন্ত ঘোড়ার গাড়ী পাওয়া যায়। রাজপুরে ২।৩টি আড্ডা আছে; সেই সকল আড্ডাতে যথেষ্ট দাণ্ডী ও ঝাম্পান থাকে। তীর্থযাত্রীদিগের মধ্যে যাঁহারা চলিতে অক্ষম, তাঁহারা এই সব আড্ডাতে গেলেই দাণ্ডী বা ঝাম্পান ভাড়া করিতে পারেন। চারিটি কুলি ও দাণ্ডীর যাতায়াতের ভাড়া পঞ্চাশ হইতে যাট টাকা পর্য্যন্ত।

রামানন্দ ভারতী।

কাহিনী।

আমরা যাহাকে 'রূপকথা' বলি, অন্য দেশে তাহাকে 'কহাওনী' বা 'কাহিনী' বলে। ছেলেবেলা ঠাকুমার মুখে রূপকথা বড় ভাল লাগে; কারণ, ছেলেবেলার শীতল বাতাসে বিরল আঁধারে তাহারা ফুটে। মানব জাতির অস্ফুট বয়সের আশা আশঙ্কা ভ্রম ও বিশ্বাস, চিন্তা ও কল্পনা, মানব-সমাজের প্রথম ইতিহাস,

মানবপ্রকৃতির প্রথম ইতিবৃত্ত তাহাদের মধ্যে লুক্কায়িত আছে। এক একটি কবিতা ভাবে ভরা, অতি কোমল করে ধরিতে হয়, অতি আদরে তাহাদের সৌরভ ভোগ করিতে হয়। মানবপ্রকৃতির রহস্য-উদ্ঘাটনে তাহারা অসামান্য সহায়।

বাঙ্গালা বিহার আসাম উড়িশার আর্য্যজাতি কান্যকুব্জকে প্রাচীন আবাস বলিয়া অভিহিত করেন। এই সকল ভাষার কাহিনীমালার একতা কনোজসম্ভবত্বসূচক বলিয়া বুঝা যাইতে পারে। গুজরাট ও মহারাষ্ট্রে দেখিলে না হয় বুঝিব, কুরুক্ষেত্রে তাহাদের অভ্যুদয় হইয়াছিল। তাহা হইলেও পাঁচ সাত হাজার বৎসরের পুরাতন জিনিস বলিয়া তাহারা কত মূল্যবান। কিন্তু মহানদীর পার্শ্বে কৃষিগ্রামে কৃষকের কুটীরের কাহিনী কামস্কটকা বা কিম্বালীতে শুনিতে পাইলে, তাহাদের উৎপত্তির ইতিহাস, প্রচারের প্রণালী, বড়ই রহস্যময় হইয়া পড়ে। বস্তুতঃ জাতি হইতে জাত্যন্তরে কাহিনীর প্রচার-ক্রম সর্ব্বত্র সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। অবস্থাবিশেষে তাহাদের স্বতঃ উৎপত্তি স্বীকার করিয়া লইতে হয়। আর্দ্র অন্ধকার ভূমিতে এক প্রকার গাছ সর্ব্বত্রই জন্মে। মানব-বিকাশের গোধূলিলগ্নে কাহিনীর স্বতঃ উৎপত্তি স্বাভাবিক।

সমাজের উৎপত্তির ন্যায় মানস প্রকৃতির বিজ্ঞানের বা দর্শনের উৎপত্তির ইতিহাস কাহিনীর ভিতর প্রচ্ছন্ন আছে। বাল্যকাল হইতে মনুষ্য ভৌতিক ব্যাপারের ন্যায় অতিভৌতিক ব্যাপারেরও জল্পনা করিয়াছে। অতিভৌতিক জল্পনা অপেক্ষাকৃত একটু ব্যাবৃত অবস্থায় উৎপন্ন। সে জন্য অতিভৌতিক জল্পনা এমন কবিত্বপূর্ণ যে, অধিকতর ব্যাবৃত আমরাও তাহার রসাস্বাদনে সমর্থ হই। ঊষা ও অশ্বিনীকুমারের, ড্যাফনী ও ভেনসের কাহিনী এই জন্য এত মনোহর। শুধুই কি কবিত্ব? পিতৃপিতামহের সেই বিশ্বাস একটি এমন মানসিক দুর্ব্বলতার উৎপাদন করিয়াছে যে, সহস্র বৎসরেও ভূতের ভয়, হাঁচি টিকটিকির অত্যাচার, অন্ধকারের সহিত আশঙ্কার সংযোগ, আলোকের সহিত প্রফুল্লতার সম্বন্ধ দূর হইবে, বলা যায় না। এক জন দারবিন আলোকের ও স্নায়ুর পরিসন্ধান করিয়া তাহাদের এরূপ সম্বন্ধের নিত্যতা দেখাইতে পারেন, কিন্তু উত্তরাধিকৃত বিকৃত স্নায়ুর অবস্থা দেখিয়া, প্রথম পুরাণ পুরুষের স্নায়ুর সহিত আলোকের এ সম্বন্ধ ছিল কি না, কে বলিবে? অতিভৌতিক জল্পনার কতকগুলি যে শব্দমূলক, শব্দবিজ্ঞানে ব্যাখ্যাত হইতে পারে, তাহা অস্বীকার করি না। কিন্তু কুয়াসার আঁধারে যে রজ্জুতে

সর্পভ্রম হয়, মানসপ্রকৃতির প্রথম উন্মেষে ভ্রান্তি ও কুসংস্কারে যে অনেকের জন্ম, তাহা কে অস্বীকার করিবে? কাহিনী তাহাদের ভাণ্ডার।

উড়িশার একটি উৎসাহী যুবক, সিদ্ধেশ্বরপুরের জমীদার নৃসিংহ প্রহরাজের পুত্র শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র প্রহরাজ কতকগুলি উড়িয়া কাহিনীর সংগ্রহ করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থের এক খণ্ড উপহার পাইয়া দেখিলাম, কাহিনীগুলি বাঙ্গালা ভাষায় অনূদিত হইলে বাঙ্গালা কাহিনীগুলির সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। প্রথম কাহিনী পড়িলেই বাঙ্গালী পাঠকের দুটি প্রিয় কাহিনী স্মরণ হইবে। সঙ্গে সঙ্গে উৎকল-গৃহের চিত্র, উৎকল আশা, আশঙ্কা, ভ্রান্তি ও সংস্কারের পরিচয় পাইবেন।

১

দিদি গো দিদি একটা কথা।
কি কথা? ব্যাঙের মাথা।
কি ব্যাঙ? সরু ব্যাঙ।
কি সরু? বামন গরু।
কি বামন? ভাট বামন।
কি ভাট? গুয়া কাট।
কি গুয়া? চিকি গুয়া।
কি চিকি? সোনার চিকি।
কি সোনা? দুই খানা।
তার অর্দ্ধেক ভাগ নেনা।

২

সাত ভাই চম্পা জাগ রে?
কেন বোন পারুল ডাক রে?
রাজা মশার লোক এসেছে
ফুল দেব কি না দেব?
না দিব না দিব ফুল—
উঠিব অনেক দূর;
আগে আসুক রাজা মশায়—
তবে দেব ফুল।

অতঃপর উৎকলকাহিনীর আরম্ভ করা যাউক।

"চকুলিয়া পণ্ডার কথা।"

"কথাটিএ কহুঁ, কথাটিএ কহুঁ।
কিস কথা? বেঙ্গ মথা।
কি বেঙ্গ? ঠুরা বেঙ্গ।
কি ঠুরা? বাহ্মণ মরা।
কি বাহ্মণ? শুধ্য বাহ্মণ।
কি শুধ্য? পিঠা মধ্য।
কি পিঠা? তাল গইঁঠা।
কি তাল? সোরিষমাল।
কি সোরিষ? অণ সোরিষ।
কি অণ? কিয়া বণ।
কি কিয়া? রজাভিআ।
কি রজা? খণ্ডি খজা।
কি খণ্ডি? মিরিগলণ্ডি।
কি মিরিগ? ঝাড় মিরিগ।
কি ঝাড়? কণ্টা ঝাড়।
কি কণ্টা? কাণকোলি কণ্টা।
ঘর্ঁরে লাগিব লটাপটা।"

এক গ্রামে এক 'চকুলিয়া পণ্ডা' বাস করিত। তার সাত মেয়ে। এক দিন 'পণ্ডা' 'পণ্ডিয়াণী'কে বলিল, 'পিঠে কল্লিনে?' পণ্ডা সকালে উঠে ভিক্ষে ক'রতে গেল। পণ্ডিয়াণী গাঁ থেকে, এর ঘর থেকে শীল, ওর ঘর থেকে সরা, কারু ঘর থেকে খুন্তি এনে পিঠে কল্লে।—পিঠে করা শেষ হ'য়েছে, সে শৌচে গেল। ফিরে এসে দেখে যে, সাতটি মেয়েতে সাতটি পিঠেই খেয়ে ফেলেছে। পণ্ডা যদি এসে শোনে, তা হ'লে রক্ষে রাখ্‌বে না। মেয়েগুণোকে ধরে একচোট্ খুব মার দিলে, আর খুন্তি তাতিয়ে তাদের আচ্ছা ক'রে ছেঁকা দিলে। গরিবের ঘর, আর কি চাল ডাল আছে যে, আবার পিঠে করে রাখ্‌বে? খানিক্ 'আছাড় কাছাড়' খেলে, তার পর বসে বসে কাঁদতে লাগল। সন্ধ্যেবেলা পণ্ডা বাড়ী ফিরল। পণ্ডিয়াণী সব কথা তাকে বল্লে। তারা পরামর্শ করলে যে, মেয়েগুলোকে নিয়ে বনে ছেড়ে দিয়ে এলে আপদ্ যাবে। এই মনে ভেবে দু'জনে রাত্রিতে ঘুমুল। তার পরদিন সকালে পণ্ডিয়াণী এক পুঁটুলী ভাত আর এক পুঁটুলী কাপাস-বিচি রেঁধে ঠিক্ করে দিলে। পণ্ডা মেয়েদের মামার বাড়ী নিয়ে যাবার ছল্ করে পুঁটুলী দুটো কাঁধে করে মেয়েদের নিয়ে বেরুল। যেতে যেতে রাস্তায় এক ভয়ানক বন প'ড়ল। সেখানে 'কুয়ার থণ্ট নাঁহি, কি চড়েইর বেণ্ট নাই।' সেখানে মেয়েদের ক্ষিদে পাওয়ায় তাদের সেখানে এক গাছের তলায় বসিয়ে জল আন্‌তে গেল। ভাতের পুঁটুলীটি কিন্তু নিজে সঙ্গে নিয়ে গেল। কাপাসবিচির পুঁটুলীটি মেয়েদের কাছে রেখে গেল।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে বেলা দুপুর হয়ে গেল। এখনও কেন বাবা ফির্‌ল না? বাপ্‌কে কত ডাকাডাকি ক'রলে, কেউ শুন্‌লে না। কত কাঁদলে, তবুও বাপ্ সাড়া দিলে না। এ দিকে ক্ষিদেয় তাদের তখন পিত্তি পর্য্যন্ত শুকিয়ে গেছে। পুঁটুলীটি খুলে দেখে যে, ভেতরে কাপাস্‌বিচি। তখন তাদের কাল্‌কের পিঠে খাওয়ার কথা মনে পড়ল। শেষে বুঝ্‌তে পার্‌লে যে, বাপ্ তাদের ছল্ করে বনে ছেড়ে দিয়ে গেছে, আর ফির্‌বে না।

সন্ধ্যে হ'ল। মধ্যে মধ্যে শেয়াল আর নেকড়ে ডাক ছাড়তে আরম্ভ কল্লে। কাছে কেউ নেই। ছেলেমানুষ একলা, তাদের বড় ভয় ক'র্‌তে লাগ্‌ল। ক্রমে ক্রমে অন্ধকার বেশী হ'তে লাগ্‌লো। সেই বনে ভূত, বেহ্ম-দত্যি, ডাইনি, সাঁকচুন্নি অনেক। তারা তখন চেঁচিয়ে কেঁদে কেঁদে চুপ ক'রেছে। একটা গাছের ওপর সাত বোনে উঠল। চুপ করে ডালে বসে

তাদের চোখ দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়তে লাগল। রাত্রে সেখানে কে আছে যে, চেঁচিয়ে কাঁদলে শুনে দৌড়ে আসবে?

সে দেশের রাজা শিকার করতে বেরিয়েছিলেন। ফিরে আস্তে আস্তে সন্ধ্যা হ'ল। ঘোড়ায় চড়ে সেই গাছের নীচে দিয়ে যেতে তাঁর গায়ে গাছ থেকে এক্ ফোঁটা জল পড়্ল। রাজার কাছে অপূর্ব্ব কি? সঙ্গে তাঁর মন্ত্রী, পাত্র, কোটাল, বেহারা, নাপিত প্রভৃতি অনেক। তখুনি 'দেখুনিয়া'কে দেখালেন, 'চাখুনিয়া'কে চাখালেন।—ঠিক্ হ'ল, সেটা শুধু এক ফোঁটা জল নয়, কোন লোকের চোখের জল্! গাছের উপর চেয়ে দেখ্লেন, সাতটি মেয়ে বসে কাঁদ্ছে। রাজা হুকুম দেওয়ায় সাত বোনে গাছ থেকে নাম্ল।

তাহার পর রাজা বল্লেন, 'কে কি কাজ্ করতে পার বল, আমি তোমাদের নিয়ে গিয়ে রাজবাড়ীতে রাখ্ব।'

বড় বোন্ বল্লে, 'আমি এক ধুচুনী চালের ভাত রাঁধ্লে, রাজবাড়ীর সমস্ত লোক এবং সমস্ত সৈন্যসামন্ত খেলেও ফুরুবে না।'

তার পরের বোনটি বল্লে, 'আমি এক বোগ্‌নো চাল ডাল বাটায় পিঠে করলে, রাজবাড়ীর সমস্ত লোক এবং সমস্ত সৈন্যসামন্ত খেলেও ফুরুবে না।'

তার পরেরটি বল্লে, 'আমি এক বাটী হলুদ বেটে দিলে, রাজবাড়ীর সমস্ত লোক এবং সমস্ত সৈন্যসামন্ত মাখ্লেও ফুরুবে না।'

আর এক জন বল্লে, 'আমি যদি এক হাঁড়ী বেন্নন্ রাঁধি, তা হলে তা ফুরুবে না।'

এই রকম, ছয় বোনে ছয় রকম কথা বল্লে। সব শেষে সব ছোট বোন্টি বল্লে, 'আমার বে হলে সুন্দর সাত ছেলে এবং সোনানাকী মেয়ের জন্ম হবে।'

রাজা সব বোনগুলিকে রাজবাড়ীতে নিয়ে গেলেন। যে যা কাজ পারে, বলেছিল, তাদের সেই কাজে রেখে, সব ছোটটিকে পাটরাণী কল্লেন।

দিনকতক পরে রাণীর গর্ভ হ'ল। রাজা সব্ সময় কাছারী করেন। রাণীর গর্ভ! কথায় বলে,

"ঠাকু ন উঠে বয়,
ধরাধরি করি বাহা কর।"

রাণী যেখানে বসেন, আর উঠ্‌তে পারেন না। রাজাকে দেখ্লে বড় আমোদ হয়। রাণীর খেতে ইচ্ছে হ'ল,—কখন একটু 'শুখুয়া রাই', কখনও বা একটু 'মুলা কাঞ্জি', কখনও বা একটু দুধের ছেনা, যখন যা ইচ্ছা হয়,

রাজা সঙ্গে সঙ্গে সব আনিয়ে দেন।—রাজার বাড়ী, তাঁর কাছে কি অপূর্ব্ব? আকাশের তারাও আনতে পারেন। দেখতে দেখতে দশ মাস পূর্ণ হ'ল। রাজা ত সব সময়ে অন্দরে থাকতে পারেন না, তাঁকে দরবারে যেতে হয়;—পাত্র, মন্ত্রী, কোটাল, এদের সঙ্গে মামলা মকদ্দমা বুঝতে হয়। আমরা যে গোরু চরাই, তাঁরা যে মানুষ চরান্।—তিনি এখন কি ক'রে রাণীর কাছে সব সময় বসে থাক্‌বেন্? রাজা শেষে দরবারে যাবার সময় রাণীকে একটা বাঁশী দিয়ে যান্। রাণীর প্রসববেদনা উপস্থিত হ'লে, সেই বাঁশী বাজালে রাজা তাঁর কাছে আসবেন।—রাজা এই ব'লে দরবারে গেলেন। রাণী ভাব্‌লেন, পাছে ঐ কথা মিথ্যা হয়। এই ভেবে, রাজা এক দিন দরবারে গেছেন, এমন সময় রাণী মিথ্যে মিথ্যে বাঁশী বাজালেন। রাজা যেই বাঁশীর শব্দ পেলেন, অমনই অন্দরমহলে গেলেন। গিয়ে দেখ্‌লেন, রাণীর কোনও কষ্ট নাই, চুপ্ ক'রে ব'সে আছেন। রাণীকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, 'কি গো, আমাকে কেন ডাকালে? তোমার ত এখন বেদনা ধরে নি।' রাণী বল্‌লেন, 'বাঁশী বাজালে তুমি সত্যি আস্‌বে কি না দেখ্‌বার্ জন্যে বাঁশী বাজিয়েছিলুম, এখন জানলুম্ তোমার কথা সত্যি।'

রাজা এই শুনে ফিরে গেলেন। তাঁর এই কথা মনে থাকে।—একদিন সত্যি সত্যি রাণীর বেদনা হ'ল। কত কষ্ট হ'তে লাগ্‌ল। সেই সুকুমার দেহে কি তা সয়? রাণী সেই সময় রাজাকে মনে ক'রে বাঁশী বাজালেন।—রাজার আগেকার কথা মনে ছিল। তিনি মনে কল্লেন, রাণী ঠাট্টা ক'রে বাঁশী বাজাচ্ছেন।—এই মনে ক'রে রাজা এলেন না। রাণী একেবারে সাতটি সুন্দর ছেলে আর একটি সোনানাকি মেয়ে প্রসব কল্লেন।

এ দিকে আবার এক মায়ের পেটের সাত বোন্। তার মধ্যে ছ' জন হ'ল রাজার দাসী, আর একটি হ'ল পাটরাণী। তাও যে পাটরাণী হ'ল, সেও আবার সব চেয়ে ছোট।—এ কি কখন রক্ত মাংসের দেহে সয়? মনে মনে ঐ ছ' বোন খানিক্ খানিক্ 'রবেই খবেই' হয়, ছোট বোনকে গালাগাল দিয়ে ভগবানকে সাক্ষী মানে, আর রোজ তার নামে সন্ধ্যার প্রদীপ দেয়।—তারা মনে মনে ঠিক ক'রে থাকে যে, যদি কখনও তাকে হাতে পায়, তা হ'লে তাকে আচ্ছা ক'রে এক হাত দেখে নেবে।

তাঁর কাছ থেকে আটটি ছেলেই তুলে নিয়ে আটটি কাঠের পুতুল রেখে দিলে, আর সেই ছেলেগুলিকে নিয়ে আঁস্তাকুড়ে পুঁতে ফেল্লে।—রাণী চেতনা পেয়ে দেখ্‌লেন, আটটি কাঠের পুতুল প্রসব করেছেন। দেখে তাঁর বুক ফেটে গেল। রাজার ছেলে হ'বে ব'লে বাজনা, বাদ্যি, শাঁখ, 'ভেঁপেঁঙ্গি বাজনা', নাচ প্রভৃতি হচ্ছে, খবর নেবার বেলায় কি না আটটি কাঠের পুতুল! যে শুন্‌লে, তার পচ্ছন্দ হ'ল না; যে শুন্‌লে, সে মাথায় হাত দিলে। সকলে ছি ছি কর্‌তে লাগল।

'চম বাইদ কোশে,
তুণ্ড বাইদ সহস্রে কোশ।'

এ কথা রাজ্যের সব যায়গায় প্রচার হ'য়ে গেল। রাজাও এ কথা শুন্‌লেন। এসে দেখেন, সত্যি সত্যিই এইরূপ ব্যাপার।—এতে তাঁর বড় লজ্জা হ'ল। পাত্র মন্ত্রী সকলকে ডাকালেন। পরে হুকুম হ'ল যে, রাণীকে নেড়া ক'রে ঘোড়াশালে রাখ, সে ঘোড়ার নাদ পরিষ্কার করুক।—যতই যে বলুক না কেন, রাজা ত একে অবোঝ, তিনি কি আর কিছু শোনেন্? পরে তাই হ'ল।—রাণী কেঁদে কেটে আপনার অদৃষ্ট ভেবে ঘোড়াশালে প'ড়ে থাকেন; যে দেখে, সে এক আধটা খোঁটা দেয়। রাজার ঘরে তিনি কি না ভোগ করেছিলেন? এমন ভাগ্য ছিল যে, বেণারসী জোড় পরে শৌচে যেতেন, ঘিয়ে কুলকুচা কর্‌তেন, শৌচে যাবার সময়েও 'টেরাবাড়' প'ড়ত। এখন আবার এত দুরবস্থাও ভোগ করতে হ'ল!

এ দিকে কি হ'য়েছে—ছয় বোনে ত আঁস্তাকুড়ে সেই আটটি ছেলেকে পুঁতে এসেছিল। সেখান থেকে তাদের কুকুরে গিলেছিল। কুকুরগুলো আবার পুকুরে তাদের বমী করে।—'গঙ্গামাতা' সে আটটি ছেলেকে রেখে পাল্‌লেন। দিন দিন ছেলেরা বাড়্‌তে লাগল; খেলা কর্‌তে ও বেড়াতে শিখ্‌লে।—'গঙ্গামাতা' কি করলেন, সাতটি বেটা ছেলেকে খেল্‌বে ব'লে সাতটি কাঠের ঘোড়া দিলেন। সেই সাতটি ছেলে সাতটি ঘোড়া নিয়ে রোজ পুকুরের ধারে খেলা করে। ঘোড়াগুলোকে এক কোমর জলে নিয়ে গিয়ে তাদের মুখ জলে ডুবিয়ে বলে, 'কাঠ ঘোড়া পাণি পি!' 'কাঠ ঘোড়া পাণি পি!' 'কাঠ ঘোড়া পাণি পি!' পুকুরটি রাজবাড়ীর কাছে।—রাজার ধোবা সেই পুকুরের ধারে কাপড় কাচে।—কাপড় কাচে ও ছেলেরা ঘোড়া নিয়ে খেলা করে দেখে। ছেলেদের দেখে বল্লে,

'বাই হোইছ কি বালুত ভাই,
কাঠর ঘোড়া কি পানি পিঅই?'

তাতে ছেলেরা উত্তর কল্লে,

'বাই হোইছ কি সেঠি ভাই,
মনিষ হোই কি কাঠ কুণ্ডেই নেই?'

ধোবা ত এই শুনে অতি আশ্চর্য্য হ'ল! রাজবাড়ীতে গিয়ে খবর দিলে। রাজা পুকুরের ধারে লোক পাঠালেন। 'গঙ্গামাতা' মায়া ক'রে ছেলেদের লুকিয়ে ফেল্‌লেন। যে শোনে, সেই আশ্চর্য্য হয়। দিন কতক পরে 'গঙ্গামাতা' মায়া ক'রে সাতটি ভাইকে সাতটি 'অর্জ্জুন' গাছ, আর বোনটিকে 'পাটলী' গাছ ক'রে, সেই পুকুরের ধারে লাগিয়ে দিলেন। পাটলী গাছ ফুলে ভেঙ্গে-পড়-পড় হ'ল। সকলে দেখে আশ্চর্য্য! এক দিন সেখান দিয়ে গাড়োয়ানেরা যাচ্ছিল, তারা সেই গাছ থেকে কতকগুলো ফুল ও ডাল ভেঙ্গে নিলে।— রাজার মালী তাদের কাছে ঐ ফুল চাইলে। তারা বল্লে, 'তোমাদের রাজ-বাড়ীর কাছে পুকুরধারে ফুলে গাছ ভেঙ্গে পড়ছে, তুমি আমাদের কি চাচ্ছ?' মালী পুকুরধারে গিয়ে দেখে যে, এই পাটলী গাছ আর ঐ সাতটা অর্জ্জুন গাছ ত সেখানে কখনও ছিল না, কোত্থেকে এল?

পাটলী গাছ এই গানটি গাইলে,

'ভাই রে ভাই রে, আম্ম বাপাঙ্কর মালী আসিঅছি,
দেবা কি ন দেবা ফুল?'

তাতে সাতটি অর্জ্জুন গাছ আর একটি গান গাইলে,

'স্বর্গে লাগু ডাল, মন্‌টে লাগু ডাল,
আম্ভে সাত ভাই ভউনীএ থাউ মা পোছে ঘোড়াশাল।
আলো লো ভউনি! ন দিঅ ন দিঅ ফুল।'

এই বল্‌তে বল্‌তে পাটলী গাছের ডাল একবার ওপরে উঠ্‌তে লাগ্‌ল, একবার নীচে নাম্‌তে লাগ্‌ল। মালী ফুল তুল্‌তে পাল্লে না। বাড়ী এসে, রাজাকে এ কথা জানালে। রাজা মন্ত্রীকে পাঠালেন। মন্ত্রী গাছের নীচে এলে গাছগুলি গান করলে,

'ভাই রে ভাই রে, আম বাপাঙ্কর মন্ত্রী অইলেনি
দেবা কি ন দেবা ফুল?
স্বর্গে লাগু ডাল, মন্‌টে লাগু ডাল,
আম্ভে সাত ভাই ভউনীএ থাউ মা পোছে ঘোড়াশাল।
আলো লো ভউনি! ন দিঅ ন দিঅ ফুল।'

মন্ত্রী এই খবর গিয়ে রাজাকে বল্লেন। পরে রাজা নিজে এলেন।—রাজাকে দেখে গাছেরা বলাবলি কল্লে,

'ভাই রে ভাই রে, আম বাপা এবে নিজে অইলেনি

* * *

ন দিঅ ন দিঅ ফুল।'

এই শুনে রাজার আগেকার কথা সব মনে পড়ল। রাণী ঘোড়াশালে নাদ্ পরিষ্কার করছিলেন। তাঁকে সেইখানে ডাকিয়ে আন্লেন। রাণী সেই গাছের তলায় যেতে সব ডালগুলো ভেঙ্গে তাঁর কোলে ঝাঁপিয়ে পড়্ল!

দেখ্তে দেখ্তে সাতটি সুন্দর সুন্দর ছেলে এবং এক সোনানাকি মেয়ে হয়ে মায়ের চারি দিক ঘিরে দাঁড়াল। রাজা ত দেখেই অবাক্! যে দেখ্লে, সেই আহা করতে লাগল। তার পর রাজা পাত্র, মন্ত্রী, 'তুরী' 'কাহালী', পাল্কী, গাড়ী প্রভৃতি আনিয়ে ভাই, বোন্, মা সকলকে স্নান করিয়ে 'পাট-পীতাম্বরী' কাপড় চোপড় পরিয়ে রাজবাড়ীতে নিয়ে গেলেন। কত উৎসব হ'ল, কত লোক খেলে, রাণী আগেকার সব কথা বল্লেন। তাতে রাজা সেই ছয় বোন্‌কে ওপরে কাঁটা ও নীচে কাঁটা দিইয়ে 'কুঁয়া' খুঁড়ে তাতে পুঁতিয়ে ফেল্লেন। রাণীকে ও ছেলে মেয়েদের নিয়ে ঘর করতে লাগ্লেন। সেই সোনানাকি মেয়ের 'ঠাকুর রাজার' (পুরী রাজার) ছেলের সঙ্গে বে দিলেন। কত পিঠে বিলুলেন, কত কাপড় বিলুলেন। আমি গেলাম, আমার সঙ্গে কথা কইলেন না। কল্‌কেতা থেকে পুরী পর্য্যন্ত লম্বা এমন একখানা কাপড় দিলেন যে, আমার পরতে কুলুল না।

'মো কথাটি সইলা—ফুল-গছটি মলা—

হইরে ফুল-গছ তু কাঁহিকি মলু?

মতে কালী গাই খাইলা।

হইলো কালী গাই তু কিআঁ খাইলু?

মতে গউড় জগিলা নাহি।

হইবে গউড় তু কিআঁ জগিলু নাহি?

মতে বড় বোহু খাইবাকু দেলা নাহি।

হইলো বড় বোহু তু কিআঁ খাইবাকু দেলু নাহি?

পুঅ কান্দিলা।

হইরে পুঅ তু কিআঁ কান্দিলু?

মতে ধুলিয়া জন্দা কামুড়িলা।

হইরে ধুলিয়া জন্দা তু কিআঁ কামুড়িলু?

ভুঁই তলে তলে খাত্র,
কঁউল মঁউস টিকিএ পাইলে রুটকিনি খাত্র।'

পাঠক! এই শেষ শ্লোকটির সঙ্গে আপনার বাঙ্গালা শ্লোকটি মিলাইয়া দেখুন।

'আমার কথাটি ফুরুলো।
নটে গাছটি মুড়ুলো।
কেন রে নটে মুড়ুলি?
গরুতে কেন খায়?
কেন রে গরু খাস্?
রাখাল কেন চরায় না?
কেন রে রাখাল চরাস না?
বৌ কেন ভাত দেয় না?
কেনরে বৌ ভাত দিস না?
কলাগাছ কেন পাত ফেলে না?
কেন রে কলাগাছ পাত ফেলিস নে?
জল কেন হয় না?
কেন রে জল হ'স না?
ব্যাঙ কেন ডাকে না?
কেন রে ব্যাঙ ডাকিস' না?
সাপে কেন খায়?
কেন রে সাপ খাস?
খাবার ধন খাব নি?
গুড় গুড়ুতে যাব নি?

উড়িয়া কাহিনী শেষ হইতেই ফুলগাছটি মরিল। আর বাঙ্গালা কাহিনী শেষ হইতে নটেগাছটি 'মুড়ুলো'। এই 'মুড়ুলো' শব্দটি ঠিক, না মরিল? তার পর কার্য্যকারণ সম্বন্ধে বাঙ্গালা কাহিনীর শৃঙ্খল কি দীর্ঘতর! সাপের ভক্ষ্য বেঙ। সাপে বেঙ না খাইলে সে চলিবে ফিরিবে কিরূপে? বেঙ ডাকিলে সাপ জানিতে পারে, কোথায় বেঙ আছে। কাজেই বেঙ ডাকে না। বেঙের ডাকের সঙ্গে বৃষ্টির সম্বন্ধ আইসল্যাণ্ড হইতে অষ্ট্রেলিয়া পর্য্যন্ত লোকের বিশ্বাস। বৃষ্টি না হইলে কলাগাছ বাড়ে না, কলাগাছে পাত পড়ে না।

পুতে কলা না কাট পাত,
তাইতে কাপড়, তাইতে ভাত।

কলা গাছে পাত না পড়িলে গৃহস্থের ঘরে ভাত হয় না। ভাত না থাকিলে গৃহস্থ বৌ রাখালকে ভাত দিবে কি করিয়া? আর পেটে খাইতে না পাইলে বেচারী রাখাল কি করিয়া গরুকে 'জাগিবে'। 'চরাইবে' অপেক্ষা 'জাগিবে' কথাটি ভাল। রাখাল না জাগিলে গরু স্বেচ্ছামত চরিয়া নটেগাছটি মুড়াইল, কাজেই নটেগাছটি মরিল।

সাত ভাই চম্পার গল্পটি যাঁহাদের জানা নাই, তাঁহারা যোগীনবাবুর 'হাসি ও খেলা' নামক শিশুপাঠ্য গ্রন্থে সে গল্পটি পাঠ করিবেন। উড়িয়া কাহিনীর কল্পনার বৈচিত্র্য যে শ্রেষ্ঠ, তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে।

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায়।

জুতো।

সম্প্রতি ভারতবর্ষে জুতো একটা টনটনে সমস্যা হয়ে উঠেছে, আশু ইহার একটা মীমাংসা হওয়া দরকার, অন্ততঃ হ'লে ভাল হয়।

প্রথমেই, জুতো বস্তুটা কি—সে বিষয়ে একটা পরিষ্কার ধারণা ক'রে নেওয়া আবশ্যক। সচরাচর জুতো আমরা মানুষের পায়েই দেখ্‌তে পাই, সেই জন্য হঠাৎ মনে হওয়া নিতান্ত স্বাভাবিক যে, পদরক্ষার জন্যই জুতোর মানব-সমাজে সৃষ্টি ও স্থিতি। কিন্তু সাধারণতঃ পায়ের নীচে থাকে ব'লে, তার ভিতর যে কতটা অন্তর্নিহিত শক্তি প্রচ্ছন্ন আছে, সে কথা আমরা ভুলে যাই, এবং যখন অপ্রত্যাশিতরূপে আমরা সে শক্তির পরিচয় পাই—আমরা মাঝে মাঝেই তা পেয়ে থাকি—তখন আমরা নিতান্ত ভীত চকিত ও স্তম্ভিত হ'য়ে পড়ি, এবং তখন সেই শক্তির স্বরূপ চিন্তা কর্‌বার সময় আসে।

রণজিৎ সিং বলেছিলেন যে, কোহিনূরের দাম পাঁচ জুতো। শুধু কোহিনূর কেন,—এ পৃথিবীর যত কিছু অমূল্য বস্তু আছে, সকলেরই দাম পাঁচ জুতো। যে দাম দিয়ে রাজার মুকুটমণি কিন্‌তে হয়, সেই দাম দিয়েই রাজার মুকুট কিন্‌তে হয়। সাত রাজার ধন কালামাণিক এই ভারতবর্ষ ইংরাজ ঐ দাম দিয়েই কিনেছেন। জুতো ছিঁড়ে গেলে মুকুট মাথা হ'তে আপনি খসে পড়ে যায়। সেই জন্যই রণজিৎ সিং কোহিনূর পূর্ব্ববর্ত্তী রাজাদের মুকুট হ'তে খুলে জুতোয় স্থান দিয়েছিলেন। আমাদের বক্তব্য এইটুকু যে, রাজ্যের অধিকার করতে জুতোর আবশ্যক, কিন্তু রক্ষা করতে ঐ পদার্থটা সমান আবশ্যক নয়। রাজনীতিতে জুতোর যতটা প্রাধান্য, সমাজনীতিতে ততটা নয়। জুতোর ধর্ম্ম dynamical, অবস্থা যখন statical তখন তার বিশেষ উপযোগিতা নেই। শান্তির সময় পাদুকার সেই অমোঘ শক্তি নিজের ভিতর সংহতভাবে সঞ্চিত থাকা উচিত। যেখানে সেখানে অনাবশ্যক ব্যবহারে তার ক্ষয় করা উচিত নয়। বিদ্যুৎ এলোমেলো ভাবে চারি দিকে ঝিক্‌মিকিয়ে নিজেকে বিক্ষিপ্ত ক'রে ফেল্‌লে তার বজ্রশক্তি ক্ষীণ হয়ে পড়ে।

এখন টম্, ডিক্, হ্যারি প্রভৃতির কাছে আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে, তাঁরা নেটিবদের যে নিতান্ত খামখেয়ালীভাবে মধ্যে মধ্যে জুতোপেটা করে' থাকেন, তার কোন সার্থকতা আছে কি না, এইটে শুধু বিচার করে যেন

দেখেন। আমরা ত মনের খুসীতে, ভক্তিভরে, অতি আদর করে' ইংরাজরাজের পাদুকা শিরে বহন করছি, এবং ভগবানের কাছে প্রতিদিন প্রার্থনা করছি যে, চিরদিন যেন তাই করতে পারি, কারণ ঐ বুটমণ্ডিত পদ ছাড়া আমাদের আর আশ্রয় নেই। বিপদে আপদে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত অপ্রতিহতপ্রভাবসনাথ ঐ জুতোরই আরাধনা আমরা কখনো একাকী, কখনো সদলবলে করে' থাকি।

পূর্ব্বেই বলেছি, তোমাদের পাদুকা আমাদের শিরস্ত্রাণ করে' রেখেছি, কিন্তু সেই জুতো পিঠে পড়লে আমাদের সহ্য হয় না, কেন না আমাদের পিঠের দাঁড়া ব'লে পদার্থটি—ইংরাজীতে যাকে বলে backbono—তার সম্পূর্ণ অভাব। সুতরাং তোমাদের জুতো আমাদের পৃষ্ঠস্থ হ'লে যে আমরা কাতরতা প্রকাশ করি, সে ষোল আনা খাঁটি। তার ভিতর কোনরূপ ভাণ, মিথ্যা, কিংবা অত্যুক্তি নেই। এই ব্যাপার নিয়ে যে agitation দেখ্‌তে পাও, সে রাজনৈতিক আন্দোলন নয়, শারীরিক আন্দোলন—তোমাদের ভাষায় যাকে বলে constitutional agitation। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে Abbé Dubois লিখেছেন যে, ভারতবর্ষের লোকেরা জুতোশুদ্ধ পায়ের লাথিতে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়, তার কারণ এ নয় যে, উক্ত পদ্ধতির প্রহারে তারা শরীরে বেশী কিছু আঘাত অনুভব করে, কিন্তু ঐ জুতো থাকার দরুণ তাদের মনে অসহ্য আঘাত লাগে। ওরূপ ব্যবহারে নিজেদের নিতান্ত অপমানিত মনে করে' বলে' একান্ত মর্ম্মাহত হয়। খুব সম্ভব যে এক শ' বৎসরের পূর্ব্বের ভারতবাসীদের পক্ষে ও কথাটা নিতান্ত সত্যি, কিন্তু nousavons changé tout cela *—এক শ' বৎসরের ইংরাজ-শাসনে ও ইংরাজি শিক্ষার ফলে আমাদের এখন মন টন্‌কো হয়েছে ও শরীর কাবু হয়েছে। আমাদের মনে কার সাধ্য আর ব্যথা দেয়? আমরা কিছুতেই আর অপমান বোধ করিনে, কিন্তু মারপিট করলে আমাদের গায়ে বড় লাগে। কথায় বলে, পেটে খেলে পিঠে সয়। এই বারমেসে দুর্ভিক্ষের দিনে পিঠে যে কিছু সয় না, সে কথা বলাই বাহুল্য। বিশেষতঃ তোমাদের কাছ থেকে পৃষ্ঠের উপর অত্যাচার আরও কম সয়, কারণ তোমরা আমাদের পৃষ্ঠপোষক।

তোমাদের সকলেরই বিশ্বাস, আমরা জুতো খেতে ভালবাসি—সেটা ভুল। সাদা পায়ের নীচেই কালো চামড়ার স্থান।—আমরা জুতো হ'তে ভালবাসি—খেতে নয়। গোমাংসভক্ষণ আমাদের শাস্ত্রনিষিদ্ধ। এবং সেই কারণেই এ কথা বলা চলে না যে, গোচর্ম্ম আহার হিন্দুর ধর্ম্মে লেখে। এ কথা অবশ্য

* আমরা ও সব উল্টে নিয়েছি।

স্বীকার্য্য যে, আমাদের সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় পঞ্চগব্যে, কিন্তু সমগ্র স্মৃতি-শাস্ত্র আলোচনা ক'রে দেখা গেছে যে, জুতোটা পঞ্চগব্যের ভিতর পড়ে না।—তবে যে আজকাল দেখা যায় অনেক হিন্দু সন্তান পেটের দায়ে কিংবা সমাজে মান্য হিসাবে গণ্য হবার জন্যে জুতো খেতে রাজি হন, সেটা কেবলমাত্র ইংরাজি শিক্ষার ফল।—জান্‌কা ওয়াস্তে এবং নামকা ওয়াস্তে যা করা যায়, তা জাতীয় স্বভাব কিংবা প্রবৃত্তির ঠিক পরিচয় দেয় না।

এই ত গেল সংক্ষেপে আমাদের কথা। এখন তোমাদের দিক থেকে দেখলেও দেখা যায় যে, অকারণ পাদুকা দ্বারা আমাদের গাত্রবেদ উৎপাদন করায় তোমাদেরও কোন লাভ নেই। মনে কর, যদি আমাদের জুতো আমাদের পিঠে ছেঁড়ো, তাতে আমাদের লোকসান, অথচ তোমাদের কোন লাভ নেই। কারণ হিন্দুস্থান ও বিলেতের ভিতর সাত সমুদ্র তের নদীর ব্যবধান—সুতরাং সেই ছেঁড়া জুতোর মেরামত বাবদ্ তোমাদের আত্মীয় স্বজন যে দু' পয়সা পাবে তারও উপায় নেই। আর সে জুতো ছেঁড়বারই অধিক সম্ভাবনা, কারণ আমরা যদি ধনের মায়ায় খুব ট্যাঁকসই জুতো কিনি, তা হলে প্রাণের মায়া ত্যাগ করতে হয়। আর যদি আমাদের জুতো পা থেকে খুলে সে জুতো দিয়ে আমাদের প্রহার করার প্রথাটা বেশী প্রচলিত হয়ে পড়ে, তা হলে চাই কি আমরা জুতো জিনিসটে একেবারে ত্যাগ করতে পারি। তার ফলে তোমাদেরই ক্ষতি। কারণ আমাদের পায়ের জুতো না গড়তে পেলে তোমাদের ভাই বেরাদারকে উপোস করতে হবে। তাতে তোমাদেরও কষ্ট হবে, আর আমরাও মনে ব্যথা পাব। কারণ যাতে তোমাদের গোচর্ম্মের ব্যবসা অক্ষুণ্ণ থাকে, এবং দিন দিন আরও শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে, তার জন্যে আমাদের এই পুণ্য মাতৃভূমিকে গোভাগাড়ে পরিণত করেছি—আমাদের শস্যশ্যামল দেশকে মরুভূমি করে তুলেছি। লাঙ্গল চষা বন্ধ হ'বে, সে ভাবনা না ভেবে আমরা প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ গরু শুকিয়ে মরতে দেই—তাদের গায়ের চামড়া গায়ের উপরেই tanned হতে দেই।

তবে তোমরা বলতে পার যে, আমাদের যদি কিছু উপকার হয়, তার জন্য তোমরা ক্ষতিস্বীকার করতে প্রস্তুত, কারণ খৃষ্টান সভ্যতার মূলমন্ত্রই এই যে, নিজের দিকে না তাকিয়ে সেরেফ্ পরের উপকার করা। প্রমাণস্বরূপ নিত্যই ত দেখ্‌তে পাওয়া যায় যে, তোমরা অন্যকে সভ্য করতে এতই ব্যস্ত যে নিজে সভ্য হ'তে ভুলে যাও। তা হ'লে দেখা উচিত, জুতো নিজের স্থানভ্রষ্ট হ'য়ে আমাদের পৃষ্ঠে ভর করলে আমাদের কোন উপকার আছে কি

না। প্রথমতঃ, তোমাদের এ দেশে অস্তিত্ব প্রমাণ করবার জন্য এ উপায় অবলম্বন করবার আবশ্যক নেই। তোমরা এর মধ্যেই আমাদের চতুরিন্দ্রিয়-গ্রাহ্য হয়েছ—চক্ষু কর্ণ নাসা ও রসনা তোমাদের জানে। আমরা তোমাদের দেখি, তোমাদের কথা শুনি, বিয়ার সিগার মেষমাংস অশন ও মেষ-রোমজ বসন এই চারের সম্মিলনে যে অপূর্ব্ব বিজাতীয় গন্ধের সৃষ্টি হয়, তা আমাদের ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের উপর জবর্দ্দস্তি করে, এবং তোমাদের পদরজ লেহন ক'রে আমরা রসনা তৃপ্ত করি। বাকি রইল শুধু ত্বক্। সত্য কথা, তোমাদের স্পর্শ আমরা ডরাই। পথের এক পার্শ্বে তোমাদের কাউকে দেখ্‌লে আমরা অপর পার্শ্বে সরিয়া যাই। এই ত্বগিন্দ্রিয়ের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করা উভয়ের পক্ষেই শ্রেয়, কারণ, আমরা পরস্পরের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এলে ফলে কেবল ফিরিঙ্গীর সৃষ্টি হয়। দ্বিতীয়তঃ, আমাদের রক্ত জুড়িয়ে গেছে সত্য, তাই ব'লে জুতোর সাহায্যে আমাদের শোণিত উত্তপ্ত করবারই কি কিছু আবশ্যক আছে? ম্যালেরিয়া প্লেগের প্রসাদে রক্তটা যে যথেষ্ট গরম হয়, গাত্রদাহতেই আমরা তার প্রমাণ পেয়ে থাকি, আর তাও যদি না হ'ত ত পেটের জ্বালাতেই আবশ্যক মত উপকার বোধ কর্‌ছি, উপরন্তু পিঠের জ্বালা ফাল্‌তো মাত্র। তৃতীয়তঃ, তোমাদের দ্বারে অতিথি হ'লে এ অধীনদের আদব কায়দা শিক্ষা দেবার জন্য আমাদের বিনামার দ্বারা সৎকার করা তোমরা যে কর্ত্তব্য ব'লে মনে কর, সেটাও তোমাদের ভ্রান্তিমাত্র। আমরা নিজের মান অপমান সম্বন্ধে উদাসীন ব'লে মনে ভেব না যে, আমরা তোমাদের মান অপমান সম্বন্ধেও উদাসীন। আমরা নিজের মান খুইয়েছি শুধু তোমাদের মান বৃদ্ধি কর্‌বার জন্য। আর তা ছাড়া আমাদের আদব কায়দা শেখান তোমাদের কর্ত্তব্যের মধ্যে নয়। তোমরা আমাদের দেশে এসেছ আমাদের সভ্য করবার জন্য, আমাদের ভদ্র কর্‌বার জন্য নয়। কারণ তোমরা আমাদের শুধু তোমাদের সভ্যতাই শেখাতে পার,—তোমরা জান আর নাই জান, দুনিয়াশুদ্ধ লোক জানে তোমাদের সভ্যতার ভিতর ভদ্রতার কোন স্থান নেই।

আমরা যদি তোমাদের সুমুখে জুতো না খুলি, তাতে তোমাদের কোন মান-হানি করিনে। কারণ আমরা জুতো খুলি শুধু দেবমন্দিরে প্রবেশ কর্‌বার পূর্ব্বে। যাকে আমরা পূজা করি, তার সুমুখেই আমরা খালি পায়ে হাজির হই। কিন্তু আমরা পূজা করি শুধু জড়পদার্থকে, হয় মাটির প্রতিমা, নয় শালগ্রাম-শিলা, না হয় কাঠের জগন্নাথ। আমরা কোন প্রাণীকে পূজা করিনে,

শুধু কোন কোন প্রাণীকে ভক্তি করি, যথা, গরু বাঁদর ও শ্বেতাঙ্গ। কিন্তু আমরা গরু কিম্বা বাঁদর দেখে জুতো খুলিনে, সেই যুক্তি-অনুসারে তোমা-দের সুমুখেও আমাদের জুতো খোলবার কথা নয়।

এই সকল ভেবে চিন্তে আমি এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হয়েছি যে, এ বিষয়ে একটা আপোষে মীমাংসা করা দরকার হয়েছে। জুতোর বদলে যদি কাণ-মলাটার প্রচলন হয়, তা হ'লে উভয় দিক রক্ষা পায়। যদি এ প্রস্তাব তোমাদের মনোমত হয়, তা হ'লে আমাদের পক্ষ থেকে কোন বাজে আপত্তি হ'বার সম্ভাবনা নেই। আমার বিশেষ ভরসা আছে যে, এ প্রস্তাব একবার আমাদের বিজ্ঞ বিচক্ষণ নেতাদের, অর্থাৎ যাঁদের আমরা leaders বলি, তাঁদের সুমুখে উপস্থিত করলে আগামী কংগ্রেসে এই মর্ম্মে একটি resolution করতালির সহিত পাস করিয়ে নিতে পারা যাবে।

আসল কথা টম্ ডিক্ হ্যারির সঙ্গে রাম শ্যাম হরির ঠিক সম্বন্ধটা নির্দ্ধা-রিত হয়ে যাওয়াটা আবশ্যক; কারণ, এই দুই দলের পাশাপাশি বাস করতে হয়। প্রথমতঃ এই দুইয়ের সম্পর্ক রাজা প্রজার সম্পর্ক নয়, কারণ টম্‌ও যার প্রজা, রামও তার প্রজা। মোক্ষমূলর প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এক সময়ে প্রমাণ করতে উদ্যত হয়েছিলেন যে, দুইয়ের ভিতর ভাই ভাই সম্বন্ধ, অর্থাৎ রাম শ্যাম হরি টম্ ডিক্ হ্যারির কৃষ্ণপক্ষীয় ভ্রাতা। তাঁদের মতে সংস্কৃত ভাষাই তার প্রমাণ। কিন্তু আজকালকার পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা ও কথা মানেন না—হেসেই উড়িয়ে দেন। তাঁদের মতে সংস্কৃত ভাষার প্রমাণ মোটেই গ্রাহ্য নয়। সংস্কৃত ভাষার উপর কি করে প্রত্যয় করা যায়? ও ত হিন্দুর মুখের কথা, আর সকলেই জানেন হিন্দুর মত মিথ্যাবাদী জাত আর দুনিয়ায় নেই। সম্পর্ক বাপ ছেলের সম্পর্কও নয়; কারণ, তা হ'লে সিপাহীর ঘোড়ার মত ছেলেতে বাপের গুণ কিছু না কিছু থাকত। সুতরাং দেখা যাচ্ছে বাকি রইল শুধু একটা সম্বন্ধ। সেটা বড় মধুর সম্পর্ক। টম্ প্রভৃতিরা যদি সেই সম্বন্ধে সম্বন্ধী এইটে ধ'রে নেওয়া যায়, তা হ'লে রাম প্রভৃতিরা হাসিমুখে কাণ-মলা সহ্য করবে।

শ্রীগৌরচরণ দাস।

মহারাষ্ট্রের টঙ্কশালা।

মহাত্মা শিবাজী দক্ষিণাপথে স্বাধীন হিন্দু-রাজ্য-স্থাপনের প্রয়াসী হইয়া ১৬৬৩ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথম স্বনামাঙ্কিত স্বতন্ত্র ধাতুমুদ্রার প্রচার করেন। তৎপূর্ব্বে, মোসলমান আমলে মহারাষ্ট্রীয়েরা কখনও টঙ্কশালা স্থাপনপূর্ব্বক স্বতন্ত্রভাবে মুদ্রা প্রচলিত করিয়াছিলেন, এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় না। শিবাজীর পিতা রাজা শাহজীর সময়ে মহারাষ্ট্র দেশের সর্ব্বত্র 'আদিলশাহী' মুদ্রারই প্রচলন ছিল। ১৬৬৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তি ঘটিলে শিবাজী পৈত্রিক রাজা উপাধি গ্রহণপূর্ব্বক স্বনামাঙ্কিত মুদ্রার প্রবর্ত্তন করেন। সেই নূতন মুদ্রা 'শিবরাঈ হোণ' (শিবরায়ের হোন) নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। এই হোন শব্দ কর্ণাটকী 'হোন্নু' শব্দের অপভ্রংশ-জাত। হোন্নু অর্থে সুবর্ণ। এই শব্দ পারসী ভাষায় 'হোন'-রূপে উচ্চারিত হয়, এবং সেই নামেই সর্ব্বত্র পরিচিত হইয়াছে।

কর্ণাটকের প্রাচীন হিন্দুরাজ্যসমূহে পূর্ব্বে কেবল সুবর্ণমুদ্রারই প্রচলন ছিল। দেশীয় রাজাদিগের নামানুসারে যে সকল সুবর্ণমুদ্রা প্রচলিত হইয়াছিল, অদ্যাপি দুই এক স্থলে তাহাদিগের নিদর্শন পাওয়া যায়। সেই সকল মুদ্রা 'অশ্বপতি হোন,' 'গজপতি হোন' প্রভৃতি নামে খ্যাত। বিজয়নগর রাজ্যে হোনের প্রচার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ছিল। তথায় বিদ্যা-রণ্য স্বামীর তপঃপ্রভাবে একদা হোনের বৃষ্টি হইয়াছিল বলিয়া যে প্রবাদ আছে, তাঁহাও উক্ত মুদ্রার বিপুলতা-সূচক বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। সেকালে দক্ষিণাপথের সর্ব্বত্র হোনের ন্যায় মোহরেরও প্রচার ছিল। মোসলমানদিগের আমলেই ঐ অঞ্চলে রৌপ্যমুদ্রার প্রথম প্রবর্ত্তন হয়, অনেকে এইরূপ অনুমান করেন। এই অনুমান যদি সত্য হয়, তবে বলিতে হইবে যে, মহারাষ্ট্র ও কর্ণাট দেশের অধিকাংশ সুবর্ণ লুণ্ঠিত হইয়া দিল্লীতে নীত হওয়ায় স্থানীয় শাসনকর্ত্তারা দেশমধ্যে রৌপ্যমুদ্রার প্রচার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

সে যাহা হউক, শিবাজীর সময়ে মহারাষ্ট্র দেশে অনেক প্রকারের হোন প্রচলিত ছিল। শিবাজীর অন্যতম কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণাজী অনন্ত সভাসদ

মহোদয় স্বপ্রণীত 'শিবছত্রপতির চরিত্র' নামক গ্রন্থে যে ষড়বিংশ প্রকার হোনের উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যে কয়েকটি এই,—১। পাতশাহী; ২। শিবরাঙ্গ; ৩। কাবেরী পাকী; ৪। ত্রিশূলী; ৫। অচ্যুতরাঙ্গ; ৬। দেবরাঙ্গ; ৭। রামচন্দ্র রাঙ্গ; ৮। গুতী; ৯। ধারওয়াড়ী; ১০। তাড়পত্রী; ১১। পাকি-নাইকী; ১২। তাঞ্জোরী; ১৩। জড়মাল; ১৪। বেলুরী; ১৫। মহম্মদ-শাহী; ১৬। রামনাথপুরী। এই সকল হোন বহুদিন পর্য্যন্ত মহারাষ্ট্রে প্রচলিত ছিল। পরবর্ত্তী কালে হাইদর ও টিপু 'বাহাদুরী' ও 'সুলতানী' হোন নামক দ্বিবিধ স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন দিল্লীর বাদশাহ-দিগের 'আলমগিরী' নামক হোনের আদান প্রদান সর্ব্বত্র অক্ষুণ্ণ ছিল। সেকালের এক হোন বর্ত্তমান কালের প্রায় ৩।৹ টাকার সমান।

শিবাজী স্বর্ণমুদ্রার ন্যায় রৌপ্য ও তাম্রমুদ্রারও প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। সেগুলি 'শিবরাঙ্গ রূপেয়া' ও 'শিবরাঙ্গ পয়সা' নামে প্রসিদ্ধ ছিল। শিবরাঙ্গ পয়সা এখনও মহারাষ্ট্রের সর্ব্বত্র প্রচুরপরিমাণে পাওয়া যায়; কিন্তু শিবাজীর প্রবর্ত্তিত সুবর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা অধুনা নিতান্ত দুর্ল্লভ হইয়া উঠিয়াছে। অন্য যে সকল প্রাচীন হোন বহুপরিমাণে নানা স্থানে পাওয়া যায়, তাহার অধিকাংশের উপর অস্পষ্ট পারস্য অক্ষর উৎকীর্ণ রহিয়াছে, পরিদৃষ্ট হয়। কোনও কোনও হোনের উপর শ্রীকৃষ্ণ ও বরাহ অবতারের চিত্রও দেখিতে পাওয়া যায়। প্রবাদ আছে, শিবাজীর সময়ে সজ্জনগড় নামক দুর্গে অসংখ্য হোন ছিল। অদ্যাপি ঐ অঞ্চলে ক্ষেত্রকর্ষণকালে কেহ কেহ কদাচিৎ দুই একটা হোন লাভ করিয়া থাকে। এই হোনের আকার ছোলার দাউলের ন্যায়। স্থানীয় লোকেও সেই জন্য উহাকে সাধারণতঃ 'সোনার দাউল' নামেই অভিহিত করিয়া থাকে।

রায়গড় সেকালে মহারাষ্ট্র দেশের রাজধানী ছিল বলিয়া শিবাজী তথায় টঙ্কশালা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী কালের রাজধানী সাতারা সে সময়ে একটি ক্ষুদ্র পল্লী ছিল। শিবাজীর মৃত্যুর পর সাম্ভাজী ও রাজারামের রাজ্য-কাল মোগলদিগের সহিত অনবরত যুদ্ধ বিগ্রহ হেতু ঘোর বিপ্লবে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। সেই অশান্তির সময়ে নূতন মুদ্রাপ্রচারের কিরূপ ব্যবস্থা হইয়া-ছিল, টাকশালের কার্য্য অব্যাহত ছিল কি না, তাহার কোনও বিবরণ পাওয়া যায় না। বোধ হয়, সে সময়ে নূতন টাকা প্রস্তুত হয় নাই। রাজারাম মোগল দিগের দৌরাত্ম্যে স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া কর্ণাটের অন্তর্গত জিঞ্জী দুর্গে আশ্রয়

গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। মহারাষ্ট্র রাজসিংহাসনও বহুদিন পর্য্যন্ত তথায় প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু সেখানে কখনও টাকশাল স্থাপিত হইয়াছিল, এরূপ কোনও প্রমাণ নাই। পক্ষান্তরে, মহারাজ রাজারাম জিঞ্জী হইতে মহারাষ্ট্র দেশের বহুসংখ্যক দেবস্থানের ও ব্রাহ্মণদিগের উদ্দেশে যে সকল দানপত্র লিখিয়া দিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ভূসম্পত্তি ভিন্ন নগদ টাকা কড়ির উল্লেখ কুত্রাপি পাওয়া যায় না। কিন্তু শিবাজীর সময়ে যে সকল দানপত্র রচিত হইয়াছিল, তাহাতে সুবর্ণমুদ্রাদির ভূরি ভূরি উল্লেখ দৃষ্ট হইয়া থাকে। পাঠকগণের কৌতূহলনিবৃত্তির জন্য আমরা এ স্থলে শিবাজীর প্রদত্ত একখানি সনন্দপত্রের অবিকল অনুবাদ সন্নিবিষ্ট করিলাম।

"শ্রীসকলতীর্থস্বরূপ বেদমূর্ত্তি রাজশ্রী সিদ্ধেশ্বর ভট, পিতা মেঘনাথ ভট ব্রহ্মোপাধ্যায়, পরগণে চাকণ, প্রভু গোসাঞী মহোদয়েষু। আজ্ঞাধারক রাজশ্রী শিবাজী রাজা, পিতা শাহজী রাজা ভোঁসলে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ। সুরুসন ১০৫৪ (১৬৫৩ খৃঃ) পত্র লিখিয়া দেওয়া গেল যে;—মহোদয়ের অনুষ্ঠিত স্বস্ত্য-য়নের বলে আমি রাজ্যাধিকারী হইয়াছি ও আমার চিন্তিত সকল মনোরথ সিদ্ধ হইয়াছে। এইরূপ প্রমাণ পাইয়া ও আপনাকে বিপৎকালের সাহায্যকারী জানিয়া পুত্রপৌত্রাদি-বংশপরম্পরাক্রমে বার্ষিক এক শত পাতশাহী হোন বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দিলাম। এই বৃত্তি, যত কাল পর্য্যন্ত আমাদিগের রাজ্য চলিবে, তত কাল পর্য্যন্ত আপনাকে প্রদত্ত হইবে। এ বিষয়ে যদি অন্যথা করি, কিংবা আমার বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া কেহ অন্যথা করে, তাহা হইলে তাহার প্রতি শ্রীশ্রী৺ জীউর, কুলদেবতার, স্বীয় পূর্ব্বপুরুষগণের ও গো ব্রাহ্মণের শপথ রহিল। এই রাজ্য আপনারই আশীর্ব্বাদপ্রতাপে পাওয়া গিয়াছে; আমাকে আজ্ঞা-পালক বলিয়া জানিবেন। তাং ১লা রমজান। [রাজমুদ্রা]

মহারাজ শিবাজী বৃত্তিস্বরূপ ভূসম্পত্তি দানের বিরোধী ছিলেন। রাজ্যের সর্ব্বোচ্চ কর্ম্মচারী হইতে সামান্য পত্রবাহক পর্য্যন্ত সকলেই তাঁহার নিকট বেতন ও পুরস্কারাদিস্বরূপ নির্দ্দিষ্টসংখ্যক 'টঙ্কা' প্রাপ্ত হইত। ইনাম বা জায়গীর-প্রথার দোষেই যে মোসলমান রাজ্যগুলি ক্ষীণশক্তি হইয়াছিল, ইহা তিনি বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। তাই তিনি স্বীয় জীবদ্দশায় কাহাকেও কোনও কারণে বেতন বা পুরস্কারের বিনিময়ে ভূসম্পত্তি দান করেন নাই। কিন্তু তাঁহার পরবর্ত্তী মহারাষ্ট্র ভূপালেরা এই প্রকৃষ্ট নীতির অনুবর্ত্তী হন নাই। রাজারাম ও শাহুর সময়ের যে সকল সনন্দ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে বৃত্তি

বা পারিতোষিকরূপে প্রায় কাহাকেও টঙ্কা বা হোন দানের উল্লেখ পাওয়া যায় না।

মোগলশক্তিকে বহুলপরিমাণে পরাভূত করিয়া রাজারাম সাতারায় মহারাষ্ট্র রাজ্যের নূতন রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু তিনি তথায় টাকশাল স্থাপিত করিয়াছিলেন কি না, তাহা জানিবার কোনও উপায় নাই। ১৭১২ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্র রাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত হয়। মহারাজ শাহু সাতারায় ও রাজারামের পুত্র সাম্ভাজী কোহ্লাপুরে থাকিয়া শাসনদণ্ড পরিচালন করিতেছিলেন। এই উভয় রাজধানীতেই স্বতন্ত্র টঙ্কশালা স্থাপিত হইয়াছিল। শাহুর নামাঙ্কিত রৌপ্য ও তাম্রমুদ্রাগুলি 'শাহু-শিক্কা' ও সাম্ভাজীর টাকশালের মুদ্রাগুলি 'শম্ভু-শিক্কা' নামে পরিচিত হইয়াছিল। ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কোহ্লাপুরের নরপতিদিগের সিংহাসন প্রধানতঃ 'পাহ্বালা' দুর্গেই প্রতিষ্ঠিত ছিল। কোহ্লাপুরে স্থায়ী ভাবে সেই রাজসিংহাসন আনীত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ঐ দুর্গেই কোহ্লাপুর-পতিদিগের টাকশাল ছিল। এই কারণে 'শম্ভু-শিক্কা' 'পাহ্লালী রূপেয়া' নামেও অভিহিত হইত। শম্ভু-শিক্কা কোনও কোনও স্থানে 'শম্ভুপীরখানী রূপেয়া' এই আখ্যায় অভিহিত হইয়াছে। রাজা শম্ভুর (সাম্ভাজীর) নামের সহিত মোসলমানদিগের 'পীরখানা' কিরূপে সংযুক্ত হইল, তাহা বলিতে পারি না। সে যাহা হউক, মহারাজ সাম্ভাজীর মৃত্যুর পরও কোহ্লাপুরের টাকশালে শম্ভু-শিক্কাই মুদ্রিত হইত। পরবর্ত্তী কোনও রাজা স্বনামে মুদ্রা প্রস্তুত করাইয়াছিলেন, এরূপ কোনও প্রমাণ অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই।

মহারাজ শাহুর শাসনকালে সাতারায় ভিকাজী নাইক, পরশুরাম নাইক প্রভৃতি অনেক ধনশালী 'সাওকার' বা মহাজন ছিলেন। ছত্রপতি শাহু প্রায়ই তাঁহাদের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিতেন। সরকারী টাকশালে 'টঙ্কা' মুদ্রিত করাইয়া সময়ে সময়ে তাঁহাদিগের ঋণ পরিশোধিত হইত। ক্রমে যেমন মহারাষ্ট্র সাম্রাজ্যের বিস্তার হইতে লাগিল, তেমনই রাজ্যের নানা স্থানে টঙ্কশালা-প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতাও অনুভূত হইতে লাগিল। পেশওয়ে বালাজী বাজী রাওয়ের মন্ত্রিত্বকালে রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের মহাজন ও অপর লোকদিগকে টাকশাল-স্থাপনের অনুমতি প্রদত্ত হইয়াছিল। সাধারণতঃ ২১৫৲ হইতে ২৭০৲ টাকা পর্য্যন্ত 'দর্শনী' (নজর) প্রদান করিয়া অনেকে তিন বৎসরের জন্য টাকশাল খুলিবার অনুমতি লাভ করিতেন। কেহ কেহ ১২০৲ টাকা দিয়া এক বৎসরের জন্য টাকশাল খুলিবার সনন্দ লইতেন। এই দর্শনী ভিন্ন তাঁহা-

দিগকে মুদ্রিতব্য টঙ্কার পরিমাণ অনুসারে একটা নির্দ্দিষ্ট করও রাজসরকারে প্রদান করিতে হইত।

মহারাষ্ট্র দেশের বহির্ভাগে মহারাষ্ট্রপতির আদেশে যে সকল টঙ্কশালা স্থাপিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে ধারওয়াড়ের টাকশালই বোধ হয় প্রথম। উহা ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। বাগলকোটে আদিলশাহী সুলতানগণের আমল হইতে যে টাকশাল চলিতেছিল, তাহা উক্ত সুলতানগণের রাজত্বলোপের পর বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। বালাজী বাজীরাও পেশওয়ে-পদ লাভ করিয়া উহা পুনর্ব্বার খুলিবার ব্যবস্থা করিয়া দেন। ফলতঃ মুদ্রার অভাবে লোকের যাহাতে অসুবিধা না ঘটে, তৎপ্রতি সর্ব্বপ্রথম এই পেশওয়েরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল।

মাধব রাও পেশওয়ের সময়ে রাজ্যের নানা স্থানে টাকশাল স্থাপিত হইয়াছিল। পরবর্ত্তী পেশওয়েদিগের আমলেও এ বিষয়ে শ্রীবৃদ্ধির ব্যতিক্রম হয় নাই। কেবল মহাজন ও ব্যবসায়ীদিগের উপর নির্ভর না করিয়া পেশওয়েগণ সরকারী সর্দ্দার ও জাইগীরদারদিগের প্রতিও টাকশাল খুলিয়া টাকা প্রস্তুত করাইবার আদেশ দান করিতেন। খান্দেশের অন্তর্গত বান্দবড়ে তুকোজী হোলকরকে টাকশাল খুলিতে বলা হইয়াছিল। বরহানপুর প্রভৃতি স্থানে শিন্দের (সিন্ধিয়ার) টাকশাল ছিল। উত্তর ভারতে উজ্জয়িনী, ইন্দোর, ভূপাল, প্রতাপগড়, ভিলসা, সিরোঞ্জ, কোটা, গঞ্জবসোদা প্রভৃতি স্থানে পেশওয়ের আদেশে টঙ্কশালা স্থাপিত হইয়াছিল। ভড়োচে শিন্দে, কুলাবায় আংগ্রে, নাগপুরে ভোঁস্‌লে প্রভৃতি সর্দ্দারেরা টাকশাল করিয়াছিলেন। আংগ্রের টাকশালে যে টাকা প্রস্তুত হইত, তাহা 'শ্রীশিক্কা' নামে প্রসিদ্ধ ছিল। হাবসীদিগের জঞ্জীরায় 'হাব্‌শানী' বা 'নিশানী' শিক্কা প্রস্তুত হইত। ঐ মুদ্রার উপর 'জ' অক্ষরটি অঙ্কিত থাকিত। বলা বাহুল্য, উহা 'জাঞ্জীরা' শব্দের দ্যোতক বলিয়া পরিগণিত হইত। কঙ্কণ, নাশিক ও দৌলতাবাদ অঞ্চলে পেশওয়েদিগের সর্দ্দার বা অনুমতিপ্রাপ্ত মহাজনেরা টঙ্কা মুদ্রিত করিতেন।

কর্ণাটকের অধিকাংশ জাইগীরদারই নির্দ্দিষ্ট দর্শনী ও কর দিয়া স্ব স্ব অধিকৃত প্রদেশে টাকশাল খুলিয়াছিলেন। কিন্তু ঐ সকলের অধিকাংশে কৃত্রিম ও অপকৃষ্ট মুদ্রা প্রস্তুত হইতেছে, এইরূপ সংবাদ পাওয়ায়, ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে মাধব রাও পেশওয়ে ঐ অঞ্চলের টাকশালগুলি বন্ধ করিয়া দিয়া ধারওয়াড়ে পাণ্ডুরঙ্গ মুরার নামক জনৈক বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীর তত্ত্বাবধানে একটি সরকারী

টঙ্কশালা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। সেই সময়ে যে একুশটি টাকশাল বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, পেশওয়েদিগের পুণা-স্থিত দপ্তরে তাহাদিগের নামের তালিকা দেখিতে পাওয়া যায়। কিছু দিন পরে এই সকল টাকশালের মধ্যে কয়েকটি আবার খুলিবার অনুমতি প্রদত্ত হইয়াছিল।

সকল প্রদেশে এক প্রকার মুদ্রা প্রস্তুত হইত বলিয়া বোধ হয় না। বাগলকোট অঞ্চলে মহ্লার ভিকাজী রাস্তে পেশওয়েদিগের প্রধান সুভেদার ছিলেন। বাদামী, বাগলকোট, হুনগুন্দ প্রভৃতি মহাল তাঁহার শাসনাধীন ছিল। তাঁহার আদেশে প্রস্তুত মুদ্রা 'মহ্লারশাহী রূপেয়া' নামে অভিহিত হইত। এই মুদ্রার মূল্য পনর আনা ছিল। পেশওয়েগণ এই মুদ্রা রাজ্যের সর্ব্বত্র চালাইবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, সে জন্য শতকরা দুই টাকা পর্য্যন্ত বাটা দিতেও তাঁহারা প্রস্তুত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে রাজকোষের বিশেষ ক্ষতি ঘটিতে লাগিল দেখিয়া তাঁহাদিগকে সে অধ্যবসায় পরিত্যাগ করিতে হয়।

মহারাষ্ট্র সাম্রাজ্যে বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন প্রকারের মুদ্রা প্রচলিত ছিল। সে সকলের নাম ও মূল্যাদির বিষয় পেশওয়েগণের দপ্তরের কাগজপত্রে লিপিবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। শেষ বাজী রাওয়ের সময়ে এক পুণাতেই বিবিধ রৌপ্যমুদ্রা প্রচলিত ছিল। ধাতুর বিশুদ্ধি-অনুসারে সেগুলির নাম ও মূল্যেরও প্রভেদ ছিল। মিষ্টার চাপ্লিনের রিপোর্টে প্রকাশ, পুণার টাকশাল ১৮২২ খৃষ্টাব্দে বন্ধ হয়। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যে বাজারে ধাতুমুদ্রার অভাব হওয়ায় পুনর্ব্বার উহা খুলিতে হইয়াছিল। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে পুণার টঙ্কশালা চিরকালের জন্য বন্ধ হইল। বাগলকোট, কোহ্লাপুর, কুলাবা প্রভৃতি প্রদেশের টাকশালগুলিও এই সময়েই বন্ধ হয়।

তদানীন্তন অধিকাংশ রাজমুদ্রার উপরেই পারস্য অক্ষর মুদ্রিত হইত, দেখিতে পাওয়া যায়। কেবল শিবাজীর ও শাহুর মুদ্রায় মহারাষ্ট্রীয় বা দেবনাগরী অক্ষর পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। কুলাবার আংগ্রেরা তাঁহাদিগের রৌপ্যমুদ্রার উপর 'শ্রী' এই অক্ষরটি মুদ্রিত করাইতেন। যশোবন্ত রাও হোলকরের মুদ্রাতেও মারাঠী অক্ষরযুক্ত ছাপ থাকিত। পেশওয়েদিগের মুদ্রায় হিজিরা সনের সংখ্যাটি মারাঠী অক্ষরে ও অপরাপর বিষয় পারস্য অক্ষরে অঙ্কিত হইত। অবশিষ্ট সকল মুদ্রাই পারস্য অক্ষরে অঙ্কিত ছিল। পারকোস্নাড় প্রভৃতি হিন্দু শাসনকর্ত্তারাও পারস্য-অক্ষরযুক্ত মুদ্রারই পক্ষপাতী ছিলেন।

পেশওয়েদিগের আমলে টাকার ন্যায় আধুলি, সিকি, দুয়ানি প্রভৃতিরও ব্যবহার ছিল। তাম্রমুদ্রার প্রচারও অল্প ছিল না। পরন্তু রৌপ্যমুদ্রার ন্যায় প্রদেশভেদে তাম্রমুদ্রার প্রকারভেদ কখনও ঘটে নাই। উত্তরে নর্ম্মদা হইতে দক্ষিণে তুঙ্গভদ্রাতীর পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র এক 'শিবরাঈ' পয়সাই প্রচলিত ছিল। কুলাবা, পনওয়েল, ধারওয়াড় প্রভৃতি সকল টাকশালেই 'শিবরাঈ' পয়সা প্রস্তুত হইত। এই পয়সার এক পৃষ্ঠে তিন পংক্তিতে 'শ্রীরাজা শিব' ও অপর পৃষ্ঠে 'ছত্রপতি' এই অক্ষরগুলি বা তাহাদের একাংশ মুদ্রিত দেখিতে পাওয়া যায়। মহারাজ শাহু স্বনামযুক্ত পয়সা চালাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ সফল হয় নাই। ইহা যে শিবাজীর প্রতি সাধারণের শ্রদ্ধার দ্যোতক, তাহা বলাই বাহুল্য। এখনও মহারাষ্ট্রে বহু স্থলে 'শিবরাঈ' পয়সার প্রভূত প্রচলন আছে। 'শিবরাঈ' পয়সার প্রচলন বন্ধ হইবে—গত বৎসর পুণায় সহসা এইরূপ একটা গুজব উঠায় নগরমধ্যে মহা হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছিল। এমন কি, অনেকে ধর্ম্মঘটের আশঙ্কাও করিয়াছিলেন। পরিশেষে কর্ত্তৃপক্ষ প্রকাশ্য ঘোষণা দ্বারা সেই জনরবের অলীকত্ব প্রতিপন্ন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

মহারাষ্ট্র সাম্রাজ্যে টাকশাল কিরূপ ছিল, উহার কার্য্য কি প্রকারে নির্ব্বাহিত হইত, ইত্যাদি বিষয়ের উল্লেখ প্রায় কোথাও পাওয়া যায় না। তবে ম্যালকম-প্রণীত মধ্যভারতের ইতিবৃত্তে ও ইলিয়ট-রচিত 'বরোদা গেজেটিয়ার' নামক গ্রন্থে এ বিষয়ের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ সংকলিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে মারাঠী টাকশালের কথঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায়।

শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর।

ত্রি-কবি-রচিত প্রাচীন কাব্য।

'যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণ' নামক নবপ্রাপ্ত প্রাচীন কাব্যে তিন ব্যক্তির ভণিতা পাওয়া যাইতেছে।

যুধিষ্ঠির প্রভৃতির স্বর্গারোহণ বৃত্তান্ত হিন্দু পাঠকগণের অবিদিত বা অভিনব বস্তু নহে; সুতরাং সে সম্বন্ধে বৃথা বাক্যব্যয় করিব না। এই নূতন আবিষ্কৃত কাব্যের কবিত্ব-প্রদর্শনও আমার উদ্দিষ্ট নহে। এই যে প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনার উৎসাহ দেশময় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে, কবিত্ব-সৌন্দর্য্য-প্রদর্শনই তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য, এমন কথা বলিতে পারি না। প্রাচীন সাহিত্যের

মূল প্রকৃতির বিনির্ণয়, তাহার সাহায্যে সত্যনির্দ্ধারণ, বিলুপ্ত জাতীয় ইতিহাসের ভস্মাচ্ছাদিত কঙ্কালের আবিষ্কার, ইত্যাদিই তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য।

জগদানন্দ নামক কোনও মহাজনের আদেশে কবি ষষ্ঠীবর সেন, এবং সেনাপতি পরাগল খাঁর আদেশে কবীন্দ্র পরমেশ্বর মহাভারত বা তাহার অংশ-বিশেষের অনুবাদ করিয়াছিলেন, ইহা শুনিয়া এখন কাহারও বিস্মিত হইবার কারণ নাই। কিন্তু পরাগল খাঁ স্বয়ং মহাভারত বা মহাভারতের অন্তর্গত কোনও কাহিনী অবলম্বন করিয়া কাব্য-রচনা করিয়াছিলেন, ইহা নূতন সংবাদ বটে। সমালোচ্য কাব্যে পরাগল খাঁর ভণিতা দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি।

ছয় জন ত্রিদিবযাত্রীর মধ্যে পথেই যথাক্রমে দ্রৌপদী, সহদেব, নকুল, অর্জ্জুন ও ভীমের পতন হয়। গ্রন্থের আরম্ভ হইতে অর্জ্জুনের পতনবৃত্তান্তের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কবি ষষ্ঠীবরের ভণিতা আছে। অর্জ্জুনের পতনবৃত্তান্তের শেষে—

ভারতের পুণ্য কথা অমৃতলহরী।
কবীন্দ্রে রচিল পোথা ভারত পাঞ্চালী॥

এই ভণিতা আছে। ইহার পরবর্ত্তী ত্রিপদীর শেষে ভণিতা নাই। ত্রিপদীর পরবর্ত্তী ষষ্ঠীবরের ভণিতা-যুক্ত পয়ারের অবসানে যে ত্রিপদী আছে, তাহাতেও কোনও ভণিতা দৃষ্ট হয় না। তাহার পর যুধিষ্ঠিরের ইন্দ্রপুরীগমনের বর্ণনায়,—

পরাগল খানে কহে গোবিন্দচরণ।
একমনে শুনিলে যায় বৈকুণ্ঠভুবন॥

এই বিস্ময়াবহ ভণিতাটি বিদ্যমান। এই পয়ারেই গ্রন্থের সমাপ্তি, কিন্তু শেষে কোনও ভণিতা নাই।

বলিয়া রাখা উচিত যে, গ্রন্থের ভাষার পর্য্যালোচনা করিয়া রচনার বিশেষ কোনও পার্থক্য বুঝিতে পারি নাই। তিন কবির রচনা হইতেই অল্প অল্প উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি। গ্রন্থের আরম্ভ এইরূপ,—

প্রণমহ নারাঅণ পরম কারণ।
যাহার কারণে হইল সৃষ্টি উতপন॥
অনাদিনিধন প্রভু ত্রিভুবনমএ।
ভকতবৎসলা বর করুণা হৃদএ॥
যাহার কারণে গঙ্গা ত্রিভুবনসার।
পাপতারিণী গঙ্গা ভব তরিবার॥

ভারতী-কমলাপতি গরুড়বাহন।
নাগান্তক নাগ প্রতি সে রত্নসাজন॥
মহেশচরণে বন্দোম হরষিতমন।
কণ্ঠে কালকূট জার বৃষ বাহন॥
ভবানী চরণ বন্দোম জগতপূজিত।
জাহার কারণে হএ মন প্রকাশিত॥

ইন্দ্রদেব প্রণমোহ আর দেবগণ।
একৈ একে বন্দোম দেব এ তিন ভুবন॥
ব্যাসমুনি বন্দম জে চারি বেদ জ্ঞাতা।
সনক আদি দিতে নারে জাহার সমতা॥
নারাঅণ রূপে মুনি ব্যাস মহাশএ।
ত্রিভুবন মধ্যে জার প্রতিষ্ঠা বিজএ।
বিজয় ভারত পোথা অতি অনুপাম।
কবি ষষ্ঠীবরে কহে গোবিন্দ চরণ॥

* * * *

শরীর পবিত্র জেন করে গঙ্গাজলে।
ভারত শুনিলে পাপ না রহে শরীরে॥
জেহি রূপে স্বর্গে গেল মনুষ্যশরীরে।
সে সব কহিব ভাহি পাঞ্চালী প্রকারে॥

* * * *

অমৃত ভারতকথা সমুদ্রের জল।
পদবন্ধে বিস্তারিতে না পারি সকল॥
সংক্ষেপে কহিব কিছু শুন ধর্ম্মমতি।
জেহিরূপে স্বর্গে গেল যুধিষ্ঠির মহামতি॥

নন্দী ও যুধিষ্ঠিরের কথোপকথন।—

নন্দী দ্বারী বোলে মহাপান্থ মহারাজ।
স্বর্গপন্থে চলিআছ সাধিতে কোন কাজ॥
এহি শিবপুরীতে জে থাক মহামতি।
তোমার উচিত স্থল শুন নরপতি॥
রাজা বোলে অবধান কর মহাশয়।
এথাতে থাকিতে মোর মনে নাহি লয়॥
শিবপুরী থাকি কিবা কেশবভুবনে।
বৈকুণ্ঠ জাহিতে হেন লহে মোর মনে॥
সকল জগতে দেখি তিন দেবমএ।
ভিন্ন ভাব কৈলে হএ পাপ অতিশএ॥
রুদ্র বিষ্ণু পিতামহ তিন এক সব।
ভেদ করিলে হএ নরকে পরাভব॥
কিন্তু আমি প্রতিজ্ঞা করিছি মর্ত্ত্যলোকে।
বৈকুণ্ঠে গোবিন্দপদ দেখিব কৌতুকে॥

নন্দী দ্বারী বোলে তুমি বৈষ্ণবপ্রধান।
বৈকুণ্ঠে কুশলে গিআ দেখ ভগবান॥
এত বলি নন্দী দ্বারী সম্ভাসি তথাহি।
কৈলাশ পর্ব্বত হোন্তে চলে তিন ভাহি॥
কৈলাশ পর্ব্বত হোন্তে জাহিতে সত্বর।
অর্জ্জুন পরিল তবে শিলার উপর॥
গিরিশৃঙ্গ ভাঙ্গি জেন পবনে ফেলাএ।
আকাশের চন্দ্র জেন গরাগরি জাএ॥
অর্জ্জুনের শোকে রাজা কাপে সর্ব্ব অঙ্গ।
অন্তরেতে মহাশোকে উঠিল তরঙ্গ॥
ভারতের পুণ্যকথা অমৃতলহরী।
কবীন্দ্রে রচিল পোথা ভারত পাঞ্চালী॥

যুধিষ্ঠিরের নরক দর্শন।

পরিত্রাণ পাইলা পাপী ধর্ম্মদরশনে।
যমে বোলে যুধিষ্ঠির শুনহ বচনে॥
তোহ্মা দরশনে পাপী হইল নিস্তার।
নারকী উদ্ধার কৈলা ধর্ম্মের কুমার॥
দিব্য রথে চড়ি বিষ্ণুপুরে কর গতি।
ধন্য ধন্য যমে বলে পাণ্ডব নৃপতি॥
দিব্য রথে আরোহণ করি নরপতি।
ধর্ম্ম ইন্দ্র যম জাএ হৈআ একমতি॥
দুন্দুভি বাজনা বাজে পুষ্পবরিষণ।
স্বর্গে জাএ যুধিষ্ঠির ধর্ম্মের নন্দন॥
চামর ঢুলাএ কেহ নরপতি-অঙ্গে।
নৃত্য করে বেশ্যাগণ সুললিত রঙ্গে॥
মস্তক উপরে ছত্র ধরিলা শমনে।
পুষ্পবৃষ্টি করিলেক সর্ব্ব দেবগণে॥
শুভক্ষণে স্বর্গে গেলা রাজা যুধিষ্ঠির।
দেবগণে বলে ধন্য তোমার শরীর॥
ইন্দ্র যুধিষ্ঠির বৈসে এক সিংহাসনে।
চারি দিকে সুবেশ করিল দেবগণে॥
বিবিধ প্রকারে ইন্দ্র করিল ভকতি।
এহি সে অমরাপুরী করহ বসতি॥

অশেষ ভারতকথা সমুদ্রের জল।
প্রণাম করিয়া বৈসে পাণ্ডব সকল॥
চারি সহোদর আর দ্রৌপদী জে সতী।
অঙ্গে অঙ্গে আলিঙ্গন কৈল মহামতি॥
পরাগল খানে কহে গোবিন্দচরণ।
একমনে শুনিলে জাএ বৈকুণ্ঠভুবন॥

গ্রন্থের শেষাংশটিও দেখুন :—

হেন কালে চারি ভাই দ্রৌপদীর সনে।
তেজবন্ত অর্জ্জুন দেখন্ত বিদ্যমানে॥
* * * *
এই জে গন্ধর্ব্ব দেখ অনন্তপ্রভাব।
এই যে ধৃতরাষ্ট্র দেখ অধিক অনুভাব॥
দেব ঋষি গন্ধর্ব্ব সিদ্ধা আর মুনিগণ।
বিষ্ণুবংশ সব দেখ ধর্ম্মের নন্দন॥
সাত্যকী প্রভৃতি জত বিষ্ণুবংশজাত।
পৃথিবী ভরিল জে সকল এথাত॥
চন্দ্রের সাথে অভিমন্যু ধনুর্দ্ধর।
অবিরত বৈসে তারা দেখ বীরবর॥
কুন্তী মাদ্রী সমে দেখ দ্রুপদনন্দিনী।
বিমানেতে চরি কেলি করে পুনি পুনি॥
বসু সমে ভীষ্ম দেখ শান্তনুনন্দন।
এই সে জে অষ্টবসু ভীষ্ম মহাজন॥
মগদ সকলে দেখ পাইল আর গতি।
কেহ গেল গন্ধর্ব্বেত জার জথা স্থিতি॥
এই মত সম্বাদ আছিল বহুতর।
গ্রহন্ত গৌরব দেখি না লেখিল আর॥
ভারতের পুণ্যকথা শুন একমতি।
এই মতে স্বর্গে রৈলা ধর্ম্ম নরপতি॥

ইতি শ্রীমহাভারতে যুধিষ্ঠিরস্বর্গারোহণপুস্তিকা সমাপ্ত॥ যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং লেখকো নাস্তি দোষকঃ। শ্রীরামশরণ ঘোষস্য।

কবি ষষ্ঠীবরই যে পুঁথিখানির সঙ্কলন করিয়াছেন, পূর্ব্বোদ্ধৃত কাব্যারম্ভ-পাঠে অনায়াসে তাহার উপলব্ধি হয়। কবীন্দ্র পরমেশ্বর মহাভারতের রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে ত কেহ সন্দেহ করিবেন না। কবীন্দ্রের ভণিতাযুক্ত উদ্ধৃত অংশটি তৎ-কৃত মহাভারতে আছে কি না, মিলাইয়া দেখিবার যাঁহাদের সুবিধা আছে, তাঁহারা দেখুন। পরাগল খাঁর ভণিতাযুক্ত অংশটি তাঁহার রচিত কি না, অবধারণ করিতে পারিলে, খাঁ সাহেবের জীবনে ও বঙ্গ সাহিত্যের ইতিহাসে আর একটি নূতন কথার সন্নিবেশ হইবে। কিন্তু এই সমস্যার পূরণ বড় সহজ নহে।

দীনেশ বাবুর মতে, কবি ষষ্ঠীবর অন্যূন তিন শত বৎসর পূর্ব্বের কবি। (১) কবীন্দ্র পরমেশ্বর পরাগল খাঁর আদেশে চারি শত বৎসর পূর্ব্বে হোসেন শাহার রাজত্বকালে মহাভারতের অনুবাদ করেন। সুতরাং পরবর্ত্তী কবি ষষ্ঠীবর তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কোনও কবির রচনা ব্যবহার করিয়াছিলেন, এরূপ অনুমান অসম্ভব বা অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু পরাগল খাঁ মহাভারতের ঐ অংশটি লিখিয়াছিলেন কি

(১) বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৩০০ পৃষ্ঠা। দীনেশ বাবু বলেন, তিনি ষষ্ঠীবরের রচিত 'স্বর্গারোহণপর্ব্ব' পাইয়াছেন। তাঁহার 'স্বর্গারোহণ'খানি কিরূপ, জানিতে পারিলে বিশেষ সুবিধা হইত।—লেখক।

না, কেমন করিয়া বলিব? প্রসিদ্ধি আছে, সেকালের নকলনবিশেরা অনেক স্থলে খামখেয়ালী করিতেন। এমন স্থলে, কেবল একমাত্র ব্যক্তির সাক্ষ্যে আস্থা-স্থাপন সঙ্গত নহে।

একই গ্রন্থে বিভিন্ন ভণিতার অস্তিত্ব সম্বন্ধে এখানে একটা কৈফিয়ত দেওয়া যাইতে পারে। আমাদের বোধ হয়, কোনও কবি বিষয়বিশেষের রচনায় প্রবৃত্ত হইয়া যত দুর নিজে রচনা করা আবশ্যক মনে করিতেন, স্বয়ং তত দুর রচনা করিতেন; অবশিষ্ট অন্য কোনও কবির রচনা হইতে গ্রহণ করিতেন। এবং এইরূপ গৃহীত রচনা আত্মসাৎ না করিয়া সরলচিত্ত কবি আদি লেখকের নামটিও বজায় রাখিতেন।

আমাদের এই মতের সমর্থন করিলেও, সমালোচ্য গ্রন্থে পরাগল খাঁর নামটি প্রক্ষিপ্ত বলিয়া আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে। এ বিষয়ে একটি জিজ্ঞাস্য আছে। এক জন বিধর্ম্মী মুসলমানের নামটি বসাইয়া দিবার জন্য হিন্দু লিপি-করের কি স্বার্থ থাকিতে পারে? এত হিন্দু কবি বর্ত্তমান থাকিতে এক জন হিন্দু লিপিকর মুসলমানের নাম বসাইয়া দিলেন কেন? পরাগল খাঁর যতই প্রসিদ্ধি থাকুক না কেন, সাহিত্য-জগতে কবি বলিয়া তাঁহার প্রসিদ্ধি ত নিশ্চয়ই ছিল না? পরাগল খাঁর প্ররোচনায় কোনও কবি বা লিপিকর 'যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণে' তাঁহার নাম সংযুক্ত করিয়াছেন, তাহাও মনে হয় না। কেন না, হস্তলিপি লিখিবার সময়ের কথা দূরে থাকুক, পুস্তক-প্রণয়ন-কালেও পরাগল খাঁ জীবিত ছিলেন না। ২।৪ খানি হস্তলিখিত পুঁথি পাওয়া না গেলে ও সকল প্রাচীন মহাভারতগুলি মুদ্রিত না হইলে, এরূপ প্রশ্নের মীমাংসা কড় সহজ নহে।

কাব্যখানি পয়ার ও নাচারি দীর্ঘত্রিপদীছন্দে লিখিত। পুরাতন তুলট কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখিত, ২৫২টি পত্রে সম্পূর্ণ। সমগ্র চরণের সংখ্যা ১০৮৪ মাত্র। লেখকের বাসস্থান ও লেখার সন তারিখ পাওয়া যাইতেছে না। তথাপি লেখাটি পুরাতন বলিয়া মনে হয়। অনেক স্থলে 'ই'কারের পরিবর্ত্তে 'হি' ব্যবহৃত হইয়াছে। আমরাও অবিকল সেইরূপ উদ্ধৃত করিয়াছি।

ভাষায় প্রাচীনতার নিদর্শন যে কিছু নাই, এমন নহে। পেলাএ, পহু, বাহুড়িআ, কুন, বাত, মোহার, লড়, কাল, দড়াই প্রভৃতি শব্দগুলি যথাক্রমে ফেলায়, প্রভু, ফিরিয়া, কোন, বার্ত্তা, মোর, দৌড়, লাফ, স্থির করি অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, দেখা যায়। মিলের অনুরোধে সপ্তমী বিভক্তিতে 'এ'কার যোগ না করিয়াই অনেক স্থলে ব্যবহৃত হইয়াছে,—

'সম্পাতি তাহান তনএ, জানিলেক ধ্যানএ,
আসিয়া দেখিলা গলে সাপ।'
'সর্ব্বক্ষণ রক্ষা মোরে করিছে বনএ।'

দ্বিতীয়া বিভক্তির 'কে'র স্থলে 'ক'এর প্রয়োগও আছে ; যথা,—

'অর্জ্জুনক সম্বোধিয়া বোলিলা নৃপতি।'
'স্থির হৈয়া যুধিষ্ঠির সবাক বুঝাএ।'

নিম্নের উদাহরণ-ধৃত শব্দগুলির ব্যবহার আলোচ্য বটে।

সম্মতা,—
ব্যাস মুনি বন্দোম জে চারি বেদজ্ঞাতা।
সনক আদি দিতে নারে যাহার সম্মতা॥

পরদার,—
পতিব্রতা নারীএ করিব পরদার॥
অকুমারী সবে মাগিব শৃঙ্গার॥

প্রত্যাসন (প্রত্যাসন্ন),—
দ্বাপর যুগের পর কলি প্রত্যাসন।
কৃষ্ণের কপটে বধ হৈল দুর্য্যোধন॥

আগুছিয়া (আগুলিয়া),—
সভার প্রধান কন্যা নামে চন্দ্ররেখা।
পন্থ আগুছিয়া (২) করে যুধিষ্ঠিরে দেখা।"

সমাই,—
'কোন হেতু এত দূর সমাইর আগমন।'
'কোন দুঃখে তোমরা সমাইর আগমন।'
'নারায়ণে নিষেধিছে তা সমাইর (৩) প্রতি।'

করন্ত, বোলন্ত প্রভৃতিরও প্রয়োগ আছে। স্থানে স্থানে 'করন্তি' প্রভৃতির ব্যবহারও দেখা যায়। উত্তম পুরুষে 'করি' প্রয়োগের পরিবর্ত্তে 'করুর' ব্যবহারও পাওয়া গিয়াছে। যথা,—

'কৃষ্ণেরে করন্তি স্তুতি পঞ্চ সহোদরে।'
'এক নিবেদন করু শুন ধর্ম্মনাথে।'

এ কাব্যের কবিত্ব সম্বন্ধে অধিক বক্তব্য নাই। রচনা আড়ম্বরহীন, ভাষা সহজ ও প্রাঞ্জল। লিপিকরপ্রমাদে অনেক স্থল অসম্পূর্ণ ও বিকৃত হইয়াছে। (৪)

শ্রীআবদুল করিম।

---

(২) এই শব্দের প্রয়োগ এখনও চট্টগ্রামে বিস্তর আছে। 'অগ্রসর' হইতে 'আগুসার', এবং 'আগুসার' হইতেই 'আগুছিয়া' শব্দের উৎপত্তি, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

(৩) এই শব্দটি আমরা আরও ২।১ খানি পুঁথিতে দেখিয়াছি, মনে হয়। 'সমূহ' শব্দের সহিত ইহার কোনও সম্পর্ক থাকিতে পারে।

(৪) বাঁশখালী থানার অন্তর্গত বটতলী স্কুলের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাবু কুঞ্জলাল নাগ মহাশয় এই পুঁথিখানির সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন ; এ জন্য আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতাস্বীকার করিতেছি।—লেখক।

সাধন-সঙ্গীত।

১

কি ভয় দেখাস তুই, এলোকেশী!
তোর সবই কেমন বেশী বেশী!
কালী তুই কালের বার, তাই রে তোর কাল রং,
আজ অকালে কাল তোরে সাজিয়েছে রে আস্ত সং।
হাতে দেছে টিনের খড়্গ—রং করা তায় রক্তের ভান;
শঙ্খ, চক্র আর যে যে সব, সবই মিছে, সবই সমান।
আগে নিতিস্ মানুষ বলি, পাঁটার রক্তে খুসী এখন,
(ওরে) আমরা যেমন মরে আছি, তুই হ'য়েছিস্ ঠিক্ তেমন!
কিসের ভয় দেখাস্ তবে, ওরে আমার এলোকেশী?
মরার হাতে অস্ত্র শস্ত্র, সবই কেমন বেশী বেশী!

২

ওরে আমার মরা মাগো, ওরে আমার মরা মা!
কেমন ক'রে ভুলাবি রে, আর ত আমি ভুলব না!
মরা মায়ের শ্রাদ্ধ ক'রে, জ্যান্ত মায়ের পূজা ক'রে,
শ্রাদ্ধ চাস্ ত শ্রাদ্ধ ক'র্‌ব, করব নারে উপাসনা।
লজ্জা নেই কি লজ্জাহীনা, লোলজিহ্বা মিথ্যা হাসিস্,
মুখে চখে রং মেখে মা, মরার মত প'ড়ে আছিস?
পূজা চাস্ ত বেঁচে ওঠ্, বাপের বেটী হোস্ যদি মা!
(আমরা) মরা মায়ের শ্রাদ্ধ করি—জ্যান্ত মায়ের উপাসনা!
ওরে আমার মরা মাগো, ওরে আমার মরা মা!
মিথ্যা তোর ভয় দেখান, আর ত আমি ভুল্‌ব না!

৩

তারিণী! নিজেরে তরা!
তোর সকল অঙ্গ মরণ ভরা!
নীরস নয়ন, নির্ব্বাক মুখ, শিথিল হস্তে খড়্গ ধরা;
নিজেরে তরা!
মুখে চোখে হায়! মরণ তায়, চরণপ্রান্তে কোটি কোটি মরা।
তারিণী! নিজেরে তরা!

জেগে ওঠ মা! জীবন পেয়ে,
সে জীবন যাক্ জগৎ ছেয়ে,
ভীম গভীর অট্টহাসি, মরমে বাজুক!—শঙ্খ বাঁশী
মরণ তাড়ায়ে জাগায়ে তুলুক মরণ-শ্রান্ত অসংখ্য মরা!
অসহায় ছাগ ঠেলে ফেলে দে, ভকতের প্রাণ নে মা! নে মা! নে!
হৃদয়-রক্তে হাস্থক কৃপাণ—রক্ত অধর, রক্ত নয়ান,
হাসিয়া ডাকিয়া বাঁচায়ে তুলুক মরণ-শ্রান্ত অসংখ্য মরা!
চেয়ে দেখ্ তুই আপনি মরা!
তারিণী! তারিণী! নিজেরে তরা!

জন্ চায়নাম্যানের চিঠি।

চীন-দেশীয় কোন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক পাশ্চাত্য জাতিদিগকে সম্বোধন করিয়া কতকগুলি পত্র লিখিয়াছেন। চীনদেশ আক্রমণ করিতে গিয়া পাশ্চাত্য সৈন্য-মণ্ডলী যখন তাহাদের সভ্যতার জীর্ণ খোলস ছাড়িয়া ভিতরকার খাঁটি পাশব-বৃত্তি চরিতার্থ করিতে বসিয়াছিল, তখনও এ ভদ্রলোক চুপচাপ ছিলেন। আমরা যেমন মনে মনে পাশ্চাত্য সভ্যতাকে উচ্চস্থানে চড়াইয়া রাখিয়াছি, চীন-দেশীয়গণ তাহা কখনই করেন নাই, স্নুতরাং আমরা যাহাঁকে সহসা মহা অধঃপতন মনে করিয়া আশ্চর্য্য হইতেছি, তাঁহারা তাহাকে স্বাভাবিক বৈ আর কিছু জ্ঞান করিতেছেন না। কিন্তু পাশ্চাত্য সংবাদপত্রগুলি যখন চীনদিগকে বর্ব্বর বলিতে আরম্ভ করিল, এবং তাহাদিগকে সভ্য করাই চীন আক্রমণের একমাত্র উদ্দেশ্য বলিয়া কৈফিয়ৎ দিতে লাগিল, তখন এ ভদ্রলোকের আর সহ্য হইল না। তখনই তিনি 'জন্ চায়নাম্যান' নাম ধারণ করিয়া উল্লিখিত পত্রগুলি লিখিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার বক্তব্যগুলি আমাদের ভাল করিয়া বিবেচনা করিবার বিষয়। একতর্ফা য়ুরোপীয় বক্তব্য পড়িয়া পড়িয়া, চীনের কথা দূরে থাক, আমরা নিজেদেরও বর্ব্বর মনে করিতে আরম্ভ করিয়াছি।

জন্ চায়নাম্যানের পত্রাবলী হইতে দুই এক স্থান মোটামুটি রকম তর্জ্জমা করিয়া দেওয়া যাইতেছে। তাঁহার সুতীব্র প্রাঞ্জল ভাষার যথাযথ অনুবাদ সম্ভব নহে।

দেখিতে হইলে আমারই বা কিরূপ তোমারই বা কিরূপ তাহা বিচার করা কর্ত্তব্য। আমরা কিরূপ? * * *

"অতি সুদূর প্রাচ্যদেশে সূর্য্যালোকপ্লাবিত প্রশস্ত নদীকূলে আমার জন্মভবন। এমন সূর্য্যালোক তোমরা কখন দেখ নাই। তোমাদের যাও বা আছে, তাহা তোমরা ছাই ও ধূমে কলুষিত করিয়া ফেল। আমার গৃহের মত এমন সহস্র গৃহ সেখানে আছে। প্রত্যেক গৃহ একটি বাগানের মধ্যস্থিত, শাদাসিধা, শ্বেত বা ধূসর বর্ণে রঞ্জিত, আড়ম্বরবর্জ্জিত, প্রিয়দর্শন ও পরিষ্কার। নদীর উভয় পারে সেই গৃহগুলির লাল বা নীল খোলার চাল বৃক্ষরাজির শ্যামল সমুদ্রের মধ্য হইতে মাথা তুলিয়া রহিয়াছে। এখানে ওখানে বড় বড় গাছের ঝোপের মাথার উপর কোন উচ্চ দেবমন্দিরের সুবর্ণমণ্ডিত কারুকার্য্য ঝিকমিক করিতেছে। বহুসেতুযুক্ত নানাবিধ নৌকায় পরিপূর্ণ নদীটি তাহার স্বচ্ছ বক্ষে সমৃদ্ধ গ্রাম্য হাটবাজারের আমদানী রপ্তানী বহন করিতেছে। কারণ চতুর্দ্দিকে অবস্থাপন্ন চাষীর বসতি, তাহারা যে জমী চাষ করে, তাহা তাহাদের নিজস্ব সম্পত্তি; তাহাদের বাপদাদারাও সেই জমীরই মালিক ছিল, এবং তাহাতেই চাষ করিত। এই চাষীরা যথার্থই বলিতে পারে যে, যে জমীতে আজ তাহাদের জীবিকানির্ব্বাহ হইতেছে, সে জমী তাহারাই পুরুষানুক্রমে গড়িয়া তুলিয়াছে। কারণ, দেখ, চারি দিকের পাহাড়ে প্রায় চূড়া পর্য্যন্ত যাহা এক কালে অনুর্ব্বর ছিল, তাহা এখন ধান তুলা চা লেবু আখ প্রভৃতির ক্ষেতে শস্যশ্যামল হইয়াছে। নদী হইতে তোলা জলের ধারায় পাহাড়ের গা রজতরেখায় ঘেরা। সহস্র ঝিকঝিকে ঝরণা ধাপ হইতে ধাপে লাফাইয়া, বাঁধান চৌবাচ্ছায় ঝুপঝাপ শব্দে পড়িয়া, প্রণালীর মধ্যে কল কল করিয়া, জমীর অন্তরে প্রবিষ্ট ও তাহা হইতে ক্ষরিত হইয়া চারি দিকে উর্ব্বরতা শ্যামলতা ও জীবনসঞ্চার করিতেছে।

"ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া আঁকাবাঁকা পথ ও ছোট ছোট সাঁকোর উপর দিয়া চলিতে থাকিলে পুরুষানুক্রমের পরিশ্রমের পরিচয় পাওয়া যায়। অবশেষে পাহাড়ে চড়িতে চড়িতে এক সময় দেখিবে যে, মানুষের ক্ষমতার সীমায় উপস্থিত হইয়াছ। সেখানে প্রকৃতি স্বাধীন লীলায় পাহাড়ের চূড়াকে নীল সোনালী ও গোলাপী বস্ত্রে মণ্ডিত করিয়াছে। সেখানে গন্ধরাজ ক্লেমাটিস আজালিয়া প্রভৃতি নানা উজ্জ্বল বর্ণের পাহাড়ী ফুল স্বাভাবিক উচ্ছৃঙ্খল ভাবে ফুটিয়া

সে নিস্তব্ধতা এতই প্রগাঢ় যে, আমাদের এক জন কবির কথায় বলা যায় যে, ভূপতিত বৃক্ষছায়ার মর্ম্মরধ্বনি যেন শুনা যাইতেছে। মাঝে মাঝে নিম্নভূমি হইতে চাষীদের এপার ওপার ডাকাডাকির শব্দ, বা প্রত্যুষে ও প্রদোষে উপত্যকার মন্দিরের পূজায় আহ্বানের ঘণ্টাধ্বনি সে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছে। সে কি নিস্তব্ধতা! কি ধ্বনি! কি গন্ধ! কি বর্ণচ্ছটা!

"এ স্থানে সমস্ত ইন্দ্রিয় এই সকল রসে সিক্ত হয়, এবং ক্রমে কত যে সরস হইয়া উঠে, তাহা তোমাদের হিমপ্রধান দেশে তোমরা কল্পনাই করিতে পার না। এই সৌন্দর্য্য সকল বাহির হইতে অন্তরে পশিয়া হৃদয় ও মনকে অলক্ষিতে নিজের সহিত সামঞ্জস্যে গড়িয়া তুলে। সুতরাং আমাদের চীনদেশে যদি ধর্ম্ম থাকে, শ্রী থাকে, ললিতকলাকৌশল থাকে, তবে যাহার দেখিবার চোক আছে, সে তাহার কারণ সহজেই বুঝিতে পারিবে। প্রকৃতি আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন। এই পর্য্যন্ত তোমাদের অপেক্ষা আমাদের ভাগ্যবলেরই পরিচয় হইল। কিন্তু এ শিক্ষা যে আমরা আদর করিয়া গ্রহণ করিয়াছি, তাহাতে আমাদের গুণপণারও পরিচয় দিয়াছি, স্বীকার করিতে হইবে।

"ভাবিয়া দেখ, এই মনোরম উপত্যকায় সহস্র মানুষ বাস করিতেছে, তাহাদের আচারের বাড়া কোন আইন নাই, পরিবারের ছাড়া কোন শাসন নাই। তাহারা পরিশ্রমী, সেরূপ শ্রমক্ষমতা তোমরা য়ুরোপে জান কি না সন্দেহ। কিন্তু সে শ্রম স্বাধীন, তাহা স্ত্রী-পুত্র-পালনার্থ, তাহা পৈত্রিক জমীকে বংশধরের জন্য উর্ব্বরতর করিবার নিমিত্ত। এইটুকু ব্যতীত তাহাদের বিষয়স্পৃহা নাই, তাহারা ধন রাশীকৃত করিবার আকাঙ্ক্ষা রাখে না। * * *

"এরূপ মানবসমাজে অশোভন পাশব দ্বন্দ্বের কোন স্থান নাই। এখানে পরস্পরের সহিত প্রভু-ভৃত্য সম্পর্ক নহে। সত্যকার প্রত্যক্ষ সাম্য ইহাদের আচার ব্যবহারে নিহিত রহিয়া তাহাদিগকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। স্বাস্থ্যকর শ্রম, যথেষ্ট অবসর,—সহজ আতিথ্য, দুষ্প্রাপ্য-বিষয়বাসনায়-অখণ্ডিত আচারগত সন্তোষ, পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী প্রকৃতি দ্বারা পরিপুষ্ট সৌন্দর্য্যবোধ, কখনও সুশোভন শিষ্টাচারে প্রকাশিত কখনও মনোহর ললিতকলায় প্রস্ফুটিত। আমি যেখানে জন্মিয়াছি, সেখানকার লোকের চরিত্রের এই সকলই প্রধান লক্ষণ। * * *

"হে সভ্যতা-দানেচ্ছুগণ! ইহার পরিবর্ত্তে তোমরা আমাদিগকে কি দিতে পার? তোমাদের ধর্ম্ম? হায়! সে ধর্ম্মের নামে কি না অকথ্য দুষ্কার্য্য

করিতেছ? তোমাদের নীতি? তাহা ত আমরা খুঁজিয়া পাই না। তোমাদের বুদ্ধি? সে বুদ্ধি তোমাদের কি দশা করিতেছে? আমাদের অবস্থার যে ছবি তোমাদের সমুখে উপস্থিত করিলাম, তোমরা পাল্টা ছবি কি দেখাইতে পার? সেই প্রশ্নের উত্তর এখন দিবার চেষ্টা করা যাক।

"বহুদিন ধরিয়া তোমাদের দেশের লোক দেখিয়া আমার যা সংস্কার জন্মিয়াছে, তাহা আলোচনা করিতে গেলে কি রকম মানুষের ছবি মনে আসে? আমি দেখিতে পাই যে, সে ব্যক্তি প্রকৃতি হইতে বিচ্ছিন্ন, কিন্তু মানুষের চেষ্টায় সংস্কৃত নয়। সে শিক্ষাপ্রাপ্ত, কিন্তু শিক্ষিত নয়। সে গ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু চিন্তা করিতে অক্ষম। যে ধর্ম্মের বুলি শিখিয়াছে, সে ধর্ম্মে তাহার বিশ্বাস নাই, কারণ সে জীবনের কোন কাজ তাহার সহিত মিলাইতে পারে না। যে নাস্তিকতা স্পষ্টরূপে স্বীকার করিবার বুদ্ধি তাহার নাই, তাহা ধর্ম্মাচরণের মুখোসে ঢাকিয়া রাখাই ভাল—এইরূপ একটি অস্পষ্ট ধারণা তাহার আছে মাত্র। * * *

"দয়া, সংযম, ত্যাগ, বিষয়বিতৃষ্ণা, এই সকল কথা তাহাকে ছেলেবেলা হইতে গেলান হইয়াছে, কিন্তু তাহা কথামাত্র রহিয়া গিয়াছে। কারণ, এই সকল মনোভাবের চর্চ্চা সে কখনও কাহাকেও করিতে দেখে নাই, নিজে করিয়া দেখিলে হয়—এ কথাও তাহার মনে কখনও উদয় হয় নাই। এই সকল ভাব তাহার মনে এইটুকু বসিয়াছে যে, তাহাকে চিরভণ্ড হইতে বাধ্য করিয়াছে, কিন্তু এত দূর বসে নাই যে, সে নিজেকে ভণ্ড বলিয়া চিনিতে পারে। * * * জীবনযাত্রার উপায় সর্ব্বস্ব, জীবনের উদ্দেশ্য কিছুই নাই। * * * তোমাদের সমাজের এই চিত্র আমার মনে প্রতিভাত হয়।

"আমি যখন প্রথম পাশ্চাত্য দেশের সংস্পর্শে আসি, তখন তোমাদের বুদ্ধির প্রকার ও পরিসর দেখিয়া আমার বড় চমক্ লাগিয়াছিল। আমি দেখিলাম যে, তোমরা এমন অনেক সমস্যার সুন্দররূপ মীমাংসা করিয়াছ, যাহার অস্তিত্বই আমাদের প্রাচ্য জাতির মনে উদয় হয় নাই। তোমরা বিশ্লেষণ ও পরীক্ষার দ্বারা প্রাকৃতিক শক্তি সকলের রহস্য ভেদ করিয়া তাহাদিগকে এমন কাজে লাগাইয়া লইয়াছ যে, তাহা আমার সেই সময়কার কাঁচা বুদ্ধির নিকট ভেল্কীর মত বোধ হইত। এখনও, অনেক দেখিয়া শুনিয়াও, সে বিষয়ে আমি তোমাদের বাহাদুরী দিয়া থাকি। তোমাদের শ্রেষ্ঠতা-অভিমানের এই প্রধান ও সর্ব্বাপেক্ষা ন্যায্য দাবী, তাহা আমি বুঝিতে পারি, এবং যখন দেখি যে

আমার কতকগুলি বুদ্ধিমান স্বদেশীয় উৎসাহসহকারে আমাদের দেশে এই-গুলির প্রতিষ্ঠা ইচ্ছা করিতেছে তখন আমি আশ্চর্য্য হই না। কিন্তু এই সংস্কারক দলের উৎসাহ আমি বুঝিতে পারিলেও তাহাদের মতে সায় দিতে পারি না। * * *

"সত্য কথা বলিতে গেলে তোমাদের গত শতাব্দীর ইতিহাস অনুশীলন করিয়া এবং তোমাদের সমাজতন্ত্রের ঘনিষ্ঠতর পরিচয় পাইয়া আমার অন্ত দিকে চোক খুলিয়া গিয়াছে। আমি শিখিয়াছি যে, যতই অত্যাশ্চর্য্য আবিষ্কার হউক না কেন, বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনী শক্তির যতই ফললাভ হউক না কেন, কেবলমাত্র এই সকলে সমাজের মঙ্গলবিধান হইতে পারে না। ইহাও শিখিয়াছি যে, শ্রমলাঘবকারী যন্ত্র তন্ত্রের উপর যে বুদ্ধি খরচ করা যায়, তাহার প্রভাবে ধনবৃদ্ধির দ্বারা যত না উপকার হউক শ্রমজীবিগণের দাসত্ব-বিধানে তদপেক্ষা ক্ষতি অধিক হয়। আমার নিকট শুধু ধনবৃদ্ধি অর্থাৎ সাংসারিক আরামের উপায়বৃদ্ধিমাত্র এমন কিছু ভাল জিনিস নহে। এই ধন দেশে কি ভাবে ব্যাপ্ত থাকে, সমাজনীতির উপর তাহার কিরূপ প্রাদুর্ভাব হয়, তাহার উপরই উহার ভাল মন্দ নির্ভর করে। এই সকল দিক দেখিয়া আমি স্বদেশে পাশ্চাত্য আদর্শের প্রচলন ভয় করি। * * *

"আমি দুঃখের সহিত দেখিতেছি যে, তোমরা এই যে এত দিন ধরিয়া যন্ত্র তন্ত্রের উন্নতি করিতেছ, ইহার মধ্যে একদিনও শ্রমজীবীদের তন্নিমিত্ত যে দুঃখ কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে, তাহার লাঘবের কোন ব্যবস্থার চেষ্টামাত্র করিলে না! অন্তঃত সে চেষ্টায় অল্পমাত্রও কৃতকার্য্য হইতে পার নাই! এক হিসাবে ইহা কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, কারণ চিরকালই তোমরা মানব-জীবন অপেক্ষা ধনকে প্রাধান্য দিয়া আসিয়াছ। কিন্তু চীনদেশের পক্ষে ইহা উৎসাহজনক নহে। * * *

"জীবনের কতকগুলি গৌণ বিষয়ে আমাদের অপেক্ষা তোমাদের সম্পদ বেশী, তাহাতে সন্দেহ নাই। তোমাদের লোকে অধিক খায়, অধিক পান করে, অধিক ঘুমায়, কিন্তু এখানেই তাহাদের শ্রেষ্ঠত্বের শেষ। তাহারা কম প্রফুল্ল, কম সন্তুষ্ট, কম পরিশ্রমী, কম শান্ত, তাহাদের নিত্য জীবন শরীর ও মনের স্বাস্থ্যের কম উপযোগী। * * * আমাদের কবি ও শাস্ত্রকার-গণ বহুকাল ধরিয়া শিক্ষা দিয়াছেন যে, ধন বা ক্ষমতা বা বাজে খাটুনিতে মঙ্গল নাই। স্বচ্ছভাবে সংযতভাবে ও সুশিক্ষিতভাবে জীবনের সম্বন্ধ সকল

অনুভব করাই শ্রেয়স্কর। প্রকৃতির মধ্যে যাহা কিছু সুন্দর, মানব-হৃদয়ে যাহা কিছু সুকুমার ও স্পর্শ-কাতর, তাহার মর্ম্মগ্রহণ অনুভূতি ও প্রকাশ ইহাতেই আমরা জীবনের সার্থকতা পাই। চন্দ্রালোকিত উদ্যানে গোলাপ, তৃণাচ্ছন্ন ভূমির উপর বৃক্ষচ্ছায়া, বাদামের ফুল, পাইনের সৌরভ, মদিরা-পাত্র ও বীণা, এইগুলি এবং জীবন মরণের বেদনা, সুদীর্ঘ আলিঙ্গন, বৃথাপ্রসারিত বাহু, আলোক ও ধ্বনির স্মৃতিবাহী মুহূর্ত্ত যাহা নিঃশব্দ ছায়াময় ভূতরাজ্যে চির লয় প্রাপ্ত হয়, যাহা কিছু আছে, যাহা কিছু ধরিতে ছুঁইতে পাই না, উড়ন্ত বিহঙ্গ, সমীরণপ্রবাহিত সুগন্ধ, এই সমস্ত জিনিসই আমাদের ইন্দ্রিয় সকল স্পন্দিত করে। ইহা আমাদের আছে, ইহা তোমরা দিতে পার না। কিন্তু ইহা অতি সহজেই কাড়িয়া লইতে পার। কলের ঘর্ঘরে ইহা শুনা যায় না, কারখানার ধূমে ইহা দেখা যায় না। পাশ্চাত্য জীবনের আবর্ত্তের নিষ্পেষণে ইহা মারা পড়ে।

"যখন আমি তোমাদের কেজো লোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করি—যাহাদের তোমরা সর্ব্বাপেক্ষা ভক্তি কর, যখন আমি দেখি তাহারা বৎসরের পর বৎসর, দিনের পর দিন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা, তাহাদের নিরানন্দ কর্ম্ম-ঘানিতে খাটিতেছে,—যখন দেখি যে, তাহাদের কষ্টলব্ধ স্বল্প অবসরেও দৈনিক দুশ্চিন্তার জের মেটে না, এবং যত না খাটুনিতে ততোধিক এই সঙ্কীর্ণ পীড়াদায়ক দুর্ভাবনায় তাহারা জীর্ণশীর্ণ হইয়া যাইতেছে, তখন আমি অতি সন্তোষের সহিত আমাদের শাদাসিধা সনাতন কর্ম্মজীবনের প্রতি দৃষ্টি ফিরাই, এবং তোমাদের এই নূতন নূতন বিপদসঙ্কুল পথ অপেক্ষা আমাদের প্রচলিত প্রথার সুগম পথের অধিক মর্য্যাদা অনুভব করি,—সে পথ আমাদের এতই পরিচিত যে চলিতে চলিতেও আমরা মাঝে মাঝে অনন্ত নক্ষত্রমণ্ডলীর প্রতি দৃষ্টি উত্তোলন করিবার অবসর পাইয়া থাকি।"

এই ত গেল প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সমাজের চিত্র। উপসংহারে হালের যুদ্ধ ব্যাপার সম্বন্ধে জন্ চায়নাম্যানের বক্তব্য শুনা যাক। পাশ্চাত্যের সহিত প্রাচ্যের সম্বন্ধ ঘনাইয়া আসিতেছে, অন্ততঃ পাশ্চাত্য জাতিগণ ত আত্মীয়তা করিবার জন্য ঘেঁষিয়া ঘেঁষিয়া আসিতেছেন। আমরা পাশ্চাত্যের অধীন হইলেও ধর্ম্মে আচারে ও চরিত্রে প্রাচ্য; বাঁচিয়া থাকিলে সম্ভবতঃ চিরকাল তাহাই থাকিব। সুতরাং উপস্থিত সংঘর্ষের আকার প্রকার কি, উহার

ভবিষ্যৎ ফলাফল কিরূপ হইবার সম্ভাবনা, উভয় দিকের বক্তব্য বিচার করিয়া এ বিষয়ে যথার্থ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া আমাদের জাতীয় উন্নতির পক্ষে অত্যাবশ্যক, ইহা বলাই বাহুল্য।

জন্ চায়নাম্যান্ বলিতেছেন,

"তোমরা অবশ্য জিজ্ঞাসা করিতে পার,—যদি আমাদের লোকের এই সকল সদ্‌গুণ থাকে, তাহারা যদি এতই খাঁটি ন্যায়পরায়ণ ও নিরীহ হয়, তাহা হইলে সকল দেশে সকল কালে রাজধর্ম্মের যাহা প্রধান নিয়ম, তাহা তাহারা লঙ্ঘন করিল কি করিয়া? (জন্ চায়নাম্যান দূত-রূপী Legationএর দুর্দ্দশার উল্লেখ করিতেছেন)। * * * তদুত্তরে আমি বলি যে, আমি আমার স্বদেশীয়গণকে দেবকল্প বলিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা কখন করি নাই। আমি বলিয়াছি মাত্র এবং এখনও তাহাই বলিব যে, তাহাদিগকে যদি উৎপীড়ন না করা হয়, তাহাদের অভ্যস্ত আচার ব্যবহারের উপর যদি হস্তক্ষেপ না করা হয়, তাহা হইলে পৃথিবীর মধ্যে এমন নিরীহ নির্ব্বিবাদী জাতি আর কোথাও পাইবে না। * * * এ ক্ষেত্রে তাহাদের প্রতি কিরূপ অত্যাচার করা হইয়াছিল, তাহা কি তোমরা কখনও উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিয়াছ? সে বিষয়ে আমি সন্দেহ করি। অতএব আমাকে সংক্ষেপে ঘটনাবলী বিবৃত করিবার অনুমতি দাও।

"তোমাদের বণিকগণ যখন প্রথমে আমাদের দেশে প্রবেশলাভ করে, তখন তাহারা কিছু আমাদের নিমন্ত্রণে আসে নাই। তথাপি আমরা তাহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়াছিলাম, খুব উৎসাহভরে না হউক, অন্ততঃ প্রসন্নভাবে। যতক্ষণ তাহারা আমাদের নিয়ম রক্ষা করিয়াছিল, আমরাও তাহাদের কারবার মঞ্জুর করিয়াছিলাম, কিন্তু এই কড়ারে যে, তাহারা আমাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার কোনও ব্যতিক্রম ঘটাইবে না। প্রথম প্রথম তোমাদের স্বদেশীয়গণ এই সর্ত্তে সম্মত হইল, এবং বহুবৎসর মাঝে মাঝে খিটিমিটি হইলেও কোন রীতিমত গোলযোগ উপস্থিত হয় নাই। যে বিষয়ে গোলমালটা আরম্ভ হইল, সে বিষয়ে তোমরা নিজ আচরণ সম্বন্ধে কৈফিয়ৎ পর্য্যন্ত দিতে সাহসী হও নাই।

"তোমাদের কারবারের প্রধান জিনিস ছিল আফীম। আমরা দেখিলাম, এই নেশায় আমাদের লোকের শরীর ও চরিত্র উচ্ছিন্ন হইতেছে, সুতরাং এই ব্যবসা নিষেধ করিলাম। কিন্তু তোমাদের বণিকগণ আইন লঙ্ঘন করিতে আরম্ভ করিল, এবং লুকাইয়া চোরাইয়া আফীম আমদানী করিতে

লাগিল—অবশেষে আমরা জবর্দ্দস্তি আইন জারি করিয়া নিষিদ্ধ মাল আটক ও বিনষ্ট করিতে বাধ্য হইলাম। এই ছুতায় তোমরা যুদ্ধ বাধাইলে, আমাদের রাজ্য আক্রমণ করিলে, খেসারত আদায় করিলে, এবং হংকং দ্বীপ দখল করিলে। ইহা কি ভবিষ্যৎ সম্বন্ধের পক্ষে শুভ সূচনা? ইহাতে কি আমাদের ইংরাজের ন্যায়পরতা সম্বন্ধে খুব উচ্চ ধারণা হইবার কথা? আরও কয়েক বৎসর গেলে নিশান সম্বন্ধে কি খুঁটিনাটি লইয়া (ইহাতেও পুনশ্চ তোমাদেরই দোষ ছিল) আমরা পুনরায় তোমাদের সহিত সংঘর্ষে আসি। তোমরা এই গণ্ডগোল অবলম্বন করিয়া নূতন নূতন দাবী করিবার ছুতা আবিষ্কার করিলে। ফরাসীদের সহিত যোগ দিয়া তোমরা আমাদের রাজধানী অধিকার করিলে, এবং আমাদের নিকট এমন সব অপমানজনক প্রস্তাব করিলে, যাহা কোন য়ুরোপীয় জাতির নিকট করিতে তোমরা সাহস পাইতে না। আমরা অগত্যা সম্মত হইলাম—তখন আমরা যুদ্ধপ্রধান জাতি ছিলাম না। কিন্তু তাই বলিয়া কি আমাদের ন্যায়-অন্যায়-বোধে আঘাত লাগে নাই? পরে যখন য়ুরোপের প্রত্যেক জাতি কোন না কোন ছুতা ধরিয়া আমাদের রাজ্যের এক এক অংশ দখল ও অধিকার করিয়া রাখিল, তখন তোমরা কি মনে করিলে যে, আমরা সহ্য করিলাম বলিয়া অপমানটা মর্ম্মে পশিল না? চীন-দেশীয় যে কেহ তোমাদের সহিত গত ৩০ বৎসরের সম্বন্ধ আলোচনা করে, তাহারা তোমাদিগকে ডাকাত ও বোম্বেটের দলে গণ্য করে, তাহাতে আর বিচিত্র কি?

"তোমরা বলিতেছ যে, দূত রাজধর্ম্মানুসারে অবধ্য। কিন্তু মনে রাখিও যে তোমরা আমাদের রাজ্যশুদ্ধ লোকের মাথা হেঁট করাইয়া তলওয়ারের মুখে সে দূত আমাদের ঘাড়ে চাপাইয়াছ। তোমরা বল যে, আমাদের মত্ত প্রজাগণ নিষ্ঠুরতাচরণ করিয়াছিল। হায়! তাহা করিয়াছিল; কিন্তু তোমাদের সৈন্যগণ?—তোমাদের যে সৈন্যরা খৃষ্টধর্ম্মাভিমানী জাতির অন্তর্গত? পেকিন হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত যে ভূমি এক কালে উর্ব্বর ছিল, তাহাকে এই প্রশ্নের উত্তর জিজ্ঞাসা কর। যে পুরুষগণ খুন হইয়াছে, এবং যে নারী ও শিশুগণ অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়াছে, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর। যে নিরীহ নির্দ্দোষগণ অপরাধীদের সহিত এক হত্যাকাণ্ডে অভিভূত হইয়াছে, তাহাদের জিজ্ঞাসা কর। সেই খৃষ্ট,—যিনি মানবকে ভালবাসিতেন, যাঁহাকে তোমরা মান্য করিবার ভাণ করিয়া থাক,—তাঁহাকে বিচার করিতে বল যে, অপরাধ কাহার—আমাদের?—যাহারা অত্যাচারে উন্মত্ত হইয়া স্বদেশরক্ষায় নিযুক্ত

ছিলাম, অথবা তোমাদের?—যাহারা অত্যাচারের পরিবর্তে দ্বিগুণ অত্যাচার করিবার কালে একবার ভাবিয়াও দেখিলে না যে, সমস্ত কাণ্ডটা তোমাদেরই পাপের ফল।

"হায় রে হায়! এই খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী জাতিগণ শিখাইতে আসিয়াছেন যে, ধর্ম্মের কোন অর্থ নাই—যদি তাহার পিছনে বল না থাকে। ভয় নাই, সে শিক্ষা আমরা অবহেলা করিব না; যে দিন তাহা সম্পূর্ণ হইবে, সে দিন য়ুরোপের দুর্দ্দিন! তোমরা চীন জাতির ৪০ কোটি মানবকে অস্ত্র-সজ্জিত করিতেছ। যাহারা—তোমাদের আগমনের পূর্ব্বে পরস্পরের সহিত, এবং সমগ্র পৃথিবীর সহিত শান্তিতে থাকা ব্যতীত অন্য আকাঙ্ক্ষা করিত না। খৃষ্টের নামে তোমরা রণভেরী বাজাইয়াছ—কংফুসিয়াসের নামে আমরা তাহা প্রতিধ্বনিত করিব!"

শ্রীভারতদাস মিত্র।

গল্পের দাম।

১

উন্নতির সোপান হইতে সোপানান্তরে আরোহণ করিতে করিতে কুমারের আর্থিক অবস্থা যখন এমন স্বচ্ছল হইয়া উঠিল যে, ২০০৲।১০০৲ টাকা বাজে খরচ করিলে তাহার গায়ে লাগে না, এমন সময়ে আমরা একদিন কয় বন্ধুতে মিলিয়া কুমারকে ধরিয়া বসিলাম, "বেশী নয়, আমাদের একদিন ওরি মধ্যে একটু ভাল করিয়া গ্রেট ইষ্টার্‌ণে একটি পার্টি ও আমরা যেরূপ পছন্দ করিব তোমার পরিবারকে সেইমত একখানি গয়না দিলেই সব গোল মিটিয়া যায়।" কুমার এ প্রস্তাবে সম্মত হইল না। অথচ কুমার লোকটা এ দিকে বিলক্ষণ উদার ও বেশ একটু সৌখীন; অর্থাৎ, ব্যক্‌স্কিনের পম্পটি, প্লেটিনামের চেনটি, এবং 'লেডি'দের প্রিয় রিষ্টলেট ওয়াচটি না হইলে কুমারের চলিত না। কিন্তু কুমার সপ্তাহের অধিক সেগুলি ব্যবহার করিতেও পারিত না; কেন না, আমাদের মধ্যে এক জন না এক জন কুমারের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ সেগুলিকে লইয়া বাধিত করিত। কুমার হাসিয়া বলিত, "জীবন্তে স্মৃতিচিহ্নের এত ঘটা, আমি মনে করব কি?" কুমারের স্ত্রী বলিত, "তোমার বন্ধুগুলোর গায়ের পায়ের

গায়ের মাপও কি ছাই তোমার সঙ্গের এক ?" কুমার আমাদের নিকট এ কথা বলিবার আগে সূচনা করিত, "পাগলী আজ খেপেছে।" কিন্তু সে কথা যাক। অনুনয় বিনয় করিলাম, অভিমান করিলাম, রাগ করিলাম, কিন্তু কুমার কিছুতেই উক্ত প্রস্তাবে ঘাড় পাতিল না। যখন দেখিলাম, কিছুতেই বাগ মানাইতে পারা গেল না, তখন আমরা বলিলাম, "কিন্তু কুমার মনে থাকে যেন, প্রতিশোধ না লইয়া আমরা ছাড়িব না।" শুনিয়া কুমার বলিল, "যে রকমে ইচ্ছা।" এই ঘটনার ২।১ দিন পরেই কুমার তাহার চাকরীস্থানে চলিয়া গেল।

২

'প্রোমোশন' পাইয়া বদলী হইবার মুখে এক মাসের অবকাশ লইয়া তিন বৎসরের পর কুমার সে বৎসর কলিকাতায় আসিয়াছে। তখন পূজার সময়। আমাদের সঙ্গে লইয়া কুমার পূজার বাজার করিতে বাহির হইয়াছে। ভাইপোদের জন্য সিল্কের পাঞ্জাবী, ভাইঝীদের জন্য ত্রাক্কিকা পাট্যার্ণের শল্‌মা-চুমকী-দার রেশমী শাড়ী, ভ্রাতৃজায়াদের জন্য অপেক্ষাকৃত সংযত রং ও পাট্যার্ণের কৌষেয় বস্ত্র, ঝী চাকরদের মাটাবালামের থান প্রভৃতি সবই কেনা হইল। আর কেনা হইল পিনোর রকমারী গোটা কতক দামী সেণ্ট। বাজার করিয়া ফিরিবার মুখে দপ্তরীপাড়ায় গাড়ী থামাইয়া কুমার এক দপ্তরীখানায় প্রবেশ করিয়া জাঁকাল রক-মের বাঁধান ছোট বড় মাঝারী সব রকম কবির থান কয়েক গ্রন্থাবলী লইয়া আসিল। সেগুলি তাঁর প্রিয়তমাকে তিনি পূজার উপহার দিতেছেন। সেণ্টগুলি শ্যালিকাদের জন্য। মিথ্যা কথা বলিব না, আমার স্ত্রী যদিও কুমারের ভগ্নী, তথাপি তাহার অদৃষ্টে একটি গন্ধ-লাভ হইয়াছিল, এবং আমিও যে তাহা ব্যবহার করিয়া বিজয়ার বাজারে শ্বশুরবাড়ী যাইবার দিন বাবু সাজি নাই, তাও বলিতে পারি না। যা লইয়া কুমারের সঙ্গে আমাদের ঝগড়া, তার কিন্তু কিছুই প্রতিকার হইল না। আমাদের পছন্দমত অলঙ্কার কুমার এ পূজার সময়ও তাহার গৃহিণীকে কিনিয়া দিল না। এই সূত্রে পূর্ব্ব বৎসরের প্রতিশোধ লইবার কথাটা মনে পড়িয়া গেল।

৩

কি উপায়ে কুমারের এই বর্ব্বর একগুঁয়েমীর প্রতিশোধ লওয়া যাইতে পারে, তাহা স্থির করিবার জন্য আমাদের কয় বন্ধুর এক কমিটী বসিল, এবং নানা তর্কের পর স্থির হইল, আজ কাল গল্প লিখিয়া প্রতিশোধ লইবার 'ফ্যাশান' চলিত হইয়াছে, অতএব গল্প লিখিয়া এবং তাহা কোনও মাসিকপত্রে প্রচার করিয়া

৪

পূর্ব্ব অধ্যায়ে যে দিনের কথা বলিতেছি, সেই দিন রাত্রি তিনটার পর গল্প লেখা সমাপ্ত হইয়া গেল। নায়িকা কুমারের পূর্ণবিকশিতযৌবনা সুন্দরী পত্নী; নায়ক সংসারস্রোতে বিক্ষিপ্ত বিপন্ন বিধ্বস্ত যৌবনের ভগ্নতরী—আমি স্বয়ং। গল্পের চুম্বক এই:—কৈশোরের এক পুণ্য শুভক্ষণে গল্পের এই নায়িকার সংস্পর্শে আমি আসিয়া পড়ি, এবং কিছু কাল যাবৎ পরস্পরের মনের ভাব ব্যক্ত করিয়া জানাইবার উপায় না থাকিলেও, অব্যক্ত প্রেমের মহিমায় আমাদের ক্ষুদ্র হৃদয় যে দিন দিন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল, সহজাত-সংস্কারের বলে তাহার পরিচয় পাইয়া সন্তুষ্ট থাকি। ঠিক এমন সময়ে সংসারস্রোত কোথা হইতে কোন অদৃশ্য পথে বিপুল-বিক্রমে হঠাৎ আসিয়া আমাদের ভাসাইয়া লইয়া গেল, এবং জীবন-নদীর দুই বিপরীত কূলে 'দু' জনকে ফেলিয়া দিল। ইহার বহু বৎসর পরে, সুখদুঃখপূর্ণ উৎসাহময় বহু বিচিত্র ঘটনার অবসানে, অকস্মাৎ এক দিন আমার এই কৈশোরজীবনের নিয়ন্ত্রী অধীশ্বরীকে লীলাময়ী বিদ্যুল্লেখার ন্যায় কুমারের গৃহিণী-রূপে প্রতিভাত দেখিলাম। এবং সেই ক্ষণিকার তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল মুহূর্ত্তমাত্রস্থায়ী আলোকরশ্মিতে তাহার পদ্মপলাশ-সুকুমার অথচ জ্বালাময় নেত্রে দুই বিন্দু অশ্রুও যেন দেখিলাম বলিয়া বোধ হইল। সেও আমায় দেখিয়াছিল। যে ক্ষণিকার ক্ষণ-স্থায়ী আলোকে আবার যুগান্ত পরে আমাদের নয়নে নয়নে মিলন হইয়া দৃষ্টি ফিরিয়া আসিয়াছিল, মুহূর্ত্তের মধ্যে বাহিরের বায়ুমণ্ডল হইতে সে আলো সরিয়া গেল বটে, কিন্তু তাহার বৈদ্যুতিক প্রভাব দুই হৃদয়ে পুরাতন কালের সেই সুপ্ত জ্বালা স্থায়ী করিয়া জাগাইয়া রাখিল। কৃত্রিম ঘটনাবলীর সমাবেশে অকাট্য ন্যায়ের আকারে প্রমাণ করিলাম, কুমারের ধর্ম্মপত্নী তাহার সহধর্ম্মিণী হইলেও কেবল একমাত্র আমারই হৃদয়ের অধীশ্বরী। এবং আবশ্যক হইলে সত্য ন্যায় ধর্ম্মের খাতিরে তাহার বিবাহিত জীবনের কর্ত্তব্য রমণীজীবনের নিষ্ঠা অটুট রাখিয়াও সে যে তাহা স্বীকার করিতে পারে, এমন দুষ্ট ইঙ্গিতও গল্পের মধ্যে ছিল।

৫

গল্প সমাপ্ত হইলে বন্ধুমহলে মহা আনন্দ পড়িয়া গেল। ভাষার পারিপাট্যে, কৃত্রিম ভাবের অকৃত্রিম উৎসে, রসবৈচিত্র্যে ও বিচিত্র ঘটনাপরম্পরার সমাবেশে গল্পটি নিখুঁত হইয়াছে, বন্ধুমণ্ডলী এইরূপ মত প্রকাশ করিয়া আমায় আপ্যায়িত করিলেন। বিশেষতঃ, আমাদের উদ্দেশ্যসাধনের পক্ষে গল্পের দাম নাই বলিলেও

হয়, এমন কথাও বলিলেন। তখন বুঝি নাই যে, বিস্তর দামে এই গল্পের ক্রয় বিক্রয় সাধিত হইতে চলিয়াছিল। যাহা হউক, কুমারকে নাকাল করিবার আগে তাহাকে একটা অবসর দেওয়া গেল,—যদি সে এখনও আমাদের প্রস্তাবে সম্মত হয়। গল্প পড়াইয়া কুমারকে শোনান হইল। আমাদের প্রস্তাবে সম্মত হওয়া দূরের কথা, সে বরং গল্পটি বিলক্ষণ উপভোগ করিল, এবং বলিল, "তোমার লেখা ত পয়সা না দিলে ছাপিবে না, অতএব এস, চাঁদা ক'রে সে টাকাটা তোলা যাক; এই আমি দু' টাকা দিয়া চাঁদার খাতা খুলিলাম।" আমি হাসিলাম বটে, কিন্তু কুমারকে জব্দ করিবার প্রবৃত্তি অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিল।

৬

সেই মাসেরই "—"এ গল্প ছাপা হইয়া গেল। কাগজ তখনও বাহির হয় নাই, শেষ ফর্ম্মা ছাপা হইতেছে। আমার গল্পের শেষ অংশটাও এই ফর্ম্মায় পড়িয়াছে। শেষ প্রুফ দেখিয়া দিবার জন্য সে ফর্ম্মা আমার টেবিলে তখনও পড়িয়া আছে। কুমার আসিয়া তাহা দেখিল। তখন তাহার পরিহাসের ভাব চলিয়া গিয়াছে। গল্প যাহাতে না ছাপা হয়, তাহার জন্য আমায় অত্যন্ত জেদ করিতে লাগিল। অন্ততঃ তাহার নামের ও পরিচয়জ্ঞাপক অবস্থাবলীর যে উল্লেখ আছে, তাহার পরিবর্ত্তন করিয়া বাহির করিবার জন্য যদি বিশ পঞ্চাশ টাকা খরচ হয়, তাও সে রাজী আছে, এমন কথাও বলিল। কিন্তু তখন আর কোনও উপায় নাই। ম্যানেজারের উপর ভার দিয়া সম্পাদক পূজার ছুটীতে দেরাদুন চলিয়া গেছেন। ম্যানেজার সম্পাদকের আজ্ঞা না পাইলে কিছুতেই পরিবর্ত্তন করিতে রাজী হইল না। সুতরাং 'প্রি-পেড' আর্জেণ্ট টেলিগ্রাম করিলাম। কিন্তু সম্পাদক তখন দেরাদুন পরিত্যাগ করিয়াছেন। আবার টেলিগ্রাম করিলাম। একে পূজার সংখ্যা, তাহাতে পত্রিকা-প্রকাশের অনেক বিলম্ব হইয়া গিয়াছে, সুতরাং ম্যানেজার ছাপিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িল। যাহা হউক, এবার উত্তর আসিল, "কেবল-নায়ক নায়িকার নামের পরিবর্ত্তন করিয়া ছাপ।" গাড়ী ভাড়া, কাগজ, ছাপা প্রভৃতি করিয়া এই উপলক্ষে কুমারের প্রায় ২৫৲।২৬৲ টাকা খরচ হইয়া গেল। কুমারেরই বা বলি কেন, সে টাকা আমারই গেল। কেন না, কুমার তখন আমার নিকট হইতে তাহা ধার লইয়াছিল, এ পর্য্যন্ত আর তাহা ফিরিয়া পাই নাই।

৭

যদি শুধু এই টাকা কয়টার উপর দিয়া যাইত, তাহা হইলেও বাঁচিতাম। কিন্তু মানুষে গড়ে, ভগবান ভাঙ্গেন। আমরাও ভাবিলাম, যা হউক, কুমারকে খুব জব্দ

করা গিয়াছে। কিন্তু ভবিতব্যতা যে কুমারের সাহায্যে আমাদের গুরুতররূপে জব্দ করিবার জন্য ফাঁদ পাতিতেছিল, সে কথা তখন কে সন্দেহ করিয়াছিল?

বিশু বাবুদের বাড়ী আজকাল পাশার আড্ডা খুব জমিয়াছে। সেখান থেকে ফিরিতে প্রায়ই রাত্রি এগারটা, এবং কোন কোন দিন বারটা একটাও হয়। যে লোক বইয়ের পোকা হ'য়ে বাড়ীতেই অষ্টপ্রহর পড়িয়া থাকিত, তার পক্ষে এরূপ আচরণ অধঃপাতে যাইবার লক্ষণই বটে। সুতরাং মধ্যে মধ্যে আমাকে স্ত্রীর শাসন সহ্য করিতে হইত। বিশু বাবুদের বাড়ী দরজীপাড়ায়।

তখন গ্রীষ্মকাল। রাত্রি প্রায় দশটা। সেই 'দান'টা খেলেই সে দিন ওঠা হবে—মস্ত রোকের খেলা। আমার পোয়া বারোর আড়ি মারার উপর সমস্ত খেলাটা—অর্থাৎ আমাদের পক্ষের জিৎ নির্ভর করিতেছে। দর্শকবৃন্দ, বিশেষ আমার সহযোগী কাৎটি দম বন্ধ করিয়া উদ্‌গ্রীব হইয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখিতেছেন—আমার হাত থেকে কি দান পড়ে। "কথা কও পাশা! পোহা বারো-ও!" বলে আমি ছক ফেলেছি, এবং পোহা বারোই পড়েছে দেখে খুব একটা অট্টরোল উঠেছে, এমন সময় কুমারদের বাড়ীর সরকার তাড়াতাড়ি এসে বিশু বাবুকে ডাকিয়া বলিল, "মশায়! সর্ব্বনাশ হয়েছে, এখুনি চলুন, রাঙা বউমা বিষ খেয়েছেন।" রাঙা বউ কুমারের স্ত্রী। উক্ত সরকার আমাদের বাড়ীতেও গিয়াছিল, এবং সেখানে আমার দেখা না পাইয়া বিশুদের বাড়ীতে আসিয়াছে। আমরা ত যে যে অবস্থায় ছিলাম, সেই অবস্থায় উঠিয়া পড়িলাম।

পম্প দিবার আগেই বমি করান হইয়াছিল, এবং বিষপানের অল্পক্ষণের মধ্যেই ধরা পড়ায় বিশেষ কিছু অনিষ্ট হইল না। প্রতিষেধক ঔষধের গুণে বিপদের আশঙ্কা একেবারেই তিরোহিত হইয়া গেল। ঘাম দিয়া যেন আমার জ্বর ছাড়িল।

শেষ রাত্রে কুমার বলিল, "আর ভয় নাই।"

আমরা বাড়ী ফিরিব বলিয়া উঠিলাম। কুমার আমাদের সঙ্গে গলির মোড় অবধি আসিল, আমাকে একান্তে ডাকিয়া বলিল, "তোমার বাড়ীতে টাকা আছে? শ' তিনেক টাকা পাঠাইয়া দিতে পার?"

সৌভাগ্যক্রমে সেই দিন বাড়ীভাড়ার টাকা আদায় হইয়াছিল। বাড়ীতে পঁহুছিয়াই কুমারকে তিন শত টাকা পাঠাইয়া দিলাম।

৮

তিন দিন পরে কুমার আমাদের নিমন্ত্রণ করিল। বলিতে কি, নিমন্ত্রণ পাইয়া আমি অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়িলাম। দুই দিন পূর্ব্বে কুমারের গৃহে

যে প্রলয়কাণ্ড উপস্থিত হইয়াছিল, আমিই তাহার মূল। লজ্জায় ক্ষোভে অনুতাপে আমার মনে শান্তি ছিল না। এ অবস্থায় কুমারের নিমন্ত্রণ 'কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে'র মত বোধ হইতে লাগিল।

বিশুকে সব বলিলাম। কিন্তু সে ছাড়িবার পাত্র নয়। অম্লানবদনে হাসিতে হাসিতে বলিল, "গতস্য শোচনা নাস্তি। চল!"

আমি বলিলাম, "বল কি? আমি যাইতে পারিব না।"

অবশেষে বিশু আমাকে জোর করিয়া টানিয়া লইয়া গেল।

আহারান্তে কুমার আমাকে বলিল, "লেখক-চূড়ামণি! এই নাও তোমার ফর্দ্দ।"

আমি সবিস্ময়ে বলিলাম, "ফর্দ্দ?"

কুমার বলিল, "যে রাত্রে তোমরা আমার বাড়ীতে বিষবৃক্ষের অভিনয় দেখিয়া যাও,—যদিও সে দিন আমার স্ত্রী তাঁহার বাপের বাড়ীতে সুস্থ-শরীরে বিরাজ করিতেছিলেন,—সেই রাত্রে তুমি তিন শত টাকা পাঠাও, মনে নাই?"

আমি বলিলাম, "তার পর?"

কুমার বলিল, "আড়াই শত টাকায় আমার স্ত্রীর জন্য ব্রেসলেট কিনিয়াছি,—তোমার বহুদিনের সখ। বাকী পঞ্চাশ টাকার মধ্যে আজিকার আয়োজনে ছাব্বিশ টাকা দশ আনা মুদ্রালীলা সংবরণ করিয়াছে। অবশিষ্ট টাকা কয়েকটির শ্রাদ্ধ যদি আজই করিতে চাও ত ষ্টার থিয়েটারে চল,—বিষ-বৃক্ষ দেখিয়া আসি!"

অট্টহাস্যের রোলে আর কিছু আমার কর্ণগোচর হইল না। কুমার পকেট হইতে একটি মরক্কো-মণ্ডিত বাক্স বাহির করিল;—বিশু বাক্সটি কাড়িয়া লইয়া খুলিয়া ফেলিল। হাসিতে হাসিতে বলিল, "বাহবা! আবার কি লেখা দেখিতেছ যে—"

আমি আলোর কাছে বসিয়াছিলাম,—বিশু আমার হাতে ব্রেসলেট দিয়া বলিল,—"দেখ ত পড়ে—"

আমি আলোয় ধরিয়া পড়িলাম,—"গল্পের দাম।"

বিদেশী গল্প।

কথা রাখা।

বহু শতাব্দী পূর্ব্বে আকানা তাহার পালিত ভাই হাসেবের নিকট বিদায় লইবার সময়ে বলিল, "আমি শরতের প্রারম্ভেই ফিরিব।"

সময় বসন্তকাল। স্থান হারিমা প্রদেশের কাটো নামক গ্রাম। আকানা ইজুমো প্রদেশের সামুরাই ; * সে জন্মভূমি দেখিবার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিতেছিল।

হাসেবে বলিল,—"তোমার ইজুমো—সেই আট মেঘের দেশ †—অনেক দূর। সেই জন্য হয় ত তোমার ফিরিয়া আসিবার কোন বিশেষ দিন স্থির করিয়া বলা কঠিন হইবে। কিন্তু ঠিক দিন জানিতে পারিলে আমাদের মন আরও ভাল থাকিত। আমরা তাহা হইলে তোমার অভ্যর্থনার জন্য ভাল খাওয়া দাওয়ার আয়োজন করিতে পারিতাম্ ; আর দুয়ারের কাছে দাঁড়াইয়া তোমার পথ চাহিয়া থাকিতে পারিতাম।"

আকানা উত্তর করিল, "তাহা যদি বল, বেড়ান আমার এত অভ্যাস আছে যে, আমি প্রায়ই পূর্ব্ব হইতে বলিতে পারি, কোন্ জায়গায় পঁহুছিতে কত দিন লাগিবে। অতএব আমি অনায়াসে কোনও বিশেষ দিনে এখানে ফিরিবার অঙ্গীকার করিতে পারি। ধর, কোয়ো উৎসবের দিন স্থির করা যাইতে পারে।"

হাসেবে বলিল, "সে ত নবম মাসের নবম দিন। তখন চন্দ্রমল্লিকাগুলি ফুটিবে, আমরা এক সঙ্গে তাহা দেখিয়া বেড়াইব—কি চমৎকার! তাহা হইলে তুমি নবম মাসের নবম দিনে আসিবার অঙ্গীকার করিতেছ ?"

"নবম মাসের নবম দিনে" পুনরায় এই কথা বলিয়া আকানা হাসিমুখে বিদায় লইয়া পদব্রজে হারিমা প্রদেশের কাটো গ্রাম হইতে চলিয়া গেল—এবং হাসেবে ও তাহার মা ছল-ছল-নেত্রে তাহার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

একটি অতি পুরাতন জাপানী প্রবাদ আছে যে, পথিমধ্যে চন্দ্রসূর্য্যের গতি কখনও রুদ্ধ হয় না। অতি দ্রুতবেগে মাসের পর মাস চলিয়া গেল ; শরৎকাল—চন্দ্রমল্লিকার কাল উপস্থিত হইল। এবং নবম মাসের নবম দিনের প্রত্যূষে হাসেবে তাহার পালিত ভ্রাতার অভ্যর্থনার আয়োজন করিতে লাগিল। সে উত্তম ব্যঞ্জনের ভোজ প্রস্তুত করাইল, মদিরা আনিল, অতিথিগৃহ সাজাইয়া কুলঙ্গীর মধ্যের ফুলদানীগুলি দুই রঙের চন্দ্রমল্লিকায় ভরিয়া দিল।

তাহার মা তাহাকে দেখিতে দেখিতে বলিয়া উঠিল, "ইজুমো প্রদেশ, বাছা, এখান হইতে এক শ' রীর ‡ উপর হইবে। আর সেখান থেকে পাহাড়ের উপর দিয়া যে পথে আসিতে হয়,

---

* জাপানের ক্ষত্রিয়-সম্প্রদায়ের নাম। † ইজুমো প্রদেশের একটি চলিত নাম।

‡ এক 'রী' এক ক্রোশের কিঞ্চিদধিক।

তাহা দুর্গম ও কষ্টসাধ্য। আকানা আজ আসিতে পারিবে কি না, বলা যায় না এত হাঙ্গাম করিবার আগে, সে আসে কি না, দেখা ভাল নয় কি ?"

প্রত্যুত্তরে হাসেবে বলিল, "না, মা। আকানা আজ আসিবে কথা দিয়া গিয়াছে—সে কথা রাখিবেই! আর যদি সে দেখে যে, সে আসিবার পর আমরা আয়োজন আরম্ভ করিতেছি, তাহা হইলে সে বুঝিবে যে, আমরা তাহার কথায় সন্দেহ করিয়াছিলাম—আমরা বড় লজ্জা পাইব।"

সে দিনটি অতি সুন্দর, আকাশ মেঘশূন্য, বায়ু এত নির্ম্মল যে, জগতের পরিসর যেন সহস্র ক্রোশ বাড়িয়া গিয়াছে। সকাল বেলা অনেক পথিক গ্রামের মধ্য দিয়া চলিয়া গেল—তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ সামুরাই। আর হাসেবে এক এক জনকে দেখে আর মনে করে, ঐ বুঝি আকানা আসিতেছে। কিন্তু মন্দিরের মধ্যাহ্ন-ঘণ্টা বাজিতে লাগিল—তবুও আকানা দেখা দিল না। বেলার শেষ পর্য্যন্ত হাসেবে পথ চাহিয়া বৃথা অপেক্ষা করিয়া রহিল। সূর্য্য অস্ত গেল—তবুও আকানার চিহ্নমাত্র নাই। তাহা সত্বেও হাসেবে রাস্তার পানে চাহিয়া দরজার ধারেই পড়িয়া রহিল।

কিছু ক্ষণ পরে তাহার মা নিকটে আসিয়া বলিলেন, "আমাদের কথায় বলে, বাছা, যে, মানুষের মন শরতের আকাশের মত সর্ব্বদাই বদলায়। তোমার চন্দ্রমল্লিকাগুলি ত কাল পর্য্যন্ত টাট্‌কা থাকিবে। এখন একটু ঘুমাইয়া লইলে ভাল হয়। ইচ্ছা হয়, কাল সকালে আবার আকানার পথ দেখিও।"

হাসেবে বলিল, "তুমি, মা, নিশ্চিন্তমনে বিশ্রাম কর। আমার এখনও বিশ্বাস যে, সে ঠিক আসিবে।"

তখন তাহার মা নিজের ঘরে চলিয়া গেলেন, আর হাসেবে পথের ধারে অপেক্ষা করিয়া রহিল।

দিনের মত রাত্রিও নির্ম্মল। আকাশ তারায় ধুক্ ধুক্ করিতেছে, এবং স্বর্গের শ্বেত নদী অপূর্ব্ব আভায় ঝিকমিক করিতেছে। গ্রামটি প্রসুপ্ত। কেবল একটি ক্ষুদ্র তটিনীর কল্লোলে এবং সুদূর কুক্কুরের ডাকে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হইতেছে। হাসেবে তখনও দুয়ারের গোড়ায়। যতক্ষণ না ক্ষীণ চন্দ্র আসপাশের পাহাড়ের পশ্চাতে ডুবিয়া গেল, ততক্ষণ সে অপেক্ষা করিল। অবশেষে তাহার মনে সন্দেহ ও ভয় প্রবেশ করিল। সে বাড়ীর ভিতর ফিরিব ফিরিব করিতেছে, এমন সময় দেখিতে পাইল, দূরে একটি দীর্ঘকায় লোক আসিতেছে—তাহার গতি দ্রুত ও লঘু। পর মুহূর্ত্তেই সে আকানাকে চিনিতে পারিল।

"এই যে!" বলিয়া হাসেবে ব্যগ্রভাবে তাহার দিকে ধাবিত হইয়া কহিতে লাগিল, "আমি সকাল হইতে এখন পর্য্যন্ত তোমার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছি! যাহা হউক, অবশেষে তুমি কথা ঠিক রাখিয়াছ। কিন্তু ভাই! তুমি নিশ্চয়ই বড় শ্রান্ত হইয়াছ। আহা! ঘরে এস। তোমার জন্য সব প্রস্তুত।"

সে আকানাকে পথ দেখাইয়া অতিথিগৃহে লইয়া চলিল, এবং ত্বরায় নির্ব্বাপিতপ্রায় প্রদীপগুলি উস্কাইয়া দিল। তাহার পর পুনরায় বলিতে লাগিল, "সন্ধ্যার পর মার একটু শ্রান্তি বোধ হইতেছিল; তাই তিনি ইহার মধ্যেই শুইতে গিয়াছেন। কিন্তু আমি এখনই তাঁহাকে জাগাইয়া দিতেছি।"

আকানা মাথা নাড়িয়া ইঙ্গিতে অসম্মতি প্রকাশ করিল। হাসেবে "তোমার যেমন ইচ্ছা" এই কথা বলিয়া গরম খাবার ও মদিরা পথশ্রান্ত আকানার সম্মুখে রাখিল। কিন্তু আকানা আহার বা পানীয় স্পর্শ না করিয়া কিছুক্ষণ মৌন ও স্তব্ধ হইয়া রহিল।

অনন্তর যেন মার ঘুম ভাঙ্গাইবার ভয়ে আকানা অস্ফুটস্বরে বলিতে লাগিল,—

"আমার আসিবার এত বিলম্ব হইবার কারণ বলি, শোন! আমি ইজুমো দেশে ফিরিয়া গিয়া দেখি, সেখানকার লোকে আমাদের পূর্ব্বপ্রভু এন্যা-রাজের সুশাসন ভুলিয়া গিয়াছে, এবং যে সুনেহিসা বলপূর্ব্বক তোন্দা প্রাসাদ বেদখল করিয়া রহিয়াছে, তাহারই খোসামোদ করিতেছে। আমার এক ভাই তাহারই অধীনতা স্বীকার করিয়া, তাহার অনুচর-রূপে সেই প্রাসাদের সীমানার মধ্যে বাস করিতেছে—কাজেই আমাকেও সেখানে যাইতে হইল। ভাইয়ের অনুরোধে আমি সুনেহিসার সহিত সাক্ষাৎ করিতে স্বীকৃত হইলাম। আমি তাহাকে পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই, তাই তাহার প্রকৃতি অবগত হইবার নিমিত্তই আমি প্রধানতঃ ইহাতে সম্মত হইলাম। সে সুদক্ষ মহাপরাক্রান্ত যোদ্ধা, কিন্তু নিঠুর ও শঠ। আমি তাহাকে স্পষ্ট বলিতে বাধ্য হইলাম যে, আমি কিছুতেই তাহার আনুচর্য্য করিতে পারিব না। ফলতঃ আমি তাহার সম্মুখ হইতে চলিয়া আসিতেই সে আমার ভাইকে আদেশ করিল, যেন আমাকে প্রাসাদের মধ্যে আটক করিয়া রাখা হয়। আমি বারংবার আবেদন করিলাম যে, আমি নবম মাসের নবম দিনে গৃহে ফিরিতে প্রতিশ্রুত আছি, কিন্তু কিছুতেই আসিবার অনুমতি পাইলাম না। তখন এই মনে করিয়া আশ্বস্ত রহিলাম যে, হয় ত রাত্রিযোগে প্রাসাদ হইতে পলাইতে পারিব। কিন্তু আমার উপর সমস্তক্ষণ দৃষ্টি রাখা হইত। তাই আজকের আগে আমি কথা রাখিবার কোন উপায় করিতে পারি নাই।"......

হাসেবে বিস্মিত ও চমকিত হইয়া বলিয়া উঠিল, "আজকের আগে!—সে প্রাসাদ যে এখান হইতে এক শ' 'রী' উপর হইবে!"

আকানা বলিল, "তা বটে। কোন জীবিত ব্যক্তি এক দিনে এক শ' রী অতিক্রম করিতে পারে না। কিন্তু আমি মনে মনে বুঝিলাম যে, কথা রাখিতে না পারিলে আমার প্রতি তোমার আর শ্রদ্ধা থাকিবে না। আমার মনে পড়িল, একটি বহু পুরাতন বচন আছে যে, মানুষের আত্মা এক দিনে এক হাজার রী চলিতে পারে। ভাগ্যক্রমে আমার তলওয়ার কাড়িয়া লওয়া হয় নাই—সেই জন্যই আমি তোমার নিকট যথাসময়ে আসিতে সক্ষম হইয়াছি! ... মাকে ভাল করিয়া দেখিও।"

তখন হাসেবে বুঝিল যে, আকানা কথা রাখিবার নিমিত্ত আত্মহত্যা করিয়াছে। *

---

* জাপানী গল্প হইতে।

প্রকৃতির দর্পণ।

KUNTALINE PRESS.

চিত্রশালা।

জননী।

অতি প্রাচীন কাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত চিত্রকলা ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে; অর্থাৎ, চিত্রকরের কল্পনা ও তাঁহার সমকালীন ধর্ম্মবিশ্বাসের প্রকৃতি অনুসারে চিত্রকলার নানারূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এই কারণে, ম্যাডোনা বা মাতৃমূর্ত্তির অসংখ্য চিত্র আছে বটে, কিন্তু একখানি অন্যখানির অনুরূপ নয়।

বাইজান্টাইন (Byzantine) যুগের চিত্রকরদিগের ধারণা ছিল, ভক্তিবহুল অন্ধভাবের উচ্ছ্বসিত বিকাশ ব্যতিরেকে ম্যাডোনার আলেখ্য রচনা করিলে তাহা ব্যর্থ হইয়া থাকে। এ ধারণায় সারবত্তা কিছুই নাই। অধিকন্তু এই ধারণার ফলে উক্ত শ্রেণীর চিত্রকরের কল্পিত ম্যাডোনার যে সকল আলেখ্য রচিত হইয়াছে, তাহাদের অধিকাংশই সামঞ্জস্যহীন বিসদৃশভাবদুষ্ট। বর্ত্তমান চিত্রে আলেখ্যকার এই রহস্যপূর্ণ দেবত্বের ভাবকে পরিস্ফুট করিয়া তুলিবার বিশেষ চেষ্টা করেন নাই। সামঞ্জস্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া সমীচীনতার সহিত মানবমূর্ত্তিতে দেবভাব প্রতিফলিত করিতে পারিলে সেটুকু কেমন শোভনভাবে ফুটিয়া উঠিবার অবকাশ পায়, তাহাই দেখাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন। তাঁহার এ উদ্যম সফলও হইয়াছে। সুনিপুণ শিল্পীর রচিত মানব-জননীর এই আদর্শে, চিত্রাঙ্কিত এই স্নিগ্ধোজ্জ্বল পুণ্যপ্রভ মাতৃ-মুখশ্রীতে ও শিশুকে বক্ষে ধারণ করিবার ভঙ্গীর মধ্যে বিশ্বব্যাপী সুমহান সকরুণ সহজ মাতৃভাব যে নিবিড়ভাবে অন্তর্নিহিত রহিয়াছে; শিশুর ভীতি-বিহ্বল অথচ আশা-উজ্জ্বল পদ্মপলাশ নয়ন দুটিতে উন্মুক্ত উদার অনন্ত বিশ্বের সহিত আদর্শ শৈশবের প্রথম পরিচয়ের যে ভাব ফুটিয়া বাহির হইতেছে, তাহা দেখিলে মনে হয়, কষ্টকল্পিত অতিপ্রাকৃত দেবত্বকল্পনাকে মানব-শিল্পের সাহায্যে ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা বোধ করি সম্পূর্ণ সার্থকতা লাভ করিতে পারে না। মানবত্ব যদি দেবত্বের অন্যতম আংশিক বিকাশই হয়, তাহার চরম পরিণতি লাভ করিতে পারিলে দেবত্ব আপনা হইতেই আসিয়া পড়ে।

গষ্টেভ প্যাপারিট্জ্ এই সত্যের উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাই ম্যাডোনার চিত্র-রচনায় তিনি পুরাতন মামুলী ভাবের পরিবর্ত্তে এই অভিনব ভাবের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। জর্ম্মাণীতে ডেফ্রেগাড্ ও উদা, ফ্রান্সে বোগুরে ও বেরো, এবং আমেরিকায় থায়ারও ম্যাডোনা-মূর্ত্তির প্রাণপ্রতিষ্ঠায় এই ভাবেরই প্রয়োগ করিয়াছেন।

প্রকৃতির দর্পণ।

ফরাসী চিত্রকর পেরল্টের অঙ্কিত এই চিত্রের নাম প্রকৃতির দর্পণ। শৈশবের সুখ এত শীঘ্র অমন অনায়াসে ছায়ার মতন ভাসিয়া চলিয়া যায় কেন? শৈশবের পর যে জীবন আসে, তাহার সঙ্গে অভিজ্ঞতা, আশা, উদ্যম, কর্ম্মের অপরিমিত গতি—সকলই আসে, কেবল সেই

স্মৃতি, সেই আলো ও ছায়ার মিলনসম্ভূত বিচিত্র পবিত্র রশ্মি—যাহার স্পর্শে শৈশবের প্রভাত কনক-রৌদ্রে প্রতিভাত হইয়া উজ্জ্বল ও মধুর হইয়া উঠে, তাহাই আর ফিরিয়া আসে না—কেন?

ঐ যে বালিকা পদ-প্রান্তস্থিত হরিত শৈবাল শষ্পের ফ্রেমে আঁটা প্রকৃতির দর্পণখানিতে নিজের সুকুমার দেহলতাটি প্রতিবিম্বিত দেখিয়া হাস্যে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে, উহার ঐ হাসির সহিত জীবনের আর কোনও পর্য্যায়ের আর কোনও হাসির কি তুলনা হয়? সৃষ্টির প্রারম্ভে অনিন্দ্যসুন্দরী প্রথমমানবী ঈভ্ এক দিন প্রকৃতির এমনই আর একখানি দর্পণে এমনই করিয়া নিজের সেই অনুপম রূপরাশির প্রতিবিম্ব দেখিয়া বিস্মিত ও মোহিত হইয়া উঠিয়াছিলেন; কিন্তু এমন প্রশান্ত মধুর সন্তোষের পবিত্র হাসি তাঁহার সে বিম্বাধর উজ্জ্বল করে নাই। ধন্য সেই অমর শিল্পী, যিনি জীবনের বসন্তপ্রভাত এমন অমর করিয়া রাখিয়াছেন!

সহযোগী সাহিত্য।

জীবনচরিত।

ভাম্‌বেরী।

অধ্যাপক ভাম্‌বেরীর সপ্ততিতম জন্মতিথি উপলক্ষে মিঃ Louis Katschar 'রিভিউ অফ্ রিভিউস' পত্রে যে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছেন, সাহিত্যের পাঠকবর্গের জন্য নিম্নে আমরা তাহার অনুবাদ প্রকাশিত করিলাম।

লেখক বলেন,—১৮৯৫ সালে যখন কবি জোকাইয়ের সপ্ততিতম জন্মতিথি উপলক্ষে আনন্দ-প্রকাশ করি, তখন তিনি বলিয়াছিলেন, 'এক জন বৃদ্ধ হইয়া পড়িলে আর এক ব্যক্তির তাহাতে আনন্দ প্রকাশ করার পদ্ধতিটা বড় ভাল নহে।' আর এক জন হঙ্গেরী-দেশবাসীও কবির এই করুণরসাত্মক মতের পরিপোষক। ইনি অধ্যাপক ভাম্‌বেরী। এক কসথ্ ব্যতীত অপর কোনও হঙ্গেরীয়ানই ইংরাজিভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের নিকট এত অধিক পরিচিত নহেন। যে হঙ্গেরীর শান্তি-সমিতির তিনি সহকারী সভাপতি, সেই সমিতি হইতে তাঁহার সপ্ততিতম জন্মতিথি উপলক্ষে আনন্দ প্রকাশ করা হইলে, উত্তরে তিনি বেশ হৃষ্টচিত্তে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার বয়স যদি সত্তর না হইয়া চল্লিশ হইত, তাহা হইলে বড়ই ভাল হইত। ভাম্‌বেরীর পঞ্চচত্বারিংশত্তম জন্মতিথিতে তাঁহার সহিত আমার আলাপ হয়;—সুতরাং তাঁহার সহিত আমার পঁচিশ বৎসরের পরিচয়। পৃথিবীর যত প্রসিদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির সহিত আমার সৌভাগ্যক্রমে আলাপ হইয়াছে, তাহার মধ্যে ব্যক্তিগতভাবে অধ্যাপক ভাম্‌বেরী প্রধানতম ব্যক্তিগণের মধ্যে অন্যতম।

অসামান্য নির্ভীকতাই ভাম্‌বেরীর চরিত্রগত বিশেষত্বের মধ্যে প্রধান। তাঁহার মানসিক শক্তি এতই অধিক যে, ইহার বলে তিনি সত্য সত্যই খঞ্জত্ব হইতে আরোগ্যলাভ করিয়াছিলেন।

চারি বৎসর বয়স হইতে দশম বৎসর পর্য্যন্ত তিনি খঞ্জ-ব্যবহার্য্য লাঠির উপর ভর দিয়া চলিতেন;—মানসিক শক্তির বলে তিনি অবশেষে সেই যষ্টি ফেলিয়া দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। নিজের শারীরিক দুর্ব্বলতা ও বিদ্যালয়ের সহপাঠিগণের বিদ্রূপের হস্ত হইতে মুক্তিলাভের ইচ্ছায় প্রণোদিত হইয়া একদিন তিনি 'আর কখনও যষ্টি ব্যবহার করিব না' এইরূপ প্রতিজ্ঞা করেন। 'আমি যষ্টিগুলা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলাম ও স্বাধীনভাবে চলিবার চেষ্টা করিলাম। এই পরীক্ষা প্রথমে অত্যন্ত ভীতিপ্রদ হইয়াছিল, কিন্তু অবশেষে আমারই জয় হয়। পাছে ভবিষ্যতে পুনরায় যষ্টি ব্যবহার করিবার প্রলোভন জন্মে, এই আশঙ্কায় সেগুলাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলি। ঐ ভাঙ্গা টুকরাগুলার মধ্যে একটা পরে ছড়ির ন্যায় ব্যবহার করিতাম।' এই একাগ্রতার প্রভাবে ভবিষ্যতে তিনি অনেক অসমসাহসিক কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। তাঁহার অপেক্ষা অল্প বিচক্ষণ ও চতুর, এবং মহম্মদীয় আচার ব্যবহার ও জীবনযাপনপ্রণালী সম্বন্ধে অল্প অভিজ্ঞ যে কোনও য়ুরোপীয় ভ্রমণকারীর পক্ষে মধ্য এসিয়ায় ভ্রমণ যে সময়ে প্রায়ই মৃত্যুতে পরিণত হইত,—সেই সময়ে তিনি তথায় বহুবিস্তৃত প্রদেশে ভ্রমণ সম্পন্ন করিয়াছিলেন। ডাক্তার ই. জে. ডিলন ক্রীট্ দ্বীপে যেরূপ বিপদসঙ্কুল ছদ্মবেশ ধারণ করিয়াছিলেন, তিনিও সেইরূপ দরবেশের ছদ্মবেশে আপনাকে এরূপ সুন্দরভাবে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, সকলেই তাঁহাকে মহম্মদের এক জন বিশিষ্ট শিষ্য বলিয়া মনে করিত। বস্তুতঃ তিনি জাতিতে য়িহুদী ও ধর্ম্মে ক্রিশ্চিয়ান। ছদ্মবেশে তিনি কত দুর কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, তাহা একটি ঘটনায় বেশ প্রমাণিত হয়। প্রায় ১৫ বৎসর পূর্ব্বে মধ্যএসিয়াবাসী জনৈক লেখক তাতার ভাষায় একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। উক্ত পুস্তিকায় তিনি ভাম্‌বেরীর কয়েক জন তাতার বন্ধুর হইয়া এই কথার সমর্থন করিয়াছেন যে, ভাম্‌বেরী 'কাফের' নহেন। তিনি আরও বলেন যে, ভাম্‌বেরী খাঁটি মুসলমান ও 'কাফের'দিগের নিকট আপনাকে ক্রিশ্চিয়ান বলিয়া পরিচিত করেন, তাহা কেবল তাহাদিগকে চতুরভাবে প্রতারিত করিবার জন্য!

কিন্তু আমীর ইয়াকুব খাঁ এ বিষয়ে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার সহিত এ সকল মতের সামঞ্জস্য হয় না। দরবেশী পরিচ্ছদে ভূষিত ভাম্‌বেরী কোনও সময়ে হিরাটের রাজ-দরবারে উপস্থিত ছিলেন। সেই সময় তৎকালীন আমীর ইয়াকুব খাঁ তাঁহাকে নির্দ্দেশ করিয়া বলেন, 'আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি, তুমি ইংরাজ।' এই জন্য বলিতে হইবে, তিনি শেষে ধরা পড়িয়াছিলেন;—কিন্তু তিনি শেষে সহচর দরবেশগণের মনোমধ্যে অঙ্কুরিত সন্দেহবীজ বিনষ্ট করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু ইয়াকুব খাঁ কেন এরূপ দৃঢ়ভাবে তাঁহার জাতি-নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, তাহা তিনি কিছুতেই জানিতে পারেন নাই। অবশেষে সার রবার্ট ওয়ারবর্টনের নবপ্রকাশিত 'খাইবারে আঠার বৎসর' নামক গ্রন্থপাঠে তাঁহার সন্দেহ নিরাকৃত হয়। ঐ গ্রন্থের ৮৯।৯০ পৃষ্ঠায় এই বিবরটি বেশ মনোরমভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এক দিন ইয়াকুব খাঁর সহিত সাক্ষাৎ হইলে সার রবার্ট তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনি কিরূপে ভাম্‌বেরীকে ইংরাজ স্থির করিয়াছিলেন।' উত্তরে আমীর যে কারণ নির্দ্দেশ করেন, তাহা অত্যন্ত সহজ। যে দিন দরবার হয়, সেই দিন আমীর দরবেশরূপী ভাম্‌বেরীকে দেখিয়াই

করিয়াছিলেন। 'কোনও প্রাচ্যদেশবাসীই এরূপ করিত না; সেই জন্যই আমি বুঝিতে পারি, ইনি ছদ্মবেশী ইংরাজ; কিন্তু তিনি অস্বীকার করায় আমি আর বেশী জেদ করি নাই।'

স্বদেশে—এবং শুধু স্বদেশেই,—কারণ 'গেঁয়ো যোগী ভিক্ পায় না'—এই প্রসিদ্ধ ভ্রমণ-কারীর সম্বন্ধে সকলে বলিত যে, তিনি বাস্তবিক কখনও মধ্য এসিয়ায় গমন করেন নাই, এবং ভাম্‌বেরীর 'মধ্য এসিয়ায় ভ্রমণ' নামক পুস্তকে বিবৃত ঘটনাবলী গ্রন্থকারের অবারিত মস্তিষ্ক-চালনার ফলমাত্র। তাঁহার জনৈক 'ভক্ত' একবার এই অপবাদের বেশ উত্তর দিয়াছিলেন,—'ভাল, তিনি যদি কখনও সে দেশে না যাইয়া থাকেন, তাহা হইলে তৎকালে অজ্ঞাত ঐ দেশ-সমূহের এমন অবিকল ও সত্য চিত্র অঙ্কিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন বলিয়া তাঁহার আরও বেশী প্রশংসা করা উচিত।' কিন্তু তাঁহার ভ্রমণ সম্বন্ধে যদি কোনও প্রমাণের আবশ্যক হয়, তাহা হইলে আমীর ইয়াকুবের সহিত সার রবার্টের কথোপকথনই সে বিষয়ে পর্য্যাপ্ত। 'মধ্য এসি-য়ায় ভ্রমণ' প্রকাশিত হইলে তদ্দেশবাসী কয়েক জন মান্য গণ্য ব্যক্তি বলেন, ভাম্‌বেরী যে য়ুরোপীয়ান, তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু তথাপি তাঁহাকে বধ করা হয় নাই কেন, এ কথার উত্তরে তাঁহারা বলেন যে, সমস্ত কোরাণ তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল, সেই জন্যই মহম্মদীয় আইনের এক বিশেষ বিধান অনুসারে তিনি মৃত্যুদণ্ড হইতে অব্যাহতি পাইয়াছিলেন।

স্ত্রীপুরুষনির্ব্বিশেষে পৃথিবীর প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের সহিত ভাম্‌বেরীর পরিচয় ও হৃদ্যতা যেরূপ, তাহা অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তিরই আছে। পরলোকগতা রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া তাঁহাকে বিশেষ সম্মান করিতেন; আবার তুর্কির শেষ তিন সুলতান ও পারস্যের শেষ দুই শাহের সহিত তাঁহার ব্যক্তিগত হৃদ্যতা তাঁহার সেইরূপ কুযশের কারণ। রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার ন্যায় বেলজিয়মের রাজা ও আমাদের বর্ত্তমান সম্রাট এড্‌ওয়ার্ডও তাঁহাকে সম্মান করেন। এ স্থলে আমি বেলজিয়মের রাজা দ্বিতীয় লিওপোল্ডের হইয়া একটি গোপনীয় বিষয় ব্যক্ত,—অথবা গোপনীয় বিষয়ই বা কেন, যে জটিল প্রশ্নের মীমাংসা করিতে অসমর্থ হইয়া কয়েক বৎসর পূর্ব্বে জার্ম্মাণগণ হৃদয়ে জ্বালা অনুভব ও মস্তিষ্কের বৃথা পরিচালনা করিয়াছিল, সেই প্রশ্নের যথার্থ উত্তর প্রদান করিতে পারি। জেমীসনের উৎপাত বিফল হইয়া গেলে জার্ম্মা-ণীর সম্রাট উইল্‌হেল্‌ম্ প্রেসিডেণ্ট ক্রুগারকে আনন্দজ্ঞাপক অভিনন্দন প্রেরণ করেন। তাহার পরেই, ১৮৯৬ সালের ১৬ই জুন তারিখের টাইম্‌স্ পত্রে, 'এক জন বিদেশী' স্বাক্ষরিত একখানি পত্র প্রকাশিত হয়। পত্রখানি ইংরাজের পক্ষে জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে লিখিত হইয়াছিল। উক্ত পত্রের ফলে য়ুরোপীয় সাময়িক-মহলে খুব উত্তেজনা দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল; এবং সকলে দ্বিতীয় লিওপোল্ডকেই ঐ পত্রের লেখক স্থির করিয়া লইয়াছিলেন। রাজা যে ঐ পত্রের লেখক নহেন, তাহা প্রকাশ্যভাবে ঘোষিত হইয়াছিল; কিন্তু প্রকৃত লোকের নাম কেহই জানিতে পারেন নাই। হঙ্গেরী দেশবাসী এই প্রসিদ্ধ অধ্যাপকই ঐ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন;—তিনি মধ্যে মধ্যে 'টাইম্‌সে' লিখিয়া থাকেন।

অধ্যাপক ভাম্‌বেরী সম্প্রতি তাঁহার 'আত্মকথা ও স্মৃতিকাহিনী' শেষ করিয়াছেন। এই গ্রন্থগুলি কতই চিত্তাকর্ষক পূর্ব্বস্মৃতি ও সুন্দর গল্পের অমূল্য ভাণ্ডার! কিন্তু তাঁহার জীবনসময়ের মধ্যে গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইবে কি না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে;—কারণ

বিস্‌মার্কের দিনলিপির ন্যায় ইহাতেও আপাততঃ প্রকাশের অযোগ্য অনেক ব্যক্তিগত বিষয় লিখিত হইয়াছে। ইংরাজিশিক্ষিত ব্যক্তিগণ আপাততঃ 'আরমেনীয়স্‌ ভাম্‌বেরী, তাঁহার জীবনবৃত্ত ও বিপদসঙ্কুল কাহিনী, — স্বকথিত' পাঠ করিয়া আনন্দলাভ করিতে পারেন। বার তের বৎসর পূর্ব্বে পুস্তকখানির অনেক সংস্করণ হইয়াছিল। এই পুস্তকের প্রচার এতই অধিক যে, অধ্যাপকের জীবন সম্বন্ধে কোনও কথা বলা একবারেই নিষ্প্রয়োজন। বিবিধ দেশ সম্বন্ধে ও প্রায় বারটি ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি থাকায় তাঁহার প্রকৃতিতে যে অদম্য আন্তর্জাতিকতার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা থাকা সত্বেও, ইংলণ্ড ও ইংরাজ, এবং তুরুষ্ক ও তুর্কিগণের উপর তাঁহার একটা বিশেষ টান আছে। হঙ্গেরীর ন্যায় ইংলণ্ড ও তুরুষ্ককেও তিনি স্বীয় মাতৃভূমির ন্যায় জ্ঞান করেন। সৌভাগ্যের বিষয়, এক্ষণে তিনি আপনাকে পূর্ব্বাপেক্ষা সুস্থ ও বলবান বলিয়া মনে করেন। অধ্যাপক বলেন, এই স্বাস্থ্য তাঁহার সরল-জীবনযাপন-প্রণালী ও ঠিক নিয়মপালনের ফল। প্রকাশ্য ভোজ প্রভৃতি ধুমধামে তিনি অত্যন্ত বিরক্ত, এই জন্যই তিনি সকলকে তাঁহার সপ্ততিতম জন্মতিথি উপলক্ষে প্রকাশ্য উৎসব করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। উপাধি ও বৈদেশিক সম্মানচিহ্ন প্রভৃতির প্রতি তাঁহার বিরক্তি এই নম্রতারই অনুরূপ। তিনি এক জন স্পষ্টবক্তা প্রজাতন্ত্রী ;—যদিও অপরাপর ব্যক্তির তুলনায় আত্মম্ভরিতা তাঁহার পক্ষে শোভনতর হইত, তথাপি তাঁহার আত্মম্ভরিতার অভাবের ইহাই প্রধান কারণ। জীবিকানির্ব্বাহের জন্য যে ময়দার বস্তা বহন করিত, সেই খোঁড়া দরিদ্র বালকের অবস্থা হইতে তিনি যে আপনাকে এক জন বিশ্ববিশ্রুত পরিব্রাজক, পণ্ডিত ও ক্ষমতাশালী বিত্তবান রাজনীতিজ্ঞে উন্নীত করিয়াছেন, এই জন্য তাঁহার একটু দম্ভ আছে ;—এমন কি, এ জন্য তিনি বিশেষ গর্ব্বিত।

বিবিধ।

কোরিয়া ও কোরিয়ার সম্রাট।

গত শরৎকালে মিঃ আলফ্রেড ষ্টেড সস্ত্রীক কোরিয়ার রাজধানী সিউয়েল নগরে গমন করিয়াছিলেন। গত মার্চ্চ মাসের 'হার্পারস্‌ ম্যাগাজিন' নামক পত্রে তিনি এ বিষয়ে একটি মনোরম প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। সম্রাট ও যুবরাজের প্রতিকৃতি, প্রাসাদের বিভিন্ন দৃশ্যাবলী প্রভৃতিতে প্রবন্ধটি সুশোভিত। কোরিয়ার রাজধানীটি সুন্দর, কিন্তু অত্যন্ত আবর্জ্জনাময়। মিঃ ষ্টেডের মতে যুবরাজ তেমন বুদ্ধিমান নহেন ; কিন্তু সম্রাট বিলক্ষণ চতুর ; সহজে বিদেশীয় পরিব্রাজকগণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে সম্মত হয়েন না। প্রাতে ৪ টার সময় সহরের পথসমূহ রাজকীয় রণবাদ্যের ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হয় ; সেই শব্দে নগরবাসিগণ শয্যা হইতে উত্থিত হন ;—কিন্তু স্বয়ং রাজা (ইঁহার নাম Lsi-ti) সেই সময় নিদ্রার্থ শয্যাশায়ী হন। ইনি মধ্যবয়স্ক ও কিঞ্চিৎ স্থূলকায়। অপরাহ্ণের প্রায় শেষ সময়ে তিনি অভ্যাগতগণের সহিত সাক্ষাৎ করেন। সম্রাট ও যুবরাজ বেশ সহৃদয় ; করকম্পনের সহিত ইংরাজ অতিথিগণের অভ্যর্থনা করেন। যে কক্ষটি অভ্যর্থনার্থ ব্যবহৃত হয়, তাহা জাঁকাল নহে। মিষ্টার ষ্টেড কক্ষটির যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা তাহার অনুবাদ করিয়া দিলাম।—'একটি কাষ্ঠনির্ম্মিত ক্ষুদ্র চতুষ্কোণ কক্ষের ধারণা করিয়া লও।

কক্ষপ্রাচীর নিকৃষ্ট ফরাসী কাগজে মণ্ডিত, ছাদটি চুণকাম করা, মেজেতে উজ্জ্বল লাল ও নীল বর্ণের কার্পেট ও কাচের জানালাগুলির উপর স্থূলভদর্শন লেসের পর্দ্দা। এবং সাধারণতঃ অপ্রীতিকর সাজ সজ্জার উপর, সম্রাটের পশ্চাতে গৃহপ্রাচীরে লম্বিত খুব সস্তায় বাঁধান দুইটি ক্রমো।'

অভ্যর্থনার বিষয় মিঃ ষ্টেড এইরূপ লিখিয়াছেন।—'দ্বারের বিপরীত দিকের এক ধারে শেষ সীমায় সম্রাট একটি টেবিলের অপর দিকে দণ্ডায়মান ছিলেন;—তাঁহার বামপার্শ্বে যুবরাজ। এক ভীষণদৃশ্য আচ্ছাদন ব্যতীত টেবিলটির আর কোনও অলঙ্কার ছিল না। সম্রাট একটি পীতবর্ণ ঢিলা পরিচ্ছদে ভূষিত ছিলেন। পরিচ্ছদটির বক্ষোদেশে সূচীকৃত জরির দুইটি সুন্দর ড্রেগন। রাজকীয় বক্ষোবন্ধ স্বর্ণময়, তাহাতে অস্বচ্ছ পীত প্রস্তর সন্নিবিষ্ট; সমস্তটা সম্রাটের বক্ষ হইতে কয়েক ইঞ্চি ঠেলিয়া উঠিয়াছে। গ্রীষ্মকালে পরিচ্ছদ যাহাতে ত্বক্ স্পর্শ করিতে না পারে, সেই জন্য সম্রাট তদ্দেশপ্রচলিত বংশনির্ম্মিত এক প্রকার আবরণী বাহু, বক্ষ ও পৃষ্ঠদেশে পরিধান করেন। এই সকল কারণেই, তিনি বস্তুতঃ যত স্থূল না হউন, তাঁহাকে তদপেক্ষা স্থূল বলিয়া বোধ হয়। দুইটি স্তরে সজ্জিত একটি গাঢ় রক্তবর্ণের সূক্ষ্মবস্ত্রই রাজকীয় শিরস্ত্রাণ।'

সম্রাট মিষ্টার ষ্টেডের সহিত বেশ সদ্ব্যবহার ও এক জন দ্বিভাষীর সাহায্যে আগামী অভিষেক সম্বন্ধে কথোপকথন করিয়াছিলেন। সন্ধ্যার সময় অতিথিগণ ভোজে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন, এবং তাঁহাদের আনন্দবর্দ্ধনের জন্য নর্ত্তকীগণ উপস্থিত ছিল। এই নর্ত্তকীদের রূপমাধুর্য্য অতিথিদের তেমন ভাল লাগে নাই। ভোজের সময় যুবরাজ পর্দ্দার মধ্য হইতে উঁকি মারিতেছিলেন।

কোরিয়ার দরবার অনুগ্রহপ্রার্থী লোকে কলঙ্কিত। য়ুরোপীয়গণ সর্ব্বদাই সুবিধালাভের জন্য ব্যস্ত। এক জন ইংরাজ কর্ম্মচারীর কর্ম্মঠতা কেমন সুফল প্রসব করিয়াছিল, মিঃ ষ্টেড তাহার এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন;—'এক জন ইংরাজ কর্ম্মচারীর কোরিয়ায় মৃত্যু হইলে, দরবারে এইরূপ স্থির হয়, (ভগবান জানেন কেন!) তাঁহার বিধবা পত্নীকে ক্ষতিপূরণস্বরূপ কিছু দেওয়া উচিত। সেই জন্য মৃত ইংরাজের পত্নীর একটা মাহিনা স্থির করিয়া তাঁহাকে যুবরাজের শিক্ষয়িত্রী-পদে নিযুক্ত করা হয়। এইরূপ শুনা যায় যে, তাঁহার বৎসরত্রয়ব্যাপী কার্য্যকালের মধ্যে তিনি যুবরাজকে কখনও শিষ্য-রূপে দর্শন করেন নাই! তথাপি তাঁহার চাকুরীর সময় আর তিন বৎসর বাড়িয়া গিয়াছে।'

কোরিয়ার প্রচলিত প্রবাদ সম্বন্ধে মিঃ ষ্টেড বলেন;—'কোরিয়ায় একটি প্রবাদ আছে যে, যখন পুক হান (Pouk Han) নামক পর্ব্বতের শেষ বৃক্ষটি পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইবে, তখন কোরিয়ারও দিন শেষ হইয়া আসিয়াছে, জানিতে হইবে। এই পর্ব্বতের নিকট রাজার নূতন প্রাসাদ;—প্রাচীন প্রাসাদটি এখান হইতে কিয়দ্দূরে অবস্থিত। উক্ত প্রবাদের ফলে, পুক হান পর্ব্বতে কেহ কাঠ কাটিতে পায় না,—কাটিলে তাহার প্রাণদণ্ড হয়। এখনও অনেক বৃক্ষ জীবিত আছে, তবে পর্ব্বতের শিরোদেশে জীর্ণ শীর্ণ একটিমাত্র বৃক্ষ বিজনে দণ্ডায়মান;—তাহাতেই লোকের মনে এইরূপ সংস্কার হইয়াছে যে, এই ভবিষ্যৎবাণী সফল হইবার আর বিলম্ব নাই।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

ভারতী। চৈত্র। শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের "পূর্ণতা" নামক ক্ষুদ্র কবিতাটির বক্তব্য কি, বুঝিতে পারিলাম না। "লেলিহ রসনা" কি "লেলিহান রসনার" অপভ্রংশ? "পুরী—সমুদ্রতটে" শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহের রচনা। উৎকল-চিত্রের নবীনতা ক্রমে উপিয়া যাইতেছে। লেখক ক্রমাগত জল ঢালিয়া রসের প্রগাঢ়তা নষ্ট করিতেছেন, সুতরাং 'পান্‌সে' হইয়া পড়িতেছে। শ্রীযুক্ত পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "শান্তি ও সংগ্রাম" প্রবন্ধের উপসংহার এই,—"চীন ও ভারতবর্ষ দুই দেশই সম্প্রতি বিদেশের সংঘর্ষে আসিয়াছে। দুই দেশেই তদ্দরুণ [সংস্কৃত ও চলিত শব্দের এরূপ অপরূপ খিচুড়ী বা ভীষণ সমাস ভাষায় প্রার্থনীয় কি?] প্রাচীন রীতি নীতি ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন, এই দুই দেশেরই প্রাচীন শান্তিপ্রবণতা পরিত্যাগ করিয়া পাশ্চাত্য সংগ্রামশীলতা অবলম্বন ভিন্ন গত্যন্তর নাই।" দেখিতেছি, প্রাচীন চীন 'পাশ্চাত্য সংগ্রামশীলতায়' দীক্ষিত হইতেছে; কিন্তু উদাসীন স্বার্থমগ্ন ভারতবর্ষের যোগনিদ্রা কখনও ভাঙ্গিবে কি? শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় "লিখনসৃষ্টির ইতিহাসে" গবেষণার পরিচয় দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত ধর্ম্মানন্দ মহাভারতীর "হিন্দুর ভাবী দশা" বোধ করি এই সংখ্যায় সমাপ্ত হইল। মহাভারতী বলিতেছেন,—"হিন্দুর ভাবী দশার মূর্ত্তি এখনও আশাময়ী।" মেঘদূতে পড়িয়াছি, আশা-বন্ধঃ কুসুমসদৃশং প্রায়শোহঙ্গনানাং সদ্যঃপাতি প্রণয়ি হৃদয়ং বিপ্রয়োগে রুণদ্ধি! শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র ঘোষের "মুঙ্গের" প্রবন্ধে নূতন কথার অভাব। "ইংলণ্ড, ব্রিটিশ উপনিবেশ ও ভারতবর্ষ" নামক প্রবন্ধটি সময়োপযোগী বটে। "ব্রাহ্মণ কি খ্রীষ্ট," নামক উপাদেয় প্রবন্ধে লেখকের নাম নাই। কিন্তু চিন্তাপ্রণালী ও রচনার ভঙ্গী যে চির-পরিচিত,—লুকাইবার উপায় নাই। ইহাই চৈত্রের ভারতীর একমাত্র উল্লেখযোগ্য রচনা। লেখকের চিন্তাশীলতা ও অভিজ্ঞতার ফলে রচনাটি পরিপূর্ণ। "ব্রাহ্মণ ও খ্রীষ্টের" অনুশীলন করিলে পাঠক উপকৃত হইবেন। বাঙ্গালা দেশের চিন্তাশীলসমাজে "ব্রাহ্মণ ও খ্রীষ্টের" আলোচনা হইলে প্রভূত মঙ্গলের সম্ভাবনা ছিল;—কিন্তু দেখিতেছি লেখকের ও আমাদের সে আশা পূর্ণ হইল না।

প্রবাসী। ফাল্গুন ও চৈত্র। শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায়ের "প্রাণী ও উদ্ভিদ" একটি চলনসই বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ। ভাষার জটিলতায় রচনাটির অঙ্গহানি হইয়াছে।—"প্রস্তরখণ্ডের শক্তি তাহার উচ্চাবস্থানে এবং তৃণের সৌর-শক্তি তাহার দেহস্থ অঙ্গার ও হাইড্রোজেনের পৃথক ও মুক্ত অবস্থানে গূঢ়াবস্থায় থাকে," ইত্যাদি বাঙ্গালা বুঝিবার জন্ম পাঠককে অনেকটা মানবী শক্তির প্রয়োগ করিতে হয়,—কিন্তু তাহার অনুরূপ ফললাভ হয় কি? বুদ্ধির ব্যায়াম মন্দ নহে, কিন্তু কেবল পাঠককে গলদঘর্ম্ম করিবার জন্ম বৈজ্ঞানিক রচনা আবশ্যক কি? শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেনের "রাধাভাব" দেখিয়া আনন্দলাভ করিলাম। দীনেশ বাবুও কণ্টক-সঙ্কুল ভাষার 'বেড়া' দিয়া ভাবগুলিকে সযত্নে লুকাইয়া রাখিয়াছেন! দীনেশ বাবু বলেন,—"এই প্রেমের রূপক রাধা,—বৈষ্ণব-কবিগণাঙ্কিত রাধা একটি সাত্ত্বিক ভাবের ইতিহাস; ইহা কাব্যের চরিত্র নহে।" অন্যত্র—"এ রাধিকা চৈতন্যদেবের ছায়া,—এবং ঈশ্বরপ্রেমের পবিত্র কথার

সুপবিত্র। আমরা অন্য ভাবে পদাবলী পড়িতে পারি না।" কিন্তু "পহিল বদরী সম পুন নবরঙ্গ" প্রভৃতি পদাবলীও কি ঈশ্বরপ্রেমের উচ্ছ্বাস? এই শ্রেণীর পদাবলীও কি দীনেশ বাবু অন্য ভাবে পড়িতে পারেন না? পদাবলীর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা অসম্ভব না হইতে পারে, কিন্তু "বৈষ্ণব-কবিগণাঙ্কিত" রাধামাত্রই কি 'সাত্ত্বিক ভাবের ইতিহাস?" অন্ধ গোঁড়ামি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য, বিশেষতঃ সাহিত্যে। বিশাল পদাবলী সাহিত্যে সাধারণ নায়ক নায়িকার ভাব আদৌ নাই, তাহার আদ্যোপান্তই আধ্যাত্মিক,—কোনও চক্ষুষ্মান পাঠক তাহা স্বীকার করিবেন না। শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ দাস "সাহিত্য-সেবা" প্রবন্ধের উপসংহারে বলিতেছেন,—"যাহারা দেব-মন্দিরের শান্তি ভঙ্গ করে তাহারা যেমন দণ্ডনীয়, সাহিত্যের দেব-মন্দিরে উচ্চ আরাধনার কথা ভুলিয়া গিয়া যাহারা স্বার্থপ্রণোদিত হইয়া সত্যের অপলাপ করে, তাহারাও তেমনই তিরস্কৃত হইবার উপযুক্ত।" কিন্তু বৈদ্য মহাশয়েরা যে নিজের রোগের চিকিৎসা করিতে চান না, তাহার কি? "ফতেপুর—সিক্রি" একটি চলনসই রচনা। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের "ঐতিহাসিক যৎকিঞ্চিৎ" বেশ হইতেছে। শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদারের "মৃচ্ছকটিকের প্রাচীনতা" উল্লেখযোগ্য। লেখক বলেন;—মৃচ্ছকটিক 'অপেক্ষাকৃত আধুনিক।' কিন্তু এই অভিনব মতের অনুকূলে তিনি যে চারিটি প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছেন, পুরাতন মতের নিরাসকল্পে তাহাই পর্য্যাপ্ত নহে। আশা করি, বিজয় বাবু এ বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া নূতন সিদ্ধান্তের পথ সুগম করিয়া দিবেন। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়ের "বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গ" আনন্দ ও শিক্ষার আধার। "প্রেমলীলায়" বিশেষত্ব নাই। "উত্তরপশ্চিম প্রদেশ, অযোধ্যা ও পঞ্জাবে বাঙ্গালী" নামক সুবিস্তৃত প্রবন্ধে অনেক সংবাদ আছে।—এই ধরণের আর একটি রচনা শ্রীযুক্ত সত্যসুন্দর বসুর "বিহারী বাঙ্গালী"। সত্যসুন্দর বাবুর লিপিকৌশলে "বিহারে বাঙ্গালী" সুপাঠ্য হইয়াছে, পূর্ব্বোক্ত রচনায় তাহার একান্ত অভাব।

প্রদীপ। চৈত্র। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচীর "প্রদীপ" নামক কবিতাটি পড়িয়া 'চেরাগের নীচেই অন্ধকার' প্রবাদটি মনে পড়িতেছে। শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গুপ্ত "কাশী-নাথ" নামক একটি গল্প লিখিতেছেন। ক্ষেত্রবাবু সুপ্রসিদ্ধ প্রবীণ লেখক—রচনাভঙ্গীতে তাঁহার সহি মোহরের ছাপও বিরল নহে;—কিন্তু সসঙ্কোচে বলিতে হইতেছে,—কাশীনাথে আপাততঃ গল্পত্ব বড় অল্প। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের "ডিরোজিও" প্রবন্ধে সংগ্রহ-পটুতার পরিচয় আছে; লেখক কাঠামো করিয়াছেন, কিন্তু রঙ্গ ফলান নাই। বর্ত্তমান যুগে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সুলিখিত রচনার অত্যন্ত দুর্ভিক্ষ। ভাবিয়া চিন্তিয়া লিখিবার, ঘষিয়া মাজিয়া সুন্দর করিবার প্রবৃত্তি অধিকাংশ লেখকের আদৌ নাই। অযত্নকল্পিত প্রবন্ধে পত্র পূর্ণ হয় বটে, কিন্তু তাহাতে ভাষার সৌন্দর্য্য বা সম্পদের পুষ্টি হয় না। শ্রীযুক্ত ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়ের "হাস্যরসের রচনাই" এবারকার 'প্রদীপের' তেল শলিতা। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল আচার্য্যের সঙ্কলিত "নাগপূজাও" উল্লেখযোগ্য সংগ্রহ। এবারকার "প্রদীপের" প্রবন্ধভাগ্য যাহাই হউক, চিত্রভাগ্য সুপ্রসন্ন, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই! কিন্তু 'প্রদীপ'-পাঠকের গৃহে প্রদীপ-শিখার অভাব নাই ত?

স্নেহময়ী।

KUNTALINE PRESS.

গীতায় ঈশ্বরবাদ।

১। ভূমিকা।

গীতা অতি অপূর্ব্ব গ্রন্থ। জগতের সাহিত্যে ইহার সমান উৎকৃষ্ট ও উপাদেয় গ্রন্থ আর দ্বিতীয় নাই। গীতার আয়তন বৃহৎ নহে; ইহাতে ৭০০ মাত্র শ্লোক, তথাপি গীতা সর্ব্বধর্ম্মের সার, সকল শাস্ত্রের সার। যেমন সমুদ্র মন্থন করিয়া অমৃত উৎপন্ন হইয়াছিল, তেমনই শাস্ত্রসমুদ্র মথিত হইয়া এই গীতামৃতের উদ্ভব হইয়াছে। সেই জন্যই কথিত হয়,

গীতা সুগীতা কর্ত্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ।

"গীতা সুগীতা করা উচিত; অন্য বিস্তর শাস্ত্রে প্রয়োজন কি?"

গীতার একটি বিশেষত্ব—ইহার সার্ব্বভৌমতা। গীতায় সাম্প্রদায়িকতা বা সঙ্কীর্ণতার লেশমাত্র নাই। সেই জন্য সকল শ্রেণীর দার্শনিক, সকল সম্প্রদায়ের সাধক গীতাকে সমান আদরের চক্ষে দেখেন। গীতা বিশ্বতোমুখ গ্রন্থ। কি জ্ঞানী, কি কর্ম্মী; কি যোগী, কি ভক্ত; সকলের পক্ষে গীতা তুল্য উপাদেয়।

এরূপ হইবার কারণ—গীতার ব্যঞ্জনা শক্তি (১)। গীতায় সকল সার সত্যের সমাবেশ দৃষ্ট হয়। গীতা সত্যের সূর্য্যস্বরূপ। সূর্য্যে সকল বর্ণের সমন্বয় আছে (২)। সেই জন্য যে ফুল যে বর্ণ প্রতিফলিত করিতে পারে, সূর্য্যকিরণে সে ফুল সেই বর্ণ ধারণ করে। সূর্য্য যদি সকল বর্ণের সমন্বয় না হইয়া, নীল, পীত, বা হরিৎ হইতেন, তবে ভিন্ন রঙ্গের পুষ্প সে আলোকে প্রকাশিত হইত না। সেইরূপ গীতা যদি সকল সার সত্যের সমন্বয় না করিয়া, সত্যের একদেশ বা অংশমাত্র প্রকটিত করিতেন, তবে ভিন্নমতাবলম্বী সাধক অথবা দার্শনিক, গীতা হইতে স্ব স্ব তৃপ্তিজনক বা পুষ্টিকর কোন উপাদান সংগ্রহ করিতে পারিতেন না।

দেশে ও বিদেশে এই গীতাগ্রন্থ নানাভাবে, নানারূপে আলোচিত হইয়াছে; কিন্তু আমার বিশ্বাস, গীতা সম্বন্ধে চরম কথা এখনও বলা হয় নাই। কারণ, যে গ্রন্থ সম্বন্ধে উক্তি আছে যে,

ব্যাসো বেত্তি ন বেত্তি বা

"ব্যাসদেব হয় ত জানেন, কিংবা তিনিও জানেন না," সেই গ্রন্থের রহস্যো-

(১) ইংরাজীতে যাহাকে suggestiveness বলে।

(২) সূর্য্য সপ্তাশ্ব; নীল, পীত, লোহিত প্রভৃতি সপ্ত মূল বর্ণ (Prismatic colours) তাঁহার বাহন।

দ্ঘাটন মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত নহে। কারণ, আমরা গীতার শুভ্রজ্যোতিঃ দৃষ্টিগোচরে আনিতে পারি না। নিজ নিজ শিক্ষা ও সংস্কারের বশে গীতাকে রঙ্গিল কাচের মধ্য দিয়া দেখি; তাহার ফলে গীতার শুভ্রজ্যোতিঃ রঞ্জিত হইয়া আমাদের চক্ষে প্রতিভাত হয়। আমার চক্ষের উপরও সেই রঙ্গিল কাচ রহিয়াছে; অতএব আমি যে গীতার মর্ম্মোদ্ঘাটন করিতে পারিব, সে দুরাশা করি না।

এ দেশে বহুদিন হইতে নানা দর্শনশাস্ত্র প্রচলিত আছে। ধীমান্ পণ্ডিতগণ বুদ্ধির দ্বারা সত্যনির্ণয় করিবার প্রয়াস করিয়াছেন। আধুনিক পণ্ডিতগণও দৃঢ়তার সহিত ঐ পথে চলিতেছেন। তাঁহারা কোন কালে গন্তব্য স্থানে পঁহুছিতে পারিবেন কি না, সন্দেহের বিষয়। কারণ, সত্যনির্ণয়ের পথ এ নহে। দার্শনিকের সম্বল তর্ক; তর্কের ফল বাদ, জল্প, বিতণ্ডা, কলহ ইত্যাদি। তর্কের দ্বারা কখনই সত্যনির্ণয় হয় না। শ্রুতি বলিয়াছেন,

নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া।

"তর্কের দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা যায় না।" ভগবান্ বাদরায়ণও ব্রহ্মসূত্রে তর্কের অপ্রতিষ্ঠা খ্যাপন করিয়াছেন। (৩)

ইহার ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন, লোকে বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া যে তর্ক উত্থাপন করে, সে তর্কের প্রতিষ্ঠা নাই। কারণ, এক বুদ্ধিমানের অনুমোদিত তর্ক, অপর বুদ্ধিমান্ নিরাস করেন। পক্ষান্তরে, তাঁহার তর্কও তৃতীয় বুদ্ধিমান্ কর্ত্তৃক খণ্ডিত হয়। অতএব তর্কের শেষ কোথায়? (৪)

সেই জন্য শাস্ত্রকারদিগের উপদেশ এই, অচিন্ত্য চরম তত্ত্বের বিচারস্থলে তর্কের প্রয়োগ করিবে না। (৫)

ঋষিদিগের অনুমোদিত সত্যনির্ণয়ের প্রণালী দর্শনের প্রণালী হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সে প্রণালীর নাম—শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন। চরম সত্য সকল (যাহাদিগকে হার্বার্ট স্পেন্সার অজ্ঞেয়ের কোটাতে ফেলিয়াছেন) প্রত্যক্ষ অথবা অনুমানের বিষয় নহে। আমাদের এরূপ কোন ইন্দ্রিয় নাই, যাহার দ্বারা আমরা চরম সত্যকে প্রত্যক্ষ করিতে পারি। অনুমান প্রত্যক্ষমূলক। আমাদের সাধ্য নাই যে, আমরা

---

(৩) তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদপ্যন্যথাঽনুমেয়মিতি চেদেবমপ্যবিমোক্ষপ্রসঙ্গঃ॥—ব্রহ্মসূত্র; ২।১।১১॥

(৪) নিরাগমাঃ পুরুষোৎপ্রেক্ষামাত্রনিবন্ধনাস্তর্কা অপ্রতিষ্ঠিতা ভবন্তি। উৎপ্রেক্ষায়া নিরঙ্কুশত্বাৎ। তথাহি কৈশ্চিদভিযুক্তৈর্যত্নেনোৎপ্রেক্ষিতাস্তর্কা অভিযুক্ততরৈরন্যৈরাভাস্যমানা দৃশ্যন্তে। তৈরপ্যুৎপ্রেক্ষিতাঃ সন্তস্ততোঽন্যৈরাভাস্যন্ত ইতি ন প্রতিষ্ঠিতত্বং তর্কানাং শক্যমাশ্রয়িতুং পুরুষমতিবৈরূপ্যাৎ॥—ঐ সূত্রের শঙ্করভাষ্য॥

(৫) অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেন যোজয়েৎ॥

তর্ক ও যুক্তি দ্বারা চরম সত্যের অবধারণ করিব। অতএব, চরম সত্যনির্ণয়ের একমাত্র প্রমাণ আপ্তবাক্য। আপ্ত অর্থে ভ্রমপ্রমাদশূন্য পুরুষ,—যিনি তত্ত্বদৃষ্টি দ্বারা চরমসত্যের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন। তাঁহার উপদেশই আপ্তবাক্য। ঋষিরা আপ্ত; সেই জন্য তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত শ্রুতি, স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্র চরম সত্যনির্ণয়ের একমাত্র প্রমাণ। সেই শাস্ত্রবাক্য "শ্রবণ" করিতে হইবে, এবং সেই সকল বাক্যের পরস্পর সমন্বয় করিয়া "মনন" করিতে হইবে; পরে তৎসম্বন্ধে একান্ত একাগ্রচিত্তে ধ্যান ("নিদিধ্যাসন") করিতে হইবে। তবেই সত্যনির্ণয় হইবে। ইহাই ঋষিদিগের অনুমোদিত সত্যনির্ণয়ের প্রণালী।

শ্রোতব্যঃ শ্রুতিবাক্যেভ্যো মন্তব্যশ্চোপপত্তিভিঃ।
মত্বা চ সততং ধ্যেয় এতে দর্শনহেতবঃ॥

"শ্রুতিবাক্য শ্রবণ করিবে। যুক্তির (৬) দ্বারা মনন করিবে। পরে সতত ধ্যান করিবে। এইরূপে সত্যের দর্শনলাভ হয়।"

এই প্রস্তাবে আমি যথাসাধ্য ঐ প্রণালীর অনুসরণ করিতে চেষ্টা করিব। কারণ, আমার বিশ্বাস যে, গীতার প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইলে কেবল তর্ক যুক্তির দ্বারা হইবে না। গীতা শ্রদ্ধাসহকারে শ্রবণ করিয়া তাহার অর্থ মনন করিতে হইবে, এবং পরে একাগ্র ও নিবিষ্ট হইয়া তাহার মর্ম্ম নিদিধ্যাসন করিতে হইবে। তবেই কথঞ্চিৎ গীতার সার সত্য আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইব।

গীতা ও ষড়্দর্শনের সম্বন্ধ।

এ দেশের মুখ্য দর্শন ছয়টি। ন্যায় ও বৈশেষিক, সাংখ্য ও পাতঞ্জল, এবং পূর্ব্বমীমাংসা ও উত্তরমীমাংসা (বেদান্ত)। সকল দর্শনেরই ভিত্তি দুঃখবাদ। সকল দর্শনকারেরই সিদ্ধান্ত এই যে, সংসার দুঃখের আলয়—কেবল দুঃখবহুল নহে, দুঃখময়। যেটুকু সুখ আছে, তাহা শুধু ক্ষণস্থায়ী এমন নহে, তাহা দুঃখের পূর্ব্বরূপমাত্র। গীতাও এ কথার অনুমোদন করিয়াছেন। গীতাও সংসারকে অশাশ্বত (ক্ষণভঙ্গুর) ও দুঃখালয় বলিয়াছেন। (৭)

(৬) যুক্তি অর্থে কেবল তর্ক নহে। ভগবান্ মনু বলিয়াছেন,

আর্ষং ধর্ম্মোপদেশং চ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা।
যস্তর্কেণানুসন্ধত্তে স ধর্ম্মং বেদ নেতরঃ॥

অর্থাৎ, "যিনি শাস্ত্রের অবিরোধী তর্ক দ্বারা শাস্ত্রোপদেশ বুঝিতে চেষ্টা করেন, তিনিই সত্যনির্ণয় করিতে পারেন। অপরে পারে না।"

(৭) পুনর্জন্ম দুঃখালয়ম অশাশ্বতং। গীতা ৮।১৫।

এই দুঃখবাদেই দর্শনের আরম্ভ। এবং এই দুঃখহানির উপায়উদ্ভাবনের জন্যই দর্শনশাস্ত্রের প্রয়োজন (৮)। ভিন্ন ভিন্ন দর্শনশাস্ত্র এই দুঃখহানির জন্য ভিন্ন ভিন্ন উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। যথাস্থানে তাহার আলোচনা করিব।

দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা করিলে এই ধারণা ক্রমশঃ বদ্ধমূল হয় যে, তাহাদের মধ্যে কি একটা অসম্পূর্ণতা, কি একটা অভাব রহিয়া গিয়াছে। আর গীতা ঈশ্বরবাদের অবতারণা করিয়া সেই অভাবের পূরণ করিয়াছেন, সেই অসম্পূর্ণতার মোচন করিয়াছেন। যেমন দেখা যায় যে, কোন একটি রাসায়নিক দ্রবে (Chemical Solution) অনেকগুলি দ্রব্যের সমাবেশ সত্ত্বেও কোন মতে দানা (Crystal) বাঁধিতেছে না, কিন্তু যদি তাহাতে একটি বিশেষ বস্তুর সংযোগ করা যায়, তবে তখনই অতি সুন্দর দানা বাঁধে; সেইরূপ দর্শনশাস্ত্রে অনেক চিন্তা, বিচার ও গবেষণা থাকিলেও তাহার অসম্পূর্ণতা দূর হয় নাই, কিন্তু গীতা ঈশ্বরবাদ-রূপ অপূর্ব্ব বস্তুর সংযোগ করিয়া অনায়াসে দর্শনশাস্ত্রকে সুসম্পূর্ণ করিয়াছেন।

২। ন্যায় ও গীতা।

ন্যায় ও বৈশেষিক এক শ্রেণীর দর্শন। ন্যায় প্রধানতঃ লজিক (Logic); ইহার বিশেষত্ব পঞ্চাবয়ব ন্যায় বা syllogismএর প্রতিপাদন। বৈশেষিকের বিশেষত্ব পরমাণুবাদে; তাঁহার মতে পরমাণু নিত্য পদার্থ। পরমাণু, কিন্তু, বস্তুতঃ অনিত্য। ইহা সাংখ্যদর্শনের তন্মাত্রমাত্র। যেখানে ন্যায় বৈশেষিকের শেষ, সেখানেই প্রকৃত দর্শনের আরম্ভ। সেই জন্য বিদ্যারণ্যমুনি তৈত্তিরীয় উপনিষদের দীপিকায় লিখিয়াছেন, মূলকারণ পরব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন আকাশ, কাল, দিক্ ও পরমাণু স্থাপিত হইবার পর তাহাদের উত্তরকালীন যে সৃষ্টি, তাহাই গোতমাদির প্রদর্শিত প্রণালীতে স্থাপিত হইবে। (৯)

ন্যায়দর্শনের ভিত্তি মহর্ষি গোতম প্রণীত ন্যায়সূত্র। ইহা পাঁচ অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রত্যেক অধ্যায়ের দুই পরিচ্ছেদ। ইহাদিগকে আহ্নিক বলে। ন্যায়দর্শনের বাৎস্যা-

(৮) The aim of all Indian philosophy was the removal of suffering, which was caused by nescience * * * * * The principal systems of philosophy in India start from the conviction that the world is full of suffering and that this suffering should be accounted for and removed. —Max Muller's Indian Philosophy; p. 140.

(৯) মূলকারণাৎ পরব্রহ্মণ উৎপন্না আকাশকালদিশঃ পরমাণবশ্চ যদা ব্যবস্থিতাঃ তদা তত আরভ্য উত্তরকালীনা সৃষ্টিঃ গৌতমাদ্যুক্তপ্রকারেণ ব্যবতিষ্ঠতাম্।

য়ন-প্রণীত প্রসিদ্ধ ভাষ্য আছে। তাহার উপর উদ্যোতকরের ন্যায়বার্ত্তিক, বাচস্পতি মিশ্রের তাৎপর্য্য-টীকা ও উদয়নাচার্য্যের তাৎপর্য্য-পরিশুদ্ধি প্রচলিত আছে।

ন্যায়দর্শনের মতে সংসার দুঃখময়। সুখও দুঃখানুষক্ত, অতএব গৌণরূপে সুখও দুঃখ বলিয়া পরিগণিত। জন্মিলেই দুঃখ। যদি দুঃখের নাশ করিতে হয়, তবে জন্মের বারণ করিতে হইবে। জন্মের হেতু প্রবৃত্তি। জীব প্রবৃত্তির বশে কর্ম্ম করে; তাহারই ফলে তাহাকে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। প্রবৃত্তির হেতু কি? দোষ। আসক্তি, বিদ্বেষ, অথবা প্রমাদ দোষ ভিন্ন কোন বিষয়ে জীবের প্রবৃত্তি হয় না। এই রাগ, দ্বেষ ও মোহ, মিথ্যাজ্ঞান হইতে উৎপন্ন। অতএব এই মিথ্যাজ্ঞানের উচ্ছেদসাধন করিতে না পারিলে দুঃখনিবৃত্তির উপায় হইবে না।

দুঃখ জন্ম-প্রবৃত্তি-দোষ-মিথ্যাজ্ঞানানাম্
উত্তরোত্তরাঽপায়ে তদনন্তরাপায়াদ্ অপবর্গঃ।—ন্যায়; ১।২ (১০)।

তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা মিথ্যাজ্ঞানের নাশ হয়। অতএব তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারিলে জীব নিঃশ্রেয়স বা অপবর্গ (মুক্তি) লাভ করে। ন্যায়দর্শনের উদ্দেশ্য—এই তত্ত্বজ্ঞান জীবকে প্রদান করা। কিসের তত্ত্বজ্ঞান? ন্যায়দর্শনের উত্তর এই যে, প্রমাণ, প্রমেয়, সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত, অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়, বাদ, জল্প, বিতণ্ডা, হেত্বাভাস, ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থান, এই ১৬ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান। তন্মধ্যে প্রমেয়ের তত্ত্বজ্ঞান স্বতঃ এবং প্রমাণাদির তত্ত্বজ্ঞান পরতঃ অপবর্গের হেতু। অপবর্গ অর্থে আত্যন্তিক দুঃখনাশ। (প্রথম অধ্যায়, ১ সূত্র।)

ন্যায়দর্শনের অভিমত এই ষোড়শ পদার্থের স্বরূপ কি? (১) প্রমাণ=প্রমার সাধনের নাম প্রমাণ (Means of knowledge)। প্রমাণ চারি প্রকার;—প্রত্যক্ষ (perception), অনুমান (inference), উপমান (Analogy) ও শব্দ (আপ্তবাক্য)। (২) প্রমেয়=প্রমাণের বিষয় (Objects of knowledge); প্রমেয় দ্বাদশপ্রকার;—আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি), অর্থ (ইন্দ্রিয়ের বিষয় ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, বায়ু ও আকাশের সংযোগে যথাক্রমে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ), বুদ্ধি, মন, প্রবৃত্তি (activity), দোষ (রাগ, দ্বেষ, মোহ), প্রেত্যভাব (পুনর্জ্জন্ম), ফল (কর্ম্মফলভোগ) দুঃখ ও অপবর্গ। (৩) সংশয় (doubt)। (৪) প্রয়োজন (purpose)—যে উদ্দেশে লোকের প্রবৃত্তি হয়, তাহার নাম প্রয়ো-

(১০) ইহার ভাষ্যে বাৎস্যায়ন লিখিয়াছেন, "যদা তু তত্ত্বজ্ঞানাৎ মিথ্যাজ্ঞানম্ অপযাতি তদা মিথ্যাজ্ঞানাপায়ে দোষা অপয়ান্তি দোষাপায়ে প্রবৃত্তিরপয়াতি প্রবৃত্ত্যপায়ে জন্ম অপয়াতি জন্মাপায়ে দুঃখম্ অপয়াতি। দুঃখাপায়ে চাত্যন্তিকোঽপবর্গো নিঃশ্রেয়সমিতি॥"

জন। (৫) দৃষ্টান্ত (instance)। (৬) সিদ্ধান্ত=বিষয়ের নিশ্চয়। (৭) অবয়ব=ন্যায়ের একদেশ (premiss)। (৮) তর্ক (reasoning)। (৯) নির্ণয়=পর-পক্ষ-দূষণ ও স্ব-পক্ষ-স্থাপন দ্বারা অর্থের নিশ্চয় (conclusion)। (১০) বাদ (argumentation)। (১১) জল্প (sophistry)। (১২) বিতণ্ডা (wrangling)। (১৩) হেত্বাভাস (fallacies)। (১৪) ছল (quibble)। (১৫) জাতি (false analogy)। (১৬) নিগ্রহস্থান—যদ্দ্বারা বিবাদীর বিপ্রতিপত্তি (mistake) বা অপ্রতিপত্তি (ignorance) প্রকাশ পায়।

এই যে ১৬ পদার্থ, যাহার তত্ত্বজ্ঞান হইলে দুঃখের অত্যন্তনিবৃত্তি বা অপবর্গ-লাভ হয়, তাহার মধ্যে ঈশ্বরের কোন প্রসঙ্গ বা উল্লেখ পাওয়া যায় না। অথচ ইহাদের বিচারেই সমগ্র ন্যায়দর্শন নিঃশেষিত হইয়াছে। ন্যায়দর্শনকে মোটামুটী তিন ভাগে বিভাগ করা যাইতে পারে। ১ম ন্যায়াংশ (logic), ২য় তর্কাংশ (dialectic), এবং ৩য় দর্শনাংশ (metaphysic)। ন্যায়াংশে প্রমাণের বিচার সহ পঞ্চাবয়ব ন্যায়ের (syllogism) গবেষণাপূর্ণ আলোচনা দৃষ্ট হয়। পরবর্ত্তী কালে পণ্ডিত নৈয়ায়িকগণ প্রমাণের বিচারেই সমস্ত শক্তির প্রয়োগ করিয়াছেন, এবং ঈশ্বরকে ঐ syllogism-ভুক্ত করিবার প্রয়াস করিয়াছেন। "ক্ষিত্যাদিকং সকর্ত্তৃকং কার্য্যত্বাৎ ঘটবৎ।" ঘটের যেমন সৃষ্টিকর্ত্তা কুম্ভকার আছে, জগতেরও সেইরূপ সৃষ্টিকর্ত্তা আছেন—ঈশ্বর। এরূপ ন্যায়ের তর্কে যদি কাহারও ঈশ্বরে বিশ্বাস হয়, তবে উত্তম; কিন্তু অনেকে মনে করেন, ঈশ্বরকে তর্কের বিষয়ীভূত না করিলেই ভাল হয়। (১১)

ন্যায়দর্শনের তর্কাংশ, জল্প, বিতণ্ডা, ছল প্রভৃতির বিচারে নিয়োজিত। ইহার সহিত প্রকৃত দর্শনের সম্বন্ধ বড় ঘনিষ্ঠ নহে। ন্যায়ের দর্শনাংশ আত্মা, দেহ, ইন্দ্রিয়, মন প্রভৃতির তত্ত্বালোচনায় নিযুক্ত। প্রসঙ্গক্রমে ক্ষিতি, অপ্‌, প্রভৃতি পঞ্চভূত ও রূপ, রস প্রভৃতি গুণের বিচার এবং সংক্ষেপে পরমাণুবাদের উল্লেখ আছে। আত্মা যে শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি হইতে স্বতন্ত্র, ভোক্তা ও জ্ঞাতা, এবং নিত্য, ন্যায়দর্শন যুক্তি দ্বারা তাহা সপ্রমাণ করিয়াছেন।

ন্যায়দর্শন ঈশ্বর অস্বীকার করেন না; বরং চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকে অসৎ হইতে সতের উৎপত্তিনিরাস প্রসঙ্গে ঈশ্বরের উল্লেখ করিয়াছেন, এবং তিনিই যে জীবের কর্ম্মফলদাতা, তাহাও প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

---

(১১) আগমাচ্চ দ্রষ্টা বোদ্ধা সর্ব্বজ্ঞাতেশ্বরঃ ইতি। বুদ্ধ্যাদিভিশ্চাত্মলিঙ্গৈঃ নিরুপাক্ষম্ ঈশ্বরম্ প্রত্যক্ষানুমানাগমবিষয়াতীতং কঃ শক্ত উপপাদয়িতুম্।—ন্যায় ৪।২১ সূত্রের বাৎস্যায়ন-ভাষ্য। অতএব দেখা যায় যে, ঈশ্বরকে তর্কের বিষয় করা বাৎস্যায়নেরও অনুমত নহে।

ঈশ্বরঃ কারণং পুরুষকর্ম্মাফল্যদর্শনাৎ।—ন্যায়; ৪।১৯।

ইহার ভাষ্যে বাৎস্যায়ন বলিয়াছেন, "মানুষের কর্ম্মফলভোগ যাঁহার অধীন, তিনিই ঈশ্বর" (১২)। ইহা ভিন্ন ন্যায়দর্শনের আর কোথাও ঈশ্বরের প্রসঙ্গ দৃষ্ট হয় না।

অতএব দেখা গেল যে, ন্যায়দর্শনে ঈশ্বরের স্থান মুখ্য নহে, অতিশয় গৌণ। ন্যায়দর্শনকার দুঃখনাশ বা অপবর্গলাভের যে উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহার সহিত ঈশ্বরের কিছুমাত্র সম্পর্ক নাই। ঈশ্বর থাকুন বা না থাকুন, জীবের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ স্থাপিত হউক বা না হউক, তাহাতে ন্যায়দর্শনের উদ্ভাবিত প্রণালীর কিছু আসিয়া যায় না। কারণ, ন্যায়দর্শনোক্ত ১৬ পদার্থের (ঈশ্বর যাহার অন্তর্ভূত নহেন) প্রকৃষ্ট জ্ঞান অর্জ্জন করিতে পারিলেই জীব অত্যন্ত দুঃখের অধিকার এড়াইয়া অপবর্গলাভ করিবে। ইহাই ন্যায়প্রদর্শিত মুক্তিপথ। গীতার অনুমোদিত পথ ইহা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ঈশ্বরকে অবলম্বন না করিয়া সে পথে এক পদও অগ্রসর হইবার উপায় নাই। এই জন্যই বোধ হয়, সমুদায় গীতা গ্রন্থে ন্যায়দর্শনের কিছুমাত্র প্রসঙ্গ, ইঙ্গিত, বা আভাষ দেখিতে পাওয়া যায় না।

৩। বৈশেষিক ও গীতা।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, ন্যায় ও বৈশেষিক একশ্রেণীর দর্শন। বৈশেষিকদর্শনের ভিত্তি মহর্ষি কণাদ-প্রণীত বৈশেষিকসূত্র। ইহা দশ অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রত্যেক অধ্যায়ের দুইটি পরিচ্ছেদ। ইহাদিগকেও আহ্নিক বলে। বৈশেষিকদর্শনের প্রাচীন ভাষ্য পাওয়া যায় না; তবে প্রশস্তপাদাচার্য্যের পদার্থসংগ্রহ গ্রন্থ ইহার ভাষ্যস্থানীয়। উদয়নাচার্য্যের কিরণাবলী ও শ্রীধরাচার্য্যের ন্যায়কন্দলী পদার্থধর্ম্মসংগ্রহের উৎকৃষ্ট টীকা। শঙ্করমিশ্রকৃত বৈশেষিকসূত্রোপস্কার নামে অপেক্ষাকৃত আধুনিক ভাষ্যও প্রচলিত আছে। বৈশেষিকদর্শনের মতেও সংসার দুঃখময়। সেই দুঃখের অত্যন্তবিনাশই নিঃশ্রেয়স। (১৩) বৈশেষিকমতেও নিঃশ্রেয়সলাভের উপায় তত্ত্বজ্ঞান। বৈশেষিকদর্শনের উদ্দেশ্য জীবকে ঐ তত্ত্ব-জ্ঞানের অধিকারী করা। কি প্রকার তত্ত্বজ্ঞান হইলে নিঃশ্রেয়স লাভ হয়? দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায়, এই ছয় পদার্থের সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্য জ্ঞান-জনিত তত্ত্বজ্ঞান। "ধর্ম্মবিশেষপ্রসূতাদ্ দ্রব্যগুণকর্ম্মসামান্যবিশেষসমবায়ানাম্

---

(১২) পরাধীনং পুরুষকর্ম্মফলারাধনম্ ইতি যদধীনম্ স ঈশ্বরঃ। তস্মাৎ ঈশ্বরঃ কারণম্ ইতি।

(১৩) [illegible] শঙ্করমিশ্র কৃত বৈশেষিকসূত্রোপস্কার।

পদার্থানাম্ সাধর্ম্ম্যবৈধর্ম্ম্যাভ্যাম্ তত্ত্বজ্ঞানাৎ নিঃশ্রেয়সম্"। [বৈশেষিকদর্শনং ১।১।৩] (১৪)

বৈশেষিকদর্শনের এই ছয় পদার্থের সহিত গ্রীকদর্শনের categories এর বিশেষ সাদৃশ্য আছে। (১) দ্রব্য (substance) নয় প্রকার; ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, বায়ু, আকাশ, কাল (time), দিক্ (space), আত্মা ও মন। ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ ও বায়ু, এই চারি ভূত নিত্য ও অনিত্য ভেদে দ্বিবিধ; পরমাণুরূপে নিত্য ও পরমাণুর সঙ্ঘাতজনিত শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয় রূপে অনিত্য। বৈশেষিকমতে এই চতুর্ব্বিধ পরমাণু ও আকাশাদি পঞ্চদ্রব্য নিত্য। আত্মা জ্ঞানের আশ্রয়; ইহার মানস প্রত্যক্ষ হয়। আত্মা বিভু, অথচ অনেক—প্রতি শরীরে ভিন্ন ভিন্ন। বৈশেষিক-মতে মন অণু; মন, আত্মা এবং সুখ দুঃখাদির প্রত্যক্ষের করণ। দ্রব্য গুণের আশ্রয়; গুণবিরহিত হইয়া দ্রব্য থাকিতে পারে না। (২) গুণ (attributes); বৈশেষিকমতে গুণ ২৪ প্রকার; রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা (number), পরিমাণ, পৃথক্ত্ব (severalty), সংযোগ (conjunction), বিভাগ (disjunction), পরত্ব (priority), অপরত্ব (posteriority), বুদ্ধি (thought), সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন (effort), সূত্রোক্ত এই সপ্তদশ গুণ। প্রশস্তপাদ গুরুত্ব (weight), দ্রবত্ব (fluidity), স্নেহ (vascidity), সংস্কার, অদৃষ্ট, (ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম) ও শব্দ, এই সপ্ত গুণের যোগ করিয়া ২৪ গুণ সম্পূর্ণ করিয়াছেন। (৩) কর্ম্ম পাঁচ প্রকার; উৎক্ষেপণ (ঊর্দ্ধে ক্ষেপণ), অবক্ষেপণ (নিম্নে ক্ষেপণ), আকুঞ্চন, প্রসারণ ও গমন। আর আর যে কিছু কর্ম্ম আছে, সকলই গমনের অন্তর্গত।

(৪) সামান্য অর্থে জাতি (Genus); জাতি দুই প্রকার; পরা ও অপরা। অধিকদেশবৃত্তি জাতিকে পরা, এবং অল্পদেশবৃত্তি জাতিকে অপরা বলে। যেমন মনুষ্যত্ব, অশ্বত্ব, গোত্ব প্রভৃতি অপরা জাতির তুলনায় প্রাণিত্ব জাতি পরা।

(৫) বিশেষ—কেহ কেহ বিশেষ অর্থে ব্যক্তি (individual) বুঝিয়াছেন। সামান্য=জাতি, বিশেষ=ব্যক্তি। এই মতই সমীচীন মনে হয়। কিন্তু বৈশেষিকমতাবলম্বীরা এ মত স্বীকার করেন না। যে অসাধারণ ধর্ম্ম দ্বারা নিরবয়ব পদার্থের পরস্পর ভেদ সিদ্ধ হয়, তাঁহারা তাহাকেই বিশেষ বলেন। বৈশেষিকেরা বলেন, দ্ব্যণুক হইতে আরম্ভ করিয়া ঘটাদি পর্য্যন্ত সমস্ত সাবয়ব দ্রব্যের স্ব স্ব

(১৪) পরবর্ত্তী গ্রন্থে অভাব নামে এক সপ্তম পদার্থ অঙ্গীকৃত হইয়াছে। সম্ভবতঃ প্রশস্তপাদাচার্য্যই এই মতের প্রবর্ত্তক। তিনি লিখিয়াছেন, "দ্রব্যগুণকর্ম্মসামান্যবিশেষসম-

অবয়বভেদ দ্বারা ভেদ সিদ্ধ হয়। কিন্তু নিরবয়ব একজাতীয় পরমাণুদ্বয় পরস্পর ভিন্ন কিসে? যে ধর্ম্ম দ্বারা তাহাদের পরস্পর ভেদ সিদ্ধ হয়, তাহাই বিশেষ।

(৬) সমবায়—Inhesion (Inseperablity)=নিত্য সম্বন্ধ। তন্তুর সহিত বস্ত্রের যে সম্বন্ধ, গুণের সহিত গুণীর যে সম্বন্ধ, ক্রিয়ার সহিত দ্রব্যের যে সম্বন্ধ, জাতির সহিত ব্যক্তির যে সম্বন্ধ, তাহার নাম সমবায়।

(৭) অভাব দ্বিবিধ: (ক) সংসর্গাভাব, অর্থাৎ সম্বন্ধের অভাব; ইহার তিন ভেদ, ১ম প্রাগভাব, যেমন সূত্রে বস্ত্রের প্রাগভাব; ২য়, ধ্বংস অর্থাৎ নাশ, এবং ৩য় অত্যন্তাভাব, যেমন জড়ে চেতনের অত্যন্তাভাব। (খ) অন্যোন্যাভাব; অশ্ব গজ নহে, সুতরাং অশ্বে গজের যে অভাব, এবং গজে অশ্বের যে অভাব, তাহাই অন্যোন্যাভাব।

বৈশেষিকদর্শন ঈশ্বর অস্বীকার করেন না। বরং ২য় অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকে বায়ুর বিচারপ্রসঙ্গে ইঙ্গিতে ঈশ্বরের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। "সংজ্ঞাকর্ম্ম ত্বস্মৎবিশিষ্টানাম্ লিঙ্গম্" [বৈশেষিক; ২।১।১৮]। "প্রত্যক্ষপ্রবৃত্তত্বাৎ সংজ্ঞা-কর্ম্মণঃ" [বৈশেষিক; ২।১।১৯]। সংজ্ঞা অর্থাৎ নাম, এবং কর্ম্ম অর্থাৎ ক্ষিত্যাদি কার্য্য, এই দুইটি আমাদিগের হইতে বিশিষ্ট (superior) ঈশ্বর মহর্ষি প্রভৃতির অস্তিত্ব প্রমাণিত করে। ঘট, পট ইত্যাদি নাম দ্বারা সেই সেই পদার্থ বুঝায় কিরূপে? ঈশ্বরের সঙ্কেত দ্বারা। ক্ষিতি, অপ্, ইহারা যখন কার্য্য, তখন অবশ্যই ইহাদের কর্ত্তা আছেন; তিনিই ঈশ্বর। (১৫)

ইহা ইঙ্গিতমাত্র। কতকটা অপ্রাসঙ্গিকও বলা যায়। ইহা ভিন্ন বৈশেষিক-সূত্রে আর কোথাও ঈশ্বরের প্রসঙ্গ দৃষ্ট হয় না।

নব্য নৈয়ায়িকদিগের প্রবর্ত্তিত বৈশেষিকদর্শনের গ্রন্থসমূহে মূলসূত্রোক্ত নব দ্রব্যের অন্যতম আত্মার বিচারস্থলে ঈশ্বরের প্রসঙ্গ দৃষ্ট হয়। তাঁহারা আত্মাকে জীবাত্মা ও পরমাত্মা ভেদে দ্বিবিধ বলেন। ভাষাপরিচ্ছেদ গ্রন্থে আত্মার পরিবর্ত্তে "দেহিনৌ" (জীব ও ঈশ্বর) শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। মূল সূত্রের তৃতীয় অধ্যায়ে আত্মার নিরূপণ করা হইয়াছে। আত্মা যে দেহ,

(১৫) শঙ্কর মিশ্র বৈশেষিকসূত্রোপস্কারে এইরূপ লিখিয়াছেন,—সংজ্ঞা নাম, কর্ম্ম কার্য্যং ক্ষিত্যাদি, তদুভয়ম্ অস্মদ্‌বিশিষ্টানাম্ ঈশ্বরমহর্ষীণাম্ সত্ত্বেঽপি লিঙ্গম্। ঘটপটাদিসংজ্ঞা-নিবেশনমপি ঈশ্বরসঙ্কেতাধানম্ এব; যঃ শব্দ যত্র ঈশ্বরেণ সংকেতিত স তত্র সাধুঃ। * * * * তথাচ সিদ্ধম্ সংজ্ঞায়া ঈশ্বরলিঙ্গত্বম্। এবং কর্ম্মাপি কার্য্যমপি ঈশ্বরে লিঙ্গম্। তথাহি ক্ষিত্যাদিকং সকর্ত্তৃকং কার্য্যত্বাৎ ঘটবৎ ইতি।

ইন্দ্রিয় ও মন হইতে স্বতন্ত্র, তাহা যুক্তি দ্বারা প্রতিপাদন করা হইয়াছে ; কিন্তু সে স্থলে ত ঈশ্বরের কোন প্রসঙ্গই পাওয়া যায় না। (১৬)

নব্য বৈশেষিকগণ গণনা দ্বারা সাব্যস্ত করিয়াছেন যে, ঈশ্বরে জ্ঞান, ইচ্ছা, প্রযত্ন, সংখ্যা প্রভৃতি ৮টি গুণের সমাবেশ আছে। "মহেশ্বরেঽষ্টৌ।" বলা বাহুল্য যে, কণাদ ঋষি মূল দর্শনে এরূপ গণনা করিতে সাহসী হন নাই।

প্রশস্তপাদাচার্য্য পদার্থসমূহের তত্ত্বজ্ঞানই মোক্ষের কারণ, এই প্রসঙ্গে, "তচ্চ ঈশ্বরনোদনাভিব্যক্তাৎ ধর্ম্মাদেব"—"সেই তত্ত্বজ্ঞান ঈশ্বর-প্রেরণা-জনিত ধর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হয়," এইরূপ বলিয়াছেন। মূল সূত্রে কিন্তু ধর্ম্মবিশেষ-প্রসূত" এইমাত্র উপদেশ আছে। ইহার বোধ হয় উদ্দেশ্য এই যে, নিবৃত্তি-লক্ষণ ধর্ম্ম বা নিষ্কামকর্ম্মোপার্জ্জিত ধর্ম্ম হইতে সমুৎপন্ন (১৭) যে তত্ত্বজ্ঞান, তাহাই মুক্তির সাধন।

প্রশস্তপাদাচার্য্য পরমাণুবাদের প্রসঙ্গেও ঈশ্বরের অবতারণা করিয়াছেন। মূল সূত্রে কিন্তু এ স্থলে ঈশ্বরের কোনও প্রসঙ্গ দৃষ্ট হয় না। কণাদের মতে পরমাণু সৎ, নিত্য ও অ-কারণ। পরমাণুই ঘট পট প্রভৃতির কারণ; তাহার কোনই কারণ নাই। যদি ঘট প্রভৃতি সাবয়ব দ্রব্যের অবয়ব বিভাগ করিতে থাকা যায়, তবে আমরা সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতর হইতে সূক্ষ্মতম অবয়বে উপ-নীত হইতে হইতে অবশেষে এরূপ অবয়বে পঁহুছিব, যাহার বিভাগ সম্ভবপর নহে। যাহার বিভাগ হইতে পারে না, যাহা পরম সূক্ষ্ম, তাহাই পরমাণু। পরমাণুর উৎপত্তিও নাই, বিনাশও নাই। অতএব পরমাণু নিত্য। দুইটি পর-মাণুর সংযোগে দ্ব্যণুক ও তিনটি দ্ব্যণুকের সংযোগে ত্রসরেণু উৎপন্ন হয়। এই-রূপে ক্রমে স্থূলাবয়ব দ্রব্যের উৎপত্তি হইয়াছে। (১৮)

প্রশস্তপাদাচার্য্য বলেন যে, সকলভুবনপতি মহেশ্বরের সংহার-ইচ্ছা হইলে পরমাণুপুঞ্জের সংঘাতজনিত শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয় ক্রমে ক্রমে বিনষ্ট হইয়া যায়। তখন কেবল বিভিন্ন পরমাণুসমূহই অবশিষ্ট থাকে। প্রলয়কালের অবসানে প্রাণীদিগের ভোগসম্পাদনের জন্য মহেশ্বরের আবার সৃষ্টির ইচ্ছা

(১৬) বাৎস্যায়ন ন্যায়দর্শনের ৪র্থ অধ্যায়ের ২১ সূত্রের ভাষ্যে এইরূপ লিখিয়াছেন,—"গুণ-বিশিষ্টং আত্মান্তরম্ ঈশ্বরঃ তস্য আত্মকল্পাৎ কল্পান্তরান্ উপপত্তিঃ।" ইহাই কি আত্মার জীবাত্মা ও পরমাত্মা রূপে ভেদস্বীকারের মূল ?

(১৭) মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার প্রণীত হিন্দুদর্শন; ১ম ভাগ; ১৪৬ পৃঃ।

(১৮) বৈশেষিকদর্শন, ৪র্থ অধ্যায়; ১ম আহ্নিক দ্রষ্টব্য।

হয়। তখন অদৃষ্টের প্রেরণায় প্রথমতঃ বায়ুপরমাণুতে স্পন্দন উৎপন্ন হয়। পরে বায়ুপরমাণুসমূহের পরস্পর সংযোগে দ্ব্যণুকাদিক্রমে মহান্ বায়ু উৎপন্ন হইয়া আকাশে প্রবাহিত হইতে থাকে। পরে ঐ প্রণালীতে তৈজস পরমাণু হইতে বৃহৎ তেজঃ এবং জলীয় পরমাণু হইতে মহান্ সলিলরাশি উৎপন্ন হয়, এবং পার্থিব পরমাণুসংযোগে বিপুলা পৃথিবীর উৎপত্তি হয়। এইরূপে চারি মহাভূত উৎপন্ন হইবার পর মহেশ্বরেরই সংকল্পে ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হয়, এবং তন্মধ্যে ব্রহ্মা আবির্ভূত হইয়া সৃষ্টিকার্য্য নিষ্পন্ন করেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এ মত প্রশস্তপাদাচার্য্যের। মূল সূত্রে ইহার কোনও ইঙ্গিত বা আভাষ পাওয়া যায় না।

যাহা হউক, এ কথা মানিতেই হয় যে, বৈশেষিকদর্শনেও ঈশ্বরের স্থান মুখ্য নহে, অতিশয় গৌণ। বৈশেষিকদর্শনকার নিঃশ্রেয়সপ্রাপ্তির যে প্রণালীর আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহার সহিত ঈশ্বরের সম্বন্ধ অত্যল্প। ঈশ্বর যাউন বা থাকুন, জীবের সহিত তাঁহার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হউক বা না হউক, বৈশেষিকের তাহাতে কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। সপ্ত পদার্থ (ঈশ্বর তাহার অন্তর্গত নহেন) ও তাহাদের সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্য জ্ঞান অক্ষুণ্ণ থাকুক, তিনি সেই তত্ত্বজ্ঞানের বলে দুঃখের গণ্ডী ছাড়াইয়া নিঃশ্রেয়স লাভ করিবেন। ইহাই বৈশেষিকের অনুমোদিত মুক্তিপথ। গীতার প্রদর্শিত পথ ইহা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ঈশ্বরকে বাদ দিলে সে পথের পথিক হওয়া অসম্ভব। এই জন্যই বোধ হয়, সমুদায় গীতা গ্রন্থে বৈশেষিক দর্শনেরও কিছুমাত্র প্রসঙ্গ, ইঙ্গিত, বা আভাষ দৃষ্ট হয় না।

বারান্তরে আমরা গীতার সহিত অন্যান্য দর্শনের সম্বন্ধবিচারে প্রবৃত্ত হইব।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

উদ্ভিদ্‌নামমালা।

উদ্ভিদ্-ঘটিত যাহা কিছু আছে, তাহাই উদ্ভিদ্‌বিদ্যার আলোচ্য। এ কালে যে সকল উদ্ভিদ্ জন্মিতেছে, শুধু তাহাদের বিষয় নহে; যে সকল উদ্ভিদ্ পুরাকালে ছিল, এবং এক্ষণে যাহাদের অবশেষ-(fossil)-মাত্র পাওয়া যায়, তাহাদেরও বিষয় উদ্ভিদ্‌বিদ্যার অন্তর্গত। কাজেই উদ্ভিদ্‌বিদ্যা প্রকাণ্ড।

উদ্ভিদ্‌সমূহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, তাহাদের বাহ্য ও আভ্যন্তর রূপ, তাহাদের জীবন-চরিত, তাহাদের সহিত অন্য প্রাকৃত পদার্থের সম্বন্ধ প্রভৃতি উদ্ভিদ্‌বিদ্যার অঙ্গ সকল স্মরণ করিলেই উহার বিশালতা উপলব্ধ হয়। এই বিদ্যাকে এ জন্য কতক-গুলি শাখায় বিভক্ত করিতে হইয়াছে।

কিন্তু এক এক শাখাও এত বিশাল যে, কোন এক জনের কথা দূরে থাকু, বহু ব্যক্তির সমবেত চেষ্টাতেও উহার অত্যল্পই জানিতে পারা গিয়াছে। যদি এক লক্ষ জাতীয় উদ্ভিদ্‌ থাকে, তাহা হইলে প্রত্যেক জাতির সহিত পরিচিত হইতে কত কাল লাগিতে পারে, তাহা অনুমেয়। আমাদের বন্ধুবান্ধবদিগের মধ্যে কয় জনের পরিচয় জানিতে পারি? মানুষের মন বলিয়া একটা পদার্থ আছে, তাহাতেই তাহার প্রকৃত পরিচয় পাইতে বিঘ্ন ঘটায় বটে, কিন্তু চারি দিকের কয়টা পশু বা কয়টা পক্ষীর পরিচয় জানিতে পারা গিয়াছে? সেইরূপ কয়টা তৃণের জীবনচরিত আমাদের বিদিত হইয়াছে?

অথচ উদ্ভিদ্‌বিদ্যা দেশকালে আবদ্ধ হইতে চায় না; এ দেশ ও দেশ ছাড়িয়া সমগ্র ভূমণ্ডলেও উহার আশা মিটে না, বর্ত্তমান ও ভূত ছাড়িয়া ভবিষ্যতের দিকেও কুতূহলের সহিত দৃষ্টিপাত করে।

এই বিশাল অধিকার ছাড়িয়া একটি অতি ক্ষুদ্র অধিকারের কথা বলা যাই-তেছে। এ দেশের উদ্ভিদ্‌বর্গের নাম। এই অধিকার নিতান্তই ক্ষুদ্র। যে হেতু, সমগ্র পৃথিবীর, নিরক্ষবৃত্তস্থিত উষ্ণ প্রদেশের মেরুসন্নিহিত তুষারময় ভূমির, তদুপরিস্থ পর্ব্বতমালার, উপত্যকার, প্রান্তরের, জলময় সমুদ্রের, হ্রদের উদ্ভিদের নাম নহে, এই ক্ষুদ্র ভারতখণ্ডের উদ্ভিদের নাম। বিষয়টি ক্ষুদ্রই বটে, যে হেতু কেবল নামমাত্র জানিতে চাই, তাহাদের জীবনচরিত নহে।

দেশের যাবতীয় উদ্ভিদের নাম জানিয়া ফল কি? দেশের বড় বড় লোকদিগের নামই জানি না, না জানাতে বিশেষ অসুবিধাও বোধ করিতেছি না, তবে আর কতকগুলা শাকের, কতকগুলা তৃণের, কতকগুলা লতার, বনস্পতির নাম জানিলে কি সুবিধা হইবে?

ইহার উত্তর কি? জিজ্ঞাসা। যে জিজ্ঞাসার বলে মানুষ মানুষ হইয়াছে, যে জিজ্ঞাসা মানুষকে স্থির থাকিতে দেয় না, সেই জিজ্ঞাসা ব্যতীত উদ্ভিদ্‌বেত্তার অন্য প্রেরক নাই। সমুদয় উদ্ভিদের নাম জানিয়া কোনও ঐহিক সম্পত্তিলাভ হইবে কি না, তাহা তাঁহার ভাবিবার অবসর নাই। সুমেরুতে উন্মুক্ত জলরাশি আছে, না সেখানে শুষ্ক ভূমি আছে, তাহা জানিয়া ফল কি? [illegible]

স্বেচ্ছায় বিষম জীবনসঙ্কটে পড়িতে গিয়াছিলেন। দূর মঙ্গলগ্রহে উদ্ভিদ জন্মিবার পক্ষে উপযুক্ত রস বায়ু তেজ আছে কি না, তাহা ভাবিলে, এবং তাহা লইয়া কলহে প্রবৃত্ত হইলে, ঐহিক বা পারত্রিক কোনও লাভের সম্ভাবনা নাই।

তথাপি কোন লোক দেখিলেই প্রথমে তাহার নাম জানিতে ইচ্ছা হয়। অবশ্য সকলে সকল লোকের নাম শুনিতে চায় না; যে লোকের প্রতি যাহার দৃঢ় মনোযোগ হয়, সে তাহারই নাম শুনিতে চায়। বোধ হয়, যেন সেই লোকটির নাম শুনিলেই তাহার আদ্যন্ত ইতিহাস জানিতে পারা যায়; যেন নামটি না জানাতে কোন গুরুতর কাজ সম্পন্ন হইতে পারে নাই।

পথের ধারে একটা গাছ দেখিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, কি গাছ। শুনিলাম ধুতুরা। অমনই জিজ্ঞাসার শেষ; নিশ্চিন্তমনে গন্তব্য স্থানে চলিয়া গেলাম। কোনও পণ্ডিতমহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি 'উন্মত্তঃ কিতবো ধূর্ত্তো ধুস্তূরঃ কনকাহ্বয়ঃ' আবৃত্তি করিলেন। হয় ত তিনি ঐ সকল নামের ব্যুৎপত্তি বলিলেন, এবং সেই গাছটার নাম কেন ধুস্তূর হইয়াছে, তাহাও বলিলেন।

উদ্ভিদ্‌ব্যবসায়ী এরূপ নাম শুনিতে চান না, প্রত্যুত ঘৃণা করেন। তাই তাঁহার উদ্ভিদনামমালা (Flora) গ্রন্থে, যে গ্রন্থে তিনি যত উদ্ভিদের পরিচয় পাইয়াছেন, তৎসমুদয়ের নাম লিখিয়া রাখেন, সে গ্রন্থে এরূপ নামসংগ্রহের প্রয়োজন দেখা যায় না। কারণ, উদ্ভিদের লৌকিক নামের স্থায়িত্ব নাই। কারণ, ভাষাভেদে এরূপ নামের প্রভেদ হয়। ইহা অপেক্ষাও গুরুতর কথা সি. বি. ক্লার্ক বলিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, যে যত অজ্ঞ, সে লৌকিক নাম তত জানিতে চায়; যে উপস্থিত গাছের কিছুই জানে না, এবং যে কোন নাম পাইলেই সন্তুষ্ট, সেই দেশী নাম দেশী নাম করিয়া চীৎকার করে।

কথাটা ঠিক। কারণ, গাছের লৌকিক নামের সহিত তাহার কিছুমাত্র পরিচয় পাওয়া যায় না। অথচ তাহার পরিচয় পাইবার অভিপ্রায়েই নামজিজ্ঞাসা। উন্মত্ততা জন্মায় বলিয়া ধুস্তূরের এক নাম উন্মত্ত হইতে পারে। কিন্তু সকল গাছের চলিত নামের অর্থ পাওয়া যায় না; যদি বা পাওয়া যায়, তাহা একদেশদর্শিতার ফল। বৈদ্যক শাস্ত্রে ধুস্তূরের নাম উন্মত্ত থাকিলে ফল আছে, কিন্তু উন্মত্তই কি ধুস্তূরের পরিচয়?

আর, কয়টা গাছেরই বা লৌকিক নাম আছে? আমাদের বৈদ্যক শাস্ত্রে পাঁচ শত কি সাড়ে পাঁচ শত উদ্ভিদের নাম আছে; তেমনই যাহারা বনে জঙ্গলে

করে, তাহারা বাধ্য হইয়া কতকগুলি গাছের নাম শিখে। কিন্তু এইরূপে সকল উদ্ভিদের নাম পাওয়া যায় না।

অথচ যাবতীয় উদ্ভিদের নাম চাই। এমন নাম, যাহা শুনিবামাত্র তাহাদের জাতি কুল গোত্র জানিতে পারি। ভদ্রলোকটির নাম কি? হরিচরণ। এই নামে তাঁহার কিছুই জানিলাম না। কিন্তু শুনিলাম; হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। অমনই কত বিষয় জানিতে পারিলাম। যখন শুনিলাম, তিনি শাণ্ডিল্যগোত্রীয়, তখন তাঁহার সম্বন্ধে আমার জ্ঞান বিস্তৃত হইল। বুঝিলাম; তিনি শাণ্ডিল্য গোত্র অলঙ্কৃত করিয়াছেন।

তবেই যদি বন্দ্যোপাধ্যায় ও শাণ্ডিল্যশ্রেণীস্থ মানবসমূহের পরিচয় জানা থাকে, তাহা হইলে হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়েরও পরিচয় কতকটা পাওয়া যাইবে। বুঝা গেল, তিনি বন্দ্যোপাধ্যায় কুলের এক জন। তাঁহার বিশেষ নাম হরিচরণ।

প্রায় এই ভাবে উদ্ভিদ্‌সমূহের নামকরণ হইয়াছে। প্রত্যেক নামে দুইটি নাম, কিংবা দুইটি নাম একত্র একটি নাম। একটি কুলগত নাম, অপরটি বিশেষ নাম। অনেক ব্যক্তির নাম হরিচরণ হইতে পারে, কিন্তু বন্দ্যকুলের হরিচরণ এক ব্যক্তি হইতে পারে। যদি অনুসন্ধানে প্রকাশ পায় যে, বন্দ্যকুলের দুই তিন ব্যক্তির নাম হরিচরণ হইয়াছে, তাহা হইলে, এক জনের ঐ নাম রাখিয়া অন্য দুই জনের অন্য দুই নাম দেওয়া আবশ্যক। কারণ, বহু ব্যক্তির একই নাম হইলে নামের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়।

এই প্রকার ভুল উদ্ভিদের নামে বড় একটা হয় না। অন্য প্রকার ভুল প্রায় হইয়া থাকে। একই উদ্ভিদের দুই তিন নাম হইয়া পড়ে। কোন একটি উদ্ভিদ দেখিলাম, উদ্ভিদ্‌নামমালায় তাহার নাম অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু পাইলাম না। মনে করিলাম, সেই উদ্ভিদের নামকরণ হয় নাই। তখন তাহার পরিচয় লইয়া তাহার কুলনিরূপণ করিয়া একটি নাম দিলাম। এইরূপ, অন্যেও করিতে পারেন। অথচ পরে হয় ত প্রকাশ পাইল, শ্বেতদ্বীপের উদ্ভিদ্‌নামমালায় ঠিক আমাদেরই গাছটির নামকরণ বহু পূর্ব্বে হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সেই পুরাতন নাম ও আমাদের প্রদত্ত নূতন নাম এক হয় না। কাজেই একটু গোলযোগে পড়িতে হয়।

এই প্রকার গোলযোগ হইতে উদ্ধার পাইবার নিমিত্ত প্রত্যেক উদ্ভিদের নামের পরে নামকর্ত্তার নামটিও যোগ করা হইয়া থাকে। তখন সেই উদ্ভিদের নামটি এইরূপ দাঁড়ায়,—অমুক-প্রদত্ত অমুক-কুলোদ্ভব অমুক নাম। উপরের

দৃষ্টান্তে বলিতে হইলে, রাধানাথ-প্রদত্ত বন্দ্যকুলের হরিচরণ নাম। কিংবা তাঁহার নাম করা যাইতেছে, যাঁহার নাম রাধানাথ হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় রাখিয়াছেন।

কিন্তু নাম পাইলেই উদ্ভিদ চিনিতে পারা যায় না। যদি নামমালা গ্রন্থে উদ্ভিদের নামের সহিত তাহার বাহ্য লক্ষণ লিখিত থাকে, তাহা হইলে সেই লক্ষণের উদ্ভিদ দেখিলেই তাহার নাম পাওয়া যাইবে, কিংবা নাম পাইলে তাহার লক্ষণ পাওয়া যাইবে। বস্তুতঃ, নামমালায় প্রত্যেক উদ্ভিদের জাতি ও কুলগত নাম ও পরিচয় বর্ণিত হইয়া থাকে।

তবে নামমালা কোষবিশেষ হইলেও অমরসিংহের প্রাণিবর্গ ও উদ্ভিদ্‌বর্গ নহে। কেবল নাম-প্রতিনাম-পূর্ণ কোষেরও প্রয়োজন আছে। কিন্তু অধিক প্রয়োজন সেই কোষের, যে কোষে নামের সহিত বস্তুপরিচয় করায়। বস্তুতঃ, জীবনামমালা গ্রন্থের দুইটি উদ্দেশ্য। একটি গাছ জানি, কিন্তু তাহার নাম জানি না; কাজেই সেই গাছ সম্বন্ধে লব্ধ জ্ঞান অন্যের নিকট প্রকাশ করিবার উপায় নাই। কিংবা, গাছের নাম জানি, কিন্তু লক্ষণ জানি না; কাজেই গাছটি চিনিতে পারা গেল না; যে অভিপ্রায়ে গাছটির অনুসন্ধান করিতেছিলাম, তাহা সিদ্ধ হইল না।

নাম পাইলে সূচীপত্র হইতে গাছটির লক্ষণ পাওয়া যায়। কিন্তু লক্ষণ জানিলে এত সহজে তাহার নাম পাওয়া যায় না। কারণ, নামের সূচীপত্র করা সহজ, কিন্তু লক্ষণের সূচীপত্র করা আদৌ সহজ নহে। কারণ, নামের সূচীপত্রে অকারাদি বর্ণ দেখিলেই চলে, লক্ষণের সূচীপত্রে অকারাদি বর্ণ কোথায়? কিংবা নাম মনুষ্যকৃত, লক্ষণ প্রকৃতিদত্ত, এবং মনুষ্যকৃত বলিয়াই সুগম, প্রকৃতিকৃত বলিয়াই দুর্গম।

সর্ব্বজ্ঞতা নাই বলিয়াই লক্ষণের সূচীপত্র করা কঠিন। প্রকৃতি সকল লক্ষণ সমান গুরু মনে করেন না; করিলে কোনও লক্ষণের অন্যথা হইত না। কিন্তু কোন্‌গুলিকে গুরু মনে করেন, তাহার নিরূপণ করিতে না পারিলে লক্ষণের সূচীপত্র হইতে পারে না। এই জন্যই কোনও জীবের জাতীয় লক্ষণের, তাহার কৌলিক লক্ষণের নির্দ্দেশ করা অতীব দুরূহ।

তথাপি কার্য্যোদ্ধার চাই। এই নিমিত্ত প্রধান ও সামান্য লক্ষণ দেখিয়া মূল শ্রেণীবিভাগ, ক্রমশঃ তাহার বিভাগ করিতে করিতে জাতিতে উপনীত হইতে হয়। এই জাতিতে উপস্থিত হইতে উদ্ভিদবর্গকে পরে পরে অন্ততঃ পাঁচ ভাগ করিতে হয়। (১) এই সকল ভাগ উচ্চ হইতে নিম্নে অবতরণ করিবার সোপান।

(১) Divisions, classes, orders, genera, species.

সোপান সুগম হইলে পদস্খলন হয় না, সর্ব্বনিম্নস্থ জাতিরূপ ভূমিতে অবতরণ করিতে পারা যায়। এইখানেই নামমালা-কারের নিপুণতা।

জীববেত্তারা কি ভাবে ও কি উদ্দেশ্যে প্রাণী ও উদ্ভিদবর্গের নামমালা প্রস্তুত করেন, তাহার আভাস দেওয়া গেল। ইহা হইতে বুঝা যাইবে, কত অনুসন্ধান, কত পর্য্যবেক্ষণ, কত পরিশ্রম করিলে কোন দেশের প্রাণীর বা উদ্ভিদের নাম-মালা গ্রথিত হইতে পারে। এখানে কল্পনার তিলমাত্র আধার নাই; কেবল প্রত্যক্ষেও চলে না, পদে পদে বিচারণা আবশ্যক।

মিষ্টার রকস্‌বরা এ দেশের উদ্ভিদের নামমালা প্রস্তুত করিবার আদি। ইহা প্রায় এক শত বৎসর পূর্ব্বের কথা। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার কেরি রকস্‌বরার নামমালার পাণ্ডুলিপি মুদ্রিত করান। তাহাই এক্ষণে মিষ্টার ক্লার্কের যত্নে সুলভ মূল্যে বিক্রয় হইতেছে। বলিতে গেলে সাধারণের উপযোগী এ দেশের উদ্ভিদের নামমালা আর হয় নাই, বোধ করি আর হইবেও না। অবশ্য গ্রন্থখানি ইংরাজীতে,—শুধু ইংরাজী নহে, উদ্ভিদ্‌বিদ্যার পারিভাষিক শব্দে গ্রথিত। উহাতে বঙ্গদেশের এবং কোন কোন স্থলে দক্ষিণাপথের উদ্ভিদের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে।

ইহার পর হুকার সাহেব ভারতবর্ষের মন্ত্রীর অনুমত্যনুসারে সমগ্র ভারতবর্ষের এক সুবিস্তৃত নামমালা প্রস্তুত করিয়াছেন। এ দেশে যেখানে যত জাতীয় গাছ আছে, প্রায় সকলেরই আবশ্যক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শুষ্ক করিয়া বিলাতে সংগৃহীত হইয়াছে। সেই সংগ্রহ দেখিয়া হুকার সাহেব ১৮৭২ হইতে ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অবিরত পরিশ্রমের পর উদ্ভিদনামমালা সমাপ্ত করিয়াছেন। হিমালয় হইতে সিংহল এবং পঞ্জাব হইতে সিঙ্গাপুর এই চতুঃসীমার মধ্যে যেখানে যত উদ্ভিদ জাতি আছে, সকলেরই লক্ষণ নাম ধাম কুল গোত্র সমুদয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। অবশ্য এমন দুই একটা গাছ থাকিতে পারে, যাহা সংগৃহীত হইতে পারে নাই। দুরারোহ পর্ব্বতে বা অগম্য জঙ্গলে এমন গাছ থাকিতে পারে, যাহার পরিচয় বিস্তৃত নামমালায় পাওয়া যায় না। বলা বাহুল্য যে, এই বিস্তৃত নামমালা সাধারণের পক্ষে উপযোগী নহে। কারণ, বাঁশবনে ডোমেরাও কাণা হইয়া থাকে।

রক্‌সবরার পর, হুকারের পর এ দেশের উদ্ভিদ্‌বর্গের নাম অবগত হইবার পথ উন্মুক্ত হইয়াছে। যিনিই এ দেশের কোন উদ্ভিদের নাম অনুসন্ধান করিতে চাহিবেন, তাঁহাকেই তাঁহাদের দ্বারে উপস্থিত হইতে হইবে। যে স্বাধীন পরিশ্রমের অতুল ভাণ্ডার সঞ্চিত হইয়াছে, তাহা হইতে সকলেই ধনবান

হইতে পারিবেন। গ্রন্থ দুইখানি ইংরাজীতে হউক, ইংরাজী ব্যতীত আমাদের গতি কোথায়? গতি থাকুক না থাকুক, এ দেশের লোকদিগের নিমিত্ত বিদেশীয় চেষ্টাই একমাত্র সম্বল। মিষ্টার সি. বি. ক্লার্ক বলেন, আমাদিগের পর্য্যবেক্ষণ করিবার অভ্যাস নাই। কেবল অভ্যাস নহে, পর্য্যবেক্ষণ করিবার প্রয়োজনই আমরা বুঝি না। বস্তুতঃ আমরা চক্ষুষ্মান্ হইয়াও অন্ধ, এবং অন্ধ থাকিয়াই জীবনযাপন করি। শিক্ষিত অশিক্ষিত অল্প ব্যক্তিই চোখ মেলিয়া বেড়ান, কান পাতিয়া শুনেন। কাজেই বাহ্য জগতের প্রতি আমাদের মনোযোগ নাই, তাহার প্রতি দৃক্‌পাত নাই। আমার বিশ্বাস, এ দেশের যেমন অন্তর্দৃষ্টি আছে, তৎসঙ্গে তদনুরূপ বাহ্যদৃষ্টি থাকিলে দেশের অন্য প্রকার অবস্থা হইত। ত্রিশ বৎসরে জাপানী যাহা করিয়াছে, সংখ্যায় সপ্তগুণ ও চক্ষুষ্মান্ মনুষ্যের পক্ষে তাহা সম্পাদন করা কিছুই আশ্চর্য্য ছিল্ না।

তবে কালে সকলই সম্পন্ন হয়। এ দেশেও চক্ষুরুন্মীলনের চিহ্ন দেখা যাইতেছে। বঙ্গদেশের মধ্যে কয়েক জন, দায়ে পড়িয়াই হউক আর স্বেচ্ছায় হউক, বাহ্য জগতের প্রতি সুনয়নে দৃষ্টিপাত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তন্মধ্যে বোধ করি, আলীপুরের প্রাণিশালার অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত রামব্রহ্ম সান্যাল মহাশয়ের নাম প্রথম করা উচিত। আমরা স্বভাবতঃ অন্ধ বা বধির নই, তাহা তিনি প্রদর্শন করিয়াছেন। ভারতীয় শৈল বিভাগে দুই জন বাঙ্গালী বিচরণ করিতেছেন। তাঁহারাও অবশ্য বাহ্য প্রকৃতির আর একটা দেশ অনুসন্ধান করিতেছেন।

আজ দেখিতেছি, দেরাদুন বন্যবৃক্ষ-বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব ছাত্র এবং বন-বিভাগের জনৈক সংরক্ষক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল মহাশয় প্রকৃতির অবশিষ্ট প্রদেশে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি সাহারণপুর, দেরাদুন ও তন্নিকটবর্ত্তী প্রদেশের বৃক্ষ সকলের এক নামমালা প্রস্তত করিয়াছেন। এ কার্য্যের নিমিত্ত তাঁহাকে অবশ্য হুকারের বিস্তৃত নামমালার সাহায্য লইতে হইয়াছে। তদ্ভিন্ন, বনবিভাগের গাম্বেল ও ব্রান্‌ডিস্ নামক দুই জন ইংরাজের সঙ্কলিত বন্যবৃক্ষের দুইটি নামমালা ছিল। এ সকলের সাহায্য পাইলেও উপেন্দ্র বাবুকে বিস্তর পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। তাঁহার গ্রন্থে (১) দেখিতেছি, তাঁহাকে প্রায় আট শত বৃক্ষের পরিচয় লইতে হইয়াছে। কেবল পরিচয় নহে, প্রত্যেক বৃক্ষের বিশেষ

(১) Forest Flora of the School Circle, N. W. P.

জানিতে হইয়াছে। এদেশীয়দিগের মধ্যে তিনিই এ পথের অগ্রণী হইলেন। (২)

বাহ্যপ্রকৃতি ত্রিস্কন্ধ—প্রাণী, উদ্ভিদ, শৈল। তিনটি ভাগেই বঙ্গবাসী প্রবেশ করিয়াছেন, এবং আশা হয়, সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইবে। সেই আশার সঙ্গে আর একটি কথা মনে আসে। এই তিন বিদ্যা জাতীয় বিদ্যা হইবে কি? স্বদেশীয় ভাষায় বিদ্যালোচনা করিতে না পারিলে তাহা স্বজাতীয় হয় না। আমগাছের সহিত গোলাপের যোড় লাগে; কিন্তু আমগাছে গোলাপের কলম কিংবা গোলাপগাছে আমের কলম হয় না। যদি বা কেহ এরূপ অসম্ভবের আশায় মুগ্ধ হন, তাহা হইলে তাঁহার মোহ অচিরে বিনষ্ট হয়। জাপানের বিদ্যালয়ে প্রতীচ্য পণ্ডিত থাকিলেও তাঁহাদের সংখ্যা অল্প, এবং বিদ্যালয়ে জাপানী ভাষাই চলিত। ইহাতেই জাপানী দেহে নূতন প্রাণ সঞ্চারিত হইয়াছে। (৩)

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

বরোদার বৈচিত্র্য।

বরোদা রাজ্যের সঙ্গদ বিভাগ প্রস্তরখনির জন্য বিখ্যাত। গৃহের ছাদ, মেজে প্রভৃতির জন্য এই সকল প্রস্তর ব্যবহৃত হয়। এই প্রস্তর সাধারণ প্রস্তর অপেক্ষা এই সকল কার্য্যের অধিক উপযোগী। সঙ্গদের অনতিদূরে দাওর নামক স্থানে মিয়াজান ও বরোদা হইতে যে অল্পপরিসর রেলপথ বিস্তৃত আছে,

(২) এই গ্রন্থের রচনা করিয়া উপেন্দ্র বাবু গবর্মেণ্টের নিকট হইতে রায় সাহেব উপাধি পাইয়াছেন। ভ্রমক্রমে আমরা গতবারে সাহিত্যের সূচীপত্রে তাঁহার নামের শেষে 'রাও বাহাদুর' সংযুক্ত করিয়াছিলাম। ইংলণ্ডের বিশেষবিৎ বিদ্বৎসমাজেও উপেন্দ্রবাবুর গ্রন্থ সমাদৃত হইয়াছে। লণ্ডনের সুপ্রসিদ্ধ 'লিনিয়ান সোসাইটী' উপেন্দ্রবাবুকে সদস্যরূপে বরণ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, উপেন্দ্রবাবুর এই সম্মানে ভারতবর্ষের মুখ উজ্জ্বল হইয়াছে।—সাহিত্য-সম্পাদক।

(৩) জাপানের বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতীচ্য বিদ্যা কিরূপে জাপানী ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, তাহা জাপানে শিক্ষাপ্রাপ্ত এবং জাপানীভাষাভিজ্ঞ কোন ব্যক্তি এ দেশের গোচর করিলে একটা বিষম সমস্যার কথঞ্চিৎ সমাধান হইতে পারে। আশা করি, সাহিত্য-সম্পাদক এ বিষয়ে চেষ্টা করিবেন, এবং অনতিবিলম্বে আমাদের কৌতূহলনিবৃত্তি হইবে।—লেখক।

এই সকল প্রস্তর খনি হইতে উত্তোলিত হইয়া এই পথে বিভিন্ন প্রদেশে প্রেরিত হয়। কিছু দিন পূর্ব্বে বরোদাতে বহু লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে 'লক্ষ্মীবিলাস' নামক যে প্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহা ও সুবৃহৎ আফিস আদালতাদির হর্ম্ম্যগুলি সঙ্গদের প্রস্তরে নির্ম্মিত। এই প্রস্তর অনেকটা মার্ব্বেল প্রস্তরের মত; তেমন শুভ্র ও মসৃণ না হইলেও শ্বেতাভ, কঠিন ও সুদৃশ্য। মিস্ত্রীরা অল্প পরিশ্রমেই ইহার উপর কারুকার্য্য করিতে পারে। খনি হইতে ষোল বর্গ ফিট প্রস্তর তুলিবার ব্যয় তিন চারি টাকা; কিন্তু ব্যবহারোপযোগী করিবার জন্য আরও পঁচিশ টাকা ব্যয় করিতে হয়। গ্রীষ্মকালে তিন চারি শত লোক প্রত্যহ এই সকল খনির ভিতর হইতে প্রস্তর তুলিয়া বরোদা, ব্রোচ, রেওয়া কাম্থা, চাঁদয়া, সিনর প্রভৃতি স্থানে প্রেরণ করে। প্রতি গাড়ী প্রস্তরের জন্য বরোদা গবর্মেণ্টকে প্রায় এক টাকা খাজানা দিতে হয়।

এই সকল খনি ভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খনি গায়কবাড় রাজ্যের পার্ব্বত্য অঞ্চলে বিস্তর আছে। যারদ উপবিভাগে ও সুরদা ও সাংখেদার সন্নিকটে হিরাণ নামক নদীর তীরে আর একপ্রকার প্রস্তর পাওয়া যায়। তাহা তেমন কঠিন নহে, তাহাতে চুণ, বালি, কর্দ্দম ও ম্যাগ্‌নিশিয়ার আধিক্য দেখা যায়। বড় বড় নদীগর্ভে মোটা মোটা কঙ্করেরও অভাব নাই, গৃহ হর্ম্ম্য ও রাজপথনির্ম্মাণেও ইহা বহুলপরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শ্রমজীবিগণ গাধার পিঠে বোঝাই করিয়া ইহা সহরে লইয়া যায় ও অল্পমূল্যে বিক্রয় করে। আমাদের দেশের উৎকৃষ্ট বালি অপেক্ষা ইহা অধিক আদরণীয় ও মূল্যবান। সিনর ও কোরাল নামক্ স্থানদ্বয়ের সন্নিকটে নর্ম্মদাগর্ভে একপ্রকার লোহিত প্রস্তরখণ্ড পাওয়া যায়, শালগ্রাম শিলার ন্যায় এ দেশে তাহার আদর। ভক্তের সংখ্যাও অল্প নহে; গোঁড়া হিন্দু সম্প্রদায়ের অধিকাংশ লোকই অল্পাধিকপরিমাণে এই শিলাখণ্ডের ঈশ্বরত্বে বিশ্বাসবান্। এই গুজরাটী শালগ্রাম তাঁহার ভক্ত ও উপাসকবৃন্দের নিকট 'নর্ম্মদা গণপতি' নামে অভিহিত। এই প্রস্তরবিক্রয় অনেক শ্রমজীবীর জীবিকানির্ব্বাহের উপায়। বর্ণানুসারে 'নর্ম্মদা গণপতির' মূল্যের তারতম্য হইয়া থাকে। প্রস্তরখণ্ড যত ক্ষুদ্র, সুগোল ও গাঢ়লালবর্ণবিশিষ্ট হয়, ততই ইহার অধিক মূল্য হয়। হিঙ্গুলোপম সমুজ্জ্বল লাল 'গণপতি' অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য। পাপ কলিযুগের প্রাদুর্ভাবে তাহা আরও দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিতেছে,—ভক্তগণের হউক না হউক, এই প্রস্তরব্যবসায়িগণের দুর্ভাগ্য বটে। এই জাতীয় প্রস্তরের বর্ণ লাল, ক্রমে তাহা পাতলা হইয়া হরিদ্রা ও বাদামী রঙ্গের সহিত মিশিয়া যায়। নৌসেরা

বিভাগের অনেক স্থানে চুণা পাথর পাওয়া যায়, ইহাও রাজ্যের একটি আয়ের বিষয়।

গায়কবাড় রাজ্যের আয়ের আর একটি উৎকৃষ্ট সংস্থান বনবিভাগ। নৌসেরা প্রান্তের অনেক স্থান গভীর অরণ্যে আবৃত। প্রধান অরণ্যখণ্ডের উত্তরে রাজপিপলা পর্ব্বতমালা, পূর্ব্বে খান্দেশ, দক্ষিণে ডানস্ নদী, এবং পশ্চিমে সুরাট। এই অরণ্যময় ভূখণ্ডের পরিমাণফল প্রায় ছয় শত বর্গ মাইল; অর্থাৎ, নৌসেরা বিভাগের প্রায় একতৃতীয়াংশ স্থান অরণ্যসঙ্কুল।

নৌসেরা বিভাগের অধিকাংশ জমীতেই প্রতিবৎসর যথারীতি শস্য উৎপন্ন হয়। কোন কোন জমি শস্য উৎপাদনের পর অনেক দিন ফেলিয়া রাখা হয়, এবং আরণ্য অঞ্চলেই এই নিয়মের বিশেষ প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। এই প্রকার শস্যোৎপাদনের নাম 'খান্দাদ'। ইহা দ্বারা অরণ্যের বিশেষ অনিষ্ট সাধিত হইয়া থাকে। কারণ, অরণ্যের কোন অংশ পরিষ্কার করিয়া কিছু কাল শস্যোৎপাদন করিবার পর সেই জমীর উর্ব্বরতা শক্তির কথঞ্চিৎ হ্রাস হইলেই তাহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক আবার অরণ্যের অন্য অংশ ধ্বংস করা হয়। এই সকল জমীতে প্রথম বৎসর যব, দ্বিতীয় বৎসর ধান্য, এবং তৃতীয় বৎসর ভুট্টা উৎপন্ন হয়, তাহার পর উপর্য্যুপরি কয়েক বৎসর জমী পতিত থাকে। অরণ্যের অভ্যন্তরে এই প্রকার পতিত জমীর সংখ্যা অল্প নহে। প্রায় সকল পতিত জমীই খড়ে পরিপূর্ণ। অনেক সময় এই খড়ে আগুন লাগে। অরণ্যের অনেক সুবৃহৎ বৃক্ষ পর্য্যন্ত ধ্বংস হইয়া যায়। আমাদের দেশের ন্যায় এ দেশেও মুগ, অড়হর, ছোলা, গম, ধান প্রভৃতি ফসল উৎপন্ন হয়, কিন্তু ইক্ষু ও কার্পাসই অপর্য্যাপ্ত জন্মিয়া থাকে।

আরণ্য বিভাগে যে সকল ফসল উৎপন্ন হয়, 'তালাতি' অর্থাৎ গ্রাম্য হিসাবরক্ষক তাহার হিসাব রাখে, "কেরাণী কারকুন" অর্থাৎ পরিদর্শক মুহুরী আবার সেই হিসাব পরীক্ষা করে, এবং উৎপন্ন শস্যের আনুমানিক মূল্যের উপর একটা নির্দ্দিষ্ট কর 'বাহিভাঙ্গার' বা নায়েব কর্ত্তৃক আদায় হয়! শস্যের প্রাচুর্য্য অনুসারে এই করের হ্রাসবৃদ্ধি হইয়া থাকে। ইহার হার নির্দ্ধারণ করিয়া দেওয়া প্রধান রাজস্বকর্ম্মচারীর কার্য্য। সাধারণতঃ উৎপন্ন শস্যের মূল্যের আট তৃতীয়াংশ গায়কবাড়-সরকারে রাজস্বস্বরূপ গৃহীত হয়; অর্থাৎ, এক শত টাকার ফসল জন্মিলে রাজাকে সাড়ে সাঁইত্রিশ টাকা রাজকর দিতে হয়। কোন কোন আরণ্য প্রদেশে জমীর খাজানা উক্ত জমীর কর্ষণের জন্য ব্যবহৃত লাঙ্গলের

সংখ্যার উপর নির্ভর করে। প্রথমোক্ত নিয়মে রাজকর আদায়ের নাম 'কালতার', শেষোক্ত নিয়মের নাম 'হলবন্দী'।

নৌসেরার আরণ্যপ্রদেশে অনেক প্রকার আরণ্যজাতি বাস করে। তাহাদের মধ্যে ধান্দিয়া, ঘোধড়া, গামিত, কঙ্কনা, ভারলি ও ভীল প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য; ইহারা দীর্ঘকাল অরণ্যের এক অংশে বাস করে না; কিছু কাল ফসল উৎপাদনের পর ইহাদের বাসস্থানের সন্নিকটবর্ত্তী জমী অপেক্ষাকৃত অনুর্ব্বর হইয়া উঠিলেই বাসস্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইহারা স্থানান্তরে কুটীর নির্ম্মাণ করে। ইহারা নিরতিশয় আলস্যপরতন্ত্র, মদ্যাসক্ত, ইন্দ্রিয়পরায়ণ, এবং বলা বাহুল্য, দরিদ্র। ইহাদের মধ্যে অনেকেই ভূতের রোজা,—তাহাদের উপর সাধারণের অগাধ বিশ্বাস। ইহারা অত্যন্ত ভূতের ভয় করে; এমন কি, কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইলে ভূতের ভয়ে তাহার আত্মীয়েরা স্ব স্ব ঘরবাড়ী পরিত্যাগ পূর্ব্বক দূরবর্ত্তী গ্রামে পলায়ন করে। অনেকে স্বহস্তে চাষ করে। যাহারা অর্থাভাবে লাঙ্গল বলদ ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া নিজে জমী করিতে না পারে, তাহারা অন্যের চাকরী করে। আরণ্য মধু, কাঠ ও সুখাদ্য ফল মূল বিক্রয় করিয়াও অনেকে জীবিকানির্ব্বাহ করে। ভীলেরা পূর্ব্বে অত্যন্ত উদ্ধত ও যথেচ্ছাচারী ছিল, কিন্তু কিছু কাল হইতে ইহারা শান্তশিষ্টভাবে চাষবাস দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিতেছে। অরণ্যবিভাগের কর্ম্মচারিগণের সহিত ইহাদের বিবাদের কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। এই সকল আরণ্যজাতি পশুপালন করিলে তদ্দ্বারা অবস্থাগত উন্নতিসাধন করিতে পারে, পশুচারণের উপযুক্ত বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রেরও অভাব নাই, কিন্তু ইহাদের সে দিকে লক্ষ্য নাই। ইহারা সম্প্রতি শান্তভাব অবলম্বন করিয়াছে বটে, কিন্তু অরণ্যের নানা স্থানে বহুসংখ্যক গাছ কাটিয়া ইহারা রাজসরকারের ক্ষতি করিতেছে, এবং সর্ব্বদাই বাসস্থান পরিবর্ত্তন করিতেছে—তাই ইহাদিগকে কোনও স্থানে স্থিরভাবে বাস করাইবার জন্য চেষ্টা হইতেছে।

নৌসেরা বিভাগের অরণ্যের প্রধান গাছ শাল। বড় বড় অরণ্যে যে কেবল শাল গাছই দেখা যায়, তাহা নহে। তাহার সঙ্গে বাঁশের ঝাড়, খের, তামরুগ, বেহেদা প্রভৃতি নানা প্রকার আরণ্য বৃক্ষ জন্মে। কোন কোন অরণ্যে শিশু, শাগুয়ান, সাদাদা, বন্দোরা, কেলাই, ও শিবান প্রভৃতি আমাদের পরিচিত ও অপরিচিত নানাবিধ বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়।

পূর্ব্বকালে যাহার আবশ্যক হইত, সেই ব্যক্তিই বনে গিয়া কাঠ কাটিয়া আনিতে

সেই কাঠের উপর অধিকার জন্মিত। কত কাঠ কাটা হইয়াছে, কোন জাতীয় কাঠ, কত দিনের গাছ, এবং কত বড় গাছ, তাহার কোনও অনুসন্ধান হইত না। অনেকে আবার কাঠ কাটিয়াই তাহা উঠাইয়া আনিত না, গাছের ছাল বাকল ও শাখা প্রশাখা বিধ্বস্ত হইয়া গুঁড়িটি পাতলা হইলে উঠাইয়া আনিবার সুবিধা হইত বলিয়া অনেক দিন ধরিয়া তাহা জঙ্গলে ফেলিয়া রাখিত। বলা বাহুল্য, ইহাতে অনেক কাঠ নষ্ট হইয়া যাইত, কতক বা আগুন লাগিয়া পুড়িয়া যাইত, অথচ সরকারের এক পয়সা আয় হইত না, কারণ, কাঠ উঠাইয়া আনিবার পূর্ব্বে ফাঁড়িতে খাজানা জমা করিয়া দেওয়া অত্যাবশ্যক ছিল না।

যাহা হউক, যাহাতে অরণ্য নষ্ট না হইতে পারে, এবং নামমাত্র মূল্যে লোকে যাহাতে স্বেচ্ছামত কাঠ কাটিয়া লইয়া না যাইতে পারে, সে জন্য ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দ হইতে বনবিভাগের কার্য্যে বিশেষ মনোযোগ প্রদান করা হইয়াছে। বর্ত্তমান মহারাজা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বম্বে হইতে এক জন বনবিভাগের কার্য্যে অভিজ্ঞ কর্ম্মচারী আনাইয়া তাঁহাকে বনবিভাগের সংস্কারকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন। তিনি প্রথমে নৌসেরা প্রদেশের অরণ্যসংস্কারে প্রবৃত্ত হন। তাঁহার অধীনে অনেকগুলি লোক আছে। বনবিভাগের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বার্ষিক প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যয় হয়। প্রধান কর্ম্মচারী মাসিক প্রায় পাঁচ শত টাকা বেতন পান, তাঁহার অধীনে ছয় জন কেরাণী, একাদশ জন পেয়াদা, পাঁচ জন দারোগা, ছয় জন নায়েব দারোগা, ৩৬ জন রাখোয়ালদার (রক্ষী) এবং ৩৬ জন সাজেদার (চৌকীদার) আছে। চাষের জন্য রক্ষিত আরণ্যবিভাগের জমী চিহ্নিত করা হয়; সেই চিহ্নিত জমী ভিন্ন অন্য জমী কেহ চষিতে পারিবে না; সমস্ত অরণ্যের জমী এ পর্য্যন্ত চিহ্নিত করা শেষ হয় নাই। পূর্ব্ব হইতে অরণ্যের যে অংশ স্থায়িভাবে কর্ষিত হইয়া আসিতেছে, তাহা আরণ্য বিভাগের অন্তর্ভূত নহে। প্রথম কয়েক বৎসর বনবিভাগের আয় বার্ষিক পঞ্চাশ হাজার টাকার অধিক হয় নাই; অর্থাৎ, আয় হইতে কেবল ব্যয়ের সংকুলান হইত, এখন আয় অনেক অধিক দাঁড়াইয়াছে।

অরণ্যরক্ষায় এখন বরোদা গবর্মেণ্টের বিশেষ দৃষ্টি পতিত হইলেও এখান-কার বনবিভাগ হইতে প্রজাসাধারণ যেমন সহজে ও অল্পব্যয়ে কাষ্ঠ আহরণ করিতে পারে, বৃটীশ-রক্ষিত বনবিভাগ হইতে ভারত গবর্মেণ্টের প্রজাগণ তেমন সহজে ও অল্পব্যয়ে কাঠসংগ্রহ করিতে পারে না। এ অঞ্চলে কাঠের ব্যবসায় প্রধানতঃ পার্শী ও মুসলমানগণের দ্বারা পরিচালিত। নৌসেরার

কাঠ খান্দেশ নাসিক প্রভৃতি অঞ্চলে প্রেরিত হয়; কাড়ি প্রভৃতি উত্তরাংশের বনবিভাগের কাঠ উত্তর গুজরাটের সর্ব্বত্র নীত হইয়া থাকে।

এখানে মজুরীর মূল্য দৈনিক তিন আনা হইতে চারি আনা; আমাদের দেশের পল্লীগ্রামের তুলনায় অবশ্য এ হার অনেক অধিক। কারণ, সেখানে সময়-বিশেষে ছয় পয়সাতেও একটা মজুর পাওয়া যায়। বাঁশ এ দেশে অত্যন্ত সস্তা। ঝাড় হইতে কাটিয়া লইলে আমাদের দেশে টাকায় পাঁচ ছয়খানির বেশী বাঁশ পাওয়া যায় না। কিন্তু এখানে 'ব্যবসায়ী' এক টাকায় (আমাদের বার আনা) এক শত বাঁশ পাওয়া যায়; অরণ্যে বংশের আধিক্যই বোধ করি এই সুলভতার কারণ। মহুয়ার গাছের এ দেশে বড় আদর; কারণ, মহুয়া ফুল হইতে এ দেশে অতি উৎকৃষ্ট মদ্য প্রস্তুত হয়। এক সময়ে সুরাটের মহুয়া মদ্যের বম্বে প্রদেশে অত্যন্ত আদর ছিল। মহুয়ার ফুল বিক্রয় করিয়া অনেক লোক জীবিকানির্ব্বাহ করে। রাত্রে মহুয়া ফুল বৃক্ষমূলে পতিত হয়, প্রভাতে শ্রমজীবিগণ তাহা কুড়াইয়া রৌদ্রে শুকাইতে দেয়, এবং দুই চারি দিনের সঞ্চিত রাশীকৃত মহুয়া ফুল তাহারা মদ্যব্যবসায়ীর হস্তে প্রদান পূর্ব্বক তৎপরিবর্ত্তে ধান্য, লবণ, কাপড় ও অন্যান্য নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্য গ্রহণ করে। গায়কবাড় গবর্মেণ্ট মহুয়ার ব্যবসায় স্বহস্তে গ্রহণ করিলে ইহা দ্বারা রাজ্যের একটি নূতন আয়ের পথ উন্মুক্ত হইতে পারে।

নৌসেরা বিভাগের অরণ্যে যে শালকাঠ পাওয়া যায়, তাহা সাধারণতঃ ৬০।৭০ ফিট উচ্চ এবং আট দশ ফিট পরিধিবিশিষ্ট হয়। কিন্তু এই প্রকার বৃহৎ বৃক্ষ ক্রমে দুর্লভ হইতেছে। এখানকার শালকাঠ মালাবার ও বর্ম্মার শালকাঠ অপেক্ষা ভারি, এক ঘন ফুট মালবার শাল সাড়ে বাইশ সের ভারি, এক ঘন ফুট বর্ম্মার শাল সাড়ে একুশ সের ভারি, কিন্তু নৌসেরার শালের এক ঘন ফুটের ওজন সাড়ে সাতাস সের। এই শাল এমন শক্ত যে, ইহা হইতে গড়ন গড়িতে ছুতারের অস্ত্র শীঘ্রই ভোঁতা হইয়া যায়, সেই জন্য ছুতারেরা কমপোক্ত কাঠ পছন্দ করে। এ অঞ্চলে শিশু কাঠের অত্যন্ত প্রচলন দেখা যায়। ছাগ মেষাদিকে শিশুর পাতা আহার করান হয়।

বরোদা অঞ্চলে তানাক (বাবলা) গাছেরও অভাব নাই। ঘরের খুঁটী, লাঙ্গল, গাড়ী প্রভৃতির জন্য বাবলাগাছ ব্যবহৃত হয়। খয়ের কাঠের ব্যবহারও নিতান্ত অল্প নহে। ঢেঁকি, লাঙ্গল, ঘরের খুঁটী, আকমাড়ার কল, তৈল পিড়াইবার কল (ঘানি বিশেষ) খয়ের কাঠে অতি উত্তম হয়। খয়ের কাঠ ব্যবহারের আর এক সুবিধা এই যে, ইহাতে উই ধরে না। জ্বালানীর জন্যও ইহা প্রচুরপরিমাণে

ব্যবহৃত হয়। নৌকা প্রভৃতি নির্ম্মাণের জন্য হালাদোয়াল নামক আর এক জাতীয় কাষ্ঠ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহাতেও উই লাগে না।

এ দেশে আইন নামক এক জাতীয় কাঠ আছে, শালগাছের ন্যায় এই গাছ অতি বৃহৎ হইয়া থাকে। জ্বালানীর জন্য ও গৃহনির্ম্মাণের অভিপ্রায়ে এই কাঠ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার ছালের রসে চামড়া মজবুদ হয়, এবং ইহার পাতা রেশম-কীটের খাদ্য। উপরে আমরা যে মহুয়া ফুলের কথা বলিয়াছি, উহার ফলও অতি সুস্বাদ, বীজ হইতে এক প্রকার শ্বেতবর্ণ তৈল উৎপন্ন হয়, উহা পোড়াঘা ও চর্ম্মরোগের পক্ষে বিশেষ উপকারী। মহুয়াগাছ যে কেবল অরণ্যেই পাওয়া যায়, তাহা নহে। বরোদা রাজ্যের সর্ব্বত্রই ইহা প্রচুর জন্মিয়া থাকে। ইহার পাতা আমাদের দেশের কদলীপত্রের ন্যায় খাদ্যাধার-রূপে ব্যবহৃত হয়। চারোলী বাদামজাতীয় বৃক্ষ, অরণ্যের মধ্যেই ইহা অধিক-পরিমাণে পাওয়া যায়। আরণ্য জাতি এই ফল সংগ্রহ করিয়া নগরে লইয়া যায়, এবং ইহার বিনিময়ে লবণ গোধূম প্রভৃতি নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি গ্রহণ করে। মিষ্টান্নবিক্রেতারা এই ফলের যথেষ্ট আদর করে। কারণ, কোন কোন প্রকার মিষ্টান্নে এই ফল বাদামের ন্যায় ব্যবহৃত হয়। এই ফল হইতে তৈলও উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহার বর্ণ প্রায় বাদামের তেলের মত।

শরৎকালে বঙ্গদেশে যখন দুর্গোৎসব আরম্ভ হয়, সেই সময় এখানে আপ্তা নামক বৃক্ষের পূজা হইয়া থাকে। আমাদের দেশের বট, তুলসী, মনসা প্রভৃতি গাছের ন্যায় এখানকার আপ্তা গাছ অতি পবিত্র। আপ্তা গাছ পূজার সময় ইহার পাতা, অশোকষষ্ঠীর সময় আমাদের দেশের অশোকফুলের মত, আত্মীয় স্বজন ও হিতৈষিগণের মধ্যে বিতরিত হইয়া থাকে। এ দেশে তামাক খাই-বার নিয়ম আমাদের দেশের মত নহে। হুঁকা প্রায় দেখা যায় না। সকলেই এতদ্দেশীয় চুরুট (বিড়ি) ব্যবহার করে, আপ্তা বৃক্ষের পত্র এই সকল বিড়ির আবরণস্বরূপ ব্যবহৃত হয়। বিল্ব, বট, আম্বা (আম্র) আমলি (তেঁতুল) তাল, খর্জ্জূর প্রভৃতি বঙ্গদেশসুলভ বৃক্ষেরও এখানে অভাব নাই। পাকুড় গাছে এ দেশে অপর্য্যাপ্তপরিমাণে লাক্ষা জন্মিয়া থাকে। এ দেশের রেশমকীট আমাদের দেশের মত নহে, তাহা অপেক্ষা অনেক বড় হয়, রেশমসূত্রও কিছু স্থূলতর, কিন্তু বঙ্গদেশের রেশম অপেক্ষা তাহা উৎকৃষ্ট নহে। এ দেশী রেশমকীট আট দশ প্রকার বৃক্ষের পাতা খাইয়া থাকে। রেশম-কীট হইতে সূত্র জন্মিতে এখানে প্রায় পঞ্চাশ দিন সময় লাগে।

বরোদা রাজ্যে রায়ান নামে একজাতীয় ছোট ছোট ফল পাওয়া যায়; পাকিলে তাহা পীতবর্ণ হয়; ভিতরে প্রচুর আঠা, গরীব লোকে গ্রীষ্মকালে দধির জলের সহিত এই ফলের রস মিশাইয়া ভক্ষণ করে। ইহা অত্যন্ত শীতল, এবং ধারকগুণবিশিষ্ট। ইহার বীজ হইতে শ্বেতবর্ণ তৈল প্রস্তুত হয়। এই তৈল মাখমের সহিত মিশ্রিত করিয়া মাখমব্যবসায়িগণ মাখমের পরিমাণ বর্দ্ধিত করে। ইহার কাঠ এত ভারি যে, তাহা জলে ভাসে না। এখানকার লোক কাঁচা তেঁতুল খাইতে অত্যন্ত ভালবাসে। তেঁতুলের কাঠ আখমাড়া কল প্রস্তুতের জন্য অধিকপরিমাণে ব্যবহৃত হয়। আমলা গাছের সংখ্যা এখানে অনেক। কবিরাজী ঔষধের জন্য আমলকী সংগ্রহ করিয়া গরীব লোকেরা বাজারে বিক্রয় করে। কার্ত্তিক মাসে অনেকে সখ করিয়া আমলা গাছের নীচে ভাত রাঁধিয়া খায়। সমদী গাছের ফল এ দেশের উত্তম তরকারী, উহা দেখিতে অনেকটা যজ্ঞডুমুরের মত। গণপতিপূজায় ইহার পাতা নিবেদিত হয়। এ দেশে ডুমুরগাছও অনেক আছে। তাহার নাম এখানে উড়ুম্বর। বারখাদা নামক বন্যগাছের ফল বাতের অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। কাড়ি বিভাগের কোন কোন অংশে অনেক চন্দন-বৃক্ষ আছে। ইহা ত্রিশ হইতে ষাট ফিট পর্য্যন্ত উচ্চ হইয়া থাকে। ডোল নামক বৃক্ষের ফলে যে তৈল উৎপন্ন হয়, গরীব লোকে তাহা ঘৃতের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করে। অনেকে তাহা মাখমের সহিত ভেজাল দিয়া বিক্রয় করে। এই সকল বৃক্ষ ভিন্ন এ দেশে এত বিভিন্নজাতীয় বৃক্ষ আছে যে, তাহাদের কথা বিশেষ করিয়া বলিতে গেলে পুঁথি বাড়িয়া যাইবে।

এ দেশে ফলের সংখ্যা আমাদের দেশ অপেক্ষা অল্প নহে। আম্র, চকড়ি (কদলী), দাড়াম (দাড়িম্ব), পেঁপে, রামফল (পেয়ারা), আনানা (আনারস), মিঠা লিম্বু (মিষ্ট লেবু), রামফল (আপেল), সীতা ফল (আতা), নালিয়ার (নারিকেল), রায়ান, বোর (কুল), জাম্বু (জাম), আঙ্গুর, কাঁকুড় প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। ফুলের মধ্যে গোলাপ, মগরো (বেল), যুঁই, বকুল, অশোক, চম্পক, সেঁউতি, শেফালিকা প্রভৃতি নানাজাতীয় ফুল আছে। শেফালিকা ও বিল্ববৃক্ষ গুজরাটে অত্যন্ত অধিক। স্থানে স্থানে বহুদূরব্যাপী শেফালিকার বিস্তীর্ণ জঙ্গল আছে। শরৎকালের শিশিরপ্লাবিত প্রভাতে অসংখ্য প্রস্ফুটিত শেফালিকা যখন তরুমূল আচ্ছন্ন করে, তখন সেই নির্ম্মল সুশীতল প্রাতঃসমীরণের মধুর হিল্লোলে তাহার সুধাগন্ধ বহু দূর পর্য্যন্ত প্রমোদিত করিয়া তুলে।

তরকারীর মধ্যে এ দেশে আলু ও বেগুন প্রধান। বেগুনের অত্যা-

চারে আমরা বিষম বিব্রত! প্রায় বার মাসই বেগুন পাওয়া যায়। দেখিতে কতকগুলি আমাদের দেশের 'শলে' বেগুনের মত; আর কতকগুলি বৃহতীর মত। রাঁধিবার সময় 'স্বয়পাকওয়ালী' (রাঁধুনী) তাহার কাঁটাগুলির মায়াও ত্যাগ করিতে পারে না। সুতরাং রন্ধননৈপুণ্যে ইহা অতি চমৎকার অখাদ্য হইয়া উঠে। এখানে সুরান নামক এক প্রকার মিষ্ট আলু আছে, তাহা আমাদের দেশের লাল আলুর মত। এতদ্ভিন্ন কপি, লাউ, কুমড়া, করলা, বিট পালং, মূলা প্রভৃতি নানাজাতীয় তরকারী পাওয়া যায়। লাউ কুমড়া প্রভৃতির আকার অতি ক্ষুদ্র।

গ্রাম্য পশুর মধ্যে এ দেশে হস্তী, অশ্ব, গো, মহিষ, মেষ, গর্দ্দভ, উষ্ট্র প্রধান। উষ্ট্র এখানে জন্মে না, কাটিয়ার ও মাড়োয়ার হইতে এখানে আনীত হয়। এ দেশে চাষের কার্য্য সর্ব্বদা বলদের দ্বারা নির্ব্বাহিত হয়। হলচালনে কখন মহিষ নিযুক্ত হয় না। এক জোড়া বলদের দাম চল্লিশ হইতে আড়াই শত টাকা পর্য্যন্ত হইতে পারে। গাড়ী টানিবার জন্য যে সকল হৃষ্টপুষ্ট ঐরাবতসদৃশ বলদ ব্যবহৃত হয়, তাহা সাধারণতঃ পেতলাদ নামক স্থান হইতে আমদানী হইয়া থাকে। পেতলাদের খুব ভাল এক জোড়া বলদ পাঁচ শত টাকা মূল্যেও বিক্রীত হইতে দেখা যায়। এই সকল বলদের শৃঙ্গ হরিণশৃঙ্গের ন্যায় দীর্ঘ ও সুদৃশ্য। অনেকে তাহাদের শৃঙ্গাগ্র পিত্তল দ্বারা বাঁধাইয়া দেয়। মধ্যশ্রেণীর চাষী গৃহস্থ-গণ এক জোড়া মহিষী ও এক জোড়া বলদ রাখে। রাবারীগণ (যাহারা দুগ্ধ ঘৃতাদি বিক্রয় করে) অনেক গাই ও স্ত্রীমহিষ পালন করে। এ দেশে পুংজাতীয় মহিষের সংখ্যা অত্যন্ত অল্প। আমাদের দেশের গোয়ালা অপেক্ষা রাবারীগণ অধিক নির্দ্দয়। পুংজাতীয় মহিষবৎসগুলি মাতৃদুগ্ধ হইতে বঞ্চিত হইয়া শৈশবেই প্রায় মারা পড়ে। দুগ্ধবতী গাভীগুলি তেমন হৃষ্টপুষ্ট নহে; দশ টাকা হইতে চল্লিশ টাকা দামের গাভী আমাদের দেশের সের হিসাবে এক সের হইতে চারি সের পর্য্যন্ত দুগ্ধ দেয়। যে সকল স্ত্রীমহিষ আড়াই সের হইতে ছয় সের পর্য্যন্ত দুগ্ধ দেয়, তাহাদের দাম যথাক্রমে পনের হইতে ষাট টাকা পর্য্যন্ত হয়। দক্ষিণ বিভাগে গো ও মহিষের বংশবৃদ্ধির জন্য প্রত্যেক গ্রামে একটি করিয়া ষাঁড় ও মহিষ সাধারণের ব্যয়ে প্রতিপালিত হয়। এ অঞ্চলে দুই জাতীয় বলদ দেখা যায়; এক জাতীয়ের নাম তালাব্দা, এবং অন্য জাতীয়ের নাম হেদিয়া। তালাব্দা-গুলি অতি বৃহদাকার, উত্তর গুজরাটে ইহাদের সংখ্যা অধিক, ইহাদের প্রত্যেকটির মূল্য ৫০৲ হইতে ৯০৲ টাকা পর্য্যন্ত হয়, এবং ইহারা পঞ্চদশ বৎসর

পর্য্যন্ত পরিশ্রম করিতে পারে। হেদিয়া বলদ বার বৎসর খাটিয়াই অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে, ইহাদের মূল্যও অপেক্ষাকৃত অল্প। পারসী ও মুসলমানেই এখানে মুরগী পুষিয়া থাকে; কিন্তু ব্রাহ্মণদিগের রান্নাঘরেও মুরগী প্রবেশ করিতে দেখা যায়, ইহাতে জাতিনাশের আশঙ্কা নাই। অনেক সম্ভ্রান্ত মারাঠাও হাঁসের মত মুরগী পালন করেন। কাটিয়ার অশ্বের জন্য বিখ্যাত, কাটিয়ারী অশ্ব অতি সুলভ; দেখিতে অধিক উচ্চ হয় না, কিন্তু ইহারা অসাধারণ পরিশ্রম করিতে পারে। এখানে কাটিয়ারী অশ্ব অনেক, কাটিয়ারে যে অশ্বের মূল্য এক শত টাকা, আমাদের বঙ্গদেশে তিন শত টাকাতেও তেমন উৎকৃষ্ট অশ্ব পাওয়া যায় না। অশ্ব অপেক্ষা অশ্বিনীরই এখানে অধিক আদর। বরোদার স্থানীয় অশ্বগুলি কাটিয়ারী অশ্বের মত সুদৃশ্য, তেজস্বী ও শ্রমক্ষম নহে।

তুষবিক্রেতা ও কুম্ভকারগণ অধিকপরিমাণে গর্দ্দভ প্রতিপালন করে। এদেশী কুড়ি টাকায় অর্থাৎ আমাদের দেশের পনের ষোল টাকায় একটা খুব ভাল গাধা কিনিতে পাওয়া যায়। এক এক জন লোকের এক পাল করিয়া গাধা আছে; ইহাদিগকে যদি ঘর হইতে খাবার যোগাইতে হইত, তাহা হইলেই গৃহস্থের সর্ব্বনাশ আর কি! সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, এ দেশে গাধাকে কেহই ঘরের পয়সা খরচ করিয়া খাওয়ায় না, মোটবহা শেষ হইলে গৃহস্থ দলকে দল ছাড়িয়া দেয়, তাহারা পুকুরের পাড়ে, পথের ধারে, খোলা মাঠে, জঙ্গলের মধ্যে, আমের বাগানে চরিয়া ঘাস লতাপাতায় উদর পূর্ণ করে। বরোদায় ছাগলের মূল্য চারি পাঁচ টাকা হইতে আট নয় টাকা পর্য্যন্ত হয়। এই ছাগের দেহ লম্বা লম্বা লোমে আচ্ছন্ন। ছাগ ও মেষের লোম কাটিয়া মেষপালগণ মোটা কম্বল ও শীতবস্ত্র বয়ন করে। এই সকল বস্ত্র বম্বে অঞ্চলে চালান হয়। আহারার্থ এখানে প্রত্যহ বহুসংখ্যক ছাগ ও মেষ নিহত হয়; তাহাদের চর্ম্ম ও চর্ব্বিও বম্বেয় প্রেরিত হইয়া থাকে। বরোদায় কুকুরের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক; তাহাদের আকার অতি বিশ্রী, অধিকাংশই লোমহীন। এমন পথ নাই, যেখানে পাঁচ সাত দশ হাত অন্তর একটি কুকুরকে শুইয়া থাকিতে না দেখা যায়; কিন্তু আহারাভাবে বেচারীরা এতই দুর্ব্বল যে, জীবিত কি মৃত, তাহা অনুমান করা কঠিন; দৈবাৎ কেহ লাঠির খোঁচা মারিলে একবার ইহারা মাথাটা একটু উচু করিয়া তৎক্ষণাৎ মাটিতে পড়িয়া চক্ষু মুদ্রিত করে। গুজরাটী বণিকগণ জৈন; তাঁহাদের 'অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ', সুতরাং তাঁহারা কুকুর-বধের বিরোধী বলিয়া কুকুরের সংখ্যা অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়া বরোদা

ও অন্যান্য গুজরাটী নগর আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু এই ধার্ম্মিক বণিক-সম্প্রদায় কুকুরের জীবনযাত্রানির্ব্বাহের জন্য কোনও প্রকার বরাদ্দ করিয়াছেন বলিয়া জানিতে পারি নাই।

বানরের অত্যাচারে এ দেশের কৃষকগণ বড়ই ব্যতিব্যস্ত। শাখামৃগগণের অখাদ্য ফল প্রায় নাই বলিলেই হয়। কিন্তু বঙ্গদেশ অপেক্ষা এ দেশে হনু-মদ্বংশীয়ের সম্মান মনুবংশীয়ের নিকট অনেক অধিক। সেদিন উড়িষ্যায় বানর-বধের জন্য খুব আন্দোলন হইয়া গিয়াছে। এ দেশে বানরবধ দূরের কথা, তাহাদের প্রতি অত্যাচার করাও লোকের চক্ষে ভয়ানক অধর্ম্মজনক; হনুমানজী দেবতার আসনে উপবিষ্ট, অনেক স্থলেই তাঁহার পূজা হয়।

এ রাজ্যের অরণ্যে আরণ্য জন্তুর মধ্যে ব্যাঘ্র, চিতা, নানাজাতীয় হরিণ, শূকর, ভল্লুক, নেকড়ে, শৃগাল, শশক, বানর, ময়ূর, পেচক প্রভৃতি নানা-প্রকার পশুপক্ষী দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমান মহারাজের পিতা মহারাজ খাণ্ডিরাও সাহেব অতি দক্ষ শিকারী ছিলেন। বরোদা হইতে ছয় মাইল দূরে জাম্বোয়া নদীর তীরে ও আঠার মাইল দূরবর্ত্তী মাহী নদীর তীরে ভাবোকা নামক স্থানে শিকারের জন্য বরাহরক্ষার দুইটি স্থান ছিল। শেষোক্ত স্থানটি এখনও শিকারীদিগের একটি উৎকৃষ্ট আড্ডা। বর্ত্তমান মহারাজা প্রতিবর্ষে একবার করিয়া ইতোলা নামক স্থানে মহা আয়োজনে শিকারে যান। এই সময়ে তাঁহার সঙ্গে কুড়িটি সুসজ্জিত হস্তী ও বহুসংখ্যক অশ্বারোহী সৈন্য গমন করে। বরোদার সন্নিকটে জঙ্গলে বহুজাতীয় হরিণ পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে বেকারী (চতুঃশৃঙ্গ-বিশিষ্ট হরিণ) চিতল (চিত্রিতচর্ম্মবিশিষ্ট হরিণ) প্রধান। শাবর ও নীলগাইও দুর্লভ নহে। জঙ্গলে নানাপ্রকার আরণ্য পক্ষী দেখা যায়। বহুসংখ্যক সারস পক্ষী শীতকালে এখানে চরিতে আসে; অন্য সময় তাহাদের দেখা যায় না। বাজের লড়াই বরোদার প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের আমোদপ্রদ ক্রীড়া। পূর্ব্ব পূর্ব্ব গায়কবাড় রাজগণ মুরগী, পারাবত, বুলবুল প্রভৃতি পক্ষী পুষিয়া তাহাদিগকে লড়াই শিখাইতেন। এখনও সময়ে সময়ে মহারাজা বাহাদুর অমাত্যবর্গে পরিবৃত হইয়া হস্তী, বৃষ, মহিষের লড়াই দেখিয়া আমোদলাভ করেন। নগরের বাহিরে প্রকাশ্য রঙ্গভূমিতে এইরূপ লড়াই বৎসরের মধ্যে দুই চারিবার হইয়া থাকে।

গুজরাট অঞ্চলে উচ্চবর্ণের মধ্যে মৎস্যভক্ষণপ্রথা প্রচলিত না থাকিলেও মাচ্ছি, মুসলমান, ধাঙ্কা, কোলি প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর লোক নদীতে মাছ ধরিয়া থাকে। কারণ, নিম্নশ্রেণীর হিন্দুসমাজে মৎস্যভক্ষণপ্রথা আমাদের দেশের মতই প্রবল।

নর্ম্মদা ও মাহী নদীতে ও বড় বড় পুষ্করিণীতে অনেক মাছ পাওয়া যায়। মৎস্য হইতে রাজ্যের অধিক আয় হয় না। যে সকল জেলে নৌকা লইয়া সমুদ্রে মাছ ধরিতে যায়, তাহাদিগকে প্রত্যেক ক্ষেপে সরকারে দুই আনা হিসাবে খাজানা দিতে হয়। এখানকার মৎস্য আমাদের দেশের মৎস্যের ন্যায় সুস্বাদ নহে; রন্ধনের দোষ কি না, বলা যায় না। ইহারা একেবারেই মাছ ভাজে না। কিন্তু রোহিতাদি শ্রেষ্ঠ মৎস্যের স্বাদও ভাল নহে। ইলিশ এ অঞ্চলে নাই। বাণ, সিঙ্গি, বোয়াল, চিংড়ি, ট্যাংরা, রুই, কাতলা, মৃগেল প্রভৃতি মাছ এ দেশে পাওয়া যায়। কিন্তু আমাদের দেশের অনেকজাতীয় মাছ এ দেশে নাই; আবার এ দেশের বিলঙ্গী, কুড়ালী, সিঙ্গাণী, ধেবড়া, গুড়াদা, পাধাও, বাসির, পলবা, দোদো, গাগড়ো, গারি, কুট, ধাংড়ি, চানকি, তারমোরা, গোদড়া, পালাবদি, মোরিয়া, ভালু, ভানজি, লেওটা, মুদার, কাড়োয়ারি, জিণ্ডি, বুমলা প্রভৃতি মৎস্যের নাম বাঙ্গলা দেশে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। ছোগিয়ো, ওফার, পনড়ে, গোলবা, এই চারি প্রকার জালে এ দেশে মৎস্য ধরে। ছোগিয়া ছোট জাল, আমাদের দেশের খ্যাপলা জালের মত, ইহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্য ধরা পড়ে। বৃহৎ মৎস্য ধরিতে পনড়ে জাল ফেলা হয়, ইহা বারো তেরো হাত লম্বা, প্রস্থও সেইরূপ, অনেকগুলি পনড়ে একত্র করিয়া নদীর একধার ঘিরিয়া ক্রমে তাহা তীরের দিকে টানিয়া তোলা হয়; ইহার সহিত আমাদের দেশের বেড়া জালের অনেকটা সাদৃশ্য আছে। এই জালে বড় বড় মাছ পড়ে। ওফার জাল বিশ পঁচিশ হাত লম্বা, ইহা খুঁটাতে আটকাইয়া সেই খুঁটা জলের মধ্যে পুঁতিয়া দেওয়া হয়।

চিত্র ও চরিত্র।

১

"সহজ প্রকৃতিগত সংস্কার আমাদিগের চরিত্র হইতে লুপ্ত হইয়া যাওয়াতে মতভেদের সৃষ্টি হইয়াছে।"

বিনোদ এই মতের পোষকতায় আত্মবিসর্জ্জনে বদ্ধপরিকর হইয়া মাথায় একটা পাগড়ী বাঁধিলেন, পায়ে দিল্লীবাজ জরির জুতা পরিলেন, গোঁফে তা দিয়া 'ডবল ব্রাকেটে'র সৃষ্টি করিলেন, একখানা রেশমের কাপড় মালকোঁচা করিয়া

পরিলেন, এবং পরিশেষে মল্লিক কোম্পানীর পঞ্জাব-আস্তীন 'শার্ট' পরিধান করিয়া উদ্যানবাটীতে কমলের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

কমল সান্ধ্য বেশ পরিধান করিয়া আসিতেছিল। অনতিদূরে একটা কাঠ-খোট্টার মত লোক দেখিয়া ফিরিল।

বিনোদ ঈষৎ হাসিয়া করোত্তোলনপূর্ব্বক ডাকিলেন,

"উহুঁ! শোন, শোন, আমি!"

কমল সত্রাসে একেবারে বাটীর মধ্যে গিয়া ছোটদিদিকে ডাকিল, "ছোট-দিদি! ওঁর কি আক্কেল! বাগানে এক জন কাঠখোট্টাকে কোথা থেকে জুটাইয়াছেন, সেটা এমন অসভ্য যে, আমাকে দেখে হাত তুলে ডাক্‌ছিল!"

ছোটদিদি। বিনোদের সম্মুখে?

কমল। না, সে মিন্‌সে একলা ব'সে আছে।

ছোটদিদি ছাতে উঠিলেন। অপেরা-গ্লাস সহযোগে ব্যাপারটা বুঝিতে পারিলেন।

"কমল তোর 'ইভ্‌নিং ড্রেসটা' খোল্।"

কমল। কেন?

ছোটদিদি। কারণ আছে।

কমল তাই করিল। ছোটদিদি কমলকে একখানি নীলাম্বরী শাটী পরাইয়া দিলেন। গতবর্ষের ঠাকুর ভাসানের সময় ইন্দু একখানা দুর্গা ঠাকরুণের মুকুট লুটিয়া আনিয়াছিল; সেটা মাথায় বাঁধিয়া দিলেন। পায়ে একজোড়া মখমলের চটি দিলেন, এবং হাতে একটা বীণা দিয়া বলিলেন, "তুই এখন যা।"

কমল। ছোট দিদি তুমি কি পাগল হয়েছ? তিনি দেখলে বল্‌বেন কি?

ছোটদিদি। তিনিই কাঠখোট্টা সাজিয়াছেন, তুই একবার বুদ্ধি দিয়ে আস্‌গে যা।

কমল হাসিয়া খুন! তাই ত, তাঁর রঙ্গ করিবার প্রবৃত্তি ত এত অধিকমাত্রায় ছিল না!

কমলের আকস্মিক প্রস্থানে বিনোদ প্রথমে বিরক্ত হইয়াছিলেন। "আজ-কালকার্ মেয়েরা কেবল স্বামীর 'বেশ' দেখিয়া চেনে, কিন্তু একটা ছাগল কি গরু এক মাইল দূর হইতে আত্মীয় কুটুম্বের ডাক শুনিয়া অভ্রান্তচিত্তে নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া পঁহুছে। মানব আবার শ্রেষ্ঠ কিসে?"

তিনি উঠিয়া যাইবেন, এমন সময় কাঁঠাল গাছের উত্তর পশ্চিম কোণে সূর্য্যদেব

অস্ত যাইতেছেন দেখিয়া বিনোদ দাঁড়াইলেন। বাগানটা অতি ছোট, 'হোরা-ইজনে'র দিকে একটা সুর্‌কীর কলের মাথা, দগ্ধ আকাশে একখানা মেঘ নাই।

"এরূপ স্থলে সূর্য্যদেবের গলায় দড়ি দিয়া মরা উচিত। এমন একটা কিছু নাই যে, যাহাতে সূর্য্যাস্তের শোভা একটু দেখিয়া লই ?"

ইতিমধ্যে কমল বীণাহস্তে কামিনীগাছের নীচে দুইটা কাগজের পদ্ম পাতিয়া বসিয়া পড়িল।

অস্তগামী সূর্য্যের প্রতি অনেকক্ষণ তাকাইয়া বিনোদের দৃষ্টিবৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে। বিনোদ স্বভাবের উপাসক, এবং কিছু 'নার্‌ভাস্'। এই অপরূপ দৃশ্যে তাঁহার মনে উদয় হইল যে, কোনও পূর্ব্বসংস্কার স্মৃতিপটে জাগিয়া উঠিয়াছে ধীরে ধীরে বিনোদ বলিলেন, "দেবী! একটা পূরবী বাজাও।"

কমল নিখাদ হইতে গান্ধার পর্য্যন্ত একটা মিড় কসিতেই বিনোদের শরীর রোমাঞ্চিত হইল। আহা! এটা যদি 'লেক কমো'তে হইত!

২

বিনোদ যখন বিলাত হইতে ফিরিয়া আসেন, তখন ইতালীর 'কমো' হ্রদ দেখিবার সখ হয়। Lake Como সার চার্লস্ টারনারের প্রসিদ্ধ চিত্র।

একটা gorgeous সনসেটের সময় কমো হ্রদের অনতিদূরে একখণ্ড শিলায় উপবেশন করিয়া বিনোদ নিজের 'পোর্টফোলিওটা'র উপর 'স্কেচ্' করিতেছিলেন।

হঠাৎ একটা ছায়া পোর্টফোলিওর ঈশান কোণে বিলম্বিত হইল। "যাঃ! মেঘ উঠ্‌ল বুঝি ?"

বিনোদ মুখ তুলিয়া চাহিলেন। একখানি ম্যাডোনার ছবি তাঁর স্কন্ধের বার ইঞ্চি দূরে উঁকি মারিতেছে।

'সন্‌সেট'-বিজড়িত মধুর হাসি ঢালিয়া দিয়া বালিকা ইতালীয় ভাষায় জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি ল্যাণ্ডস্কেপ্ পেণ্টার ?"

বিনোদ ইতালীয় ভাষা জানিতেন। ল্যাণ্ডস্কেপের মুখে ছাই! বিনোদ সলজ্জে পোর্টফোলিও রাখিয়া দিলেন।

"আমি নূতন ব্রতী—শিক্ষানবিশ। এ ল্যাণ্ডস্কেপ ইতালীর জন্য। আমি ভারতবাসী ভ্রমণকারী, বসিয়া সময় কাটাইতেছি।"

বালিকা। আপনি ভারতবাসী ? কিন্তু দেখিতে ইতালীয়ের ন্যায়। আপনি ইচ্ছা করিলে ভাল Portrait Painter হইতে পারিতেন। আমি অনেক ক্ষণ

দেখিতেছিলাম। আপনার Curve ল্যাণ্ডস্কেপের উপযোগী নয়। অস্ত-গামী সূর্য্যের পরিধি মানুষের মাথার মত হইয়াছে।

বিনোদ। আপনার নাম কি?

বালিকা। "রোসেটি"। আমি ঐ হোটেলে থাকি। আমার পিতা হোটেলের স্বত্বাধিকারী। আপনি কোথায় আছেন?

বিনোদ। বেশী দূরে নহে; আমি ঐ হোটেলেই যাইব।

রোসেটীর পিতা চিত্রকর। বিনোদ এক সপ্তাহ সেই হোটেলে থাকিয়া Potraitএর টচ্ (স্পর্শকৌশল) শিক্ষা করিলেন। এক সপ্তাহের পর একটা বড় দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ কবিয়া ব্রিণ্ডিসি রওনা হইলেন। দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত বিনোদের হৃদয়ের অর্দ্ধেকটা ইতালীর লেক কমোতে বিসর্জ্জিত হইয়াছিল।

বাকী অর্দ্ধেক তিনি ইতিপূর্ব্বে কলিকাতায় কমলের নিকট রাখিয়া যান। সেটুকু লইয়া কোনও গোলমাল হয় নাই। বিনোদের মতে, প্রেম স্বোপার্জ্জিত ধন। ইহার বণ্টনের ভার মালিকের হস্তে। তবে একবার দিয়া পুনরায় ফিরা-ইয়া লইলে 'কালীঘাটের কুকুর হইতে হয়', তাহা সত্য!

"আমার অর্দ্ধেক সম্পত্তি আমি জলে ফেলিয়া দিয়াছি, ইহাতে কাহারও দাবী দাওয়া নাই।" এটা আইনানুমোদিত সহজ সংস্কার।

বিনোদ কলিকাতায় প্রত্যাগত হইয়া রোসেটীর ক্ষুদ্র হাফ্‌টোনখানা আফিস-বাক্সে Evidence Actএর মলাটের মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন। কমল বোকা, তাই এত দিন Evidence Act কখনও খুলিয়া দেখে নাই।

বীণা শুনিতে শুনিতে বিনোদের চিত্ত কমো হ্রদের দিকে গেল। মনে হইল, "রোসেটীর মাথায় মুকুট কেন?" তাহাই আধ-আধ স্বরে প্রকাশ্যভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন।

কমল ভাবিল, "রোসেটী" মানে গোলাপ। কড়িমধ্যম কাঁপাইয়া পুরা মধ্যমে মিড় দিয়া গান্ধারে নামিল।

কমল। ভেবে দেখ না!

বিনোদ ভাবিয়া দেখিলেন। "তোমার কাপড়খানা নীল, আকাশও নীল। তোমার মুখ Orange, আর 'সন্‌সেট্'টাও Orange। তোমার মখমলের জুতা Dark Sienna, সেটার সহিত প্রস্ফুটিত পদ্মের Contrast বেশ হয়েছে। তবে তোমার মুকুটটা Setting Sunএর সঙ্গে harmony রাখিতে পারে নাই।"

কমল। তোমার পাগড়ী সাদা, আর সুরকীর কলের ধূমটা কাল। তোমার পঞ্জাবীটা পাটকিলে, আর কাঁঠাল গাছটা সবুজ। তোমার কাপড়খানা ধূসর, আর সন্ধ্যাও পাটল। এ সব বেশ হয়েছে, কিন্তু তোমার জরীর নাগরা জুতোটার সঙ্গে 'সন্‌সেট্'টার harmony মোটেই হয় নাই।

· বিনোদ সমালোচনার Force অনুভব করিলেন।

"তবে কি করি?"

কমল। তুমি জরীর জুতা ফেল।

বিনোদ। তুমি মুকুট খোল। আর দেখ "রোসেটী", তুমি বাঙ্গালা শিখ্‌লে কবে?

কমল। অল্প দিন।

বিনোদ। আমার শেষ চিঠি পেয়েছিলে?

কমল। কোন্ চিঠি?

বিনোদ। তবে বুঝি পাও নাই। কমল সেখানা নিয়ে একদিন টানাটানি ক'রেছিল। বোধ হয় তার সন্দেহ হয়েছিল।

কথাটা সত্য। হঠাৎ কমলের মনে হইল, ইহার মধ্যে কিছু আছে। তার হাত কাঁপিতে লাগিল। ভুলিয়া ধৈবতটা কোমল করিয়া ফেলিল। পূরবীটা পরজের মত বাজিতে লাগিল।

কমল বিনোদের স্বভাব জানিত। বিনোদ "Dreamer"। জাগিয়া স্বপ্ন দেখে।

কমল। বোধ হয় কমল চুরী করেছে।

বিনোদ। সর্ব্বনাশ! তোমার মুখখানা আমি Evidence Actএর মলাটের মধ্যে রেখেছি, কমল সেটার সন্ধান পায়নি ত?

কমল। না, তুমি ঘুমোও, আমি সেখানা নিয়ে আসি।

কামিনীগাছের তলে বিনোদ সুশীতল বাতাস পাইয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন। কমল দৌড়িয়া গিয়া Evidence Actএর মলাট খুলিয়া যাহা দেখিল, তাহা অপূর্ব্ব!

একটি ছোট হাফ্‌টোন-চিত্রে 'লেক কমো'র ধারে আলুলায়িতকেশে একটি ভুবনমোহিনী বালিকা দাঁড়াইয়া সতৃষ্ণনয়নে সূর্য্যাস্ত দেখিতেছে!

কমল বলিল, "বটে, দাঁড়াও, তোমার কাঠখোট্টামি আমি বার করছি।"

৩

কমলের প্রথম উদ্বেগে ছবিখানা ছিঁড়িয়া ফেলিবার দুর্দ্দম্য ইচ্ছা হইল। কিন্তু সেটা যুক্তিসঙ্গত নহে বিবেচনা করিয়া ছোট দিদির নিকট গেল।

ছোট দিদি প্লটখানা অবিলম্বে বুঝিয়া লইলেন।

কমল। দেখ্‌লে ত?

ছোট দিদি বিনোদের কনিষ্ঠা ভগিনী। মনে মনে বিনোদের রুচির প্রশংসা করিলেন। এ ছবির কাছে বৌ কোথায় লাগে?

ছোট দিদি। বৌ! ওটা বিনুর একটা খেয়াল, কিছু মনে করিস্‌নি।

কমল। খেয়াল নয় দিদি, এটা টপ্পা। পূর্ব্বরাগ। সোজা কথায় এটা চুরি। বিশ্বাসঘাতকতা। প্রবঞ্চনা।

এই ধারাবাহী অভিযোগে ছোট দিদির সহানুভূতি প্রবল হইয়া উঠিল। তিনি ঈষৎ ভ্রূভঙ্গী করিয়া কমলের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন।

"আচ্ছা, দাঁড়া। তুই আমার কাছে এতেলা দে। বুঝলি ত? তোর প্রথম অভিযোগটা আমি লিখিয়া লই।"

ছোট দিদি নোট করিলেন।

"সংবাদদাত্রী—কমল। আসামী—বিনু। অভিযোগ—চুরি, ৩৭৯ ধারা (কিংবা বিশ্বাসঘাতকতা ৪০৬ ধারা)। ঘটনার তারিখ—জানা নাই—১৮৯৬ খৃঃ—স্থান ইটালী, লেক কমো। অপহৃত মাল—?"

ছোট দিদি থামিয়া গেল।

"কমল, কি চুরি?"

কমল। কেন, চোরা মাল ধরেছি ত।

ছোট দিদি। ঐ ছবিখানা?

কমল। হাঁ।

ছোট দিদি। ও কার জিনিস?

কমল। ওটা আমার নয় কি? আমার স্বামীর যত কিছু, সব আমার। আমাদের না ব'লে যখন লুকিয়ে রেখেছে, তখন চুরি বৈকি।

ছোট দিদি নোট করিলেন—"অপহৃত মাল—হাফ্‌টোন চিত্র—মূল্য ।০"।

কমল। দিদি! চারি আনা কি? এত বড় চুরির দাম চারি আনা?

কমল। তদন্ত কর।

ছোট দিদি। আমার জুরিশ্‌ডিক্‌শনের বাহিরে।

কমল। কেন?

ছোট দিদি। ইতালী আমার এলেকায় নয়।

কমল। দিদি, চালাকী কর কেন? তুমি ত আর দারোগা নও। যখন চোর এখানে, আর তুমি দারোগার ভার লইয়াছ, তখন জুরিশ্‌ডিক্‌শনের আপত্তি তোল কেন?

ছোট দিদি কমলকে বলিলেন, "বৌ, ছবিটা নিয়ে যেখানে ছিল, সেইখানেই রাখিয়া আয়।"

কমল। কেন?

ছোট দিদি। বোকা! তোর উপর প্রমাণের ভার যে, বিনুর অভিসন্ধি অসৎ। Dishonest intention না হ'লে ফৌজদারী অপরাধ হয় না।

কমল। বাগানে সব কথা টের পেয়েছি।

ছোট দিদি। ওটা স্বপ্নাবস্থায়। দিবাস্বপ্ন মোটেই প্রমাণ নয়। তুই বাড়াবাড়ি করিস্‌নে। আমি যা বলি, তাই কর। তোকে দেখ্‌তে হবে, বিনু ছবি-খানা মলাট্ থেকে মাঝে মাঝে বার করে কি না, কি রকম ক'রে ওটার সঙ্গে ব্যবহার করে, যেমন :—বেশী ক্ষণ তাকিয়ে থাকে কি না, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে কি না, চ'খের কোণে জল আসে কি না, ইত্যাদি।

কমল। মুখের কাছে আনে কি না?

ছোট দিদি। সেটা ভুল। ছবিখানা নষ্ট হয়ে যাবে। তুই মানব-চরিত্র এখনও ভাল বুঝিস্‌নি।

কমল তাহাই করিল। ছবিখানা Evidence Actএর মলাটের মধ্যে আবার রাখিয়া আসিল।

গোয়েন্দাগিরিটা যাহাতে সুচারুরূপে সাধিত হয়, তজ্জন্য বিনোদের আফিস্‌-কাম্‌রার গবাক্ষের পার্শ্বে একটা সিকির মত ছিদ্র সেই সন্ধ্যাকালেই হইয়া গেল।

সন্ধ্যার পর বিনোদ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কমল! বীণা বাগানে লইয়া গিয়াছিল কে?"

কমল। তা আমি কি জানি? আমি আর ছোটদিদি ঠাকুরদের বাড়ী বেড়াইতে গিয়াছিলাম।

উপরন্তু একটা সাক্ষী থাকায় বিনোদ অন্য কোনও জেরা করিলেন না, কিন্তু মনে একটা খট্‌কা থাকিয়া গেল।

৪

চিত্রে বেখাপ্পা রঙ্গ পড়িয়া গেলে জল দিয়া মুছিয়া ফেলিতে হয়। অন্য রঙ্গ দিয়া ঢাকিতে গেলে সেটা আরও বেতর হইয়া পড়ে। মানবচরিত্রে 'ওভারটোন' পড়িলে নয়নের জলে মিটাইয়া ফেলা ভাল। কমল সে দিক দিয়া গেল না। রঙ্গ চাপিয়া রাখিল।

কমল তাহার পর দিবস হইতে চুল বাঁধিল না। ভিনোলিয়া সোপ্‌গুলি ছোট দিদিকে দান করিল। একখানা গেরুয়া রঙ্গের রেশমী শাড়ী বাছিয়া লইল, এবং নির্জ্জনে বসিয়া রবি ঠাকুরের সন্ধ্যা-সঙ্গীতের উদাস ভাগগুলি পেন্সিল দিয়া চিহ্নিত করিল।

বৈরাগ্যের উচ্ছ্বাস দেখিয়া ছোট দিদি পরম প্রীত হইলেন।

কমল রাগ করিয়া বীণার খরজের তার ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছে। পঞ্চমের তার পাকা, তাই ছিঁড়িতে পারে নাই। সন্ধ্যার সময় বিনোদ বীণাটা পরীক্ষা করিয়া তাহার দুর্দ্দশা দেখিতে পাইলেন। বীণার উপর তাঁর বড় মায়া ছিল।

"ভুলু! এ তার ছিঁড়িল কে?"

বিনোদের ষষ্ঠবর্ষীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভুলু আসল কথা জানে, কিন্তু বৌদিদিকে সঙ্গীন অপরাধে অভিযুক্ত করা তাহার যুক্তিযুক্ত বোধ হইল না।

"ওটা বেরালে ছিঁড়েছে!"

বিনোদ। তুই গাধা! নিজে দেখেছিস্?

ভুলু। বেরাল যখন ঘরে ছিল, তখন টুং টাং শব্দ হচ্ছিল।

বিনোদ। আচ্ছা যা।

মার্জ্জারের এরূপ অলৌকিক শক্তিপ্রকাশ বিনোদের ন্যায়সঙ্গত মনে হইল না। তিনি বীণাটা লইয়া কমলের নিকট গেলেন।

"দেখ ত এটার কি অবস্থা হয়েছে।"

কমল। যত্ন না করিলে অমনিই হয়। যখন বুকের তার ভাঙ্গে, তখন ক'টা লোক দেখ্‌তে আসে?

বিনোদের নিকট কমলের 'টোন' যেন বর্ণচাপা বোধ হইল। তিনি জড়-বীণার সহিত হৃদয়-বীণার তুলনা এ সময় সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক বিবেচনা করিয়া বলিলেন,

"আজকাল খরজের তার বাজারে বড় পাওয়া যায় না। কলিকাতার

পিতলের তারগুলায় শীঘ্র মরিচা ধরিয়া যায়; যেটা ছিঁড়েছে ওটা রূপার তার, ইতালী হইতে আনিয়াছিলাম।”

কমল। ও! তা আমি জানিতাম না। ইতালীর তারে বুঝি কখনও মরিচা ধরে না?

বিনোদ। না।

কমল। তবে দেশী তারের দরকার কি? তুমি ইতালীতে গিয়ে রূপার তার বাজাওগে।

বিনোদ একটু বিস্মিত হইলেন।

“কমল, তুমি বুঝ নাই। ইতালীর খরজ ভাল, কিন্তু এ দেশের পঞ্চমের মত পাকা ইস্পাতের তার সে দেশে হয় না। দুটোর সংযোগ হ’লে বীণার ঝঙ্কারটা মধুর হয়।”

কমল। আচ্ছা, আমি ভিক্ষা ক’রে ইতালীর তার এনে দেব; তুমি এখন যাও।

বিনোদ। কমল! তোমার কি সর্দ্দি হয়েছে? আজ অমন কচ্ছ কেন?

কমল। আমার শরীর ভাল নাই।

বিনোদ। আজ চুল বাঁধ নাই কেন?

কমল। চুলগুলো পাকা ইস্পাতের তারের মত, জোর ক’রে বাঁধলে থাকে না।

বিনোদ। ছি! তোমার হয়েছে কি?

বিনোদ কমলের আলুলায়িত কেশের এক গুচ্ছ তুলিয়া দেখিলেন, ঠিক রেশমের মত। তাহারই মধ্যে একটা লইয়া সন্ধ্যার অস্তমিত জ্যোতির সাহায্যে বাতায়নপথে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন।

বিনোদ আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন;—

“কমল, তোমার চুল ঠিক ইতালীয় দেশের ন্যায়!”

কমলের সর্ব্বাঙ্গে ব্যথা হইল। ছুটিয়া ছোটদিদির কামরায় গিয়া একখানা ইজিচেয়ারে বসিয়া কাঁদিবার চেষ্টা করিল। একবার ইচ্ছা হইল, চুলগুলা কাটিয়া ফেলে।

সন্ধ্যার আঁধার হইতেও কমলের চুল কালো। সন্ধ্যাতারার আলোক

ক্ষীণ কুলকুলধ্বনি হইতেও কমলের হৃদয় নীরব ঔদাস্যময়। সেই স্রোতস্বতীর উপকূলে একটি পর্ণকুটীর বাঁধিয়া কমল হৃদয়ের মাঝে একখানা Landscape আঁকিয়াছে।

"দীননাথ! আমার জীবনের সন্ধ্যা কি এইখানেই?"

ছোট দিদি ইজিচেয়ারের আড়াল হইতে বাহির হইয়া কমলের কানে কানে বলিল, "বিনু আফিস-ঘরে গিয়াছে।"

দুই জনে আড়ি পাতিতে গেল।

৫

ছোটদিদি বলিলেন, "তুই গ্যাখ্!"

কমলের ভয় হইল। "না দিদি, তুমিই দেখ, আমার শরীর কেমন কচ্ছে।"

পূর্ব্বদিবসে উভয়েরই একটা প্রকাণ্ড ভুল হইয়াছিল। একটা ছিদ্র দিয়া দুই জনে দেখা অসম্ভব, তাহা কাহারও মনে উদয় হয় নাই।

প্রথমে কমল দেখিল।

কমল (চুপি চুপি)। "সব অন্ধকার।"

ছোট দিদি দেখিলেন।

ছোট দিদি। কি নজর তোর! ঐ ত বিনু চেয়ারে ব'সে। এক চোখ বন্ধ করে দেখ্।

কমলের Focusটা ঠিক হয় নাই, তাই 'পার্স্পেক্টিভে'র নিয়মানুসারে বিনোদের দেহ চেয়ারের সঙ্গে বিলীন হইয়া গিয়াছিল। ছোট দিদির পরামর্শানুসারে কমল একটা চক্ষু টিপিয়া দেখিল, বিনোদ একগাছি চুল লইয়া গ্রন্থি দিতেছে। এক, দুই, তিন, গ্রন্থি সমাপ্ত হইল।

ছোট দিদি। কি ক'চ্ছে?

কমল। আঙ্গুল নাড়ছে। তুমি দেখ না।

ছোট দিদি দূরত্ববশতঃ চুলগাছি দেখিতে পাইলেন না। বলিলেন, "তাই ত।"

ধীরে ধীরে বিনোদ Evidence Act খানা বাহির করিয়া মলাটের মধ্যে চুলগাছি রাখিয়া দিলেন।

কমল একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

ছোট দিদির নিকট প্রক্রিয়াটা অস্বাভাবিক বলিয়া অনুমিত হইল।

"কমল কিছু বুঝতে পাচ্ছিস?"

কমল। পাচ্ছি বৈ কি। খরজের সঙ্গে পঞ্চম বাঁধছেন।

ছোট দিদি। সে আবার কি ?

কমল। সে কিছু না, এখন চল।

নিশিকালে বিনোদ ঘুমাইলে পর কমল হাফটোনখানা চুরি করিয়া সারা রাত্রি অনিমেষনয়নে দেখিল। প্রত্যুষে ছোট দিদি দেখিলেন, কমল বাতায়নপথে প্রভাত-তারার পানে তাকাইয়া আছে।

কমলের মুখের দিকে তাকাইয়া ছোট দিদি চমকিয়া উঠিলেন। ছোট দিদি দেখিলেন, কমলের মুখের সহিত হাফ্‌টোনের মুখের কোনও পার্থক্য নাই। সেই বালিকাসুলভ দৃষ্টি ! সেই 'লাইট', সেই 'শেড্'। সূর্য্যের প্রথম কিরণে কমলের মুখ উজ্জ্বলতর হইয়া ঘরের অন্ধকারের সহিত অপূর্ব্ব Contrastএর সৃষ্টি করিল।

সে ঘরেরই অন্ধকার, না হৃদয়ের বিষাদ, তা ছোট দিদি জানিতে পারেন নাই।

কিয়ৎক্ষণ পরেই কমল ছবিখানি মলাটের মধ্যে রাখিয়া চুপি চুপি ছোট দিদির ঘরে গেল।

ছোট দিদি দেখিলেন, এ নূতন কমল !

কমল। ছোট দিদি ! 'সন্‌সেট' (সূর্য্যাস্ত) আর 'সন্‌রাইজে' (সূর্য্যোদয়) তফাৎ কি ?

ছোট দিদি। উদয়ের রঙ্গ এক রকম, আর অস্তের রঙ্গ আলাদা। উদয়ের রঙ্গে জ্যোতি বেশী সাদা, আর অস্তের রঙ্গে জ্যোতি বেশী সিঁদুরে। উদয়ের রঙ্গ বিধবার মত, আর অস্তের রঙ্গ সধবার মত, মাথায় সিঁদুর থাকে। সন্ধ্যাসুন্দরী সিঁদুর সীমন্তে দিয়া রাত্রিকালে ঘুমাইয়া থাকে, সকালে সেটা মুছিয়া যায়। তুই এত দিন পেণ্টিং শিখ্‌ছিস্,—আর এটা জানিস না ?

কমল। ছোট দিদি ! তুমি কবি।

ছোট দিদি। নে, চালাকি করিস্‌নে। আজ দুপুর বেলা রঙ্গ আর তুলি নিয়ে আসিস্, বিনু আপিসে গেলে দেখিয়ে দেব।

কমল। দিদি ! সূর্য্যদেবও ত দিনে আপিস ক'রে রাত্তিরে ঘুমায় ?

ছোট দিদি। তোর বল্‌বার মানে যে, "তবে কমলিনী 'সন্‌সেটে' কাঁদিতে বসে কেন ?"

কমলের মুখ লাল হইয়া গেল।

"না দিদি, সে কথা বল্‌ছি না। আমি বল্‌ছিলাম—আচ্ছা তাই হউক—

না হয় তাই হ'ল—না হয় কমলিনীই কাঁদিল—কিন্তু সে দেশেও ত কমলিনী থাকে—সে কি রকম ?"

ছোট দিদি। সে তোর মাথার মত। তুই বড় বোকা। সেও কমল, এও কমল;—একটা আর একটার প্রতিকৃতি।

কমল। তবে সন্ধ্যাকালে মন উদাস হয় কেন ?

ছোট দিদি। ঐ ত মজা! ওটা সহজসংস্কার—মানবচরিত্র।

৬

কমল যথার্থই বদলাইয়া গিয়াছে। কমলের কতকগুলি মিশ্রবর্ণ ছিন্নভিন্ন হইয়া এখানে ওখানে সরিয়া গিয়া নূতন আলোক ও ছায়ার সঞ্চার করিয়াছে।

বিনোদ কেবল স্বপ্নই দেখিতেছে। বিনোদের নির্ব্বিকার অবস্থা!

বিনোদ আপিসে গেলে কমল প্রত্যহ লুকাইয়া স্বামীর পোর্টফোলিওর উপর লেক কমোর হাফটোনখানা স্কেচ্ করিত। ছোট দিদি ও কমলের আড়িপাতার কল্পনা নিষ্ফল হইয়াছিল। কাজেই অন্য উপায় ছিল না।

এক সপ্তাহ পরে কমল একখানা 'ক্যান্‌ভ্যাসে'র উপর ইতালীর বিখ্যাত 'সন্‌সেট'টা নিপুণতাসহকারে রঙ্গ দিয়া আঁকিয়া ফেলিল। কিন্তু কমল বড় দুঃখিনী। কমল Potrait আঁকিতে জানে না।

"দিদি, এ দিক ত হয়েছে, কিন্তু রোসেটীর চিত্রটা কি করিয়া আঁকি ?"

ছোট দিদি। আগে একটা কাগজে আঁকিয়া নে, তার পর Hard pencil দিয়া ক্যান্‌ভাসে লাইনের উপর উপর চাপিয়া দিলে Outline ত হবে, তার পর আমি দেখিয়া লইব।

কমলের চেষ্টা বৃথা হইল। যেটা টানে, ভূতের মত হয়। হয় কান বড়, নয় চক্ষু লম্বা, আঙ্গুল গণিয়া দেখিলে কখনও ছয়টা হয়, কখনও চারিটা হয়। ইহার উপায় কি ?

ছোট দিদি বলিলেন, "একটা কথা মনে হয়েছে।"

কমল। কি ?

ছোট দিদি। বিনু বিলাত যাইবার পূর্ব্বে তোর যে ফটোগ্রাফ নিয়ে গেছ্‌লো, সেইখানা আল্‌পীন দিয়া ক্যানভাসে বসাইয়া দে।

কমল দুঃখের হাসি হাসিল। বলিল, "দিদি, সে চেহারা কি আর এ 'ল্যাণ্ডস্কেপে' মানায় ?"

ছোট দিদি। একবার নিয়ে আয় না ছাই!

কমল কম্পিতহস্তে হাতবাক্স হইতে একখানা পুরানো ফটোগ্রাফ লইয়া আসিল।

পঞ্চদশবর্ষীয়া কমল বেণী বাঁধিয়া ড্রয়িংরুমে বসিয়া আছে।

ছোট দিদি। দুটো চেহরাতে মেলা ত।

কমল তাহার ফটোগ্রাফের সহিত রোসেটীর সাদৃশ্য দেখিয়া চমকিয়া উঠিল। বোধ হইল, যেন ড্রয়িংরুমের কমল লেক কমোর তটে দাঁড়াইয়া আছে।

ছোট দিদি। কি দেখ্‌ছিস্‌?

কমল। এ আমার ফটো নয়।

ছোট দিদি। পাগ্‌লী, নিজের চেহারা কি মনে থাকে? তাতে আবার এক মাস ধরিয়া আর্শিতে মুখ দেখিস্‌নি।

কমল। দিদি, যখন আর্সিতে মুখ দেখি, তখন কি ছাই মুখের দিকে মন থাকে?

ছোট দিদি। বিনুর দিকে থাকে বুঝি? তবে দেখিস্‌ কি?

কমল অনেক দূর স্বীকার করিয়া ফেলিয়াছে, এখন ফিরাইয়া লওয়াটা দূষণীয় বিবেচনা করিল।

"আমার এখন আর লজ্জা কি? তিন বৎসর ধরিয়া আসিতে তারি মুখ দেখিতাম, আমার মুখ কখনও দেখি নাই। দিদি, সে কি কখনও তা ভেবে দেখেছে?"

কমলের ক্যান্‌ভাস দুই এক ফোঁটা জল পাইয়া আরও উজ্জ্বল হইল। কমল তুলি দিয়া মুছিতে লাগিল।

ছোট দিদি বলিলেন "বৌ—তুই সোনার বৌ—কিন্তু বড় বোকা। একে ত যে কাঁদে সে বোকা, আর যে সহজসংস্কারবশতঃ কাঁদে, সে ডবল্‌ বোকা।"

কমল। কেন দিদি?

ছোট দিদি। তোর সংস্কার যে, একটা মেয়েমানুষের ছবি লুকিয়ে রাখ্‌লেই বুঝি স্বামীর চরিত্র বিগড়াইয়া যায়? তোর কি চোখ নাই? এই দেখ!

ছোট দিদি দেখাইলেন। কমল বিস্ফারিতনয়নে দেখিল, ফটোগ্রাফের পৃষ্ঠে বিনোদের লেখা,—

"My Rosetti"

Lake Como, Italy. 23—9—1896.

B. B. Mukerji

কমল হেঁয়ালিটা ভাল বুঝিল না

"তবে দিদি, রোসেটীকে পত্র কি লিখিয়াছিল ?"

ছোট দিদি। তার কৈফিয়ৎ কল্যকার সন্‌সেটে হবে। তুই একটু ধৈর্য্য ধরিয়া থাক্।

৭

বিনোদ সাদা মানুষ। কোনও অভাবনীয় ঘটনা হইলেও তাহার মর্ম্ম বুঝিতে বিনোদের তিন দিন লাগিত।

এত বড় কারখানা হইয়া গেল, বিনোদ তার বিন্দুবিসর্গও জানেন না।

আজ আপিস হইতে আসিয়া বিনোদ দেখিল, লুচি ঠাণ্ডা। অনুমান করিল, মেয়েরা সকাল সকাল লুচি ভাজিয়া কোথায় বেড়াইতে গিয়াছে।

বিনোদ দুইটা গোলাপী সিগারেট এবং একটা দেশলাই লইয়া বাগানের দিকে গেলেন।

অবিচলিতচিত্তে বাগানের এক দিকে বসিয়া সিগারেট টানিতে টানিতে বিনোদ আকাশের দিকে চাহিলেন। আজ যেন আকাশটা একটু বেশী নীলবর্ণ।

বিনোদের দৃষ্টি একটা অভিনব পদার্থে পড়িয়াছে। সেটা কমলের সেদিনকার 'পেণ্টিং'। "ওটা কি," "ওখানে কেন," "কার ছবি," এ সব প্রশ্ন অন্য লোকের মনে উদিত হইতে পারে, কিন্তু বিনোদের মনে হওয়া অসম্ভব। বিনোদ দেখিলেন, ছবিখানা বেশ। সেটার distant view লইতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া বিনোদ প্রায় পঁচিশ হাত পশ্চাৎ হটিয়া একটা চাঁপা গাছের নীচে গেলেন।

"না, এ Positionটা ঠিক হয় নাই।"

বিনোদ একেবার সেখান হইতে উত্তর কোণে গিয়াছেন। ছবিখানা প্রায় পঞ্চাশ হস্ত দূরে থাকিল।

এই নূতন স্থানপরিবর্ত্তনে একটা আরও নূতন ঘটনা ঘটিল। বিনোদ দেখিলেন, ঠিক বিশ হাত দূরে, ছবির এক অংশ নয়নপথ হইতে ছাইয়া বক্র বিষুবরেখার ন্যায় একটি মৃণালবাহু সলজ্জে 'নর্থ পোলে'র দিকে অর্দ্ধ অবগুণ্ঠন দিবার উপক্রম করিতেছে।

লজ্জা বাহুতে, না চখে ?

বিনোদ একদৃষ্টিতে চক্ষু দুটির তারা অন্বেষণ করিলেন। পাইলেন না। দৃষ্টি স্থির নহে।

রোসেটীর অপূর্ব্ব প্রতিমূর্ত্তি :

বিনোদ ডাকিলেন, "রোসেটী! ভয় পাইয়াছ?" ভয় পাইবারই কথা। নীল আকাশ কাল মেঘে ভরিয়া গিয়াছে। দূরে তালবৃক্ষের মাথায় সাদা পাতা কাঁপিতেছে। দুই একটা সাদা বক মেঘের কোলে উড়িয়া 'লাইটে'র প্রতিভা বিস্তার করিয়াছে।

খুব ঝড় আসিবে।

কড় কড় করিয়া মেঘ ডাকিয়া উঠিল। অদূরে বজ্র পড়িয়া একটা নারিকেল বৃক্ষ ঝলসিয়া গেল।

কমল দৌড়িয়া বিনোদের কোলে লুকাইলেন।

বিনোদ শীঘ্রগতি কমলকে ধরিয়া বৈঠকখানায় লইয়া গেলেন। তখন মুষল-ধারে বৃষ্টি পড়িতেছে। বিনোদের বুক ভিজিয়া গিয়াছে, কিন্তু দেহ ভিজে নাই।

বিনোদ সাত পাঁচ ভাবিলেন, অবশেষে বলিলেন, "রোসেটী! তোমার বিরহ হয়েচে?" বিনোদের মতে বর্ষার সময় বিরহটা স্বভাবসিদ্ধ।

কমল। তোমার রোসেটী ঝড়ে হ্রদে ডুবিয়া মরিয়া গিয়াছে।

বিনোদ। তবে তুলিয়া আনিলাম কাহাকে?

কমল। রোসেটীর ভূত।

বিনোদ বলিলেন, "দেখ কমল! যখন প্রবাসে থাকিতাম, তখন ইতালীয় নবেলগুলা পড়িয়া তোমার মুখ নব্য ইতালীর বর্ণে রঞ্জিত করিয়াছিলাম। তোমার বালিকা-মুখের পূর্ব্বস্মৃতি আমাকে স্বপ্নাবস্থায় চিত্রকর করিয়া তুলে। এক দিন কমো হ্রদের তটে বসিয়া তোমাকে সজীব দেখিতে পাইলাম। ইতালীর কি মহিমা! সাত দিনে তোমার মুখখানি গ্রাণ্ড হোটেলে বসিয়া তুলি দিয়া আঁকিয়া ফেলিলাম। সেটার হাফ্‌টোন করিয়া লইয়া আসিয়াছি।"

কমল। সেখানা কোথায়?

বিনোদ। সেটা এক যায়গায় লুকান আছে।

কমল। বল না কোথায়?

বিনোদ। হৃদয়ে।

কমল। তবে তাকে লুকিয়ে চিঠি লিখতে কেন?

বিনোদ। তোমার ভয়ে। সেগুলি তোমাকে দেখাব?

কমল। অনেক চিঠি লিখেছ।

বিনোদ। অনেক। তুমি যদি সত্য রোসেটী হইতে ত পাইতে। ...নিক রোসেটী ছিলে, তাই দিই নাই। আর দেখ! আজ তোমাকে সত্য

সত্যই রোসেটী দেখিতে পাইয়াছি। কমো হ্রদের স্মৃতির সঙ্গে যে প্রেমের অংশটুকু বিসর্জ্জন দিয়াছিলাম, তাহা ফিরিয়া পাইয়াছি।

কমল। তবে সত্য সত্য রোসেটী বলিয়া আর কেহ নাই?

বিনোদ। তুমিই কলিকাতার কমল, আর ইতালীর রোসেটী।

কমল। আমার সন্দেহ হয়েছিল।

বিনোদ। প্রেম সহজসংস্কার। জীবনের আলোক। প্রকৃতির বিভিন্ন চিত্রে পড়িয়া চরিত্রের তারতম্য হয়। স্বামী একটাই হয়, দুটো হয় না। স্বামীর ভালবাসাও একটা। সেই ভালবাসা একটা চিত্রের মধ্যে আঁকিয়া প্রকৃতি জগৎকে দেখায়। কিন্তু সংসার কি কুহকময়, চিত্র ক্ষণে ক্ষণে বদ্‌লায়। আমার যেন বোধ হয়, সব স্বপ্নময়।

কমল স্বামীর মুখের সুবাস প্রাণ ভরিয়া লইতেছিল। বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে। ঘোর রক্তবর্ণ মেঘের কোলে সূর্য্য ডুব দিতেছে।

কমল বলিল, "যা সর্ব্বনাশ!"

বিনোদ। কি?

কমল। ঐ দেখ! আমার ছবিখানা ঝড়ে উড়িয়া তাল গাছের মাথায় লাগিয়া আছে!

সত্য সত্যই চিত্র উড়িয়া গিয়াছে, চরিত্র বর্ষার ভরা জলে ভাসিতেছে।

মন্ত্রহীনা।

কি মন্ত্রে করিবে দীক্ষা
হে গুরু! আপনি?
নাস্তিক বলে'ও দেব
ক'র না ভ্রূকুটী;
হেস না দাম্ভিকা বলে',
চিরান্ধ রমণী;
—প্রবেশিতে জ্ঞান-মার্গে
শত বাধা ত্রুটী।

রাখ তব বীজ-মন্ত্র
তুলিয়া অন্তরে,
তৃণ-চিহ্ন-হীন কোন
বন্ধ্যা ভূমি তরে।
হে দেব! হেথায় নাহিক স্থান।
সর্ব্ব আচ্ছাদিত;
তৃণ-গুল্ম-লতা-তরু
কণ্টকে আবৃত।

আমারে দেছেন দীক্ষা
আপনি শর্ব্বাণী।
নানা মন্ত্রে নানা তন্ত্রে
সর্ব্ব-পন্থী আমি।

প্রাবৃটে কভু আমি ধ্যানমগ্না,
ঘোর ঘনচ্ছায়ে
নিরখি সে শ্যামা, বামা
মুক্তকেশী মায়ে।
চক্ মক্ তক্ তক্
দীপ্ত তলবার,
পিছনে এলান কেশ—
প্রলয় আঁধার।
গুড় গুড় গুম গুম
পদ-শব্দ শুনি'
উল্লাসে নাচিয়া উঠে
হৃদয়-শিখিনী!

কখন ফাগুন-দিনে
যমুনার কূলে
হেরি রাধা শ্যাম-বামে
চম্পক-দুকূলে।
রুণি ঝুনি রুণি ঝুনি
নূপুর-শিঞ্জিনী,
হৃদয়ের কুঞ্জে কুঞ্জে
জাগে বংশীধ্বনি।

কভু সুশুভ্র চামর কাশ
তুলি' পথে পথে
সারদার আগমন
সূচিছে শরতে।

কনক-বরণ-ছটা
দিগন্তে বিকাশ,
দশ দিকে বিকীরিত
দীপ্ত চন্দ্র-হাস।

দক্ষিণে ইন্দিরার পদতলে
পূর্ণ বসুন্ধরা,
চম্পক-বরণ-দ্যুতি
হরিত-অম্বরা।

বামে রক্ত-শতদল-দামে
শ্রীপদ দু'খানি,
শুভ্র-কুবলয়-কান্তি
চারু বীণাপাণি!
প্রসন্ন ললাটপটে
দীপ্ত জ্ঞান-জ্যোতি,
মোহ-ধ্বান্ত-বিনাশিনী
দেবী সরস্বতী।
কবিতা-কমল-গন্ধে
পূর্ণ দিক্ দশ,
লোলুপ মানস-ভৃঙ্গ
বাঞ্ছিত পরশ।

কভু হেমন্তে নিরখি আমি
বরাভয়-দাত্রী
দারিদ্র্যনাশিনী দুর্গা
দেবী জগদ্ধাত্রী,
ধৃত মাঙ্গলিক শঙ্খ;—
ধ্বনিত অম্বর,
চারি দিকে প্রসারিত
কল্যাণ সুকর।

শীতে সুশুভ্র তুষার মাঝে
হিমাদ্রিশিখরে
বিমল-রজত-কান্তি
হেরি যোগেশ্বরে।
রুক্ষ জটাজুটজাল
পড়েছে প্রসারি,
ঝর ঝর প্রবাহিত
মন্দাকিনীবারি।
ধুইয়া চরণ-যুগ্ম
বহিছে নির্ম্মলা,
ভৈরব পিনাক-ঘোষে
ভীতা দিক্‌বালা।

নিদাঘেতে তীব্র দীপ্তি
পূর্ণ জ্যোতির্ম্ময়ে
নেহারি মানস নেত্রে
নির্ব্বাক বিস্ময়ে।
স্তম্ভিত নিস্তব্ধ দিবা
কুলায়েতে পাখী ;
প্রকৃতি ধেয়ান-মগ্না,
অবিচল শাখী।
পুরুষ-প্রকৃতি দ্বৈত
অদ্বৈত পূজক,
আমি শৈব, আমি শাক্ত,
আমি সে বৈষ্ণব ;—
—কি মন্ত্র আমারে দেব !
দেবে অভিনব !

কাহিনী।

২। "চারি মহাজনপুত্র কথা।"

এক মহাজনের চার ছেলে ছিল। মহাজন মরিবার সময় চার ছেলেকে কাছে ডাকিয়া বসাইল। কলিকালের ছেলে, তাদের বিশ্বাস কি? আজ না হয় বুড়ো আছে, কাল সকালে বুড়ো চোখ্ বুজিলে যে যার হাঁড়ীকুড়ী ভিন্ন করে নেবে ; এত ধন দ্রব্য, পাঁচ ভূতে লুটে খাবে। মহাজন এই কথা ভাবিয়া ছেলেদের কাছে বসাইল। মহাজনের এক ভায়রাভাই বড় ন্যায়বান্। তাঁর 'কাকচরিত্র' জানা। মহাজন ছেলেদের বলিল, "আমি এত দিন ছিলুম ব'লেই ত কোন ভাবনা ছিল না। আমি ত এখন চলিলাম। যদি তোমাদের ভিন্ন হইবার ইচ্ছা হয়, তা' হ'লে তোমাদের মেসোমশায়কে ডেকো। তিনি যার যা পাওনা গণ্ডা ভাগ করে দেবেন। তোমরা সেই ভাগ নিয়ে যে যার ঘর

সেই চার ভাইয়ের মধ্যে বড়টি 'পাঠ সাঠ' (পড়াশুনা) করে। তার নীচের ভাইটি 'ন্যায় নিশাপ' (বিচার মীমাংসা) করে। ছোট দু' ভাই চাষের কাজ করে ও মাঠ্ টাঠ্ দেখে। এইরূপে চার ভাই থাকে। বড় দু' ভাই এক আধ ঘণ্টা এ ধারে ও ধারে যায়, ফিরে এসে বাড়ীতে পালঙ্কে গড়াতে থাকে। ছোট দু' ভাই সারাদিন মেহনৎ ক'রে রদ্দুর ঝড় খেয়ে সন্ধ্যাবেলা ঘরে এসে যা হোক্ দুটো ভাত টাত খেয়ে এখানে সেখানে পড়ে থাকে। দু' ভাই খেয়ে দেয়ে আয়েস্ কচ্ছে, আর দু' ভাই মুটে মজুরের চেয়েও হীন। এ কি কখনও বউদের চোখে সয়? ভাইয়েদের কথা ভাইরা বুঝতে থাকুক্, চার বউ ত সমান। তার মধ্যে বড় দু' বউ কেন দিনের মধ্যে চার প্রহর ঘর-কন্নার কোন কাজ কর্ম্ম না করবে, ও 'পাটপীতাম্বরী' প'রে পান্ টান্ খেয়ে পালঙ্কে গড়াক্তে থাক্‌বে? আর ছোট দু' বউ এত কি অপরাধ করেছে যে, দিন রাত খেটে খেটে তাদের পায়ের বাঁধন্ ছিঁড়ে যাবে? রাত্রে ছোট দু' বৌ তাঁদের 'গরস্থ'কে নানা রকম টিটকারী দেয় ও ধিক্কার দিয়ে বলে, "যে যার কড়া গণ্ডা ভাগ করে নিলে সুখে থাক্‌তে। পরের অধীনে মাথা গুঁজে কত দিন পড়ে থাক্‌বে? বড় দু' ভাই কি দশ্‌মেসে, আর তোমরা কি আটাশে ছেলে?" এইরূপে দিন কতক যেতে না যেতে, ছোট দু' ভাই শুনে শুনে আর সহ্য কর্‌তে পাল্লে না। এক দিন বড় দু' ভাইয়ের কাছে গিয়ে বল্লে যে, "ভিন্ন হ'ব।" তাতে সকলে বল্লে, "বাবা মর্‌বার্ সময় বলে গেছেন, মেসোকে ডেকে আনবো, তিনি যা ভাগ করে দেবেন, আমরা তাতেই রাজী।" সকলে গিয়ে মেসোর বাড়ী পঁহুছিল। মেসোর কাকচরিত্র জানা ছিল। 'আগত কথা' এক দণ্ডে জানিতে পারিতেন। তিনি তাদের দেখেই সব জান্‌তে পাল্লেন। বাহিরে না জান্‌বার মত ভাব ক'রে ওদের আদর কল্লেন, পা ধোবার জল আন্‌তে বল্‌লেন, দাওয়ায় বস্‌বার জন্যে মাদুর পেতে দিলেন, ও 'দুঃখ সুখ' জিজ্ঞাসা কল্লেন। মহাজনের ছেলেরা সুখ দুঃখ কি আর্ বল্‌বে? ভিন্ন হওয়ার কথা বল্লে, আর বল্লে যে, বাবা বলে গেছেন যে, আপনি গিয়ে আমাদের ভিন্ন করে দিয়ে আস্‌বেন। মেসো ত আগে থেকে সবই জান্‌তেন, বল্লেন, "আমি কাল স্বপন্ দেখেছি—তোমরা আজকে আসবে, স্বপনে আমি হুকুম পেয়েছি, তোমাদের ও বউদের নিয়ে ৺জগন্নাথ (শ্রীক্ষেত্র) যাব। ৺জগন্নাথকে প্রণাম করে ফিরে এসে তোমাদের ভিন্ন ক'রে দেব।" এ কথায় চার ভাই রাজী হলো। তার পরে মেসো চার শ্যালীপো ও চার বউকে নিয়ে ৺জগন্নাথ-

দর্শনে বেরুলেন। ৺পুরীতে পৌঁছে ৺দর্শন কল্লেন্। ফিরে আস্‌তে আস্‌তে রাস্তায় একটা বড় মাঠ পড়ল। বেলা তখন দুপুর হয়েছে। হেঁটে হেঁটে সকলে ক্লান্ত হয়েছে। মেসো বল্লেন, "আর হাঁট্‌তে পারবো না। এইখানে খানিক জীরুতে হবে।" এই বলে গাঁঠরী খুলে দেখেন্ যে, টাকার থলেটি নেই। কত ব্যস্ত হলেন, খানিক কেঁদে কেটে চুপ কল্লেন। শেষে মেসো বল্লেন, "ছেলেরা তোমরা ত সব যোগ্য। চার্ ভাই চার দিকে যাও, যে যা উপায় কর্‌তে পার্‌বে, নিয়ে এস। রেঁধে খেয়ে দেয়ে আর উপায় দেখা যাবে।"

চার ভাই চার দিকে ছুটল্। ছোট ভাইটি চাষেতে খুব মজবুৎ, যেতে যেতে দেখে, রাস্তায় একজন চাষা চষ্‌ছে, গরু দুটো বড়ই অশায়েস্তা, বেলা দুপুর হয়ে গেছে, তবুও হাত্ খানেকও চষা হয় নি।—বড় ব্যস্ত হয়ে বসে আছে। জিজ্ঞাসা কর্‌তে চাষা সব বল্‌লে। মহাজনের ছেলে বল্‌লে, "আমি ঘণ্টা খানেকের মধ্যে জমিখানা চষে দেব, তুমি কি দেবে বল।" চাষা শুনে বড় খুসী হলো, শেষে ঠিক হলো, পাঁচ সের চাল, ডাল, আর কিছু তরিতরকারী ও কাঠ দেবে। এই সব আন্‌তে চাষা বাড়ী গেল। ফিরে আস্‌তে না আস্‌তে মহাজনের ছেলে সব জমী চষে ফেলেছে। সেই জিনিসগুলি নিয়ে মহাজনের ছেলে এসে ঠিকানায় হাজীর হ'ল।

ওর বড়টি আর এক দিকে গেছল। দেখ্‌লে, পাঁচ সাতটি লোক দাঁড়িয়ে কথাবার্ত্তা কইছে। তারা বল্লে, "এ জমীতে সব সময়ে জল থাকে, ধান মোটেই হয় না। এ দিকে জমিদার খাজনা কড়া ক্রান্তি বুঝে নেয়। আচ্ছা, কি উপায় কল্লে এতে ফসল হয়?" মহাজনের ছেলে ত চাষের কাজে খুব 'ধুরন্ধর'। বল্লে, "কি দেবে বল, আমি উপায় ব'লে দেব।" ওরা বল্লে, "আমরা দুটি টাকা দেব"। সে বল্লে, "মাটী গোবর মিশিয়ে ছোট ছোট তাল পাকিয়ে তার ভিতর দুটি ক'রে 'কোইলিবাই' ধান পুরে জলের উপর ফেলে দিলে ঐ ধানগুলি ডুবে গিয়ে মাটীতে থাক্‌বে, আর গাছ উঠে ধান হবে।"—কথাটা সকলের মনে লাগল। মহাজনের ছেলেকে দুটি টাকা দিয়ে খুসী করে বিদেয় কল্লে। টাকা দুটি নিয়ে রাস্তায় জিনিসপত্র কিনে সে এসে ঠিকানায় পঁহুছিল।

তার উপরের ভাইটি 'ন্যায় নিশাপ' করে।—যেতে যেতে রাস্তায় দেখ্‌লে, একটি বটগাছের তলায় একটি লোক বসে কাঁদছে। লোকটির চেহারা সুন্দর-পানা, বড়লোকের ছেলের মত দেখ্‌তে। মহাজনের ছেলে জিজ্ঞাসা কর্ত্তে বল্লে, "আমরা চার ভাই ভিন্ন হয়েছিলাম। এক এক জনের ভাগে এক এক

লক্ষ টাকার সম্পত্তি পড়েছিল। সব ভাগ হ'ল, শেষে একটি কাল বেরাল আর ভাগ হয় না। ওকে নেবে কে? সব ভাই এক জেদ্ কল্লে। মধ্যস্থ এসে ভাগ ক'রে দিয়ে গেল—চার ভাইয়ের চার পা। বেরালটি এজমালীতে রইল। দৈবযোগে বেরালটি এক দিন লাফিয়ে পড়ল। আমার ভাগে যে পাটি পড়েছিল, তা ভেঙ্গে গেল। আমি সেই পায়ে তেলের নেকড়া জড়িয়ে দিলাম। বেরালটি পাড়াপড়সীদের বাড়ী উনুনের কাছে শুয়েছিল। তার পায়ের নেকড়ায় আগুন ধরে গেল। বেরালটি 'অস্তব্যস্ত' হ'য়ে এক জনের খাঁচায় উঠল্। খাঁচা থেকে চালে আগুন ধরল। দেখ্তে দেখ্তে পাড়ার সমস্ত ঘরদোর পুড়ে ছারখার হ'য়ে গেল। অনেক কষ্টে আগুন ত নিভ্ল। কাল্কে এই কথার বিচার হয়েছিল। মধ্যস্থেরা আমার দোষ দিলে। আমি পাড়ার সব ঘরদোর নূতন করে দেব। যত টাকা খরচ হবে, আমি দেব। অত টাকা দিতে আমার সম্পত্তির আধ্খানেক ফুরিয়ে যাবে। আমি ত ভেবে কূল কিনারা পাচ্ছি না। আমি যাচ্ছিলাম রাজার কাছে ফরিয়াদ্ কর্ত্তে, আবার ভাবলুম, রাজা পাড়ার সকলের কথা না শুনে কি আমার কথা শুন্বেন? এই ভেবে এখানে বসে আছি। আমাকে যে এ থেকে উদ্ধার কর্ব্বে, তাকে আমি অনেক টাকা দেব।" মহাজনের ছেলে বল্লে, "আচ্ছা, যদি ঘর তৈয়ারী করবার খরচ তোমায় না দিতে হয়, তুমি আমায় কি দেবে?" ধনী বল্লে, "আমি তোমায় পাঁচ শো টাকা দেব।" মহাজনের ছেলে বল্লে, "যাও, গিয়ে পাড়ার সকলকে ডেকে সদরে বসাও, আমি যাচ্ছি।" মহাজনের ছেলে তার বাড়ীতে গেল। পাড়ার লোক সব বসে আছে, তাকে দেখে সব কথা বল্লে। সে বল্লে, "বেরালের পায়ে আগুন লাগ্তে বেরাল পালিয়ে গেল।" পালিয়ে যেতে ঘর পুড়ে গেল। তোমরা বল, যে পায়েতে আগুন লেগেছিল, সেই পায়ের দোষ। আচ্ছা, আমি জিজ্ঞাসা কচ্ছি, যদি বেরালের চল্বার শক্তি না থাকত, তবে সে পালিয়ে যেত কি ক'রে? খোঁড়া পায়ে ত বেরাল আর চলতে পারে না। আর তিনটি পা থাকাতে বেরাল পালিয়ে গেল, তাই ঘরে আগুন লাগল; এতে বলুন দেখি, ঐ তিন পায়ের দোষ, না খোঁড়া পায়ের দোষ?" শুনেই ত সকলে অবাক! কি উত্তর দেবে, কিছু বুঝতে পাল্লে না। সকলে এক-মুখে বল্লে, "ঐ তিন পায়ের দোষ, খোঁড়া পায়ের দোষ নয়।" তাতে অন্য তিন ভায়ের দোষ হ'ল। সেই তিন ভাই পাড়ার সব ঘর তৈয়ারী ক'রে দেবে, স্থির হ'ল। এই দেখে সেই ধনী মহাজনের ছেলেকে পাঁচ শ' টাকা ও খাবার দাবার দিয়ে ঠিকানায় বিদায় দিলে।

সকলের বড় ভাই আর এক দিকে গিয়াছিল। যেতে যেতে শুন্‌লে, ঐ দেশের রাজার মন্ত্রীর বাড়ীতে কান্না কাট্‌না লেগেছে। জিজ্ঞাসা করে বুঝলে, আজ সকালে রাজা মন্ত্রীকে হুকুম দিয়েছেন, রাজার 'একদন্তা' হাতীটের ওজন কত, মন্ত্রী এ কথা না ঠিক করে দিলে কাল সকালে মন্ত্রীর মুণ্ডু কাটা যাবে। এর জন্যেই মন্ত্রীর ঘরে কান্না কাট্‌না। মহাজনের ছেলে মন্ত্রীর কাছে গেল। মন্ত্রী বললে, এ হাতীকে ওজন করে দিলে তোমাকে এক হাজার টাকা দেব। মহাজনের ছেলে মন্ত্রীকে একটা ডোঙ্গা আন্‌তে বল্‌লে। ডোঙ্গা এলে পর তাতে হাতীকে নিয়ে দাঁড় করালে। ডোঙ্গা এক হাত ডুবে গেল। খড়ী দিয়ে সেইখানে একটি দাগ দিলে। হাতীকে নাবিয়ে দিয়ে ঐ দাগ্‌টি না ডোবা পর্য্যন্ত ডোঙ্গাতে বালি ভর্ত্তি কর্ত্তে বল্লে। দাগ ডুব্‌লো। আর বালী ভরা হ'ল না। তার পর, বালি-গুলি তুলে ওজন কর্ত্তে এক শ' মন হল। মন্ত্রী দেখে বড় সুখী হলেন। মহাজনের ছেলেকে হাজার টাকা, খাবার দাবার ও পাল্কী ঘোড়া দিয়ে বিদায় দিলেন। সে এসে ঠিকানায় পঁহুছিল।

রান্নাবান্না হ'ল। সকলের খাওয়া দাওয়া শেষ হ'ল। মেসো চার শ্যালীপো আর চার বউকে কাছে ডেকে, যে যা রোজগার করেছিল, সকলকে শুনিয়ে দিলে। দিয়ে বল্লে, "এবার বল, বাড়ী গিয়ে তোমাদের ভিন্ন করে দিয়ে আসি।" ছোট দুই ছেলে আর ছোট দুই বউ বড় দু' ভাই আর ভাজদের পায়ে পড়ল, আর নিজেদের অযোগ্যতা বুঝ্‌তে পাল্লে। ভিন্ন হওয়া দূরে গেল, সকলে আনন্দে বাড়ী ফিরিল। সেই দিন থেকে ঝগড়া না ক'রে সকলে মিলে মিশে সুখে ঘরকন্না করতে লাগল।

"মো কথাটি সইলা,
ফুল-গছটি মলা।" ইত্যাদি।

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায়।

শিবালিকে হাতী ধরা।

সাহিত্যের বৈশাখ-সংখ্যায় শিবালিকের জন্মবৃত্তান্ত বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি। আজ শিবালিকের এক দিনের ঘটনা বর্ণনা করিয়া আপাততঃ শিবালিক প্রসঙ্গের

উপসংহার করিব। এইরূপ ঘটনা নিত্য ঘটে না, ঘটিলেও সকলের চাক্ষুষ হয় না, এই প্রবন্ধ লিখিবার ইহাই প্রবর্ত্তক হেতু। প্রচলিত পুস্তকাদিতে হাতী ধরার নানারূপ প্রণালীর বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু শিবালিকে যে প্রণালীতে হাতী ধরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, তাহার বর্ণনা কোথাও পড়ি নাই। *

অযোধ্যার অন্যতম করদরাজ্য বলরামপুরের মহারাজার হাতী ধরার বিরাট আয়োজন আছে। ইঁহার এই কার্য্যে শতাধিক শিক্ষিত হস্তী, প্রায় ৫০ জন অশ্বসাদী, শতাধিক পদাতিক ও তৎসংখ্যক উষ্ট্র নিযুক্ত আছে। মাহুত, সহিস, উষ্ট্রপাল প্রভৃতি লইয়া সর্ব্বসমেত প্রায় ৫০০ লোক খেদায় কাজ করে। যখন যে প্রদেশের বনে অনেক হাতী আসিয়াছে সংবাদ পাওয়া যায়, তখনই তথায় এই চতুরঙ্গ সেনা প্রেরিত হয়। অতগুলি গজ বাজী উষ্ট্রের আহার ও অতগুলি লোকের বেতনাদিতে অবশ্য বিলক্ষণ ব্যয় হয়। তা ছাড়া সরকারী জঙ্গলে হাতী ধরিতে হইলে খেদা করিবার অনুমতির জন্য প্রথমে অন্যূন দুই হাজার টাকা সেলামী দিতে হয়, এবং প্রত্যেক ধৃত হস্তী প্রতি এক শত টাকা হিসাবে মাশুল দিতে হয়। এই সকল ব্যয় খতাইলে দেখা যায় যে, মহারাজা বাহাদুর হাতী ধরিয়া বিশেষ লাভবান হইতে পারেন না। কিন্তু তাঁহার ঐ একটা সখ, বলরামপুরের ঐ একটি বিশেষত্ব ও প্রসিদ্ধি, সুতরাং লাভালাভের গণনা ইহাতে নাই।

ইং ১৯০০ সাল, জানুয়ারি মাস। বর্ণিতব্য ঘটনার এক মাস পূর্ব্বে বড়দিন উপলক্ষে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের তদানীন্তন ছোটলাট স্বনামখ্যাত সার এণ্টনী ম্যাক্‌ডনেল বাহাদুর দেহরাদূনের শিবালিকের পূর্ব্বপ্রান্তে ভাগীরথীতীরে রাই-ওয়ালা নামক রমণীয় স্থানে শিবিরসন্নিবেশ করিয়া কিয়দ্দিবস অবস্থান করিতে-ছিলেন। তাঁহারই চিত্তবিনোদনার্থ যে সকল আয়োজন হইয়াছিল, বলরাম-পুরের খেদা কর্ত্তৃক হাতী ধরার বন্দোবস্ত তাহার অন্যতম। কিন্তু সে সময়ে একটিমাত্র হাতী ধরা পড়িয়াছিল। যূথভুক্ত অপর হাতীগুলি শিবালিকের পশ্চিমপ্রান্তাভিমুখে পলায়ন করিয়াছিল।

হাতী ধরা দলের অধিপতি কাপ্তেন নান্নে খাঁ কিন্তু সহজে নিরুদ্যম হইবার

---

* বনবিভাগের মুখপত্র Indian Foresterএর ১৯০০ সালের মার্চ্চ সংখ্যায় আমি এই ঘটনা উপলক্ষ করিয়া একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম, এবং ঐ প্রবন্ধ অন্যান্য দুই একখানি ইংরাজী পত্রিকায় উদ্ধৃতও হইয়াছিল। তথাপি সাধারণ বাঙ্গালী পাঠকের সম্ভবতঃ তাহা দৃষ্টিগোচর হয় নাই। বলা বাহুল্য, এই প্রবন্ধ উক্ত ইংরাজী প্রবন্ধের অনুবাদ নয়।

লোক নন। ইনি অসাধারণ বীরপুরুষ। উচ্চশিক্ষা বা আভিজাত্যের অনুরোধে তিনি বর্ত্তমান পদে প্রতিষ্ঠিত হন নাই। সর্ব্বপ্রথমে হয় ত হাতীর "চারাকাট" ছিলেন, সে কথা কিন্তু এখন বড় প্রকাশ পায় না। সে যাহা হউক, বহুকাল মাহুতগিরি করিয়াছেন, এ কথা তিনি নিজেই অম্লানবদনে স্বীকার করেন। হাতীর নাড়ী নক্ষত্র তাঁহার নখদর্পণের ন্যায় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানা আছে—ইহাই তাঁহার একমাত্র বিদ্যা; অদম্য সাহস ও অলোকসামান্য বীরত্বই তাঁহার বিশেষত্ব; আর বীরোচিত সরলতা ও অমায়িকতাই তাঁহার চরিত্রভূষণ। দেখিতে খুব লম্বা চৌড়া দিগ্‌গজ পুরুষ নন। বস্তুতঃ, হিন্দুস্থানী ভাষায় নান্নে মানে 'ছোট;' সম্ভবতঃ আকারে খর্ব্ব বলিয়াই তাঁহার নান্নে খাঁ নামকরণ হইয়াছে। ইঁহারা ইতঃপূর্ব্বে গঙ্গার পূর্ব্বতীরসংলগ্ন গাড়োয়াল জেলার জঙ্গল হইতে অনেকগুলি হাতী ধরিয়া সঙ্গে করিয়া আনিয়াছেন,—শিবালিকের হাতীগুলি ধরিয়া এ বৎসর অভিযান সমাপ্ত করিবেন, ইহাই কাপ্তেন সাহেবের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা।

নান্নে খাঁ পলায়নপর হস্তীদিগের সন্ধানের জন্য শিবালিকের সর্ব্বত্র পদাতিক সৈন্য প্রেরণ করিয়া ঘাটীতে ঘাটীতে সংবাদবাহক অশ্বারোহী সংস্থাপন করিলেন। হাতীদের গতিবিধির সংবাদ প্রত্যহ তাঁহার নিকটে আসিতে লাগিল। সুবিধা মত স্থানে পঁহুছিলে সদলবলে তথায় উপস্থিত হইবেন, এই সংকল্প করিয়া হরিদ্বারের উপকণ্ঠে শিবিরসংস্থাপন পূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন।

২৪শে জানুয়ারি বুধবার নান্নে খাঁ সংবাদ পাইলেন, হরিদ্বার হইতে ২৪ মাইল পশ্চিমে চিলাওয়ালী রাউয়ের খোলে কয়েকটি জঙ্গলী হাতী অবস্থান করিতেছে। তিনি সেই দিনই প্রস্থান করিয়া ২৫শে তারিখে বেলা ১০টার সময় চিলাওয়ালী রাউয়ের ঘাটীতে উপস্থিত হইয়া সরকারী বনের প্রান্তসীমায় শিবির-সন্নিবেশ করিলেন। কাপ্তেন সাহেব, তাঁহার সহকারী জমাদার সুলতান খাঁ, এক জন কেরাণী বাবু, রসদের ভারপ্রাপ্ত বানিয়া ও অশ্বসাদীদের জন্য তাম্বু ছিল,—অপর সকলে সেই মাঘ মাসের দারুণ শীত কিয়ৎপরিমাণে প্রশমিত করিবার নিমিত্ত তাড়াতাড়ি বনজঙ্গল কাটিয়া ছোট ছোট কুঁড়ে ঘর প্রস্তুত করিয়া লইল, আর প্রচুর কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া আগুন পোহাইবার বন্দোবস্ত করিল।

কল্য হাতী ধরা হইবে, চতুর্দ্দিকে সংবাদ ছুটিতে লাগিল। সাহারাণপুর জেলার বনসমূহের তদানীন্তন ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী বনবিভাগের দেশীয় কর্ম্মচারি-

কর্ত্তব্যানুরোধে খেদার তত্ত্বাবধারণ করিবার নিমিত্ত অবিলম্বে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলেন। আমরা বনবিদ্যালয়ের ছাত্রগণ সমভিব্যাহারে অদূরে ধৌলখণ্ড নামক স্থানে অবস্থান করিতেছিলাম। ২৫শে জানুয়ারি সন্ধ্যার সময় করুণা বাবু আমাদিগের নিকট খেদার সংবাদ পাঠাইলেন। পরদিবস প্রাতে আমাদের অন্যত্র যাইবার সংকল্প ছিল, কিন্তু সুযোগ পাইয়াও এমন একটি বৃহৎ ব্যাপার না দেখিয়া গেলে বড়ই আক্ষেপ থাকিয়া যাইবে ভাবিয়া, ২৬শে তারিখে খেদা দেখিবার জন্য ছুটি থাকিবে, এই আদেশ প্রচারিত হইল। আদেশ পাইবামাত্র ছাত্রমহলে একটা তীব্র আনন্দ কোলাহল উত্থিত হইল। উৎসাহপ্রাবল্যে তাহাদের অনেকের রজনীতে নিদ্রা হইল না। তাহাদের কলরবে, ও বোধ করি উৎসাহসংক্রামকতায়, আমাদেরও সুষুপ্তির ব্যাঘাত হইল।

পরদিবস প্রাতে পাঁচ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া সাড়ে সাতটার সময় টিলাওয়ালায় উপস্থিত হইলাম। শেষরাত্রে কুয়াশা হইয়াছিল, তখনও সূর্য্যদেব কুয়াসাজাল ভেদ করিয়া প্রকাশমান হয়েন নাই। করুণা বাবু ও নায়েব খাঁ আমাদিগের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। আলাপ আপ্যায়িতের পর নায়েব খাঁ বলিলেন, "পাহাড়ে রাত্রেই লোক পাঠান হইয়াছিল, কিন্তু কুয়াসাজনিত গাঢ় অন্ধকারে হাতীর সন্ধান পাওয়া যায় নাই। তাহাদের অবস্থানঘটিত নিশ্চিত সংবাদ পাইবামাত্রই খেদা রওয়ানা করা হইবেক।"

ইত্যবসরে আমরা খেদার হস্তিসমূহকে দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। ঐরাবতসদৃশ নগেন্দ্রগজ, দেবীপ্রসাদ, যমুনাপ্রসাদ, নাগেশ্বরপ্রসাদ প্রভৃতি অতিকায় হাতীগুলি সকলেরই বিস্ময় ও আনন্দ বর্দ্ধিত করিল। নূতন ধরা হাতীগুলিই কিন্তু সকলকে অধিক আমোদিত করিতেছিল। তাহারা দুর্দ্দান্ত বন্য স্বভাব আজও সম্যক্ ভুলিতে পারে নাই। সুতরাং অচেনা মানুষ কাছে গেলে কেহ লম্ফ ঝম্প, কেহ বা মৃত্তিকাপ্রক্ষেপ প্রভৃতি কার্য্য দ্বারা অধৈর্য্য জ্ঞাপন করিতেছিল, কেহ বা উত্ত্যক্ত হইয়া শ্রবণবিদারক তূর্য্যবৎ ধ্বনি করিতেছিল। ইহাদের মধ্যে একটি ছোট বাচ্চা ছিল। উহার জননী ধৃত হইয়াছে কি না, স্থির হয় নাই; কারণ, হাতীরা ধরা পড়িবার পর পূর্ব্বসম্পর্ক কিছুতেই স্বীকার করে না। এই রীতিটি প্রায় সকল বন্য পশুতেই দেখিতে পাওয়া যায়। যাহা হউক, এই শাবকটি পূর্ব্বোক্ত নাগেশ্বরপ্রসাদের অতিশয় অনুগত হইয়া উঠিয়াছে। এটি যেন তাহার পালিত পুত্র। সে তাহার গায়ে শুঁড় বুলাইয়া কত স্নেহের সহিত আদর করে;

খাইতে দেয়; তাহাকে কেহ মিছামিছি মারিতে উদ্যত হইলে নাগেশ্বরপ্রসাদ গভীর বৃংহিতে গগন বিদীর্ণ করে।

কাপ্তেন নাম্নে খাঁ এ যাবৎ নিশ্চেষ্ট নন। প্রস্থানের আয়োজন নানাপ্রকারে হইতে লাগিল। সর্ব্বপ্রথমে আদেশ প্রচারিত হইল, "নয়োঁকো পানী পীলাও"। অবিলম্বে তিন তিনটি হাতী একত্র নদীর জলের দিকে চলিতে লাগিল। দুই পাশে দুইটি শিক্ষিত পোষা হাতী, আর উভয়ের মধ্যস্থলে একটি নূতন হাতী উভয়ের গলসংলগ্ন একগাছি মোটা কাছি দ্বারা আবদ্ধ,—পরস্পরের ব্যবধান পাঁচ ছয় হাত মাত্র। নূতন হাতীটির এই অবস্থায় ছুটিয়া পলাইবার উপায় নাই, পোষা হাতীদিগকে মারিবারও যো নাই। বস্তুতঃ তাহারা এইরূপে প্রহরি-পরিসেবিত হইয়া শান্ত ভাবে জল খাইয়া আসিল, কিছুমাত্র অবাধ্যতা বা অশিষ্টতা দেখাইল না। অতঃপর "ধারওয়ালা" অর্থাৎ পদাতিকদিগকে কার্ত্তুস্ লইবার হুকুম হইল। তাহারা তৎক্ষণাৎ জমাদার সুলতান খাঁর নিকট হইতে প্রত্যেকে ছয়টি করিয়া কার্ত্তুস্ লইয়া গেল।

এতক্ষণে বেলা প্রায় দশটা হইয়া উঠিল। আর আমাদের দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া হাতী দেখা ভাল লাগিতেছিল না। আমরা ক্রমে অধীর ও সন্দিহান হইতে লাগিলাম—আজ হয় ত তবে আর হাতী ধরা হয় না—দেখিতেছি নিরাশ মনে ফিরিয়া যাইতে হইবে। এমন সময় সোল্লাসে ভেরী বাজিয়া উঠিল—হাতীর খবর আসিয়াছে, সর্ব্বত্র এই সংবাদ বিঘোষিত হইল।

অল্পক্ষণ পরে আবার ভেরীনিনাদ হইল। এইবার ধারওয়ালাগণ স্ব স্ব বন্দুকাদি অস্ত্র শস্ত্র ধারণ করিয়া চিলাওয়ালী রাউ বাহিয়া কাতার দিয়া দ্রুতপদে পর্ব্বতাভিমুখে চলিতে লাগিল। ইহারা কেন যাইতেছে, কি করিবে, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না; অথচ নাম্নে খাঁকে তখন জিজ্ঞাসা করা সুরুচিসঙ্গত মনে করিলাম না; কারণ, সে সময়ে তিনি অতিশয় ব্যস্ত। গল্প করিবার তাঁহার আদৌ অবসর নাই।

অনতিবিলম্বে হস্তিব্যূহ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইল। চারিটিমাত্র শিক্ষিত হাতীর পৃষ্ঠে হাওদা বাঁধা ছিল। আমরা কয়েক জনে ঐ চারিটিতে আরোহণ করিলাম। করুণা বাবু তাঁহার নিজের প্রিয় হস্তিনী 'বেসী'র পৃষ্ঠে বসিলেন। অপর সমস্ত হাতীর পিঠে হাওদা বাঁধা হয় নাই। তৎপরিবর্ত্তে অতি ক্ষুদ্র একটি গদী বাঁধা, আর তাহারই উপরে বার তের হাত লম্বা ও প্রায় দুই ইঞ্চি মোটা এক গাছি কাছি বিঁড়ের মত করিয়া জড়াইয়া রাখা। ইহাদের প্রত্যে

কের স্কন্ধে মাহুত ও কটিদেশে দণ্ডায়মান অপর এক ব্যক্তি। শেষোক্তকে খেদার ভাষায় 'মুগরীওয়ালা' বলা হয়। ইহাদের সঙ্গে অস্ত্র শস্ত্র কিছুই থাকে না; কেবল মাহুতের হাতে মামুলী অঙ্কুশ, আর মুগরীওয়ালার হাতে একটি 'মুগরী'। এই মুগরী কাষ্ঠনির্ম্মিত প্রায় এক হাত লম্বা ক্ষুদ্র গদা বিশেষ, অগ্রভাগে কয়েকটি ছোট ছোট পেরেক বসান থাকে মাত্র। এই সকল অতি সামান্য উপকরণের সাহায্যে উহারা জঙ্গল হইতে জীবন্ত হাতী কি প্রকারে ধরিয়া আনিবে, তখন কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। যাহা হউক, এই কাছিওয়ালা হাতীগুলির পৃষ্ঠে এক একটি ছাত্রকে বসাইয়া লওয়া হইল। পথ সংকীর্ণ, সুতরাং হাতীগুলি সারিবন্ধ হইয়া চলিতে লাগিল। ৬০ কি ৭০টি হাতী সারিবদ্ধ হইয়া চলিতে থাকিলে প্রায় অর্দ্ধ মাইল রাস্তা যুড়িয়া যায়। এত হাতীর একত্র সমাবেশ দেখিবার মত বটে। হস্তিপৃষ্ঠে প্রায় ২০০ লোক, কিন্তু না মানুষ না হাতী টুঁ শব্দ করিতেছে, অথচ গতি মন্থর নয়। সর্ব্বাগ্রগামী নান্নে খাঁ স্বীয় বাহন যমুনাপ্রসাদকে খরবেগে চালাইতেছেন, কারণ আজ তিনি মাহুতের বেশে হস্তীর স্কন্ধে বসিয়াছেন, আর পশ্চাতের সমস্ত হাতী তাঁহারই অনুগমন করিতে চেষ্টা করিতেছে।

চিলাওয়ালী রাউ বাহিয়া উত্তরাস্তে শিবালিক ভেদ করিয়া এই ভাবে চারি মাইল পথ অতিক্রম করা হইল। 'রাউ' অর্থে এ দেশে শুষ্ক নদী বুঝিতে হয়। গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী শিবালিক পর্ব্বতের দক্ষিণ দিকের ঢালে এই প্রকার ৪০টি রাউ আছে। পর্ব্বতের শীর্ষদেশ হইতে ছোট ছোট অনেক 'সোত' (স্রোতঃ) প্রবাহিত হইয়া পরস্পর মিলিতে মিলিতে অবশেষে একই প্রবাহ উৎপাদন করে, তখন হইতেই প্রকৃত 'রাউ' নামে অভিহিত হয়। রাউগুলির তলদেশ প্রায়ই পর্ব্বতবিচ্যুত বালুকা ও উপলখণ্ডসমূহে আচ্ছন্ন, ক্বচিৎ অল্প অল্প জল দেখিতে পাওয়া যায়; কেবল বর্ষাকালে ইহারা ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করে। হঠাৎ বন্যা আসিবার আশঙ্কায় সে সময়ে কেহই রাউয়ের রাস্তায় চলিতে সাহস করে না। পর্ব্বতের যত দূর পর্য্যন্তের বৃষ্টিবারি কোনও এক রাউয়ের দ্বারা নিষ্ক্রান্ত হয়, সেই অংশকে ঐ রাউয়ের খোল (drainage basin) বলে। সুতরাং শিবালিকের দক্ষিণ দিকের সমস্ত ঢাল এই প্রকার ৪০টি খোলে বিভক্ত। আমাদের অদ্যকার ঘটনাস্থল চিলাওয়ালী নামক রাউয়ের খোলে।

চারি মাইল অতিক্রম করিয়া যে স্থানে উপস্থিত হইলাম, তথায় গাডাওয়ালী সোত নামক একটি সোত বাম দিক (অর্থাৎ পশ্চিম দিক) হইতে চিলাওয়ালী

খাউয়ের সঙ্গে মিলিত হইয়াছে। দেখিলাম, খারওয়ালাগণ এই স্থানে সমবেত হইয়া কাপ্তেন সাহেবের প্রতীক্ষা করিতেছে। ইহারা বলিল, গাডাওয়ালী সোতের উর্দ্ধতম অংশে সাতটি বন্য হস্তী আছে, অগ্রগামী চর এই সংবাদ আনিয়াছে। কাপ্তেন সাহেব অবিলম্বে বন্যহস্তীদিগকে অলক্ষ্যে বেষ্টন করিবার নিমিত্ত ইহাদিগকে প্রেরণ করিলেন। উহারা গাডাওয়ালী সোতের খোলের সীমানির্দ্দেশক শিখরসমূহের অভিমুখে নিঃশব্দে অথচ দ্রুতপদবিক্ষেপে ধাবিত হইল।

উহাদের যথাস্থানে পঁহুছিতে অবশ্য কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইবে; নামে খাঁ আমাদের দিকে ফিরিয়া হাসিয়া বলিলেন, আপনারা বিশ্রাম ও জলযোগ করিয়া লইতে পারেন। এই সদিচ্ছাপ্রণোদিত ইঙ্গিত বাঞ্ছিত হইলেও তখন বিদ্রূপাত্মক বলিয়া বোধ হইল। বেলা ১২টা বাজিয়াছে। জঠরাগ্নি বিলক্ষণ উদ্দীপ্ত হইয়াছে, ইহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু খাই কি? এত বিলম্ব হইবে, তাহা পূর্ব্বে জানা ছিল না। ভাবিয়াছিলাম, দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বেই খোলখণ্ডে ফিরিয়া গিয়া মধ্যাহ্নকৃত্য সমাপন করিতে পারিব, সুতরাং সঙ্গে কিছুই আনা হয় নাই। সেই বালুকা ও প্রস্তরবহুল পাহাড়ে আহার্য্যের প্রত্যাশা মরুভূমিমধ্যে বারিপ্রত্যাশার ন্যায় নিতান্তই নিষ্ফল, সুতরাং অনশন অনিবার্য্য সিদ্ধান্ত করিয়া লইলাম। ও দিকে করুণা বাবু আমাদের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া অলক্ষ্যে মৃদু মৃদু হাসিতেছেন। প্রস্থানে বিলম্ব দেখিয়া তিনি দূরদৃষ্টি ও দয়াপ্রবণতাবশে আমাদের উৎসাহ চঞ্চলতাকে অতিক্রম করিয়া সকলের অজ্ঞাতসারে এই স্থানে জলযোগের প্রচুর আয়োজন করিয়া রাখিয়াছিলেন। গাডাওয়ালী সোতের জলের ধারে শিলাতলে একটি বিশাল বনতরুর নিবিড়চ্ছায়ায় তাঁহার ভৃত্য আহার্য্যভাণ্ডার উন্মোচন করিয়া আমাদের প্রতীক্ষা করিতেছিল। দৃষ্টিমাত্র ধড়ে প্রাণ আসিল। নির্ঝরসলিলে হস্তপদাদি প্রক্ষালন করিয়া সোৎসাহে আহারে প্রবৃত্ত হইলাম। দেখিতে দেখিতে কৃষ্ণপক্ষীয় চন্দ্রমার ন্যায় ভাণ্ডার ক্রমে ক্ষীয়মান হইতে হইতে অচিরে অমাবস্যায় উপনীত হইল। করুণানিধান বাবুর সহিত একত্র বনমধ্যে বহুবার আহার করিয়াছি, কিন্তু এ দিনের মত এমন আমোদ ও তৃপ্তি বোধ করি আর কোনও দিন অনুভব করি নাই। আজ আমাদের ক্ষুন্নিবৃত্তি করাইয়া তিনি যথার্থই নামের সার্থকতা দেখাইলেন।

ক্রমশঃ।

সাধনা।

ওগো প্রিয়! তুমি মোর পুণ্য জীবনের
চির প্রেমার্জ্জিত পূর্ব্ব জনমের ফল!
ওগো প্রিয়! তুমি মোর শূন্য মরণের
সহস্র আসন্ন আশা সহায় সম্বল!—
নিতান্ত আমারি তুমি!

আছ তুমি দাঁড়াইয়া বিরাট অটল,
অতি ঊর্দ্ধ দৃষ্টি তব স্বর্গ পানে ধায়!
সকল জীবন তব, স্বাধীন সফল!—
আমি ব'সে তোমারি ও চরণের ছায়,—
তোমারি চরণ চুমি!

যদি কোন দিন তব উন্নত নয়ন
ধরণীর পানে চায় দেব-স্বপ্ন ভুলে!
আমি তাই পাতিয়াছি আমারি শয়ন
চেয়ে দে'খ, তোমারি ও চরণের মূলে!—
সফল করিও তুমি!

খুলিয়া হৃদয়-দ্বার আমি বিছাইব
যত না সৌন্দর্য্য আছে, যত না স্বপন!
সর্ব্ব কোমলতা মোর আমি পেতে দিব—
তুমি ক'র—ওগো ক'র—আমারি জীবন
তোমার চরণ-ভূমি!

চিত্রশালা।

স্নেহময়ী।

গার্হস্থ্য দৃশ্যের কল্পনায় ফ্রেডরিক মর্গান অদ্বিতীয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। গার্হস্থ্য জীবনে যে সৌন্দর্য্য, যে সহানুভূতি, পরিচিত অথচ অজ্ঞাত যে ভাবরাশি প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত, সুনিপুণ কলাকুশলীই প্রতিভাবলে তাহাদিগকে অভিনব রূপ প্রদান করিয়া 'সাধারণ' শ্রেণী হইতে উন্নীত করিতে পারেন। তাই আমাদের শিক্ষাহীন অন্ধ দৃষ্টিতে যে সৌন্দর্য্যের উপলব্ধি করিতে পারি না, মর্গানের মত সুনিপুণ চিত্রকরের তুলিকায় যখন সেই সৌন্দর্য্য উজ্জ্বল ও পরিস্ফুট হইয়া উঠে, তখন তাহা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়।

খোকা ও তাহার জননী, সুরম্য উদ্যান ও গৃহপালিত কুক্কুর, আমরা সকলেই দেখিয়াছি ও প্রায় নিত্যই দেখিয়া থাকি। কিন্তু ফ্রেডরিক মর্গান উক্ত কয়টির বিচিত্র সমাবেশে গার্হস্থ্য জীবনের এই বিশেষ ভাবটিকে চিত্রপ্রতিভায় অনুপ্রাণিত করিয়া যেরূপ 'চিরন্তন' করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা আমাদের কয় জনের কল্পনা-মুকুরে প্রতিবিম্বিত হয়?

স্নেহময়ী জননী স্বীয় নবপ্রসূতের মায়ায় বিভোর হইয়া নির্নিমেষনয়নে ও তন্ময়চিত্তে খোকাকেই আদর করিতেছেন! কিন্তু তাই বলিয়া গৃহ যখন শিশুর মধুর কলরবে মুখরিত

হয় নাই, তখন হইতেই সর্ব্বেসর্ব্বা, সুখে দুঃখে বিপদে সম্পদে চিরসাথী, আশ্রিত, পালিত, মানবসদৃশ জীব তাহার স্থলাভিষিক্ত দু'দিনের নবাগত অপরিচিতের খাতিরে এত অনাদর অবহেলা উপেক্ষা সহ্য করিবে কেন?—"মার একি আচরণ?" "আমি কি কেহ নই?" "ঐ কি সব?" "আমার এত অনাদর?" প্রভৃতির অনুরূপ ভাব ইতর জীবের অনুভব-প্রবণ হৃদয়কে স্পর্শ করিয়া কিরূপ চঞ্চল করে, এবং মানবভাষায় ও মানব উপায়ে না হইলেও তাহার মূক ভাষায় ও সহজাত ভঙ্গী দ্বারা সে ভাব কেমন স্পষ্টরূপে প্রকাশ পায়, এই আলেখ্য তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। চিত্রস্থিত কুকুরের মৃদু লেহন ও উজ্জ্বল সজল দৃষ্টিতে সংযত অভিমানের যে ভাব পরিস্ফুট, মানব-মুখে এই ভাবের বিকাশ ইহা অপেক্ষা অধিকতর পরিস্ফুট হওয়া সম্ভব কি না, বলিতে পারি না।

সাধন-সঙ্গীত।

করালী! যদি মরণেরে মার্‌তে পারিস্—
তবেই বুঝ্‌বো মনে প্রাণে আজ্‌ও তুই জ্যান্ত আছিস্।
মাগো! তোরে ডাক্‌ছি কত, সাড়া দিস্‌নে মরার মত,
খড়্গ দে মা! আমার হাতে সত্যই যদি মরে থাকিস্!
আর তোরে মা! বারে বারে, এমন ক'রে ডাক্‌ব নারে,
আমি নিজেই কর্‌ব যা কর্‌বার তুই যদি মা! নাই জাগিস্!
ওরে! যদিও মা মরিয়াছে, মায়ের নাম আজ্‌ও আছে,
(আমি) সেই নামের জোরে মারব মরণ, চুপ্ করে তুই চেয়ে দেখিস্!

মরা হাড়ে ভেল্কী খেলে ওরে আমার মরা মা!
একবার তবে ঝেড়ে ঝুড়ে আদত্ ভেল্কী খেলা না!
যা হবার তা হবে তাই, আমি একবার দেখ্‌তে চাই,
লোকে যা সব সত্যি ভাবে, তারে তুই মা মিথ্যা মানা!
সত্য মিথ্যা নানা প্রকার, এম্‌নি এই ভবের আঁধার,
(এ যে) ভেল্কীর ভেল্কী, আদৎ ভেল্কী, খেলালে যায় সব জানা!
থাকে না আর চোখের ঘোর, বাড়ে যে মা! বুকের জোর,
একবার তবে ঝেড়ে ঝুড়ে আদৎ ভেল্কী খেলা না!

সহযোগী সাহিত্য।

চৈনিক নাটক।

জুন মাসের 'নাইন্টিন্থ্ সেঞ্চুরী এণ্ড আফ্‌টার' পত্রে মিষ্টার আর্কিবল্ড লিটল্ চীনের নাটক সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। লেখক বলেন,—কনফিউসিয়স্ সম্পাদিত 'শু-কিং' অর্থাৎ ইতিহাস-গ্রন্থপাঠে জানা যায় যে, অতি প্রাচীন কালে (খৃঃ পূঃ ২২০০ শতাব্দীতে) চীনবাসীরা সঙ্গীত-শাস্ত্রের অনুশীলন করিত। চৈনিক স্বর্ণযুগে চীনদেশে 'সান' নামক এক সম্রাট আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ইনি চীনের অন্যতম সুপ্রসিদ্ধ 'শিয়া' রাজবংশের আদিপুরুষ। ইঁহার দরবারে

এক জন সঙ্গীতশাস্ত্রবিৎ সভাসদ বিদ্যমান ছিলেন। কোন পর্ব্বাহে বা দেবপূজা উপলক্ষে উৎসবস্থানে নৃত্যগীতাদির অনুষ্ঠান উৎসবের একটা অঙ্গমধ্যে পরিগণিত হইত। যে প্রকার রীতি অনুসারে তদানীন্তন নৃত্যপ্রণালী নিয়মিত হইত, তাহাতে ইহাকে নৃত্য নামে অভিহিত না করিয়া লাস্যলীলা বা অঙ্গভঙ্গিপ্রদর্শন বলিলেই যথাযথ হয়। শুনা যায়, প্রাচীন নৃত্যপ্রথা সেই সময়ের চীনবাসীদিগের চতুর্ব্বিধ কর্ম্ম ও তাহার আনুষঙ্গিক হৃদয়ভাবের পরিচায়ক ছিল। এই নৃত্যের দ্বারা ভূমিকর্ষণ, শস্যসংগ্রহ, সমর ও শান্তি, এবং এই চতুর্বিধ কর্ম্মজনিত চিত্তভাব—আনন্দ, শান্তি ও সন্তোষ প্রদর্শিত হইত। খৃঃ পূঃ ২৪০০ হইতে ৭২০ পর্য্যন্ত সপ্তদশ শতাব্দীর ইতিহাস পূর্ব্বোক্ত 'শু-কিং' নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই গ্রন্থপাঠে জানা যায় যে, পূর্ব্বকালে পৃথিবী, নদী ও পর্ব্বতের অর্চ্চনাকালে পূর্ব্ববর্ণিত নটসম্প্রদায় ঢালের দ্বারা যুদ্ধ, কোদালির দ্বারা কৃষিকার্য্য ও পতাকা দ্বারা রণজয় সূচিত করিত। পরবর্ত্তী কালের কোনও গ্রন্থে এইরূপ নৃত্যপ্রণালীর বিস্তৃত বিবরণ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এইরূপ লিখিত আছে যে, পূর্ব্বোক্ত নটসম্প্রদায় উত্তর দিক্ হইতে রঙ্গস্থলে প্রবেশপূর্ব্বক অঙ্গভঙ্গি ও অবস্থাননৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়া যুদ্ধাভিযানের অভিনয় করিত। তাহার পর দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইয়া শ্রেণীবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান হইত। তখন অভিনেতৃবর্গ লোকবিশ্রুত নৃপতি, বীর ও সাহিত্যসেবিগণের অবদানের অভিনয় করিত। কালক্রমে এই অভিনয়প্রণালীর এরূপ অধঃপতন হইল যে, চৌ-বংশীয় সম্রাটগণের শাসনকালে ধর্ম্মোৎসবক্ষেত্রে ইহার অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ হইয়া গেল। সুধীসমাজে এই নৃত্যাভিনয়কারিগণ নিতান্ত ঘৃণিত ও উপেক্ষিত হইতে লাগিল। বর্ত্তমান কালেও সজ্জনসমাজে ইহাদিগের সমাদর নাই। ইংলণ্ডে মহাকবি সেক্সপীয়রের সময়ে যেরূপ রঙ্গমঞ্চে নাটকাভিনয় হইত, অধুনাতন চৈনিক রঙ্গভূমি অবিকল তাহারই অনুরূপ। এই রঙ্গভূমি সমচতুর্ভুজাকারে নির্ম্মিত হয়। ইহার একাংশ দর্শকবর্গের আসনশ্রেণী পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়া থাকে। রঙ্গমঞ্চের পশ্চাদ্ভাগের প্রাচীরে অভিনেতৃবর্গের প্রবেশ ও প্রস্থানের জন্য দুইটি দ্বার থাকে। এই রঙ্গভূমিতে দৃশ্যপটের সমবেশ নাই, সুতরাং অভিনয়সাফল্য সম্পূর্ণরূপে অভিনেতৃসম্প্রদায়ের নৈপুণ্যের উপর নির্ভর করে। সেক্সপীয়রের সমসাময়িক অভিনেতৃবৃন্দের ন্যায় চৈনিক অভিনেতারাও বিলক্ষণ কলাকুশল। যন্ত্রিদল দর্শকদিগের সমক্ষে রঙ্গভূমির পশ্চাদ্ভাগে উপবিষ্ট হয়। ধনাঢ্য দর্শকমণ্ডলী নাট্যশালার চতুষ্পার্শ্বস্থিত গ্যালারীতে আসন পরিগ্রহ করেন। পিট্ নামক আসনগুলি কেবল দরিদ্র দর্শকদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট থাকে। ইহারা বিনামূল্যে দর্শনাধিকার প্রাপ্ত হয়। চীনদেশের সর্ব্বত্র এই নিয়ম প্রচলিত আছে। কুত্রাপি তাহার ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয় না। মিষ্টার লিট্‌ল্ বলেন,—বোধ করি, ইংলণ্ডের নাট্যশালা ও রঙ্গস্থলসমূহে এই প্রথা প্রবর্ত্তিত হইলে ভাল হয়। এই স্থানে আর একটি কথার উল্লেখ, বোধ করি, অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। চীন-ভ্রমণ কালে আমি এতদ্দেশীয় বর্ণজ্ঞানশূন্য নাবিক ও বাহকগণের ইতিহাসাভিজ্ঞতার পরিচয় পাইয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছিলাম। আমাদিগের দেশে এই শ্রেণীর লোকদিগের ঐতিহাসিক বিষয়ের কোনও ধারণা নাই। চৈনিক নাবিক প্রভৃতি বিদেশী পর্য্যটকদিগকে আগ্রহভরে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থানসমূহ দেখাইয়া পুরাকালের বীর ও ও সম্রাট্‌দিগের কীর্ত্তিকাহিনীর বর্ণনা করিয়া থাকে। বহুদিন পরে আমি ইহাদিগের ইতিহাস-জ্ঞানের কারণ জানিতে পারিয়াছিলাম। রঙ্গালয়সমূহই তাহাদিগের একমাত্র শিক্ষাস্থল। এখানকার শিক্ষার মত মধুর ও মনোরম শিক্ষা আর কোথাও সুলভ নহে। রঙ্গমঞ্চে যে সকল নাটকের অভিনয় হয়, প্রধানতঃ ইতিহাস হইতেই তাহাদিগের উপকরণ সংগৃহীত হইয়া থাকে। চীনের প্রত্যেক পল্লীতে সর্ব্বত্রগামী অভিনেতৃ-সম্প্রদায় এই সকল নাটকের অভিনয় করে। পল্লীর সঙ্গতিপন্ন লোকেরা এই সকল অভিনয় ব্যাপারের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিয়া থাকেন।

এই সকল অভিনেতৃ সম্প্রদায়কে সপ্তাহ বা এক পক্ষ কালের জন্য অভিনয়ার্থ নিযুক্ত করা

হয়। মধ্যাহ্নকালে অভিনয়ের আরম্ভ ও রাত্রি ৯ ঘটিকার সময় তাহার সমাপ্তি হয়। অভিনেতৃবর্গ চীনবাসীদিগের প্রকৃতিগত অসামান্য ধৈর্য্যসহকারে এই দীর্ঘকালব্যাপী অভিনয় কার্য্য সম্পাদন করে। নাটকের প্রধান প্রধান অংশগুলি সুরসংযোগে গীত হয়। কিন্তু কিরূপে তাহারা দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত স্বরসাম্য রক্ষা করে, ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। অনেকগুলি নাটক তাহাদিগের কণ্ঠস্থ থাকে। অনেকে কোন প্রকার নাট্যগ্রন্থাবলীর ব্যবহার করে না; শৈশব হইতে নাটকাভিনয়-শিক্ষায় নিযুক্ত থাকাতে, বাল্য-সুলভ স্মরণশক্তির প্রাখর্য্যবশতঃ নাটকগুলি সম্পূর্ণরূপে তাহাদিগের আয়ত্ত হয়। কোন সম্ভ্রান্ত আগন্তুক অভিনয়দর্শনেচ্ছু হইলে, তাঁহার নিকট একখানি নাট্যগ্রন্থাবলী আনয়ন করে। তিনি শতাধিক নাটকের মধ্য হইতে একখানি নাটক অভিনয়ার্থ নির্ব্বাচিত করিয়া দেন। আমি অনেকবার অপ্রচলিত ও লোকের অপ্রিয় নাটকের নির্ব্বাচন করিয়া দেখিয়াছি, অভিনেতারা অবলীলাক্রমে তাহার অভিনয় করিয়াছে। তবে নির্ব্বাচিত নাটকের মধ্যে নাটকীয় পাত্রগণের কাহারও নাম যদি নির্ব্বাচনকর্ত্তার নামের অনুরূপ হয়, তাহা হইলে, সেই নাটকের আর অভিনয় হয় না। চৈনিক রঙ্গমঞ্চে দৃশ্যপটের সমাবেশ নাই বটে, কিন্তু অভিনেতৃগণের পরিচ্ছদ পরম রমণীয়। রাজা, সেনাপতি প্রভৃতি উচ্চ-পদস্থ ব্যক্তিদিগের পরিচ্ছদ বিবিধ কারুকার্য্যে মণ্ডিত। অভিনেতাদিগের পরিচ্ছদ ও বেশবিন্যাস যথাযথভাবে ও পরম যত্নসহকারে সম্পাদিত হয়। এই সকল রঙ্গমঞ্চে যবনিকা ও 'ড্রপসিনে'র ব্যবহার নাই। আর একটা কৌতুকাবহ ব্যাপার এই যে, একখানি নাটকের অভিনয় সমাপ্ত ও আর একখানি নাটকের অভিনয়ারম্ভের পূর্ব্বে পুনরভিনয়-সূচক বিরামকালের ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয় না। কেবল করতালের অদ্ভুত শব্দ দ্বারা তাহার সঙ্কেত করা হয়। কিন্তু অবস্থাভিজ্ঞ ব্যক্তি ভিন্ন আর কেহই এই ইঙ্গিতের মর্ম্মগ্রহণে সক্ষম হয় না। এই জন্য অনেক ইউরোপীয় দর্শক বলিয়া থাকেন, চৈনিক নাটকের অভিনয় একবার আরব্ধ হইলে সহজে উহার সমাপ্তি হয় না। তবে সময়ে সময়ে সেক্সপীয়রের প্লেণ্টাজিনেট বংশ-সংক্রান্ত নাটকনিচয়ের ন্যায় ধারাবাহী ঐতিহাসিক নাটকাবলীর অভিনয় হয় বটে। তখন তিন চারি দিন ধরিয়া একটি আখ্যায়িকার অভিনয় চলিতে থাকে। চৈনিক ভাষায় চতুর্ব্বিংশ অঙ্কবিশিষ্ট একখানি প্রসিদ্ধ নাটক আছে। তবে সচরাচর অস্মদ্দেশীয় নাটকের অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর নাটকেরই অভিনয় হইয়া থাকে।

যখন অভিনয় আরব্ধ হয়, তখন সমস্ত পল্লীর মধ্যে একটা উল্লাস কোলাহল পড়িয়া যায়। পল্লীবাসীরা সুন্দর বেশভূষায় সুসজ্জিত হইয়া অভিনয়দর্শনে গমন করে। মহিলাগণ নাট্য-শালার 'গ্যালারী'তে আসনপরিগ্রহ করেন;—তাঁহাদিগের সম্মুখস্থ টেবিলের উপর চা, কেক প্রভৃতি নানাবিধ উপাদেয় খাদ্যদ্রব্য রক্ষিত হয়। 'পিটে'র মুক্ত ও সুবিস্তীর্ণ স্থানে পল্লীর এক একটি পরিবারের সমস্ত লোক সমবেত হইয়া পাইপে ধূমপান করিতে করিতে এরূপ নিশ্চিন্ত-ভাবে সমস্ত দিন অভিনয় দর্শন করিতে থাকে যে, দেখিলে হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হয়। প্রত্যেক রঙ্গভূমির পশ্চাদ্ভাগে চারিটি সমুজ্জ্বল স্বর্ণাক্ষরে "We hold the mirror up to Nature," এই বাক্য খোদিত থাকে। এই "Motto" দেখিবামাত্র সেক্সপীয়রের কথা স্মৃতিপথে উদিত হয়। ইহা দেখিয়া হয় ত কোন যুক্তিপ্রিয় বলিবেন যে, সেক্সপীয়র অন্যান্য দেশের ন্যায় চীনদেশেও পদার্পণ করিয়াছিলেন। নগরে ব্যবসায়িগণের সভাগৃহের একাংশে অবস্থিত রঙ্গমঞ্চে অভিনয় হইয়া থাকে। চীনের প্রত্যেক বাণিজ্যপ্রধান নগরে এইরূপ অনেকগুলি নাট্যশালা আছে। সুচারু দারু, প্রস্তর ও চিত্রকলাদির প্রাচুর্য্যে এই রঙ্গালয়-গুলি খুব সুন্দর দেখায়। বণিক্‌সম্প্রদায়ের উৎসবকালে সভার সদস্যবৃন্দ নিমন্ত্রিত হইয়া থাকেন। ইংলণ্ডের বণিক্‌সমিতির প্রদত্ত ভোজের ন্যায় চৈনিক বণিকগণের এই ভোজও মহা সমারোহে নির্ব্বাহিত হয়। প্রাচীনপ্রথানুসারে এই ভোজ ব্যাপার বহুক্ষণ ধরিয়া চলিয়া থাকে। ঐ সময়ে ভোজসভায় নানাবিধ নাটকের অভিনয় হয়, অভিনেতৃদল অভিনয়শ্রমে

ক্লান্ত হইয়া পড়িলে তাহাদিগের শ্রমাপনোদনের জন্য কুলীরা নিতান্ত মলিনবেশে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশপূর্ব্বক তাহাদিগকে মধ্যে মধ্যে চায়ের পেয়ালা দিয়া আসে। দর্শকবৃন্দ কুলীদিগকে 'অদৃশ্য' মনে করিয়া থাকেন। দর্শকদিগের মনে দৃশ্য বা নাটকীয় ব্যাপার সম্বন্ধে একটা স্থূল ধারণা জন্মাইবার জন্য রঙ্গমঞ্চে নানারূপ দ্রব্যাদি ব্যবহৃত হয়। টেবিলের উপরিস্থিত একটা চেয়ারে দণ্ডায়মান হইয়া বিপক্ষ সৈন্যে পরিবেষ্টিত সেনাপতি রঙ্গমঞ্চে দণ্ডায়মান জনৈক অভিনেতাকে সম্বোধন করিয়া বিপক্ষদলের অধিনায়কের সহিত বাগ্বিতণ্ডার অভিনয় প্রদর্শন করেন। হস্তস্থিত বেত্রের দ্বারা অশ্বারোহী সৈন্যের ও অশ্বারোহীর গতির অনুকৃতি দ্বারা অশ্বপরিচালন কার্য্যের অভিনয় প্রদর্শিত হয়। যে সকল অভিনেতারা স্ত্রীচরিত্রের অভিনয় করে, তাহারা রমণীদিগের কণ্ঠস্বর, হাবভাব ও গমনভঙ্গীর এরূপ অবিকল অনুকরণ করে যে, তাহাদিগকে কিছুতেই প্রকৃত নারী হইতে বিভিন্ন বলিয়া চিনিতে পারা যায় না। আবার একখানি টেবিলই ক্রমান্বয়ে কারুকার্য্যখচিত আস্তরণ ও সামান্য রক্তবর্ণ বসনে মণ্ডিত হইয়া রাজাসন ও বিচারাসন উভয়ের কার্য্যই সম্পাদন করে। রঙ্গমঞ্চের পশ্চাদ্ভাগে প্রাঙ্গনের পার্শ্বস্থিত অর্দ্ধ-অনাবৃত গ্যালারীতে অভিনেতৃগণের সজ্জাগৃহ নির্দ্দিষ্ট হয়। অভিনেতারা এই নেপথ্যগৃহে এমন ক্ষিপ্রভাবে বেশপরিবর্ত্তন করে যে, দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। লৌহপাতমণ্ডিত সিন্দুকের মধ্যে পরিচ্ছদগুলি রক্ষিত হয়। পরিচ্ছদগুলি বহুমূল্য। ইউরোপে যে সমস্ত সুচারু কারুকার্য্যে খচিত বস্ত্রাদি প্রেরিত হয়, তাহা অভিনেতাদিগের পরিত্যক্ত পরিচ্ছদ।

চীনে নরসুন্দর জাতি ও এই অভিনেতৃগণ সমাজের একমাত্র অধম ও ঘৃণিত সম্প্রদায় বলিয়া পরিগণিত। ইহাদের সন্তানেরাও দেশের কোনও রাজকার্য্যে প্রবেশাধিকার লাভ করিতে পারে না। সাহিত্যের ভাষায় ইহাদিগের নাম Children of the Pear garden। ট্যাং বংশের প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট্ Shuan-tsung অভিনেতৃগণকে আপনার 'পেয়ার' উদ্যানে আহ্বান করিয়া নাট্যকলা শিক্ষা দিতেন বলিয়া উহারা এই নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। উক্ত সম্রাট্ অন্তঃপুরিকাগণের অভিনয়কলারও তত্ত্বাবধান করিতেন, এবং তদানীন্তন গীতাভিনয়-সম্প্রদায়ের জন্য কতিপয় অভিনব রাগ রাগিণীর উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানকালে ঐ রাগ রাগিণীগুলি "লীচু ফলের সৌরভ" নামে সাধারণ্যে পরিচিত। সঙ্গীত ও অভিনয়-কলার উন্নতিকল্পে উক্ত সম্রাট্ একটি সঙ্গীতবিভাগের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এবং বিশ্ববিশ্রুত নেপোলিয়নের ন্যায় রাজকার্য্যে কোন ঔদাস্য প্রকাশ না করিয়াও সঙ্গীত ও অভিনয়কলার আলোচনায় সমধিক আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। আরও গৌরবের কথা এই যে, ইনিই সুবিখ্যাত 'হেনলিন' কলেজের সংস্থাপক।

চীনের অতি প্রাচীন গীতিকাব্য পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, পুরাকালে চীনরমণীগণ বহু বিষয়ে স্বাতন্ত্র্যলাভ করিয়াছিলেন। রঙ্গস্থলে রমণীর প্রবেশাধিকার যে সময় হইতে নিষিদ্ধ হইয়াছে, নারীজাতির সামাজিক অবস্থাও সেই সময় নিতান্ত হীন হইয়া পড়িয়াছে। ইউরোপের ন্যায় চীনদেশেও অভিনয়সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণ নির্দ্দিষ্ট বিভাগসমূহের অন্তর্গত। প্রত্যেক অভিনেতারই অভিনয়সংক্রান্ত নাম ও কার্য্যপ্রণালী নির্দ্দিষ্ট আছে। যোগ্যতা অনুসারে পৃথক্ পৃথক্ ব্যক্তি বীর, করুণ, রৌদ্র, হাস্য প্রভৃতি বিভিন্ন রসের অভিনয় করিয়া থাকে।

চীনভাষায় চৈনিক গণিকাগণের নাম 'বারহাসিনী' (the Women who Smiles in public)। ইহাদিগের অবস্থা প্রাচীন গ্রীসের বারবনিতাদিগের অবস্থার অনুরূপ। ইহাদিগকে নৃত্যগীতাদি ললিতকলার সম্যক্ অনুশীলন করিতে হয়; সাহিত্য বিষয়ে জ্ঞানার্জ্জনও ইহাদিগের পক্ষে অপরিহার্য্য। রঙ্গমঞ্চে এই শ্রেণীর রমণীচরিত্রও অভিনীত হয়। চৈনিক নাট্যকারকে নাটকের রচনা সম্বন্ধে সুনীতির অনুমোদিত রচনাপ্রণালীর অনুসরণ করিতে হয়। চৈনিক ব্যবহারশাস্ত্রানুসারে অশ্লীলতা গুরুতর অপরাধের মধ্যে পরিগণিত। অশ্লীল গ্রন্থের অভিনয় ও প্রচার বন্ধ হওয়া পর্য্যন্ত গ্রন্থপ্রণেতাকে কারাবদ্ধ থাকিতে হয়।

এক 'আলসাটিয়স্' বন্দর ভিন্ন চীনের অন্য সকল স্থানেই নাটকাভিনয় লোকশিক্ষার সমধিক উপযোগী। চৈনিক লেখকেরা বলেন, নিরক্ষর লোকদিগের শিক্ষার্থ রঙ্গালয়ে উন্নত চরিত্র-চিত্রের প্রদর্শনই আবশ্যক। চৈনিক ব্যবস্থাপকগণ কুৎসিত গ্রন্থের রচয়িতার দণ্ড বিধানের ব্যবস্থা করিয়া অশ্লীল নাটকাভিনয় সম্বন্ধে এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন,—কল্পনামূলক অথচ বাস্তবানুরূপ সাধুশীল নরনারী, পিতৃভক্ত কর্তব্যপরায়ণ সুসন্তান ও মানসিক উন্নতির-অনুকূল অন্যবিধ ঘটনাদির অভিনয়দর্শনে দর্শকগণ যাহাতে ধর্ম্মপথগামী হয়, তদ্বিষয়ে যত্ন, অভিনয়-সম্প্রদায়ের একান্ত কর্তব্য। The Maid's Intrigues নামক লোকপ্রিয় নাটকে শ্রীমতী হান কন্যাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, 'পূর্ব্বকালের ন্যায় এ কালেও নিরূপিত বিধি ব্যবস্থার পালন ব্যতিরেকে নর-নারীর সম্মিলন যে সম্ভবপর নহে, তাহা কি তোমার অবিদিত?' বর্ত্তমান রাজবংশীয়দিগের চরিত্রাভিনয় ব্যতীত অন্য কোন প্রকার অভিনয় চৈনিক আইনে প্রতিষিদ্ধ নহে। সকলে ইচ্ছানুসারে নাট্যশালা স্থাপন পূর্ব্বক যে কোন বিষয়ের অভিনয় করিতে পারেন। বাস্তবিক চৈনিক অভিনয়প্রণালী তদ্দেশীয় অধিবাসিগণের দ্বারা নিয়মিত হওয়াতে ইহা আমাদিগের যদৃচ্ছ ও উচ্ছৃঙ্খল অভিনয়রীতি অপেক্ষা সমাজের পক্ষে সমধিক ফলোপধায়ক হইয়াছে।

শুনা যায়, 'সুই' বংশের প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট্ ওয়েনটির রাজত্বকালে (৫৮০ খৃঃ) বর্ত্তমানরঙ্গমঞ্চ-নির্ম্মাণপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। 'টং' রাজবংশ (৭২০—৯০৫ খৃঃ), 'স্যং' রাজবংশ (৯৬০—১১১৯ খৃঃ), এবং তাতার ও মোগল রাজবংশের 'কিন্' ও ইউয়েনের (১১২৩—১৩১৪ খৃঃ) রাজত্বকালে চৈনিক ভাষার সম্যক্ উন্নতি হইয়াছিল। ঐ সময় অধিকাংশ নাট্যগ্রন্থ প্রণীত হইয়াছিল। মোগল রাজবংশের শেষ রাজার ৮৯ বৎসরব্যাপী রাজত্বকালে (১২৭০—১৩৬৮ খৃঃ) ৪৪৮ খানি নাটক রচিত হয়। এই সকল নাটকের প্রণেতার নাম প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। কিন্তু ১০৫ খানি নাটকের রচয়িতার নাম অপরিজ্ঞাত। এতদ্ভিন্ন বিখ্যাত গণিকাগণের প্রণীত চারি খানি নাটক অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। "ইউয়েন-বংশীয় রাজাদিগের শাসনকালে বিরচিত নাটকসংগ্রহ" পুস্তকের সঙ্কলনকারী নাটকগুলিকে দ্বাদশ শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রথম শ্রেণীর নাটকে দেব ও উপদেবগণের চরিত্রে রূপান্তরগ্রহণের ক্ষমতা লক্ষিত হয়। তিনি নাটক-রচনা সম্বন্ধে কয়েকটি নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে, একখানি প্রকৃত নাটকের রচনা করিতে হইলে উহাকে চারি অঙ্ক বিশিষ্ট করাই কর্ত্তব্য। প্রয়োজন হইলে নাটকে একটি পূর্ব্বাভাষ সংযোজিত হইতে পারে। পূর্ব্বাভাষ দ্বারা নাটকীয় ঘটনা পরিব্যক্ত হইয়া থাকে। প্রথম অঙ্কে নাটকের আখ্যানবস্তু বা 'প্লট' সন্নিবিষ্ট করিতে হয়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় অঙ্কে নাটকীয় চরিত্রসমূহের কর্ম্মসংঘাতে প্লটটি পরিণত হইয়া উঠে। চতুর্থ অঙ্কে নাটকীয় চরিত্র ও ঘটনাবলী চরম সীমায় উপনীত হয়, এবং ঘটনাস্রোত সহসা বিভিন্ন দিকে প্রবাহিত হওয়াতে পাপের দণ্ড ও প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হয়। চৈনিক নাট্যসাহিত্য এরূপ বিপুল হইলেও, ইউরোপীয় ভাষায় তাহার দুই একখানি গ্রন্থমাত্র অনূদিত হইয়াছে। ইহা নিতান্ত বিস্ময়কর বটে। অনেকগুলি নাটক কেবল পুরাকালের চিত্র। চৈনিক ভাষায় 'কুই-ম্যোন্' প্রেতলোকের তোরণ বলিয়াই যে চিত্তাকর্ষক, তাহা নহে; বাস্তবিক ইহার অন্তর্নিবিষ্ট আখ্যানভাগ ও কথোপকথনপ্রণালী বিশেষ হৃদয়গ্রাহী। ইউরোপীয় ভাষায় অনূদিত চৈনিক নাটক ১৭৩৫ খৃঃ জেস্যুইট পাদরী ফাদার ড্রেমেয়ার কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়।

কতকগুলি চৈনিক নাটকায় বিচিত্র কাব্য-কল্পনার সমাবেশ দেখা যায়। উহা আমাদিগের অদ্ভুত বোধ হইলেও, যাঁহারা চীনবাসীকে সম্যক্ বুঝিতে পারিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট সুসঙ্গত ও সুন্দর বোধ হইবে। 'হো হান্ শান্' নাটকের নায়ক তুষারবর্ষণ দেখিবার জন্য স্ত্রীপুত্র সঙ্গে লইয়া গৃহের উপরতলের প্রকোষ্ঠে গমন করিলেন। কয়েক পাত্র মদ্যপান করিবার পর তাঁহার বুদ্ধিবিভ্রম ঘটিল। তখন তাঁহার বোধ হইতে লাগিল, যেন বসন্তকাল সমাগত!

তুষাররাশি, পিয়ার বৃক্ষের নবমুকুল, আরক্ত মেঘমালা, কুসুমিত উইলো লতা, সম্মুখে রেশম-রচিত সুন্দর পর্দা বিলম্বিত, এবং পদতলে পুষ্পাকীর্ণ গালিচা বিস্তৃত রহিয়াছে। সে কালের নাটক-রচনায় সুরার উপযোগিতাও অল্প নহে। সামান্য মদ্যপানমাত্রই চীনের কর্ম্মবিমুখ সাহিত্যসেবীরা বিলক্ষণ উত্তেজনা অনুভব করেন। শুনা যায়, কবিতারচনার সময় ইঁহারা উদ্দীপনার জন্য অল্পপরিমাণে মদ্যপান করিতেন। অধুনাতন শিক্ষিত সাহিত্যসেবিগণ পরম সুরাভক্ত।

নাটকাভিনয় ইদানীন্তন চীনবাসীদিগের জীবনের একটা অংশবিশেষ। নাটকাভিনয় ব্যতীত চীনের কোনও প্রকার সাধারণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় না। ধর্ম্মসংক্রান্ত উৎসবের সহিত ইহার সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য।

চৈনিক নাটকের চরিত্রগুলি প্রকৃতপক্ষে সজীব নরনারীর চিত্র। নাট্যকারেরাও প্রকৃতির অনুগত চরিত্রচিত্রণে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া থাকেন। মিষ্টার লিটল্ বলেন, ভারতের প্রাচীন নাট্যকারগণ যেরূপ উদ্দাম কল্পনার বশবর্ত্তী হইয়া অতিপ্রাকৃত চরিত্র ও রাক্ষসাদির সৃষ্টি করিয়াছেন, [ভারতীয় নাটক সম্বন্ধে লেখকের জ্ঞান অত্যন্ত চমৎকার!] চৈনিক নাটককারগণ সেরূপ পন্থার অনুসরণ করেন নাই। তাঁহারা নাটকের মধ্যে মানবচরিত্রের অন্তর্নিহিত রহস্যের প্রকাশ করিয়া শ্লেষের আশ্রয় লইয়া মানবের চরিত্রগত দুর্ব্বলতা প্রদর্শিত করিয়াছেন। উৎকৃষ্ট চৈনিক নাটকসমূহ কেবল সাময়িক নহে, সেগুলি সেক্সপীয়রের নাটকনিচয়ের ন্যায় সাহিত্যের চিরন্তন সম্পত্তি। চীনের লোকচরিত্র বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিতে হইলে, নাটকপাঠে তাহা যেরূপ সহজে সম্পন্ন হইতে পারে, এমন আর কিছুতেই নহে।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

ভারতী। বৈশাখ। "বর্ষ-মঙ্গল" একটি মামুলি কবিতা। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় চৌধুরীর রচিত। হালখাতার মত নববর্ষের কবিতাও এ দেশে 'নিত্য';—কিন্তু আসল কবিতা পদার্থটা বোধ করি মোটের উপর 'নৈমিত্তিক'। মাসিকপত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় শোভা পায় বলিয়া তাহা 'আবশ্যক' হইতে পারে, কিন্তু দরকার মত কবির হুকুমে ভাবের জোয়ার ত আসে না। তাই এই শ্রেণীর কবিতা প্রায় সার্থক হয় না। ছন্দে কতকটা অধিকার থাকিলে কবিতার কাঠামোর উপর খুব 'রঙ্গচঙ্গ' চলিতে পারে, কিন্তু দৈব-প্রেরণা [শ্রদ্ধেয় চন্দ্রনাথ বাবু সম্প্রতি Inspiration শব্দের এই অনুবাদ করিয়াছেন। 'মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ।'] নহিলে সেই মৃণ্ময়ী মূর্ত্তির প্রাণপ্রতিষ্ঠা অসম্ভব। "বর্ষ-মঙ্গল" যে কবিতার স্বাভাবিক লীলায় বঞ্চিত, ফনোগ্রাফের গানের মত কুণ্ঠিত, কাগজের ফুলের মত কুঞ্চিত, তাহারও বোধ করি, কারণ এই। কবির 'প্রকৃতি অরি'র প্রসাদ, প্রভাব ও পরিমল "বর্ষ-মঙ্গলে" নাই। কিন্তু আমরা কবির কবিতায় সেইরূপ সৌরভেরই প্রত্যাশা করি।

"এ আলোক ছটা
স্বর্গের ধিকার এসে কাল-বৈশাখীর বেশে
আবরিবে মেলি নীলজটা!"

পড়িয়া কিছু বুঝিতে পারিলাম না, অথচ শব্দ ক'টির অর্থ জানি। "জাগুক সবার মনে অতীতের প্রকাণ্ড প্রমাদ" প্রভৃতিও তদ্বৎ। আসল কথা, কবিতাটির 'কল্পনা' যেরূপ উচ্চ ও গুরুগম্ভীর, 'রচনা' সেরূপ হয় নাই। কবি যতখানি ভাবিয়াছেন, ভাষায় ততখানি প্রকাশ করিতে পারেন নাই। "সুন্দরী" শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের ক্রমশঃপ্রকাশ্য উপন্যাস। শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর রচিত "দেবকৌতুক" নামক পদ্য নাটিকার কৌতুক ঠাকুর দেবতার ভোগ্য হইবে,—আমরা রসগ্রহ করিতে পারিলাম না। "হিন্দুর নারীমর্য্যাদা"

প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত জ্ঞানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ইংরাজীভাবাপন্ন বাঙ্গলায় প্রতিপন্ন করিতেছেন, হিন্দুরা নারীর মর্য্যাদা জানিতেন ও রাখিতেন। গ্রন্থকারের অনুসন্ধান ও প্রয়াস প্রশংসনীয়। এম্. কে. গান্ধির "দক্ষিণাফ্রিকায় ভারতোপনিবেশ" প্রবন্ধে বিশেষ তথ্য নাই, তাঁহার আলবার্ট হলের বক্তৃতার অনুবাদ করিলে কাজ হইত। আর একটি কথা, "দক্ষিণাফ্রিকা" প্রভৃতি সন্ধিবন্ধন শুনিলে "যদ্যপ্যাঠারো টাকা দিলাম, তথাপ্যাটচালা সারা হইল না" মনে পড়ে না? একেই ত রবীন্দ্র বাবু, হীরেন্দ্র বাবু এবং সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ সন্ধি সমাস প্রভৃতিকে মারিয়া তাড়াইবার জন্য লাঠী উচাইয়া পরিষদের প্রাঙ্গনে 'পাঁয়তারা' করিতেছেন, এ সময়ে এ পক্ষে একটু সতর্কতা বাঞ্ছনীয় নয় কি? শ্রীমতী সরলা দেবীর "বাঙ্গালী পাড়া"য় মন্দ কি? আমাদের পাড়ার প্রশংসা—মিষ্ট লাগিবে না? আমাদের এই তেল তামাক ও মুড়ী মুড়কীর সমাহারের মধ্যেও এতটা সৌন্দর্য্য আছে, 'আঁস্তাকুড়ে'র কাছে দাঁড়াইয়া তাহা দেখিতে পাই নাই। লেখিকা দেখিয়াছেন, এবং অনুগ্রহ করিয়া দেখাইয়াছেন, এ জন্য আমরা ধন্যবাদ দিতেছি। রচনাটি ক্রমশঃপ্রকাশ্য, সমাপ্ত হইবে ত? অন্ততঃ আমরা সমাপ্তির আশা করি। লেখিকার দুই একটি রচনার ভাগ্যে 'শেষ সুখ পরম সুখ' ঘটে নাই, তাই বলিতেছি। ঠাকুমা দিদিমার আমলে ভয় ছিল, গল্প শেষ না করিলে 'আধকপালে' ধরে। এখন বিংশ শতাব্দীর নব বিধানে সে শঙ্কা নাই। এই জন্যই পাঠকদিগকে তথা সম্পাদক-সম্প্রদায়কে অনেক সময়ে কর্ম্মভোগ করিতে হয়। শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের "বাস্তু সাপ" একটি ক্ষুদ্র গল্প। গল্প বটে, কিন্তু 'আষাঢ়ে'। প্রভাতের 'ছাপ' নাই। ছোট গল্পের 'জান' যাহা, তাহারই অভাব। সুতরাং রসভঙ্গ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় "বাঙ্গালীর বিবাহ-ক্ষেত্রের প্রসারতা বৃদ্ধি"র অনুকূলে অনেক যুক্তিতর্কের অবতারণা করিয়াছেন। পরেশ বাবুর অনুশীলনের ফল ও মন্তব্যের আলোচনা প্রার্থনীয়। "মোহনচাঁদ করমচাঁদ গান্ধি" একটি কবিতা। শ্রীযুক্ত দক্ষিণাপ্রসাদ বসুর রচিত। কর্ম্মবীর গান্ধি স্বদেশের জন্য অনেক সহ্য করিয়াছেন, আমরাও তাঁহার জন্য অম্লানবদনে এই ছড়াটি সহ্য করিব। দক্ষিণাবাবুর গুণানুরাগ প্রশংসনীয়; কিন্তু হৃদয়ে "এক অপূর্ব্ব বিস্ময়, সম্ভ্রম ও প্রীতির প্রবাহ ছুটিলেই" যে মানুষ 'কবি' হয় না,—মানুষের মনে কবিত্বের ভোগবতী উৎসারিত হইয়া উঠে না, সে অপরাধ দক্ষিণবাবুর নহে, বিধাতার। ইহাঁরা যদি বিধাতার উপর অনবরত পদ্য লিখিয়া হতভাগাকে জব্দ করিয়া দেন, তাহা হইলে কবিরাও বাঁচেন, আমরাও বাঁচি। "ভারত ইতিহাসের একাংশ" সুরচিত ঐতিহাসিক নিবন্ধ। উল্লেখযোগ্য;—রচনার হিসাবেও বটে, লেখকের জন্যও বটে। নাটোরের সুপ্রথিত মহারাজা শ্রীযুক্ত জগদিন্দ্রনাথ রায় ইতিহাস-চর্চ্চায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এবং বাঙ্গালা মাসিকে প্রবন্ধ লিখিতেছেন, ইহা আহ্লাদের কথা, বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিবার কথা, এবং আশার কথাও বটে। এ দেশে যাঁহাদের অন্নবস্ত্রের সংস্থান আছে, তাঁহারা প্রায় দুনিয়ার কোনও কাজেই লাগেন না।—কথাটা ঠিক হইল না।—অনেক 'অকাজে' লাগেন বটে।—তার পর, রাজা মহারাজার দল বিলাসে ভাসেন, গৌরাঙ্গ-সমাজে (বাগবাজারের নয়) চাঁদা দেন ও সেলাম বাজান, বড় জোর অধঃপাতে যান।—তাঁহাদের মধ্যে যদি কেহ ইতিহাসের দুর্গম গহ্বরে প্রবেশ করিয়া সত্য-রত্নের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হন, তাহা অপেক্ষা আনন্দের বিষয় আর কি হইতে পারে? শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায়ের "নববর্ষে পল্লীদৃশ্য" দেখিয়া তৃপ্ত হইয়াছি। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত "ভূমিকর আন্দোলনের ফলাফল" লিখিতেছেন। কিন্তু ফলাফল ত জানা আছে,—একটি সুগোল শূন্য। বীরবলের "হাল খাতা" বেশ,—টক্‌টকে 'খেরো'র বাঁধা খাতাখানির মলাট দেখিয়াই মসগুল হই নাই—ভিতরের পদার্থ আছে। লেখক ভাবিতে জানেন, ভাবাইতে পারেন। আশা করা যায়, বীরবলের মিঠেকড়া রকম চিক্কণ চাবুকের চোটে তন্দ্রামগ্ন সমাজের কূর্ম্মপৃষ্ঠে একটু দাগ পড়িবে।

কিউপিড্ ও সাইকী।

KUNTALINE PRESS.

সাহিত্য, ১৩শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা।

গীতায় ঈশ্বরবাদ।

৪। পূর্ব্বমীমাংসা ও গীতা।

পূর্ব্ব প্রবন্ধে (১) দর্শনশাস্ত্রের অবলম্বিত প্রণালী সম্বন্ধে সাধারণভাবে কয়েকটি কথা বলিয়া আমরা ন্যায় ও বৈশেষিকদর্শনের সহিত গীতার সম্বন্ধ বিচার করিয়াছি। বর্ত্তমান প্রবন্ধে পূর্ব্ব মীমাংসার সহিত গীতার সম্বন্ধ বিবেচিত হইবে।

বেদের দুই ভাগ—কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। সংহিতা ও ব্রাহ্মণ ভাগ লইয়া কর্ম্মকাণ্ড, এবং আরণ্যক ও উপনিষদ্ ভাগ লইয়া জ্ঞানকাণ্ড। কর্ম্মকাণ্ড-বেদের বিরোধভঞ্জন ও সামঞ্জস্যবিধানের জন্য মীমাংসা দর্শনের উৎপত্তি। মীমাংসা দর্শনের ভিত্তি মহর্ষি জৈমিনি প্রণীত পূর্ব্বমীমাংসা-সূত্র। ইহা দ্বাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত। পূর্ব্বমীমাংসার শবর স্বামীর কৃত প্রসিদ্ধ ভাষ্য আছে। কুমারীল ভট্ট এই ভাষ্যের উপর "তন্ত্র-বার্ত্তিক" নামে বিখ্যাত বার্ত্তিকের রচনা করিয়াছিলেন। মাধবাচার্য্যের "জৈমিনীয় ন্যায়মালাবিস্তর" গ্রন্থে মীমাংসা দর্শনের অধিকরণসমূহ বিশদভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। আপদেবের "মীমাংসা ন্যায়প্রকাশ" ও লোগাক্ষি ভাস্করের "অর্থসংগ্রহ" মীমাংসা দর্শন সম্বন্ধে সুপ্রচলিত প্রকরণ গ্রন্থ।

মীমাংসা দর্শনের মতে বেদের কর্ম্মকাণ্ডই সার্থক, জ্ঞানকাণ্ড নিরর্থক। "আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাদ্ আনর্থক্যং অতদর্থানাম্"। (মীঃ দঃ ১।২।১)। যে হেতু কর্ম্মই বেদের প্রতিপাদ্য, সেই জন্য তদ্ভিন্ন বেদে যে জ্ঞান অংশ দৃষ্ট হয়, তাহা নিরর্থক। অতএব, এ মতে উপনিষদের সমস্ত সার সত্যের উপদেশ অর্থবাদমাত্র। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম," "অয়মাত্মা ব্রহ্ম," "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি বাক্য না থাকিলেও চলিত। বেদে যে আত্মার তত্ত্বজ্ঞান উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহার উদ্দেশ্য দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব প্রতিপাদন করিয়া জীবকে অদৃষ্টফল স্বর্গাদির সাধন যাগকর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করা (২)।

মীমাংসা দর্শনের মতে বেদ নিত্য (৩), অভ্রান্ত ও অপৌরুষেয়। অর্থাৎ, বেদের

---

(১) সাহিত্য জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

(২) "শেষত্বাৎ পুরুষার্থবাদো যথাহন্যেষ্বিতি জৈমিনিঃ।—ব্রহ্মসূত্র ৩।৪।২।

(৩) বেদের নিত্যতা প্রতিপাদন উপলক্ষে মীমাংসা দর্শনে বিশেষ গবেষণার সহিত শব্দের

কেহ রচয়িতা নাই। ঋষিরা মন্ত্রদ্রষ্টা মাত্র। বেদ চিরদিনই আছে ও চিরদিনই থাকিবে। বেদের প্রামাণ্য স্বতঃসিদ্ধ, বেদের সত্যতা প্রমাণান্তরের অপেক্ষা করে না।

বেদ জীবের হিতার্থ ধর্ম্মের প্রতিপাদন করেন। ধর্ম্ম কি ? যাগাদি। "যজেত স্বর্গকামঃ—স্বর্গকামনায় যাগ করিবে," এইরূপ উপদেশ দ্বারা বেদ জীবকে প্রেরণা করেন। যাহা দৃষ্ট বিষয়, জীব নিজে তাহার উপায় উদ্ভাবন করিতে পারে, যেমন জীব ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণ জন্য অন্ন জল সংগ্রহ করিতে পারে। কিন্তু যাহা অদৃষ্ট-বিষয়, যেমন স্বর্গাদি, তাহা পাইবার উপায় সে কিরূপে আবিষ্কার করিবে ? অথচ জীব দুঃখময় সংসার ছাড়িয়া সুখময় স্থান লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল। লৌকিক উপায়ে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। সেই জন্য বেদ কৃপা করিয়া জীবকে উপদেশ দেন, "স্বর্গকামো যজেত—স্বর্গপ্রাপ্তির সাধন যজ্ঞ অনুষ্ঠান কর," তাহা হইলে নিশ্চয়ই স্বর্গলাভ হইবে। স্বর্গ সুখধাম ; সেখানে দুঃখের লেশমাত্র নাই। সেখানে চাহিলেই সুখ মিলে।

যন্ন দুঃখেন সম্ভিন্নং ন চ গ্রস্তমনন্তরম্।
অভিলাষোপনীতং চ তৎসুখং স্বঃপদাস্পদম্ ॥

"যে সুখে দুঃখের মিশ্রণ নাই, যে সুখ পরে দুঃখে পরিণত হয় না, যে সুখ ইচ্ছামাত্র উপস্থিত হয়, স্বর্গ সেই সুখের আস্পদ"। যজ্ঞের দ্বারা এই স্বর্গলাভ হয়। কারণ, যজ্ঞের ফল অপূর্ব্ব (Transcendental) ; "যজতের্জাতম্ অপূর্ব্বম্"। যজ্ঞ দ্বারা অমৃতত্ব লাভ করা যায়। "অপামঃ সোমং অমৃতা অভূমঃ—আমরা সোমপান করিয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছি"।

বেদ বলিতেছেন, "অক্ষয্যং হবৈ চাতুর্মাস্যযাজিনঃ সুকৃতং ভবতি—চাতুর্মাস্য-যাগকারীর অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয় হয়।" "সর্ব্বান্ লোকান্ জয়তি মৃত্যুং তরতি পাপ্মানং তরতি ব্রহ্মহত্যাং তরতি যো যোঽশ্বমেধেন যজতে।—অশ্বমেধ যজ্ঞের ফলে যজমান সকল লোক জয় করেন, মৃত্যুর অতীত হন, পাপ—ব্রহ্মহত্যা হইতে উত্তীর্ণ হন।" তখন তিনি বলিতে পারেন—"কিং নূনম্ অস্মান্ কৃণবদ্ অরাতিঃ—শত্রু আমাদের কি করিতে পারে ?" "কিমু ধূর্ত্তি রমৃতমর্ত্তস্য—মর্ত্ত্য মানুষ—আমি অমর হইয়াছি ; ধূর্ত্তি (জরা) আমার কি করিতে পারে !"

নিত্যত্ব ও স্ফোটবাদের প্রতিপাদন করা হইয়াছে। অন্যত্র, প্রমাণের বিচারস্থলে মীমাংসকেরা সুযুক্তির পরিচয় দিয়াছেন।

পূর্ব্বমীমাংসার মতে বেদ পঞ্চবিধ। ১। বিধি, ২। মন্ত্র, ৩। নামধেয়, ৪। নিষেধ, ও ৫। অর্থবাদ।

১। বিধি injunction। যে বেদবাক্য দ্বারা অজ্ঞাত বিষয় বিজ্ঞাপিত হয়, তাহাকে বিধি বলে ; যেমন, "স্বর্গকামো যজেত"। পূর্ব্বমীমাংসার মতে, বিধি-বাক্যই বেদের সারভাগ।

এই বিধি আবার চতুর্ব্বিধ :—উৎপত্তি বিধি, বিনিয়োগ বিধি, প্রয়োগ বিধি ও অধিকার বিধি। যে বিধি কর্ম্মস্বরূপমাত্রের বিধান করে, তাহাকে উৎপত্তিবিধি বলে ; যেমন "অগ্নিহোত্রং জুহোতি,—অগ্নিহোত্র হোম করিবে"। হোমনির্ব্বাহের পক্ষে এইমাত্র জানিলেই যথেষ্ট হইল না। কিরূপে হোম করিতে হইবে (কাহার উদ্দেশে এবং কি দ্রব্যের উপচারে) তাহা জানা আবশ্যক। সেই জন্য বিনিয়োগ বিধির উপদেশ। যেমন, "দধ্না জুহোতি—দধির দ্বারা হোম করিবে," "ইন্দ্রাগ্নী উদং হবিঃ—ইন্দ্র ও অগ্নির উদ্দেশে এই হবিঃ"। যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্য এত দূর জানি-লেও পর্য্যাপ্ত নহে। পর পর কি ক্রমে যজ্ঞাঙ্গের অনুষ্ঠান করিতে হইবে, তাহা জানা আবশ্যক। সেই জন্য প্রয়োগ বিধির উপযোগিতা। যেমন "অগ্নিহোত্রং জুহোতি যবাগূং পচতি"—এখানে অগ্নিহোত্র হোম ও যবাগূর পাক, এই উভয় ক্রিয়ার উপদেশ রহিয়াছে। প্রয়োগ বিধির সাহায্যে জানা যায় যে, কোন্ ক্রিয়াটি পূর্ব্বে ও কোন্‌টি পরে অনুষ্ঠেয়। কিন্তু ইহা জানিলেও যথেষ্ট হইল না। কারণ, কে কোন্ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে, তাহা না জানিলে যজ্ঞানুষ্ঠান সম্ভবে না। সেই জন্য অধিকার বিধির প্রয়োজন। কারণ, যে যে কর্ম্মের অধিকারী, সে ভিন্ন অপরের সে কর্ম্ম সাজে না। যেমন, "রাজা রাজসূয়েন স্বারাজ্যকামো যজেত।" ইহা দ্বারা বুঝা গেল যে, রাজা ভিন্ন অপরে রাজসূয় যজ্ঞের অধিকারী নহে।

২। মন্ত্র ; "অগ্নিমীলে পুরোহিতম্" ইত্যাদি বেদের সংহিতা অংশ প্রধা-নতঃ এই মন্ত্র দ্বারা গঠিত। মীমাংসকদিগের মতে, যজ্ঞের উদ্দিষ্ট দেবতা প্রভৃতির স্মারকরূপে মন্ত্রের উপযোগিতা।

৩। নামধেয় ; নামধেয়ের উদ্দেশ্য, বিধেয় বিষয়ের সঙ্কোচ সাধন করা। যেমন, "উদ্ভিদা যজেত পশুকামঃ ;" "চিত্রয়া যজেত পশুকামঃ ;" এখানে উদ্ভিদ ও চিত্রা শব্দ দ্বারা সাধারণ যজ্ঞবিধির সঙ্কোচ সাধন করা হইল। যজ্ঞমাত্রেই কামনাসিদ্ধির উপায় নহে, কিন্তু উদ্ভিদ অথবা চিত্রা নামক যজ্ঞ দ্বারাই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। অন্যবিধ যজ্ঞ দ্বারা হইবে না।

৪। নিষেধ; নিষেধবাক্য দ্বারা পুরুষকে নিবৃত্ত করা হয়। যেমন, "কলঞ্জং ন ভক্ষয়েৎ—কলঞ্জ ভক্ষণ করিবে না," "মা দিবা স্বাপ্সীঃ,—দিবসে নিদ্রা যাইবে না"; এই সকল বাক্য দ্বারা কলঞ্জভক্ষণ ও দিবানিদ্রার বারণ করা হইল।

৫। অর্থবাদ; যে বাক্যের দ্বারা বিধি বা নিষেধের সম্পর্কে প্রশংসা বা নিন্দা করা হয়, তাহাকে অর্থবাদ বলে। অর্থবাদ তিন প্রকার; গুণবাদ, অনুবাদ ও ভূতার্থবাদ। গুণবাদের উদাহরণ,—"আদিত্যো যূপঃ"; সূর্য্য কখন যূপ (যজ্ঞকাষ্ঠ) হইতে পারে না। এ বাক্যের ইহাই বক্তব্য যে, যূপ সূর্য্যের মত উজ্জ্বল। অনুবাদ—যেমন, "অগ্নির্হিমস্য ভেষজম্,—অগ্নি হিমের ঔষধ।" এ কথা আমরা পূর্ব্বেই জানিতাম, অতএব ইহা বেদে না বলিলেও চলিত; সেই জন্য ইহা অর্থবাদ। ভূতার্থবাদ—যেমন, "ইন্দ্রো বৃত্রায় বজ্রম্ উদযচ্ছৎ—ইন্দ্র বৃত্রের প্রতি বজ্র উত্তোলন করিয়াছেন।" এইরূপে মীমাংসকেরা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, সমস্ত বেদই হয় সাক্ষাৎ, না হয় পরম্পরাভাবে, যজ্ঞরূপ ধর্ম্মেরই প্রতিপাদন করিতেছেন।

ইন্দ্রাদি দেবতার উদ্দেশে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা হয় বটে, কিন্তু যজ্ঞই মুখ্য। দেবতা গৌণমাত্র—প্রযোজক নহেন। (৪) কারণ, মীমাংসা-মতে দেবতার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। দেবতা মন্ত্রাত্মক। মন্ত্র নির্দ্দিষ্ট ক্রমে গ্রথিত শব্দসমূহ। সে ক্রমের বা শব্দের ব্যত্যয় ঘটিলে মন্ত্র নিষ্ফল হয়। "অগ্নিমীলে পুরোহিতম্"—এই মন্ত্রে যদি অগ্নি শব্দের স্থলে বহ্নি শব্দের প্রয়োগ করা যায়, অথবা "ঈলে অগ্নিং পুরোহিতম্"—এইরূপে নির্দ্দিষ্ট ক্রমের ব্যত্যয় করা যায়, তবে সে মন্ত্রে কিছুই ফল দর্শাইবে না।

মীমাংসকেরা নিরীশ্বরবাদী। তাঁহারা বেদকে নিত্য ও অভ্রান্ত বলেন বটে, কিন্তু বেদ যে ঈশ্বরবাক্য, তাহা স্বীকার করেন না। বস্তুতঃ, মীমাংসা দর্শনের কোথাও ঈশ্বরের কোনও প্রসঙ্গ নাই। সেই জন্য 'বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণী'-গ্রন্থকার, মীমাংসকদিগের পরিচয়স্থলে বলিয়াছেন, "তাহারা ঈশ্বর মানে না, জগতের যে কেহ স্রষ্টা, পালয়িতা, বা সংহর্ত্তা আছেন, এ কথা স্বীকার করে না।

---

(৪) দেবতা বা প্রযোজয়েৎ অতিথিবৎ ভোজনস্য তদর্থত্বাৎ [মীমাংসা দর্শন ৯।১।৬]

অপিবা শব্দ পূর্ব্বত্বাৎ যজ্ঞকর্ম্মঃ প্রধানং স্যাৎ গুণত্বে দেবতা শ্রুতিঃ [ঐ ৯।১।৯]

তাহাদের মতে জীব নিজ কর্ম্মানুসারে ফলভোগ করে, তাহাতে ঈশ্বরের কোন সম্পর্ক নাই" (৫)।

জ্ঞানবাদীরা কর্ম্মকাণ্ডের বিরোধী। তাঁহারা বলেন, কর্ম্মের দ্বারা শ্রেয়োলাভ হয় না। "ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ত্যাগেনৈকেন অমৃতত্বমানশুঃ—অমরত্ব-লাভের উপায় কর্ম্ম নয়, সন্তান নয়, একমাত্র ত্যাগের দ্বারাই অমর হওয়া যায়।" তাঁহারা আরও বলেন যে, কর্ম্মের ফল চিরস্থায়ী নহে; ভোগের দ্বারা কর্ম্মক্ষয় হইলে কর্ম্মীর পতন অবশ্যম্ভাবী। অতএব, যাহারা যাগাদি কর্ম্মানুষ্ঠানকেই শ্রেয়োলাভের উপায় মনে করে, তাহারা মোহান্ধ।

প্লবাহ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা অষ্টাদশোক্তমবরম্ যেষু কর্ম্ম। এতচ্ছ্রেয়ো যে অভিনন্দন্তি মূঢ়া জরামৃত্যুং তে পুনরেবাপি যন্তি॥—মুণ্ডক, ১।২।৭।

অবিদ্যায়াং বহুধা বর্ত্তমানা বয়ং কৃতার্থা ইত্যভিমন্যন্তি বালাঃ। যৎ কর্ম্মিণো ন প্রবেদয়ন্তি রাগাত্তেনাতুরাঃ ক্ষীণলোকাশ্চ্যবন্তে॥—মুণ্ডক, ১।২।৯।

"এই যে অষ্টাদশ ব্যক্তি নিষ্পাদ্য যজ্ঞরূপ কর্ম্ম, ইহা অদৃঢ় (ভঙ্গুর) ভেলা; যে মূঢ় ব্যক্তিরা শ্রেয়োবিবেচনায় ইহার প্রশংসা করে, তাহারা পুনর্ব্বার জরা-মৃত্যুগ্রস্ত হয়"।

"নানারূপে অজ্ঞানে আচ্ছন্ন অজ্ঞ ব্যক্তি, কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে করে; কিন্তু ফলাকাঙ্ক্ষানিবন্ধন তত্ত্বজ্ঞানলাভে অসমর্থ হইয়া কর্ম্মক্ষয় হইবার পর তাহাকে দুঃখার্ত্ত হইয়া স্বর্গচ্যুত হইতে হয়"।

তবেই বুঝা গেল, কর্ম্মফল স্থায়ী নহে; কর্ম্মীর পতন আছে। কর্ম্ম দ্বারা যে অমরত্বলাভের কথা বলা হয়, সে অমরত্ব আপেক্ষিকমাত্র, চিরস্থায়ী নহে। সে অমরত্বের পরমায়ু প্রলয় পর্য্যন্ত।

আভূতসংপ্লবং স্থানং অমৃতত্বং হি ভাষ্যতে।—বিষ্ণুপুরাণ।

"প্রলয় পর্য্যন্ত অবস্থানকে অমরত্ব বলে।"

কর্ম্মের ফল কেবল যে ভঙ্গুর, তাহা নহে। ইহার আবার তারতম্য আছে।

---

(৫) মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন নিজ সম্পাদিত মীমাংসাদর্শনের ভূমিকায় লিখিয়াছেন,—"But though dealing so largely with the sacred scriptures of the Hindus and thus commanding a large share of their respect, oddly enough, it propounds a godless system of religion. The main drift of its arguments is to shew that if bliss be the fruit of good works, the interposition of a diety is simply superfluous."

কর্ম্মীরা কর্ম্মের উৎকর্ষাপকর্ষঅনুসারে উচ্চতর নিম্নতর লোকের অধিকারী হয়। (৬) অপরের উৎকর্ষ দেখিলে স্বর্গবাসীরও দুঃখ অনুভব হয়। (৭)

কর্ম্মের আর একটি বিষম দোষ এই যে, কর্ম্ম বন্ধের কারণ। "কর্ম্মনা বধ্যতে জন্তু র্বিদ্যয়া চ প্রমুচ্যতে—জীব কর্ম্ম দ্বারা বদ্ধ হয়, আর জ্ঞান দ্বারা মুক্ত হয়।" পুণ্য হউক, পাপ হউক, জীব যে কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করিবে, তাহাকে অবশ্যই তাহার ফলভোগ করিতে হইবে।

অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃত কর্ম্ম শুভাশুভম্।

সুকৃত হউক, দুষ্কৃত হউক, ভোগ ভিন্ন কোন কর্ম্মেরই ক্ষয় হয় না।

নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটীশতৈরপি।

ভোগ না হইলে, শতকোটী কল্পেও কর্ম্মের ক্ষয় হয় না। আর যত দিন অল্পমাত্রায়ও কর্ম্ম অবশিষ্ট থাকে, তত দিন জীবকে কর্ম্মভোগের জন্য পুনঃপুনঃ সংসারে আসিতে হয়।

পুণ্যেন পুণ্যং পাপেন পাপং উভয়থা মনুষ্য লোকং।—প্রশ্নোপনিষদ্।

"জীবকে পুণ্যের ফলভোগের জন্য পুণ্যলোকে, পাপের ফলভোগের জন্য পাপলোকে, এবং পাপপুণ্য উভয়ের ফলভোগের জন্য মনুষ্যলোকে গমন করিতে হয়।" অতএব, জ্ঞানবাদীর মতে, যে কর্ম্ম এত দোষের আকর, সেই কর্ম্ম সন্ন্যাস করাই উচিত। অর্থাৎ, সর্ব্ববিধ কর্ম্মত্যাগই প্রকৃষ্ট পন্থা।

এ বিষয়ে গীতার উপদেশ কি? গীতাও কর্ম্মাসক্তির নিন্দা করিয়াছেন। কর্ম্মকাণ্ড-বেদকে লক্ষ্য করিয়া ভগবান্ অর্জ্জুনকে উপদেশ দিয়াছেন,—

ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদাঃ নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।

"হে অর্জ্জুন! বেদের বিষয় সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই তিন গুণ লইয়া; তুমি ত্রিগুণের অতীত হও।"

আর কর্ম্মবাদী মীমাংসকদিগকে ইঙ্গিত করিয়া গীতা নিন্দাবাক্যে বলিয়াছেন,—

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি বাদিনঃ॥
কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্ম্মফলপ্রদাম্।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি॥

---

(৬) বাচস্পতি মিশ্র লিখিয়াছেন,—"জ্যোতিষ্টোমাদয়ঃ স্বর্গমাত্রসাধনং বাজপেয়াদয়ঃ স্বারাজ্যস্যেত্যতিশয়যুক্তত্বম্ ইতি।"

(৭) অতিশয়ো বিশেষ স্তেন যুক্তঃ বিশেষগুণদর্শনাদ্ ইতরস্য দুঃখং স্যাৎ।

—সাংখ্যকারিকা, (২) গৌড়পাদভাষ্য।

ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে॥—গীতা, ২।৪২।৪৪।

"বেদের ফলবাদে আসক্ত হইয়া যাহারা ঐ পুষ্পিত বাক্যের প্রশংসা করিয়া বলে 'ইহা ভিন্ন আর কিছু নাই', তাহারা অজ্ঞানী।"

"যাহারা কামাত্মা, স্বর্গপরায়ণ, ভোগ ও ঐশ্বর্য্য সাধক ক্রিয়াবহুল কর্ম্মকাণ্ডে অনুরক্ত (যাহার ফলে সংসারে আসিতে হয়), ফলাসক্ত সেই সকল ব্যক্তির বুদ্ধি কখনও সমাধিতে একাগ্র হয় না।"

গীতাও স্পষ্ট ভাষায় কর্ম্মীর পতন প্রতিপাদন করিয়াছেন।

ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা যজ্ঞৈরিষ্ট্বাস্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।
তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোকমশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্॥
তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না গতাগতং কামকামা লভন্তে॥—গীতা, ৯।২০।২১।

"কর্ম্মকাণ্ডী, সোমপায়ী যাজ্ঞিকেরা পাপহীন হইয়া যজ্ঞের দ্বারা স্বর্গপ্রাপ্তি কামনা করে। তাহারা তাহার ফলে পুণ্য ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গে দিব্য দেবভোগ ভোগ করে।"

"সেই বিশাল স্বর্গলোক ভোগ করিবার পর তাহারা পুণ্যক্ষয় হইলে আবার মর্ত্ত্যলোকে ফিরিয়া আসে। এইরূপে সকাম সাধক কর্ম্মকাণ্ডের অনুসরণ করিয়া পুনঃপুনঃ গতাগতি করিতে থাকে।"

কর্ম্ম যে বন্ধের কারণ, গীতা সে কথা বারবার বলিয়াছেন,—

যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মনোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।—গীতা, ৩।৯।

"ঈশ্বরোদ্দেশে যে কর্ম্ম কৃত হয়, তদ্ভিন্ন অন্য কর্ম্ম বন্ধের কারণ।"

অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে।—গীতা, ৫।১২।

"সকাম কর্ম্মী ফলে আসক্তিবশতঃ বন্ধনে পড়িয়া যায়।"

গীতা আরও বলিয়াছেন যে, দেবতার উদ্দেশে যে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা হয়, তাহার ফল শ্রেয়স্কর কহে। কারণ, দেবতাকে ভজিলে দেবতাই মিলে, ভগবানকে পাওয়া যায় না। ভগবানই যখন সাধকের গম্য স্থান, তখন তাঁহাকে ছাড়িয়া দেবতার ভজনা করিলে বিপথে যাওয়া হয়।

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্॥—গীতা, ৯।২৫।

"যাহারা দেবতার ভজনা করে, তাহারা দেবতাকে পায়, যাহারা পিতৃদিগের ভজনা করে, তাহারা পিতৃদিগকে পায় ; যাহারা ভূতগণের ভজনা করে, তাহারা

ভূতগণকে পায় ; কিন্তু যাহারা আমাকে (ভগবান্‌কে) ভজনা করে, তাহারা আমাকেই (ভগবান্‌কেই) পায়।"

দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি।—গীতা।

"দেবতার আরাধনা করিলে দেবতাকে পাওয়া যায় ; কিন্তু আমার যাহারা ভক্ত, তাহারা আমাকেই পায়।"

গীতা আরও বলিয়াছেন,—

"দেবতার আরাধনা করিলে দেবতাকে পাওয়া যায়, কিন্তু আমার যাহারা ভক্ত, তাহারা আমাকেই পায়—।"

যেপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়াঽন্বিতাঃ।
তেপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্ ॥—গীতা, ৯।২৩।

[illegible] সকল ভক্ত শ্রদ্ধার সহিত অন্য দেবতার উপাসনা করে, তাহারা আমারই (ভগবানেরই) উপাসনা করে, কিন্তু বিধিপূর্ব্বক নহে।"

বলা বাহুল্য যে, দেবতাকে পাওয়াতে এবং ভগবানকে পাওয়াতে বিস্তর প্রভেদ। দেবতাকে পাওয়ার অর্থ এই যে, যে বিশেষ দেবতার উপাসনা করা যায়, তাঁহার সালোক্য এবং কখন কখন সাযুজ্য লাভ হয়। অর্থাৎ, যদি কোন সাধক ইন্দ্রের উপাসনা করেন, তবে তাঁহার ইন্দ্রলোক লাভ হইবে—হয় ত বা তিনি ইন্দ্রের সত্তায় নিজের সত্তা নিমজ্জিত করিবেন—ইহার অধিক নহে। শাস্ত্রকারেরা বলেন যে, দেবতাদিগেরও পতন আছে।

বহূনীন্দ্রসহস্রাণি দেবানাং চ যুগে যুগে।
কালেন সমতীতানি কালো হি দুরতিক্রমঃ ॥

"যুগে যুগে বহু ইন্দ্র বহু দেবতার কালবশে ক্ষয় হইয়াছে। কালকে কেহই অতিক্রম করিতে পারে না।"

অতএব, দেবতার সালোক্য বা সাযুজ্য লাভ করিয়া বড় একটা ফল নাই। কারণ, দেবতার পতনের সঙ্গে সেই দেব-উপাসকেরও পতন ঘটে। তখন তাহাকে আবার সংসারে আসিতে হয়। গীতাও এই কথাই বলিয়াছেন।

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে ॥—গীতা, ৮।১৬।
মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ ॥—গীতা, ৮।১৫।

"হে অর্জ্জুন! ব্রহ্মলোক হইতেও জীবের পতন আছে, কিন্তু আমাকে পাইলে আর পুনর্জ্জন্ম হয় না।"

"মহাত্মগণ আমাকে লাভ করিলে পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া, দুঃখের আবাস ক্ষণভঙ্গুর সংসারে আসিতে বাধ্য হয়েন না।"

তবে কি গীতা যজ্ঞানুষ্ঠানের বিরোধী? গীতা সকাম যজ্ঞের বিরোধী বটেন, কিন্তু যজ্ঞমাত্রেরই বিরোধী নহেন। বরং জীবকে যজ্ঞে প্রবৃত্তি দিবার জন্য যজ্ঞের প্রশংসাবাদ করিয়াছেন।

যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্।
নায়ং লোকোঽস্ত্যযজ্ঞস্য কুতোঽন্যঃ কুরুসত্তম॥—গীতা, ৪।৩১।

"যে যজ্ঞ করে না, তাহার ইহলোক নাই—পরলোক ত নাই-ই। আর যাহারা যজ্ঞের শেষ ভোজন করে, তাহারা সনাতন ব্রহ্ম লাভ করে।"

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ।
তে ত্বঘং ভুঞ্জতে পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ॥—গীতা, ৩।১৩।

"যাহারা নিজের জন্য পাক করে, তাহারা পাপী,—পাপ ভোগ করে; আর যাহারা যজ্ঞের শেষ ভোজন করে, তাহারা সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়।"

এ সম্বন্ধে গীতার বক্তব্য এই যে, স্বর্গাদিলাভের জন্য সকাম যজ্ঞানুষ্ঠান নিন্দার্হ। কিন্তু দেবতাদিগের পোষণের জন্য এবং সংসারচক্র প্রবর্ত্তনের জন্য যজ্ঞের অনুষ্ঠান জীবের অবশ্য কর্ত্তব্য।

সহযজ্ঞৈঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
...সবিষ্যাধ্বম্ এষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্॥
...বান্ ভাবয় তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তবঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ॥
ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।
তৈর্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুংক্তে স্তেন এব সঃ॥—গীতা, ৩।১০।১২।

"পূর্ব্বকালে প্রজাপতি যখন জীবসৃষ্টি করেন, তখনই যজ্ঞের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এবং জীবদিগকে এই উপদেশ দিয়াছিলেন যে, এই যজ্ঞ দ্বারাই তোমাদের প্রজাবৃদ্ধি হইবে, এই যজ্ঞই তোমাদের কামধেনুস্বরূপ হইবে। যজ্ঞের দ্বারা তোমরা দেবতাদিগকে পোষণ কর; দেবতারাও তোমাদিগের প্রতিপোষণ করিবেন। এইরূপে পরস্পর পরস্পরের পোষণ করিয়া পরম শ্রেয়ঃ লাভ কর। দেবতারা যজ্ঞের দ্বারা অর্চ্চিত হইয়া তোমাদের অভিলষিত ভোগ দান করিবেন। তাঁহাদের দত্ত ভোগ তাঁহাদের উদ্দেশে অর্পণ না করিয়া যে সম্ভোগ করে, সে চোরের কার্য্য করে।"

এ কথার সার মর্ম্ম এই যে, দেবলোকে ও নরলোকে নিয়ত আদান প্রদান

চলিতেছে। দেবতারা নানা প্রকারে—বর্ষণ করিয়া, উত্তাপ দিয়া, জল, স্থল, অন্তরীক্ষে অধিষ্ঠিত থাকিয়া, জগতের হিতসাধন করিতেছেন। মানুষেরাও তাঁহাদের কৃত এই উপকারের কতক প্রত্যুপকার করিতে পারে। সেরূপ করিবার উপায় যজ্ঞানুষ্ঠান। কারণ, যজ্ঞের ফলে যে অপূর্ব্ব উৎপন্ন হয়, তদ্দ্বারা দেবলোকের পুষ্টিসাধন করা যায়। অতএব, যাহাদের চিত্তে দেবতাদিগের প্রতি কৃতজ্ঞতার অনুভব আছে, তাহাদের উচিত যে, যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া দেবঋণ যথাসাধ্য পরিশোধ করা।

> অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জ্জন্যাদন্নসংভবঃ।
> যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জন্যো যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ॥—গীতা, ৩।১৪।
> এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং নানুবর্ত্তয়তীহ যঃ।
> অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি॥—গীতা, ৩।১৬।

"প্রাণী সকল অন্ন হইতে উৎপন্ন, অন্ন জন্মে সুবৃষ্টির ফলে, সুবৃষ্টি হয় যজ্ঞের ফলে, যজ্ঞ কর্ম্মসাধ্য।"

"এইরূপে প্রবর্ত্তিত সংসারচক্র, যাহারা না অনুবর্ত্তন করে, ইন্দ্রিয়সুখপরা তাহারা বৃথাই পাপময় জীবনভার বহন করিতেছে।"

অতএব, গীতার মতে সুবৃষ্টি প্রভৃতি প্রাকৃতিক ব্যাপার সুশৃঙ্খলে নিষ্পন্ন করিবার উপায় যজ্ঞানুষ্ঠান। আর সকলেরই উচিত, যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া সেই বিষয় নির্ব্বিঘ্ন নির্ব্বাহ হইবার পক্ষে সহায়তা করা। [illegible]দেশ এই যে, সকলেই যেন এই উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ করিবার জন্য [illegible]জ্ঞানুষ্ঠান করে।

এত দূর অবধি কর্ম্মবাদ সম্বন্ধে গীতার উপদেশ আলোচিত হইল। পরবর্ত্তী প্রবন্ধে গীতার প্রবর্ত্তিত অপূর্ব্ব কর্ম্মযোগের যথাসম্ভব আলোচনা করিব।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

শিবালিকে হাতী ধরা।

জলযোগ সমাপ্ত হইতে না হইতেই নান্নে খাঁ সত্বর প্রস্তুত হইতে বলিয়া পাঠাইলেন। আমরা হস্তী আরোহণ করিলাম। কিন্তু এই স্থান হইতে ছাত্রদিগকে পদব্রজে চলিতে হইল। সর্ব্বাগ্রে যমুনাপ্রসাদের স্কন্ধে নান্নে খাঁ চলিলেন; তৎ-

পশ্চাতে পদব্রজে ছাত্রগণ, সর্ব্বপশ্চাতে অবশিষ্ট হস্তিশ্রেণী। কিয়দ্দূর গিয়া কাপ্তেন সাহেব ছাত্রদিগকে পর্ব্বতের উপরে চড়িয়া নিঃশব্দে লুক্কায়িত থাকিতে আদেশ করিলেন। তাহারা প্রস্থান করিল বটে, কিন্তু ঠিক্ নিঃশব্দে লুক্কায়িত হইতে পারিল কি না সন্দেহ। এখন হইতে হস্তিশ্রেণীর বহু অগ্রে অতি সতর্কিতভাবে নান্নে খাঁ স্বীয় হস্তী চালাইতে লাগিলেন, আমরা তাঁহার ইঙ্গিতানুসারে কখন মন্থরগতিতে, কখন দ্রুতবেগে, ও সর্ব্বদা যথাসাধ্য নিঃশব্দে অনুগমন করিতে লাগিলাম। এই ভাবে কিছু দূর যাইয়া দেখি, নান্নে খাঁ ফিরিয়া আসিতেছেন, তাঁহার বদনমণ্ডল বিষাদকালিমালিপ্ত, উজ্জ্বল নেত্রযুগল ক্রোধাগ্নি উদ্গিরণ করিতেছে। ব্যাপার কি? হা অদৃষ্ট! শিকার পলাইয়াছে! হাতীগুলি কোনওরূপে সাড়া পাইয়া পূর্ব্বাভিমুখে চম্পট দিয়াছে। বেলা তখন একটা। শীতকালের বেলায় অবসান হইতে আর বড় বিলম্ব নাই। আর কি আজ হাতী ধরা হয়?

আফলোদয়কর্ম্মা কাপ্তেন সাহেব মুহূর্ত্তমধ্যে নূতন মৎলব আঁটিলেন। ছাত্রদিগকে নামিয়া আসিতে ইঙ্গিত [illegible] হইল। সকলে সমবেত হইলে, সম্ভবতঃ তাহাদেরই অনবধানতায় সমস্ত আয়োজন বিফল হইতে চলিল, ইহা বুঝাইয়া, ভবিষ্যতের জন্য বিশেষ সতর্ক হইতে বলিয়া দেওয়া হইল। আমাদিগকে এখন ফিরিয়া যাইতে হইবে; কারণ, যে পথে বন্যহস্তীরা পলাইয়াছে, আমাদের পক্ষে সে দুর্গম পথে যাওয়া একে ত নিতান্ত অসম্ভব, দ্বিতীয়তঃ নিতান্তই নিষ্ফল; কেন না, উপর হইতে পশ্চাদ্ধাবন করিয়া হাতী ধরা অসাধ্য ব্যাপার। কাজেই আমরা গাড়াওয়ালীর বেণীবন্ধে যেখানে জলযোগ করিয়াছিলাম, তথায় ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় চিলাওয়ালী বহিয়া উজান চলিতে লাগিলাম। এখন সকলে যথার্থই নিঃশব্দ। অসাফল্যের আশঙ্কায় সকলেই বাক্যব্যয়ে বিমুখ। এক মাইল আন্দাজ উজান চলিয়া বাম দিকে আর একটি সোতের মুখ দেখিতে পাওয়া গেল। ইহার নাম পাটদোয়ারী সোত। হাতীরা গাড়াওয়ালীর খোল হইতে পর্ব্বত উল্লঙ্ঘন করিয়া এই পাটদোয়ারীর খোলে চলিয়া আসিয়াছে।

চলিতে চলিতে বেলা আড়াইটার সময় যে স্থানে পঁহুছিলাম, সেখানে পাটদোয়ারী সোত দুইটি শাখাস্রোতে বিভক্ত হইয়াছে। উভয় শাখার ব্যবধানভূমিতে একটি ত্রিভুজাকার পাহাড় অবস্থিত। ঐ ত্রিভুজের উত্তর সীমায় শিবালিকের শিখরনির্দ্দেশক একটি উচ্চ cliff অর্থাৎ লম্ববৎ পর্ব্বতপার্শ্ব, পূর্ব্বদক্ষিণ ও দক্ষিণপশ্চিমে পাটদোয়ারীর উক্ত শাখাদ্বয়, উপরে অনতিনিবিড় বনসমাবেশ। নান্নে খাঁ ইঙ্গিতে জানাইলেন, পলায়নপর হাতীগুলি ঐ ত্রিভুজের

কোনও স্থানে লুক্কায়িত আছে। পাটদোয়ারীর বামে ও দক্ষিণে দুইটি উচ্চ পর্ব্বত, পূর্ব্ব দিকের পর্ব্বতটি সমধিক উচ্চ ও দুরারোহ। এইটির উপরে উঠিয়া নিরাপদ স্থানে লুক্কায়িত হইবার নিমিত্ত কাপ্তেন সাহেব আমাদিগকে ১৫ মিনিট সময় দিলেন। আমরা অপ্রত্যাশিত ক্ষিপ্রতা সহকারে গুল্মাদির অন্তরালে নিজ নিজ স্থান অধিকার করিয়া লইলাম। বেলা তখন ২টা ১৫ মিনিট। দেখিলাম, ইত্যবসরে খেদার হাতীগুলি পাটদোয়ারীর দুই শাখায় পরস্পর কুড়ি পঁচিশ হাত দূরে দূরে দাঁড়াইয়া ত্রিভুজাকৃতি পাহাড়টিকে প্রায় ঘেরিয়া ফেলিয়াছে। বন্যহস্তিগণ যদি পলাইতে চায়, তবে তাহাদিগকে এই শিক্ষিত হস্তিব্যূহ ভেদ করিয়া পলাইতে হইবে। কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি। উত্তর দিকে প্রাচীরবৎ অনধি-গম্য cliff বিদ্যমান।

মুহূর্ত্তমধ্যে চারি দিকের উচ্চ পর্ব্বত হইতে একেবারে শতাধিক বন্দুকের আওয়াজ হইল। এতক্ষণ বন্দুকধারীরা যে কোথায় লুক্কায়িত ছিল, আমরা কেহ দেখিতে পাই নাই। বাস্তবিক উহাদের কথা এক রকম ভুলিয়াই গিয়াছিলাম, সুতরাং এই অপ্রত্যাশিত ভীমশব্দে সকলেই চমকিত হইলাম। তখন ত্রিভুজাকার পাহাড়ের দিকে চাহিয়া দেখি, কয়েকটি ধূসরবর্ণ পিণ্ডাকার পদার্থ সন্নিহিত বনখণ্ডকে লণ্ডভণ্ড করিয়া ছুটাছুটি করিতেছে। দূরবীক্ষণসাহায্যে দেখিলাম, ঐ ধূসরবর্ণ পদার্থগুলিই বন্যহস্তী। উহারা গঙ্গাতীরত্যাগ অবধি অবগাহনসুখে বঞ্চিত থাকায় কয়েক সপ্তাহকাল গায়ের মাটী ধৌত হয় নাই—এই জন্যই অমন ধূসরবর্ণ দেখাইতেছিল—এই কারণে ইতঃপূর্ব্বে আমরা তাহাদিগকে ঠাহর করিতে পারি নাই। অসাধারণ ক্ষিপ্রতাসহকারে কতকগুলি খেদার হাতী পাহাড়ে উঠিয়া উহাদিগকে বেষ্টন করিয়া ফেলিল, এবং অতি সুকৌশলে উহাদের এক একটিকে যূথভ্রষ্ট করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। বাস্তবিক, খেদা ব্যাপারে প্রধান কৌশ-লই এই যে, বন্য হস্তীর সম্মুখীন না হইয়া পশ্চাৎ বা পার্শ্ব হইতে তাড়না করিতে হয়। পালিত হস্তীকে বন্যভ্রাতার সহিত সম্মুখযুদ্ধে প্রবৃত্ত করাইলে, প্রথমোক্তের প্রাণরক্ষা অসাধ্য হইয়া উঠে।

একটা ভীষণ গজকচ্ছপ ব্যাপার আরব্ধ হইল। কোনও একটি বন্যহস্তী যূথচ্যুত হইবামাত্র কতকগুলি খেদার হাতী তাহাকে পশ্চাৎ হইতে ধাক্কা দিতে দিতে সোতের গর্ভে আনিয়া ফেলে। তথায় তরুলতা গুল্মাদি না থাকায় কাজের বেশী সুবিধা হয়। তার পর হাতীটিকে আগে করিয়া সকলের তাহার পশ্চাতে বা পাশাপাশি ভাবে সবেগে প্রধাবন। যাই কোনও খেদার হাতী একটু কাছে

ঘেঁসিতে পায়, অমনই তাহার মাহুত পূর্ব্ববর্ণিত সেই কাছিগাছটি উঁচা করিয়া ধরে—মুগরীওয়ালা পশ্চাৎ হইতে এগিয়ে দেয়। ঐ কাছির শেষ প্রান্তে ফাঁস লাগান থাকে। ফাঁসটি বন্যহস্তীর গলায় পরাইয়া দেওয়াই ইহাদের উদ্দেশ্য। ভয়বিহ্বল বন্যহস্তী প্রায় শুণ্ড উত্তোলন করে না। যদি কখনও বৃংহিতনিষ্কাশনার্থ সেরূপ করে, তবে সুচতুর মাহুত সে সুযোগ ছাড়ে না। কারণ, শুণ্ড বেষ্টন করিয়া ফাঁস পরান অনেক সহজ। নতুবা ফাঁসের আয়তন বড় করিয়া লইয়া সুযোগ বুঝিয়া মস্তক ও শুণ্ডের উপর তাকিয়া ফেলিতে হয়। কাছি যেমন শুণ্ডস্পর্শ করে, নির্ব্বোধ হাতী অমনই শুঁড় তুলিয়া ধরে, তাহাতে কাছি গলায় আসিয়া পড়ে। তখনই ভীষণ বেগে ছুটিতে আরম্ভ করে। খেদার হাতী দৌড়িয়া না পারিলে বুনো হাতীর গলায় ফাঁস কসিয়া লাগায় তাহার প্রাণবিয়োগ হইতে পারে, অথবা শেষোক্ত অধিক বলবান্ হইলে প্রাগুক্তকে হিঁচড়াইয়া টানিয়া লইয়া মারিয়া ফেলিতে পারে। সুতরাং মুগরীওয়ালা সজোরে নিজ হস্তীর পুচ্ছমূলে সেই পেরেক-লাগান গদারূপী মুগরী মারিতে থাকে, মাহুতও অঙ্কুশের নিরঙ্কুশ সদ্ (অসদ্!) ব্যবহার করিতে থাকে—দুই দিক হইতে রক্তগঙ্গা প্রবাহিত হয়,—কিন্তু যেমন করিয়াই হউক, কাছি ঢিলা রাখাই চাই। উহারই উপর তন্মুহূর্ত্তে দুইটি হাতী ও দুইটি মানুষের প্রাণ নির্ভর করে।

কিন্তু স্মরণ আছে ত?—একটি বুনো হাতীর পশ্চাতে অনেকগুলি পালিত হাতী ছুটিতে থাকে। একটিতে যখন ফাঁস পরায়, আরগুলি ততক্ষণ নিশ্চিন্ত থাকে না। যদি বাম দিকের কোনও হাতী ফাঁস পরাইয়া থাকে, তবে দক্ষিণ দিক হইতে আর একটি হাতী—যত শীঘ্র সম্ভব—কখন কখন যুগপৎ—আর একটি ফাঁস পরাইয়া দেয়। বাকি হাতীগুলি ততক্ষণ প্রাণপণে ইহাই দেখিতে থাকে যে, বন্দী ফিরিয়া দাঁড়াইতে না পারে, অর্থাৎ সকলেই তাহাকে তাড়াইয়া লইয়া যাইতে থাকে। দুইটি ফাঁস লাগিলে, আর বড় আশঙ্কা থাকে না। তখন দুই দিক হইতে দুইগাছি কাছির অল্প অল্প আকর্ষণে বন্যহস্তীর বেগ মন্দীভূত হইয়া পড়ে। সেই সুযোগে অপর হাতীগুলি ক্রমে উহার গা ঘেঁসিয়া চলিতে থাকে, এবং ইঙ্গিতমাত্রে সকলে উহার দিকে মাথা করিয়া উহাকে সজোরে চাপিয়া ধরে। আর কোথায় যাবে? তখন বেচারীর তিলার্দ্ধ নড়িবার শক্তি থাকে না, যাই একটু নড়িতে চেষ্টা করে, অমনই কোনও কোনও জ্ঞাতিপুঙ্গবের সুদারুণ দন্তাঘাত তাহার নিঃসহায়ত্ব-স্মরণ করাইয়া দেয়। উহারা তখন মনে করিলে অভাগাকে শূন্যে উত্তোলন করিয়া রাখিতে পারে। এমনই সময় কোনও এক

নির্ভীক মুগরীওয়ালা লাফ দিয়া নীচে নামিয়া বন্দীর পেটের নীচে বসিয়া সুদৃঢ় রজ্জু দ্বারা তাহার পশ্চাতের পদদ্বয় দৃঢ় করিয়া ছাঁদিয়া দেয়। বস্। এখন হইতে যে কোনও দুইটি হাতী গললগ্ন দুইগাছি কাছির সাহায্যে উহাকে অক্লেশে যথেচ্ছ লইয়া যাইতে পারে।

এই প্রণালীতে সর্ব্বাগ্রে আনুমানিক একবৎসরবয়স্ক একটা 'বক্না' ধরা হইল। গেঁদকলি নামক হস্তিনীর পৃষ্ঠ হইতে মাহুত আলান খাঁ ইহার গলায় প্রথমে ফাঁস পরায়। বয়সে সর্ব্বকনিষ্ঠ ও আকারে ক্ষুদ্রতম হইলেও লম্ফ ঝম্প ও গর্জ্জনে এই বাচ্চাটি অপর সকলকে পরাস্ত করিয়াছিল—সে নিতান্ত বদ্-মেজাজ। ইহার পরই বিনায়ক-প্রসাদ নামক হস্তীর মাহুত সৈতী কর্ত্তৃক দলের বৃহত্তম হস্তিনী ধৃত হইল। বিনায়কপ্রসাদ খুব বড় হাতী নয়; তেমন যে মোটা সোটা, তাও নয়; দন্তও তাহার মোটে একটি। এই একদন্ত মহাপ্রভু কিন্তু এ পর্য্যন্ত অনেক হাতী ধরিয়াছেন, বলরামপুরের খেদার মধ্যে আর কোনও হাতীই এ পর্য্যন্ত অত ধরিতে পারে নাই। এই হস্তিনী ঐ বাচ্চাটির জননী বলিয়া অনুমিত হইল; কারণ, ইহার পরে আর যে দুইটি হস্তিনী ধৃত হইয়াছিল, তাহাদের বয়স ১২।১৪ বৎসরের অধিক নয়, সুতরাং তাহাদের নিতান্ত বালিকা বলিলেও হয়। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ধৃত হইবার পর ইহারা কখনই পূর্ব্বসম্পর্ক স্বীকার করে না। ফলতঃ, বাচ্চাটিকে নিকটে দেখিলেই তাহার ডাকিনী-মা হয় পদাঘাত করে, নতুবা যা-কিছু সম্মুখে পায়, শুণ্ড দ্বারা নিক্ষেপ করিয়া মারে; কিছু না পারে ত ক্রোধকম্পিত ভীমনিনাদে সকলকে ত্রাসিত করে; সুতরাং ইহাদিগকে দূরে দূরে রাখিতে হইয়াছিল।

এইরূপে ক্রমান্বয়ে চারিটি হস্তিনী ও দুইটি হস্তী ধৃত হইলে দেখা গেল যে, যূথপতির সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। যে দুইটি পুংহস্তী ধৃত হইয়াছে, তাহা-দের বয়স ও আকৃতি তাদৃশ সম্মানার্হ পদের উপযোগী নয়। পক্ষান্তরে, সাতটি হাতীর মধ্যে ছয়টি মাত্র পাওয়া গিয়াছে। যূথপতি ইত্যবসরে একেবারে উত্ত-রাভিমুখে পাহাড়ে চড়িয়া গিয়া লুক্কায়িত হইয়া আছে। নায়ে খাঁর এইরূপই অভিপ্রেত ছিল কি না, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হয় নাই, কিন্তু এটা বিশেষ সুবিধার কথাই হইয়াছিল। যূথস্বামী প্রথমে রণে নামিলে খেদার হস্তিগণ তাহাকে সামলাইতে পারিত কি না সন্দেহ। এখন বন্দীকৃত হস্তীদিগের কয়েকটি প্রহরী ব্যতীত খেদার অপর সকল হাতীই ইহার সহিত রণরঙ্গে মাতিতে প্রস্তুত। এইবার আর এক চোট খুব বন্দুকের আওয়াজ করা হইল, কিন্তু তাহাতে কিছু-

মাত্র ফল দর্শিল না। আত্ম-গোপনেচ্ছু যূথপতি তাহাতে বিন্দুমাত্রও টলিল না। তখন দলে দলে খেদার হাতী সেই ত্রিভুজাকার পাহাড়ের উপরের দিকে উহার সন্ধানে চলিতে লাগিল। কিয়ংক্ষণ খুঁজিবার পর যাই উহাদের এক দল দৃষ্টিপথে পড়া, আর অমনই মাতঙ্গরাজ সম্মুখের পাদপসমূহকে কতক মড়মড় শব্দে ভাঙ্গিয়া ও কতক উৎপাটিত করিয়া নক্ষত্রবেগে ছুটিতে ছুটিতে পাটদোয়ারীর পশ্চিমের দিকের শাখায় উপস্থিত হইল। মুহূর্ত্তমাত্র তথায় দাঁড়াইয়া একবার চারি দিক দেখিয়া লইল, আর তখনই পাটদোয়ারী ও গাড়াওয়ালীর ব্যবধান পর্ব্বতের শিখরাভিমুখে পুনরায় পূর্ব্ববৎ বেগে ছুটিতে লাগিল। পাঠক, নক্ষত্রবেগ শুনিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিবেন না। হাতী অত বেগে ছুটিতে পারে, এ বিশ্বাস আমারও পূর্ব্বে ছিল না। বস্তুতঃ, যাঁহারা কেবল 'শোয়ারী' হাতীর 'গজেন্দ্রগমন' দেখিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে পলায়মান বন্যহস্তীর অমিতবলদৃপ্ত খরবেগের সম্যক্ ধারণা করা নিতান্তই অসম্ভব। যাহা হউক, গজরাজের উদ্দেশ্য নান্নে খাঁর বুঝিতে বাকি রহিল না। একবার পূর্ব্বোক্ত পর্ব্বতের শিখরদেশে চড়িতে পারিলে হাতীটি অনায়াসেই গাড়াওয়ালীর দিকে পলাইতে পারিবে। অমনই মুহূর্ত্তের নিমিত্ত পশ্চাদ্ধাবন বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল, আর বাম ও দ... দিক হইতে অনেকগুলি পোষা হাতী প্রায় তেমনই বেগে উপরে চড়িতে লাগিল;—উদ্দেশ্য, উহার অগ্রবর্ত্তী হইয়া গতিরোধ করা।

এ উদ্দেশ্য কিন্তু সহজে সুসিদ্ধ হইল না। ধস্তাধস্তি খুবই খানিক ক্ষণ করিতে হইল। মড়মড় শব্দে বড় বড় গাছ ভূপতিত হইতে লাগিল, হস্তিপদোৎক্ষিপ্ত ধূলিরাশিতে চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন হইল, পর্ব্বতগাত্রচ্যুত প্রস্তরখণ্ডসমূহ গড়াইতে গড়াইতে পাটদোয়ারীতে আসিয়া পড়িতে লাগিল, ক্ষণে ক্ষণে গভীর তূর্য্যনিনাদে গগন বিদীর্ণ হইতে লাগিল। অবশেষে অতিকষ্টে খেদার হাতীগুলি প্রতিদ্বন্দ্বীর গতিরোধ করিতে সমর্থ হইল। তখন পুনরায় পাটদোয়ারী অভিমুখে পূর্ব্ববৎ বেগে ধাবিত হইয়া অচিরাৎ সোতের উপলবালুময় গর্ভে সকলে আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং তৎক্ষণাৎ সোত বহিয়া দক্ষিণাভিমুখে প্রধাবন আরম্ভ করিল। নান্নে খাঁর ইহাই উদ্দেশ্য ছিল। বৃক্ষলতাদি-রহিত অপেক্ষাকৃত সমতল সোতগর্ভে কেবল ছুটিয়া বেড়াইলে, বন্য হস্তী যতই বলবান্ হউক না কেন, অবশেষে নিশ্চয়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িবে। তত ক্ষণে খেদার হাতী পর্য্যায়ক্রমে দম লইতে পারে। এ ক্ষেত্রে তাহাই হইল। প্রায় ১৫ মিনিট ছুটাছুটির পর দেবীপ্রসাদ নামক হস্তীর মাহুত বান্দু প্রথমে ইহার গলায় কাছির ফাঁস পরাইল।

অমনই একটা বিকট বৃংহিতনিনাদ পর্ব্বতসমূহকে প্রকম্পিত করিয়া কন্দরে কন্দরে প্রতিধ্বনি উৎপাদন করিল। বোধ হইল, যেন গজরাজের স্বাধীনতালোপসূচক আর্ত্ত ক্রন্দনে সহানুভূতি দেখাইবার জন্য দিকপালগণ কাঁদিয়া উঠিলেন। হতভাগ্য বন্দী প্রাণপণ করিয়া এইবার একবার ছুটিল। কাছির প্রবল আকর্ষণে দেবী-প্রসাদ হুঁচোট্ খাইয়া পড়িবার উপক্রম হইল, কিন্তু ভাগ্যক্রমে সুবিশালবপুঃ নগেন্দ্রগজ অন্য দিক হইতে বন্দীর গতিরোধ করিল। তখনই পূর্ব্ববর্ণিত প্রণালীতে সকল হাতী—অন্ততঃ যতগুলির স্থানসঙ্কুলান হইল—উহাকে চারি দিক হইতে মাথা দিয়া চাপিয়া ধরিল, এবং অবিলম্বে কয়েক জন মুগরীওয়ালা মিলিয়া তাহার পশ্চাতের পদদ্বয় ছাঁদিয়া দিল।

অতঃপর নিকটে অগ্রসর হইয়া আমরা দেখিলাম, পরাজিত বন্দী যথার্থই গজরাজ! যেমন বৃহৎ আকার, তেমনই সুন্দর রূপ। বস্তুতঃ, খেদার অতগুলি হাতীর মধ্যে এক নগেন্দ্রগজ ব্যতীত ইহার ন্যায় রূপবান্ হস্তী আর দ্বিতীয় দেখিতে পাইলাম না। যেমন পৃথুল কুম্ভ, তেমনই সুপ্রশস্ত ললাট, তদনুরূপ লালিত্যময় সুগঠন বপুঃ। শুণ্ডের মূলভাগ সুবিশাল, পৃষ্ঠ ও বক্ষঃস্থল সুবিস্তৃত, পদচতুষ্টয় [illegible] স্থূল ও দৃঢ়। বয়স অনুমান করা হইল প্রায় ৩৫ বৎসর। এই-[illegible] বয়সের হাতীই অধিক মূল্যবান। বেশী বয়স হইলে প্রায়ই ভাল রকম পোষ মানে না, বা শিক্ষিত হয় না, অল্প পরিশ্রমে কাতর হয়, এবং শীঘ্র মরিয়া যাইবার আশঙ্কা থাকে। পক্ষান্তরে, নিতান্ত বাচ্চা হইলে অনেক দিন প্রতিপালন করিয়া কার্য্যক্ষম করিয়া লইতে হয়। ফলতঃ, একা এই হাতীটিই অপর ছয়টির তুল্যমূল্য, নাল্লে খাঁ এই অভিমত প্রকাশ করিলেন।

এখন বেলা চারিটা, সুতরাং ঠিক্ হাতী ধরা কাজে কিঞ্চিদধিক এক ঘণ্টা মাত্র সময় লাগিয়াছিল। এত অল্প সময়ে কার্য্যসিদ্ধি হইল, অথচ কি নূতন কি পুরাতন হাতী, কি মাহুত কি মুগরীওয়ালা, কেহই খুন জখম হইল না। নাল্লে খাঁর এখন আহ্লাদের পরিসীমা নাই। তিনি বিজয়োল্লাসে উৎফুল্ল, কিন্তু শিথিলপ্রযত্ন নহেন। ক্ষণমাত্র বিশ্রাম না করিয়াই তিনি বন্দীকৃত হস্তীদিগের পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধারণ করিতে লাগিলেন। অবিলম্বে অপর হাতীগুলি প্রহরিবেষ্টিত হইয়া চিলাওয়ালা আড্ডার অভিমুখে চালিত হইতে লাগিল; কিন্তু যূথপতিকে কিছুতেই নড়াইতে পারা গেল না। সুতরাং রজনীতে তাহার পাহারার জন্য মাহুত সহ কতকগুলি বড় বড় পোষা হাতী রাখিয়া আসা হইল। আমরা সকলে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

আহার ব্যাপারে এত বাঁধাবাঁধি ;—আজ বেগুন খাইতে নাই, কাল পটোল খাইতে নাই, অমুক দিন লাউ রাঁধিতে নাই, অমুক দিন উপবাস করিতে হয়। আহার-তত্ত্ব হিন্দু বেশ স্পষ্ট বুঝিয়াছিল, তাই হিন্দু চিরকালই নিরামিষাশী, এক সূর্য্যে দুইবার খায় না।

শাস্ত্র, বিজ্ঞান ও ইতিহাসের প্রায় অধিকাংশ স্থলেই নিরামিষ আহারের উপকারিতা ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রতিপাদক যুক্তি দেখা যায়। ইহাই যে মানবের একমাত্র স্বাভাবিক আহার, তাহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে। প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক যুগের বিদ্বান, মনীষী ও প্রধান ব্যক্তিগণ ইহার পক্ষপাতী। কিন্তু আজকাল কি শিক্ষিত কি অশিক্ষিত, সকলেই শাস্ত্রসঙ্গত আহারে বীতস্পৃহ। অনেকে স্থূলদর্শনে যথেচ্ছাচারী পাশ্চাত্যদিগের বলপুষ্টির আবছায়া দেখিয়া তাহার অনুকরণে সর্ব্বদা প্রয়াসী। "তাঁহাদের ধারণা, বঙ্গবাসীর অকাল-মৃত্যুর প্রধান কারণ মাংসাদির অবহুল ভোজন,—অবাধ বাণিজ্যের প্রধান অন্তরায় আহার বিচার!"

ইন্দ্রিয়, মন ও আত্মার পূর্ণবিকাশ লাভ করিতে হইলে মানবকে আহারের দিকে একটু দৃষ্টি রাখিতে হয়। কারণ, স্বভাব ও গুণ আহারসাপেক্ষ। আহারকারী মানুষমাত্রের হৃদয়েই আহার্য্য দ্রব্যের গুণত্রয় বিরাজমান আছে। তাই গীতায় ভগবান বলিয়াছেন,—

আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকাঃ স্মৃতাঃ॥
কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরুক্ষবিদাহিনঃ।
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ॥
যাতযামং গতরসং পূতিপর্য্যুষিতঞ্চ যৎ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্॥

আহারের প্রধান প্রয়োজন ক্ষুন্নিবৃত্তি হইলেও, ইহার অবান্তর প্রয়োজন বলপুষ্টি-সাধন। সেই বলপুষ্টি দুইপ্রকার ;—শরীরগত ও মনোগত। শরীর ও মন উভয়ই ভৌতিক পদার্থ। শরীর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, মন অতীন্দ্রিয়,—ইন্দ্রিয়ের রাজা বা প্রবর্ত্তক বলিলেও হয়। ভুক্ত বস্তু দ্বারা যেরূপ শারীরিক বলাধান ও পোষণ হয়, সেইরূপ মানসিক বলপুষ্টিও সাধিত হয়। যথা ছান্দোগ্যোপনিষদে,—

"অন্নমশিতং ত্রেধা বিধীয়তে। তস্য যঃ স্থবিষ্ঠো ধাতুস্তৎ পুরীষং ভবতি। যো মধ্যমস্তন্মাংসং। যোঽণিষ্ঠস্তন্মনঃ।"

অর্থাৎ, "ভুক্ত অন্ন জঠরাগ্নি দ্বারা পচ্যমান হইয়া ত্রিধা বিভক্ত হয় ;—স্থূল, মধ্যম ও সূক্ষ্ম। তাহার মধ্যে স্থূল ধাতু বিষ্ঠারূপে পরিণত হয় ; মধ্যম ধাতু রস-রক্তাদিরূপে পরিণত হইয়া পরিণামে মাংসরূপ ধারণ করে ; সূক্ষ্ম ধাতু হৃদয়গত সূক্ষ্ম হিতাখ্যনাড়ীতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া মনোরূপে পরিণত হয়।" সংযত আহারের নিশ্চিত ফল কি, তাহা নিবৃত্তিমার্গের অধিকারী একমাত্র হিন্দুই জোর করিয়া বলিতে পারেন।

হিন্দু শাস্ত্রের দোহাই দিতে গেলে আজকাল চলে না, এবং নব্যবিজ্ঞানাভিজ্ঞ পণ্ডিতাভিমানীদের নিকট তাহা পর্য্যাপ্ত authority বা নজির বলিয়া গ্রাহ্য হয় না। আমার কোনও শ্রদ্ধেয় বন্ধুর কথায় বলিতে গেলে, আজকাল শালগ্রাম শিলাও পূজার পূর্ব্বে একবার জর্ডানের জলে ধুইয়া লইলে ভাল হয়। তাই আজ সংক্ষেপে সাধারণ বিচারবুদ্ধি ও সহজ বিজ্ঞানের মতে পারিভাষিক নিরামিষ আহারের যুক্তিযুক্ততা প্রতিপন্ন ও পাশ্চাত্য পণ্ডিত এবং মনীষিগণের মত উদ্ধৃত করিয়া নব্য যুবকগণের সন্দেহভঞ্জন করিবার কথঞ্চিৎ চেষ্টা করিব।

কোন বিষয়ের বিচার করিতে হইলেই নিম্নলিখিত তিনটি বিষয় ধরিয়া বিচার করিতে হয় ;—

১। ইতিহাস ও শাস্ত্রবাক্য, অর্থাৎ মানবের পূর্ব্ব অভিজ্ঞতালব্ধ শিক্ষা।
২। বিজ্ঞান, অর্থাৎ প্রকৃতির বজ্রশাসনের শিক্ষা।
৩। ধর্ম্ম, অর্থাৎ ভগবানের আদেশবাণী।

ইতিহাসের সর্ব্বত্রই দেখিতে পাই যে, ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন যুগের প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণ নিরামিষ আহারের সমর্থন করিয়াছেন। হিন্দুশাস্ত্রের ত কথাই নাই! পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যেও * প্রায় সকলেই স্বীকার করিয়াছেন যে, অহিংসাই পরম ধর্ম্ম, অহিংসাই পরম সন্ন্যাস, অহিংসাই পরম সত্য ; আর সকল ধর্ম্মই ইহা হইতে অঙ্কুরিত হইয়াছে।

নিরামিষ আহার সম্বন্ধে আধুনিক বিজ্ঞান শাস্ত্রের অভিমত কি, প্রথমে তাহারই আলোচনা করিব। মানবের প্রকৃতি, অবয়বের গঠন ও কার্য্যপ্রণালীর সহিত যদি তাহার আহারের সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়, তবে তাহাই বিজ্ঞানানুমোদিত প্রকৃত নৈসর্গিক আহার। অথবা অপর সৃষ্ট প্রাণীর গঠনের

---

* Hesiod, Pythagorus, Plato, Socrates, Seneca, Plutarch, Clement, Antioch, Newton, Franklin, Palley, Hufeland, Abemethy, Lamb, Dr. Cheque, Lamartine, Michlet, Buffon, Shopenhair and Zenda Avesta.

তুলনায় আহারের সহিত মানবের স্বাভাবিক আহার স্থিরীকরণও বিজ্ঞানের অংশ। তদ্ব্যতীত দ্রব্যগুণ লক্ষ্য করিয়া মানবের কিরূপ আহার আবশ্যক, তাহার নির্ণয়ও বিজ্ঞানের অভিপ্রেত।

প্রথমতঃ, সমস্ত সৃষ্ট প্রাণীকে আহারানুযায়ী চারি ভাগে বিভক্ত করা যায়; যথা, শস্যভুক্, ফলভুক্, মাংসভুক্ ও সর্ব্বভুক্।

এখন শারীর গঠন দ্বারা (anatomy) মানবকে কোন্ শ্রেণীভুক্ত করা যায়, দেখা যাউক্।

১। প্রাণিসমূহের দেহাগ্রভাগ।—হক্সলি (Huxley) বলেন, সমস্ত স্তন্যপায়ী জীবকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়; যথা,—(১) যাহাদের ক্ষুর আছে, (২) যাহাদের থাবা আছে, (৩) যাহাদের হস্তপদাদি আছে। বিশেষ করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, যে সমস্ত প্রাণীর ক্ষুর আছে, তাহারা সাধারণতঃ শস্যভুক্, এবং কেহ কেহ সর্ব্বভুক্। যে সমস্ত প্রাণীর থাবা আছে, তাহারা মাংসভুক্; এবং যাহারা হস্তপদবিশিষ্ট, তাহারা ফলভুক।

২। অন্ননালীর (alimentary Canal) দৈর্ঘ্য।—সমস্ত মাংসভুক্ প্রাণীর ইহা নিতান্ত ছোট। মাংসাশী প্রাণীর মধ্যে কাহারও নালীদৈর্ঘ্য দেহ অপেক্ষা তিন গুণের বেশী নয়। মানুষের প্রায় বারো গুণ, মেষের ত্রিশ গুণ। *

৩। স্তন।—সমস্ত মাংসাশী প্রাণীর স্তন উদরনিম্নে (abdomen) অবস্থিত। এমন কি, সর্ব্বভুক্ প্রাণীর স্তনও উদরনিম্নে। কেবল মানবের বক্ষের উপর (chest) অবস্থিত। (১)

৪। কোলোন (Colon)।—সমুদয় মাংসাশী জীবের ইহা মসৃণ ও (Non Sacculated) মানবের ইহা বহুক্ষুদ্রছিদ্রবিশিষ্ট (afed) (২)।

৫। জিহ্বা।—সমুদায় মাংসাশী প্রাণীর জিহ্বা বন্ধুর এবং মাংসের সংস্পর্শে তাহাতে একরূপ খরখরে শব্দ হয়। মনুষ্যের জিহ্বা মসৃণ।

৬। ত্বক্।—মাংসাশীর প্রকৃত ঘর্ম্মনালী নাই। মনুষ্যের শরীরে ইহা এত বেশী যে, যদি সমুদয় বিস্তৃত করা যায়, তবে ১১০০০ ফিট স্থান অধিকার করিবে। শূকরের কেবল শুণ্ড ঘর্ম্মাক্ত হয়।

৭। লালা-নিঃসারক যন্ত্র।—মাংসাশী প্রাণীর ইহা এত অল্প যে, নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অধিকন্তু, তাহাদের লালার সহিত মিশ্রিত হইলে

(১). Kuttner in Virchow's Archines.
(২). Dr. Kellog, M.D.

শ্বেতসার পদার্থের (Starchy Substances) কোনও ক্রিয়া হয় না। মনুষ্যের ঠিক ইহার বিপরীত।

খ্যাতনামা ডাক্তার কেলোগ্ এম. ডি. (Dr. Kellogg M.D.) উল্লিখিত ও অন্যান্য অনেকগুলি প্রমাণ দেখাইয়াছেন। মানবের Canine দন্ত সম্বন্ধে অনেকের বিকৃত ধারণা আছে; (১) বাহুল্যভয়ে এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় তাহার অবতারণা করিলাম না। যাহা হউক, প্রমাণ এত অধিক যে, আহার-প্রণালী দেখিলে মানবকে যথার্থই ফলভুক্ জীবের পর্য্যায়ে শ্রেণীবদ্ধ করিতে হয়। কিছুতেই ভীষণদর্শন লাঙ্গূলবিশিষ্ট হিংস্র জন্তুর মধ্যে পরিগণিত করিতে আমার ইচ্ছা হয় না। (২)

এখন দেখা যাউক, মানব অবয়বের কার্য্যপ্রণালী বা শারীরতত্ত্ব (Physiology) অনুসারে মানব কোন্ শ্রেণীভুক্ত।

হক্সলী দেখাইয়াছেন যে, প্রাণিগণ ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বে গর্ভস্থলীতে যেরূপ ভাবে লালিত ও পোষিত হয়, তাহা অনুধাবন করিয়া দেখিলে, প্রাণিগণকে ছয় শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। প্রথম, যাহাদের গর্ভপরিস্রব (Placenta) বা ফুল ভূমিষ্ঠ হইবার সময় নির্গত হয় না। শস্যভুক্ সমুদয় প্রাণী এই শ্রেণীভুক্ত; দ্বিতীয়তঃ, যাহাদের ফুল জন্মকালে বহিষ্কৃত হয়, এবং একটি জোনের (Zone) ন্যায় ডিম্ব ব্যাপিয়া থাকে, তাহারা সকলেই মাংসাশী। তৃতীয়তঃ, যাহাদের ফুল জন্মকালে নির্গত হয় বটে, কিন্তু তাহা ডিম্ব ব্যাপিয়া না থাকিয়া একখানি চাকৃতির ন্যায় স্বতন্ত্রভাবে থাকে। ইহারা ফলভুক্।

---

1. (*a*). "The teeth of man have not the slightest resemblance to those of carnivorous animals".—Prof. Wm. Lawrence, F.R.S.

(*b*). "It has been truly said that man is fugivorous.—All the details of his intestinal Canal and above all his Denition, prove it in the most decided manner".—F. A. Pouchet, M.D.

(*c*). "That the cuspid teeth do not thus indicate aflesh dictary either in whole or in part in further shown by the presence of so called cuspids in purely herbivorous animals as in the stag, the camel, and the so-calld "bridle teeth" of the horse."

—Dr. Kellogg, M. D.

2. (*a*) Said the great naturalist *Linuæus*, in speaking of the Dietetic character of man. His organisation, when compared with

ধৃত হস্তীদিগের নামকরণ বলরামপুরে পঁহুছিয়া হইবে। শুনিলাম, মহারাজা বাহাদুর অমাত্যবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া নূতন হাতীগুলিকে উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া নাম রাখিয়া থাকেন। মাহুত ও মুগরীওয়ালাদের মধ্যে যাহারা বিশেষ বাহাদুরী দেখাইয়াছে, তাহাদিগকে ঐ সময়ে পুরস্কার দেওয়া হয়।

নূতন হাতীকে পোষ মানাইতে ও মাহুতের আদেশ শিখাইতে সচরাচর দুই মাসের বেশী সময় লাগে না। আমরা নূতন ধরা হাতীদিগকে দুই দিন পরে পুনরায় দেখিয়াছিলাম। তখন যে কেহ দূর হইতে ঘাসে মোড়া চাউল আটা প্রভৃতির পুঁটলী সম্মুখে নিক্ষেপ করিলে অমন যে দুর্দ্ধর্ষ যূথনাথ, তিনিও, দেখিলাম, লোভসংবরণ করিতে পারিতেছেন না। আস্তে আস্তে শুঁড় বাড়াইয়া পুঁটলীটি তুলিয়া বদনবিবরে দিতে তখন তাঁহার কিছুমাত্র সঙ্কোচ বা লজ্জা বোধ হইতেছিল না। মাহুত ধমক দিলে এখনই একটু যেন থতমত খাইয়া দাঁড়ান! দুই মাসের মধ্যে ইনিও সুশিক্ষিত হইয়া স্বীয় বন্যভ্রাতাদিগের স্বাধীনতাহরণ কার্য্যে সহায়তা করিতে থাকিবেন, সন্দেহ নাই। হায়! পরাধীনতায় এমনই করিয়া হৃদয়ের মহত্ত্ব লোপ পায়!

সাহসিক মুগরীওয়ালাদিগের মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা না করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিতে পারি না। হস্তিপৃষ্ঠনিবদ্ধ একগাছি রজ্জুমাত্র বামহস্তে ধারণ করিয়া দক্ষিণ হস্তে সেই মুগরী ঘুরাইতে ঘুরাইতে ইহারা দণ্ডায়মান অবস্থায় হাতী চালাইতে থাকে। হাতী সময়ে সময়ে যেরূপ বেগে ছুটিতে থাকে, তাহাতে সমতল পথেও ঐ প্রকার দাঁড়াইয়া থাকা যথেষ্ট বিস্ময়কর। কিন্তু হাতী পাহাড় পর্ব্বতে উঠুক বা নামুক, বা যেমনই পথে চলুক, মুগরীওয়ালা সমভাবেই দাঁড়াইয়া থাকে। সম্মুখে মুহুর্মুহুঃ বড় বড় বৃক্ষের শাখা পড়িতেছে—মুগরীওয়ালা কোনওটিকে লম্ফ দ্বারা অতিক্রম করিতেছে, কোনওটির নীচে একেবারে হাতীর পশ্চাদ্‌ভাগে বা কুক্ষির দিকে ঝুঁকিয়া মাথা বাঁচাইতেছে, আবার নিমেষমধ্যে খাড়া হইয়া দাঁড়াইতেছে ও আবশ্যকমত মুগরী চালনা করিতেছে। তাহাদের ক্ষিপ্রকারিতা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও সাহসিকতার তুলনা হইতে পারে না। ইহারা সামান্য বেতনের লোভে এইরূপ অসমসাহসিকতার পরিচয় দেয় না, প্রত্যুত হস্তিসংগ্রামে প্রকৃত শিকারীর ন্যায় অতিশয় উৎসাহ ও আনন্দ অনুভব করিয়া থাকে। কেহ কোনও কারণবশতঃ যদি কখনও খেদা করিতে অপারগ হয়, তাহার বিষাদ ও পরিতাপের পরিসীমা থাকে না।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল।

নিরামিষ আহার।

আমার তিন বৎসরের মেয়েকে এক দিন আদর করিয়া ডকিয়াছিলাম,—"লক্ষ্মী মা আমার!" অমনই সে বলিয়া উঠিল, "বাবা! তুমি আমাল মেয়ে।" আমি বুঝাইলাম, "না মা, আমি তোমার ছেলে।" আর এক দিন আমি বসিয়া আছি, সে হাসিমুখে বলিল, "বাবা! তুমি আমাল মেয়ে।" আমি তাহার চাঁদমুখে বার বার চুম্বন করিয়া আর একবার বুঝাইলাম, "না মা, আমি তোমার ছেলে।" কিছু দিন ... আবার এক দিন দুইটি ছোট ছোট বালিসের কোন্‌টি কা'র মেয়ে হইবে ইহা লইয়া ছোট বোন্‌টির সঙ্গে ঝগড়া করিতেছে, এমন সময় আমাকে দেখিতে পাইয়া বালিস ফেলিয়া দৌড়িয়া আসিয়া বলিয়া উঠিল, "ঐ আমাল্ মেয়ে!" আমি সেই 'না-প্রসব-করে-কানাইএর মা'র অপূর্ব্ব পুত্রবাৎসল্য হইতে নিস্তার পাইয়া আবার তাহাকে বুঝাইলাম, "না মা, আমি তোমার ছেলে।" সে আজ ছয় মাসের কথা। বালিকা এখনও মাঝে মাঝে বলে, "বাবা! তুমি আমাল্ মেয়ে।" ভাবিলাম, বালিকা কেন আমাকে ছেলে না বলিয়া মেয়ে বলে? তিন বৎসরের মেয়ের কেমন ধারণা, মা বলিলেই মেয়ে বলিতে হয়, শতবার বুঝাইয়া দিলেও তাহা ছাড়িতে পারে না। হরি! হরি! তিন বছরের ধারণা যদি এত বলিয়া দিলেও না যায়, তবে মানবের দুই চারি জন্মের ধারণা কি এক কথায় দূর হইতে পারে?

শাস্ত্রপ্রমাণ না থাকিলেও লোকে সহজে লৌকিক আচার ছাড়িতে পারে না; তাই সহস্রবার বলিলেও, নিজের অভ্যাসটা যতই জঘন্য ঘৃণ্য শাস্ত্রবিগর্হিত হউক না, লোকাচারের কেমন প্রবল প্রভাব, কিছুতেই মানুষ ছাড়িতে পারে না। তাই ভয় হয়, লোকাচারবিরুদ্ধ নূতন কথা বলিতে গেলেই অপদস্থ হইতে হইবে। কিন্তু যাহা সত্য, তাহা চিরকালই সত্য। যে সত্য মহাযোগী ব[illegible]দর্শী আর্য্য ঋষিগণের অলৌকিক ক্ষমতাবলে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা চিরকালই সত্য থাকিবে; সে সত্যের লোপাপত্তির আশঙ্কা করি না।

আজ যে বিষয়ের অবতারণা করিতে সাহসী হইয়াছি, তাহার আলোচনা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। আবার মানব আজ কাল এই বিষয়ে যত উদাসীন, এমন কোনও বিষয়ে নহে। আমাদের প্রকৃতি যে আমাদের আহারের উপর নির্ভর করে, তাহা আর বলিয়া দিতে হইবে না। এই গুরুতর তত্ত্ব আর্য্য ঋষিগণ যেমন বুঝিয়াছিলেন, এমন আর কেহ নহে। তাই হিন্দুর প্রাত্যহিক

আহারতত্ত্বের বিচার করিতে হইলে শরীরতত্ত্বের গুটিকতক বিষয়ের বিশেষ আলোচনা করিতে হইবে। বাহুল্যভয়ে সংক্ষেপে, তাহার কিছু আভাসমাত্র দিব।

প্রথম,—ভোজন ও ভুক্তের পরিপাকক্রিয়া;—ইহার অন্তর্গত আহারগ্রহণ, চর্ব্বণ ও পচনাদি।

দ্বিতীয়,—পচ্যমান ভুক্তাবশিষ্টের বিষ্ঠাদি পরিণাম।

তৃতীয়,—ভুক্ত দ্রব্য হইতে জাত বিষাক্ত দ্রব্য।

(১) আহার্য্যগ্রহণ—অর্থাৎ, কি উপায়ে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর প্রাণীরা আহার্য্য গ্রহণ করে। শস্যাশী প্রকৃতির শ্যামল ক্ষেত্রে ইচ্ছামত তাহাদের আহার্য্য গ্রহণ করে, তাই তাহাদের কোন বিশেষ অঙ্গ প্রত্যঙ্গের আবশ্যক হয় না। তাই শস্যাশীদের কেবল পর্য্যটনোপযোগী ক্ষুর আছে; মাংসাশী দুর্ব্বলকে পীড়া দিয়া বলপূর্ব্বক আহার্য্য সংগ্রহ করে, তাই তাহাদের শিকারোপযোগী থাবা ও বিশেষ দন্ত আছে। আর ফলভুক্ মনুষ্য প্রভৃতির ফল তুলিতে ও তাহার খোসা ছাড়াইবার জন্য হস্তের ন্যায় বিশেষ অঙ্গের একান্ত প্রয়োজন।

(২) তাহার পর আহার্য্য লইলেই হয় না, তাহা চর্ব্বিত হওয়া চাই। প্রাণিগণের চর্ব্বণব্যাপার বিশেষ করিয়া দেখিলে স্পষ্ট জানিতে পারা যায় যে, যাহার যেরূপ নৈসর্গিক আহার্য্য, তাহার অনুকূল চর্ব্বণ করিবার শক্তি ও অবয়বও তাহার আছে। প্রথমতঃ, শস্যভুক্ প্রাণীর চোয়ালের গতি অতি জটিল। * ইহারা ইচ্ছামত দিকে ইচ্ছা চোয়াল ঘুরাইতে ফিরাইতে পারে।

---

that of other animals, shows that fruits and esculent vegitables constitute his most suitable food."

(*b*). Baron *Cuview* one of the very highest authorities on comparative Anatomy Says:—"The natural food of man, judging from his structure, appears to consists of fruits, roots, and the esculent parts of vegetables."

(*c*). It is not going too far to say that every fact connected with the human organisation goes to prove that man was formed a frugivorous animal. Dr. Thomas Bell of London.

* There are three distinct motion—the Vertical, the lateral or sidewise, and a movement forward and backward. By this means the large grinding teeth can be used in a most effective manner in reducing to a pulpy mass the twigs and coarse herbage upon which this class of anlmals feeds.

গরু প্রভৃতির চর্ব্বণ ও রোমন্থন দেখিলে ইহা স্পষ্টই বুঝা যায়। মাংসাশী জীব ইচ্ছামত চোয়াল ফিরাইতে পারে না, কেবলমাত্র এক দিকে নাড়িতে পারে; তাই তাহাদের চর্ব্বণে ঠিক কাঁচির মত গতি লক্ষিত হয়। ইহারা প্রথমতঃ থাবা ও বিশেষ দন্ত দ্বারা মাংস টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া পরে ক'সের দাঁতের করাতের মত ধার দিয়া হাড় হইতে মাংস ছাড়াইয়া লইয়া ভক্ষণ করে। ফলভুক্ প্রাণীরা ঠিক শস্যভুকের মত চর্ব্বণ করে।

(৩) সমস্ত মাংসাশী প্রাণী লেহন করিয়া জলপান করে; কিন্তু মনুষ্য শস্যভুকের মত শোষণ করিয়া জলপান করে।

(৪) আহার্য্য চর্ব্বিত হইলে মুখের লালার সহিত মিশ্রিত হয়। যখন শস্য-ভুক্ প্রাণীর মুখের লালা তাহাদের উদ্ভিজ্জ খাদ্যের সহিত মিশ্রিত হয়, তখন ভুক্ত উদ্ভিজ্জের শ্বেতসার পদার্থের সহিত লালার মিশ্রণে বিশেষ ক্রিয়ার উৎপত্তি হয়। কিন্তু মাংসাশী প্রাণীর মুখলালা শ্বেতসার পদার্থের সহিত মিশ্রিত হইলে কোনও ক্রিয়াই হয় না। ইহা লক্ষ্য করিলে বোধ হয় যে, মানবের স্বাভাবিক আহারই ফলমূল শাক সবজী।

(৫) পাকস্থলীর কাণ্ড দেখিলেও মানুষকে মাংসাশী মনে হয় না। প্রথমতঃ, মাংসাদি জঠরের ভিতর নানা প্রকার বিষাক্ত দ্রব্যের উৎপাদন করে; তাহা হইতে নিস্তার পাইবার জন্য মাংসাশী জীবের পাকস্থলীতে gastric juice নামক এক প্রকার দ্রব্য প্রচুরপরিমাণে উৎপন্ন হয়। কিন্তু মনুষ্যের gastric juiceএর তত শক্তি নাই। সুতরাং মাংসাদি ভোজনে এত অনিষ্টাপাতের সম্ভাবনা। মানবের gastric juice শাক সবজী পরিপাকের বিশেষ অনুকূল। দ্বিতীয়তঃ, মাংসাশী জন্তুর যকৃতের গঠন পূর্ণ ও জটিল। তৃতীয়তঃ, অন্ত্রনালীর অত্যধিক দৈর্ঘ্য ও colonএর অবস্থা দেখিলে স্পষ্টই বোধ হয় যে, মানবের স্বাভাবিক আহার মাংস নহে।

উদ্ভিদ্‌জীবনের বিশেষত্ব এই যে, তাহারা আলোক ও অন্যান্য প্রাকৃতিক শক্তির (Vital principles of organisation) সাহায্যে পৃথিবী, জল ও বায়ুর অন্তর্গত রূঢ় পদার্থের পুনঃসন্নিবেশে নূতন নূতন পদার্থ [যেমন শ্বেতসার (Starch) মেদ, শর্করা, অণ্ডলালা (albmen) শাখা প্রশাখা ইত্যাদি] সৃষ্টি করিয়া উদ্ভিদদেহ গঠিত করে। তাহাদের মধ্যে যাবদীয় ক্রিয়াশক্তি প্রচ্ছন্ন-ভাবে অন্তর্নিহিত থাকে; পরে উপযুক্ত অবস্থানুসারে তাহা কার্য্যসম্পাদনে প্রকাশিত ও ব্যবহৃত হয়। যেমন কাষ্ঠের অন্তর্গত ক্রিয়াশক্তি অম্লজানের সহিত

মিলিত হইলে অগ্নি ও উত্তাপরূপে পরিণত হয়। প্রাণিজীবনের কার্য্যপ্রণালী স্বতন্ত্র। তাহারা প্রাকৃতিক শক্তির সাহায্যে প্রাকৃতিক পদার্থ লইয়া কোন কার্য্যকরণক্ষম শক্তি উপার্জ্জন করিতে পারে না। অগত্যা তাহারা উদ্ভিজ্জের সঞ্চিত শক্তিসমূহের সাহায্য গ্রহণ করে, এবং সেই সকল অন্তর্নিহিত শক্তিকে পচন ও সমীকরণ দ্বারা বিশ্লিষ্ট করিয়া নানাপ্রকার জৈবিক শক্তি প্রাপ্ত হয়। তাই প্রাণিজীবনে উদ্ভিদ্ না হইলে প্রায় চলে না। অতএব দেখা গেল, উদ্ভিদ-জীবনের সাধারণ নিয়ম শক্তি-সঞ্চয়। প্রাণিজীবনের সাধারণ নিয়ম সঞ্চিত শক্তির বিশ্লেষণ। সত্য সত্যই প্রাণিদেহের জৈবিক কার্য্যপ্রণালী ঠিক এঞ্জিনের ন্যায়। কলে যেমন কয়লা দ্বারা প্রথমে উত্তাপ, তাহার পর বাষ্প ও অবশেষে বাষ্প দ্বারা নানা কার্য্য সম্পন্ন হয়, সেইরূপ প্রাণিদেহে পচন ও অন্যান্য জৈবিক ক্রিয়া দ্বারা প্রাণিগণের খাদ্যসমূহের অন্তর্নিহিত সঞ্চিত ক্রিয়া-শক্তি সকল বিকশিত হইয়া শরীরের উত্তাপ ও জীবনীশক্তি প্রকাশ পায়, এবং ধূমাদির ন্যায় নানাবিধ বিষাক্ত দ্রব্য মল মূত্র বায়ু স্বেদ প্রভৃতি রূপে নির্গত হয়। জৈবিকশক্তির বিশ্লেষণ হইলেই প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে নানাবিধ বিষ উৎপন্ন হয়। আমিষ আহারে এই বিষও গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু নিরামিষ আহারে বিষাক্ত দ্রব্যের কোন ভয় থাকে না। অতএব উদ্ভিদের মধ্যে আমরা অনেকটা খাঁটী আহার পাইতে পারি।

আমিষাশীদের দেহে অত্যন্ত সহজে সংক্রামক রোগ সংক্রামিত হয়। শরীরের রক্তে এক প্রকার আণবিক পদার্থ আছে। কোনও প্রকার ব্যাধির বীজ (germs) শরীরে প্রবেশ করিলে ঐ আণবিক পদার্থ তাহা অনায়াসে নষ্ট করিতে পারে। এই শক্তি আমাদের যকৃতের শ্বেতসারের উপর নির্ভর করে। মাংসের রস ও আমিষভোজনজাত বিষাক্ত দ্রব্য সকল আমাদের এই মহামূল্য রোগবীজনাশক শক্তির বড়ই অপকারী। মাংসাহারে ক্রমশঃ এই শক্তির হ্রাস হইতে থাকে। চিকিৎসাবিজ্ঞানে যে সমস্ত রোগ আমিষাহারের অবশ্যম্ভাবী ফল বলিয়া একবাক্যে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, এক্ষণে সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করিব।

১। প্রধানতঃ আমিষ আহারে আমাদের শরীরে Uric Acid নামক এক প্রকার পদার্থ এত অধিক সঞ্চিত হয় যে, Dr. Haigএর মতে অধিকাংশ রোগই তাহা হইতে উৎপন্ন হয়।

২। মূত্রসম্বন্ধীয় নানা পীড়ার কারণই অপরিমিত মাংসাহার।

৩। মৃগীরোগের কারণই মাংসাহার, এবং একেবারে মাংসাহার-বর্জ্জনই ইহা হইতে নিস্তার পাইবার একমাত্র উপায়।

৪। ক্যান্সার (Cancer)

৫। Tape worm.

৬। টাইফয়েড জ্বর।

৭। যক্ষ্মা।

৮। অকালে দন্ত পড়িয়া যাওয়া।

৯। গাউট।

১০। Brigts disease.

১১। অম্লপিত্তাধিকারের প্রায় সকল রোগই মাংসভোজন হইতে উৎপন্ন।

১২। বসন্ত, স্কার্লেট্ ফীভার, ডিপ্থিরিয়া প্রভৃতি কতকগুলি রোগে মাংসভক্ষণ একেবারে নিষিদ্ধ।

১৩। মৎস্যভক্ষণে ম্যালেরিয়া বৃদ্ধি পায়।

খাদ্যের উপাদানতত্ত্বের (chemical composition) বিচার করিলে আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাই যে, যে পাঁচটী পদার্থ সকল বৈজ্ঞানিকের মতে আমাদের জীবন-ধারণ ও সার্ব্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয়, তাহা নিরামিষ আহারে প্রচুরপরিমাণে বিদ্যমান।

অনেকের বিশ্বাস, নিরামিষ আহারে শরীরের শক্তি, কর্ম্মক্ষমতা ও শ্রমসহিষ্ণুতার হ্রাস হয়। কিন্তু এ সংস্কার অমূলক। নিম্নলিখিত দৃষ্টান্তে পাঠক তাহার প্রমাণ পাইবেন।

(ক) গত ২৫ বৎসরের মধ্যে জাপানীর ন্যায় কোন জাতির উন্নতি হয় নাই। এই জাপানের অধিকাংশ অধিবাসীই নিরামিষাশী।

(খ) সুয়েজ খালের নির্ম্মাতা মুসো ডি, লেসেপ্স বলেন যে, নিরামিষভোজী আরব্য ও হিন্দুস্থানবাসী শ্রমজীবী না থাকিলে এত বৃহৎ ব্যাপার কিছুতেই সম্পন্ন হইত না। তিনি আমিষাশী ইউরোপীয় শ্রমজীবীদের অলসতা ও অকর্ম্মণ্যতার অনেক নিন্দা করিয়াছেন।

(গ) পদব্রজে গমনে ও বাইসিকল্ প্রভৃতিতে গমনে নিরামিষাশীদের শ্রমসহিষ্ণুতা ও শক্তির প্রভূত প্রমাণ পাওয়া যায়।

অনেকের সংস্কার, নিরামিষ আহারে মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা জন্মে। নিউটন, ফ্রাঙ্কলিন, বেকন ও এডিসনের মস্তিষ্ক কি দুর্ব্বল ?

আমি প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছি, অনেক পাশ্চাত্য চিকিৎসক ও ও বিজ্ঞানবিদ্‌গণের মতে নিরামিষ আহারই আমাদের শরীররক্ষা, বলপুষ্টি-সাধন, দীর্ঘজীবন ও শ্রমসহিষ্ণুতার প্রধান সহায়। পক্ষান্তরে, বিভিন্ন শাস্ত্রের মতে আমিষ আহার আমাদের অনেক অনিষ্টের মূল, অনেক রোগের কারণ। কিন্তু আমাদের শাস্ত্রকারগণ কেবল শারীরিক ইষ্টানিষ্টের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই খাদ্যনির্ব্বাচন করেন নাই। তাঁহাদের মতে আহারের সহিত ধর্ম্মের সম্বন্ধ আছে ;—আহারের অবান্তর প্রয়োজন ধর্ম্মসাধন, মানসিক উৎকর্ষলাভ ও আত্মোন্নতি।

আহারের সহিত আমাদের মানসিক অবস্থার সম্বন্ধ বড় ঘনিষ্ঠ। সাত্ত্বিক আহার করিলে আমাদের মানসিক বৃত্তগুলিও সাত্ত্বিক হইয়া থাকে। পশুপক্ষী-দের মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে সকল পশু পক্ষী নিরামিষাশী, তাহারা কত শান্ত, কত অহিংস্র, কত সমাজপ্রিয়। একমাত্র সাত্ত্বিক আহারই মানবের নৈতিক উন্নতির অনুকূল, সুতরাং শ্রেষ্ঠ আহার। যে আহারে কাম ক্রোধ প্রভৃতি রিপুর অসঙ্গত উদ্রেকের সম্ভাবনা দূর হইয়া যায়, যাহাতে উগ্র ও উদ্ধত স্বভাব শান্ত কোমল ও সর্ব্বজনপ্রিয় হয়, যে আহারে মন চিরনির্ম্মল ও চিরপ্রফুল্ল হয়, এবং মনের আবিলতা ও অবসাদ নষ্ট হয়, সেই আহারই প্রশস্ত। যাহাতে সর্ব্বভূতে সমদর্শিতা ও তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল অনন্ত ও অনাবিল প্রেম ও প্রীতি জন্মে, তাহাই সাত্ত্বিক আহার ; তাহাই আমাদের শাস্ত্রকারগণের পারিভাষিক নিরামিষাহার।

কিন্তু যে একটি বৃত্তি নিরামিষাহারের প্রধান ফল বা মুখ্য কারণ, যে বৃত্তি হৃদয়ে উদিত হইলে সকল শান্ত নৈতিক বৃত্তিগুলি বিকশিত হইয়া থাকে, যাহার নিকট শত বিজ্ঞান শত ইতিহাস শত লোকের অভিজ্ঞতা নগণ্য বলিয়া মনে হয়, যে বৃত্তি পরোক্ষভাবে সকল ধর্ম্মের আশ্রয়, সেই অহিংসাই মানবের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। তাই শাস্ত্র পুনঃপুনঃ শিক্ষা দেন,—"আত্মোদরের জন্য বৃথা হিংসা করিও না, নর-জন্ম কেবল স্বার্থসেবার জন্য নহে।" জীবনের বিশেষ প্রয়োজন ধর্ম্মচর্য্যা। অহিংসা এই ধর্ম্মচর্য্যার অনুকূল,—সুতরাং কায়মনোবাক্যে পালনীয়। তাই সকলতত্ত্ববিদ্‌ ভক্তচূড়ামণি প্রহ্লাদ দৈত্যশিশুগণকে উপদেশ দিয়া বলিয়াছিলেন ;—

"সর্ব্বত্র দৈত্যাঃ সমতামুপেত্য সমত্বমারাধনমচ্যুতস্য।"

প্রাচীন কবি-কাহিনী।

আমাদের আলোচ্য কবির নাম দ্বিজ রঘুনাথ। দুঃখের বিষয়, এই নাম ভিন্ন তাঁহার সম্বন্ধে আর কোনও তথ্যের সংগ্রহ করিতে পারি নাই। বঙ্গীয় প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনা করিতে যাওয়া অন্ধকারে হাতড়াইয়া মরা মাত্র। ইহাঁর সম্বন্ধেও আমরা তাহাই করিতেছি না, কে বলিবে? প্রাচীন বৈষ্ণব সাহিত্যে পদাবলী-লেখক এক 'রঘুনাথ' আছেন। তাঁহার রচিত একটিমাত্র পদ প্রকাশিত আছে।(১) আমরা 'মঙ্গলচণ্ডীর পাঞ্চালী' ও 'সত্যনারায়ণের পাঞ্চালী' নামক যে দুইখানি প্রাচীন পুঁথি পাইয়াছি, তাহাতেও 'দ্বিজ রঘুনাথের' ভণিতা পরিদৃষ্ট হয়। আমাদের আলোচ্য কবি ও এই পাঞ্চালী-লেখক কবি অভিন্ন ব্যক্তি কি না, বলা যায় না। কবি রঘুনাথের কীর্ত্তিস্বরূপ যে পদগুলি প্রকাশিত হইতেছে, তাহা হইতে প্রতিপন্ন হয় যে, তিনি এক জন বৈষ্ণব কবি। উক্ত দুই 'রঘুনাথ'কে অভিন্ন ব্যক্তি অনুমান করিলে এরূপ একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, বৈষ্ণব হইয়া চণ্ডী প্রভৃতির মাহাত্ম্য-জ্ঞাপক কাব্য তিনি লিখিলেন কেন? তদুত্তরে বলা যাইতে পারে, তিনি প্রথমতঃ উক্ত কাব্য দুইখানির রচনা করিয়া লোকের মনস্তুষ্টি ও খ্যাতি অর্জ্জনের প্রয়াস পাইয়াছিলেন, হয় ত পরে বৈষ্ণব হইয়া পদগুলির রচনা করিয়াছিলেন। প্রাচীন সাহিত্যে এরূপ দৃষ্টান্তও বিরল নহে। সুপ্রসিদ্ধ কবি মাধবাচার্য্য সম্বন্ধেও এরূপ উক্তি শুনা যায়। তিনিও বৈষ্ণব হইয়া সাময়িক রুচির খাতিরে চণ্ডীর মাহাত্ম্য-জ্ঞাপক 'চণ্ডীকাব্যের' রচনা করিয়া গিয়াছেন। (২)

আমাদের কবির কোনও বিবরণই যখন পাওয়া গেল না, তখন তাঁহার জন্মস্থান বা জন্মকাল নির্দ্দিষ্ট হইবে কি প্রকারে? তবে, তাঁহার কীর্ত্তিগুলি চট্টগ্রামেই পাওয়া যাইতেছে বলিয়া, তাঁহাকে ঠিক চট্টগ্রামবাসী না বলিলেও, অন্ততঃ পূর্ব্ববঙ্গবাসী বলিবার যথেষ্ট হেতু আছে। স্থূলভাবে আবির্ভাবকালেরও যে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না, এমন নহে। বঙ্গসাহিত্যে বৈষ্ণব-পদাবলী রচিত হইবার দুইটি যুগ আছে;—এক, চৈতন্য দেবের পূর্ব্ববর্ত্তী কাল;

(১) বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ১ম সংস্করণ, ১৫৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।
(২) বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ১ম সংস্করণ, ২২১ পৃষ্ঠা দেখুন।

দ্বিতীয়, তাঁহার সমসাময়িক বা পরবর্ত্তী কাল। যে যুগে বঙ্গীয় কবিকোকিল-কুলের কুহুতানে বঙ্গীয় কাব্যকানন মুখরিত হইয়াছিল, আমাদের এই কবিও সম্ভবতঃ সেই যুগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। চৈতন্য দেবের পরবর্ত্তী কালের কোনও বৈষ্ণব কবিই তাঁহার নামোল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিতেন না।

চট্টগ্রামে প্রাচীন কালে সঙ্গীতের খুব চর্চ্চা ছিল বলিয়া বোধ হয়। এ পর্য্যন্ত আমরা রাগ-তাল-সম্বন্ধীয় অনেকগুলি গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়াছি। এই গ্রন্থগুলির নাম রাগমালা, ধ্যানমালা, রাগনামা, তালনামা, তানমালা ইত্যাদি। এই গ্রন্থগুলির বিশেষ বৃত্তান্ত সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় দৃষ্ট হইবে। এই গ্রন্থগুলিতে রাগ তান সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য নানা কথাই আলোচিত হইয়াছে। প্রত্যেক রাগে গেয় এক একটি প্রাচীন সঙ্গীত বা পদ বিন্যস্ত আছে। পদগুলি বিভিন্ন কবির রচিত। (১) তাঁহাদের মধ্যে অনেক হিন্দু ও মুসলমান নূতন কবি আছেন। অধিকাংশ পদই বৈষ্ণব-লীলাত্মক। এইরূপে, অনেক কবির পদই ধ্বংসমুখ হইতে রক্ষিত হইয়াছে। "মুসলমান বৈষ্ণব কবির" পদগুলি আমরা "বীরভূমি" নামক মাসিকপত্রিকায় প্রকাশ করিতেছি। কবি রঘুনাথের অনেকগুলি পদ পাওয়া গিয়াছে। প্রাচীন হস্তলিপি বড়ই অশুদ্ধিপূর্ণ, এই কারণে অনেকগুলি পদের উদ্ধার করা কঠিন। লিপিকরগণ খামখেয়ালি করিয়া শেষাংশ ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। সে জন্য ও অনেক পদের রচয়িতার নির্দ্দেশ করা যায় না। নিম্নে রঘুনাথের পদগুলি যথাসম্ভব অবিকৃতভাবে প্রকাশ করা যাইতেছে।

রামক্রিয়া।

শ্যাম বন্ধুরে কেমতে পাসরিমো।
হিআর মাঝে তোমারে রাখিমো॥
হাটে ত ন যাম, ঘাটে ত ন যাম,
পানিরে ন যাম লাজে।
তবে ত পাপিষ্ঠ লোকে মোরে কলঙ্কিনী
বোলে॥
তোমার আমার পিরীতিখানি কুমারের
পোঅনি।
বাহিরে লেপনী দিআ অন্তরে আগুনি॥
দ্বিজ রঘুনাথে কহে মনেত ভাবিআ।
আখি ঝরে মন পোড়ে তোমার লাগিআ॥ ১

ভূপালী।

বিধির সনে কথ শত অরি (২) ছিল মোর।
না দেখি মাধব কাল কিবা গোর॥
কি কহল আএ সই ওই কানুর লেহা। (?)
একহি পরাণনিধি ভিন্ন ভিন্ন দেহা॥
দ্বিজ রঘুনাথে কহে শুন ব্রজ নারী।
ললাটের লিখন কিছু বুঝিতে ন পারি॥ ২

* * *

(১) উক্ত পদাবলী-লেখক কবিগণের নামগুলি এই;—শিবচরণ দাস, রামসেবক গোমস্তা, কৃষ্ণদাস, নন্দলাল রায়, জয়রাম দাস, নটবল্লভ, মনোহর, বাসুদেব, গোপীবল্লভ, পাগল শঙ্কর, ভবানন্দ ও নট ঘনশ্যাম। অনেক পদের ভণিতা পাওয়া যায় নাই।

(২) অরি—অরিত্ব, শত্রুতা।

নাথ কি বলিব আমি।
আমার মনের দুঃখ সব জান তুমি॥
বুঝাইলে না বুঝে মন পাপ রসে ধায়।
না জানি অবোধ মন কোন্ খেনে ডুবায়॥
ইষ্ট বল মিত্র বল সমুদের সাথী।
অসম পড়িলে আমার গোবিন্দ সারথি॥
স্ত্রী বল পুত্র বল সব অকারণ॥
সকলি ছাড়িয়া ভজ গোবিন্দ-চরণ॥
দ্বিজ রঘুনাথে কহে এই বার বার।
আর নি ভবের মাঝে জনম আমার॥ ৩

* * *

আমি কাল রূপ হেরিতে করাছি মানা। (১)
সখি বুঝালে মন বুঝে না॥
আমি যখনেতে কাল রূপ হেরেছি।
তখনে নির্ম্মল কুলে কালী দিএছি॥
কলঙ্ক চন্দ্র সখি সর্ব্ব অঙ্গে মাখিবো।
আমি কৃষ্ণ-কলঙ্কী হবো, কাল হেরিবো॥
আমি সদাএ কলঙ্কের অলঙ্কার পরিবো।
আমি আর গুরু জনার ভয় রাখি না।
জটিলা * * শুনিলে ভয় রাখি না॥
কুলমান সকলি কালী দিএছি।
আমি কালা চান্দের দাসী হইআছি॥
মূঢ়মতি ললিতা গো জান না।
রাখাল বলে কালা চান্দকে নিন্দা কর না॥
কালা চান্দকে নিএ সখি হৃদের মাঝে
রাখিবো।
বোলুক বোলুক সকলে কলঙ্কী রাই।
কাল হার পরেছি গলে কিছু ক্ষতি নাই॥
কাল পদে সঁপেছি জীবন যৌবন।
সখি কৃষ্ণ বিনে নাই অন্য মন॥
নিজ নাম লেখো হরি তব চরণে।
রঘু কহে কালাপদে ধনে প্রাণে সঁপিবো॥ ৪

কর্ণাট।

রে কানু রে কানু তোর দোহাই।
একি অপরূপ পেখিলুম রাই॥
পীন পয়োধর দুবলি গাতা। (২)
গিরি উপরে (যেন) কনকলতা॥ (৩)
মুখ মনোহর অধর রঙ্গে।
সুললিত বান্ধুলী কমল সঙ্গে॥
খঞ্জন সাজনী সাজএ আর। (?)
তাহে চাহি চহি নাচএ ময়ুর॥
কহে (দ্বিজ) রঘুনাথে মনের মানস।
ভুবনে তরিতে রহিল আশ॥ ৫

বেলাবলী।

কাহাতে কহিমু সখি মনের বেদনা।
মিলাল রতন বিধি কেনে বিঘঠনা॥ ধু।
আর * * কান্দিআ প্রিয়া গেল পরবাস।
দিনে দিনে ক্ষীণ তনু হইলু নৈরাশ॥
শয়নে না আইসে নিদ্রা রজনী না পোসাএ।
এখলা মন্দিরে ধনী প্রাণি বাহিরাএ॥
আষাঢ়ে বরিখে দেওআ একাক পরবাস।
নব জলধর দেখি লাগিল তরাস॥
খাইতে নাহিক শ্রদ্ধা আখিতে নাহি নিন্দ।
দ্বিজ রঘুনাথে কহে স্মর রে গোবিন্দ॥ ৬

মাধবী।

ওই সে কালিআ বিনোদিআ,
ওই সে কালিআ কানু॥ ধু।
চূড়ার উপরে মালতীর মালা,
তাহে মধুরস পীএ।
অধর রঙ্গিমা, ভুরুর ভঙ্গিমা,
রমণী কেমনে জীএ। (৪)

(১) মানা—মান?

(২) 'ধবল গাতা' পাঠান্তর। দুবলি—দুর্ব্বল?
(৩) 'মেরু উপজল কনকলতা' পাঠান্তর।
(৪) ভুরুর ভঙ্গিমা কুসুম জনু।
কাজল সাজল মদন তনু॥" পাঠান্তর।

শীষের সিন্দুর, নয়ানের কাজল,
সঘনে দোলনি দোলে।
কদম্বতলে শ্যাম চিকনিআ কালা,
ঘিরিয়া রাখিল তোলে॥
হাত রাঙ্গা, পাও রাঙ্গা,
রাঙ্গা কাণের ফুল
ধেনু চরাইতে, বেণু বাজাইতে,
লই গেল জাতির কুল॥
দ্বিজ রঘুনাথে কহে সম্মুখে যমুনা।
মন রাধে তনু কানু না চিন আপনা॥ ৭

আশাবরী।

শ্যামল সুন্দর তনু দেখিলুম স্বপনে।
দেখিআ মোহিত হৈলুম আর না লয়
মনে॥ ধু।
যে বোল সে বোল বন্ধু সে যে দুরাচার।
আপনে সদয় হৈলে সেহ অলঙ্কার॥
বন্ধুআ আসিব করি পাতিআছি কান
(কান্দ)।
অবিরত পোড়ে মন না দেখি নমান॥
কেহ বোলে কালা কানু আমি বোলি শ্যাম।
হৃদেত লিখিআ রাখম্‌ কালার নিজ নাম॥
আমি ভাবি বন্ধু বন্ধু বন্ধে ভাবে ভিন।
বন্ধুরে কি দোষ দিমু আপনার কুদিন॥
দ্বিজ রঘুনাথে কহে বার এইবার।
আর নি মনুষ্যকুলে জনম আমার॥ ৮

বেলোয়ার।

একি অপরূপ হে বনে ত ব্রজরায়।
বাজাএ মোহন বাঁশী সুরভি চরাএ॥ ধু।
খসিল মোহন চূড়া উড়ে মন্দ বায়।
বান্ধিতে উন্ধিতে চূড়া ধবলী চলি যায়॥
রহ রহ ধবলী শাঙলী বলি ধাএ।
নীলগিরি পাছে করি চান্দ চলি যাএ॥
ঘামে তিতিল তনু মন্দ মন্দ ঝরে।
মরকত মণি জিনি মুকুতা উদগারে॥
শ্যামল সুন্দর তনু ধুলাএ ধূসর। (১)
আড়ে আবরিল চান্দ নব জলধর॥
দ্বিজ রঘুনাথে কহে জগতভিখারী।
ললাটের লেখা কেহ খণ্ডাইতে না পারি॥ ৯

মালব।

হরি মাধব রায়।
সতত মিনতি তুআ পায়॥ ধু।
কি মোর গৃহের কাজে, বসতি সমুদ্র মাঝে,
তরঙ্গ গণিতে দিন যায়॥
জানিআ না কর দয়া, সকলি কপট মায়া,
দীনবন্ধু লিএ তোমাএ।
তোমার কৃপার ফলে, এথ দিন আছিলুম ভালে
এবে গতি কি হউক আমাএ॥
হরি পতি হরি গতি, হরি সে নয়ানের জ্যোতি,
হরি বিনে নাহিক উপায়।
দ্বিজ রঘুনাথে কয়, এইবার উদ্ধার মোর,
ছায়া দিআ রাখ রাঙ্গা পাএ॥ ১০

ধানশী।

বন্ধের ভাবে জাগিতে চাপিল কাল ঘুমে।
(শ্যামরূপ লাগিআছে মরমে)॥ ধু।
ধরিআ মোহন বেশ, মন্দিরে কানু পরবেশ,
বিনোদিনী শুইআছে সিংহাসনে।
ঘুমের আলসে রাই, নিদ্রাতে চৈতন্য নাই,
কোরে কানু রাধা নাহি জাগে॥
অধরে অধর দিআ, শ্রুতিমুলে কথা কহিয়া
কহিল গা তোল ধনী রাই।
অঙ্গের সৌরভ পাইআ, গাওখানি মোড়াম দিআ,
উঠে রাধা চান্দমুখ চাহি॥
নিদের আলস মুছি, প্রেমভাবে উঠি বসি,
বৈস রাধে কানুর নিকটে।
সুন্দর সুরব (?) তুমি, এ চান্দ বদন আমি,
রূপে গুণে কেহ নাহি টুটে॥

---

(১) "শ্যামল সুন্দর তনু রূপে মনোহর।
ভাবে আবেশ তনু ধুলাএ ধূসর॥"—পাঠান্তর।

যখনে আছিলাম ঘরে, দূতীএ পাঠাইল মোরে, দূতীর চাতুরী কথা, শুনি বৃকভানু-সুতা,
প্রেম রসে পাতিআছে কান্দ। মুখেতে বসন দিআ হাসে।
কেমন সন্ধান করি, প্রাণ মোর নিল হরি, দ্বিজ রঘুনাথ-বাণী, শুন রাধে ঠাকুরাণী,
হাতে দিআ গগনের চান্দ॥ তুআ পাশে বন্ধের বিলাসে॥ ১১

হস্তলিপির পাঠ অবিশুদ্ধ, সেই জন্য অনেক পদের অর্থবোধে গোলযোগ হইবার সম্ভাবনা।

আমরা কবিতাগুলির গুণাগুণ সম্বন্ধে কোনও কথা বলিব না। সত্যোদ্ধারের জন্য প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনার যতটা আবশ্যকতা আছে, সৌন্দর্য্যপ্রদর্শনের জন্য তাহার ততটা আবশ্যকতা আছে বলিয়া মনে করি না। বিশেষতঃ, কবিতার সৌন্দর্য্য লিখিয়া বুঝাইবার নহে—নিজেই উপভোগ করিবার জিনিস। তবে আমাদের আশা আছে, এই পদগুলি পাঠ করিয়া পাঠকগণ আনন্দলাভে কখনই বঞ্চিত হইবেন না।

শ্রীআবদুল করিম।

আকবর শাহ।*

হুমায়ূনের মৃত্যুকালে আকবর রাজধানীতে উপস্থিত ছিলেন না; পঞ্জাবে সেকন্দর শাহের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন।

এই সময় তারদি বেগ নামক জনৈক সেনাপতি দিল্লীর শাসনকর্ত্তার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি বাদ্‌শাহের মৃত্যু-সংবাদ গুপ্ত রাখিয়া আকবরের অভিষেকের

* 1. Malleson's Akbar.
2. Elphinstone's History of India.
3. Oriental Annuals.
4. Keen's the Turks in India.
5. Dow's History of Hindostan, Vol. II.
6. Elliot's History of India, Vols. V and VI.
7. Todd's Rajstan.
8. Wheeler's History of India.
9. ঐতিহাসিক-চিত্র, ১ম বর্ষ।
10. সাধনা, ৩য় বর্ষ।
11. Ain-i-Akbari—(Gladwin's Translation.)
12. Munta Khabu-l-Lubab. (Persian Text; Published by the Asiatic Society of Bengal).

সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন করিলেন। আকবরের নিকট এই দুঃসংবাদ পঁহুছিলে, সমবেত আমীর ওমরাহগণ পরলোকগত সম্রাটের জন্য গভীর শোক প্রকাশ করিয়া একবাক্যে তাঁহাকে পিতৃসিংহাসনে অভিষিক্ত করিলেন। সচিবশ্রেষ্ঠ বৈরাম খাঁকে নবাভিষিক্ত অপ্রাপ্তবয়স্ক সম্রাটের অভিভাবকের পদে নিযুক্ত করিয়া তাঁহার হস্তে শাসনসংক্রান্ত যাবতীয় ক্ষমতা প্রদত্ত হইল।

কিন্তু দিল্লীর সিংহাসনের চতুষ্পার্শে তখন প্রবল ঝঞ্ঝা। প্রত্যেক মূহুর্ত্তেই আশঙ্কা হইতেছিল যে, এই প্রবল বাত্যায় ত্রয়োদশবর্ষবয়স্ক নবীন সম্রাটের মস্তক হইতে রাজ-মুকুট খসিয়া পড়িবে। রাজবিপ্লবে শাসনশৃঙ্খলার মূল শিথিল হইয়া পড়াতে কাবুলরাজ্যে বিদ্রোহানল প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল। সেকন্দর শাহ হস্তচ্যুত সাম্রাজ্যের উদ্ধারার্থ পঞ্জাবে আকবরের সঙ্গে বিগ্রহে নিযুক্ত ছিলেন। এক্ষণে হুমায়ূনের মৃত্যুসংবাদ শ্রবণ করিয়া নবোৎসাহে রণাঙ্গণে মোগলের শক্তিপরীক্ষা করিবার সঙ্কল্প করিলেন। বৈরাম খাঁর সাহায্যে আকবর যোগ্যতাসহকারে এই সকল শত্রুর দমন করিতে লাগিলেন। কিন্তু শত্রুকুল নির্ম্মূল করিবার পূর্ব্বেই আর এক জন পরাক্রান্ত শত্রু মোগল সাম্রাজ্য গ্রাস করিবার জন্য রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইলেন। মহম্মদ আদিলের সেনাপতি হিমু মোগলশক্তি পর্য্যুদস্ত করিবার জন্য আয়োজন সমাপ্ত করিয়া, ত্রিশ সহস্র রণনিপুণ সৈন্য সমভিব্যাহারে দিল্লীর অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পথিমধ্যে আগ্রা হস্তগত করিয়া অবিলম্বে রাজধানীর দ্বারদেশে উপনীত হইলেন। নগররক্ষক তারদি বেগের অবহেলা ও হঠকারিতায় হিমু নগররক্ষী মোগল সৈন্য-বৃন্দকে সহজে পরাজিত করিয়া দিল্লী অধিকার করিয়া নিজে মহারাজাধিরাজ বিক্রমাদিত্য উপাধি গ্রহণ করিলেন। শত্রু কর্ত্তৃক দিল্লী অধিকৃত হইবার সংবাদ যে সময় আকবরের নিকট পঁহুছিল, তখন অধিকাংশ প্রদেশই তাঁহার হস্তচ্যুত হইয়াছিল; কেবলমাত্র পঞ্চনদপ্রবাহবিধৌত ভূমির কিয়দংশে তাঁহার আধিপত্য অব্যাহত ছিল।

আকবর হিমুর বিজয়বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া কিংকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিবার জন্য মন্ত্রিসভা আহ্বান করিলেন। সমবেত ওমরাহগণ তাঁহাকে ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া কাবুলে পলায়ন করিবার পরামর্শ দিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "শত্রুর সৈন্যসংখ্যা লক্ষাধিক, কিন্তু তাহার গতিরোধের জন্য আমরা কেবলমাত্র বিংশতি সহস্র সৈন্য নিযুক্ত করিতে পারিব। এরূপ অবস্থায় আমাদের কাবুলে গমন করাই কর্ত্তব্য। আমরা এই অল্পসংখ্যক সৈন্যের সাহায্যেই কাবুল সংরক্ষণ

করিতে পারিব। তার পর সুযোগ উপস্থিত হইলে পুনর্ব্বার ভারতবর্ষ আক্রমণ করা সহজসাধ্য হইবে।" একমাত্র বৈরাম খাঁ এই মতের প্রতিবাদ করিয়া শত্রুর বলপরীক্ষা করিবার নিমিত্ত অগৌণে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়াই কর্ত্তব্য বলিয়া মত প্রকাশ করিলেন। বালক হইলেও আকবর বৈরামের এই পরামর্শ যুক্তিসিদ্ধ বোধ করিলেন। তিনি এমন ভাবে তদীয় মতের সমর্থন করিলেন যে, সমবেত সভ্য-মণ্ডলী তাহাতে মুগ্ধ হইয়া রাজকার্য্যে ধনপ্রাণ উৎসর্গ করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। আকবর বৈরাম খাঁকে খানবাবা উপাধি প্রদান করিয়া তাঁহারই হস্তে সমস্ত বন্দোবস্তের ভার অর্পণ করিলেন। বৈরামও তাঁহার পরিতোষের জন্য স্বীয় পুত্রের মস্তক স্পর্শ করিয়া পরলোকগত সম্রাটের প্রেতাত্মার নামে শপথ করিলেন যে, তিনি কখনও বিশ্বাসঘাতকতা করিবেন না।

ওমরাহগণ আকবরের বাক্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার কার্য্যে ধনপ্রাণ সমর্পণ করিবার সঙ্কল্প করিলেন। এমন সময় এরূপ একটি ঘটনা সংঘটিত হইল যে, তাহাতে ওমরাহগণ বুঝিতে পারিলেন, রাজাজ্ঞা-প্রতিপালন ব্যতীত তাঁহাদের আর গত্যন্তর নাই। সুতরাং ভয় ও মৈত্রীর প্রভাবে তাঁহারা সম্রাটের সঙ্গে দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ হইলেন। আমরা সেই ঘটনাটির এখানে বর্ণনা করিতেছি। হিমু কর্ত্তৃক দিল্লী অধিকৃত হইবার সময় তারদি বেগ খাঁ দিল্লীর শাসনকর্ত্তৃপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার হঠকারিতাতেই দিল্লী নগর অধিকার করা শত্রুর পক্ষে সহজসাধ্য হইয়াছিল। বৈরাম খাঁ ও তারদী বেগের মধ্যে সদ্ভাব ছিল না। ধর্ম্মবিষয়ক মতানৈক্য নিবন্ধন তাঁহারা পরস্পরের শত্রু হইয়া উঠিয়াছিলেন। দিল্লী শত্রুহস্তে পতিত হইলে তারদি বেগ পঞ্জাবে আকবরের শিবিরে আগমন করেন। বৈরাম খাঁ পূর্ব্বোক্ত অপরাধে তাঁহাকে বিনাশ করিতে কৃতসঙ্কল্প হন। একদা আকবর ক্রীড়া উপলক্ষে শিবির হইতে বহির্গমন করিলে সেনাপতি তাঁহার চিরশত্রুর শিরশ্ছেদন করেন। যদিও বৈরাম খাঁর এই আচরণ একান্ত কঠোর ও নৃশংস বলিয়াই চিরকাল নিন্দিত হইবে, তথাপি ইহা সেই বিপদসঙ্কুল সময়ে সেনানায়কদিগকে কর্ত্তব্যসাধনে বহুলপরিমাণে উন্মুখ করিয়াছিল, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। (১)

(১) বদায়ুনি প্রভৃতি ইতিহাসবেত্তৃগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, আকবর এই *হত্যাপরাধে সংলিপ্ত ছিলেন। তারদি বেগের স্বভাব একান্ত চঞ্চল ছিল। তিনি কখনও বা হুমায়ুনের পক্ষ অবলম্বন করিতেন, কখনও বা তাঁহার ভ্রাতৃগণের সঙ্গে যোগ দিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে সঙ্কুচিত হইতেন না। হুমায়ুনের মৃত্যুকালে তিনি তাঁহার পক্ষাবলম্বী ছিলেন।

হিমু দিল্লীবিজয় সম্পন্ন করিয়া পাণিপথের বিশাল প্রান্তরে সসৈন্যে সমবেত হন। এই স্থানে তাঁহার সৈন্যের সহিত মোগলের যুদ্ধ উপস্থিত হইল। মোগল সামন্তগণ রাজকার্য্যে শৈথিল্য প্রদর্শন করিলে তারদী বেগের দশা প্রাপ্ত হইবেন বলিয়াই হউক, অথবা মহদুদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হইয়াই হউক, প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। হিমু রণনিপুণ হস্তীর সাহায্যেই সংগ্রামক্ষেত্রে জয়লাভ করিবার আশা করিয়াছিলেন। কিন্তু শত্রুসৈন্যের মধ্যভাগে উপনীত হইবামাত্র প্রতিপক্ষের অস্ত্রনিক্ষেপে জর্জ্জরিত হইয়া হস্তীগুলি ক্ষেপিয়া উঠিল, এবং মাহুতের অনুজ্ঞা অগ্রাহ্য করিয়া পশ্চাৎগামী হইল। ইহাতে হিমুর সৈন্য ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। তথাপি হিমু ভগ্নহৃদয় না হইয়া চারি সহস্র সৈন্য সহ বিপুলবিক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অবশেষে শত্রুর হস্তনিক্ষিপ্ত শরে তাঁহার এক চক্ষু বিদ্ধ হইল। তদীয় সৈন্যগণ এই আঘাতে হিমুর মৃত্যু অবধারিত বিবেচনা করিয়া ভয়ব্যাকুলচিত্তে পলায়ন করিল। কিন্তু বীরশ্রেষ্ঠ হিমু তীর সহ চক্ষু উৎপাটিত করিয়া ফেলিলেন, এবং তাদৃশ শোচনীয় অবস্থাতেও কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া অসাধারণ বীরত্ব ও একাগ্রতাসহকারে শত্রুবিনাশে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি বিপুল বিক্রম প্রদর্শন করিয়া সৈন্যকে উত্তেজিত করিয়া তুলিলেন, এবং কৃপাণহস্তে পথ পরিষ্কার করিয়া ক্রমশঃ শত্রুসৈন্য মথন করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এমন সময় কুলী নামক এক জন মোগল সেনানায়ক হিমুর হস্তি-চালকের প্রাণনাশ করিবার জন্য বর্ষা উত্তোলন করিলেন; মৃত্যুভয়ব্যাকুল মাহুত আত্মজীবনরক্ষার জন্য হিমুকে দেখাইয়া দিল। কুলী তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে অশ্বারোহী সৈন্য দ্বারা বেষ্টন করিয়া বন্দী করিলেন। বিজয়শ্রী মোগলের অঙ্কশায়িনী হইলেন।

এ সময় আকবর রাজধানীতে উপস্থিত ছিলেন না, কিন্তু তাঁহার পিতৃব্যপুত্র তথায় ছিলেন। এ অবস্থায় একমাত্র তারদি বেগের কৌশলেই আকবর বিনা বিঘ্নে পিতৃসিংহাসন অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। আবুল ফজল নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, এরূপ ব্যক্তির হত্যাকার্য্যে যে আকবরের ন্যায় মহানুভব সম্রাট সংলিপ্ত ছিলেন, তাহা সম্ভবপর নহে। সুবিখ্যাত ইতিহাসবেত্তা মহম্মদ কাসিম ফেরিস্তা নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, বৈরাম খাঁ এ বিষয়ে সম্রাটের অনুমতি গ্রহণ করেন নাই। তিনি শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে সেনাপতি বলেন, 'জাঁহাপনা, আমি আপনার বিনা অনুমতিতেই তারদি বেগকে বধ করিয়াছি; জাঁহাপনা বড় দয়ালু, আপনি নিশ্চয়ই তাঁহাকে ক্ষমা করিতেন। কিন্তু এই বিপদ-সঙ্কুল সময়ে কেহ রাজকার্য্যে অবহেলা করিলে সৈন্যমধ্যে শৃঙ্খলা-রক্ষার জন্য তাঁহাকে রাজদ্রোহীর ন্যায় কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত করা কর্ত্তব্য।' আকবর এইরূপ কঠোর শাস্তির ঔচিত্য অনুভব করেন, কিন্তু উহার অমানুষিকতায় শিহরিয়া উঠেন।

মোগল সৈন্য হিমুকে বন্দী করিয়া আকবরের শিবিরে আনয়ন করিল। তখন হিমুর অবস্থা একান্ত শোচনীয়। আহত অঙ্গ হইতে অবিশ্রান্ত রক্তস্রাবহেতু তাঁহার মৃত্যু আসন্ন হইয়াছিল। আকবর বিজিত কাফেরকে স্বহস্তে বধ করিয়া পুণ্যসঞ্চয় করিবার জন্য বৈরাম খাঁ কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইলেন। কিন্তু তিনি শিক্ষকের উপদেশমত তরবারি কোষোন্মুক্ত করিয়া তদ্দ্বারা হিমুর মস্তক স্পর্শ করিয়া বাষ্পাকুললোচনে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। বৈরাম খাঁ রোষকষায়িতনেত্রে আকবরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন যে, অসময়ে দয়া-প্রকাশই তাঁহার বংশের সমস্ত বিপদের মূল কারণ। তাহার পর তিনি স্বয়ং বিজিত বীরপুরুষের শিরশ্ছেদন করিলেন। হিমুর মস্তক কাবুলে ও তাঁহার দেহ দিল্লীর দ্বারদেশে সংস্থাপিত করিবার জন্য প্রেরিত হইল।

পাণিপথের যুদ্ধের অত্যল্পকাল পরেই কাবুল বিদ্রোহের শান্তি হইল, এবং সেকন্দর শাহের বিষদন্ত সমূলে উৎপাটিত হইল। আকবর বৈরাম খাঁর সাহায্যে শত্রুরক্তে পৃথিবী রঞ্জিত করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে নিরাপদ হইলেন।

যে মোগল সাম্রাজ্য উত্তরকালে বিশালতা, ধনগৌরব ও সামরিক বলে এসিয়াখণ্ডের অন্যান্য সাম্রাজ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতা লাভ করে, যাহার গৌরব-রবি প্রাচ্য আকাশ আলোকিত করিয়া সমগ্র জগতে বিকীর্ণ হইয়া পড়ে, যাহার ঐশ্বর্য্যের স্বপ্নকাহিনীতে প্রলুব্ধ হইয়া বৈদেশিক বণিকসম্প্রদায় দলে দলে ভারতবর্ষে আগমন করে, এবং যাহার সুস্নিগ্ধ শ্যামল ছায়াতলে ভারতবাসী বহুদিন সুখে কালযাপন করিয়াছিল, তাহা এই ভাবে সূচিত হয়। সূচনাকালে ইহার অবস্থা কিরূপ ছিল, আমরা প্রথমতঃ সংক্ষেপে তাহার বর্ণনা করিব; তাহার পর আকবর কোন সাধনায় তাদৃশ সাফল্যলাভ করিতে সমর্থ হন, তাহা বিবৃত করিতে প্রবৃত্ত হইব। "ভারতের সিংহাসন মোগল পাঠানের পক্ষে এক প্রকার অভিশপ্ত, কেহ কখনও অবিচ্ছিন্নভাবে বংশানুক্রমে বহুদিন বহুযুগ ধরিয়া ইহার উপর বিরাজ করিতে পারে নাই। প্রথম মুসলমান আক্রমণ হইতে বর্ত্তমান যুগ পর্য্যন্ত এ বিষয়ের জাজ্জ্বল্যমান সাক্ষিস্বরূপে ইতিহাস আমাদের সম্মুখে বর্ত্তমান। দাসবংশ গেল, খিলিজি গেল, ঘোরলোদি গেল, পাঠানাধিকারের অস্তিত্ব লোপ হইল। শোণিতরেখা তীরে রাখিয়া ভিন্ন ভিন্ন মহাপ্লাবনের প্রচণ্ড স্রোতগুলি যে কোথায় অন্তর্হিত হইল, তাহা কেহ বলিতে পারে না। আবার নূতন কূলপ্লাবী তরঙ্গ উঠিল। চাঘটাই সমরখন্দের অনুর্ব্বর প্রান্তর পরিত্যাগ করিয়া কৃপাণহস্তে ফলশস্য-ধন রত্ন পূর্ণ কুবেরের লীলাক্ষেত্র প্রকৃতির প্রমোদকানন হিন্দুস্থানে পদার্পণ

করিল। চাঘটাই মোগল বাবর শাহ পাঠানবংশের অস্তিত্ব লোপ করিয়া আবার অভিশপ্ত সিংহাসনে আসন বিছাইলেন। বাবর গেলেন, হুমায়ূন আসিলেন। আবার সের শাহ প্রবল ঝঞ্ঝা উঠাইলেন। আবার অভিশপ্ত সিংহাসনের আস্তরণ খসিয়া পড়িল; ভারতে মোগলের শক্তিবিকাশের শেষচ্ছটা পর্য্যন্ত মলিন হইয়া আসিল; সে মলিনতা যে ইহজন্মে ঘুচিবে, তাহারও কোন সম্ভাবনা দেখা গেল না।" (১)

মোগলশক্তি বিধ্বস্ত করিয়া সের শাহ আফগান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিলেন। হুমায়ূন অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া ভারতবর্ষ হইতে নির্ব্বাসিত হইলেন। কিন্তু সেরের উত্তরাধিকারিগণের অবিমৃষ্যকারিতায় হিন্দুস্থান তাঁহাদের হস্ত হইতে স্খলিত হইল। হুমায়ুন পুনর্ব্বার দিল্লীর সিংহাসন কাড়িয়া লইলেন। তাহার পর দুই দিন অতিবাহিত হইতে না হইতেই তিনি অকস্মাৎ কালগ্রাসে পতিত হইলেন; হিন্দুস্থানের রাজনৈতিক আকাশ মেঘের ঘোর ঘটায় আচ্ছন্ন হইল। এমন সময়ে কিশোরবয়স্ক আকবর কার্য্যক্ষেত্রে পদার্পণ করিলেন।

আকবর শাহের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে ভারতবর্ষের কোন মোসলমান বংশের রাজত্বই সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ছিল না। কিন্তু তৈমুর বংশের প্রতিষ্ঠিত রাজত্বই সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ব্বল ও নিরবলম্ব ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। গজনি ও ঘোরবংশীয় নৃপতিগণের স্বদেশ বিজিত রাজ্যের সংলগ্ন ছিল বলিয়া তাঁহারা বিপৎকালে স্বদেশ হইতে সাহায্য লাভ করিতেন। অন্যান্যবংশীয় অধিপতিগণের রাজত্বকালেও তাঁহাদের স্বদেশীয় বীরগণ দলে দলে ভারতবর্ষে ভাগ্য-পরীক্ষার্থ আগমন করিতেন বলিয়া তাঁহারাও সর্ব্বদা জনবলে বলীয়ান্ থাকিতেন। বাবর বাদশাহ স্বদেশ হইতে তাড়িত হইয়া ভারত সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি কাবুল দেশে আধিপত্য সংস্থাপন করিয়া অধিবাসিগণের হৃদয় আকৃষ্ট করিয়া তাহাদের স্বদেশিরূপে কিয়ৎপরিমাণে গৃহীত হইয়াছিলেন, কিন্তু কামরাণের অধীনে এ দেশ হিন্দুস্থান হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়াতে আকবরের রাজ্যলাভকালে রাজ্যের বীরবহুল অংশ তাঁহার প্রতিপক্ষ ছিল। আফগানবহুল ভারতীয় মোসলমানসমাজও কিশোরবয়স্ক মোগলবংশোদ্ভব সম্রাটের শত্রু বলিয়া পরিগণিত ছিল। ভারতবর্ষের প্রকৃতিপুঞ্জও মোগল রাজ্যের হিতাকাঙ্ক্ষী ছিল না। বাবর বাদশাহ ভারতবর্ষে সিংহাসন পাতিবার পর সর্ব্বদা সন্ধি বিগ্রহেই নিরত ছিলেন; প্রকৃতিপুঞ্জের মঙ্গলার্থ কোন বিধি ব্যবস্থা প্রচলিত করিয়া তাহাদের হৃদয় অধিকার

---

(১) ঐতিহাসিক চিত্র, ১ম সংখ্যা, [illegible]

করিতে পারেন নাই। তদীয় পুত্র হুমায়ুনও শাসনসৌকর্য্যার্থ কোন অভিনব-প্রথার উদ্ভাবন করিয়া প্রজাসাধারণের প্রীতি আকর্ষণ করিতে পারেন নাই; তাঁহার শাসন-কালেও শাসনযন্ত্র ভারতবাসীদিগকে পূর্ব্ববৎ পিষ্ট করিয়াছিল। ভারতবাসী মোগল সাম্রাজ্যের অস্তিত্বের সঙ্গে আপনাদের সুখ দুঃখ জড়িত নহে, এইরূপ বিবেচনা করিত। এ জন্য তাহারা উহার স্থায়িত্ব অথবা বিলোপ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল। ভারতবর্ষের বহির্ভাগেও কোন শক্তিশালী জাতি আকবরের সঙ্গে ঐক্য-সূত্রে আবদ্ধ ছিল না; অথবা ভারতবর্ষের অভ্যন্তরেও প্রকৃতিপুঞ্জ তাঁহার বংশের প্রতি অনুরাগী ছিল না। কেবলমাত্র মধ্য এসিয়ার বিভিন্ন দেশের লুণ্ঠনলোলুপ অস্ত্রব্যবসায়িগণ তাঁহার সহগামী ছিল। সম্রাট নিজে কিশোরবয়স্ক, এবং তাঁহার সৈন্যদল আত্মপরায়ণ সৈন্যে পরিপূর্ণ ছিল; এরূপ অবস্থায় রাজ্যের স্থায়িত্বের আশা সুদূরপরাহত হইবে, তাহা বিচিত্র কি? ইহাতেই মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিকূল অবস্থার অবসান নহে। আকবরের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে বহুসংখ্যক মোসলমান রাজবংশের বিলোপ হইয়াছিল; এই সকল বংশের যথার্থ ও প্রতারক উভয়বিধ উত্তরাধিকারিগণে সমগ্র দেশ পরিপূর্ণ ছিল। তাঁহাদের মধ্যে কেহ শক্তিশালী হইয়া উঠিলেই রাজ্যাকাঙ্ক্ষায় কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করিতেন, এবং বহু-সংখ্যক লুণ্ঠনপ্রয়াসী সৈন্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার পতাকামূলে আসিয়া দণ্ডায়-মান হইত। এই সব কারণে সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ম্যালিসন সাহেব নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, "Panipat had given Akbar India,—an empire with-out a root in the soil liable to be overthrown by the first strong gust."

তাদৃশ নিরবলম্ব দুর্ব্বল সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ববিধানই আকবরের সর্ব্বপ্রধান কার্য্য ছিল। বিধাতৃপুরুষও তাঁহাকে এই গুরুতর কার্য্যসম্পাদনের উপযোগী নানাবিধ সৎগুণে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

ক্রমশঃ।

গৌরাঙ্গের মন্ত্রদীক্ষা।

এই পৃথিবীতে যদি স্বর্গের কোনও পদার্থ থাকে, তবে প্রেমই সেই পদার্থ। প্রেমের আচার বড় বিচিত্র। এবং ইহার আধ্যাত্মতত্ত্ব অতীব অগাধ। ইহা

হৃদয়ের একটি স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম, এবং ঈশ্বরের রচিত সংসার এরূপে গঠিত হইয়াছে যে, তাহাতে এই স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্মের উদ্রেকসাধন হইয়া থাকে। আমরা সর্ব্বপ্রথমে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধুর আকৃতিতে মুগ্ধ হই, এবং প্রকৃতি দেবীকে সর্ব্বান্তঃকরণে ভালবাসিয়া ফেলি। তরু লতা, পুষ্প ফল, জল বায়ু, চন্দ্র সূর্য্য, দ্যুলোক ও ভূলোক আমাদের হৃদয়ের সিংহাসন অধিকার করিয়া বসে, এবং আমরাও আমাদের হৃদয়ের ভালবাসা প্রকৃতি দেবীর চরণে উপহার দিয়া একবারে তাঁহার নিকট আত্মবিক্রয় করিয়া বসি। প্রেমের স্বভাবই এই যে, ইহা প্রীতির বস্তুর নিকট আত্মসমর্পণ করে। লাবণ্যময়ী প্রকৃতিদেবী আমাদের বাহ্য প্রেমের পাত্রী, এবং সেই প্রেম আজীবনস্থায়ী। মৃত্যু আমাদের পক্ষে প্রধানতঃ এই কারণে যন্ত্রণাময় যে, আমরা এই মধুর প্রকৃতির ছবি আর দেখিতে পাইব না। বয়োবৃদ্ধিসহকারে প্রকৃতিকে বড়ই নির্দ্দয় ও কঠিনহৃদয় বলিয়া দেখি, কিন্তু তাহাতে কি ? তিনি কঠিনা হইলেও সুন্দরী ; লাবণ্যদাস মানব-হৃদয় ভাবে, ইনি আমাকে ভালবাসুন বা না বাসুন, আমি ইঁহাকে ভালবাসিতে ছাড়িব না। নবজাত শিশু যখন পিতা মাতা আত্মীয় স্বজন কিছুই বুঝে না, তখনও প্রকৃতির প্রেমিক হইয়া পড়ে। পরে যখন পিতামাতার স্নেহের পরিচয় পায়, তখন আর এক ভাবের বিচিত্র প্রেমের বিকাশ হইয়া থাকে। নিজের ন্যায় সজীব চৈতন্যময় সুখদুঃখের তন্ত্রীসমন্বিত হৃদয়যন্ত্র অন্যত্র বাজিতেছে দেখিয়া এক অদ্ভুত অধ্যাত্মলাবণ্যের আস্বাদ গ্রহণ করে। সেই যন্ত্রের বাৎসল্য-সঙ্গীতের তালে বালহৃদয়ে পিতৃস্নেহ মাতৃস্নেহের ঝঙ্কার সমুত্থিত হইতে থাকে। ক্রমশঃ ভাই ভগিনী, প্রতিবেশিবর্গ, সহাধ্যায়িবর্গ, বন্ধুবর্গ ইত্যাদি ক্রমে প্রেমপাত্রের সংখ্যা বর্দ্ধিত হইতে থাকে। নরনারীকে অতিক্রম করিয়া পশুপক্ষীও আমাদের প্রেম আকর্ষণ করে, এবং ভালবাসার সুরে হৃদয়মন্দির পরিপূর্ণ হইয়া যায়। ঈদৃশ অবস্থায় দাম্পত্য সম্বন্ধ সংঘটিত হইলে, সেই সঙ্গীতে নূতন স্বর সংযুক্ত হইয়া, তাহাকে শতগুণ মধুর করিয়া তুলে। অবশেষে যখন জায়াপতির শরীর হইতে চৈতন্যময় ও লাবণ্যময় নূতন জীবের আবির্ভাব হইতে আরম্ভ হয়, তখন আমাদের পার্থিব প্রেমের মহোৎসব পূর্ণমাত্রায় উপনীত হয়। নিঃস্বার্থ বিমিশ্র প্রেম কি, পিতামাতা তাহা অনুভব করিয়া মুগ্ধ হইয়া যান। সংসারকে পরমেশ্বর এইরূপে "প্রেম"-শিক্ষার বিদ্যালয়স্বরূপ করিয়া গঠন করিয়াছেন।

ক্রমে আমরা জরাজীর্ণ হইতে থাকি। প্রেমপাত্রগণকে ক্রমে ক্রমে অন্তর্ধান করিতে দেখি। তখন সুখের সঙ্গীতের মধ্যে বিষাদের সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হয়।

হৃদয় গভীর চিন্তায় আলোড়িত হয়। বহির্দ্দেশে চক্ষু আর তত ধাবিত হয় না,—হৃদয়ের মধ্যে যেন এক নব চক্ষুর আবির্ভাব হয়। স্বপ্নেও যাহা ভাবা যায় নাই, এমন সব কথা দিন দিন মনোমধ্যে আবির্ভূত হইতে থাকে; সংসারের আবরণ ভেদ করিয়া আমরা অনন্তের বিশাল আকৃতি যেন কিছু কিছু দেখিতে পাইতেছি বলিয়া বোধ হয়। সে এক অনির্ব্বচনীয় দৃশ্য। এমন এক বস্তুর সত্তা আমরা অনুভব করি, যাহার বিশালতার ইয়ত্তা করা অসাধ্য; যাহা দেশকালের সীমা ছাড়াইয়া চারি দিক ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে, বোধ হয়। তাহা জীবন ও মরণের নিয়ামক, এবং যুগপৎ ভীষণ ও মোহন। আমরা সেই অনন্ত পদার্থের ছায়া দেখিয়া একবারে বিস্ময়, ভয় ও আনন্দে আপ্লুত হইয়া পড়ি। তাঁহাকে সম্যক্ দেখিতে পাই না, কিন্তু ঐ যেন রহিয়াছেন বলিয়া বেশ বিবেচনা হয়। বর্ণনা করিতে পারি না, তবু যেন দেখিতেছি বলিয়া মনে হয়।

এই অনির্ব্বচনীয় সত্তাকে আমরা ইহলোক ও পরলোকের অধিপতি বলিয়া ক্রমশঃ ধারণা করি;—এবং তাঁহার প্রতি আমাদের যে মিশ্রভাবের উৎপত্তি হয়, তাহার নাম "ভক্তি"। বিস্ময়, ভয় ও প্রেম, সেই মিশ্রভাবের তিনটি প্রধান অঙ্গ। তাঁহার দুর্ব্বোধ প্রকৃতি বিস্ময় রসের উদ্দীপন করে; তাঁহার কঠিন নিয়মে ভয় জন্মে; আবার তাহার সঙ্গে সঙ্গে তিনি যে এই বিশ্বসংসারের অদ্ভুত লাবণ্যের আধার, তাহা চিন্তা করিয়া তৎপ্রতি প্রেমের সঞ্চার হয়। ঈদৃশ ভক্তিরসের উদ্রেক হইলে মনুষ্যের চরিত্রগঠন সম্পূর্ণ হয়। মনুষ্য তখন আপনাকে ক্ষুদ্র ও বিচ্ছিন্ন জীবনের সীমাতে আবদ্ধ না দেখিয়া এক অনন্ত জীবনের স্রোতে ভাসমান বলিয়া উপলব্ধি করে। হৃদয় সঙ্কীর্ণভাব পরিত্যাগ করিয়া বিশাল হয়। যাহাদিগকে হারাইয়াছিলাম বলিয়া বোধ হইয়াছিল, তাহাদিগকে আবার দেখিব বলিয়া আশা জন্মে। যাহা ছায়াবাজী বলিয়া মনে হইতেছিল, তাহার পশ্চাদ্ভাগে অনন্তকালস্থায়ী মাধুর্য্যব্যঞ্জক প্রাকৃতিক সত্তার উপলব্ধি হয়, এবং তৎসম্পর্কে আমাদের নূতন জীবনের আশার সঞ্চার হয়। সর্ব্বোপরি যে অনির্ব্বচনীয় ঐশী শক্তি সেই জীবনের উৎস, তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় প্রেমের সঞ্চার হয়।

এই প্রবন্ধে "শক্তি" শব্দ যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা বলা আবশ্যক। ইংরেজীতে যাহাকে Force এবং Energy বলে, অস্মদ্দেশীয় পদার্থবিদ্যায় তাহা "বল" ও "শক্তি" বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। এই শক্তি ভৌতিক শক্তি, সংক্ষেপে শক্তি বলিয়াই কথিত হইবে। তদ্ভিন্ন মানবাত্মার যে সকল ক্ষমতা বা সামর্থ্য আছে, তাহাও সচরাচর শক্তি শব্দে উল্লিখিত হয়। অর্থ বিশদ করিবার অভিপ্রায়ে

তাহা "চিৎশক্তি" বলিয়া কথিত হইবে। তদ্ভিন্ন ভৌতিক শক্তি ও চিৎশক্তিকে ঈশ্বরের যে সকল ক্ষমতার অধীন বলিয়া বিবেচনা করা যায়, তাহা পৃথক বলিয়া "ঐশীশক্তি" শব্দে উল্লিখিত হইবে।

ভক্তির ভিত্তি যে কল্পনা, তাহা অবশ্য স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু কল্পনা আমাদের স্বাভাবিক বৃত্তিনিচয়ের অন্যতম। কল্পনাবিকাশ চিন্তার বিকাশের ন্যায় আমরা রুদ্ধ করিতে অসমর্থ। যাহা দেখিতেছি ও অনুভব করিতেছি, তাহা হইতে যেরূপ কল্পনা স্বভাবতঃ বিকাশ পায়, তাহা আমাদের জীবনের একটি অপরিহার্য্য ভাব। পৃথিবীর সর্ব্বদেশের ও সর্ব্বকালের লোক অনিবার্য্য-ভাবে যাহা কল্পনা করিতে বাধ্য হয়, তাহা আমরা জীবন হইতে পৃথক করিতে পারি না। এই সংসার যে স্বতঃ আবির্ভূত হইতে পারে না, এক অদ্ভুত ঐশী শক্তি হইতে যে ইহার আবির্ভাব হইয়াছে, ইহা মনুষ্য জাতির বিশ্বজনীন কল্পনা। সেই ঐশী শক্তি মনুষ্যহৃদয় হইতে গূঢ় থাকিতে ইচ্ছা করিয়াও তথায় আপন সত্তার আভাস প্রকাশ করিবার জন্য সেই হৃদয়ে কল্পনাশক্তির যোজনা করিয়াছেন, এইরূপ বিবেচনা করাই সুসঙ্গত।

কল্পনার সাহায্যে আমরা ইহজীবনে ঐশী শক্তির অস্তিত্বের কিঞ্চিৎ আভাস পাই মাত্র। কিন্তু তাহাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। আমরা চিরকালের জন্য বর্ত্তমান জীবন প্রাপ্ত হই নাই। অতি স্বল্পকালের জন্য পাইয়াছি। এই স্বল্প-কালের মধ্যে জানিবার ও বুঝিবার অনেক সামগ্রী পাইয়াছি।—সুতরাং ঈশ্বরকে জানিবার ও বুঝিবার অধিকার পাই নাই বলিয়া বিষণ্ণ হইবার কোনও আবশ্যক নাই। ভক্তিরসে সিক্ত হইয়া আমাদের জীবন যে মরুভূমিসদৃশ হইবে, ইহা ঈশ্বরের অভিপ্রেত বলিয়া বিবেচনা হয় না। স্বাভাবিক ভক্তিরসের সহিত অস্বাভাবিক বৈরাগ্য ভাবের কোনও সম্বন্ধই নাই।

মাধবেন্দ্র পুরীর হৃদয়ে ভক্তির সঞ্চার হইলে তিনি যে ধৈর্য্য হারাইয়াছিলেন, ইহাতে তাঁহার চরিত্রের কিঞ্চিৎ অসম্পূর্ণতা লক্ষিত হয়। এই ধৈর্য্যনাশের কারণ এই যে, তিনি এ জীবনে ঈশ্বরকে সম্যক্‌রূপে দেখিতে পাইলেন না।

"হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্।"

হে দীনবন্ধু! আমি তোমাকে না দেখিয়া পাগল হইয়াছি। উদ্‌ভ্রান্ত হৃদয়কে দমন করা আমার সাধ্যায়ত্ত নহে।—এরূপ ভাব মনুষ্যহৃদয়ের সাধারণ ভাব হওয়া উচিত নহে।—ঈশ্বর যখন ইহজীবনে আমাদিগকে দেখা দিবেন না নিশ্চিত,—যখন তাঁহার ইচ্ছা যে মনুষ্যের চক্ষে আমি আবির্ভূত হইব

না, তখন আর তাঁহাকে না দেখিয়া আমাদের কাতর হইবার কারণ কি?—ঈশ্বরকে দেখিতে পাইলাম না বলিয়া এ জীবনের সমুদায় ভালবাসাকে পরিত্যাগ করা কদাচ যুক্তিযুক্ত নহে। যে ব্যক্তি ঈশ্বরকে দেখিবার জন্য সন্ন্যাসী হইয়া সংসারত্যাগ করে, সে নিশ্চয়ই পথভ্রান্ত।

ফলতঃ, ইহা মাধবেন্দ্র পুরীর যত দূর দোষ না হউক, তদানীন্তন শিক্ষা-প্রণালীর দোষ। বেদের চরম উপদেশ এইরূপ ভাষায় উক্ত হইয়াছে,

"ন তং বিদাথ য ইমা জজান অন্যদ্ যুষ্মাকম্ অন্তরং বভূব।
"নীহারেণ প্রাবৃতা জল্প্যা চ অসুতৃপো উকথশাসশ্চরন্তি॥"

অর্থাৎ,—"হে মনুষ্যগণ! যে ঐশীশক্তি হইতে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছে, তোমরা তাঁহাকে জান না;—যাহা ঈশ্বর বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করিয়াছ, তাহা অন্য। তোমরা কুজ্ঝটিকায় আচ্ছন্ন হইয়া, তিনি এমন, তিনি তেমন, কেবল এইপ্রকার জল্পনা কর। তোমাদের উচিত যে, তিনি তোমাদিগকে যে প্রাণ দিয়াছেন, তাহার তৃপ্তিসাধন কর, এবং সেই সঙ্গে তাঁহার মহিমাকীর্ত্তন করিতে থাক।" এই উপদেশের ফল এই যে, ঈশ্বরের মহিমাকীর্ত্তন করিতে করিতে তদ্দত্ত জীবন ভোগ করিতে হইবে। "প্রাণের তর্পণ কর।"—এই বেদ-বাক্যকে অকিঞ্চিৎকর বলিয়া যেন কেহ অবজ্ঞা না করেন। ইহার ন্যায় সারগর্ভ উপদেশ আর নাই। ঈশ্বরের মহিমাকীর্ত্তন করিয়া "প্রাণের তর্পণ" করাই আদর্শ মনুষ্যচরিত্র।

"প্রাণের তর্পণ" কিরূপে হয়?—ঈশ্বর প্রাণের সৃষ্টিকর্ত্তা, এবং সেই প্রাণের তৃপ্তির যে সকল উপাদান, তাহারও সৃষ্টিকর্ত্তা, এবং সেই তৃপ্তিসাধনের যে সামর্থ্য ও ক্ষমতা, তাহারও সৃষ্টিকর্ত্তা। এখন সেই ক্ষমতার চালনা আমাদের বুদ্ধিবিবেচনাসাপেক্ষ।—মনুষ্য যে বুদ্ধি বিবেচনার সাহায্যে এই ক্ষমতাচালনার অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছে, ইহাই তাহার মনুষ্যত্বের মহিমা। সুতরাং যে ব্যক্তি সেই অধিকার পাইয়াও তদনুসারে কার্য্য না করে, সে অতীব অপাত্র, সন্দেহ নাই।

আমরা স্বীয় চিৎশক্তির চালনা দ্বারা ঈশ্বরের রচিত উপকরণে গৃহ-নির্ম্মাণ করিয়া, বস্ত্র বয়ন করিয়া, শস্য ও ফলমূল অর্জ্জন করিয়া, প্রাণের তর্পণ করিতে পারি।—আপনার ন্যায় অন্যান্য বহুতর জীবের প্রাণ-তর্পণ করিতে পারি, এবং তদ্দ্বারা বিমল আনন্দ উপভোগের অধিকারী হইতে পারি। বিবিধ প্রাকৃতিক উপদ্রবে আমাদের প্রাণে ব্যথা জন্মে, কিন্তু

সেই সকল ব্যথার অপনোদনের যথাসম্ভব ক্ষমতাও ঈশ্বর আমাদিগকে দিয়াছেন, এবং তদ্দ্বারা প্রাণের তর্পণ করা আমাদের যেমন সাধ্যায়ত্ত, তেমনই কর্ত্তব্য। এইরূপ করিলেই জীবনের সদ্ব্যবহার করা হইল। এই প্রাণতর্পণেই আমাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ প্রবৃত্তি যে 'প্রেম', তাহার বিকাশসাধন হইয়া থাকে।

অতএব 'বৈরাগ্য' নিরবচ্ছিন্ন পথভ্রম। বিশেষ অকালবৈরাগ্য। যাহার হস্তপদ কর্ম্মঠ, এবং মন সতেজ, তাহার পক্ষে সংসারত্যাগী হওয়া বিষম ভ্রম। সে আপনার জীবনকে মরুময় করিয়া, স্বার্থে বঞ্চিত ও পরার্থে অকর্ম্মণ্য হইয়া, বিধাতার বিদ্রোহাচারণ করে।

দুর্ভাগ্যক্রমে মাধবেন্দ্রের সময়ে বেদবিদ্যার জ্যোতিঃ নানা কারণে নিষ্প্রভ হইয়াছিল। বেদের সমাদরই ছিল না। তোমরা ঈশ্বরকে জানিবার অধিকার প্রাপ্ত হও নাই, বেদের এই সারগর্ভ উপদেশের পরিবর্ত্তে তদানীন্তন গুরুগণ এইরূপ প্রকাশ করিতেন যে, আমাদের নিকট মন্ত্রগ্রহণ কর, এই মন্ত্র জপ করিতে করিতে সিদ্ধ হইলে তোমরা ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিবে।

পাছে কোনও ব্যক্তি এ স্থলে আমার বক্তব্যের প্রকৃত মর্ম্ম পরিগ্রহ না করিয়া আমার এই বৈরাগ্যনিন্দায় দোষদর্শন করেন, তজ্জন্য এই বিষয়ে আমরা কিছু বলা আবশ্যক মনে করি।—সংসার ক্ষণস্থায়ী, সন্দেহ নাই; কিন্তু তা বলিয়া অলীক নহে। ইহলোক অপেক্ষা পরলোক আমাদের পক্ষে মূল্যবান্ পদার্থ বলিয়া পরিগণিত হওয়া উচিত, তাহাতেও সন্দেহ নাই; কিন্তু পরলোক যদি থাকে (আছে তাহাতে সন্দেহ করি না)—তবে ইহজীবনের সহিতও তাহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। যে জীবন পাইয়াছ, যদি তাহার সদ্ব্যবহার না কর, তবে পরজীবনে শ্রেয়োলাভের আশা বড় অল্প।—এখন যাহারা উদাসীন হইয়া সংসারত্যাগ করে, তাহারা জীবনের সদ্ব্যবহার করে কি না? তাহারা জীবনের ব্যবহারই করে না—সদ্ব্যবহার ত দূরের কথা। যদি এরূপ আপত্তি করা যায় যে, তাহারা সমুদায় জীবন ঈশ্বর-চিন্তায় নিযুক্ত থাকিয়া জীবনের সদ্ব্যবহার করে, তাহার উত্তর এই যে, ঈশ্বর সাক্ষাৎসম্বন্ধে মনুষ্যবুদ্ধির অগম্য পদার্থ। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া হাটে ঘাটে বসিয়া থাকিলে যে ঈশ্বর দেখা দিবেন, ইহা কোনও বুদ্ধিমান ব্যক্তিই বিশ্বাস করিতে পারেন না। যদি বিষ্ণুকে দেখিতে চাও, তবে কণ্বপুত্র মেধাতিথি ঋষির উপদেশ অনুসারে—

"বিষ্ণোঃ কর্ম্মাণি পশ্যতি যতো ব্রতানি পস্পশে॥"

বিষ্ণু আপনাকে গোপন করিয়া আপনার অনির্ব্বচনীয় সৃষ্টি আমাদের বুদ্ধির

সম্মুখে প্রসারিত করিয়াছেন, এবং তদ্দর্শনে তাঁহার মহিমা হৃদয়ঙ্গম করিবার অবসর প্রদান করিয়াছেন। নেকড়া পরিয়া, ছাই মাখিয়া, দ্বারে দ্বারে অলাবুপাত্র-হস্তে ভিক্ষা চাহিয়া বেড়াইলে সেই মহিমা হৃদয়ঙ্গম করিবার সুবিধা বেশী হয়, না ইয়ুরোপের লোকে প্রবল উদ্যম ও পরিশ্রমের ফলে সাহিত্যবিজ্ঞানের যেরূপ উন্নতি-সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছে, তদ্দ্বারা সুবিধা বেশী হয়?—হাজার হাজার বৈরাগী ত আমরা দেখিতেছি, কিন্তু কে তাহার মধ্যে ঈশ্বর সম্বন্ধে নূতন কথা আমাদিগকে একটাও বলিতে পারে?

হৃদয়ের অসৎপ্রবৃত্তি সকলকে পরাজয় করা যদি বৈরাগ্যের উদ্দেশ্য হয়, তবে তাহাই বা কিরূপে সাধিত হইতে পারে? কালিদাসের হৃদয়গ্রাহী ভাষায়, বিকারের হেতু সত্ত্বেও যদি বিকার না জন্মে, তবেই ধীরতার ও জিতেন্দ্রিয়তার উৎপত্তি হইয়াছে, বলা যায়। সংসারে থাকিয়া ক্রোধের কারণ ঘটিলেও যাঁহারা ক্রুদ্ধ হন না,—লোভে পড়িয়াও যাঁহারা অপহরণ করেন না, তাঁহাদিগকে জিতেন্দ্রিয় বলা যায়; কিন্তু যাঁহারা লোভ ও ক্রোধের সীমা ছাড়াইয়া পলাইয়া যান, তাঁহারা যে আত্মসংযমসাধন করিয়াছেন, তাহার প্রমাণ কি?

বিদ্যাই বল, আর আত্মসংযমই বল, ধর্ম্মানুগত সংসারমার্গই তাহার মুখ্য সাধন। ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা কর্ত্তব্য। আমাদের এরূপ শিক্ষার আবশ্যক যে, আমরা সুখের ন্যায় দুঃখের জন্যও প্রস্তুত হইতে পারি। যথাসম্ভব সুখের উপচয় ও দুঃখের অপচয় দ্বারা যাহাতে আমরা মানব-জন্মের মাহাত্ম্য প্রকাশ করিতে পারি, তজ্জন্য আমাদের শিক্ষিত হওয়া আবশ্যক। তাহা হইলেই জীবনের প্রকৃত সদ্ব্যবহার করা হইল, এবং তাহা হইলেই, যিনি হয় ত পরীক্ষার জন্য এই নিকৃষ্ট জীবন দান করিয়াছেন, তিনি তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট জীবন দান করিবেন, এরূপ আশার সঞ্চার এক দিন হইতে পারে। মহর্ষি বসিষ্ঠের সময়ে বৈরাগীরা "অরণ" বলিয়া উল্লিখিত হইত। আমাদের দেশের সেই সত্য যুগে এই অরণ-গণ নিন্দার পাত্র বলিয়াই গণ্য হইত। তখন তাহারা অতি অল্পসংখ্যক ছিল, এবং স্ত্রীসংসর্গ করিত না বলিয়া "অরণ" অর্থাৎ "অ-রমমান" উপাধি পাইয়াছিল। কিন্তু কলিযুগে বৈরাগী লাখ লাখ, আর বৈরাগীর ন্যায় বৈরাগিনীও অনেক। ধন্য বুদ্ধদেব, যিনি এই মহা অনর্থের মূল! অরমমান হইয়াও বৈরাগীরা বসিষ্ঠের সময়ে নিন্দনীয় ছিল, কিন্তু হা দৈব! এখন রমমান হইয়াও তাহারা পূজিত! মাধবেন্দ্রের সময়ে মন্ত্রসিদ্ধ হওয়া এক বাতিক জন্মিয়াছিল। লোকে মন্ত্রজপের দ্বারা ঈশ্বরদর্শনের আশা করিত।

মাধব গোপালমন্ত্র জপ করিতে করিতে সর্ব্বদাই কাতরস্বরে "অয়ি দীন!" শ্লোক উচ্চারণ করিতেন। হে দীনবন্ধু দেখা দাও! দিনের পর দিন মাসের পর মাস বৎসরের পর বৎসর যায়, কিন্তু তিনি দীনবন্ধুর দেখা পান না। তিনি দিনের মধ্যে লক্ষবার মন্ত্রজপ করিয়াও মন্ত্রসিদ্ধ হইতে পারেন নাই। মৃত্যুশয্যাতে পড়িয়াও তাঁহার সেই এক বুলি,—"হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং!" এই কাতর হৃদয় লইয়াই তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু প্রবঞ্চক লোকেরা বলিতে লাগিল, সে কি? মাধব পুরী ঈশ্বর দেখেন নাই? অনেকবার ঈশ্বর তাঁহাকে দেখা দিয়াছিলেন। সে সকল অসার গল্পের আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি।

ঈশ্বর পুরীকে আমি বঞ্চকের মধ্যে গণ্য করি না, কিন্তু তিনিও মাধবের ন্যায় প্রতারিত ছিলেন বলিয়া বিবেচনা করি। গৌরাঙ্গ নির্ব্বিঘ্নহৃদয়ে তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে, তিনি মাধব পুরীর ধর্ম্মমত তাঁহার নিকট ব্যক্ত করিলেন; তদীয় জীবনবৃত্তান্ত তাঁহাকে শুনাইলেন, এবং তাঁহাকে "দশাক্ষর মন্ত্র" প্রদান করিয়া তাহা জপ করিতে উপদেশ দিলেন। এবং কহিয়া দিলেন, একাগ্র-চিত্তে এই মন্ত্র জপ করিতে থাক, "গোপাল" তোমাকে অবশ্য একদিন দর্শন দিবেন। এইরূপে ঈশ্বর পুরীর হস্তে গৌরাঙ্গের চিত্তফলকে মথুরা ও মথুরানাথের চিত্র অঙ্কিত হইল। গৌরাঙ্গের আবেগময় হৃদয়ে যখন যে ভাবের উদ্রেক হইত, তাহাই পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইত। যাঁহাকে দেখিলে একদা বৈষ্ণবেরা পাশ কাটাইয়া যাইত, সেই বহির্ম্মুখও অন্ধ ঘটনাচক্রে পড়িয়া "বৈষ্ণব" হইলেন। যিনি একদা অতিশয় উদ্ধত ও বাচাল ছিলেন, তিনি এক্ষণে অতিশয় বৈষ্ণব হইলেন। মন্ত্র লইয়াই মথুরার দিকে ধাবমান হইতে ইচ্ছা হইল। কিন্তু তাঁহার অনুচরগণ অনেক কষ্টে তাঁহাকে ক্ষান্ত করিল। তিনি এক্ষণে পৃথিবীর আর সকল বিষয় ভুলিয়া গিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে কিরূপে মন্ত্রের সাধন করিবেন, তাহাতে ব্রতী হইলেন। তদ্গতচিত্তে ভক্তিভাবে মন্ত্রজপ করিতে হয়। গৌরাঙ্গও কৃষ্ণগতপ্রাণ হইলেন। সর্ব্বদা 'হে কৃষ্ণ দেখা দাও!' বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

এই অবস্থায় গয়া হইতে গৃহাভিমুখে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। গৌড় রাজধানীর অপরপারে গঙ্গাতীরে তৎকালে "কানাইর নাটশাল" নামে এক গ্রাম ছিল। এই স্থানে উত্তীর্ণ হইলে তিনি এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখিলেন। গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া তিনি নিভৃতে বৈষ্ণবসমাজে যাহা দেখিলেন, তাহার বর্ণনা করিয়াছিলেন। বৃন্দাবন

"তমাল-শ্যামল এক বালক সুন্দর।
নবগুঞ্জ সহিত কুন্তল মনোহর॥
নীলস্তম্ভ জিনি ভুজ রত্ন অলঙ্কার।
শ্রীবৎস কৌস্তুভ বক্ষে শোভে মণিহার॥
কি কহিব সে পীত পট্ট পরিধান।
মকর কুণ্ডল শোভে কমল নয়ান॥
আমার সমীপে আইলা হাসিতে হাসিতে।
আমা আলিঙ্গিয়া পলাইল কোন ভিতে॥"

এই দৃশ্য নিদ্রাবস্থায় কি জাগরণাবস্থায়, তাহা স্পষ্ট লিখিত হয় নাই। গৌরাঙ্গের সঙ্গে অন্যান্য লোক ছিল, তাহারা কেহ তাহা দেখিতে পায় নাই। কিন্তু গৌরাঙ্গ এইরূপ এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখিলেন। এক্ষণে মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রের গবেষণায় নির্ণীত হইয়াছে যে, মনের অবস্থাবিশেষে ইহার ইঙ্গিতগ্রাহিতা ভাব অতিমাত্রায় উপনীত হয়। তদবস্থাপন্ন ব্যক্তিকে যেরূপ ইঙ্গিত বা সঙ্কেত করা যায়, সে তাহাই বাস্তবিক দেখিতেছি ও শুনিতেছি বলিয়া বিবেচনা করে। যাহাদের হৃদয় অতিশয় আবেগময়, তাহারা এইরূপ ইঙ্গিতগ্রাহিতার সবিশেষ পরিচয় দিয়া থাকে। দশাক্ষর মন্ত্রের জপ করিলে গোপাল দর্শন দিবেন, এই ইঙ্গিতেরই ফলে গৌরাঙ্গের উল্লিখিত দৃশ্যদর্শন ঘটিয়াছিল, বিবেচনা হয়।

এক্ষণে গৌরাঙ্গের মনে হইল, কৃষ্ণ আমাকে দেখা দিয়া পলায়ন করিলেন। এই ক্ষণ হইতে তাঁহার এইরূপ বিলাসের আরম্ভ হইল;—

"কৃষ্ণ রে বাপ রে প্রাণ জীবন শ্রীহরি।
কোন দিগে গেলা মোর প্রাণ করি চুরি॥"

তিনি গৃহে প্রত্যাগমন করিলে তাঁহার জীবনে এক মহাপরিবর্ত্তন লক্ষিত হইল। তাঁহার পরিচিত ঔদ্ধত্য ও বাচালতা দূরে গিয়াছে। তিনি বিরক্ত উদাসীনের ভাব ধারণ করিয়াছেন, সর্ব্বদা কৃষ্ণনাম করেন, "কৃষ্ণ কোথা গেলে!" বলিয়া বিলাপ করেন, এবং দুই চক্ষু অশ্রুতে ভাসিয়া যায়!

নবদ্বীপস্থ বৈষ্ণবগণ এই কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলেন। নিমাই পণ্ডিত যে বৈষ্ণব হইবেন, ইহা স্বপ্নের অগোচর কথা। শ্রীমান পণ্ডিত প্রভৃতি দুই এক জন বৈষ্ণব তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন, এবং তাঁহার এই অদ্ভুত পরিবর্ত্তনের রহস্য জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন,—

"—বন্ধু সব আজি ঘরে যাহ।
কালি যথা বলি তথা আসিবারে চাহ॥
তোমা সভা সহিত নিভৃত এক স্থানে।
মোর দুঃখ সকল করিব নিবেদনে॥
কালি সবে শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর দ্বারে।
তুমি আর সদাশিব আসিবা সত্বরে॥

এই কথা বৈষ্ণবসমাজে প্রচারিত হইল। কল্য শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর গৃহে গৌরাঙ্গ আপন মনঃ-পরিবর্ত্তনের রহস্য প্রকাশ করিবেন।

সবিরাম জ্বর।

১

প্রাতঃকালে শয্যা ত্যাগ করিয়া সংসারের বিস্তৃত কর্ম্মক্ষেত্রের সহিত আত্ম-সম্বন্ধ-স্থাপনের নিমিত্ত ব্যাকুলমনে ইতস্ততঃ চাহিতেছিলাম, এমন সময় আমার বিবাহের প্রস্তাব লইয়া পিসীমা আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

দারপরিগ্রহ কর্ম্মটা অত্যন্ত সোজা নহে, এবং এরূপ আকস্মিক ঘটনায় স্নায়ুর উত্তেজনা সহজে হইতে পারে, তাহা পিসীমাকে বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করিলাম।

মনের ভিতর ডুব দিয়া মনের কথা বুঝিতে পিসীমা ভীষ্মতুল্য; কাজেই আমার আপত্তিবাণগুলি ব্রহ্মাস্ত্রে নিবারণ করিয়া আমাকে পরাস্ত করিলেন। অপিচ, আমার পিতৃমাতৃবিয়োগের পর পিসীমা তাঁহাদিগের স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। এমন পবিত্র স্থান হইতে তাঁহাকে ভ্রষ্ট করাটা নিতান্ত নীতি-বিরুদ্ধ ও অকৃতজ্ঞতার পরিচায়ক।

কিন্তু অন্তর্দৃষ্টি সন্ধান পূর্ব্বক যাহা দেখিতে পাইলাম, তাহা বড় সুখের নহে, এবং কিঞ্চিৎ অন্ধকারময়।

আমার নাম 'খোঁড়া কার্ত্তিক'। কিঞ্চিৎ খঞ্জ; দেখিতে মন্দ নহি। গণ্যমান্য-বংশোদ্ভূত, এবং অর্থাভাব মোটেই নাই।

কন্যাটি সুন্দরী। দেখি নাই, শুনিলাম। তাহাই যথেষ্ট। সুহাসিনী লেখা পড়া জানে। সে কথাও মন্দ নহে। আপনি জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, "তোমার কত দুর?" তাহার উত্তরে এখন কিছু বলাটা যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করি না। অতএব দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিতেছি, "ক্রমে জানিতে পারিবেন।" ক্রমশঃ বিস্তার, জগতের বিধান।

ভাদ্র মাস। নিবাস দিনাজপুর। কাজেই বেলা চারিটার সময় প্রত্যহ জ্বর আসে। ঈশ্বরের অনুকম্পায়, কিংবা স্নায়ুর উত্তেজনায়, যে কারণেই হউক, জ্বরটা রাত্রি দশটার সময় ছাড়িয়া গেল। পর দিন জ্বর আসিল না। অত্যন্ত সুলক্ষণ বিবেচনা করিয়া চট্‌পট্‌ বিবাহটা মনে মনে স্থির করিয়া ফেলিলাম।

সেই সন্ধ্যা! বর্ণনা অনাবশ্যক। অসিতবরণা সন্ধ্যা। মনের সঙ্গে সেটার চিরকাল একটা সম্বন্ধ থাকিয়া গিয়াছিল।

সেই এক দিন! দিনের কোন বিশেষত্ব ছিল না। একই দিন, সকলের পক্ষে পৃথক। আমার পক্ষেও তাহাই, অতএব বিশেষত্ব ছিল।

অনেক আন্দোলন, অনেক চিন্তা, অনেক অনুধাবনের পর পিসীমাকে পুনরায় ডাকিলাম।

পিসী। মত বদ্‌লে যায়নি ত?

আমি। মোটেই না। বরং দৃঢ়। বিবাহটা যত শীঘ্র হয়, ততই ভাল।

পিসীমা পুলকিত হইলেন। আমিও আনন্দে অশ্রু ও শ্মশ্রু মোচন করিলাম। শেষোক্ত প্রক্রিয়া অবলম্বন করাতে বন্ধুগণ সকলেই একমতে বলিলেন, "তোমার সহিত বায়রণের অনেকটা সাদৃশ্য আছে।" আমি অন্যমনস্ক হইয়া দুই তিন বার শূন্য গোঁফে তা দিয়াছিলাম। তাহাতে কি যায় আসে?

সংস্কারের অধীন মানব। আবার সেই সংস্কার যদি পূর্ব্বসংস্কার হয়, তাহা হইলে কি রক্ষা আছে!

তৎপরদিন হইতে গ্রামে একটা কোলাহল পড়িয়া গেল। সকলেই বলিল, "খোঁড়া কার্ত্তিকের বিয়ে"।

সুহাসিনীর পিত্রালয় রংপুরে।

বরযাত্রীর মধ্যে ফৌজদারী পেস্কার মহাশয় শীর্ষস্থানীয়, এবং মিয়াজান দপ্তরী গোড়ায়। বিবাহ-আলয়ে উপস্থিত হইতে তিন সপ্তাহ লাগিয়াছিল। প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব আমার একটা বিশেষ চরিত্রলক্ষণ। সেটার পরিচয় ক্রমশঃ পাইবেন। অতএব সঙ্গে আদার কুচি, কুইনাইন, বিজয়া বটিকা প্রভৃতি যথেষ্টপরিমাণে সংগ্রহ করিয়া লইয়া গিয়াছিলাম। বরযাত্রিবর্গের মধ্যে অধিকাংশই গো-শকটে আরোহণ পূর্ব্বক মহাপ্রস্থান করিয়াছিলেন। উল্লেখযোগ্য ঘটনার মধ্যে পেস্কার মহাশয়ের মাথায় পথিমধ্যে অকারণে টাক্ পড়িয়া গিয়াছিল, এবং হঠাৎ একটা বন্যবরাহ দেখিয়া মিয়াজানের কর্ণ অস্থায়িভাবে বধির হইয়া যায়। সে কালে রেলপথ হয় নাই। এই ত সে দিনের কথা। সময়ের গুণে ঘটনাস্রোতের পরিবর্ত্তন হয়।

বিবাহটা হইয়া গেল। বরকন্যা অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে রাত্রি তিনটা বাজিয়া গেল। যাহাদের সন্ধ্যার সময় জ্বর আসিয়াছিল, তাহারা মিষ্টান্ন প্রভৃতি অঞ্চলে বাঁধিয়া সানন্দে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। অবশিষ্ট জ্বরাক্রান্ত স্ত্রী ও পুরুষ, কেহ অন্দরে, কেহ বহির্ব্বাটীতে, নিদ্রাক্রান্ত হইয়া শয়ন করিল।

বাসর-ঘর শূন্য।

বোধ হয় কেহ কেহ ইঙ্গিতে জানাইয়াছিলেন,—বর অতিশয় শান্ত ও সুন্দর। তাহার উপর, আমি যে উদ্বাহ-আনন্দে একেবারেই স্পৃহাহীন, তাহা জানাইবার জন্য আপাদমস্তক মুড়ি দিলাম। আসল কথা, আমার জ্বর আসিতেছিল। এমন সময় আমার পূর্ব্বে কখনও জ্বর আসে নাই। এটা বোধ হয় স্থানপরিবর্ত্তনের ফল। কিংবা হয় ত রংপুরের জ্বর এই সময় আসে।

দুর্ভেদ্য অন্ধকার ভেদ করিয়া বহির্ব্বাটী হইতে পেস্কার মহাশয়ের জুতা চুরির কলরব তখনও আসিতেছে। বাসরগৃহ দোতালায়। নিশাচর পক্ষী যে ডাকে নাই, এমন কথা বলিতে পারি না; তবে স্মরণ নাই। আকাশে যে তারা ছিল না, এমন নহে; তবে দেখিতে পাই নাই। বাহিরে সম্ভবতঃ দুই একটা শৃগাল দাঁড়াইয়াছিল, কিন্তু তাহাদিগের রাগিণী ভাঁজিবার সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

দীপাবলী নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছিল, কেবল একটা দেয়ালগিরি তখনও নিভিয়া যায় নাই। ম্যালেরিয়া-বাহী প্রভাতবায়ু পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে ধাবমান হইয়া সূর্য্যোদয়ের পথ পরিষ্কার করিতেছিল। জ্বরের সম্পূর্ণাবস্থা। এমন সময়, কি জানি কেন, সঙ্গিনীর অবস্থা নিরূপণ করিবার একটা দুর্দ্দম্য ইচ্ছা হইল।

দেখিলাম, সে ঘুমাইতেছে। অতি ধীরে অবগুণ্ঠন খুলিলাম। হাতখানা ঈষৎ কম্পিত হইয়াছিল। ওটা স্বভাবের দোষ। কিন্তু যাহা দেখিলাম, তাহা অনির্ব্বচনীয়!

মুখখানি সুন্দর! অতি সুন্দর। এমন সুন্দর যে, মোটেই বর্ণনার আবশ্যক করে না। অধীর হইয়া পড়ি নাই, তবে বোধ হয়, নাড়ী দেখিবার নিমিত্ত কোমল করপল্লব স্পর্শ করিয়াছিলাম। তাহার উষ্ণতাপ্রভাব ক্রমশঃ ত্বক্‌ভেদ করিয়া আমাকে জানাইয়া দিল যে, সুহাসিনী জ্বরে বেহুঁস হইয়া আছে। মনে অনেকটা সাহস হইল।

৩

অতি মৃদুস্বরে ডাকিলাম, "ও গো!"

এই সম্বোধনটি সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন, পবিত্র ও রুচিকর।

ডাকিয়াই আমি চক্ষু মুদ্রিত করিলাম। হঠাৎ চারি চক্ষুর সম্মিলন হওয়াটা যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করি নাই। বলা বাহুল্য, বরণের সময় সুহাসিনী চক্ষু উন্মীলন করে নাই।

আবার মিটি মিটি চাহিয়া দেখিলাম। যেন বোধ হইল, তাহার চক্ষু ইতি-পূর্ব্বেই স্বীয় অভিনয় সমাপ্ত করিয়া বসিয়া আছে। আবার ডাকিলাম, "ও গো!"

এবার সে চাহিল। জ্বরের উপর যত দূর লজ্জা সম্ভব, তাহা সুন্দর মুখে প্রকাশিত হইল। একটি বৃহৎ পতঙ্গ বাতায়নপথে গৃহে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিতেছিল, সুহাসিনী তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

বলি কি ?—"তুমি কেমন আছ ?" এ উক্তি নিতান্ত সাধারণ হইয়া পড়ে। প্রথম সম্ভাষণটা প্রায়ই পূর্ব্বে ভাবিয়া রাখা উচিত। এত বড় পবিত্র,—আজী-বনব্যাপী—উদ্বাহ ব্যাপারের মুখপাতটা আমাদিগের ভাগ্যে বৃথা হইয়া পড়ে।

আমি বড় প্রেমিক রকমের লোক ছিলাম না। তবে প্রেম আমার মধ্যে যথেষ্ট বর্ত্তমান আছে, তাহার প্রমাণে একটা কবুলজবাব ছাড়িয়া দিলাম।

"তোমার মত আর একটি বালিকাকে ভালবাসিয়াছিলাম !"

কথাটা পূর্ব্বস্মৃতি, এবং ইহাতে সহৃদয় ভাবুকের নয়নকোণের অবস্থান্তর-প্রাপ্তির খুব সম্ভাবনা। সুহাসিনীর তাহাই হইল। তবে ভাবটা বরুণের দিকে না গিয়া অনেকটা অরুণের দিকে গেল।

এই এক কথায় বালিকার মুখ খুলিয়া গেল। বলা উচিত, সুহাসিনীর বয়স চতুর্দ্দশের ন্যূন নহে।

সু। তার নাম কি ?

আমি। নাম কি মনে আছে ? কত লোককে ভালবাসিয়াছি, তাহাদের নাম কি মনে থাকে ?—বাঃ !

[আমার বক্তৃতা দীর্ঘ হইলে লাঙ্গুলে একটা "বাঃ !"—(ধ্বন্যাত্মক এবং ভাবাত্মক শব্দ) দ্বারা শেষ রক্ষা করিতাম।]

সুহাসিনী আর কোন কথা কহিল না। এইরূপে কথোপকথন বন্ধ রাখিয়া জ্বরাবস্থায় ঘুমাইলে ক্লেশবৃদ্ধির সম্ভাবনা স্থির করিয়া পুনরায় বলিলাম, "তোমার জ্বর কয় ডিগ্রী ?"

সু। ১০২।

আমি। আমার ১০১। বোধ হয়, বাড়িবে। বায়ুর প্রকোপ হইলে আদার কুচিতে অনেকটা উপকার হয়। অসময়ে এমন ঔষধ আর নাই। খাইবে কি ? খাও না ! বাঃ !—

অঞ্চলে গাঁইট দিয়া আদার কুচি সাবধানে রক্ষা করিয়াছিলাম। খুলিতে সময় লাগিল। সুহাসিনী খাইল না।

আমি। খাবে না ?

সু। না।

"তবে আমি খাই," বলিয়া একটি দুইটি করিয়া গলাধঃকরণ করিলাম।

সুহাসিনী নীরব। কথার উত্তর না পাইলে আমার স্নায়ু সচরাচর উত্তেজিত হইত। তাহাই ঘটিল।

৪

সংসার সুখে দুঃখে পূর্ণ। বায়ু, পিত্ত ও কফের বিকারে বোধ হয় এই সুখ দুঃখের সৃষ্টি হয়।

ঈষৎ-জ্বর-সংযুক্তা মধুযামিনী পোহাইতে লাগিল। আকাশ মেঘময়, সারা-নিশি জাগরণ করিয়া সকলেই সেইটুকুর সুবিধা লইতেছিল। আমি কোনও কথা না কহিয়া অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলাম। মনে কত কথা আসিল। প্রথম আলাপটার ফল কিছু গুরুতর দাঁড়াইবে, বিবেচনা করিয়াছিলাম। কিন্তু তাহা হইল না দেখিয়া আর একবার অন্যরূপ চেষ্টা দেখিলাম। বলিলাম, "তোমার কষ্ট হচ্ছে?"

সু। না।

আমি। বোধ হয় জ্বর বাড়িবে।

সু। না। ছাড়িয়া গিয়াছে।

আমি। আমার বোধ হয়—আমারও ছাড়িয়া গিয়াছে।

তাহার পর ঈষৎ কম্পিতস্বরে বলিলাম, "তুমি কখনও ভালবাসিয়াছ?"

সু। না।

আমি। ভালবাসিবে?

সু। না।

আমি। যদি সুন্দর হয়, মনে কর—মনে কর—আমার মত?

সু। তোমার চেয়ে অনেকের সুন্দর মুখ আছে।

আমি। এক জনের নাম কর ত।

সু। আমার কি মনে আছে? কত সুন্দর মুখ দেখিয়াছি।

আমি। তবে নিশ্চয় কাহাকেও ভালবাসিয়াছিলে?

সু। বোধ হয়।

উভয়েই ঘর্ম্মাপ্লুত হইতেছিলাম।

জানি না কেন, ক্রমেই মাথাটা ঘুরিতে লাগিল। বাতায়ন পার হইয়া পতঙ্গটা নির্ব্বাণোন্মুখ দীপ নিভাইয়া দিল। সেই অন্ধকারে প্রতিজ্ঞা করিলাম,—"ইহার

তাহার পরদিনই নববধূ লইয়া স্বদেশে চলিলাম। পথিমধ্যে কাহারও সহিত কথা কহি নাই। অবস্থা উদ্ভ্রান্ত! সুযোগ পাইয়া একদিন প্রাতঃকালে পেস্কার মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৌ মনে লাগিয়াছে ত?"

আমি। দিনাজপুরে গিয়া সে কথা হইবে।

পেস্কার। আমার জুতাজোড়ার কি হইবে?

আমি। তদপেক্ষা ভাল জুতা কিনিয়া দিব। বরযাত্রী আসিলেই জুতা চুরি যায়। সে কথা জানেন না? বাঃ!—

পেস্কার। আপনার মনটা কিছু উচাটন দেখিতেছি।

তাহার পর, শ্বশুর মহাশয় অতি ভদ্র, বিনীত ও বড়লোক, শ্যালক অতি সুপুরুষ ও বিদ্বান, মিষ্টান্ন অতি পরিপাটী রকমের, বিদায়কালে যথাযোগ্য সম্মান-প্রদর্শন প্রভৃতি সারসত্যের অবতারণা করিয়া পেস্কার মহাশয় পথের প্রথা রক্ষা করিতে লাগিলেন।

আমি বলিলাম, "আমার সঙ্গে কাহারও আলাপ হয় নাই।"

আমি উন্মনা হইয়া একটা কথা ভাবিতেছিলাম। কখন বাটীতে পদার্পণ করিয়াছি, জানি না। তৎপরদিন পিসীমাকে বলিলাম, "বধূকে লইয়া একবার পশ্চিমে হাওয়া বদলাইতে যাইব। তুমি উপরের ঘরটা মেরামত করাইয়া রাখিও।"

পিসীমা বলিলেন, "বাবা, তোমাদের ভাব বুঝি না। এমন সুন্দর, শান্ত, বউটি—দু' দিন দেখি না।" আমি বলিলাম, "আবার ফিরিলে দেখিবে। জ্বরটা সারিয়া যাউক—উভয়েরই শরীরের অবস্থা বড় খারাপ—বাঃ—"

৫

সংসারের মধ্যে আমার পুরাতন ও বিশ্বাসী ভৃত্য—মকরাক্ষ নস্য। নস্য জাতিতে ছোট। দিনাজপুরে নস্যের প্রাদুর্ভাবটা বেশী। নস্যগণ মুসলমান। তাহাদিগের হাতে জল খাইতে নাই। মকরাক্ষ নস্য আমার খাস চাকর হইলেও বিবাহের বরযাত্রী যায় নাই।

মকরাক্ষের গোঁফ "জোড়া" নহে। নস্যের উভয় দিকের গোঁফের মধ্যে একটি শ্বেতরেখা সীমা নির্দ্দেশপূর্ব্বক ওষ্ঠপ্রান্ত হইতে নাসিকাপ্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। মকরাক্ষ নস্যের সহধর্ম্মিণীর জীবদ্দশায় তিনিই গোঁফের কর্ত্তা ছিলেন। বোধ হয়, কর্ত্তার বিয়োগে গোঁফ বিধবার আকার ধারণ করে। ইহার নিগূঢ় কথা কেবল নস্য জানিত। মকরাক্ষ নস্যের চুল কালো, মন সাদা, চক্ষু দুইটা

নন্তের সহিত যাহা পরামর্শ হইল, তাহা আপাততঃ অপ্রকাশ্য থাকিল।

বৈদ্যনাথে একটি বাসাভাড়া করিয়া তৎসমাচার পিসীমাকে এবং অন্যান্য পুরজনকে দিলাম। সঙ্গে কেবল বধূ ও মকরাক্ষ যাইবে।

বিকালে চারিটার সময় সুহাসিনী পশ্চিমদুয়ারী ঘরের কোণে বসিয়া পত্র লিখিতেছিল। আমি ঘরে প্রবেশ করিয়াই বলিলাম, "সব ঠিক।"

সু। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) বেশ।

আমি। তুমি চিঠি লিখ্‌ছ কাহাকে?

সু। যমকে।

আমি বলিলাম, "বাঃ!—" তৎপরে গৃহাভ্যন্তর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলাম। তিন দিন পরেই বৈদ্যনাথ!

বাটীর সম্মুখেই উদ্যান—লতাকুঞ্জ, পুষ্পকুঞ্জ, ভ্রমরের গুঞ্জন, অদূরে খণ্ডশৈল, হিমানীসিক্ত মলয়বাতাস! কি সুন্দর দৃশ্য! তাহার উপর সুসজ্জিত কুটীর, লেমোনেড ও জিঞ্জারেড, এবং সময়বিশেষে দুই একখানা কাটলেট ও সিগারেট। মকরাক্ষ আনন্দে অধীর। তাহার প্লীহাটা দুই দিনেই বাতাসের গুণে ক্ষুদ্রাকারে পরিণত হইল। পীতবর্ণ ঘুচিয়া চক্ষুর কোণে হিঙ্গুলবর্ণ দেখা দিল।

অন্দরমহলে বিশেষ কোনও পরিবর্ত্তন দেখিলাম না। একদিন প্রেমোচ্ছ্বাসের চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু ফলে কিছুই দাঁড়ায় নাই। স্তম্ভিত তুষারের ন্যায় নয়নের দৃষ্টি আমার প্রতি স্থাপিত করিয়া প্রিয়া বলিলেন, "আর যাতনা দিও না।" সত্যসত্যই কি যাতনা দিয়াছি? এমন সময় কে বহির্ব্বাটী হইতে ডাকিল, "ওহে খোঁড়া কার্ত্তিক!"

স্বর নবীনের। নবীনচন্দ্র আমার মাতুলের মামাত শ্যালক। বৈদ্যনাথে থাকে। বাহিরে গেলাম। দেখিলাম, অন্য এক জন আগন্তুক। দেখিয়াছি বলিয়া বোধ হয়, চিনি না।

আগন্তুক। চিনিতে পারেন কি?

আমি। বোধ হয় এগ্‌জিবিশনে দেখিয়া থাকিব।

আগন্তুক। আমি আপনার শ্বশুরবাটীর লোক। সুহাকে লইতে আসিয়াছি।

আমি। আপনি কে হন?

নবীনচন্দ্র ও আগন্তুক পরস্পরের মুখ চাহিয়া ঘরে তামাক খাইতে গেল।

৬

সবই যেন বেতর রকমের। লোকটা পরিচয় না দিয়াই আমার বৈঠকখানা অধিকার করিয়া বসিয়াছে! আরও বিশেষ বিদ্বেষের কারণ এই যে, তাহার মুখশ্রী বেতর সুন্দর। মনে হইল, বোধ হয় প্রিয়ার বাসরঘর-কথিত সুন্দর পুরুষবর্গের মধ্যে আগন্তুক একটি, এবং বোধ হয়, দিনাজপুরে যাহাকে পত্র লিখিতেছিলেন, ইনিই সেই!

ধূমকেতু ও বিড়ালের ন্যায় আপদ সঙ্গে সঙ্গে আসে।

গবাক্ষদ্বারে প্রিয়া উঁকি মারিতেছিলেন, এবং বোধ হইল, যেন একটু হাসিতেছিলেন। মকরাক্ষ সুসংবাদ লইয়া আসিল। অন্দরমহলে ডাক্ পড়িয়াছে। ডাকাত পড়িলেও এত আশ্চর্য্য হইতাম না। গেলাম।

প্রিয়া বলিলেন, "ওঁকে জল টল খাওয়াও, উনি আমাদের আপনার লোক।"

আমি। যেই হউন, আমি (স্বগত—উহার সঙ্গে) তোমাকে যাইতে দিব না।

সুহা। সে পরের কথা।

আগন্তুক বিনা বাক্যব্যয়ে বাটীর মধ্যে গেলেন, এবং হস্তপদাদি প্রক্ষালন করিয়া আমার শয্যায় শুইয়া পড়িলেন।

আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল। সভ্যতা রংপুরে মোটেই প্রবেশ করে নাই।

আমি। আপনার শরীরের গঠন তো বেশ। আপনার জ্বর জ্বালা হয় না?

একটি সিগারেটের ধূম উদ্গীরণ করিয়া আগন্তুক বলিলেন, "আমার বড় জ্বর হয় না, তবে কখনও একবার রেমিটেণ্ট জ্বর হইয়াছিল, মনে পড়ে।"

সেটার পুনরুদয়ের সম্ভাবনা আমার মনে উদিত হইল। আমি বলিলাম, "আপনার নাম?"

ঈষৎ হাস্য করিয়া আগন্তুক বলিলেন, "প্রসাদ।"

আমি যেন শুনিলাম, "প্রতিশোধ।"

আমি। আবার বলুন ত?

আগন্তুক। প্রসাদ। মুখে সিগারেট থাকিলে স্পষ্ট করিয়া কথা কওয়া যায় না। মার্জ্জনা করিবেন।

তাহার পর প্রসাদ বাবু ঘুমাইলেন। নিদ্রাভঙ্গের পর সর্ব্বাঙ্গে সাবান মাখিয়া স্নান করিলেন। পুনর্ব্বার ঘুমাইলেন। বেলা তিনটার সময় আহারের চেষ্টায় অন্দরমহলে গেলেন। আমি পূর্ব্বেই আহার করিয়াছিলাম।

বাহিরে মকরাক্ষ নস্য প্লীহায় ঔষধ মালিশ করিতেছিল। আমি বলিলাম, "নস্য! এ লোকটা কি রকম?

মকরাক্ষ। ভাল বোধ হয় না।

আমি। এরূপ অজানিত লোকের সঙ্গে তাহার কথাবার্ত্তাটা, এবং উহার সঙ্গে তাহাকে পাঠান, কিরূপ—বাঃ—

মকরাক্ষ। আপনি শ্বশুরবাড়ীর কাহারও সঙ্গে আলাপ করেন নাই?

আমি। না।

মকরাক্ষ। সেটা আপনারই ভুল হইয়াছে—এমন অবস্থায়, ভাল করিয়া পরিচয়টা লউন না। আপনার এত লজ্জা কেন?

লজ্জা আমার আর একটি চরিত্রলক্ষণ। আমি মুখ ফুটিয়া পরিচয়টা লইব মনে করিতেছি, এমন সময় মুক্ত গবাক্ষপথ দিয়া দেখিলাম, প্রসাদ ও সুহাসিনী উভয়েই এক শয্যায় বসিয়া অশ্রু মুছিতেছে!

অশ্রুত্যাগের কোনও কারণ থাকিতে পারে না—ব্যতীত একটি—কেবল একটি!—আমার শিরায় শিরায় রক্ত ছুটিতে লাগিল—

আমি একটি ক্রোধকটাক্ষপাত করিয়া দূরে সরিয়া গেলাম। উভয়েই বোধ হয় দেখিল।

"মকরাক্ষ!"

মকরাক্ষ। বাবু!

আমি। তোমার সহিত পরামর্শ আছে—কথাটা সঙ্গীন—বিদেশে আসিয়াও শান্তি নাই? এ কি রকম? বাঃ!—

৭

এক সপ্তাহ কাটিয়া গেল। ঘোর সংসারবর্ত্মে এক সপ্তাহ বড় সোজা নয়। সৌর-জগতে চন্দ্র সূর্য্য ইতিমধ্যে কতবার আসিয়াছে গিয়াছে, তাহা জানিতেও পারি নাই। মনের মধ্যে কেবল দুইটি বিষয়—অবিশ্বাস!—প্রতিহিংসা! আমি বুঝিতে পারিয়াছি, প্রসাদই তাহার হৃদয়ের আনন্দ, নয়নের জ্যোতি, ইত্যাদি। প্রসাদ নহিলে সে এক দণ্ড থাকিতে পারে না। শনিবার প্রত্যূষে প্রসাদ বাবুর ঘরে গেলাম। প্রসাদ বাবু বলিলেন, "জ্বর হইয়াছে!" জ্বর সামান্য। আমি মনে মনে ভাবিলাম, এটা প্রেমজ্বর। এ জ্বরমগ্নের বন্দোবস্ত আমি করিবই। টেবিলের উপর প্রসাদ বাবুর একখানা পত্র পড়িয়াছিল।

বোধ হয়, রাত্রিকালে পত্রখানি লিখিয়া জ্বরে পড়িয়াছেন। প্রসাদ বাবু বাহিরে যাইবামাত্র পত্রখানি হস্তগত করিলাম। দেখিলাম, পত্র নয়—ঈশ্বরের নিকট আকুল হৃদয়ের প্রার্থনা! প্রেমের কোনও প্রমাণ পাইলাম না। মনে হইল, প্রিয়ার হস্তাক্ষর ও ইঁহার হস্তাক্ষর প্রায় এক রকমের। এ কি জ্বালা! মস্তকে বৃশ্চিক দংশন করিল। ঘরে গিয়া দুয়ার বন্ধ করিলাম। নষ্ঠের সহিত যাহা পরামর্শ করিয়াছিলাম, সেটা কার্য্যে পরিণত করিবার পথ বিধাতা দেখাইয়া দিলেন। দুইখানি পত্র লিখিলাম। একখানি এই,—

"সুহা! আর পারি না। এ জন্মে তুমি আমার হইলে না, সেই শোক হৃদয়ে থাকিল—হৃদয় ভাঙ্গিয়া যাইবে। যদি ভগ্ন হৃদয় জোড়া দিতে চাও, তবে কল্য ঠিক ৯॥০টা রাত্রির সময় আমার সহিত বাবলা গাছের নীচে দেখা করিও। তোমারি সাধের প্রসাদ। পুনশ্চঃ।—মুখে বলিতে পারি নাই, তাই পত্রে লিখিলাম। আমার জ্বর হইয়াছে। প্রঃ—"

এই পত্র প্রসাদের হস্তাক্ষরে পরিণত করিয়া আপনাকে বাহাদুরী না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। অতঃপর ২নং পত্র সমাপ্ত করিলাম,—

"প্রাণের প্রসাদ! কল্য রাত্রিকালে কার্ত্তিক নবীন বাবুর বাসায় আহার করিতে যাইবেন। আমি আর এ দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করিতে পারি না। পূর্ব্বদুয়ারী ঘরে রাত্রি ১০ টার সময় এস। অনেক কথা আছে। মকরাক্ষকে সাবধান। তোমারই দাসী—সু।"

এই পত্র প্রিয়ার হস্তাক্ষরে লিখিলাম।—দুইখানি পত্রই মকরাক্ষকে দেখাইলাম। নষ্ঠ লেখাপড়া জানিত। আমার অসাধারণ বুদ্ধির মধ্যে নষ্ঠ ব্যতিরেকে (এবং পিসীমা) অন্য কেহ ঢুকিতে পারিত না। মকরাক্ষকে বলিলাম, "আমি বাবলাতলায় যাব, আর তুমি পূর্ব্বদুয়ারী ঘরের আড়ালে লুকাইয়া থাকিবে, তাহার পর যাহা হয়, ক্রমশঃ বুঝিতে পারিবে।"

মকরাক্ষ। আপনি মার যেন অপমান করিবেন না।

আমি। তুমি কি পাগল? কখনই না।

মকরাক্ষ। আর উনি ঘরে আসিলে কি করিব?

আমি। তালা বন্ধ করিয়া দিবে।

উভয় পত্র ডাকে রওনা হইল। এবং সেই দিনই পরস্পরের করযুগলে শোভা পাইতে লাগিল। ওঃ! সেই কল্য! কবে আসিবে? আমি চাদর মুড়ি দিয়া শুইয়া থাকিলাম। আমি জানিতাম, উভয়েই সাবধান, এবং প্রথম

সেই ক্রোধকটাক্ষপাতের দিনের পরে আর বড় একটা আমার অসাক্ষাতে তাহারা কথোপকথন করিত না।

পর দিন! পর দিনের মধ্যাহ্নে মকরাক্ষ বলিল, "বাবু, ও লোকটা জজ আদালতের উকীল, চালাক্ লোক—"

আমি। আমিও ফৌজদারী আদালতের মোক্তার, দেখা যাবে—বাঃ!—

৮

নির্দ্দিষ্ট সন্ধ্যাকালে আকাশের তারার দিকে দুই একবার চাহিলাম। সেই এক সন্ধ্যা, আর এই এক!

রাত্রি ঘোর অন্ধকার। রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকটেই আমার বাসা, এবং রেলওয়ে লাইনের নিকটেই সেই উল্লিখিত বাবলা গাছ। স্থানটা অনেক চিন্তা করিয়া মনে মনে বাছিয়া লইয়াছিলাম। যে টোপ্ ফেলিয়াছি, আর যায় কোথা? প্রমাণ হাতে হাতে। রাত্রি ৮টার সময় প্রসাদ বাবুকে বলিলাম, "আমি নবীন দারোগার বাসায় আহার করিতে যাইতেছি।" পূর্ব্বোক্ত নবীনচন্দ্র বৈদ্যনাথের পুলিস দারোগা। প্রসাদ বাবু বলিলেন, "আমি ষ্টেশনে যাইতেছি, গাড়ী বাহির হইয়া গেলে প্রত্যাবর্ত্তন করিব।" ষ্টেশনমাষ্টারের সহিত প্রসাদ বাবুর খুব আলাপ। রাত্রী ১০টার সময় গাড়ী ছাড়ে। বুঝিলাম, তিনি ষ্টেশন হইতে ফিরিয়া প্রিয়ার আবাহন অনুরোধ রক্ষা করিবেন।

৯টার সময় বাবলাগাছের নীচে উপস্থিত হইলাম। ৯৷৹টার সময় বোধ হইল, দুইটি লোক অন্ধকারে রেলওয়ে লাইন পার হইয়া ষ্টেশনের অভিমুখে চলিয়া গেল। আমি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া সুহাসিনীর আগমন-প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিলাম। বোধ হইল, শীঘ্রই চাঁদ উঠিবে। বৃক্ষ হইতে একটা কালপেচক রেলওয়ে ষ্টেশ-নের দিকে উড়িয়া গেল। উৎসাহে উদ্বেগে হৃদয় নাচিতেছিল।

সে উৎসাহ আনন্দের উৎসাহ নহে। সে উৎসাহ শোণিতের, সে উদ্বেগ প্রতিহিংসার। কত ক্ষণ বসিয়াছিলাম, জানি না। ট্রেণ ছাড়িয়া গেল। এক, দুই, তিন করিয়া প্রত্যেক গাড়ী আমার নয়নের সম্মুখে ছুটিতে লাগিল। হঠাৎ মাথা ঘুরিয়া গেল। বোধ হইল, যেন প্রিয়া ও প্রসাদ বাবু একখানি সেকেণ্ডক্লাস কম্পার্টমেণ্টের গবাক্ষে সহাস্যমুখে দাঁড়াইয়া, আমি যেখানে ছিলাম, সেই বাবলা-গাছের অভিমুখে অঙ্গুলি দ্বারা কি একটা সঙ্কেত করিতেছিল!

সর্ব্বনাশ! বাটীর দিকে লক্ষ্য করিয়া দেখি, আমার গৃহের ল্যাম্প নিভিয়া গিয়াছে। এক লম্ফ দিয়া উঠিলাম। পদতল বাবলা কাঁটায় ক্ষত বিক্ষত হইয়া

গেল। ভ্রূক্ষেপ নাই। ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিলাম। তখনও অন্ধকার। সহসা মনে হইল, আমি কি পাগল? বোধ হয় আমার ভ্রম হইয়া থাকিবে। রেলগাড়ীতে তাহাদের যাওয়া অসম্ভব।

পূর্ব্বদুয়ারী ঘরের নিকট আসিয়া স্থিরনেত্রে একটা আবছায়ার মত মকরাক্ষ নস্তকে বারান্দার কোণে দণ্ডায়মান দেখিলাম।

বুঝিলাম, আমাকেই সে প্রসাদ বলিয়া ঠাওরাইয়াছে। গৃহাভ্যন্তরে কি শব্দ হইল।

'ওঃ! বোধ হয় সুহাসিনী ঘরেই আছে, এবং নায়কের প্রতীক্ষা করিতেছে। কিংবা বোধ হয় প্রসাদ বাবু ইহার মধ্যেই ঘরে প্রবেশ করিয়াছেন!

চিত্ত অস্থির হইলে বুদ্ধিভ্রংশ ঘটিয়া থাকে। মনে পড়িল যে, প্রসাদ বাবু ঘরে গেলে মকরাক্ষ তালা বন্ধ করিয়া দিত। কিন্তু হয় ত সুহাসিনী ঘরেই আছে, অতএব মকরাক্ষ নস্ত পরামর্শানুযায়ী ব্যাপারসাধনে বিরত হইয়াছে।

দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া ঘরে চকিতের ন্যায় প্রবেশ করিলাম। দ্বারের সম্মুখেই একটা বিস্তৃত তৈলাক্ত পদার্থে পদতল সংলগ্ন হইবামাত্র আছাড় খাইয়া পড়িয়া গেলাম। এমন সময় বুঝিতে পারিলাম, মকরাক্ষ বাহিরে তালা বন্ধ করিয়া ছুটিয়া গেল। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় আমি বলিলাম, "বাঃ!—"

৯

আমি দীপশলাকা জ্বালিলাম। আমার সাধের ক্যাষ্টর অয়েলের পিপাটি শূন্য করিয়া প্রায় দশ সের তৈল কে মেজের উপর ঢালিয়াছে। আমার কুকুর "জেনি" ক্যাষ্টর অয়েল মাখিয়া ঘরে বসিয়া আছে। শয্যার উপর একখণ্ড কাগজে বড় বড় অক্ষরে লেখা "সবিরাম জ্বরের ঔষধ।"

পদাঘাত করিয়া গবাক্ষ ভাঙ্গিয়া ফেলিলাম। এ ঘর ও ঘর প্রবেশ করিয়া দেখি, সবই শূন্য। সুহাসিনীও নাই, প্রসাদ বাবুও নাই। প্রসাদ বাবুর পোর্টম্যাণ্টোও নাই।

"হায়! হায়! শালা ফাঁকি দিয়াছে গো!" চীৎকারের চোটে কুকুর ডাকিয়া উঠিল।

মকরাক্ষ। বাবু! যাহা হইবার, তা হইয়া গিয়াছে। আমি যতক্ষণ বারান্দায়, সেই অবসরে বোধ হয় দুই জন ব্যাগ্ হাতে পগার ডিঙ্গাইয়া চম্পট দিয়াছে। আমি নবীন দারোগাকে সংবাদ দিয়া আসিয়াছি।

আমি। তবে ব্যাটা ঘরে তালা বন্ধ করিয়া গেলি কেন?

নন্দ। প্রথমে অবস্থাটা বুঝিতে পারি নাই। আপনাকে না দেখিয়া বাব-লাতলায় খুঁজিতে গিয়াছিলাম, সেখান হইতে ফেরত আসিবার সময় ষ্টেশনের বড় বাবু বলিলেন যে, প্রসাদ বাবু ও বাবুর গিন্নী সাহেবগঞ্জের টিকিট ক্রয় করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। আমার সন্দেহ হওয়াতে দারোগা বাবুকে শীঘ্র আসিতে বলিয়া এইমাত্র উপস্থিত হইলাম।

আমি শূন্যে হস্তনিক্ষেপ করিয়া বলিলাম,—"সব ব্যাটা চোর—চোর!"

নবীনচন্দ্র প্রবেশ করিবামাত্র আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম।

নবীন। ব্যাপার কি? কিছু চুরি গিয়াছে?

আমি। না; গহনাগুলি রাখিয়া গিয়াছে।

নবীন। তবে?

আমি। ৪৯৭।৪৯৮ ধারা, পুলিসের ধর্ত্তব্য নহে। আর দেখুন, আমার সন্দেহ হয়, ষ্টেশনমাষ্টার ইহার মধ্যে আছেন।

ওঃ! আমি ফৌজদারী মোক্তার! আমার বাটীতে ৪৯৭ ধারা! এ মুখ লইয়া যাইব কোথায়? নবীনচন্দ্র সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন। কথাটা তোলপাড় করিয়া রাষ্ট্র করা যুক্তি-সঙ্গত নহে, তাহা বুঝাইয়া দিলেন।

"যাইবে কোথায়? দুই দিনেই অপরাধিদ্বয়কে ধরিয়া দিব। সাহেবগঞ্জে টেলিগ্রাম করিব কি?"

আমি। মোটেই না। চাঁদের কলঙ্ক ধরিয়া উপাড়িয়া ফেলিলেও চাঁদ পবিত্র হয় না। আমার জীবনের সাধ অনেক দিন ফুরাইয়াছে, কিন্তু প্রতিহিংসা-নল আরও জ্বলিয়া উঠিয়াছে। মকরাক্ষ!

নন্দ। বাবু!

আমি। আমার পায়ের কাঁটা তুলিয়া দাও। সাবান আন। গরম জল ফুটাও। এ কি সাধারণ যন্ত্রণা? তাহার উপর আবার দে কোম্পানীর তৈল! আচ্ছা দেখা যাইবে, রংপুরের শালা কত দূর যায়। আমার কি? আমার লজ্জাসরম গিয়াছে, আমি—

নবীন দারোগা ধীরে ধীরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। আমি অঙ্গমার্জ্জনে রত হইলাম।

১০

লজ্জা, অপমান, ক্ষোভ, ধিক্কার, প্রতিহিংসার বোঝা মাথায় লইয়া বাটী

প্রায় এক সপ্তাহ পরে বাটীতে পঁহুছিয়াছিলাম। সন্ধ্যাকালে গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখি, পিসীমা সলিতা পাকাইতেছেন। আমাকে দেখিয়াই তিনি নয়নজলে পরিপ্লুত হইলেন। বুঝিতে পারিলাম, সংবাদ আসিতে বিলম্ব হয় নাই।

আমি। পিসীমা! সব হারাইয়াছি।

পিসী। বাবা, খবর পেয়েছ?

আমি। কিসের খবর? অন্য কোন বিপদ হইয়াছে নাকি?

পিসী। বৌমা যে আর নেই! এই যে তার ভাই চিঠি লিখেছে!

পিসীমার ক্রন্দনধ্বনির মাত্রা চড়িতে লাগিল। আমি জানিতাম, পিসী সুচতুরা বুদ্ধিমতী, কিন্তু এই অভাবনীয় ঘটনায় মাথায় বজ্র ভাঙ্গিয়া পড়িল। সংবাদ এই যে, সাহেবগঞ্জের গঙ্গায় ঝড়ে নৌকাডুবি হইয়া নায়ক ও নায়িকা মারা পড়িয়াছেন! আমি বলিলাম, "ঈশ্বরের বিচার নাই। যেরূপ মোকদ্দমা, তাহাতে তাঁহার নিজ হাতে আইন লওয়াটা ভাল হয় নাই।"

প্রবল বেগে বাত্যা উঠিয়াছে। হায় রে, কত সাধ করিয়াছিলাম! আমার মধুযামিনী যে ঐ ঘরেই কাটিবে! হঠাৎ, ক্রন্দন আমার চরিত্রলক্ষণ নহে, অথচ কাঁদিয়া ফেলিলাম।

পিসীমা। বাবা! তোর দোতালা ঘরে শয্যা পাতিয়াছি, একটু বিশ্রাম করগে।

ধীরে ধীরে উঠিলাম। সন্ সন্ শব্দে বায়ু আসিয়া গৃহের আলোক নির্ব্বাপিত করিল। আর আলোকেই বা কি হইবে? যাহার জীবনের আলোক নাই, তাহার বাহিরের আলোক দেখিয়া কি ফল? শয্যায় শয়ন করিয়া ঘোর রকম মনস্তাপ হইল। একবার, দুইবার, তিনবার কাঁদিলাম। এ সংসারের পরিণাম যখন ইহাই, তখন মানবের ঈর্ষ্যা দ্বেষ হিংসা কেন? শাস্ত্রচর্চ্চা করিয়া পরলোকের প্রতি একটা বিশ্বাস ছিল। করযোড়ে জগন্নাথকে ডাকিয়া বলিলাম, "নাথ! পরলোকে যেন সুহাসিনীকে দেখিতে পাই। আমার কোন্ দোষে সে আমাকে ছাড়িয়া গেল?" বাস্তবিক, আমি যে তাহাকে ভালবাসিতাম, তাহাতে আর কোন সন্দেহ রহিল না।

যেন ঊর্দ্ধ হইতে ধ্বনি হইল, "ছি, কেঁদ না!"

আমার প্রেতযোনিতে বিশ্বাস চিরকালই ছিল, কিন্তু বিশ্বাস থাকা ও প্রত্যক্ষ হওয়া, উভয়ের পার্থক্য অনেক। কাজেই বিশ্বাস ও আমি উভয়েই ভয়ে কাঁপিয়া উঠিলাম।

আমি। কে তুমি?

ভূত। সুঁহাঁসিঁনী—

একটা প্রবাদ আছে যে, মরিলেও ম্যালেরিয়া ছাড়ে না; যদি সুহাসিনী হয়, তবে নিশ্চয় ম্যালেরিয়া ছাড়ে নাই। ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ গ্রহণ করিতে উৎ-

সুক হইয়া অঞ্চলে বাঁধা আদার কুচি ও কুইনাইন বাহির করিয়া ঊর্দ্ধে দেখাইলাম। আমি, জিজ্ঞাসা করিলাম তোমার জ্বর আসিয়াছে কি?

ভূত। হাঁ।

আমি। আচ্ছা, একখানা আদার কুচি খাও ত ধন!

যেন কে আমার হস্ত হইতে আদার কুচি লইয়া খাইতে লাগিল। বাস্তবিক, আমার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। এ কি কখনও সম্ভব হইতে পারে? ভয়ে ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিলাম। ঘর্ম্মাপ্লুত অবস্থায় পিসীকে চীৎকার করিয়া ডাকিব, এমন সময়ে দুইটি কোমল হস্ত আমার মুখ চাপিয়া ধরিল, "নাথ! দাসীকে কেন এত কষ্ট দিতেছ।"

এবার নাকি সুর নাই। আমি কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলাম, "একবার বল ত রাম।" সে বলিল "রাম।" আমার অনেকটা সাহস হওয়াতে বলিলাম, "এ কি রকম! বাঃ!—"

১১

উপর্য্যপরি স্নায়ুর উত্তেজক ঘটনাবলী আমাকে অবসন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল।

"তুমি কি সত্যই সুহাসিনী?"

সুহাসিনী। হাঁ।

আমি। তবে প্রসাদ কই?

সুহাসিনী। সে আমার ভাই, তাকে সঙ্গে করে কল্য এখানে আসিয়াছি।

আমি। পিসীমা জানেন?

সুহাসিনী। জানেন বৈকি, তিনিই এই ফুলশয্যা পাতিয়া দিয়াছেন।

আমি। তবে তুমি ছিলে কোথা?

সুহাসিনী। আমি দড়িতে ঝুলিতেছিলাম। তুমি আমাকে পায়ে ঠেলিলে আমি গলায় দড়ি দিয়া মরিব।

আমি সুহাসিনীকে নিকটে টানিয়া আনিলাম। জ্বর ছাড়িতেছিল।

আমি। প্রসাদ চলিয়া গিয়াছে?

সুহাসিনী। না; নীচের ঘরে শুইয়া আছে।

আমি। তোমরা আমাকে এমন ফাঁদে ফেলিলে কেন?

অন্ধকারের মধ্যে দুটি তারকার ন্যায় তাহার অশ্রুসিক্ত চক্ষু দেখিয়া আমার হৃদয়ে ব্যথা লাগিল। চুম্বনের পরিশ্রমটা আমিই ঘাড় পাতিয়া লইলাম। তাহার পর আর কি? অনেক কৈফিয়ৎ আদান-প্রদানের পর ইহাই স্থির হইল যে, সুহাসিনী আমারই, এবং আমিও তাহারই। সেও আমাকে বাসর-ঘরে ভালবাসিয়াছিল, আমিও বাসিয়াছিলাম; তবে বায়ু ও পিত্তের বৈষম্যে এতদিন সবিরাম জ্বরে ভুগিতেছিলাম, অবিরাম জ্বরে পরিণত হইতে পারে নাই। সেই অবধি আমরা বরাবর আদার কুচি ও কুইনাইন ব্যবহার করি। আর কি করিব? বাঃ!—

সহযোগী সাহিত্য।

মার্ক টোয়েন।

গত জুলাই মাসের 'ক্যাসল্‌স্‌ ম্যাগাজিনে' মিষ্টার নর্থ্‌প্‌ 'মার্ক টোয়েনের সহিত এক দিবস' নাম দিয়া একটি মনোজ্ঞ নক্সা অঙ্কিত করিয়াছেন। এই নক্সায় পরিহাসরসিকের শৈশব-কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। তাঁহার প্রকৃত নাম সামুয়েল ক্লেমেন্স। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম। যখন তাঁহার বয়স তিন বৎসর, তখন একবার তাঁহার পিতা হানিবল্‌ নামক স্থানে বাসস্থানপরিবর্তন করিবার সময় শিশুর কথা একেবারে বিস্মৃত হইয়া তাঁহাকে পূর্ব্ব আবাসে ফেলিয়া যান। শিশু তখন উদ্যানে কর্দ্দমপিণ্ডনির্ম্মাণে ব্যস্ত ছিল। অল্প ক্ষণের পর জনৈক আত্মীয় শিশুকে তদবস্থায় দেখিতে পাইয়া তাহাকে পথে পিতার নিকট পঁহুছাইয়া দিয়া আসেন। বাল্যকালে দুর্ব্বল ছিলেন বলিয়া কেহ তাঁহাকে শিক্ষা ও কাজকর্ম্ম সম্বন্ধে পীড়াপীড়ি করিত না। ঐ সময়ে তাঁহার একটি কুঅভ্যাস ছিল—স্বপ্নসঞ্চরণ। বালক ঘুমের ঘোরে উঠিয়া বেড়াইত। ১৫ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে মার্ক টোয়েন নয় বার প্রায় জলমগ্ন হইয়াছিলেন।

দ্বাদশবর্ষ বয়সে পিতৃবিয়োগ ঘটাতে বালককে তাঁহার ভ্রাতার আফিসে কাজকর্ম্ম শিখিতে হয়। ভ্রাতা পল্লীগ্রামে একখানি সংবাদপত্রের পরিচালন করিতেন। সেই পত্রে বালকের রহস্যচর্চ্চার "হাতে খড়ি" হয়। মুদ্রাকর বালক হইতে তিনি একবার সপ্তাহকালের জন্য সম্পাদকের পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। যখন তাঁহার বয়স পনের বৎসর, তখন একবার তিনি ফিলাডেলফিয়ায় পলাইয়া গিয়া 'লেজার' পত্রের মুদ্রণে নিযুক্ত হন। তার পর সাত বৎসর মিসিসিপিতে পাইলটের কাজ করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে প্রায় ১৫০০ মাইলের মধ্যে প্রত্যেক স্থল তাঁহার নখদর্পণে ছিল। উত্তর ও দক্ষিণ বিভাগের মধ্যে দাসপ্রথা লইয়া যখন যুদ্ধ উপস্থিত হয়, তখন তিনি পাঁচ সপ্তাহ কাল দক্ষিণ বিভাগের সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করেন।

একখানি শকটযোগে তিনি আমেরিকা-ভ্রমণে বাহির হন। ঐ যাত্রায় তিনি তাঁহার Roughing It এর উপাদান সংগ্রহ করেন। নেভাডায় অবস্থানকালে তরুণ ক্লেমেন্স স্থানীয় Enterprise পত্রে লিখিতে আরম্ভ করেন। ঐ পত্র ভার্জিনায় মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইত। ঐ সময়ে তাঁহার রচনাবলী Josh ইতি ছদ্মনামে প্রকাশিত হইত। কিন্তু কিছু দিন পরেই আবার M. Twain এই নামে বাহির হইতে থাকে। এই নাম মিসিসিপিতে পাইলট-দিগের ব্যবহৃত জল মাপিবার সঙ্কেত হইতে উদ্ভূত। পরিমাণরজ্জুর চিহ্নানুযায়ী জলের গভীরতা কোথাও চার 'বাম', কোথাও দুই 'বাম'। M. Twain অর্থাৎ দুই 'বাম', এই সঙ্কেত কিঞ্চিৎ বিচিত্র ও সুমিষ্ট বলিয়া লেখক উহা গ্রহণ করেন, এবং তাঁহার সাহিত্যরচনায় চিরপ্রসিদ্ধ করিয়াছেন।

কিছু কাল খনির ব্যবসায় করিবার পর তিনি দুই বৎসর Enterpriseএর সম্পাদন কার্য্য করেন। পরে ২৯ বৎসর বয়সে সানফ্রান্সিস্কোর 'Call'এর সংবাদদাতা হইয়া যান। অনতিকাল পরেই স্যাণ্ডউইচ্‌ দ্বীপে গিয়া তথায় তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্ত অবলম্বনে বক্তৃতা আরম্ভ করেন। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে তিনি কালিডোনিয়ায় একখানি সংবাদপত্র কর্ত্তৃক য়ুরোপ-পর্য্যটক দলের নেতৃত্বে বৃত হইয়া য়ুরোপে গমন করেন। ঐ ভ্রমণের ফল তাঁহার Innocent Abroad নামক গ্রন্থ। এই পুস্তকখানির প্রায় ১০০০০০ দশ লক্ষ বিক্রীত হইয়াছিল। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে তিনি বিবাহ করেন। তিনি শ্বশুরের নিকট একখানি সুন্দর বাড়ী এবং একখানি লাভজনক পত্রিকায় তৃতীয়াংশ লাভ করেন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে ঐ মূলধন সাহায্যে তিনি ওয়েবেষ্টার কোম্পানী নামে পুস্তকপ্রকাশকের ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। এই ব্যবসায়ে তিনি বিলক্ষণ সঙ্গতিসম্পন্ন হইয়া উঠেন। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে পুস্তকের ব্যবসায়ে অত্যন্ত ক্ষতি হইল, এবং ঋণপরিশোধের জন্য বিব্রত হইয়া পড়িলেন। অনেকেই তাঁহাকে ব্যবসায় বন্ধ করিয়া পাওনাদারদিগের সহিত একটা

রক্ষা করিতে বলিলেন। এত অধিক বয়সে অন্য কোনও লেখককে এমন গুরুতর দায়ে পড়িতে হয় নাই। যে ঋণভার তিনি ইচ্ছা করিলেই অনায়াসে নিজ স্কন্ধ হইতে অপসৃত করিতে পারিতেন, তিনি তাহারই পরিশোধার্থ নিজের মস্তিষ্ক বাঁধা দিলেন। কয়েক দুই বৎসরের মধ্যে তাঁহার ঋণ সমস্ত শোধ হইয়া আসিল বটে, কিন্তু জীবনযাত্রানির্ব্বাহের জন্ম তাঁহাকে আবার সাহিত্যশ্রমে প্রবৃত্ত হইতে হইল।

সারাঙ্কা হ্রদের দক্ষিণ উপকূলে তটপ্রান্তেই একখানি পল্লীকুটীরে এই সুবিখ্যাত রহস্য-নিপুণের বাস। হ্রদটি আমেরিকার হ্রদসমুদায়ের মধ্যে সৌন্দর্য্যে সমধিক খ্যাত। তিনি ক্ষুদ্র গৃহকোণটি ছাড়িয়া কোথাও নড়িতে চাহিতেন না। কদাচিৎ পরিবারবর্গের সহিত হ্রদবক্ষে নৌকাবিহারে বাহির হইতেন। প্রায় সর্ব্বদাই শৈলমধ্যে কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন; বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত বড় একটা সাক্ষাৎ করিতেন না।

লোকালয় হইতে সুদূরে অবস্থিত ও কৌতূহলী পথিকবর্গের পক্ষে দুর্গম বলিয়া তিনি ঐ নিভৃত স্থানটি মনোনীত করেন। গৃহের উত্তরাংশে হ্রদের আরও নিকটে শ্যামস্নিগ্ধ ছায়াতটে মার্ক টোয়েন নিজের জন্ম একটি নিভৃত আশ্রম নির্ম্মিত করিয়াছেন। সেখানে একটি টেবিল ও একখানি চেয়ার ব্যতীত আর কিছু নাই। এই ক্ষুদ্র আশ্রমে একান্ত নিভৃতে মার্ক টোয়েন যাবতীয় গ্রন্থের রচনা করেন। সাধারণতঃ তিনি এক দিনে প্রায় ২০০০ শব্দ লিখিতে পারেন। কখন কখন উহার সংখ্যা ৩০০০ পর্য্যন্ত উঠে, কিন্তু সে কদাচিৎ। লিখনকার্য্যে তিনি হংসপুচ্ছ ব্যবহার করেন। টাইপ-রাইটার যন্ত্র তিনি দেখিতে পারেন না। প্রতিদিন প্রাতে ১০টার সময় তাঁহার নিভৃত আশ্রমে প্রবেশ করিয়া দৈনিক কার্য্য আরম্ভ করেন। তাঁহার দৈনিক কার্য্য অনেকটা আফিসের কার্য্যের মত। কোনও দিন কোনও কারণে তাঁহার নির্দ্দিষ্ট দৈনিক ব্যবস্থার ব্যতিক্রম ঘটে না। ৫।৭ ঘণ্টা পরিশ্রমের পর তিনি দিবসের অবশিষ্ট ভাগ ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করেন।

হাটফোর্ড নামক স্থানে তাঁহার একটি শীতাবাস আছে। যখন তিনি এখানে বাস করেন সপ্তাহে একদিন তাঁহার বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত সাক্ষাতের জন্ম নির্দ্দিষ্ট থাকে। তাঁহার বন্ধুর সংখ্যা বড় অল্প নহে। বিলিয়ার্ড তাঁহার বড় প্রিয়। ইহাতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। কিছু-দিন পূর্ব্বে দ্বিচক্রযানে ভ্রমণ করিতে বড় ভালবাসিতেন, কিন্তু তাহাতে আর তাঁহার অনুরাগ নাই। তাম্রকূটে তাঁহার একান্ত অনুরাগ। দৈনিক কুড়িটি চুরুটের কমে তাঁহার চলে না। ব্রাউনিং তাঁহার প্রিয় কবি, এবং ঐতিহাসিক চরিত্রের মধ্যে নেপোলিয়ন তাঁহার প্রিয়।

চিত্রশালা।

এক রাজার তিন কন্যা ছিল। সাইকী তন্মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠা। অনিন্দ্যসুন্দরী সাইকীর অলৌকিক সৌন্দর্য্যে ঈর্ষান্বিতা হইয়া রোমীয় পুরাণের ভিনাস্ পুত্র কিউপিডকে (মদনকে) আদেশ করেন, সাইকীকে কোনও প্রকারে নির্য্যাতন কর। মাতার এই অনুশাসন পালন করিতে গিয়া কিউপিড সাইকীর প্রেমাসক্ত হইয়া পড়েন; এবং এক সুন্দর বিজন উপত্যকায় সাইকীকে আনিয়া রাখেন। কিউপিড অলক্ষ্যে থাকিয়া প্রতি নিশীথে সাইকীর দর্শনসুখ উপভোগ করিতেন। সাইকীর প্রতি আদেশ থাকে, তিনি যেন কিউপিডকে দেখিবার চেষ্টা না করেন। কিন্তু সহোদরাদের প্ররোচনায় ও নিজের কৌতূহল চরিতার্থ করিতে গিয়া সাইকী এই আদেশ লঙ্ঘন করেন, এবং তাহার ফলে পরিত্যক্ত হইয়া পড়িয়া থাকেন। প্রাণা-ধিকের বহু অন্বেষণের পর অবশেষে তিনি জুপিটারের অনুগ্রহে অমরত্ব লাভ করিয়া কিউপিডের পরিণীতা হইয়া চিরসহচরীরূপে বিরাজ করিতে থাকেন।

সাহিত্য পরিণতি লাভ করিয়াছে, তাহা অত্যন্ত সুন্দর ও সুকুমার। কেবল সাহিত্য নয়, শিল্পকলাতেও ইহাদের প্রভাব অনন্যসাধারণ। র‍্যাফেলের অতুলনীয় চিত্রাবলীর মধ্যেও কয়খানি অনুপম চিত্র এই মদন ও রতির আলেখ্যমূলক।

উইলিয়াম বুগেরিওর এই বর্ত্তমান আলেখ্যে সাইকীর স্বর্গারোহণ চিত্রিত হইয়াছে। সৌষ্ঠব-সামঞ্জস্য ও শিল্পসাফল্যের জন্য বুগেরিওর চিত্র শিল্পজগতে সুবিখ্যাত।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

প্রদীপ। বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ। প্রথমেই শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র নিয়োগীর রচিত "ক্লিয়োপেট্রা" নামক একটি সুদীর্ঘ পদ্য। ভারতচন্দ্র লিখিয়া গিয়াছেন, "কোনও গুণ নাই তার কপালে আগুন।" "ক্লিয়োপেট্রা" সম্বন্ধে এ কথা বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। কবিবর শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন মহাশয়ের "ক্লিয়োপেট্রা"র পর হরিশ্চন্দ্র কবিত্বক্ষেত্রে মৈশরী কবিতার চাষ করিলেন কেন, বলিতে পারি না। "শব্দ ও সঙ্গীত" শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায়ের রচিত চলনসই বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ। "হাস্যরসের রচনা" এবার দুটি দেখিতেছি—একটি ঠাকুরদাস বাবুর; আর একটি হরিসাধন বাবুর—নাম "কঙ্কণ চোর।" প্রথমটি হাস্যরসের ব্যাখ্যা; দ্বিতীয়টি হাস্যরসের উৎস।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা। নবম ভাগ, প্রথম সংখ্যা। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের সম্পাদকতায় পরিষৎ-পত্রিকা পরিষদের যোগ্য হইয়াছে, মুক্তকণ্ঠে তাহা বলা যায়। এ সংখ্যায়, শ্রীযুক্ত মেঘনাদ ভট্টাচার্য্য "শব্দসমালোচনায়" প্রবৃত্ত হইয়াছেন। লেখক বহু প্রচলিত শব্দের মূলের অনুসন্ধান করিয়াছেন। শব্দগুলি অকারাদি বর্ণক্রমে সজ্জিত হইলে আরও ভাল হইত। শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের "বাঙ্গলা কর্ম্মকারক" উপাদেয় প্রবন্ধ। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বিজ্ঞানসম্মত পথে বাঙ্গলা কর্ম্মকারকে বিভক্তি যোগের নিয়ম আবিষ্কৃত করিয়া বাঙ্গলা ভাষার উপকার করিয়াছেন। তাঁহার শেষ সিদ্ধান্ত এই,—"ক্লীবলিঙ্গ ভিন্ন সর্ব্বনামে, সংজ্ঞাবাচক শব্দে, নির্দ্দেশার্থে, এবং দ্বিকর্ম্মক ধাতুর গৌণকর্ম্মে বিভক্তির প্রয়োগ হয়। এতদ্ভিন্ন অপরাপর স্থলে বিভক্তির লোপ হয়।" শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক সঙ্কলিত "কবিবল্লভের রসকদম্ব" প্রবন্ধে একখানি প্রাচীন কাব্যের পরিচয় আছে। শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র ঘোষের "তমলুক" একটি চলনসই ঐতিহাসিক রচনা। শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্যের সঙ্কলিত "গোলোকসংহিতা" ও "মঙ্গলচণ্ডীর পাঁচালী" প্রাচীন সাহিত্য-প্রিয় পাঠকের প্রীতিবিধান করিবে। পরিষদের "কার্য্যবিবরণী" অনায়াসে অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত হইতে পারে। কিন্তু সংক্ষিপ্তই হউক, আর বিস্তৃতই হউক, 'যথাযথ' না হইলে কোনও বিবরণই বিশ্বাসযোগ্য হয় না। পরিষদের তৃতীয় মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণে ব্যাকরণ প্রবন্ধের আলোচনায় আমার (সুরেশচন্দ্র সমাজপতির) উক্তি বলিয়া যাহা মুদ্রিত হইয়াছে, তাহার শেষ বক্তব্যটি আমার নহে; কাহার উক্তি আমার বলিয়া প্রচারিত হইল, তাহা বলিতে পারি না। এরূপ অসাবধানতা অমার্জ্জনীয়।

মুকুল। জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়। মুকুল শুকাইয়া ঝরিয়া পড়ে নাই, ইহাই আমাদের সৌভাগ্য বলিয়া মনে করি। কিন্তু মুকুলের সে শ্রী নাই, সে সৌন্দর্য্য নাই। বর্ত্তমান সংখ্যায় বিবিধ প্রবন্ধের সমাবেশ আছে;—কিন্তু একটিতেও যত্নের চিহ্ন দেখিলাম না। "প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ", "মার্টিনিকে অগ্ন্যুৎপাত" ও "প্রাণীরা পরস্পরের বন্ধু" প্রভৃতি রচনা বিষয়গুণে চিত্তাকর্ষক। কিন্তু ভাষার দোষে অত্যন্ত কলঙ্কিত। সম্পাদক মহাশয় এ বিষয়ে অবহিত হইলে ভাল হয়।
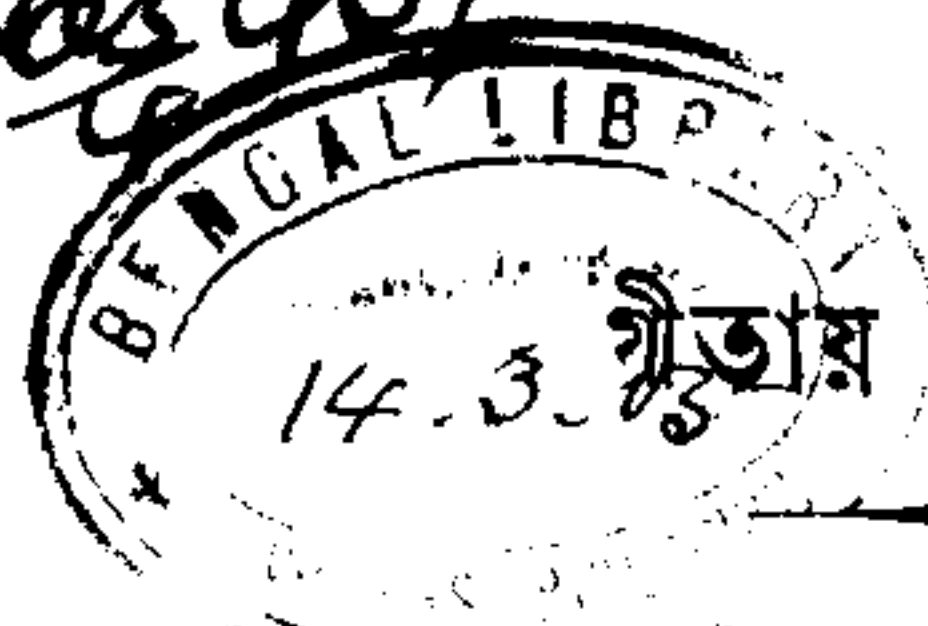
গীতায় ঈশ্বরবাদ।

৫। সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রবন্ধে * যথাক্রমে ন্যায়, বৈশেষিক ও পূর্ব্বমীমাংসা দর্শনের সহিত গীতার সম্বন্ধ আলোচিত হইয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে গীতার প্রবর্ত্তিত অপূর্ব্ব কর্ম্মযোগের আলোচনা করিয়া জ্ঞানবাদ ও গীতার সম্বন্ধ বিচার করিতে চেষ্টা করিব।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, একশ্রেণীর জ্ঞানবাদী সাধক কর্ম্মের ভঙ্গুরতা, কর্ম্মীর পতন, কর্ম্মের বন্ধনযোগ্যতা প্রভৃতি দোষ দর্শন করিয়া এককালে কর্ম্ম বর্জ্জন করিতেন। তাঁহারা নিজেদের কর্ম্মসন্ন্যাসী বলিয়া খ্যাপন করিতেন। তাঁহারা নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য, কোনরূপ কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করিতেন না। কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য সকল কর্ম্মেরই বর্জ্জন করিতেন। গীতা কিন্তু এরূপ কর্ম্মসন্ন্যাসের অনুমোদন করেন না। গীতা বলেন যে, কর্ম্ম না করিয়া জীব এক ক্ষণও থাকিতে পারে না। কারণ, প্রকৃতির গুণের তাড়নায় তাহাকে অনিচ্ছায়ও কর্ম্ম করিতে হয়।

> ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
> কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ ॥—গীতা—৩।৫।

গীতার মতে কর্ম্মাসক্তি যেমন দোষের, অকর্ম্মাসক্তিও সেইরূপ দোষের।

> মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি।—গীতা—২।৪৭।

'ফলাকাঙ্ক্ষা করিয়া কর্ম্ম করিও না, কিংবা কর্ম্মত্যাগে (অকর্ম্মে) আসক্ত হইও না।'

গীতা বলেন যে, কর্ম্ম যে বন্ধের কারণ হয়, তাহার হেতু এই যে, জীব ফলের আকাঙ্ক্ষা করিয়া আসক্তচিত্তে অহঙ্কার-বুদ্ধিতে কর্ম্ম করে। কিন্তু জীব যদি ফলাকাঙ্ক্ষা-রহিত হইয়া অনাসক্তচিত্তে কর্ত্তব্যবুদ্ধির প্রেরণায় কর্ম্ম করিতে পারে, তবে আর কর্ম্ম তাহাকে বন্ধন করিতে পারিবে না।

> অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ।
> স সংন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্নচাক্রিয়ঃ ॥—গীতা—৬।১।

* সাহিত্য, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

'কর্ম্মফলের আকাঙ্ক্ষা না করিয়া, কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে যিনি কর্ম্ম করেন, তিনিই সন্ন্যাসী, তিনিই যোগী; কর্ম্মত্যাগী, অগ্নিহীন (অগ্নি যজ্ঞানুষ্ঠানের চিহ্ন) ব্যক্তি প্রকৃত সন্ন্যাসী নহেন।'

কর্ম্ম সাধারণতঃ বন্ধের কারণ বটে, কিন্তু এরূপ ভাবে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা যাইতে পারে যে, কর্ম্মও করা হইবে, অথচ, কর্ম্মজনিত বন্ধন ঘটিবে না। এইরূপ কর্ম্মের কৌশলকে কর্ম্মযোগ বলে। 'যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলং'।—গীতা এই কর্ম্মযোগের প্রচার করিয়া, কর্ম্ম ও অকর্ম্ম, কর্ম্মানুষ্ঠান ও কর্ম্ম-সন্ন্যাস, এই উভয়ের অদ্ভুত সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছেন। গীতা বলেন, কর্ম্মযোগ ও কর্ম্ম-সন্ন্যাস, এ উভয়ই শ্রেয়ঃসাধন বটে; কিন্তু কর্ম্ম-সন্ন্যাস অপেক্ষা কর্ম্মযোগ শ্রেষ্ঠ। কারণ, কর্ম্ম-সন্ন্যাসের মূলে স্বার্থপরতা, আর কর্ম্মযোগের মূলে সর্ব্ব-জীবের হিতৈষণা।

সন্ন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ।
তয়োস্তু কর্ম্মসন্ন্যাসাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে—গীতা—৫। ২।

যাঁহারা সাধনমার্গে অগ্রসর হইয়া জীবন্মুক্তির অধিকারী হইয়াছেন, তাঁহারা যদি জগতের হিতার্থ কর্ম্মানুষ্ঠান না করিয়া নিজেদের স্বার্থ-সিদ্ধির উদ্দেশ্যে কর্ম্ম-সন্ন্যাস করিয়া বসিয়া থাকেন, নিজেদের মুক্তিলাভই সার করেন, তবে কি তাঁহারা আধ্যাত্মিক স্বার্থপরতা দোষে দূষিত হয়েন না? তাঁহারা যদি না কর্ম্ম করিতে স্বীকার করেন, তবে জগদ্ব্যাপার কিরূপে নিষ্পন্ন হইতে পারে? মুক্ত পুরুষেরাই ত জগতের স্থিতির জন্য বিশেষ বিশেষ অধিকারের ভার বহন করিয়া—কেহ মনু হইয়া, কেহ সপ্তর্ষি হইয়া, কেহ ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ প্রভৃতির কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়া, ভগবানের পালন কার্য্যে সহায়তা করেন। ভগবান নিজের কর্ম্মানুষ্ঠান সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, ইঁহাদের সম্বন্ধেও সেই কথা বলা যায়।

ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি॥
যদি হ্যহং ন বর্ত্তেয়ং জাতু কর্ম্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥
উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্মচেদহম্।—গীতা—৩। ২২—২৪।

'হে অর্জ্জুন! তিন লোকে আমার কিছুই কর্ত্তব্য নাই; এমন কোন বস্তু নাই, যাহা আমি পাই নাই, যাহা পাইবার জন্য কর্ম্মানুষ্ঠান করিব।

তথাপি আমি কর্ম্ম করিতেছি। কারণ, আমি যদি না অবহিত হইয়া সর্ব্বদা কর্ম্মানুষ্ঠান করি, তবে অপরে আমার অনুকরণ করিবে, এবং তাহার ফলে সমস্ত লোক উৎসন্ন যাইবে।'

সেই জন্য সাধকোত্তমেরা ভগবানের অনুকরণে সতত কর্ম্মযোগ অবলম্বন করিয়া কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন।

এই কর্ম্মযোগ আয়ত্ত করিবার প্রণালী কি? কর্ম্মযোগে উপনীত হইতে হইলে, পর পর তিনটি সোপান অতিক্রম করিতে হয়। সে সোপান কয়টি যথাক্রমে—১ম, ফলাকাঙ্ক্ষা-বর্জ্জন, ২য়, কর্তৃত্বাভিমান-পরিত্যাগ, এবং ৩য়, ঈশ্বরার্পণ। প্রথম দুইটির উপদেশ শাস্ত্রান্তরেও দেখা যায়, কিন্তু ঈশ্বরার্পণবুদ্ধিতে কর্ম্মানুষ্ঠানের উপদেশ গীতার সম্পূর্ণ নিজস্ব।

১। ফলাকাঙ্ক্ষা-বর্জ্জন। গীতা বলিতেছেন,—

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।—গীতা—২। ৪৭।

'কর্ম্মেই তোমার অধিকার, ফলের সহিত সম্পর্ক রাখিও না।'

অতএব অনাসক্ত হইয়া ফলকামনা পরিত্যাগ করিয়া কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর।'

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।—গীতা—৩। ১৯।

এতান্যপি তু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ।

কর্ত্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্॥—গীতা—১৮। ৬।

'যজ্ঞ, তপঃ, দান প্রভৃতি কর্ম্ম ত্যাগ করা উচিত নহে; কিন্তু আসক্তি-রহিত হইয়া, ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া, ইহাদিগের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য।'

২। কর্তৃত্বাভিমান-পরিত্যাগ। কর্ম্ম যে পাশ-রূপে পরিণত হইয়া জীবকে বন্ধন করে, তাহার প্রধান কারণ জীবের অহঙ্কার-বুদ্ধি। জীব অভিমান-বশে মনে করে, 'আমিই কর্ম্ম করিতেছি'; বাস্তবিক কিন্তু জীব অকর্ত্তা। কায়িক অথবা মানসিক, যাহা কিছু কর্ম্ম হয়, সমস্তই প্রকৃতির যে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণ, তাহাদিগেরই প্রেরণায় সিদ্ধ হয়। অতএব বিবেকবুদ্ধিতে দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, আত্মা কর্ত্তা নহেন, তিনি স্বতন্ত্র কেবল। গীতা বলিতেছেন,—

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।

অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥—গীতা—৩। ২৭।

'প্রকৃতির গুণের দ্বারা সমস্ত কর্ম্ম সিদ্ধ হইতেছে; কিন্তু যাহারা অহঙ্কারে

মূঢ়চিত্ত, তাহারা নিজেকে কর্ত্তা মনে করে।' এই অযথা কর্ত্তৃত্বাভিমান পরিত্যাগ করিতে হইবে।

নান্যং গুণেভ্যঃ কর্ত্তারং যদা দ্রষ্টানুপশ্যতি।
গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মদ্ভাবং সোঽধিগচ্ছতি॥—গীতা—১৪। ১৯।

'যখন জীব বুঝিতে পারে যে, গুণ ভিন্ন অন্য কর্ত্তা নাই, আত্মা দ্রষ্টামাত্র, এবং গুণ হইতে স্বতন্ত্র, তখন সে ভগবদ্ভাব লাভ করে।'

গীতা অন্যত্র বলিতেছেন,—

নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ।
পশ্যন্ শৃন্বন্ স্পৃশঞ্জিঘ্রন্নশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপঞ্ছ্বসন্॥
প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্নন্ উন্মিষন্নিমিষন্নপি।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্ত ইতি ধারয়ন্॥—গীতা—৫। ৮—৯।

'তত্ত্বজ্ঞ কর্ম্মযোগী এইরূপ মনে করিবেন যে, আমি কিছুই করিতেছি না। দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন, ঘ্রাণ, অশন, গমন, নিদ্রা, নিশ্বাস, বচন, গ্রহণ, উৎসর্গ, নিমেষ প্রভৃতি সমস্ত ইন্দ্রিয়ব্যাপার ও কর্ম্মব্যাপারের অনুষ্ঠানকালে তিনি এই ধারণা করিবেন যে, ইন্দ্রিয়সকল স্ব স্ব বিষয়ে ব্যাপৃত রহিয়াছে মাত্র।'

গীতা আরও বলিতেছেন,—

যস্য নাহংকৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাপি স ইমান্ লোকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে॥—গীতা—১৮। ১৭।

'যাহার অহঙ্কার-বুদ্ধি নাই, যাহার বুদ্ধি নির্লিপ্ত, সে কর্ম্ম করিলেও বদ্ধ হয় না।'

৩। ঈশ্বরার্পণ। মানুষ সাধারণতঃ কর্ম্মানুষ্ঠান করে নিজের জন্য, সঙ্কল্প-সিদ্ধির জন্য, স্বার্থের প্রেরণায়। গীতার উপদেশ এই যে, সমস্ত কর্ম্মফল ঈশ্বরে অর্পণ করিতে হইবে। তাঁহারই উদ্দেশে, তাঁহারই কার্য্য সাধন করিতেছি, এই ভাবে জগতের হিতের জন্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হইবে।

ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা॥—গীতা—৫। ১০।

'ঈশ্বরে কর্ম্ম অর্পণ করিয়া, আসক্তিরহিত হইয়া যে কর্ম্ম করিতে পারে, সে পাপে লিপ্ত হয় না; যেমন পদ্মপত্র জলে লিপ্ত হয় না।'

যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।—গীতা ৩। ৯।

'যজ্ঞ ভিন্ন অন্য উদ্দেশ্যে কর্ম্ম করিলে সে কর্ম্ম বন্ধের কারণ হয়।'

যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে ।—গীতা—৪ । ২৩ ।

'যজ্ঞের উদ্দেশ্যে যে কর্ম্ম করা যায়, সে সমস্ত বিলীন হইয়া যায়'।

এই যজ্ঞের অর্থ কি ? শঙ্করাচার্য্য "যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ"—"যজ্ঞই বিষ্ণু" এই শ্রুতির প্রমাণে যজ্ঞ অর্থে ঈশ্বর স্থির করিয়াছেন। যজ্ঞার্থে কর্ম্ম করার অর্থ, ঈশ্বরোদ্দেশে কর্ম্ম করা, ঈশ্বরে কর্ম্মফল অর্পণ করা। যজ্ঞ শব্দের আর এক প্রকার অর্থ করা যাইতে পারে। যজ্ঞকে এখন আমরা 'জগ্‌গি'তে পরিণত করিয়াছি; একটা ধূমধাম হৈ চৈ ব্যাপারই আমাদের দৃষ্টিতে যজ্ঞ। যজ্ঞের কিন্তু আদিম অর্থ এরূপ নহে। যজ্ঞের মর্ম্মভাব,—ত্যাগ (sacrifice); যজ্ঞের ইংরাজী অনুবাদ 'sacrifice' শব্দে এখনও সে ত্যাগের ভাব উজ্জ্বল রহিয়াছে। যজ্ঞার্থে কর্ম্ম করার এরূপ অর্থও হইতে পারে যে, ত্যাগের ভাবে (as a sacrifice) কর্ম্মানুষ্ঠান করা। যে কর্ম্মে কোন স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্য নাই, যে কর্ম্মের মূলে সংকল্পলাভের প্রত্যাশা নাই, যে কর্ম্ম অহঙ্কাররহিত হইয়া ভগবানের উদ্দেশ্যে সমর্পণ করা হয়, তাহাই যজ্ঞ কর্ম্ম। ভগবান গীতাতে পুনঃপুনঃ উপদেশ দিয়াছেন যে, মানুষ যাহা কিছু করিবে, তাহা যেন তাঁহাকেই অর্পণ করে; তাহা হইলে আর তাহাকে কর্ম্ম-বন্ধনে বদ্ধ হইতে হইবে না।—

যৎকরোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ মদর্পণম্ ॥
শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্ম্মবন্ধনৈঃ।
সংন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি ॥—গীতা—৯। ২৭—২৮।

'যাহা কিছু কর্ম্ম করিবে, অশন, যজন, দান, তপস্যা, সমস্তই আমাতে (ঈশ্বরে) অর্পণ করিবে। তাহা হইলে শুভ অশুভ সমস্ত কর্ম্ম-বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া সন্ন্যাসযোগযুক্ত হইয়া আমাকে প্রাপ্ত হইবে।'

এ বিষয়ে ভাগবতে একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইয়াছে।—

এতৎ সংসূচিতং ব্রহ্মংস্তাপত্রয়চিকিৎসিতম্।
যদীশ্বরে ভগবতি কর্ম্ম ব্রহ্মণি ভাবিতং ॥
আময়ো যশ্চ ভূতানাং জায়তে যেন সুব্রত।
তদেব হ্যাময়ং দ্রব্যং ন পুনাতি চিকিৎসিতং ॥—ভাগবত—১। ৫। ৩২—৩৩।

'যে দ্রব্যের কারণে কোন রোগ উৎপন্ন হইয়াছে, সেই দ্রব্য সেবন করিলে সে রোগের উপশম হয় না। কিন্তু যদি সেই দ্রব্যকে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের প্রণালীমতে দ্রব্যান্তর দ্বারা ভাবিত করিয়া লওয়া যায়, তবেই তদ্দ্বারা রোগ-

শান্তি হয়। সেই রূপ, এই যে তাপত্রয়গ্রস্ত ভবরোগ, ইহার উৎপত্তি কর্ম্ম হইতে। কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা তাহার উপশম হয় না। কিন্তু সে কর্ম্ম যদি ভগবানে (ব্রহ্মে) সমর্পিত হয়, তবে ঈশ্বর দ্বারা ভাবিত সেই কর্ম্ম দ্বারাই ত্রিতাপের উন্মূলন সাধিত হয়।' (২)

যে এরূপ করিতে পারে, তাহার কর্ম্ম আর কর্ম্ম থাকে না, অকর্ম্ম হইয়া যায়। সে সকল কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করে, অথচ কর্ম্মের ফল যে বন্ধন, তাহা হইতে মুক্ত থাকে।

কর্ম্মণ কর্ম্ম যঃ পশ্যেৎ অকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনু ষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ ॥—গীতা—৪। ১৮।

'যে কর্ম্মে অকর্ম্ম দেখে, এবং অকর্ম্মে কর্ম্ম দেখে, সেই মনুষ্যের মধ্যে বুদ্ধিমান, সেই কর্ম্মযোগী, সেই সমস্ত কর্ম্ম নিষ্পন্ন করে।' গীতার শিক্ষা এই যে, জীব এই কর্ম্মযোগ আয়ত্ত করিয়া জগতের হিতার্থ সমস্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করুক, তাহাতে সেও কর্ম্মপাশের বন্ধনে পড়িবে না,—জগৎ ব্যাপারও সুনিষ্পন্ন হইবে। ইহাই গীতার উপদিষ্ট কর্ম্মযোগ।

৬। জ্ঞানবাদ ও গীতা।

জ্ঞানবাদীরা কর্ম্মানুষ্ঠানের বিরোধী। তাঁহারা কর্ম্ম-সন্ন্যাসের পক্ষপাতী। তাঁহাদের উপদেশ এই যে, 'জ্ঞানাৎ মোক্ষঃ'—জ্ঞানের ফলে মোক্ষলাভ হয়। তাঁহারা বলেন যে, জ্ঞানীকে কর্ম্ম স্পর্শ করিতে পারে না।

যথা পুষ্করপলাশ আপো ন শ্লিষ্যন্ত এবং বিদি পাপং কর্ম্ম ন শ্লিষ্যতে। ছান্দোগ্য—৪। ১৪। ৩।

'যেমন পদ্মপত্রকে জল স্পর্শ করিতে পারে না, সেইরূপ জ্ঞানীকে পাপ (এবং পুণ্য) কর্ম্ম স্পর্শ করিতে পারে না।'

তাঁহারা আরও বলেন যে, তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইলে সমস্ত অতীত কর্ম্ম ভস্মীভূত হইয়া যায়।

---

(২) মীমাংসা প্রকরণের রচয়িতা লোগাক্ষি ভাস্কর তাঁহার অর্থসংগ্রহেও এই মতের পোষকতা করিয়াছেন—'সোঽয়ং ধর্ম্মো যদুদ্দিশ্য বিহিতস্তদুদ্দেশেন ক্রিয়মাণস্তদ্ধেতুঃ। ঈশ্বরার্পণবুদ্ধ্যা ক্রিয়মাণস্তু নিঃশ্রেয়সহেতুঃ।' অর্থাৎ, বেদোক্ত ধর্ম্ম স্বর্গাদিলাভের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হইলে, স্বর্গাদিফলসাধক হয়; কিন্তু ঈশ্বরার্পণবুদ্ধিতে অনুষ্ঠিত হইলে মুক্তির কারণ হয়। অবশ্য মূল দর্শনে এ মতের কোন ভিত্তি নাই। কারণ, মূল দর্শন নিরীশ্বরবাদী

তদ্ যথেষীকাতূলম্ অগ্নৌ প্রোতম্ প্রদূয়েত এবং হাস্য সর্ব্বে পাপ্মানঃ প্রদূয়ন্তে।— ছান্দোগ্য—৫। ২৪। ৩।

'যেমন ঈষিকা তৃণের তুলা অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইলে ভস্মীভূত হয়, সেইরূপ জ্ঞানীর সমস্ত পাপ ভস্মীভূত হয়।'

ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥—মুণ্ডক—২। ২। ৮।

'সেই পরম বস্তু দর্শনগোচর হইলে সমস্ত কর্ম্ম ক্ষয় হইয়া যায়।' (৩)

সুতরাং জ্ঞানীকে আর সংসারে আসিতে হয় না। জ্ঞানার্জ্জনের ফলে জীব নির্ব্বাণের অধিকারী হয়।

জ্ঞানবাদীর মতে, এই জ্ঞান, পদার্থের বিচারও সদসদ্ বস্তুর বিবেক হইতে উৎপন্ন হয়।

গীতা জ্ঞানের বিরোধী নহেন। বরং জ্ঞানের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন।

ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।—গীতা—৪। ৩৮।

'জ্ঞানের সমান পবিত্র জগতে আর কিছুই নাই।'

সর্ব্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি।—গীতা—৪। ৩৬।

'জ্ঞানরূপ ভেলায় পাপ সমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়া যায়'।

যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা॥—গীতা—৪। ৩৭।

'হে অর্জ্জুন! যেমন প্রদীপ্ত অগ্নি কাষ্ঠরাশিকে ভস্মীভূত করে, সেইরূপ জ্ঞানাগ্নি সমুদয় কর্ম্মরাশিকে ভস্মীভূত করে।'

---

(৩) ব্রহ্মসূত্রও এই বিষয়ের প্রতিপাদন করিয়াছেন।

'তদধিগম উত্তরপূর্ব্বাঘয়োরশ্লেষবিনাশৌ তদ্ব্যপদেশাৎ॥'

'ইতরস্যাপ্যেবমসংশ্লেষঃ পাতে তু॥'—ব্রহ্মসূত্র ৪। ২। ১৩—১৪।

কর্ম্ম ত্রিবিধ—প্রারব্ধ, সঞ্চিত ও ক্রিয়মাণ। সাধারণতঃ ভোগের দ্বারা প্রারব্ধ কর্ম্মের ক্ষয় হয়। কিন্তু জ্ঞান উৎপন্ন হইলে সঞ্চিতের বিনাশ ও ক্রিয়মাণের অশ্লেষ হয়। অর্থাৎ, পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-জন্ম-কৃত কর্ম্মরাশি (যাহার ভোগের জন্য জীবকে পুনঃপুনঃ জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয়) তাহা বিনষ্ট হইয়া যায়। এবং ইহজন্মে যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা যায়, তাহাও বন্ধের হেতু হয় না।

এই যে জ্ঞান, ইহা তত্ত্বজ্ঞান—যাহাকে পরাবিদ্যা বলা যায়—অপরা বিদ্যা বা অবরজ্ঞান নহে। (৪) পরাবিদ্যা কাহাকে বলে? যে বিদ্যা দ্বারা সেই অক্ষর পুরুষকে লাভ করা যায়।

অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে।—মুণ্ডক উপনিষদ্।

তত্ত্বজ্ঞান অর্থে 'তৎ'এর জ্ঞান। তৎ = তিনি; ওঁ তৎ সৎ—সেই সচ্চিদানন্দ ভগবান্। গীতা বলেন যে, তাহাকেই জ্ঞান বলা যায়, যদ্দ্বারা জীব সমস্ত প্রাণীকে প্রথমতঃ আপনাতে এবং পরিশেষে ঈশ্বরে দর্শন করে।

যেন ভূতান্যশেষেন দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি॥—গীতা—৪। ৩৫।

অতএব তত্ত্বজ্ঞানী ভগবদ্ভক্ত না হইয়া থাকিতেই পারেন না। কারণ, তাঁহাকে জানিলেই তাঁহার প্রতি— পরা-অনুরক্তি বা পরম-প্রেমের উদয় হয়। অতএব জ্ঞানীকে ভক্ত হইতেই হয়। সেই জন্য গীতায় ভগবান্ চারি শ্রেণীর ভক্তের উল্লেখ করিয়া জ্ঞানীকেই শ্রেষ্ঠ ভক্ত বলিয়াছেন। এই চারি শ্রেণীর ভক্ত যথাক্রমে আর্ত্ত (যেমন কুরুসভায় দ্রৌপদী); অর্থার্থী (যেমন উত্তম স্থানের আকাঙ্ক্ষী ধ্রুব); জিজ্ঞাসু (যেমন উদ্ধব ও অর্জ্জুন) এবং জ্ঞানী (যেমন প্রহ্লাদ, শুক, নারদ প্রভৃতি)। ইহাঁদের মধ্যে জ্ঞানীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কারণ, জ্ঞানীর ভগবানই প্রিয়তম বস্তু। সেই জন্য ভগবানও জ্ঞানীর প্রতি প্রীতিমান্।

চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥
তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ॥—গীতা—৭। ২৬—২৭।

অবশ্য এরূপ তত্ত্বজ্ঞানী জগতে বিরল। কিন্তু বহুজন্মের সাধনার ফলে যাঁহারা যথার্থ তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী হইতে পারিয়াছেন, তাঁহারা জগতের সর্ব্বত্র ভগবানের সত্তা প্রত্যক্ষ করেন, এবং শেষপরে ভগবানকে প্রাপ্ত হয়েন।

---

(৪) Madam Blavatsky তিব্বতীয় ভাষায় প্রচলিত Book of golden Precepts নামক গ্রন্থ হইতে যে অপূর্ব্ব সারসংগ্রহ (Voice of the Silence) প্রচার করিয়াছেন, তাহাতেও এই অবরজ্ঞান (Head Learning) ও তত্ত্বজ্ঞান (Soul-wisdom) এই উভয়ের ভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে।

'Learn to discern the real from the false, the ever-fleeting from the ever-lasting. Learn above all, to separate Head-learning from Soul-wisdom the 'Eye' from the 'Heart, doctrine.—Voice of the Silence.

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ॥ —গীতা—৭। ১৯।

'বহু বহু জন্ম অন্তে জ্ঞানবান্ আমাকে প্রাপ্ত হন; এবং 'বাসুদেবই সব' এইরূপ অনুভব করেন। সেইরূপ মহাত্মা ব্যক্তি অতিশয় দুর্লভ।'

পরবর্ত্তী প্রবন্ধে সাংখ্য দর্শনের সহিত গীতার সম্বন্ধ আলোচিত হইবে।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

আকবর।

২

আকবরের হৃদয় একাধারে পুরুষোচিত দৃঢ়তা ও রমণী-সুলভ কোমলতায় সুগঠিত হইয়াছিল। কিশোরবয়স্ক আকবর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। হিন্দু-কুলোদ্ভব হিমু সিংহাসনের চতুর্দ্দিকে তুমুল বাত্যা তুলিলেন, তাহাতে বালকের মস্তক হইতে রাজমুকুট খসিয়া পড়িবার উপক্রম হইল। পিতৃ-সুহৃদ বৈরাম খাঁ অক্লান্ত যত্নে ও চেষ্টায় হিমুর বিষদন্ত উৎপাটিত করিয়া তাঁহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় আকবরের সন্নিধানে আনয়ন করিলেন। বৈরাম খাঁ শত্রুর শিরশ্ছেদন করিবার জন্য আকবরকে বারংবার উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। কিন্তু আকবর আপনার প্রধান অবলম্বন পিতৃতুল্য সুহৃদের অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া তাদৃশ প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীকে ক্ষমা করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না, এবং বৈরাম খাঁ সে জন্য বিরক্তি প্রকাশ করিলেও তিনি আপন সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলেন না। আকবর বিলাস-বিমুখ, কষ্ট-সহিষ্ণু ও পরিশ্রমী ছিলেন। "সমরক্ষেত্রের কোলাহলে ও কষ্টে তাঁহার যে আনন্দ ছিল, দিল্লী আগ্রার মর্ম্মর-ময় রত্নমণ্ডিত রাজকক্ষেও সেই আনন্দ উপভোগ করিতেন। তিনি প্রতিদিন দুই শত লোকের জন্য মুখরোচক খাদ্য প্রস্তুত করাইতেন। নিজে কয়েক মুষ্টিমাত্র খাইয়া বাকী আগ্রা দুর্গের প্রাচীরপার্শ্বে সমবেত দরিদ্রদের ধরিয়া দিতেন।" (১) তাঁহার রাজত্বকালে একবার গুজরাটে বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, এবং তাহাতে তাঁহার শক্তি ভস্মীভূত হইবার উপক্রম হয়। তখন বর্ষাকাল; পথ ঘাট একান্ত দুর্গম। সুতরাং সৈন্যের অভিযান দুঃসাধ্য ছিল।

---

(১) ঐতিহাসিক চিত্র, ১ম সংখ্যা, ১৮৯৯।

মাংস আকবরের প্রিয় খাদ্য ছিল না। তিনি ফল মূল আহার করিয়া অপরিসীম তৃপ্তি অনুভব করিতেন। তিনি বলিতেন যে, ফল সৃষ্টিকর্ত্তার সর্ব্বোৎকৃষ্ট দান।

কিন্তু আকবর স্বভাবসিদ্ধ সাহসিকতা ও ক্ষিপ্রকারিতাবশে তথায় স্বয়ং উপনীত হইবার জন্য সঙ্কল্প করিলেন, এবং তদভিমুখে যাত্রা করিয়া এত দ্রুতবেগে পথ অতিবাহিত করিয়াছিলেন যে, সেই দারুণ বর্ষায় আগ্রা পরিত্যাগ করিবার পর নবম দিবসে ত্রিশ সহস্র সৈন্য সমভিব্যাহারে সার্দ্ধ চারি শত মাইল দূরবর্ত্তী শত্রুর সম্মুখীন হন। আকবর কথনও কথনও ব্যায়ামের জন্য কষ্ট সহ্য করিয়া আনন্দ অনুভব করিতেন। একবার তিনি অশ্বপৃষ্ঠে একাদিক্রমে দুই দিন অতিবাহিত করিয়া এক শত দশ ক্রোশ পথ অতিক্রম পূর্ব্বক আজমীর হইতে দিল্লীতে আগমন করেন। বিগ্রহে লিপ্ত হইয়া তিনি কথনও আনন্দ অনুভব করেন নাই; কিন্তু আবশ্যকমত সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিতেন। তাঁহার অলৌকিক শৌর্য্যবীর্য্যের কাহিনীতে ইতিহাসের পৃষ্ঠা পরিপূর্ণ রহিয়াছে; তাহা পাঠ করিলে প্রতীতি হয় যে, তিনি বিনা প্রয়োজনে কেবলমাত্র সহজাত-সংস্কার-বশে যুদ্ধক্ষেত্রে আপনার জীবন বিপন্ন করিয়া আনন্দ অনুভব করিতেন। কিন্তু যুদ্ধ কথনও তাঁহার প্রিয় ছিল না। আকবরের বীরত্বকাহিনী রাজ্যের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইবার পর বিদ্রোহপ্রবণ সাম্রাজ্য শান্ত হইয়াছিল। সন্ধিবিগ্রহে তিনি স্বয়ং কথনও দীর্ঘকাল ব্যাপৃত থাকিতেন না। সমরক্ষেত্রে জয় লাভ করিবার অব্যবহিত পরেই আনুষঙ্গিক অন্যান্য কার্য্যের ভার সেনাপতিগণের হস্তে ন্যস্ত করিয়া পুনর্ব্বার শাসন সংরক্ষণ কার্য্যে মনোনিবেশ করিবার নিমিত্ত রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন।

আকবর ন্যায়পরায়ণ শাসনকর্ত্তা বলিয়া জনসমাজে পূজিত হইয়াছেন; কিন্তু তাঁহার ন্যায়পরায়ণতা দয়াধর্ম্মবিবর্জ্জিত ছিল না। আকবর অত্যন্ত সদাশয় ও ক্ষমাশীল ছিলেন। মহম্মদ কাজিম ফেরিস্তা নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, ক্ষমাধর্ম্মের অনুষ্ঠানে তিনি কথনও কথনও শাসকের কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইয়াছেন; কিন্তু তাঁহার প্রকৃতি অত্যন্ত তেজস্বিনী ছিল; এই জন্য জনসাধারণ তাঁহার ক্ষমাশীলতা দুর্ব্বলতার ফল বলিয়া বিবেচনা করিত না, বরং সদাশয় শাসনকর্ত্তা বলিয়া তাঁহাকে শ্রদ্ধা ও প্রীতির পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিত। আকবর বিদ্রোহীদিগকে ক্ষমা করিয়া প্রীতিবন্ধনে আবদ্ধ করিতেন, কথনও তাহাদের প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদান করিতেন না। তাঁহার হৃদয় একান্ত কোমল ছিল; পশুপক্ষীর যন্ত্রণাতেও তিনি কাতর হইয়া পড়িতেন। একদা তাহার পুত্র সেলিম এক ব্যক্তির সর্ব্বাঙ্গ হইতে জীবদ্দশায় চামড়া তুলিয়া লইবার আদেশ দিয়াছিলেন।

আকবর এই আদেশের বিষয় অবগত হইয়া বলেন, "মৃত পশুর চর্ম্ম তুলিবার দৃশ্যও আমাকে ব্যথিত করে। আমার পুত্র হইয়া সেলিম কিরূপে এরূপ নিষ্ঠুর আদেশ প্রদান করিয়াছে।"

যদিও আকবর নিতান্ত কোমলহৃদয় ছিলেন, তথাপি তিনি আবশ্যকমত কঠোর হস্তে ন্যায়-দণ্ড পরিচালন করিতে পারিতেন। আকবর স্বভাবতঃ শাসন সংরক্ষণ কার্য্যেরই অনুরাগী ছিলেন, এবং রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াই যথার্থ আত্ম-প্রসাদ লাভ করিতেন। এই হিন্দুর দেশে সর্ব্বতোমুখ প্রভুত্বের প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে যে গুণের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন, আকবর তাহাতেও ভূষিত ছিলেন। তাঁহার ধর্ম্মমত উদার ছিল। তিনি কখনও পরধর্ম্মে বিদ্বেষ প্রকাশ করেন নাই। (২)

আকবর একান্ত বন্ধুবৎসল ছিলেন। সাম্রাজ্যের বিশিষ্ট রাজপুরুষগণ তাঁহার সহিত অচ্ছেদ্য প্রণয়বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। (৩) প্রীতির আস্পদ সম্রাটের কার্য্যে প্রাণপাত করিতেও তাঁহারা কুণ্ঠিত হইতেন না।

---

(২) আকবরের ধর্ম্মমত কি প্রকার উন্নত ও উদার ছিল, তাহার প্রদর্শনার্থ, কাশ্মীরের একটি মসজিদের গাত্রে উৎকীর্ণ করিবার জন্য তদীয় প্রধান সহচর আবুল ফজল কর্ত্তৃক রচিত কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি।—

O God, in every temple I see people that see thee,
And in every language I hear spoken people praise thee.
Polytheism and Islam feel after thee.
Each religion says 'Thou art one, without equal.'
If it be a mosque people murmur the holy prayer,
And if it be a Christian Church people ring the bell from love to thee.
Sometimes frequent the Christian cloister, and some times to the mosque.
But it is thou I seek from temple to temple.
Thy elect have no dealings with heresy or with orthodoxy.
For neither of them stands behind the scene of thy truth.
Heresy to the heretic, and religion to the orthodox,
But the dust of the rose-petal belongs to the heart of the perfume seller.

(৩) আবুল ফজল, ফৈজী ও বীরবল সম্রাটের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বান্ধব ছিলেন। বীরবল বাদশাহের কার্য্যে শত্রুহস্তে জীবনবিসর্জ্জন করেন। ফৈজী আজীবন আকবরের কার্য্যে রত থাকিয়া লোকান্তরিত হয়েন, এবং আবুল ফজল সেলিমের ষড়যন্ত্রে বিদেশে নিহত হন। এই মিত্রত্রয় একে একে আকবরের জীবদ্দশাতেই কালগ্রাসে পতিত হন। বাদশাহ সুহৃৎ-

আকবর প্রভুভক্ত, বিশ্বস্ত ও কর্ম্মঠ অমাত্যবর্গ লাভ করিয়াছিলেন; এ বিষয়ে ভারতীয় আর কোনও মুসলমান নরপতিই তাঁহার ন্যায় সৌভাগ্যশালী ছিলেন না। কর্ত্তব্যসাধনে আকবরের অসাধারণ প্রীতি ছিল। বস্তুতঃ, তিনি কর্ত্তব্যপালন ঈশ্বরোপাসনার তুল্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। ফলতঃ, সর্ব্বপ্রকারেই আকবর ভারতবাসীর হৃদয় অধিকার ও মোগল সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ববিধান করিবার উপযুক্ত পাত্র ছিলেন। কিন্তু তিনি রাজত্বের প্রথম ভাগেই এ বিষয়ে মনোনিবেশ করিতে পারেন নাই।

আকবর ত্রয়োদশবর্ষবয়ঃক্রমকালে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই সময় বৈরাম খাঁ রাজ্যের কর্ণধার ছিলেন। তিনি আকবরের নামে শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। তদানীন্তন শাসনপ্রণালী বৈরাম খাঁর মতানুগত ছিল; বাদশাহের সে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষমতা ছিল না।

শোকে অত্যন্ত মুহ্যমান হইয়াছিলেন। আমরা সে বিবরণ এখানে উদ্ধৃত করিতেছি।—
"In the course of action for subduing the Yousufies, Akbar's greatest personal friend Raja Birbal died owing to the rashness of Zein Khan the general. Akbar refused to see Zein Khan, and was long inconsolable for the death of Birbal. As the Raja's body was never found, a report gained currency that he was alive amongst the prisoners and it was so much encouraged by Akbar, that a long time afterwards an impostor appeared in his name. As this second Birbal died before he reached the Court Akbar was again mourning."—*Elphinstone's History of India.* "Faizi died 5th october 1595, barking like a dog according to the austere Badauni,—but really weak and speechless. Akbar saw him at midnight; supporting his friend's head he said gently, 'Shek-ji! here is a Doctor, will you not speak to me?' One fancies the faint look of the closing eye, but no words escaped the lips the emperor threw his head dress on the ground and wept aloud.—" *Keen's The Turks in India*" When the news of that dire calamity and dreadful event (murder of Abul Fazl) reached that shadow of God, the Emperor Akbar, he was extremely grieved, disconsolate, distressed, and full of lamentation. That day and night he neither shaved as usual, nor took opium, but spent his time in weeping and lamenting." "*Wikaya-i-Asad Beg.*" বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত ওর্চার রাজা নরসিংহ, কোন কোন মতে বীরসিংহ, [জাহাঙ্গীর স্বরচিত জীবনবৃত্তে নরসিংহ লিখিয়াছেন] যে সলিমের প্ররোচনায় আবুল ফজলকে হত্যা করেন, তাহা বাদশাহ আকবর অবগত ছিলেন না। তিনি বন্ধুহন্তাকে শাস্তি দিবার জন্য সেলিমকে প্রেরণ করেন। নরসিংহ দেব পলায়ন করাতে তাঁহার রাজ্য মোগলের হস্তগত হয়। সম্রাট ইহার পর অত্যল্পকাল জীবিত ছিলেন; এই জন্য নরসিংহ নিষ্কৃতিলাভ করেন।

আকবর আশৈশব বৈরাম খাঁর স্নেহচ্ছায়াতলে বর্দ্ধিত হন। বৈরামের অসীম রণনৈপুণ্য ও অক্লান্ত উদ্যমের বলেই আফগানের গ্রাস হইতে মোগল সাম্রাজ্যের উদ্ধার হইয়াছিল। এ জন্য বাদশাহ তাঁহাকে খানবাবা বলিয়া সম্বোধন করিতেন, এবং তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ ছিলেন। কিন্তু বৈরাম খাঁ দীর্ঘকাল বাদশাহের সহিত স্নেহসূত্রে আবদ্ধ থাকিতে পারেন নাই। আবুল-ফজল নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, বৈরাম প্রথমতঃ নির্ম্মলচরিত্র ও লোকপ্রিয় ছিলেন, কিন্তু প্রভূত ক্ষমতালাভের সঙ্গে সঙ্গে তোষামোদজীবিগণে পরিবেষ্টিত হইয়া ক্রূরস্বভাব ও যথেচ্ছাচারী হইয়া উঠেন।

একদা আকবর হস্তীর ক্রীড়া দর্শন করিতেছিলেন। এমন সময়ে একটি হস্তী ক্ষিপ্ত হইয়া বৈরাম খাঁর পট্টাবাসে প্রবেশপূর্ব্বক নানারূপ বিশৃঙ্খলা ঘটায়, এবং তাহাতে বৈরাম খাঁর জীবন সংশয়াপন্ন হয়। এই ঘটনা তাঁহার প্রাণ-নাশের ষড়যন্ত্র, এইরূপ সন্দেহ করিয়া, তিনি হস্তিচালকের প্রাণদণ্ড বিধান করেন। কিন্তু তাহাতেও পরিতৃপ্তিলাভ না করিয়া কয় দিন বাদশাহের সঙ্গেও অসদ্ব্যবহার করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। বৈরাম খাঁ এক জন প্রতিদ্বন্দ্বী রাজ-পুরুষকে অতিলঘু অপরাধে নিহত করেন। বাদশাহের শিক্ষক পীর মহম্মদও তাঁহার হস্তে প্রাণ হারাইতেছিলেন, কিন্তু অল্পের জন্য পরিত্রাণ লাভ করিয়া রাজধানী হইতে নির্ব্বাসিত হন। সন্দিগ্ধচিত্ত বৈরাম খাঁর সন্দেহের ফলে বাদ-শাহের অনুচরগণও সর্ব্বদা নিগৃহীত হইতেন। এই সকল কারণে রাজদরবারে তাঁহার শত্রুর সংখ্যা ছিল না। বাদশাহ নিজেও তাঁহার প্রতি ক্রমশঃ বীত-শ্রদ্ধ হন। শত্রু-দল বৈরামকে অপদস্থ করিবার জন্য বাদশাহকে সর্ব্বদা উত্তেজিত করিত। বৈরাম খাঁ রাজনীতিবিশারদ কার্য্যপটু মন্ত্রী ছিলেন; বাদশাহ মন্ত্রীর গুণে মুগ্ধ হইয়া তদীয় সমস্ত অপরাধ উপেক্ষা করিতেন। বাদশাহ স্বীয় ধাত্রী মাহম আঙ্কার একান্ত অনুরক্ত ছিলেন; তিনিও মন্ত্রীর বিরুদ্ধে বাদশাহকে উত্তেজিত করিবার জন্য যত্নবতী ছিলেন। অবশেষে আকবরও বৈরামের ক্ষমতা লুপ্ত করিবার প্রয়াসী হন। আকবর জানিতেন, দুরাকাঙ্ক্ষ বৈরাম খাঁর হস্তে আংশিক ক্ষমতা থাকিলেও তিনি নিরাপদ হইতে পারিবেন না। সুতরাং তাঁহাকে অপদস্থ করিতে হইলে তাঁহার সমগ্র ক্ষমতা কাড়িয়া লইতে হইবে। এই জন্য তিনি সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, কিন্তু ১৫৬০ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে এরূপ কতকগুলি [illegible] নীরব থাকিতে না পারিয়া স্বহস্তে শাসন-

সংক্রান্ত সমস্ত কার্য্যের ভার গ্রহণ করিবার অভিপ্রায়ে আদেশ-লিপি প্রচারিত করিলেন। (৪)

এই আদেশলিপি প্রচারিত হইলে বৈরাম খাঁ দেখিলেন যে, তিনি ক্ষমতাচ্যুত হইয়াছেন, এবং বাদশাহ তাঁহাকে ক্ষমতাচ্যুত করিবার পূর্ব্বেই তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিবার সমস্ত পথে কণ্টক রোপণ করিয়াছেন। এ জন্য তিনি মক্কা অভিমুখে যাত্রা করিবার উদ্দেশ্যে নাগরে গমন করিলেন। তথায় উপনীত হইয়া বাদশাহের অনুকূল আদেশের আশায় প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন কিন্তু বাদশাহ পুনরাহ্বানের পরিবর্ত্তে তাঁহাকে অনতিবিলম্বে ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করাইবার জন্য পীর মহম্মদকে সসৈন্যে প্রেরণ করিলেন। এইরূপ রূঢ় ব্যবহারে খানখানান নিতান্ত মর্ম্মাহত হইয়া বাদশাহের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন। কিন্তু অচিরাৎ পরাজিত হইয়া অনুতপ্তচিত্তে তাঁহার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা চাহিলেন। খানখানান সাম্রাজ্যের সঙ্কটকালে উঁহার রক্ষার্থ যে সকল কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা বাদশাহের স্মৃতিপথে উদিত হইল। তিনি তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়া রাজদরবারে আনয়ন করিবার জন্য দূত প্রেরণ করিলেন। বৈরাম খাঁ রাজদরবারে উপনীত হইয়া গলদেশে পাগড়ী বন্ধন পূর্ব্বক বাষ্পাকুললোচনে সিংহাসনতলে পতিত হইলেন। বাদশাহ হস্তধারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে উত্তোলন করিয়া ওমরাহ-শ্রেণীর শীর্ষস্থানে উপবেশন করাইলেন; তাহার পর তাঁহার আশঙ্কা বিদূরিত করিবার জন্য মূল্যবান খেলাৎ প্রদান করিয়া বলিলেন, "যদি খানখানান সামরিক জীবন প্রিয় বোধ করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে কাল্পী ও চিন্দেরীর শাসনকর্ত্তৃপদে নিযুক্ত করিতে পারি; সেখানে তিনি আপনার প্রতিভার সম্যক্ অনুশীলন করিতে পারিবেন। আর যদি তিনি রাজদরবারেই অবস্থান করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলেও আমাদের বংশের

---

(৪) এই সময় আকবর দিল্লীতে এবং বৈরাম খাঁ আগ্রাতে অবস্থান করিতেছিলেন। বাদশাহ স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া খানখানানকে নিম্নলিখিত পত্র লেখেন।—

"As I was fully assured of your honesty and fidelity I left all important affairs of State to your charge and thought only of my pleasures. I have now determined to take the reins of the government into my own hands, and it is desirable that you should now make the pilgrimage to Mecca upon which you have been so long intent. A suitable jagir out of the perganas of Hindustan shall be assigned to your maintanance, the revenue of which shall be transmitted to you by your agent."—*Tabakt-i-Akbari.*

উপকারী বন্ধু রাজানুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হইবেন না। যদি তিনি ধর্ম্মার্থ মক্কায় তীর্থযাত্রা করিবার মানস করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাকে পদোচিত সম্মানসহকারে তথায় পঁহুছাইয়া দিবার বন্দোবস্ত করা যাইবে।” খানখানান উত্তর করিলেন, “আমার প্রতি বাদশাহের প্রীতি ও বিশ্বাসের অবশ্যই হ্রাস হইয়াছে। আমি আর কখনও পূর্ব্ববৎ রাজার প্রীতি ও বিশ্বাসের ভাজন হইতে পারিব না। এ অবস্থায় কেন আমি রাজসকাশে অবস্থান করিব? রাজকৃপাই আমার পক্ষে যথেষ্ট ; ক্ষমাই আমার পূর্ব্বরাজসেবার যথোচিত পুরস্কার। দুর্ভাগ্য বৈরাম খাঁ ইহসংসারের আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া পারত্রিক মঙ্গলের কামনায় নিরত ও মক্কার পথের পথিক হইবে।” অতঃপর বৈরাম সমুদ্রকূলাভিমুখে যাত্রা করেন, এবং পথিমধ্যে এক জন আফগানের হস্তে নিহত হন। এই আফগানের পিতা খানখাননের হস্তে যুদ্ধক্ষেত্রে জীবনবিসর্জ্জন করিয়াছিল। আকবর সিংহাসনারোহণের পঞ্চম বৎসরে স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন।

অষ্টাদশবর্ষবয়স্ক এক জন তরুণ যুবককে দিল্লীর সর্ব্বময় কর্ত্তা দেখিয়া দুরাকাঙ্ক্ষ মোগল রাজপুরুষগণ রাজ্যের নানা স্থানে বিদ্রোহ-পতাকা উড্ডীন করিয়া আকবরকে বিব্রত করিয়া তুলিলেন। প্রথমতঃ শের-বংশীয় শেষ নরপতি আদিলের পুত্র দ্বিতীয় শেরশাহ সৈন্য সংগ্রহ করিয়া আকবরের বিরুদ্ধে উত্থিত হইলেন। আকবরের নিয়োগক্রমে সেনাপতি জমান খাঁ তাঁহাকে পরাস্ত করিলেন। কিন্তু জমান খাঁ তরুণবয়স্ক প্রভুকে তুচ্ছ করিয়া লুণ্ঠিত দ্রব্যের রাজভাগ আত্মসাৎ করিলেন, এবং স্বয়ং স্বাধীন হইবার প্রয়াসী হইলেন। আকবর তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। তখন জমান খাঁ অনন্যোপায় হইয়া বশ্যতা স্বীকার করিলেন।

এই সময় আফগানগণ মালব দেশে আধিপত্য করিতেছিলেন। আকবর মালব দেশ হইতে আফগানদিগকে বিদূরিত করিবার জন্য সেনাপতি আদম খাঁকে নিযুক্ত করিলেন। আদম খাঁ স্বকার্য্যসাধন করিয়া আকবরের বশ্যতা-পাশ ছিন্ন করিলেন, এবং স্বয়ং স্বাধীন হইলেন। আকবর তাঁহাকে দমন করিবার জন্য স্বয়ং মালব দেশে যাত্রা করিলেন। আদম খাঁ রাজসৈন্যের গতিরোধ করিতে না পারিয়া বশ্যতা-স্বীকার পূর্ব্বক ক্ষমালাভ করিলেন ; কিন্তু বাদশাহের ক্ষমাগুণে অতি সহজে নিষ্কৃতি পাইলেন বলিয়া আপনার চরিত্র সংশোধিত করিলেন না। তিনি ক্ষমালাভ করিবার পর রাজধানীতে উপস্থিত হন। এই স্থানে উজীরের সঙ্গে তাঁহার মনোমালিন্য উপস্থিত

হয়। একদা উজীর বাদশাহের কক্ষপার্শ্বে উপাসনায় নিরত ছিলেন, এমন সময় আদম খাঁ অস্ত্রাঘাতে তাঁহাকে নৃশংসভাবে হত্যা করিলেন। বাদশাহ এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ লইবার জন্য প্রাসাদের উপর হইতে হত্যা-কারীকে যমুনাগর্ভে নিক্ষেপ করিবার আদেশ প্রদান করেন। আদম খাঁর পর বাদশাহের শিক্ষক পীর মহম্মদ মালবের শাসনভার প্রাপ্ত হন; কিন্তু তাঁহার শাসনকালে তথায় নানাবিধ গোলযোগ উপস্থিত হয়। সুতরাং অচিরে শান্তি-স্থাপনের অভিপ্রায়ে আকবর তাঁহাকে পদচ্যুত করিলেন।

ইহার পরেই নাগরে বিদ্রোহানল জ্বলিয়া উঠিল। আবদুল মানি ও সেরফ উদ্দীন নামক দুই জন সামন্ত বিদ্রোহ-পতাকা উড্ডীন করিয়া দিল্লীর অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিন্তু অবিলম্বে আকবরের আক্রমণে পরাজিত হইয়া তাঁহারা কাবুলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। পীর মহম্মদের পদচ্যুতির পর বাদশাহ উজবেগ-বংশোদ্ভব আবদুল্লা খাঁকে মালবের শাসনভার অর্পণ করেন। আবদুল্লা অত্যন্ত কোপনস্বভাব ছিলেন। তিনিও অনতিবিলম্বে আকবরের বশ্যতা অস্বীকার করিয়া স্বাধীন হইলেন। আকবর তাঁহাকে দমন করিবার জন্য স্বয়ং পুনর্ব্বার মালব দেশে গমন করিলেন। আবদুল্লা যুদ্ধক্ষেত্রে পরাস্ত হইয়া গুজরাট রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এই ঘটনায় সমস্ত উজবেগ সৈন্য বাদশাহের বিরুদ্ধে উত্থিত হইল; বিদ্রোহ চারি দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল।

বাদশাহ নর্ম্মদাতীরবর্ত্তী গড়মণ্ডল রাজ্যের স্বাধীনতা হরণ করিবার জন্য সেনাপতি আসফ খাঁকে প্রেরণ করেন। তৎকালে রাণী দুর্গাবতী গড়মণ্ডলের শাসয়িত্রী ছিলেন। দুর্গাবতী তেজস্বিনী বীররমণী ছিলেন। আসফ খাঁ গড়-মণ্ডল রাজ্য আক্রমণ করিলে, রাণী বিপুলবিক্রমে শত্রুসৈন্য বিধ্বস্ত করিতে লাগিলেন। মোগল সৈন্য প্রমাদ গণিল। এমন সময়ে শত্রুর নিক্ষিপ্ত তীরে দুর্গাবতীর এক চক্ষু বিদ্ধ হইল। তিনি সৈন্যপরিচালন করিতে অসমর্থ হইয়া আত্ম-হত্যা করিলেন। বীররমণীর আকস্মিক মৃত্যুতে আসফ খাঁ অতি সহজে গড়-মণ্ডল অধিকার করিলেন। তিনি গড়মণ্ডল লুণ্ঠন করিয়া অপরিমিত অর্থ হস্তগত করিলেন। কথিত আছে, তিনি স্বর্ণমুদ্রাপূর্ণ এক শত কলস প্রাপ্ত হন। আসফ খাঁ এই ধনরাশির অধিকাংশ আত্মসাৎ করাতে বাদশাহের সহিত তাঁহার মনোমালিন্যের সূত্রপাত হয়। উজবেগগণ বিদ্রোহ উপস্থিত করিলে আসফ খাঁ তাহাদের সঙ্গে মিলিত হইয়া আকবরকে ঘোর বিপদগ্রস্ত করিয়া

তুলিলেন। আকবরের সিংহাসন কম্পিত হইয়া উঠিল। উজবেগগণ ক্রমশঃ দিল্লীর নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। আকবর বিপুলবিক্রমে বিদ্রোহদমনে প্রবৃত্ত হইলেন। দুই বৎসর চেষ্টার পর বিদ্রোহ প্রায় উপশমিত হইয়া আসিয়াছিল; এমন সময় বাদশাহের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হাকিম পঞ্জাব আক্রমণ করাতে তিনি বিদ্রোহ-দমন পরিত্যাগ করিয়া তথায় গমন করিলেন। হাকিমকে দমন করিয়া বাদশাহ কতিপয় মাস পরে দিল্লীতে প্রত্যাগত হইয়া দেখিলেন যে, বিদ্রোহী দল পুনর্ব্বার বলসংগ্রহ করিয়া এলাহাবাদ ও অযোধ্যা প্রদেশের অধিকাংশ অধিকার করিয়াছে, এবং রাজধানীর অভিমুখে অগ্রসর হইবার জন্য আয়োজনে প্রবৃত্ত হইয়াছে। তখন বর্ষাকাল। রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার পক্ষে বর্ষাকাল প্রশস্ত সময় নহে। কিন্তু বাদশাহ সমস্ত বাধা বিঘ্ন অগ্রাহ্য করিয়া বিদ্রোহী দলের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। বিদ্রোহী দল বিতাড়িত হইয়া গঙ্গার অপর তীরে আশ্রয় গ্রহণ করিল। বর্ষায় গঙ্গা স্ফীত হইয়াছিল; এ জন্য বিদ্রোহী সৈন্য তথায় আপনাদিগকে নিরাপদ মনে করিল। কিন্তু গঙ্গার প্রবল প্লাবনও বাদশাহের গতিরোধ করিতে পারিল না। তিনি নিশীথে দুই সহস্র সৈন্য লইয়া সন্তরণ করিয়া গঙ্গার অপর তীরে উত্তীর্ণ হইয়া বিদ্রোহী সৈন্য আক্রমণ করিলেন। এই আকস্মিক আক্রমণে বিদ্রোহী সৈন্য বিধ্বস্ত হইয়া পড়িল। সাত বৎসর অশ্রান্ত যুদ্ধের পর পঞ্চবিংশ-বর্ষবয়স্ক তরুণ যুবক আকবর সমস্ত বিদ্রোহের মূলোচ্ছেদ করিলেন। তিনি এই বিদ্রোহদমনে সাহস ও বীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া বীরসমাজের বরেণ্য হইলেন, এবং মেঘনির্ম্মুক্ত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় আপনার রশ্মিজালে সমগ্র প্রাচ্য গগন উদ্ভাসিত করিলেন।

ক্রমশঃ।

শিবাজীর রাজ্যাভিষেক।

সূচনা।

১৫৯৬ শকাব্দের জ্যৈষ্ঠ শুক্লাত্রয়োদশী বৃহস্পতিবার, ১৬৭৪ খৃষ্টাব্দের ৬ই জুন, মহারাষ্ট্র-ক্ষত্রিয়কুলাবতংস ছত্রপতি মহাত্মা শিবাজী রায়গড় দুর্গে অভিষিক্ত হইয়া দীর্ঘকালের পরাধীন ভারতে স্বাধীন হিন্দু সাম্রাজ্যের প্রাণপ্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক যে গৌরবকর যুগের প্রবর্ত্তন করেন, তাহার ফলে ভারতের বিলুপ্তপ্রায় বেদবিদ্যার পুনরুজ্জীবন সাধিত হয়; মহারাষ্ট্র, কর্ণাট, মালব, গুজরাট, রাজপুতানা, মধ্যপ্রদেশ ও [illegible]

পঞ্জাব প্রভৃতি দেশে হিন্দুশক্তি প্রাধান্য লাভ করে ; গো ব্রাহ্মণের রক্ষা ও তীর্থ-স্থানাদির সংস্কার ঘটিয়া ভারতে হিন্দুধর্ম্মের বিজয়বৈজয়ন্তী পুনর্ব্বার উড্ডীন হয়। এই কারণে ঐ দিবস সমগ্র হিন্দু জাতির নিকট পরম পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হইবার যোগ্য। সুখের বিষয়, ভারতের নানা স্থানে প্রধানতঃ মহারাষ্ট্রদেশের সর্ব্বত্র এই পবিত্র দিবস রামনবমী, জন্মাষ্টমী প্রভৃতির ন্যায় চিরস্মরণীয় করিবার জন্য তত্রত্য হিন্দুগণ সসমারোহে উৎসবাদি সম্পন্ন করিয়া থাকেন। অধিকতর আনন্দের বিষয় এই যে,এত দিন পরে বঙ্গদেশের কেন্দ্রস্বরূপ কলিকাতা মহানগরীতেও গত বৎসরে এই উৎসব হইয়া গিয়াছে। এই জাতীয় মহোৎসবের পবিত্রতা উপলব্ধিপূর্ব্বক শিক্ষিত ও স্বদেশভক্ত বঙ্গবাসী হিন্দুমাত্রই যে ইহাতে সম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে যোগদান করিয়াছেন,ইহা আমরা হিন্দুসমাজের ভাবী সৌভাগ্যের পূর্ব্ব-লক্ষণ বলিয়া মনে করি। কারণ, স্বদেশের প্রাচীন মহাপুরুষগণের মহত্ব অনুভব করিয়া তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধাপ্রকাশ করিতে শিক্ষা না করিলে কোনও জাতির উন্নতিলাভ ঘটে না।

হিন্দুজাতির এই গৌরবাবহ ঘটনার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ কোনও ইংরাজী গ্রন্থেই প্রাপ্ত হওয়া যায় না। শিবাজীর স্বদেশীয় হিন্দু চরিতাখ্যায়কগণ ইহার যথাক্রমে সুবিস্তৃত বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। সে বৃত্তান্ত ইতিহাস-জিজ্ঞাসু পাঠকের প্রীতিকর হইতে পারে বিবেচনায় আমরা তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। প্রথমে বখরের [illegible] ও তৎপরে সে সম্বন্ধে আমাদিগের বক্তব্য প্রকাশিত হইল।

যে বখর হইতে ছত্রপতি মহাত্মা শিবাজীর সিংহাসনারোহণোৎসবের বিবরণ অনূদিত হইল, তাহা মহলার রাম রাও চিটনীস কর্ত্তৃক বিরচিত। এই বখর-লেখক শিবাজী মহারাজের বংশধর সাতারাধিপতি মহারাজ শাহুর চিঠনবীস ছিলেন। তিনি ১৮১০ খৃষ্টাব্দে সাতারার রাজকীয় দপ্তরের কাগজপত্র অবলম্বনে মহারাষ্ট্র সাম্রাজ্যের একখানি বিস্তারিত ইতিহাস রচনা করিয়াছেন। সেই ইতিহাসের (বখরের) প্রথমভাগ "শিব ছত্রপতির সপ্তপ্রকরণাত্ম চরিত্র" নামে প্রসিদ্ধ। মহলার রাম রাওয়ের বৃদ্ধপ্রপিতামহ বালাজী আওজী চিটনীস ছত্রপতি শিবাজীর অতি বিশ্বস্ত পত্রলেখক ছিলেন। রাজ্যসংক্রান্ত অধিকাংশ কার্য্য-বিবরণই চিটনীসকে লিখিয়া রাখিতে হইত। রাজকীয় দপ্তরের সুব্যবস্থা ও পর্য্যবেক্ষণের ভার চিটনীস-বংশের হস্তে ন্যস্ত ছিল। চিটনীস-বংশীয় মহলার রাও সেই দপ্তরের সমস্ত মূল কাগজপত্র ও তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের লিখিত বিবরণাদি

পর্য্যালোচনা করিয়া এই বখর রচনা করিয়াছেন; সুতরাং ইহা বহু পরিমাণে প্রামাণিক বলিয়া পরিগৃহীত হইবার যোগ্য, সন্দেহ নাই। এই কারণে আমরা শিবাজীর রাজ্যাভিষেকের বৃত্তান্ত প্রধানতঃ মহল্লাররাম রাওয়ের গ্রন্থ হইতেই ভাষান্তরিত করিয়া দিলাম।

শ্রীশিবাজী মহারাজ দক্ষিণাঞ্চলে অভিযান করিয়া 'চন্দী' (জিঞ্জী) প্রভৃতি স্থান হস্তগত করিলেন। তত্রত্য অবশিষ্ট মাণ্ডলিক রাজা ও বিদ্রোহপ্রিয় জমীদারগণের সকলেই তাঁহার পদানত হইলেন। তাঁহাদিগের কাহাকে কত বার্ষিক কর দিতে হইবে, মহারাজ তাহা স্থির করিয়া দিলেন। বিজাপুরের বাদশাহী (অর্থাৎ সুলতানের অধীন সমস্ত প্রদেশ) পূর্ব্বেই মহারাজের করতলগত হইয়াছিল। ভাগানগরের (গোলকোণ্ডার) সুলতানের সহিত তিনি অকৃত্রিম মৈত্রীসূত্রে বদ্ধ হইয়াছিলেন। (১) দিল্লীর বাদশাহ দৌলতাবাদ (নিজামশাহী) রাজ্যের জয় পূর্ব্বক তথায় আপনাদের সুভা স্থাপন করিয়াছিলেন, মহারাজ তাহাও স্বীয় বিক্রমে মোগলদিগের হস্ত হইতে পুনর্গ্রহণ করিতে সমর্থ হন। ঐ রাজ্যের অন্তর্গত দুর্গ ও প্রধান স্থানসমূহের অধিকাংশে মহারাজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তিনি অনেক সুভা জয় করিয়াছিলেন, এবং দিল্লীতে গিয়া বাদশাহের শক্তি ও কর্ত্তৃত্বের পরিচয়ও জানিয়া আসিয়াছিলেন।

কাজেই এক্ষণে মহারাজের মনে হইল,—'দক্ষিণাপথ যে সাড়ে ছয় সুভায় বিভক্ত,তাহাদের অধিকাংশ স্বরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। অবশিষ্ট প্রদেশে চৌথ, মোকাসা, ঘাসদানা, সাহোত্রা প্রভৃতি স্বত্ব বলপূর্ব্বক স্থাপন করিয়া অর্দ্ধেক প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি। এক দিল্লীপতি অবশিষ্ট ছিলেন, তাঁহারও উপমর্দ্দ করিয়াছি। তিনি যে সকল সর্দ্দার পাঠাইয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলকে পরাস্ত করিয়াছি। রামেশ্বর পর্য্যন্ত একচ্ছত্র সাম্রাজ্যস্থাপনে সমর্থ হইয়াছি। অতঃপর, এত দিন যেরূপ ভাবে রাজ্য করিয়াছি, সেরূপ ভাবে করিলে লোকে বিদ্রোহী জমীদারের মধ্যেই আমার গণনা করিবে। অতএব রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া ছত্রসিংহাসন গ্রহণপূর্ব্বক, পুরাকালীন রাজগণ যেরূপ অষ্ট প্রধানের (সচিবের) সাহায্যে ধর্ম্মানুসারে রাজ্য করিতেন, সেইরূপে রাজ্য পালন করিব।' এইরূপ সংকল্প করিয়া মহারাজ অভিষেক ক্রিয়ার আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন।

ইহার পর বখরকার সম্রাট্ অওরঙ্গজেবের স্বয়ং দক্ষিণাপথে অভিযানের সংকল্প ও শিবাজীর ভয়ে সে সংকল্পপরিহারের বিষয় বর্ণনা করিয়া "মহারাজের

(১) ভাগানগরের বর্ত্তমান নাম হায়দরাবাদ। এই নগর ১৫৮৯ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ কুলী কুতুবশাহের দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে। কুতুবশাহ ভাগামতী নাম্নী প্রিয়তমা উপপত্নীর স্মৃতি চিরস্থায়িনী করিবার জন্য এই নগরকে ভাগানগর নামে আখ্যাত করেন। গোলকোণ্ডার জলবায়ু অতীব অস্বাস্থ্যকর বলিয়া কুতুবশাহ তথা হইতে রাজধানী অপসারিত করিয়া নবপ্রতিষ্ঠিত ভাগানগরে লইয়া যান। ভাগামতীর মৃত্যুর বহুদিন পরে ঐ নগর হায়দরাবাদ নাম ধারণ করে। গোলকোণ্ডা হইতে ভাগানগর ৭মাইল দূরবর্ত্তী।

নিকটে যে সকল সর-কারকুন, মন্ত্রণা-বিশারদ, শূর, বিচক্ষণ, রাজকার্য্য-দক্ষ, প্রকৃতিপুঞ্জের প্রতি দয়াশীল, পরোপকাররত, রাজকর্ম্মচারী, অমাত্য ও সেনাধিপতি ছিলেন, তাঁহাদিগের এবং চতুরঙ্গসেনা, কোষদ্রব্য ও দুর্গপ্রদেশাদির বিস্তারিত পরিচয় প্রদান" করিয়াছেন। সেই প্রসঙ্গে "রণথম্বোর" দুর্গের সুভেদারকে সম্রাটের দূত ইলাচি বেগ সাক্ষাৎকার-কালে যে প্রকার বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক ছুরিকার আঘাতে বিনষ্ট করিয়াছিল, তাহাও বিবৃত হইয়াছে।

"শিব-দিগ্বিজয়" নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যে, মহারাজের জ্ঞাতিবন্ধুগণ ও প্রসিদ্ধ মারাঠা সর্দ্দারগণ শিবাজী মহারাজের প্রতি যথোচিত সম্মানপ্রকাশে অবহেলা করিতেন। অনেকে আপনাদিগকে বিজাপুর সরকারের পুরাতন সর্দ্দার বলিয়া গৌরবান্বিত ও মহাত্মা শিবাজীকে রাজদ্রোহী জমীদার বলিয়া নাসা কুঞ্চিত করিতেন। সাধারণ মহারাষ্ট্রবাসী শিবাজীর একান্ত পক্ষপাতী হইলেও, যাঁহারা আদিলশাহী বংশের প্রতিষ্ঠাকাল হইতে সর্দ্দার ও মনসব্‌দার পদের গৌরবভোগ করিয়া আসিতেছিলেন, তাঁহারা সহজে রাজা শাহজীর পুত্রকে মহারাষ্ট্র সমাজের প্রভু বলিয়া স্বীকার করিতে চাহিতেন না। এই সকল আত্ম-প্রাধান্যাভিলাষী বিজাপুরী সর্দ্দার ও জাইগারদিগের উপর যথোচিত প্রভুত্বস্থাপনের জন্য শিবাজীকে রাজ্যাভিষেকের আড়ম্বর করিতে হইল।

সিংহাসনের মহিমা অতি বিচিত্র। সাধারণ লোকে যে কার্য্য করিলে নিন্দিত হয়, সিংহাসনাধীশ্বরের পক্ষে সেই কার্য্য ন্যায়সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার ইংরাজেরা ইংলণ্ডের আধিপত্য অস্বীকারপূর্ব্বক স্বাধীনতালাভের চেষ্টা করিলে বিলাতের লোকে তাঁহাদিগকে দস্যু, ক্রূরাচার, রাজবিদ্রোহী প্রভৃতি আখ্যায় অভিহিত করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহারা বাহুবলে আপনাদিগের স্বাতন্ত্র্যপ্রতিষ্ঠা করিবামাত্র সকলে তাঁহাদিগের প্রশংসা করিতে লাগিলেন! যাঁহারা দস্যুদলপতি বলিয়া বিঘোষিত হইয়াছিলেন, তাঁহারাই "সাধু", "মহাত্মা" প্রভৃতি উপাধি লাভ করিলেন; তাঁহাদিগের কার্য্যাবলী ন্যায়সঙ্গত বলিয়া প্রতিপন্ন হইল! কেবল আমেরিকায় নহে, জগতের সর্ব্বত্র এইরূপ রীতি দৃষ্ট হয়। দেশের প্রতিষ্ঠিত রাজশক্তির বিরুদ্ধে যাঁহারা উত্থিত হন, তাঁহাদিগের কার্য্যাবলী সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে প্রথম অবস্থায় গর্হিত বলিয়াই বিবেচিত হইয়া থাকে। কিন্তু তাঁহাদিগের উদ্যম সফল হইলে সেই সকল কার্য্যই বিধিসঙ্গত বলিয়া সাধারণের নিকট পরিগণিত হয়। প্রাচ্যদেশে এই উদ্যমসাফল্যের প্রধান চিহ্ন—অভিষেকক্রিয়া। যথাবিধানে রাজ্যাভিষিক্ত না হইলে কাহারও ললাট হইতে বিদ্রোহ-

তিলক বিলুপ্ত হয় না। কাজেই শিবাজীকে আত্মাভিষেকের আয়োজন করিতে হইয়াছিল; কেবল উচ্চাকাঙ্ক্ষার বশীভূত হইয়া তিনি সিংহাসনে অধিরোহণ করেন নাই। বখরলেখকেরা প্রকারান্তরে এই কথাই বলিয়াছেন।

তাহার পর বখরলেখক মহ্লার রাম রাও বলিতেছেন,—

এতদ্ভিন্ন আরও কতিপয় প্রদেশ ও দুর্গ মহারাজের হস্তগত হইল। কোনও কোনও স্থানে বিদ্রোহী জমীদারেরা বশ্যতা স্বীকার করিলেন। তুঙ্গভদ্রাতীর হইতে রামেশ্বর পর্য্যন্ত ও গোণ্ডবন, চান্দা, বরাড় (বেরার) প্রভৃতি নর্ম্মদাতীর পর্য্যন্ত সমস্ত প্রদেশ হইতে চৌথ মোকাসা আদায় হইতে লাগিল।

তখন মহারাজ ভাবিলেন,—'এত দিনে সার্ব্বভৌম পদলাভের যোগ্যতা ও সিংহাসনারোহণের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছি। রাজকোষে দশ কোটী মুদ্রা সঞ্চিত হইয়াছে। মন্ত্রী প্রভৃতি অষ্ট প্রধান (সচিব) যেরূপ লক্ষণযুক্ত হওয়া উচিত বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে, সেইরূপ লক্ষণাক্রান্ত সচিবাদি পাইয়াছি। সৈন্য—অশ্ব-গজ-রথ-পদাতি চতুরঙ্গ—যথাশাস্ত্র সংগৃহীত হইয়াছে। আমার পূর্ব্বপুরুষেরা পুরাকাল হইতে 'ছত্রসিংহাসনযুক্ত রাজা' করিয়া আসিতেছেন; সেই কুলে আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছি। সেই শিশোদে বংশের ধর্ম্ম—দুষ্ট যবনের দমন ও তাহাদিগের অধীনতা-অস্বীকার প্রভৃতি ধর্ম্ম—শ্রীর কৃপায় শ্রীশঙ্কর ও শ্রীভবানী আমার দ্বারা পালন করাইয়াছেন। কুলধর্ম্ম যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিয়াছি। আরসি সিংহের বংশধরগণ উদয়পুরে ছত্র সিংহাসন সহ রাজত্ব করিতেছেন। আমাদের বংশের অপর পুরুষগণ কচ্ছ, ভুজ ও নেপাল প্রদেশে ছত্রসিংহাসনযুক্ত রাজত্ব করিতেছেন। আমি বাহুবলে মোসলমানের হস্ত হইতে এই দক্ষিণদেশীয় রাজ্যের উদ্ধার করিয়াছি। [illegible]রাণা লক্ষ্মণ সিংহের বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, তখন পৃথক্ ছত্রসিংহাসন প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া পূর্ব্বযুগের রাজগণের ন্যায় রাজত্ব করিব। বিশেষতঃ রাজ্যশাসনের যে প্রধান সপ্তাঙ্গ—রাজা, প্রধান (মন্ত্রী), রাষ্ট্র, দুর্গ, কোষবল, সুহৃদ্বল ও সেনা—তাহার সকলগুলিই সিদ্ধ হইয়াছে। অতঃপর সিংহাসনাধীশ্বররূপে পরিচিত হইতে হইবে।' এ বিষয়ে মহারাজ দৃঢ়সংকল্প হইলেন।

প্রথমতঃ মহারাজ এ জন্য শ্রীর (শ্রীভবানীর) নিকট প্রার্থনা করিলেন। শ্রী স্বপ্নগত হইয়া বলিলেন,—'তোকে বর দিয়াছি, এই বংশে অংশরূপে আবির্ভূত হইয়া ধর্ম্মবৃদ্ধি করিয়াছি। তোর সিংহাসনাধীশ্বর হইবার বাসনাও পূর্ণ করিব।' দেবীর নিকট এইরূপ আশ্বাস পাইয়া মহারাজ জননীর নিকট স্বীয় মনোগত ভাবের নিবেদন করিলেন। জননীর আদেশগ্রহণের পর শ্রীরামদাস স্বামীর নিকট কারকুন পাঠাইলেন ও প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলেন। তিনিও তাঁহার প্রস্তাবে অনুমোদন পূর্ব্বক 'কার্য্যসিদ্ধি হইবে' বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। মহারাজ চিঞ্চবড় নামক স্থানের প্রসিদ্ধ মোরয়া দেব ও অপর সাধু সজ্জনগণের নিকট কারকুন পাঠাইয়া তাঁহাদিগেরও এ কার্য্যে সম্মতি আনাইলেন।

তাহার পর মহারাজ রাজ্যের বড় বড় পণ্ডিত, বিদ্বান, বৈদিক ও সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণদিগকে শিবিকাদি যানপ্রেরণপূর্ব্বক নিমন্ত্রণ করিয়া আনিলেন। সকল সর-কারকুন ও সর্দ্দারদিগকে

সমবেত করিলেন। আত্মীয়, সুহৃৎ, সম্বন্ধী, বন্ধুবান্ধবদিগকে সভায় ডাকিয়া সকলের সমক্ষে স্বীয় মনোগত অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া তিনি প্রশ্ন করিলেন,—'অতঃপর ছত্র-সিংহাসন গ্রহণ করিবার ইচ্ছা করিয়াছি। সে সম্বন্ধে আপনাদিগের মতে কি করা কর্ত্তব্য?' মহারাজ স্বয়ং এই প্রশ্ন উত্থাপিত করিলেন, এবং অভিষেক বিষয়ে সকলের অনুমোদন গ্রহণ করিলেন। 'রাজ্যাভিষেক করাই কর্ত্তব্য' বলিয়া সর্ব্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত হইল। শিষ্ট জনগণের সহিত আলোচনা করিবার সময় মহারাজের উপনয়নসংস্কারসংক্রান্ত প্রশ্ন উপস্থিত হইল। কারণ, রাজ্যাভিষেকের জন্য আদৌ ব্রতবন্ধ আবশ্যক। ব্রতবন্ধের (উপনয়নের) পর অভিষেকসংক্রান্ত সমস্ত ক্রিয়াকলাপ হওয়া উচিত। কিন্তু শ্রীকাশী, পৈঠন (প্রতিষ্ঠান) ও সকল তীর্থক্ষেত্রের শিষ্ট ব্যক্তিগণের সম্মতি ভিন্ন এ কার্য্য কিরূপে সিদ্ধ হইবে? সমস্ত সরকারকুন এই সমস্যায় পড়িলেন। তখন বালাজী চিটনীস উঠিয়া নিবেদন করিলেন যে,—'মহারাজ যে যে মনোরথ করিয়াছেন, তাহা দুর্ঘট হইলেও,সমস্তই সিদ্ধ হইয়াছে। অতএব এ সমস্যার মীমাংসা অসম্ভবনীয় হইবে কেন? চারি বেদ ও ছয় শাস্ত্র যাঁহাদিগের অধীত, এরূপ প্রসিদ্ধ ভট্টের বংশ বারাণসীতে বিদ্যমান রহিয়াছে। সেই বংশে ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি-কর গ্রন্থ-সমূহ যাহা হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে, সেই ধুরীণ পণ্ডিত গাগাভট্ট অনাহূত হইয়াও মহারাজের কীর্ত্তিশ্রবণে পৈঠন ক্ষেত্রে আগমন করিয়াছেন। তাঁহাকে ও পৈঠনের পণ্ডিতগণকে এখানে আনয়ন করিয়া তাঁহাদিগের পরামর্শানুসারে এই কার্য্য সুসিদ্ধ করুন।'

বালাজী আওজীর এই উপদেশ অনুসারে মহারাজ চেষ্টা করিয়া তাঁহাদিগকে (পণ্ডিত-দিগকে) আনাইবার আদেশ করিলেন। তাঁহাদিগের আনয়ন সম্বন্ধে সকলেরই সম্মতি হইল। তদনুসারে বালাজী আওজীর গুরুস্থানীয় কেশব পণ্ডিত ও ভালচন্দ্র ভট্ট ও আওজীর আশ্রিত সোমনাথ কা[illegible]তিকে দশ হাজার টাকা ও পাল্কী সঙ্গে দিয়া গাগা ভট্ট ও পৈঠনের পণ্ডিতদিগকে আনিতে পাঠান হইল। তাঁহারা গিয়া মহারাজের কার্য্যকলাপ ও মনোরথের বিষয় গাগা ভট্টকে বুঝাইয়া বলিয়া তাঁহার সহিত প্রতিষ্ঠানের পণ্ডিতদিগের একবাক্যতা সাধন করিলেন। এবং উদয়পুর, জয়পুর প্রভৃতি স্থানে যে প্রকার রাজ্যাভিষেক ক্রিয়া সম্পাদিত হইয়া থাকে, শিবাজীর সেই প্রকার অভিষেককার্য্য সম্পন্ন করিতে তাঁহাদিগকে সম্মত করিয়া রায়গড়ে লইয়া আসিলেন।

তাঁহারা রায়গড়ে উপস্থিত হইলে মহারাজ প্রত্যুদ্গমন পূর্ব্বক তাঁহাদিগের বহু সমাদর করিলেন। এবং সম্ভ্রমসহকারে বাসস্থানাদির ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তাহার পর দেশীয় সমস্ত বড় বড় ব্রাহ্মণ ও রাজপুরুষদিগকে লইয়া একটি সভা হইল। সেই সভায় সকলের বিচারে প্রতিপন্ন হইল যে,—উদয় সিংহজী রাণা ও শিবাজী একবংশীয়। শিশোদে বংশের পুরুষেরাই হিন্দুস্থান হইতে আসিয়া এ দেশে বসতি করিয়াছেন। রাজপুত রাজবংশীয়েরা মহারাষ্ট্রদেশে মারাঠা নামে আখ্যাত হইয়া থাকেন। উদয়পুর, জয়পুরে রাজ্যাভিষেক, সিংহাসনারোহণ, ব্রতবন্ধ প্রভৃতি সংস্কার হইয়া থাকে। কাশীক্ষেত্রাদি হইতে ব্রাহ্মণ লইয়া গিয়া জয়সিংহ অশ্বমেধ করিয়াছিলেন, সে সময়ে এ বিষয়ের সমস্ত সিদ্ধান্ত হইয়া গিয়াছে। তদনুসারে রাজ্যাভিষেকের অঙ্গস্বরূপ উপনয়ন সংস্কার দ্বারা শিবাজীকে অভিষিক্ত করা হউক, কারণ ইনিও

সেই বংশজ; তদ্বংশীয়গণের ছত্র-সিংহাসন গ্রহণের অধিকার চলিয়া আসিতেছে।' যদিও মহারাজের বয়স ৪৬ বৎসর ও দুইটি পুত্র হইয়াছিল, তথাপি পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত অনুসারে সমস্ত পণ্ডিতজন ও ব্রাহ্মণেরা অভিষেকের পূর্ব্বাঙ্গস্বরূপ উপনয়ন করিবার ব্যবস্থাপ্রদান করিলেন।

এই ঘটনার বর্ণনা পাঠ করিলে সে কালের ব্রাহ্মণদিগের উদারতা ও প্রবল স্বদেশ-হিতৈষণা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। শিবাজী বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়বংশ-সম্ভূত হইলেও, দক্ষিণাপথের মোসলমান বিপ্লবের ফলে উপনয়নাদি সংস্কার হইতে বিচ্যুত হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতৃপিতামহগণ কোনও কালে উপনীত হন নাই। ষট্‌চত্বারিংশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত স্বয়ং শিবাজী মহারাজও উপনয়ন-সংস্কার-বর্জ্জিত ছিলেন। দ্বিজাতির যোগ্য সংস্কারলাভের পূর্ব্বে তাঁহার দুইটি পুত্র ও একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। এরূপ অবস্থায় তাঁহার "ব্রতবন্ধ" সংস্কারের প্রস্তাবে সামাজিকগণের আপত্তি উত্থাপন করা নিতান্ত স্বাভাবিক ছিল। অন্ততঃ বর্ত্তমান কালে এরূপ প্রস্তাব উপস্থিত হইলে কয় জন ব্রাহ্মণপণ্ডিত তাহার অনুমোদন করিতে অগ্রসর হইবেন, তাহা আমরা বলিতে পারি না। কিন্তু খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে মহারাষ্ট্র জাতির সৌভাগ্য-সঞ্চার-কালে দক্ষিণাপথের ব্রাহ্মণদিগের হৃদয়ে স্বদেশপ্রীতি ও স্বজাতিবাৎসল্য এরূপ প্রবল হইয়াছিল যে, কুসংস্কার বা পরম্পরাগত আচারের প্রতি অন্ধ ভক্তি তাঁহাদিগকে কর্ত্তব্যপথ হইতে—দেশহিত-সাধনের সংকল্প হইতে পরিভ্রষ্ট করিতে পারিত না। এই কারণে তাঁহারা পুরুষানুক্রমে শূদ্রত্বপ্রাপ্ত শিবাজীকে যজ্ঞোপবীতদান করিতে বিশেষ আপত্তি করেন নাই। মহারাষ্ট্রদেশের স্বাধীনতা-সম্পাদন-ব্যাপারে তাঁহারা কত দূর সহায়তা করিয়াছিলেন, এই প্রসঙ্গে তাহার সংক্ষিপ্ত নির্দ্দেশ আমরা আবশ্যক বলিয়া মনে করি।

যাঁহারা শিবাজীর অধীনতায় কর্ম্মগ্রহণ করিয়া স্বদেশরক্ষাব্রতে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, সেই সকল ব্রাহ্মণের স্বার্থত্যাগাদির উল্লেখ আমরা এই স্থলে করিব না। যাঁহারা পৌরোহিত্য ও শাস্ত্রালোচনা করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতেন, তাঁহাদিগের কর্ত্তব্যজ্ঞানের পরিচয়ই প্রদান করিব। (১ম) দিল্লীর কারাগার হইতে পলায়নের পর শিবাজী যখন মথুরায় উপস্থিত হইয়া তত্রত্য কয়েক জন মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণের আশ্রয়ে ছদ্মবেশে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময়ে এক দল মোগল সৈন্য তাঁহার অনুসন্ধানের জন্য তথায় উপস্থিত হয়। তদ্দর্শনে অষ্টমবর্ষীয় সান্তাজীকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক শিবাজী একাকী মথুরা হইতে অবসৃত হইতে বাধ্য হন। এ দিকে মোগল সৈন্য তীর্থবাসী মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণদিগের গৃহে প্রবেশ করিয়া শিবাজীর অনুসন্ধান করিতে করিতে সান্তাজীকে দেখিতে পায়। তাহার

আকারপ্রকারে শিবাজীর সাদৃশ্য দেখিয়া মোগলদিগের চিত্তে সন্দেহের উদ্রেক হওয়ায় ব্রাহ্মণেরা সান্তাজীকে আপনাদিগের ভ্রাতুষ্পুত্র বলিয়া পরিচিত করেন, এবং তাহার সহিত এক পাত্রে ভোজন করিয়া মোগলদিগের সংশয়নিবৃত্তি করেন।

(২) পুণার নিকটবর্ত্তী লেটন প্রদেশের নিম্বালকর বংশ অদ্যাপি মহারাষ্ট্র দেশে বিশেষ প্রসিদ্ধ। শিবাজীর সময়েও নিম্বালকরেরা সামান্য প্রতিপত্তিশালী ছিলেন না। তাঁহারা বিজাপুরের সুলতানের অনুগৃহীত ছিলেন। শিবাজীর কার্য্যকলাপের সহিত তাঁহাদিগের গুপ্ত সহানুভূতি আছে বলিয়া সন্দেহ হওয়ায় বিজাপুরপতি বজাজী নিম্বালকরকে সহসা ধৃত করিয়া বন্দী করেন। বজাজী স্বীয় নির্দ্দোষিতা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিলে, সুলতান তাঁহাকে জানাইলেন যে, তিনি মোসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে তাঁহার অপরাধ মার্জ্জিত হইতে পারে। নিরুপায় নিম্বালকর প্রাণ-রক্ষার জন্য ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। এ দিকে নিম্বালকরের ন্যায় ক্ষমতাশালী ব্যক্তি পরধর্ম্মাবলম্বী হওয়ায় সমাজের বহুল অনিষ্ট সাধিত হইতে পারে,ইহা বিবেচনা করিয়া শিবাজীর জননী মনস্বিনী জীজা বাঈ তাঁহাকে পুনর্ব্বার স্বধর্ম্ম-গ্রহণে অনুরোধ করিলেন। বজাজী বাধ্য হইয়াই স্বধর্ম্মত্যাগ করিয়াছিলেন; সুতরাং তিনি হিন্দুধর্ম্মের শান্তিময় ক্রোড়ে আশ্রয়লাভের জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তখন মনস্বিনী জীজা বাঈ দেশের সমস্ত ব্রাহ্মণপণ্ডিতকে সমবেত করিয়া নিম্বালকরের অবস্থা তাঁহাদিগের গোচর করিলেন। বজাজী বিপদে পড়িয়া ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা বুঝিতে পারিয়া সমস্ত ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে শাস্ত্রসঙ্গত প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া শুদ্ধ করিলেন। প্রায়শ্চিত্তান্তে ব্যবহার্য্যতা সম্বন্ধে যাহাতে সামাজিকগণের মধ্যে কোন প্রকার মতভেদ উপস্থিত না হয়, তাহার জন্য জীজা বাঈয়ের আদেশক্রমে শিবাজী, বজাজীর পুত্র মহাদেবজী নিম্বালকরকে, স্বীয় দুহিতা (সখু বাঈ) দান করিলেন। ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দে এই ঘটনা ঘটে। শিবাজীর শক্তি তখনও মহারাষ্ট্র দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই; তথাপি দেশের ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরা জীজা বাঈর উদ্দেশ্যের মহত্ত্ব বুঝিতে পারিয়া, স্বদেশের মঙ্গল স্মরণপূর্ব্বক বিনাবাক্যব্যয়ে ম্লেচ্ছ-ধর্ম্মগ্রস্ত নিম্বালকরের উদ্ধারের জন্য প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিয়া তাঁহার স্বদেশ-সেবার পথ উন্মুক্ত করিয়া দিলেন! সেকালের সমাজও বর্ত্তমান কালের সমাজের ন্যায় অনুদার ছিল না।

ফলতঃ সেকালের ব্রাহ্মণগণের এইরূপ উদারতাপূর্ণ কর্ত্তব্যজ্ঞানের সহিত ক্ষত্রিয়সমাজের বাহুবল ও কায়স্থগণের রাজনীতি-কৌশলের মণিকাঞ্চন

যোগেই মহারাষ্ট্র জাতির দাসত্বমুক্তি ঘটিয়াছিল। যাঁহাদিগের চেষ্টায় দক্ষিণাপথের বর্ণভেদময় হিন্দু সমাজে রাষ্ট্রীয় একতার সফল দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, এবং মহারাষ্ট্রীয়েরা অতুলনীয় গৌরবের অধিকারী হইতে পারিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের অনেকেই ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। এইরূপ উদার-চরিত বিপ্রসম্প্রদায় যে স্বদেশের গৌরববর্দ্ধনকারী শিবাজীর শূদ্রত্বমোচন করিয়া তাঁহাকে যজ্ঞোপবীত দানে সিংহাসনাভিষিক্ত করিতে সহজেই অগ্রসর হইবেন, তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন।

দুঃখের বিষয় এই যে, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের প্রণীত "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস" গ্রন্থের "কায়স্থের বর্ণনির্ণয়" নামক খণ্ডে, শিবাজীর রাজ্যাভিষেক-বিষয়ক বিবরণে কতিপয় অনৈতিহাসিক উক্তি স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রতিবাদের সৌকর্য্যার্থ সেই উক্তিগুলি আমরা এ স্থলে উদ্ধৃত করিলাম।

"শিবাজীর রাজ্যাভিষেককাল উপস্থিত হইল। এ সময়ে তাঁহার দুইটী পুত্র জন্মিয়াছে, অথচ এ পর্য্যন্ত উপনয়নাদি হয় নাই। সুতরাং কিরূপে তাঁহার অভিষেক হইবে? ব্রাহ্মণেরা আপত্তি করিতে লাগিলেন। তখন কাশীর বিখ্যাত পণ্ডিত গাগা ভট্ট পৈঠনে আসিয়াছিলেন, ব্রাহ্মণদিগের পরামর্শে প্রথমে তিনি অনেকটা প্রতিকূল ছিলেন। বালাজী আবজী তাঁহাকে শিবাজীর অনুকূল করিবার জন্য বলিয়া পাঠাইলেন যে, উদয়পুরের প্রসিদ্ধ রাণার বংশে শিবাজী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার পরিপোষক বংশাবলী উদয়পুর হইতে আনাইয়া তিনি গাগা ভট্টের সন্দেহভঞ্জন করিলেন। এইরূপে ব্রাহ্মণ রাজকর্ম্মচারিগণের নিতান্ত প্রতিবন্ধকতা সত্বেও চিটনীসের চেষ্টায় পণ্ডিতবর গাগা ভট্টের শাস্ত্রীয় যুক্তিতে শিবাজী প্রৌঢ় বয়সে উপনয়নসম্পন্ন ও রাজ্যাভিষিক্ত হইলেন। শিবাজী এই সময়ে প্রীত হইয়া বালাজী আবজীকে যে সনন্দ দিয়াছিলেন, তাহাতে লিখিত আছে,—'আমি তোমার সেবায় মুগ্ধ হইয়া তোমাকে অষ্ট প্রধানের মধ্যে একটী পদ দিব, ইচ্ছা করিয়াছিলাম। কিন্তু তোমার প্রার্থনা মত পুরুষানুক্রমে চিটনীসপদ প্রদান করিলাম'।"

পাঠক দেখিবেন, শিবাজী মহারাজের চিটনীস বালাজী আওজীর বংশধর মহ্লার রাম রাওয়ের বর্ণনায় উদ্ধৃতাংশের পরিপোষক কোনও কথা নাই। "ব্রাহ্মণদিগের পরামর্শে গাগা ভট্ট প্রথমে প্রতিকুল ছিলেন", অথবা "ব্রাহ্মণ রাজকর্ম্মচারীদিগের নিতান্ত প্রতিবন্ধকতা সত্বেও চিটনীসের চেষ্টায় শিবাজী অভিষিক্ত হইলেন" প্রভৃতি উক্তির সমর্থন করা যাইতে পারে, এমন কোনও প্রমাণ মহ্লার রাম রাওয়ের বখরে পরিদৃষ্ট হয় না। পক্ষান্তরে শিবাজীর অন্যতম কায়স্থ কর্ম্মচারী কৃষ্ণাজী অনন্ত সভাসদ খৃঃ ১৬৯৪ অব্দে (অর্থাৎ শিবাজী মহারাজের মৃত্যুর ১৪ বৎসর পরে) যে বখর রচনা করিয়াছেন, তাহার বর্ণনায়

বিশ্বাসস্থাপন করিলে বলিতে হয় যে, "গাগা ভট্ট প্রথমে প্রতিকূল" থাকা দূরের কথা, তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই শিবাজীর রাজ্যাভিষেকের প্রস্তাব উত্থাপিত করিয়াছিলেন। কৃষ্ণাজী অনন্ত বলেন,—

অতঃপর (দিলের খানের পরাভবের পর) বেদমূর্ত্তি রাজশ্রী গাগা ভট্ট বারাণসী হইতে রাজার কীর্ত্তি শ্রবণ করিয়া, দর্শনের জন্য আগমন করিলেন। ভট্ট গোস্বামী মহাপণ্ডিত, চারি বেদ ছয় শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, যোগাভ্যাসসম্পন্ন, জ্যোতিষ, মন্ত্রশাস্ত্র প্রভৃতি বিদ্যায় নিপুণ, কলিযুগে বিরিঞ্চির তুল্য। রাজা সরকারকুন সহ প্রত্যুদ্গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে সম্মানিত করিয়া (রায়গড়ে) আনয়ন করিলেন। তিনি রত্নখচিত অলঙ্কার, শিবিকা, হস্তী, অশ্ব ও বহু ধনসম্পত্তি দিয়া নানা প্রকারে তাঁহার পূজা করিলেন। গাগা ভট্ট অতীব সন্তুষ্ট হইলেন। তাঁহার মনে হইল, মুসলমান বাদশাহেরা সিংহাসনে বসিয়া ছত্রধারণ পূর্ব্বক বাদশাহী করেন, আর শিবাজী রাজা চারিটি বাদশাহীতে (মোগলশাহী, আদিমশাহী, নিজামশাহী ও কুতুবশাহী রাজ্যে) আধিপত্য স্থাপন করিয়া ও গড়কোট সহ ৭৫ সহস্র তুরগ সৈন্যের অধিপতি হইয়াও সিংহাসনে বঞ্চিত রহিয়াছেন, ইহা সঙ্গত নহে। অতএব মারাঠা রাজার ছত্রপতি পদ-ধারণ কর্ত্তব্য। এইরূপ চিন্তা করিয়া গাগা ভট্ট রাজাকে স্বীয় মনোভাব জ্ঞাপন করিলেন। রাজার নিকট এ প্রস্তাব সঙ্গত বলিয়া বোধ হইল। দেশের সমস্ত মাতব্বর লোককে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া এ বিষয়ের আলোচনা করায় গাগা ভট্টের প্রস্তাব সকলের মনোনীত হইল। তখন ভট্ট গোস্বামী বলিতে লাগিলেন যে, রাজা সিংহাসনে উপবেশন করুন। অতঃপর রাজার বংশের মূলানুসন্ধান করায় প্রকাশ পাইল যে, উত্তরভারত হইতে বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় শিশোদে বংশ-ভুক্ত একটি পরিবার দক্ষিণ দেশে আসিয়াছিল। রাজা সেই পরিবার-সম্ভূত। উত্তরদেশীয় ক্ষত্রিয়গণ যেরূপ ব্রতবন্ধ করিয়া থাকেন, রাজারও সেইরূপ করা কর্ত্তব্য, স্থির করিয়া তাহারই করিলেন। ব্রতবন্ধ করিয়া তাঁহাকে প্রথমে শুদ্ধ ক্ষত্রিয় করিলেন ইত্যাদি।

"চিত্রগুপ্তবিরচিত শিবাজী মহারাজের চরিত্র" নামক বখরের বর্ণনাও সভাসদের অনুরূপ। "শিবদিগ্বিজয়" নামক গ্রন্থ বালাজী আওজী চিটনীসের কনিষ্ঠপুত্র খণ্ডোবল্লালের রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই গ্রন্থে লিখিত আছে যে, বারাণসীবাসী পণ্ডিতগণের ও তত্রস্থ গাগা ভট্টের মনে প্রথমে শিবাজীর ক্ষত্রিয়ত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ ছিল বলিয়া তাঁহারা মহারাজের অভিষেকে আপত্তি করিয়াছিলেন, বালাজী আওজী তাঁহাদিগের সে সন্দেহভঞ্জন করায় তাঁহারা শিবাজীর উপনয়ন করিতে সম্মত হইলেন। এ বখরেও মহারাষ্ট্রদেশের ব্রাহ্মণগণের আপত্তির যে "ব্রাহ্মণ রাজকর্ম্মচারিগণের প্রতিবন্ধকতার" ইঙ্গিতেও কোন উল্লেখ নাই। অপর কয়েকখানি সংক্ষিপ্ত বখরের কোনখানিতেই শিবাজীর অভিষেকে ব্রাহ্মণগণের বাধাদানের কোনও বর্ণনা দেখিতে পাই না।

তেছে, কেবল তাহাতে ব্রাহ্মণদিগের বিরুদ্ধে শিবাজীর অভিষেক পণ্ড করিবার দোষারোপ করা হইয়াছে। কিন্তু সে কালের ব্রাহ্মণদিগের উদারতা, কর্ত্তব্যজ্ঞান ও দেশহিতৈষণা সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বে যাহা উল্লেখ করিয়াছি, তাহার বিষয় চিন্তা করিলে কায়স্থ বখরের বর্ণনায় বিশ্বাসস্থাপন করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। শিবাজীর সমসাময়িক কর্ম্মচারী কৃষ্ণজী অনন্ত সভাসদের বখর, বালাজী আওজীর কনিষ্ঠ পুত্রের রচিত শিবদিগ্বিজয় ও তদ্বংশধর মহ্লার রাম রাওয়ের সরকারী কাগজপত্র অবলম্বনে লিখিত বখর—এই প্রসিদ্ধ গ্রন্থত্রয়ের বর্ণনা ও কায়স্থ বখরের উক্তির অনৈতিহাসিকতা সপ্রমাণ করিতে অসমর্থ নহে। শিবাজীর অভিষেক সম্বন্ধে কায়স্থ বখরের বর্ণনা একটু অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিলেই প্রতীয়মান হইবে যে, উহা অপক্ষপাত লেখকের রচনা নহে। সুতরাং উহার অসঙ্গতি-প্রতিপাদনের জন্য অধিক বাক্যব্যয় আবশ্যক মনে করিলাম না।

শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর।

আমি সুখী কেন ?

১

তোমরা সুখ দুঃখের কি জান ? তোমরা যাহা জান, আমি তাহা জানি, আমি তাহা হইতেও অধিক জানি।

আমি জানি—অপরাজিতা বিধবা হইয়াছিল। তোমরা তাহা জান কি ? দেখিতেছি, তোমরা তাহার কিছুই জান না। কিন্তু সংসারে কে কার খোঁজ রাখে ? তোমাদের কোন দোষ নাই।

তোমরা বল,—সংসারে এত দুঃখ কেন ? তাই বলিয়া কাঁদ। আমি বলি, সংসারে এত সুখ কেন ? তাই বলিয়া হাসি। তোমার সুখের গৃহে দুঃখ দেখিলে কাঁদ। আমার দুঃখের কুটীরে সুখ দেখিলে হাসি। তোমার প্রাসাদে খঞ্জ অন্ধ গেলে তুমি কাঁদ। আমার ভাঙ্গা ঘরে রাঙ্গা বধূ দেখিলে আমি হাসি। তোমারও দোষ নাই, আমারও দোষ নাই।

এই হাসি কান্নার মধ্যে অপরাজিতা বিধবা হইয়া গেল। স্বামীর কুল পিতার কুল, দুই কুলই কাঁদিয়া আকুল। আমি হাসিলাম। কেন বুঝিলে ? পরে বলিতেছি।

অপরাজিতা ছোট। তবে এমনই কি নিতান্ত ছোট? আবার এমনই কি নিতান্ত বড়? অপরাজিতা রাঁধিতে জানে না, গৃহকর্ম্ম জানে না। অপরাজিতা মুখরা। এমন বিধবা ঘরে রাখিয়া লাভ কি? তাই অপরাজিতা বাপের বাটী আসিল। আসিয়াই ফুটিল।

কিন্তু অপরাজিতা ফুটিলেই কি ভ্রমর ছুটে? তাহাও নয়। অপরাজিতা নীল বৈধব্য-অবগুণ্ঠন পরিয়া প্রাচীরবেষ্টিত গৃহপ্রাঙ্গনে বসিয়া সুনীল অনন্ত আকাশ পানে চাহিয়া থাকিত। কাজেই ভ্রমরকুলের অভাব হইয়া পড়িল।

অপরাজিতা কি স্বামীর সোহাগ পাইয়াছিল? মোটেই না। সে স্বামীকে একবারের অধিক দেখিয়াছিল কি না সন্দেহ। তাহাও বিবাহের পূর্ব্বে। বিবাহের সময়, অর্থাৎ শুভদৃষ্টির সময়, অপরাজিতা চক্ষু উন্মীলন করে নাই। তার পর কয়টা দিন স্বামীর ভয়ে রাত্রিকালে বিড়ালের সঙ্গে রন্ধনশালায় শুইয়া থাকিত।

তুমি মনে করিবে, স্বামীটা হয় ত ছিল মাতাল। তাহাও না। তবে কিছু কিছু, অর্থাৎ, ৺ চন্দ্রকান্ত দেবশর্ম্মা অনেক বিবাহ করিয়া শেষ বিবাহের কিয়দ্দিন পূর্ব্ব হইতে অহিফেন সেবন করিতেন, এবং বিবাহ করিয়া মাত্রা এত বাড়াইয়াছিলেন যে, নবীনা বধূর অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাঁহার কোন বিশ্বাসই ছিল না। ফুলশয্যার নিশাকালে অপরাজিতা কাঁদিতে বসিলে ৺চন্দ্রকান্ত দেবশর্ম্মার অহিফেনানুপ্রাণিত পরম নেশামধুর ক্ষীরের কথা স্মৃতিপথে উদিত হইবামাত্র তিনি সত্রাসে বলিয়াছিলেন। "ঘরে ম্যাও করে কেটা—বিড়াল নাকি?" যাহারা আড়ি পাতিতে আসিয়াছিল, তাহারা সকলেই এই অপূর্ব্ব রহস্যোক্তির তীক্ষ্ণ ধারে হাসিয়া আটখানা হইল। কেবল অপরাজিতা কাঁদিল। ৺চন্দ্রকান্তের বয়স তখন পঞ্চান্ন বৎসর। রীতিমত ত্রৈরাশিক কসিলে তাঁহার শেষ পক্ষের স্ত্রীর বয়স অন্ততঃ পঁয়ত্রিশ হওয়া উচিত; তাহা না হইয়া চতুর্দ্দশ হইয়া গিয়াছিল, ইহা ত স্বাভাবিক কথা নয়!

আমার সহিত অপরাজিতার পূর্ব্বেই বিবাহের কথা হইয়াছিল, কিন্তু ৺চন্দ্রকান্ত কুলীনাগ্রগণ্য, এবং রাশীকৃত ধনের ঈশ্বর। এখনও কৌলীন্যের প্রভাব বঙ্গের বায়ু ও বল্লরীতে মুদ্রিত। আমার দাবীর মধ্যে কেবল চেহারাখানা ও একটু ভাষাজ্ঞান। তাহার পরিচয় পাইতেছেন বোধ হয়। আমার চিত্তবৃত্তি প্রভৃতির পরিচয়ে ইহাই বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, তখন মনে মনে দারুণ অভিশাপ দিয়া-

মানব-চরিত্র বিচিত্র ব্যাপার, সত্য কথায় চটা উচিত নয়। ব্রাহ্মণের অভিশাপ ফলিল।

২

রুদ্ধ হৃদয়বেদনা দগ্ধ দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত ছাড়িয়া দিয়া ৺চন্দ্রকান্ত দেবশর্ম্মার মুখাগ্নি জলন্ত করিলাম। তোমরা বলিতে পার, "লোকটা (অর্থাৎ আমি) কি পাজি, এবং ভাষাটা কি রুক্ষ ও অশ্লীল"। তবে আমার চরিত্রটাও দৃষ্টিপাত-যোগ্য। আমি একটা পাড়াগেঁয়ে বানর, আমি যদি বলিতাম, "সেই ঝিল্লীমুখর সন্ধ্যাবেলায়, যখন লৌহকঠিন মানবদেহ ভেদ করিয়া ৺চন্দ্রকান্তের অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ আত্মা অগ্নিসংস্কৃত হইয়া দ্যুলোকে উঠিতেছিল, তখন একটু সুগভীর পরিত্রাণের নিশ্বাস ফেলিয়া অপরাজিতার শান্ত লাবণ্যমণ্ডিত মুখখানি চর্ম্মচক্ষুর অন্তরালবর্ত্তী মনোনেত্রের উপর ঈষৎ-পূরবী-রাগিণী-কম্পিত তুলিকায় টানিলাম," তবে তুমি বলিতে, "ব্যাটা রবি ঠাকুরের নকল কচ্ছে।" কাজেই সেকালের ভাষাবীণাযন্ত্রে একালের বখামির একটু মিড় টানিয়া কিঞ্চিৎ নূতনত্বের সৃষ্টি করিতেছি।

আমার মাথার সম্মুখে বড় চুল, পশ্চাতে খাটো, তদুপরি বাঁদুরে টুপি (মনকি ক্যাপ) দাড়ি কামান, গাত্রে চাঁদনির আড়াই টাকার অ্যাঙ্গোলার ডবলব্রেষ্ট কোট, তন্নিম্নে গেঞ্জি, এবং তাহারই দক্ষিণ দিকের পকেটে অগ্‌ডেনের ট্যাব-সিগারেট, বাম দিকে নস্যের ডিবা ও দেশলাই। চক্ষু কটা। বয়স দেখিলে অনুমান করা যায় না। যখন বাইসিকেলে ছুটি, তখন আমাকে অনেকটা বালকের মত বোধ হয়; কেন না, গোঁপ দেখা যায় না। যখন পাড়ায় বেড়াই, তখন প্রৌঢ়া ও যুবতী সকলেই আমাকে দেখিয়া ঘোমটা টানে। ইহাতে বয়সের অনুমান করিয়া লও।

শ্মশানঘাট হইতে বাইসিকেল্ পৃষ্ঠে গৃহাভিমুখে দৌড়িলাম। সম্মুখেই এক গরুর পাল; তন্মধ্যে বসাকদিগের শামলা নব-বৎস-রক্ষণশীলা চঞ্চলা গাভী ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির মত আমার পশ্চাতে দৌড়িল। আমি দুই চারিবার ওয়ার্ণিংবেল্-টাতে টঙ্কার দিয়া এবং দুইবার সার্‌কিট কসিয়া অচিরাৎ জানোয়ারটার অকারণ আক্রমণ হইতে উদ্ধারলাভ করিলাম। তৎপরে চলদবস্থায় টক্ করিয়া একটি সিগারেট জ্বালিয়া মুখে সংযুক্ত করিলাম, এবং তৎক্ষণাৎ এক টিপ্ নস্য লইয়া হাঁচিতে হাঁচিতে গ্রাম্য কৃষকগণের বিস্ময় উৎপাদন করিয়া তেমোহানার উপর বাইসিকেল্ হইতে অবতীর্ণ হইলাম।

বাইসিকেল ধীরে ধীরে বামহস্তে হেলাইয়া দুলাইয়া যখন চলিয়া আসিতেছি,

তখন স্বভাবতঃই জীবনের সম্ভাবিত নূতন অঙ্ক মনোনাট্যশালায় জাগ্রত হইয়া উঠিতেছিল। কাজেই গ্রামের খোনা ভট্টাচার্য্যের সহিত আমার মস্তক অন্ধকারে বাধিয়া গেল। ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরও অন্যমনস্ক হইবার কোন বিশেষ কারণ ছিল; বোধ হয়, অনেক দিন দক্ষিণা জুটে নাই। ম্রিয়মাণ ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "রাম, রাম! কেও!"

আমি বলিলাম, "ভয় নাই, আমি হৃষীকেশ।"

ভট্টাচার্য্য। চন্দ্রকান্তের কাল হইয়াছে, জান?

আমি। এই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপ্ত করিয়া আসিলাম।

ভট্টাচার্য্য। শ্রাদ্ধে ব্যয়াদি কত হইবে জান?

আমি। অনেক। যদি আপনাকে সম্পূর্ণরূপে দক্ষিণা না দেয়, আমি ডবল দিব।

ভট্টাচার্য্য। বাঁচিয়া থাক বাবা! তোমরা বড় লোক, ইচ্ছা করিলে কি না করিতে পার?

আমি। আর যদি একটা বিধবা-বিবাহের বিধান দিতে পারেন, তবে আপনার সৌভাগ্যলক্ষ্মী সুনিশ্চিত। নস্য লইবেন কি?

ভট্টাচার্য্য (নস্যগ্রহণান্তে)। বিধবা-বিবাহ শাস্ত্রসম্মত, কিন্তু আমার তিনটি কন্যা জান ত, বিধান দিতে ভয় হয়, বিশেষতঃ পল্লীগ্রাম, চক্রবর্ত্তীর দল আমাকে ঠ্যাঙ্গাইয়া মারিয়া ফেলিবে। তবে এখন আসি বাবা।—

আমি বলিতে যাইতেছিলাম, "আপনার তিনটি কন্যা শুদ্ধ আমি গছিয়া লইব;" কিন্তু ভাবিলাম, আমি স্বার্থপর! চন্দ্রকান্ত কি দোষ করিয়াছিল? হায় রে সংসার এবং সংসারের মানুষ!

৩

গ্রামের দৃঢ়, কর্ম্মঠ ও সুচতুর জন কতক প্রেম-পাথারের নূতন পুরাতন নাবিক সংগ্রহ পূর্ব্বক বড় দীঘির পাড়ে একটা সভাস্থাপন করিলাম। সকলেরই মতে বিধবা-বিবাহের প্রস্তাবনা অসম্ভব বলিয়া বোধ হইল। অনেক অনুসন্ধান ও তদন্তের পর, এবং কর্ত্তৃপক্ষের মনের ভাবগ্রহণানন্তর বেশ বুঝা গেল যে, বিংশ শতাব্দীর মধ্যে এ গ্রামে বিধবা-বিবাহের কোন সম্ভাবনা নাই। তবে এক্‌জিকিউটিভ্ কমিটীর মতে একটা পথ ছিল,—তাহা এই যে, বালিকাহরণ পূর্ব্বক অন্য কোনও স্থানে বিবাহ কার্য্য সম্পাদিত করা।

মনে হইল, কর্ত্তৃপক্ষের খোসামোদ অপেক্ষা উক্ত উপায় অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ। [illegible] একটা [illegible] তাহার উপর নির্ব্বিঘ্নে কন্যালাভ। [illegible] ইহাও

স্বীকার করিলাম যে, দণ্ডবিধির ৩৬৩ ধারা প্রভৃতির সম্ভাবনা হইতে পারে, কিন্তু তদ্বিপক্ষেও অনেক আপত্তি ছিল।

আসল কথা, স্বয়ং কন্যার অভিপ্রায় তখনও অবিদিত।

সেটার ভার সম্পূর্ণ আমার উপর পড়িল। সারা রাত বসিয়া ভাবিলাম, এবং বাঁশীতে দুই চারিটি গৎ বাজাইলাম। গহন তিমির ভেদ করিয়া যখন ঊষার আলোকচ্ছটা সুদূর পূর্ব্বে দেখা দিতেছিল, তখন একবার হালদারদিগের খিড়কীঘাটের দিকে কলাবাগানের মধ্যে পাইচারী করিয়া আসিলাম। জন মনুষ্য নাই। রাত্রিকালের মৃদুমধুর লক্ষ্নৌ ঠুংরির বাছা বাছা গৎ বিফল হইয়া গিয়াছে। তবে কি অপরাজিতার হৃদয়ে প্রেম নাই? সেই নিশি! কত বার বায়ুতাড়িত শুষ্কপত্রের মর্ম্মর শুনিয়া মনে করিয়াছিলাম, এইবার বুঝি অপরাজিতা আসিতেছে! কতবার ঘনান্ধকার হইতেও কিঞ্চিৎ ঘন আবছায়া দেখিয়া মনে করিয়াছিলাম, ঐ বুঝি অপরাজিতা গৎ-বিহ্বলা হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। সকলই বিফল?

এমন সময় শ্বেতবর্ণের মত একটা কি নড়ন্ত চড়ন্ত পদার্থ দেখিয়া নিরাশাশীতল শোণিত আবার তড়িদ্বেগে হৃদয়ে ছুটিল। সেটাও একটা গাভী। অনেকক্ষণ আমার উদাস মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। আমি পূর্ব্বদিনের কথাটা স্মরণ করিয়া পলাইয়া আসিলাম।

ঋতুটা শীতকাল। আমার সারা নিশির কষ্ট পুরাতন আমলের প্রেমিক ভিন্ন অন্য কেহ বুঝিতে পারিবেন না। সূর্য্য উঠিলে কত রাখালবালক অর্দ্ধজীর্ণ শীতবাসের অপেক্ষাকৃত অটুট ভাগে মুড়ি বাঁধিয়া প্লীহাপরিপূর্ণ ডাগর উদর দেখাইয়া চলিয়া গেল। কত পুরাতন রামের মা, সাতকড়ির বৌ, নবীনের পুত্রবধূ, ছোট বড় কলসীকক্ষে যথানির্দ্দিষ্ট ও নিয়মিত সময়ে ধীরে ধীরে যাইল আসিল। কেহই আমার নিদারুণ উদ্বেগ, কষ্টকর অশান্তি, উপায়বিহীন দীর্ঘ-নিশ্বাস বুঝিল না।

অবশ্য জগতে একটা নিয়ম আছে। কার্য্যমাত্রেরই সফলতা ও নিষ্ফলতা আছে। শুনিয়াছিলাম, কর্ম্মফল ভোগ করিতে হয় নিশ্চিত। কর্ম্মটাই যদি নিষ্ফল হইল, তবে আর ভোগ করিব কি ছাই? সুতরাং আমার মত জ্ঞানীর বুঝিতে বাকি রহিল না যে, কর্ম্মের উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হইলে অত বড় কর্ম্মটাই কর্ম্ম-ভোগ। কর্ম্মটা সুসিদ্ধ হইলে তাহার পর সেটা ফলভোগ, কর্ম্মভোগ নহে।

কর্ম্ম-নিষ্ফলতার সঙ্গে সঙ্গেই একটা বৈরাগ্যভাবের উদয় হয়। মনে ভাবিলাম, এত বাড়াবাড়ি কেন? আমার কপালে অন্য একটা সুন্দরী স্ত্রী জুটিতে কত ক্ষণ? কিন্তু তাহা হইলে কি হয়? কর্ম্মক্ষেত্রের আমার বিধিনির্দ্দিষ্ট পথ সরল রেখার উপর দিয়া যায় নাই। দুই চারিবার নস্য লইয়া মস্তিষ্কটাকে মাঘ-মাসের মৃত আকাশের মত পরিষ্কার করিয়া ফেলিলাম।

বিকালে ঘনশ্যাম হালদারের বাটীতে মলিনমুখে গেলাম। ঘনশ্যাম হালদার অপরাজিতার পিতা। যথাযোগ্য সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া এবং পরিধেয় বস্ত্রে বারবার অশ্রুমোচন করিয়া আমার প্রতি হালদার মহাশয়ের অনুরাগ বিশেষরূপে বর্দ্ধিত করিলাম। "বাবা, তুমি যদি আমার জামাই হ'তে—তবে কি আর—(চক্ষু জলভারাক্রান্ত)—"

আমি, "ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন" ইহা বলিয়াই বেগে খিড়কী দ্বার দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলাম। "অপরা! তুমি দুপুর রাত্তিরে এখানে দাঁড়িয়ে থেকো, আমি আসবো।" অপরা সেখানে একাকিনী দাঁড়াইয়া শুনিল।

৪

অনেক সময় অতি সহজেই একটা বৃহৎ ঘটনা ঘটিয়া যায়। কে জানে অপরাজিতা খিড়কীর দুয়ারে দাঁড়াইবে, আর কেই বা জানে যে, আমার অদৃষ্টে অমন সুযোগটা এক মুহূর্ত্তে ঘটিয়া উঠিবে? এইরূপ সুযোগেই বড় বড় যুদ্ধ বিগ্রহ চক্ষের নিমেষে শেষ হইয়া যায়, এবং এইরূপ সুযোগেই বড় বড় দেহ চক্ষের নিমেষে লাস হইয়া যায়।

বাটীতে প্রবেশ করিবার সময় দেখিলাম, অপরাজিতা সেইখানেই দাঁড়াইয়া আছে, এবং বোধ হইল, পুষ্করিণীর স্বচ্ছ জলের দিকে অনিমেষনয়নে চাহিয়া একটিবার সেই লাখ টাকার মাথাটি দুলাইয়া দিল। উদ্দেশ্য, "তুমি আসিও, আমি থাকিব।" আমি একটি দুই লাখ টাকা মূল্যের দীর্ঘনিশ্বাস সুখে টানিলাম। এটা আকর্ষণ-বিপ্রকর্ষণের খেলা।

আমি সিগারেটের ধূম ছাড়িয়া রুমাল নাড়াইয়া দিলাম। সেটা "সিগ্যাল," অর্থাৎ সঙ্কেত -"তুমি এখন যাও।" এমন সময় পূর্ব্ব দ্বার দিয়া একটি যুবা-পুরুষকে বাহির হইতে দেখিয়াই আমি কপাট রুদ্ধ করিয়া তাহার ফাঁক দিয়া উভয় পক্ষের গতিবিধি পরিদর্শন করিলাম।

যুবক অপরাজিতাকে লইয়া চলিয়া গেল।

আমি ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিলাম, "মধু! হালদারদের বাড়ীতে একটা তেড়ী-কাটা বাবু এসেছে, সে কে?"

মধু। তিনি হালদার মশাইয়ের ভাইপো। কাল রাত্তিরের গাড়ীতে ছোট বোনকে নিয়ে কলিকাতা হ'তে এসেছেন।

মনের খট্‌কা অন্তর্হিত হইয়া যুবকের ভগ্নীবৎসলতার করুণ চিত্রে হৃদয় আর্দ্র হইয়া গেল। ভাবিলাম, এবার কলিকাতায় গিয়া একটু পবিত্রচিন্ততার চর্চ্চা করিব।

ঘোর সন্ধ্যার সময়ে আমার গবাক্ষপ্রান্তে একটা ছোট ঢিল পড়িল; তৎপরেই আর একটা। দ্রুতগতি গবাক্ষ খুলিয়া বাহিরে গিয়া ঢিল কুড়াইয়া আনিলাম। একটাতে এক খণ্ড কাগজ জড়ান ছিল; এবং সেই কাগজে সুন্দর হস্তাক্ষরে লেখা;—

"কুলমান সবই সঁপিয়াছি। রাত্রি দুইটার সময় আসিও। পূর্ব্বদুয়ারী ঘরের দিকে যাইও না, সেখানে ক্ষীরোদ ও বুড়ী শুইয়া থাকিবে। আমি উত্তর দিকে থাকিব। রাত্রি তিনটার গাড়ীতে আমরা কলিকাতায় চলিয়া যাইব। কিন্তু আমার একটি প্রতিজ্ঞা রাখিতে হইবে। যতক্ষণ আমার সহিত তোমার বিবাহ না হয়, ততক্ষণ আমার মুখ দেখিবে না, এবং অঙ্গস্পর্শ করিবে না। করিলেই আত্মহত্যা করিব। সঙ্গে ছুরিকা লইলাম। কলিকাতায় গিয়া ২৩নং —ষ্ট্রীটে মাসীর বাড়ীতে রাখিয়া আসিও, এবং বিবাহের দিন ও স্থান স্থির হইলে আমাকে লইয়া যাইও। মাসী জানিবেন, তুমি আমার দেবর। সাবধান, অভাগিনীর মান অপমান এবং জীবনের আশা ভরসা তোমার হাতে।—স্বামিহীনা অ…"

একে দারুণ শীত, তাহাতে দারুণ হর্ষ, উভয়ে তুমুল সংগ্রাম বাধাইয়া আমাকে শৃঙ্খলবদ্ধ কাকাতুয়ার মত দোলাইতে লাগিল। পত্রখানি হৃদয়ে এবং চক্ষুতে বুলাইয়া ব্রেষ্ট-পকেটে রাখিলাম।

বুঝিতে পারিলাম, ক্ষীরোদ সেই আগন্তুক যুবক ভ্রাতা, এবং বুড়ী তাঁহারই বালিকা ভগ্নী। পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই। তাহারা কলিকাতার লোক, কতক্ষণই বা? দশটার সময় ঘুমাইয়া পড়িবে।

নিভৃতে আসিয়া পত্রখানি আবার পড়িলাম। ডাউডেন সেক্ষপীয়রের "ম্যাকবেথ" যেমন করিয়া তন্ন তন্ন করিয়া পড়িয়াছিলেন, তাহা হইতেও অধিক অধ্যবসায়সহকারে পাঠ করিলাম। শেষে স্থির করিলাম, অপরাজিতার চরিত্র

পরস্তস্ত্রা সুন্দরী নহে। বিধবা না হইলে লেখাপড়া না জানিলে এমনটি হয় না। এই জন্যই বিলাতে যুবতী বিধবার এত আদর।

পাছে ঘুমাইয়া পড়ি, তাই দুইবার চা খাইলাম। নেত্রে ক্যাজুপুটী অয়েল মাখিলাম। ক্রমে সম্পূর্ণ তারকামণ্ডিত আকাশের তলে হিমানীসিক্ত শীতক্লিষ্ট দ্বিপ্রহর নিশি তালে তালে বহিয়া গেল।

৫

যাঁহারা এ পথের পথিক, তাঁহারা জানেন, অভিসার কার্য্যটা কত দূর বিঘ্নসঙ্কুল। দারুণ গ্রীষ্মকালেও অভিসারকর্ম্মে রক্ত হিম হইয়া যায়, এ ত শীতকাল, তাহার উপর আর একটা চম্পটের জঞ্জাল। দারুণ শীতে বিধবা যুবতীকে লইয়া কলিকাতায় পলায়ন কি সোজা কথা? তদুপরি সেই পত্রবর্ণিত কঠিন প্রতিজ্ঞা।

সংসারে কোনও জটিল ব্যাপারে রত হইলে অন্ততঃ একটি মানুষের সাহায্য লইতে হয়। ভৃত্য মধুকে সব কথা ভাঙ্গিয়া বলিতে হইল, এবং মধুকে পোর্টম্যাণ্টো প্রভৃতি লইয়া প্রায় অর্দ্ধক্রোশদূরস্থ রেলওয়ে-ষ্টেশনে পাঠাইয়া দিলাম।

ঠিক রাত্রি সাড়ে বারটার সময় হালদারদিগের স্থাবর সম্পত্তির মধ্যে অবৈধ পদার্পণ করিলাম। পরের ঘরে রাত্রিকালে যাওয়া আসা পূর্ব্বে কখনই অভ্যাস ছিল না, তাই প্রত্যেক পাদবিক্ষেপে অনেক সময় বহিয়া গেল। অনেকে প্রেমের প্রভাবে আত্মহারা হইয়া পড়ে। আমার কিন্তু সে অবস্থা ঘটে নাই। প্রত্যেক শুষ্ক পত্রের মর্ম্মর, প্রত্যেক কণ্টকাঘাত, প্রত্যেক জীবসমাগমের শব্দ, কোনটাই ইন্দ্রিয়প্রহরিগণকে বঞ্চনা করিতে পারে নাই। ইহারই মধ্যে মন একটু কবিত্ব-পূর্ণ ভাব ধারণ করিয়া মানবত্বের সফলতা-সম্পাদন করিতেছিল।

বহু যত্নে পূর্ব্বপুষ্করিণীর ভাঙ্গা পাড় অতিক্রম করিয়া গোয়ালের নিকট দাঁড়াইলাম। এক ঘণ্টায় এত দূর আসিয়াছি, ইহা কম শ্লাঘার কথা নহে!

ভাবিলাম,একটু বিশ্রাম করা উচিত। কিন্তু এত শীতে বিশ্রাম করি কোথায়? তখনও দুইটা বাজিতে আধ ঘণ্টা বাকি আছে।

একটা কুকুর সেখানে শুইয়াছিল; সেটা অতি মৃদুস্বরে নিজের অস্তিত্বের পরিচয় দিয়া আবার লাঙ্গুল নাড়িয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

বোধ হয়, কুকুর আমাকে নির্দ্দোষ ভাবিয়া লইয়াছিল, কিংবা সেটা প্রভুভক্ত নহে। যাহাই হউক, তাহার শব্দহীনতার চেষ্টা দেখিয়া বুঝিলাম, বিধাতা আমার প্রতি বাম নহেন।

নস্যের সহিত প্রেমের কোন সম্বন্ধ নাই, তবে নস্য সর্ব্বদাই মস্তিষ্ক পরিষ্কার রাখে, এবং বিশেষতঃ শীতকালে হিমের প্রভাব হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিবার উহা একটি প্রধান উপায়। আরও একটা কারণ ছিল, যদি অপরা না উঠিয়া থাকে, তবে একটা হাঁচিলে অর্দ্ধঘুমন্ত অবস্থা টুটিয়া যাইতে পারে।

তাই অন্ধকারে ধীরে ধীরে উত্তর দিকের ঘরের গবাক্ষের নিকট গিয়া একটা হাঁচিলাম। গবাক্ষ উন্মুক্ত হইল। অন্য কোনও গোলমাল হইল না। চোর ও শত্রু কখনও ঘোর নিশীথকালে হাঁচি.ত আসে না, অতএব এবংবিধ শব্দে কাহারও সন্দেহ হওয়া অসম্ভব।

অপরা বাহিরে আসিল। শীতে কাঁপিতেছিল। প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলাম, অতএব গাত্রস্পর্শ করিলাম না। কেবল বলিলাম, "আমার সঙ্গে এস।"

অবশ্য সংসার ছাড়িতে জীবের যখন এত কষ্ট হয়, তখন পিতৃগৃহ ছাড়িতে বিধবার কষ্ট হইবে, তাহার আর আশ্চর্য্য কি? অপরা একটু কাঁদিল। সেই সুখের ঘর, পিতামাতার সোহাগ, সেই কামিনীফুলের গাছ, শীতকালের মোলায়েম লেপ ও শয্যা, সেই কুলমানের বন্ধন, মৃত স্বামীর স্মৃতি, সেই জীবনের আক্ষেপ।

সকলই বোধ হয় অপরার মনে উদিত হইতেছিল। কিন্তু হইলে কি হয়? নারী সংসারে আসে প্রেম করিতে, শিখাইতে, এবং শিখিতে। যাহার প্রেমতৃষ্ণা ফুরায় নাই, সে মরিয়াও আবার প্রেম চাহে।

"আমারে আবার যেন রমণী জনম দিবে" বটে কি না। আমি খুব বুঝিতে লাগিলাম, এবং আত্মশ্লাঘাভরে আবার সিগারেট জ্বালিলাম। সেই ক্ষীণালোকে অপরার গৌরবর্ণ ফুটিয়া প্রতিমার রঙ্গের মত দেখাইতে লাগিল। কিন্তু অবগুণ্ঠন ছিল।

কালবিলম্ব দেখিয়া আমি নস্য লইলাম। বাটীর মধ্যে কে যেন বলিয়া উঠিল, "হাঁচে কে?"

আমি অপরাকে বলিলাম, "শীঘ্র এস!" এবং উভয়ে দ্রুতপাদবিক্ষেপে বাগানের শেষ সীমায় আসিলাম।

এমন সময়ে পুনর্ব্বার দূর হইতে শুনিলাম, "কে রে?" আমি উচ্চৈঃস্বরে একটা শৃগালধ্বনি করিয়া ষ্টেশনের দিকে চলিলাম।

সেই নিবিড় অন্ধকার ভেদ করিয়া আমার শৃগালধ্বনি কুকুরকে জাগাইয়া তুলিল, এবং গৃহস্থের ভয় তিরোহিত করিল।

কলুষিত প্রেম ও কাঁচা সোনা—প্রেমের পার্থক্য না পুড়াইলে বুঝা যায় না, কিংবা কষ্টিপাথরে ঘসিতে হয়।

তবে কষ্টিপাথরটা ঠিক হওয়া চাহি। কবিকুল মনকে কষ্টিপাথর বলিয়াছেন। প্রমাণ, যেমন "কূটস্থ আত্মা" প্রভৃতি।

শীতে ক্লেশ পাইয়া একবার ভাবিয়াছিলাম, "একটা বিধবাকে লইয়া এত জঞ্জালে পড়া কি ভাল?" বোধ হয়, ষ্টেশনে আসিয়া সে ভাবটা অপরার মনে লাগিয়াছিল। অপরা কাঁপিতে লাগিল।

মনে করুণাসঞ্চার হইল। সে করুণার স্নিগ্ধ স্বার্থবিহীন উচ্ছ্বাসে প্রেমের পবিত্র কোরকগুলি ফুটিতে লাগিল। আমিও আবার সিগারেট টানিলাম।

স্ত্রীলোকদিগের গাড়ীতে অপরাজিতাকে অধিষ্ঠিতা করিয়া, এবং স্বয়ং নিকটবর্ত্তী পুরুষদিগের গাড়ীতে অধিষ্ঠিত হইয়া যখন নস্ত লইলাম, তখন প্রায় ভোর। গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

যাইবার সময় কেবল মধু বলিয়াছিল, "সাবধান!"

আমি বিরক্তিসহকারে বলিয়াছিলাম, "সে আর তোমাকে শিখাইতে হইবে না।"

কলিকাতায় পঁহুছিয়া অপরাকে ২৩নং—ষ্ট্রীটে তাহার মাসীর বাড়ীতে লইয়া গেলাম। তখন বেলা দ্বিপ্রহর। পথে অপরা জলগ্রহণ করে নাই। একবার মনে করিয়াছিলাম, হঠাৎ কোন ষ্টেশনে রাহুমুক্ত শশি-মুখখানি দেখিয়া লইব। চেষ্টা বিফল হইল। তৎপরিবর্ত্তে সেই গভীর অবগুণ্ঠন ও সেই সুন্দর কোমল দুইটি নিবিড় কৃষ্ণবর্ণ তিলে শোভিত অঙ্গুলির মধ্যে রজার্সের ক্ষুদ্র ছুরিকা ঝলসিতেছিল।

কাজেই প্রতিজ্ঞা অটুট রহিল, এবং বাড়াবাড়ি না করিয়া আমি কোচ্‌বক্সে উঠিয়া পড়িলাম।

বোধ হয়, অপরা পূর্ব্বেই মাসীকে পত্র দ্বারা জানাইয়াছিল। কারণ, ২৩নং বাটীর দুয়ারে এক জন দাসী আসিয়া অপরাকে অন্দরে লইয়া গেল।

আমি চুপ করিয়া বাহিরে বসিয়া রহিলাম। এমন সময় বাটীর মধ্যে একটা হাস্য কিংবা ক্রন্দনের রোল উঠিল, বড় বুঝিলাম না। সারা রাত্রি জাগিলে হাস্য ক্রন্দনের পার্থক্য বড় বুঝা যায় না।

একবার ভাবিলাম, অপরা চাতুরী খেলে নাই ত? হয় ত আমার মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া কলিকাতায় আসিয়াছে!—কিন্তু এমন নীচপ্রবৃত্তি কখনও অপরার পক্ষে সম্ভবে না।

সেই রাত্রিকালের পত্র খুলিয়া আবার পাঠ করিতেছি, এমন সময় একটি গৌরবর্ণ বালক একখানা পত্র লইয়া আমার হাতে দিল।

"মাসীমাকে সব কথা খুলিয়া বলিয়াছি, মাসীমারা ব্রাহ্মমতের লোক। বিধবা-বিবাহে আপত্তি নাই। সুতরাং তুমি আর দেবর বলিয়া পরিচয় দিও না। এই বাটীতেই থাক, কল্য বিবাহের দিন ভাল, বন্ধুবান্ধব যদি কেহ থাকে, নিমন্ত্রণ করিও। অঃ।"

তাহার পরেই একটি সুন্দর শ্মশ্রুবিশিষ্ট যুবাপুরুষ অন্দর হইতে বাহিরে আসিলেন।

আগন্তুক। নমস্কার!

আমি। নমস্কার।

আগন্তুক। আপনার মত মহাশয় লোকের সহিত পরিচিত হইয়া আমি সৌভাগ্যান্বিত হইলাম। শীঘ্রই আপনার সহিত আমার এক নূতন সম্বন্ধ ঘটিবে, ঈশ্বর করুন, সেই সম্বন্ধ যেন সুখের হয়।

আমি বুঝিলাম, ইনিও গুপ্ত অভিনয়ের মধ্যে এক জন, এবং ব্রাহ্ম মেজাজের লোক।

আমি। আপনি বোধ হয় আমার ভাবী শ্যালক। আপনি অপরার ভ্রাতা মাসতুত সম্বন্ধে ?

আগন্তুক। অপরা আমার ভগ্নী।

আমি। আপনি ব্রাহ্ম ?

আগন্তুক। অবশ্য।

তৎপরে আহারাদিসমাপনান্তে প্রায় দশ ঘণ্টা কাল বিশ্রামসুখ উপভোগ করিলাম।

সুখদুঃখময় সংসারে মানব-চরিত্র ও পার্থিব ঘটনাবলী প্রভৃতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করিবার সময় কম লোকেরই আছে। কাজেই যখন রাত্রি দশটার সময় জাগরিত হইয়া ক্ষুধাতুর হইলাম, তখন আহার্য্য সামগ্রী ব্যতিরেকে আর কোন দিকে আমার মন ছিল না।

দ্বিতলে সুন্দর ব্রহ্মসঙ্গীত হইতেছে। একে ব্রহ্ম-সঙ্গীত, তাহার উপর রমণীকণ্ঠ! জীবনের ভার ও মনের চঞ্চলতা প্রায় অদৃশ্য হইয়া গেল।

কিয়ৎক্ষণ পরেই রূপার রেকাবির উপর নানাবিধ মিষ্টান্ন ও লুচি তরকারি লইয়া একটি পরমসুন্দরী বালিকা আমার ঘরে উপস্থিত হইল।

রূপের মোহে আমি হাঁ করিয়া থাকিলাম। বালিকা পুনরায় এক গেলাস জল ও রূপার ডিবাতে পান লইয়া আসিল।

ইতিমধ্যে ঘরের একখানা দর্পণে আমার কুঞ্চিত কেশদাম আলুথালু করিয়া লইয়াছিলাম, এবং বালিকার পুনঃপ্রবেশের সময় যত দূর সতৃষ্ণ কোমল নয়নভঙ্গী সম্ভব, তত দূর নেত্রদ্বয়কে প্রস্তুত করিয়া বালিকার নয়নের উপর স্থাপন করিলাম।

বোধ হইল, বালিকা দেখিতে ঠিক অপরার ন্যায়, অন্ততঃ প্রাতঃকালের হৃতা বালিকার হাত দুখানি ও গঠনের সহিত তাহার এত দূর সাদৃশ্য ছিল যে, আমি বিস্মিত হইলাম।

আমি। তুমি অপরার কে?

বালিকা। বোন।

আমি। তোমার বিবাহ হইয়াছে?

বালিকা। না।

প্রায় চতুর্দ্দশবর্ষীয়া বালিকার বিবাহ হয় নাই! বুঝিলাম, এরা ব্রাহ্মমতের।

আমি। তুমি ঠিক অপরার মত দেখিতে।

বালিকা। আপনি অপরা দিদিকে দেখিয়াছেন?

আমি। বোধ হয় বিবাহের পূর্ব্বে একবার দেখিয়াছি।

মোট কথা, আমার অপরাকে ভাল করিয়া দেখা হয় নাই। একবার ভাবিলাম, এ অপরাজিতা নয় ত? না, তাহা হইতে পারে না।

আমি। তুমি উপরে গান করিতেছিলে? বালিকা নিরুত্তর হইয়া রহিল।

কেমন মিষ্ট কথা! কেমন মৃদুমধুর ভঙ্গী। আমি তাহাই মনে করিতে করিতে প্রায় সমস্ত খাবারগুলি নিঃশেষ করিয়া ফেলিলাম।

একটি দীর্ঘনিশ্বাস উঠিল।

ক্রমেই রাত্রিকালে ভালবাসা প্রগাঢ় হইয়া উঠিল। এমন কি, ঘুমন্তে ও জাগ্রতে স্বপ্ন দেখিতে লাগিলাম। সমস্ত দিন ঘুমাইলে, রাত্রিকালে বিশেষতঃ শীতকালে, প্রেমের উচ্ছ্বাস বড়ই স্নিগ্ধ, রমণীয় ও মধুর বলিয়া বোধ হয়।

প্রাতঃকালে পূর্ব্বদিনের সুন্দর যুবাপুরুষ আমার নিকট আসিলেন। জানিলাম, তাঁহার নাম মহেন্দ্র বাবু।

মহেন্দ্র বাবু কথার পৃষ্ঠে কথায় বুঝিতে পারিলেন যে, আমার মস্তক ও হৃদয়

কোথা হইতে একটা আক্ষেপ আসিয়া জুটিল! যদি ঐ বালিকাটি আমার হইত, তবে অপরার জন্য এত সহিতাম না।

মহেন্দ্র। আপনাদের বিধবা বিবাহ করিলে জাতি যায়?

আমি। বোধ হয় যায়।

মহেন্দ্র। তবে এত দূর বাড়াবাড়ি করিলেন কেন?

আমি মৌন হইয়া রহিলাম।

তার পরে কোনও কথা হয় নাই। সন্ধ্যার পূর্ব্বে ঢাক ঢোল, ব্যাণ্ড চতুর্দ্দোল, রোশনাই ও বন্ধুবান্ধব আসিয়া জুটিল। কলিকাতায় বিবাহের যোগাড় করিতে কতক্ষণ? তবে এ বাটীতে বিবাহ হইবে না। অন্য একটি বাটীতে বিবাহ।

আমি মহেন্দ্র বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "বিধবা বিবাহে এত ধূম কেন?"

মহেন্দ্র। বিবাহ হিন্দুমতে অর্থাৎ বিদ্যাসাগরের মতে হইবে। ব্রাহ্মমতে হইবে না।

আমি। খরচ যোগাইবে কে?

মহেন্দ্র। অপরার মাসী।

আমি। ব্রাহ্মমতে হইলেই ত ভাল হইত।

মহেন্দ্র। দুই মতেই হইবে।

আমি। সে কেমন?

মহেন্দ্র। অর্থাৎ সেই বাটীতে দুইটি বিবাহ হইবে, একটি ব্রাহ্মমতে ও আর একটা হিন্দুমতে। আমি শুনিয়া অবাক!

তাহাই হইল। সন্ধ্যার পরেই ধূমধাম করিয়া অন্য বাটীতে অপরাকে বিবাহ করিতে গেলাম। এক ভাগে আমার বিবাহের আয়োজন হইয়াছিল, অন্য ভাগে কিরূপ আয়োজন হইয়াছিল, জানি না। সেই ভাগের বর, কন্যা, এবং ক্রিয়া আমাদিগের অজানিত থাকিল। কেবল ইহাই দেখিলাম, মহেন্দ্র বাবু আমাদিগের ঘর হইতে চলিয়া গিয়াছেন।

মনে কেবল সেই বালিকার মুখখানি জাগিতেছিল!

ভাবিলাম, সংসারে মনের স্থিরতা নাই, এবং প্রেমেরও স্থিরতা নাই। যখন ব্রহ্মাণ্ড অস্থির হইয়া ঘুরিতেছে, তখন মানব ঘুরিবে বৈ কি?

কিন্তু যখন কন্যাদানের সময় ক্ষীরোদ বাবুকে দেখিলাম, তখন চমকিয়া উঠিলাম

আমি। আপনাকে বোধ হয় আমাদিগের দেশে হালদার মহাশয়ের বাটীতে পরশ্ব দিন দেখিয়াছি।

ক্ষীরোদ। হাঁ, দুয়ার হইতে উকি মারিয়া। তাহার পরই আমার ভগ্নীকে লইয়া পলায়ন করিয়াছেন। আপনাকে পুলিসের মারফৎ হ্যাণ্ডকফ্ (হাতকড়ী) না দিয়া বিবাহশৃঙ্খলে বদ্ধ করিতেছি, ইহাতে আপনার সবিশেষ কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।

আমি। (সলজ্জে)। তবে আপনার এ বিবাহে সম্মতি আছে ?

ক্ষীরোদ। আমি সেই জন্যই আপনার দেশে গিয়াছিলাম। যাহা হউক, কন্যা অপনার পছন্দ হইয়াছে ত ?

আমি। কোন কন্যা ?

ক্ষীরোদ। ঐ যে "বুড়ী"। যাকে লইয়া আপনি পলাইয়া আসেন, এবং যে আপনাকে কাল রাত্রে জলখাবার দিতে গিয়াছিল।

আমার মাথা ঘুরিয়া গেল, এবং কত ক্ষণ ঘুরিয়াছিল, জানি না। বিধির বিড়ম্বনা প্রহেলিকার মত। সব সময় বুঝিয়া উঠা যায় না।

বোধ হইল, আমার একটা বিবাহ হইয়া গেল। বোধ হইল, স্বপ্নের মত আবার সেই কৃষ্ণতিলশোভিত পূর্ব্ববর্ণিত অঙ্গুলি আমার করতলের মধ্যে বসন্তকিশলয়ের ন্যায় কাঁপিতে লাগিল। কোথায় তুমি অপরা ?—

তাহার পর বাসরঘরে অপরা নূতন স্বামী মহেন্দ্র বাবুর সহিত উপস্থিত। শ্যালিকাগণ বলিল, এটা "ডবল বাসর", অর্থাৎ ব্রাহ্মমত ও হিন্দুমত, উভয় মতেরই বাসর।

পুলিস ইন্‌স্‌পেক্‌টরের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী বলিয়া উঠিল ;—

"৩৬৩ ধারার অপরাধ আপোষে মিটমাট করিলে কিছু বখসিস্ চাই।" কাজেই আমার ঘড়ীর চেন লইয়া তাঁহার গলায় দিলাম, এবং প্রদান করিবার সময় তাঁহার কান ভুলিয়া টিপিয়া দিয়াছিলাম, সেই পাপক্ষালনার্থ নস্য লইলাম।

সুখের বাসরে মহেন্দ্র, আমি, অপরা ও বুড়ী, ওরফে মৃণালিণী (মিলি) তাস খেলিতে খেলিতে রাত্রি কাটাইলাম।

বুড়ীর পিতা বড়লোক, এবং বুড়ী আদরের কন্যা, কাজেই বুড়ীকে সঙ্গে লই-বার সময় অপরা গেল, এবং মহেন্দ্রও গেল। আমার দরিদ্রকুটীর ও পিতৃ-মাতৃশূন্য ঘর তাহাদের দেখাইলাম। বুড়ী ব্রহ্মসঙ্গীত গাহিল। আমি ব্রাহ্ম-মেজাজের হইয়া দাঁড়াইলাম, এবং মহেন্দ্র হিন্দু হইয়া দাঁড়াইল।

খোনা ভট্টাচার্য্য দক্ষিণা পাইয়া বলিল, "উভয় মতই বিদ্যাসাগরের মতের মধ্যে পড়ে।"

সকলে রীতিমত বিদায় পাইয়া বলিল, "অবশ্য! অবশ্য।"

সুতরাং ঘনশ্যাম হালদারের জাতি পূর্ব্বাপর বজায় রহিল। তাহাতেই আমি এত সুখী।

গৌড়ের ভগ্নাবশেষ।

গৌড় অতি প্রাচীন নগর। স্কন্দপুরাণে পাঁচটি গৌড়ের নাম আছে। সেই পাঁচটির একটি সারস্বত প্রদেশে, একটি কান্যকুব্জ প্রদেশে, একটি উৎকল প্রদেশে, একটি মিথিলা প্রদেশে ছিল। আমাদের আলোচ্য গৌড় নগর মালদহ জেলার অন্তর্গত। অযোধ্যার একটি গৌড়ের নাম পাওয়া যায়। শ্রাবস্তী নগরী তাহার রাজধানী ছিল। শ্রাবস্তীর বর্ত্তমান নাম শেট মাহেৎ। বোধ হয়, অযোধ্যার গৌড় ও কান্যকুব্জের গৌড় অভিন্ন। এতগুলি স্থানের নাম গৌড় হইল কেন, এ পর্য্যন্ত তাহার সন্তোষ-জনক উত্তর মিলে নাই। গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ ও গৌড়ীয় বৈশ্য, হিমালয় প্রদেশে, পঞ্চনদ প্রদেশে, ময়-রাষ্ট্র অঞ্চলে অর্থাৎ মীরাট প্রদেশে ও গুজরাট প্রভৃতি নানা স্থানে বাস করিতেছে। সেই সকল ব্রাহ্মণ বৈশ্য যে এই গৌড় হইতে সে সকল স্থানে গিয়াছে, ইহার প্রমাণ নাই, এবং ইহা হিন্দু আর্য্যদিগের উপনিবেশস্থাপন-প্রণালীর বিরুদ্ধ। অতএব ইহা একরূপ ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত যে, ভারতবর্ষে গৌড় নামে কতিপয় রাজ্য ও নগর ছিল।

বাঙ্গালার গৌড় সর্ব্বাপেক্ষা প্রাসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। বাঙ্গালার গৌড় অতি প্রাচীন নগর। এরূপ শুনা গিয়াছে, মগধে যে সময়ে প্রদ্যোতন-বংশীয় রাজগণ রাজত্ব করিতেছিলেন, তৎকালে পশ্চিমাঞ্চলস্থ কোনও গৌড়প্রদেশের ভোজ-নামক রাজা গঙ্গাপুলিনে একটি নগরস্থাপন করিয়া স্বীয় জন্মভূমির নামানুসারে তাহার গৌড় নাম রাখেন। সম্রাট আকবর শাহের প্রধান মন্ত্রী আইনআকবরী-প্রণেতা আবুল ফজল গৌড়ের কতিপয় হিন্দু রাজবংশের নাম ও রাজত্বকাল লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। অবশ্য তৎসমুদায় কোনও বিলুপ্ত মূল গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। পাণিনি ব্যাকরণের একটি সূত্রের দৃষ্টান্তস্থলে গৌড়পুরের নাম উল্লি-

খিত হইয়াছে, এবং উহাকে পূর্ব্বদেশীয় নগর বলা হইয়াছে। উহা এই গৌড় হইতে পারে। পাণিনিকে যাঁহারা সমধিক প্রাচীন বলিয়া স্বীকার করিতে সঙ্কুচিত, তাঁহারাও খ্রীষ্টপূর্ব্ব পাঁচ ছয় শত বৎসরের অধস্তন বলেন না। বাস্তবিক, পাণিনি তদপেক্ষা পূর্ব্বতন। পাণিনি গ্রন্থে উল্লিখিত গৌড় যে অতি প্রাচীন নগর, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। মুসলমান ঐতিহাসিকগণ গৌড়কে অতি প্রাচীন নগর বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। খোরশিদে জাহানুমার গ্রন্থকার কোন প্রাচীন ইতিহাসের মত লইয়া লিখিয়া গিয়াছেন, যখন ফিরোজ রায় ভারতবর্ষের অধিপতি ছিলেন, তখন রুস্তম নামক নরপতি তাঁহার রাজ্য আক্রমণ পূর্ব্বক অধিকার করিয়া সুরাজকে এ দেশের রাজা করিয়া যান। সুরাজের পর ভরাজ রাজা হন। ভরাজকে পরাজিত করিয়া গণ্ডার নামক ব্রাহ্মণ এ দেশ অধিকার করেন। এই সময়ে মঙ্গল দিপ নামক হিন্দু কোচবিহার অঞ্চল হইতে আসিয়া বাঙ্গালা ও বিহার অধিকারপূর্ব্বক প্রায় তেইশ শত বৎসর পূর্ব্বে গৌড় নগর স্থাপিত করেন। এই বর্ণনার যে কোনও ঐতিহাসিক মূল্য আছে, এমন বোধ হয় না। তবে এইমাত্র জানা যাইতেছে যে, মুসলমানেরাও গৌড় নগরকে প্রাচীন নগর বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন।

গৌড় নগরের কোনও বিষয় বলিবার সঙ্গে সঙ্গে পাণ্ডুয়ার উল্লেখ না করিলে বর্ণনার অঙ্গহানি হইবে। পাণ্ডুয়া অতি প্রাচীন নগর। উহার প্রাচীন নাম পুণ্ড্রবর্দ্ধন। পুরাণে লিখিত আছে, অঙ্গদেশে বলি-নামক রাজা রাজত্ব করিতেন। তাঁহার পাঁচ পুত্রের নাম অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম, পুণ্ড্র। তাঁহারা যে পাঁচটি রাজ্য স্থাপিত করেন, তৎসমুদায়ের নাম অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম ও পুণ্ড্র হয়। বলি-বংশীয় ক্ষত্রিয়গণ বালেয় ক্ষত্রিয় নামে প্রসিদ্ধ। এই বালেয় ক্ষত্রিয়গণের নামানুসারে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের বালিয়া জেলার নাম হইয়াছে। এই পৌরাণিক বর্ণনার এইটুকু আমরা অসঙ্কোচে গ্রহণ করিতে পারি যে, অঙ্গদেশ হইতে আর্য্যসভ্যতা পুণ্ড্রদেশে আসিয়াছিল। আর্য্যগণ অঙ্গদেশ হইতে পুণ্ড্রদেশে উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন। ভাগলপুর হইতে গঙ্গাতীরবর্ত্তী অনতিপ্রশস্ত সুদীর্ঘ স্থানের প্রাচীন নাম অঙ্গদেশ। বাঙ্গালার উত্তরভাগের প্রাচীন নাম পুণ্ড্র। পুণ্ড্রদেশ, গঙ্গা ও করতোয়ার মধ্যবর্ত্তী ছিল রাজধানী পুণ্ড্রবর্দ্ধন, গঙ্গাতীরে স্থাপিত হইয়াছিল। পুণ্ড্ররাজগণ, সময়ে সময়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বাস করিতেন। তৎসমুদায়েরও পুণ্ড্রবর্দ্ধন নাম হয় করতোয়া নদীর তীরে এইরূপ একটি পুণ্ড্রবর্দ্ধন ছিল।

তাহার ভগ্নাবশেষের বর্ত্তমান নাম বর্দ্ধনকুটী। উত্তর বাঙ্গালায় একাধিক স্থানের নাম পুণ্ডরিয়া। উহাদের প্রাচীন নাম পুণ্ড্র বা পুণ্ড্রবর্দ্ধন হইবার সম্ভাবনা। আমাদের আলোচ্য পুণ্ড্রবর্দ্ধন গঙ্গাতীরে অবস্থিত ছিল। গঙ্গা তখন পাণ্ডুয়ার পশ্চিম দিক্ দিয়া প্রবাহিত হইত। গৌড় পাণ্ডুয়ার তুলনায় আধুনিক নগর। গঙ্গার এক পারে গৌড় ও অপর পারে পাণ্ডুয়া ছিল। বর্ত্তমান পিছলি গঙ্গারামপুর প্রাচীন গৌড়ের একদেশে অবস্থিতি করিতেছে। গঙ্গা নদী তৎকালে এখনকার কালিন্দীর খাত দিয়া প্রবাহিত হইত। গৌড়ের প্রান্তবাহিনী গঙ্গা সচরাচর ভাগীরথী নামে অভিহিত হইত। গৌড় প্রথম অবস্থায় পুণ্ড্র রাজ্যের অধীন ছিল, এবং তাহারই একটি নিকটবর্ত্তী বাণিজ্যস্থান স্বরূপ ব্যবহৃত হইত। উহা এমন সুন্দর ছিল যে, বৈদেশিক লোকে উহাকে গঙ্গাহ্রদের একটি নলিন বলিয়া আনন্দিত হইতেন। পুণ্ড্রদেশের ইক্ষুকে পুঁড় আখ বলে। কেহ কেহ বলেন, পুণ্ড্ররাজ্যের এই বাণিজ্যস্থান পুঁড় আখের গুড়ের জন্য খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। এই গুড় শব্দ হইতে গৌড় নামের উৎপত্তি হইয়াছে। ইহা একটা উৎকট অনুমানমাত্র।

শুনিয়াছি, চীন পর্য্যটক হুয়েন সাঙ্গ পুণ্ড্রবর্দ্ধনে আসিয়াছিলেন। তিনি গৌড়ের কোন উল্লেখ করেন নাই। তখন হয় ত গৌড় পাণ্ডুয়ার অধীন ছিল। গৌড় তৎকালে বড় নগরই ছিল। হর্ষবর্দ্ধন শিলাদিত্য কিরণসুবর্ণ বা কর্ণ-সুবর্ণরাজ শশাঙ্কের সহিত যুদ্ধ করিয়া গৌড় অধিকার করেন। শশাঙ্ক গৌড়েশ্বর বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। অতএব, তৎকালে গৌড় ও পাণ্ডুয়া শশাঙ্কের অধীন ছিল। কর্ণসুবর্ণ নগর মুর্শিদাবাদ জেলার উত্তরাংশে অবস্থিত ছিল। গৌড় শশাঙ্কের অধিকারস্থ সর্ব্বপ্রধান নগর না হইলে, তিনি গৌড়েশ্বর-নামে পরিচিত হইতেন না। হর্ষবর্দ্ধন গৌড় অধিকার করিয়া, তথা হইতে আপনার দিগ্‌বিজয়িনী সেনা ভারতের অবিজিতপ্রদেশসমূহ জয় করিবার জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। শ্রোতৃগণ মনশ্চক্ষে দর্শন করিয়া পুলকিত হউন যে, গৌড় হইতে চতুরঙ্গিণী সেনা ভারতের নানা স্থান জয়ের জন্য গমন করিতেছে। আমি যে গৌড়ের কথা বলিতেছি, সে গৌড়ের চিহ্নমাত্র নাই; কেবল প্রকাণ্ড, বিস্তৃত উচ্চ স্থান অতীতের সাক্ষ্যদান করিতেছে।

কাশ্মীররাজ জয়াপীড় খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে পুণ্ড্রবর্দ্ধন নগরে আগমন করেন। জয়াপীড় ভারতবর্ষের এক জন প্রধান রাজা ছিলেন। তৎকালে জয়ন্ত পুণ্ড্রবর্দ্ধনের রাজা ছিলেন। জয়ন্তের অন্য নাম আদিশূর, ইহা

অনুমিত হইয়াছে। অনুমানের বিরুদ্ধে কোন প্রবল যুক্তি প্রদর্শিত হয় নাই। আদিশূর বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাসে অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া আছেন। পুণ্ড্র রাজ্য বহুকাল মগধের বৌদ্ধ সাম্রাজ্যের অধীন ছিল। এ দেশে তখন ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের প্রভাব ছিল না। নিতান্ত জল-বহুল স্থান হওয়ায় এ দেশ সভ্যজাতির বাসেরও উপযোগী ছিল না। আর্য্য সভ্যতার কেন্দ্রস্থান ব্রহ্মাবর্ত্ত, ব্রহ্মর্ষি ও মধ্যদেশ হইতে বহু দূরে আসিয়া বাস করাতে, পুণ্ড্র ক্ষত্রিয়জাতি অনার্য্যভাবাপন্ন হইয়া গিয়াছিল। হিন্দুরাজ্য স্থাপিত হইলে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যজাতি পুণ্ড্র দেশে আসিয়া বাস করিতে লাগিল। দীর্ঘকাল ধরিয়া কনোজ ও কাশ্মীর রাজ্যে বিবাদ চলিতেছিল, তজ্জন্য নিতান্ত উৎপীড়িত হইয়া অনেকে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ পুণ্ড্র রাজ্যে আসিতে লাগিল। আদিশূরের সময় পুণ্ড্র দেশে বহুপরিমাণে ব্রাহ্মণ জাতির আগমন হইয়াছিল। আদিশূরের পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়নের ইতিহাস এই ঘটনারই অন্তর্ভূত। পাঁচটিমাত্র ব্রাহ্মণের বংশে এত ব্রাহ্মণ জন্মিতে পারে না। সে সময়ে যে বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ কায়স্থ এ দেশে আসিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। আদিশূরের যজ্ঞ পুণ্ড্র বর্দ্ধনে হইয়াছিল, বিক্রমপুরে হয় নাই। পাণ্ডুয়ায় হোমদীঘী ও ধূমদীঘী নামে দুইটি পুষ্করিণী আছে। জনপ্রবাদ, এই দুই পুষ্করিণীর তীরে আদিশূরের পুত্রেষ্টিযজ্ঞ হইয়াছিল। জয়াপীড় ছদ্মবেশে পুণ্ড্র বর্দ্ধনে প্রবেশ করেন। সে সময়ে পুণ্ড্র বর্দ্ধনে কার্ত্তিকেয় দেবের একটি প্রকাণ্ড মন্দির ছিল। জয়াপীড় মন্দিরপ্রাঙ্গণে প্রবেশ করিয়া আরতিদর্শন করেন, এবং দেবনর্ত্তকী কমলার রূপ ও নৃত্য দেখিয়া মোহিত হন। কার্ত্তিকেয় দেবের সে মন্দির পাণ্ডুয়ার কোন্ স্থলে অবস্থিত ছিল, এখনও জানা যায় নাই। কেহ কেহ বলেন, আদিনা মস্‌জিদ্ সেই স্থান অধিকার করিয়া আছে।

প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থাবলীতে বিচ্ছিন্নভাবে গৌড় ও পাণ্ডুয়ার কতিপয় রাজার নাম পাওয়া যায়; কিন্তু তাঁহাদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। গৌড় পাণ্ডুয়ার ইতিহাসবর্ণনা অদ্য আমার মুখ্য উদ্দেশ্য নয়, তজ্জন্য আমি তাহা হইতে নিবৃত্ত হইলাম। কাম্বোজ-বংশ, শূর-বংশ, পাল-বংশ ও সেনবংশের সহিত আমাদের কিছু কিছু পরিচয় হইয়াছে। কোন সময়ে গৌড় ও পাণ্ডুয়ায় বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্মের প্রবল প্রতাপ ছিল। জৈনেরা এক বৌদ্ধমূর্ত্তির অপমান করিয়াছিল বলিয়া, তাহাদের অনেকে বৌদ্ধ-সম্রাট অশোকের আদেশে খড়্গামুখে অর্পিত হইয়াছিল। গৌড়ের বীরবতী-নগরবাসী রামচন্দ্র কবিভারতী বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া বিপদে পতিত হইয়াছিলেন। তিনি আত্মীয়স্বজন কর্ত্তৃক নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া

সিংহলে পলায়ন করেন। গৌড়ের এক জন হিন্দু রাজার সভায় তৎকালজীবিত সমুদায় ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিচার হইয়াছিল। অনেকে অনুমান করেন, বৌদ্ধাচার্য্য শান্তিরক্ষিত গৌড়বাসী ছিলেন।

বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী পাল-রাজগণ শূরবংশীয় ভূশূরের হস্ত হইতে পুণ্ড্রবর্দ্ধন গ্রহণ করিলে, ভূশূর দক্ষিণরাঢ়ে গমন করিয়া অন্য একটি পুণ্ড্রনগর প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহাই হুগলী জেলার বর্ত্তমান পাণ্ডুয়া। এই পাণ্ডুয়া হইতে মালদহ জেলার পার্থক্যবোধের জন্য, মালদহ জেলার পাণ্ডুয়াকে হজরৎ পাণ্ডুয়া বা বড় পাণ্ডুয়া বলা হইয়া থাকে। যে সকল ব্রাহ্মণ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী রাজার সংস্রবত্যাগে অভি-লাষী হইয়া ভূশূরের সঙ্গে রাঢ়দেশে গমন করেন, তাঁহাদের হইতে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদের উৎপত্তি হইয়াছে। পাল রাজাদের সতর আঠার জন রাজার নাম পাওয়া যায়। পাটলিপুত্র অর্থাৎ পাটনা, মুদ্গগিরি অর্থাৎ মুঙ্গের, এবং উদন্তপুর যথাক্রমে তাঁহাদের রাজধানী হইয়াছিল। বোধ হয়, ধর্ম্মপালদেব গৌড় অধিকার করেন। পালরাজগণ, গৌড়েশ্বর উপাধিধারণ করিয়া আপনা-দিগকে গৌরবান্বিত মনে করিতেন। পালবংশীয়দের রাজত্বের শেষভাগে চালুক্যবংশীয় রাজেন্দ্র চোল পূর্ব্ব বাঙ্গালা অধিকার করেন। প্রায় সেই সময়ে কর্ণাটদেশীয় ক্ষত্রিয় রাজগণ দক্ষিণবঙ্গে উপনীত হন। তাঁহারা পূর্ব্ববঙ্গ অধি-কার করিয়া সুবর্ণগ্রামে এক রাজধানী স্থাপিত করেন। বিজয় সেন গৌড় অধিকার করিলে পালরাজগণ বেহার প্রদেশ লইয়াই সন্তুষ্ট থাকেন। হিন্দুধর্ম্মের প্রতি লোকের মতিগতি হওয়ায় পালরাজগণের প্রভাব কমিয়া যায়। এই সময়ে গঙ্গা নদী গৌড় ও পুণ্ড্রবর্দ্ধনের সন্নিধি ত্যাগ করিতেছিল। বল্লালসেন পিছ্‌লি গঙ্গারামপুর পরিত্যাগ করিয়া ইংরেজবাজারের অতিনিকটবর্ত্তী বাগ-বাড়ী বা বল্লালবাড়ী নামক স্থানে বাস করেন। আপনাদের মধ্যে অনেকেই বাগ-বাড়ী দেখিয়া থাকিবেন। বাগবাড়ীতে এখন কোনও দালান কোঠা নাই। কয়েকটা পুরাতন পুষ্করিণী আছে মাত্র। বাগবাড়ী হইতে দ্বারবাসিনী পর্য্যন্ত একটি সুদীর্ঘ বাঁধ আছে। উহার প্রথম অংশ গঙ্গাস্রোতে অনেক দিন হইল বিধৌত হইয়া গিয়াছে। দ্বারবাসিনী সেনরাজগণের অধ্যুষিত গৌড়নগরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। ইহার অন্য নাম রণ-চণ্ডী। এখনও দ্বারবাসিনীর মন্দিরের প্রকাণ্ড ভগ্নস্তূপ পড়িয়া আছে।

দ্বারবাসিনী হইতে সাহুল্লাপুর পর্য্যন্ত সমুদায় স্থান সেন-গৌড়ের অন্তর্গত ছিল। সুবিখ্যাত সাগরদীঘী সেনরাজগণের অদ্ভুত কীর্ত্তি। এরূপ প্রকাণ্ড

দীঘী বঙ্গদেশে আর নাই। সাহুল্লাপুরের নিকটে তুলসীগঙ্গা ভাগীরথীতে মিশিয়া কিয়দ্দূরে উহা ভাগীরথী ত্যাগ করিয়া গৌড়ের মধ্য দিয়া ভাতিয়ার বিলে পড়িয়াছিল। তুলসীগঙ্গার ভাগীরথীর সহ মিলন ও ভাগীরথী-পরিত্যাগ, এই দুই সীমার মধ্যবর্ত্তী ভূভাগ পরম পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। বহুদূরবর্ত্তী স্থানের লোক এখানে মৃত স্বজনকে আনিয়া দাহ করিয়া থাকে। সাহুল্লাপুরের নিকটে পিরালপীর মখদুম আখিসেরাজের সমাধিমন্দির আছে। এ স্থানটি বড়ই সুন্দর। আখিসেরাজুদ্দিন ৭৪৩ হিজিরা বৎসরে প্রাণত্যাগ করেন। ইনি গৌড়ের প্রাথমিক মুসলমান রাজগণের ধর্ম্মোপদেষ্টা ছিলেন।

গৌড় ও পাণ্ডুয়ায় এখন সেন রাজগণের কোনও বিশেষ কীর্ত্তি নাই। লক্ষ্মণ সেনের সময় গৌড় অনেক দক্ষিণ দিকে সরিয়া গিয়াছিল। গঙ্গাপ্রবাহপরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে গৌড় স্থান পরিবর্ত্তন করিয়াছিল। লক্ষ্মণ সেন গঙ্গাপুলিনে নগর সরাইয়া লইয়া গিয়া উহার নাম লক্ষ্মণাবতী রাখেন। মুসলমানেরা ১১৯৮ অব্দে লক্ষ্মণাবতী অধিকার করে। লক্ষ্মণাবতীর দক্ষিণ দিকে মুসলমানেরা নূতন নূতন হর্ম্ম্য প্রস্তুত করিয়া গৌড়ের আয়তন বাড়াইয়াছিল। সে সমস্ত অট্টালিকার উপকরণের অধিকাংশ হিন্দুদের নগর ভাঙ্গিয়া তন্মধ্য হইতে গৃহীত হইয়াছিল। হিন্দু দেব দেবীর মূর্ত্তি ও হিন্দু দেবমন্দিরগুলি নিঃশেষে ভগ্ন হইয়াছিল। মুসলমানদের সময়ে গৌড়নগরের প্রাচীরবেষ্টিত অংশের মধ্যে হিন্দুরা পূজার সময় শঙ্খ ঘণ্টা বাজাইতে পারিতেন না। নগরের পার্শ্বদেশে সাহুল্লাপুর হইতে রামকেলী পর্য্যন্ত স্থান হিন্দুদের বসতির জন্য বিশেষরূপে নির্দ্দিষ্ট ছিল। এখানে তাঁহাদের ধর্ম্মানুমোদিত কার্য্য করিবার অধিকার ছিল। জলপ্লাবন হইতে নগররক্ষার জন্য পূর্ব্ব ও পশ্চিম পার্শ্বে সুদৃঢ় বাঁধ নির্ম্মিত হইয়াছিল। নগরের জলনিকাশের সুন্দর বন্দোবস্ত ছিল। নগরের রাজবর্ত্মগুলি সুপ্রশস্ত ছিল। রাস্তার উভয় পার্শ্বে দ্বিতল ত্রিতল অট্টালিকাশ্রেণী শোভা পাইত। স্পেনরাজের এক কর্ম্মচারী গৌড়ের চূড়ান্ত শ্রীবৃদ্ধির সময় উহা দর্শন করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন, "গৌড়ে দশ বার লক্ষ লোক বাস করিত। পর্ব্বোপলক্ষে এত লোকের সমাগম হইত যে, অনেক লোক পায়ের চাপে মারা পড়িত।" গৌড়ে এমন ধনী লোক ছিল যে, তাহারা নিমন্ত্রিত সমস্ত লোককে স্বর্ণপাত্রে ভোজন করাইতে পারিত। হিন্দু রাজগণের সময়ের বিশেষ বিবরণ জানা যায় না। পাল ও সেন রাজগণের তাম্রশাসনপাঠে জানা যায়, রাজতন্ত্র নানা বিভাগে বিভক্ত ছিল। প্রজাগণের শরীর ও সম্পত্তিরক্ষার জন্য বিভিন্ন ক্ষমতাশালী রাজকর্ম্মচারিগণ নিযুক্ত

হইতেন। পালরাজগণ বৌদ্ধ হইলেও হিন্দু প্রজাগণের উপর অত্যাচার করিতেন না। হিন্দু দেব দেবীর মন্দিরপ্রতিষ্ঠার জন্য তাঁহারা ভূমিদান করিতেন। ভট্টগুরব মিশ্র, কেদার মিশ্র ও দর্ভপাণি মিশ্র নামক তিন জন ব্রাহ্মণ পালরাজগণের মন্ত্রিত্ব করিয়া গিয়াছেন। সেনরাজগণের সময় বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ কায়স্থ জাতির সংখ্যা গণিত হয়, এবং তাঁহাদের মধ্যে গুণবান্দিগকে উপযুক্ত সম্মান প্রদত্ত হয়। প্রজাগণের প্রতি মুসলমান রাজগণের বিশেষ স্নেহ ছিল না। প্রজাগণ দীর্ঘকাল শান্তিসুখ ভোগ করিতে পারিত না। একবার উড়িষ্যার রাজার সেনাগণ আসিয়া দীর্ঘকাল নগর অবরুদ্ধ করিয়া রাখে। অবরুদ্ধ নগরবাসীদের কষ্টের সীমা ছিল না। মুসলমান রাজগণের কেহ কেহ পাণ্ডুয়ায় গিয়া বাস করিতেন। সামস্উদ্দিন ইলিয়াস্ শাহের সময় হইতে রাজা গণেশের সময় পর্য্যন্ত ছয় জন রাজা বায়ান্ন বৎসর পাণ্ডুয়ায় রাজত্ব করেন। শুনা যায়,গণেশ বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। অদ্বৈতাচার্য্যের পিতা কুবেরাচার্য্য গণেশের এক জন উপদেষ্টা ছিলেন। গণেশ পাণ্ডুয়ায় যে সকল দেবমন্দির প্রতিষ্ঠিত করেন, তাঁহার পুত্র যদু মুসলমান হইয়া তৎসমস্ত ভাঙ্গিয়া তাহার মালমশলা দিয়া মস্‌জিদ্ নির্ম্মিত করেন। যদু মুসলমান হইলেন কেন, বলা যায় না। তৎকালীন মুসলমান সাধুদের নৈতিক চরিত্রের উৎকর্ষ দেখিয়া কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে কি যদু জালালুদ্দিন হইয়াছিলেন? পাণ্ডুয়া দুই বার সম্রাট ফিরোজ শাহার আক্রমণ সহ্য করিয়াছে। পাণ্ডুয়ার ইতিহাসপ্রসিদ্ধ গোপপল্লী বা গোয়ালপাড়া নামক উপনগর এই আক্রমণে লোকশূন্য হইয়াছিল। গঙ্গা সরিয়া যাওয়ায়, পাণ্ডুয়া জলাভূমিতে পরিবেষ্টিত হইয়া লোকশূন্য হইয়া পড়িয়াছে। পাণ্ডুয়া নগর মুসলমানদের সময় দুই ভাগে বিভক্ত হয়; কুতুব সহর ও মোকদম সহর। কুতুব সহরে নুর কুতুব আলমের ও মোকদুম সহরে মোকদম শাহ জেলালুদ্দিনের সমাধিমন্দির আছে। পাণ্ডুয়ার কতকগুলি ভগ্ন অট্টালিকার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যাইতেছে,—

১। মোকদম শাহ জেলালুদ্দিনের স্থান।—এই বিখ্যাত ফকীর তাব্রিজ সহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাব্রিজ সহর পারস্য দেশে অবস্থিত। মোকদম শাহ মুসলমান রাজত্ব স্থাপিত হইলে এ দেশে আগমন করেন। শেখশুভোদয়ার মতে, ইনি রাজা লক্ষ্মণ সেনের সময় গৌড়ে আসিয়া রাজার নিকট বিশেষরূপ সমাদরলাভ করেন। মোকদম শাহ বঙ্গদেশে বাইশ হাজার টাকার ভূসম্পত্তি উপার্জ্জন করেন; এই জন্য তাঁহার বিষয়কে বাইশ-হাজারি বলে। মোক-

দম শাহের দরগার ভিতরের ঘরটি সুলতান আলি মোবারক কর্ত্তৃক ৭৪২ হিজিরায় নির্ম্মিত হয়। ১০৭৫ হিজিরায় নিয়ামৎ উল্লা কর্ত্তৃক সমস্ত অংশের নির্ম্মাণ কার্য্য পরিসমাপ্ত হয়।

২। ছোট দরগা।—ইহা নুর কুতুব আলম নামক ফকীরের দরগা। ইনি যে সম্পত্তি উপার্জ্জন করেন, তৎসমস্তের মূল্য ছয় হাজার টাকা বলিয়া, ইঁহাকে ষষ্‌হাজারি বলে। পাণ্ডুয়ার ছোট দরগা সম্মানে বড় দরগা বা মোকদম শাহের দরগা অপেক্ষা অল্প হইলেও জাঁকজমকে তদপেক্ষা বড়।

৩। আদিনা মস্‌জিদ।—ইহা পাণ্ডুয়ার অলঙ্কারস্বরূপ। সেকেন্দর শাহ এই মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করেন। একটা প্রকাণ্ড বৌদ্ধস্তূপ ও কতিপয় হিন্দুদেব-মন্দির ভাঙ্গিয়া এই মস্‌জিদ নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহা অতি প্রকাণ্ড মস্‌জিদ। লেফটেন্যাণ্ট গবর্ণর টমসনের সময় নয় হাজার টাকা খরচ করিয়া ইহাকে মৃৎ-স্তূপের মধ্য হইতে উদ্ধার করা হয়। গত ফেব্রুয়ারি মাসে গবর্ণর জেনেরল ইহার সৌন্দর্য্য উপভোগ করিয়া গিয়াছেন। স্বর্গীয় ছোট লাট ইহা দুই বার দর্শন করিয়া গিয়াছেন। গুণগ্রাহী ইংরেজ গবর্মেণ্ট এই অপরূপ বস্তুটির রক্ষাবিধানে যথোচিত যত্ন করিতেছেন।

৪। লক্ষ্মণসেনী দালান।—ইহা বড় দরগার মধ্যে রহিয়াছে। লক্ষ্মণ সেনের প্রাসাদ ভাঙ্গিয়া যে এই দরগা নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

এতদ্ব্যতীত ভাণ্ডারখানা, তন্দুরখানা, সলামি দরজা প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে। সমুদায় পাণ্ডুয়া বেড়াইয়া দেখিলে মনে একটি গম্ভীর ভাবের উদয় হয়। এই নগর কত হিন্দু ও কত বৌদ্ধ রাজাকে বক্ষে ধারণ করিয়াছিল! এখন সাঁওতালগণের ক্রীড়াভূমি হইয়া পড়িয়াছে।

গৌড়নগরের কতিপয় স্তম্ভ, প্রাচীর, দ্বার ও অট্টালিকার সংক্ষিপ্ত পরিচয়,—

১। কদমরসুল।—নসরৎ শাহ গৌড়দুর্গের অভ্যন্তরে ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে এই অট্টালিকার নির্ম্মাণ করেন। ইহাতে এক খণ্ড শাদা পাথরের উপর মহম্মদের পদচিহ্ন আছে। এই পদচিহ্ন প্রথমে পাণ্ডুয়ায় আনীত হয়। সুলতান্ আলা-উদ্দিন হুসেন ইহা গৌড়ে আনয়ন করেন। কদমরসুলের পশ্চিম দিকের পুকুরের নাম জালালি পুকুর।

২। ফতেইয়ার খাঁর কবর।—সুজার বিরুদ্ধে আরঙ্গজীব যে সকল সেনা-পতিকে প্রেরণ করেন, তাঁহাদের এক জনের পুত্র এখানে পরলোকগমন করেন; ইহা তাঁহার কবর।

৩। লুকোচুরী।—গৌড়ের রাজপ্রাসাদে যাইবার পূর্ব্ব দিকের ফটকদ্বার। ইহা একটি উচ্চ দোতালা। ইহার ভিতর দিয়া হস্তীতে আরোহণ করিয়া যাওয়া যায়। এই দ্বারের উভয় পার্শ্বে যে দুটি ক্ষুদ্র ঘর আছে, তাহাদের নাম নক্কর-খানা। উহার উপরে নহবং বাজিত।

৪। চিকা মস্‌জীদ।—ইহা একটি অতি পুরাতন ইটের দালান। ইহার নিকট যে দাতন মস্‌জিদ ছিল, তাহাতে জেলখানার অধ্যক্ষ বাস করিতেন। লোকে বলে, ভাগীরথীর তীরস্থ হাব্বাসখানায় কয়েদীগণ বাস করিত।

৫। গুমতি।—লুকোচুরীর দক্ষিণে বিদ্যমান আছে। ইহা একটি দরজা। এই দরজা দিয়া জেলখানার কয়েদীদিগকে বাহির করা হইত।

৬। বাইশগজি।—রাজপ্রাসাদের চতুর্দ্দিকস্থ প্রাচীর। কেন যে ইহার বাইশগজি নাম হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। স্থানীয় লোকে ইহাকে ঘোড়দৌড় বলে। কেহ কেহ গাঙ্গোদিদিও বলিয়া থাকে।

৭। খাজাঞ্চি।—কদমরসুলের উত্তর-পশ্চিম কোণে অবস্থিত। ইহার নিকটে যে পুকুর আছে, তাহাকে টাঁকশাল দীঘী বলে। খাজাঞ্চিতে বোধ হয় খাজানা-খানা ছিল। ইহারই নিকট জানানা মহল ছিল। এই সকল স্থান প্রহরিগণ কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত হইত।

৮। পীরশা মঞ্জিল।—ফিরোজ শাহ ইহার নির্ম্মাণ করেন। ইহাকে কেহ কেহ চেরাগ-দানি, কেহ কেহ বা তিরআশা মন্দির বলে। ইহা একটি হিন্দুকীর্ত্তি ছিল। মুসলমানেরা ইহা ভাঙ্গিয়া বর্ত্তমান আকারে পরিণত করিয়াছে। কথিত হয়, ইহার নির্ম্মাতা রাজমিস্ত্রীকে উপর হইতে ফেলিয়া দিয়া নিহত করা হয়। রাজার বিশ্বাস হইয়াছিল, মিস্ত্রী যথাশক্তি কার্য্য করে নাই। রাজা নিম্নে অবতরণ করিয়া হিঙ্গা নামক পদাতিককে দেখিতে পান; তাহাকে আদেশ করেন যে,"হিঙ্গা! তুই মোরগাঁ যা।" হিঙ্গা রৌদ্রমূর্ত্তি নরপতিকে কারণ জিজ্ঞাসা করিতে সাহস পায় নাই। সে মোরগাঁয় উপস্থিত হইয়া ভাবিবার অবকাশ পাইল, "মোরগাঁয় আসিলাম কেন? রাজা কি জন্য আমাকে এখানে পাঠাইলেন?" একটি ব্রাহ্মণযুবক পদাতিকের মুখে আদ্যোপান্ত শুনিয়া বলিয়া দিলেন, এই মোরগাঁয় ভাল ভাল রাজমিস্ত্রী পাওয়া যায়, তুমি তাহাদের জন কয়েককে লইয়া গৌড়ে ফিরিয়া যাও। রাজারও সেই-রূপ উদ্দেশ্য ছিল। এই ব্রাহ্মণযুবক সনাতন। এই ঘটনা হইতে এতদঞ্চলে "হিঙ্গা তুই মোরগাঁ যা", এই প্রবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। আগমনের কারণ বলিতে না পারিলে লোকে বলে, এ যে দেখি "হিঙ্গা তুই মোরগাঁ যা"।

৯। বারদুয়ারি বা সোনা মস্‌জিদ।—ইহা ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে নসরৎ শাহ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহা প্রস্তরনির্ম্মিত। ভিতরের ছাদ ও সমস্ত গুম্বজ পড়িয়া গিয়াছে। ইহা একটি বৃহৎ গৃহ। কেহ কেহ বলেন, ইহা বিচারালয়; কেহ কেহ বলেন, ইহা ইমাম্‌বাড়ী।

১০। দখল-দরজা।—এই দ্বার দিয়া উত্তর দিক্ হইতে রাজপ্রাসাদে যাওয়া যাইত। ইহাতে রঙ্গিন ইটের কার্য্য দৃষ্ট হয়। ইহার উত্তর দিকে পরিখা।

১১। লোটন মস্‌জিদ।—এই মস্‌জীদটি এক জন নর্ত্তকী কর্ত্তৃক নির্ম্মিত ইহার আগাগোড়া রঙ্গিন ইটে প্রস্তুত।

১২। কোতোয়ালি গেট বা সেলামী দরজা।—এই ফটকের পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকে কামান ছুড়িবার স্থান আছে। এই দরজা ৮৬২ হিজিরাতে সুলতান মহম্মদ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। ইহার দক্ষিণ দিকে বালুয়াদীঘী নামক পুষ্করিণী।

১৩। পিয়াস্‌-বাড়ীর দীঘী বা প্যাজ্‌ বাড়ীর দীঘী।—ইংরেজবাজার হইতে আট মাইল দূরে রাস্তার বাম পার্শ্বে স্থিত একটি বড় দীঘী। এইরূপ প্রবাদ আছে, এই পুষ্করিণীর জল প্রথমে বড়ই অস্বাস্থ্যকর ছিল। কয়েদীদিগকে এই বিষাক্ত জল পান করান হইত। এখন ইহার জল মন্দ নহে। এই দীঘীর পশ্চিম দিকের বাঁধা ঘাটের সম্মুখে জলের নিম্নে চারি পাঁচ হাত উচ্চ দুটি পাথরের হস্তিমূর্ত্তি আছে।

১৪। হোসেন শার কবর।—হোসেন শার কবরের চারি পার্শ্বে রঙ্গিন ইটের প্রাচীর ছিল। এই প্রাচীর বাঙ্গালকোট নামক স্থানে অবস্থিত। এই স্থানে প্রদীপ ও ফাতেহা দিবার জন্য সম্রাট আরঙ্গজীবের আদেশানুসারে নবাব মোয়াজ্জম খাঁ ১০৭০ হিজিরাতে পঞ্চাশ বিঘা নিষ্কর ভূমি দান করেন।

১১৯৮ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ্ বিন্ বক্তিয়ার গৌড় অধিকার করেন। রাজা লক্ষ্মণ সেন স্বয়ং তৎকালে নবদ্বীপে ছিলেন। কেশব সেন গৌড়ে ছিলেন। তিনি যুদ্ধ করেন নাই। বক্তিয়ার গৌড়ে রাজধানী করিলেন। বঙ্গ বিহারের সন্ধিস্থলে অবস্থিত বলিয়া গৌড় রাজধানীর উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। উত্তর দিক্ ব্যতীত অন্য তিন দিকে দুস্তর নদী থাকায় গৌড় দুরাক্রম্য ছিল। গিয়াসুদ্দিনের রাজত্বকালে জলপ্লাবন হইতে গৌড়-রক্ষার জন্য যে উচ্চ বাঁধ নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহার এক অংশ অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়। মালদহ সহরের পশ্চিম দিকে যেখানে আম্রকাননের শেষ হইয়াছে, তথায় সেই সুপ্রশস্ত বাঁধ অদ্যাপি বিদ্যমান। এই বাঁধের পশ্চিম দিকে যে বিল রহিয়াছে, গঙ্গা হইতে

তাহার উদ্ভব হইয়াছে। গঙ্গার একটি শাখা পূর্ব্বে এই বিল ও গোঙ্গরালি বিলের স্থান দিয়া প্রবাহিত হইত। তুলসীগঙ্গা গৌড়ের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইত। এই জন্য মুসলমান গৌড় সুন্দররূপে জলসিক্ত হইত। এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে, তিস্তা বা ত্রিস্রোতা তিনবার আপনার গতি পরিবর্ত্তিত করিয়াছে। উহার একটি প্রাচীন প্রবাহ দিয়া এখন পুনর্ভবা নদী প্রবাহিত হইতেছে। কৌশিকী অতি চঞ্চল নদী। উহা তিস্তা ও গণ্ডকীর মধ্যবর্ত্তী ভূভাগে বারংবার আপনার গতি পরিবর্ত্তিত করিয়াছে। কোন সময়ে এই কৌশিকী নদীর ভীষণ জলস্রোত গৌড়নগর ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছিল ; এই জন্য পূর্ব্ব দিকে ডবল বাঁধ দিয়া নগর রক্ষিত হইয়াছিল।

গৌড়ের বাঁধগুলির অবস্থানপ্রণালী অতি জটিল। কোন্‌টি কোন্ দিকের জলপ্লাবন হইতে নগর-রক্ষার জন্য নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা ভাল বুঝা যায় না। সাধারণতঃ সে সমস্ত বাঁধ গড় নামে অভিহিত হইয়া থাকে। বোধ হয়, বাঁধের উপর হইতে সেনাগণ নগর রক্ষা করিত। নগরের বড় বড় অধিবাসীরাও আপনাদের বাসস্থান জলপ্লাবন ও শত্রু হইতে রক্ষা করিবার জন্য সুদৃঢ় বাঁধ নির্ম্মাণ করিতেন। এইরূপ বাঁধের মধ্যে ঠাকুরপ্রসাদের গড় ও কালাপাহাড়ের গড় বিশেষ প্রসিদ্ধ। জেলখানার কিছু দক্ষিণে কালাপাহাড়ের গড়। কালাপাহাড় এক জন বিখ্যাত সেনাপতি ছিলেন। তাঁহার প্রকৃত নাম কালাচাঁদ পাঁড়ে। ইনি গৌড়ের কোন মুসলমান রাজকুমারীকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিয়াই হউক, অথবা বাধ্য হইয়াই হউক, মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। মোগলেরা বাঙ্গালা অধিকার করিলে, কালাপাহাড় পাঠানদের সঙ্গে উড়িষ্যায় পলায়ন করেন। তিনি মোগলদের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হন। ঠাকুরপ্রসাদের কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই।

গৌড়ের উপনগরগুলির মধ্যে রামকেলি সর্ব্বাপেক্ষা সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল। রামকেলিতে বিস্তর ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের বাস ছিল। হোসেন শাহ গৌড়ের সর্ব্বপ্রধান নরপতি ছিলেন। পরকীয় ধর্ম্মে তাঁহার বিদ্বেষ ছিল না। তাঁহার সময়ে অনেক হিন্দু রাজতন্ত্রের উচ্চপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। পুরন্দর খাঁ হুসেন শার সর্ব্বপ্রধান হিন্দু কর্ম্মচারী ছিলেন। পুরন্দর খাঁ রাজদত্ত উপাধি, প্রকৃত নাম গোপীনাথ বসু। হুসেন শাহ গুণী লোকদিগকে উপাধি দিয়া সম্মানিত করিতেন। কেহ গন্ধর্ব্ব খাঁ, কেহ গুণরাজ খাঁ, কেহ সুন্দরবর খাঁ, কেহ বুদ্ধিমন্ত খাঁ, এইরূপ উপাধি পাইয়াছিলেন। পুরন্দর খাঁর অধীনে

সনাতন ও রূপ নামক দুই ব্রাহ্মণযুবক কার্য্য করিতেন। ইহঁাদের বুদ্ধিমত্তা ও কার্য্যকুশলতায় হুসেন শা সন্তুষ্ট ছিলেন, এবং দবিরখাস ও সাকর মল্লিক উপাধি দিয়া ইহাঁদিগকে সম্মানিত করিয়াছিলেন। বার্দ্ধক্যবশতঃ গোপীনাথ বসু কার্য্যত্যাগ করিলে সনাতন ও রূপ উভয়েই উচ্চপদে আরূঢ় হইলেন। এই দুই ভাই রামকেলিতে বাস করিতেন। অদ্যাপি রামকেলিতে রূপ ও সনাতন গোস্বামীর বাসস্থানের চিহ্ন রহিয়াছে। তাঁহাদের ভ্রাতুষ্পুত্র জীব গোস্বামী রামকেলির মদনমোহন বিগ্রহের প্রতিষ্ঠাতা। রূপ সনাতন অত্যন্ত বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তাঁহাদের প্রবর্ত্তনায় নানা স্থান হইতে ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ আসিয়া রামকেলিতে বাস করিয়াছিলেন। চৈতন্যদেব হুসেন শার রাজত্বকালে রামকেলিতে এক তমালবৃক্ষের নিকটে দাঁড়াইয়া হরিধ্বনি করিয়াছিলেন, সে স্থান অদ্যাপি প্রদর্শিত হইয়া থাকে। রামকেলির পূর্ব্ব সমৃদ্ধি এককালে বিলুপ্ত হইয়াছে। চৈতন্যদেবের আগমনোৎসবের স্মরণে প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠমাসের শেষ দিনে রামকেলিতে মহামেলা হইয়া থাকে।

হুসেন শাহ আটাশ বৎসর গৌড়ে রাজত্ব করেন। তৎপুত্র নসরৎ শাহও মন্দ লোক ছিলেন না। হুসেন শা ও নসরৎ শাহের সময় বাঙ্গালা ভাষায় পরাগালি মহাভারত রচিত হয়। নসরৎ শাহের সময় পাণ্ডুয়ায় নসরৎশাহি দীঘী খনিত হয়। নসরৎ শাহ গৌড়ের বড় সোনা মস্‌জীদের নির্ম্মাতা। রাজা মুসলমান হইলেও গৌড়বাসিগণ প্রধানতঃ হিন্দু ছিল। গৌড়ের জমীদার পর্য্যন্ত হিন্দু ছিলেন। সৌভাগ্যলাভের পূর্ব্বে হুসেন শাহ এক জন রাজোপাধিধারী হিন্দু জমীদারের চাকরী করিতেন। নিজে রাজা হইয়া সেনাগণকে নগরলুণ্ঠনের হুকুম দিয়াছিলেন। অধিবাসিগণ প্রধানতঃ হিন্দু ছিল, এই জন্য হুসেন শাহ গৌড় লুণ্ঠন করিতে পাপবোধ করেন নাই। সের শাহ গৌড় অধিকার করিয়া সেনাগণকে নগর লুণ্ঠন করিবার অনুমতি দেন। সেনাগণ হত্যা ও লুণ্ঠন করিয়া পাশব আমোদ চরিতার্থ করিয়াছিল। লোকে বিরক্ত হইয়া উঠিল, এবং গৌড়ে বাস নিরাপদ নয়, ভাবিল। হুমায়ুন মোগল সৈন্য লইয়া গৌড়ে উপস্থিত হইলে লোকের আতঙ্ক বর্দ্ধিত হইল। গৌড়ের সৌন্দর্য্যদর্শনে প্রীত হইয়া হুমায়ুন উহার নাম জেন্নাতাবাদ রাখেন। হুমায়ুন এক বর্ষ গৌড়ে বাস করিয়াছিলেন। দুর্দ্দম সেনাগণের দৌরাত্ম্যে নগরবাসিগণ নিতান্ত নিপীড়িত হইতে লাগিল। পাঠানেরা যখন আপনাদের মধ্যে কাটাকাটি মারামারি আরম্ভ করিল, তখন নগরবাসিগণ বুঝিতে পারিল, উহাদের ও গৌড়ের কপালে আগুণ

লাগিতে বেশী বিলম্ব নাই। সোলেমান্ কর্‌রাণী আসিয়া গৌড়ের অপর পারে তাণ্ডায় বাস করিতে লাগিলেন। গৌড় তখন বাদবিসংবাদের আকর ও অস্বাস্থ্য-কর স্থান বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। দায়ূদ শাহ গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করিয়া মোগল রাজ্য আক্রমণ করিলেন। ভীমবেগে রাজপুত ও মোগলসেনা বাঙ্গালায় আসিয়া উপস্থিত হইল। দায়ূদ রাজ্য ও প্রাণ হারাইলেন। পাঠানেরা উড়িষ্যায় গিয়া হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য কিয়ৎকাল নিষ্ফল প্রয়াস পাইয়াছিল।

মোগল সেনা মুনেম খাঁর আদেশে গৌড়ে প্রবেশ করিল। সেবার ভীষণ বর্ষা হইয়াছিল। নগরমধ্যে দারুণ মারীভয় উপস্থিত হইল। দলে দলে সেনা মরিতে লাগিল। মুনেম খাঁও মরিলেন। শুনা যায়, নগরবাসিগণ পলায়নের পরামর্শ করিবারও অবকাশ পায় নাই। বোধ হয়, ইহার কিছু অত্যুক্তি হইবে। নগরবাসিগণ সেনাদের দৌরাত্ম্যে পূর্ব্ব হইতেই নগর ছাড়িয়া পলাইয়াছিল। মহামারীর কবল হইতে যাহারা রক্ষা পাইয়াছিল, তাহারা চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িল। গৌড় নির্ম্মনুষ্যপ্রায় হইল। সুজা একবার গৌড়কে পুনরুজ্জীবিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার সে চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। গৌড় নির্ম্মনুষ্য হইয়া জঙ্গলে ভরিয়া গেল। বহুদিন যাবৎ লোকের বিশ্বাস ছিল, গৌড় ভূত প্রেতে পরিপূর্ণ। ভয়ে কেহ গৌড়ের মধ্য দিয়া হাঁটিত না। কেহ কেহ ইহাও বলিয়া থাকেন, তাঁহারা গৌড়ের মাঠে রাত্রিকালে রাজসভার অধিবেশন ও অসংখ্য সেনার সমরক্রীড়া দর্শন করিয়াছেন!

গৌড়ের ইতিহাস-বর্ণন আমার উদ্দেশ্য নয়। এই জন্য আমি যথাসম্ভব তাহা হইতে নিবৃত্ত হইয়াছি। আশা করি, আপনাদের মধ্যে কেহ কেহ পাণ্ডুয়া, গৌড়, খণ্ডারণ্য ও কৌশিকী কচ্ছের ইতিহাস লিখিয়া আমাদিগকে পরি-তৃপ্ত করিবেন। *

শ্রীরজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী।

---

* মালদহ জেলা স্কুলের সভায় পঠিত।

মুক্তি।

নিখিল নীলিমা নব নির্ম্মল,
অরুণ কিরণপুঞ্জে,
তরুলতা ভরা তৃণ তরুফল
করুণ কাননকুঞ্জে ॥
আলোকে হাস্তে ললিত লাস্তে
উছলি চলিছে তটিনী,
বিলাসমধুর মদির আস্তে
নাচিছে নিপুণা নটিনী ॥
ধীরে বহে ধারা, নির্জ্জন তীর, –
রবির কিরণ-স্বর্ণে,
সোপান ভবন দেউল কুটীর
চিত্রিত চারু বর্ণে।
মাথার উপর ওই গেয়ে যায়
পুলকে প্রভাত-পক্ষী;
মঞ্জুল বনে ওই ধেয়ে যায়
গুঞ্জরি' মধুমক্ষী।
মর্ম্মরি' ওঠে মৌন কানন
মধুর মন্দ বায়,
সৌরভভরে ভরেছে ভুবন,
ফুল-সুগন্ধ ধায়।
তৃষিত কিরণে শুকায় শিশির,
ক্রমে বেড়ে উঠে বেলা;
আলোকে অনিলে নীল নদী-নীর
সারা দিন করে খেলা!
ধূ ধূ করে ক্ষেত, জনহীন তট,
ঘন দেবদারুবন,—

রৌদ্রদগ্ধ ললাটে প্রকট
স্থূল শিরা অগণন,
কহিল বন্দী অস্ফুটভাষে,—
"চারি মাস বাকি আর !"
ঘর্ম্মের সহ মর্ম্ম-উচ্ছাসে,—
মিশি গেল আঁখিধার !
মুণ্ডিত শির, ক্লান্ত শরীর
উন্নত মসীমূর্ত্তি ;
সংখ্যা-পদক গলে কয়েদীর,
অঙ্গে মলিন কূর্ত্তি ।
নিশিদিন তার বাজিছে শ্রবণে
প্রভুর সরোষ বাক্য,
"ভিটায় থাকিবি ভেবেছিস্ মনে ?—
দিবি না মিথ্যা সাক্ষ্য ?"
নিমকহারাম, পাজী বদ্‌মাস্
জানি তোর যত ধর্ম্ম ।
ধর্ম্মের নামে ফাঁকি দিতে চাস্
পড়িলে প্রভুর কর্ম্ম ?
উত্তরে তার উত্তম পাল,
দক্ষিণে বিশালাক্ষী,—
পূবে পশ্চিমে তোর ক্ষেত আ'ল,—
তুই ত প্রধান সাক্ষী ।"
বঙ্গের ভাতে অঙ্গপুষ্টি,
মিছির দারুণ রুক্ষ,
করিল বৃষ্টি হাজার মুষ্টি,
রাজার বিচার সূক্ষ্ম !
কম্পিত দেহ, সংবিত নাই,
লম্বিত ধূলিজালে,
কহিল নিতাই, "যা বলেন তাই
কহিব বিচারকালে !"

* * *

কৃশ কালিদাস, গায়ে নামাবলী,
করুণ কোমল কান্তি,
পুণ্যের বিভা উঠিছে উছলি
নয়নে স্নিগ্ধ কান্তি—
বিচারশালায় উপনীত আসি
উপবীত হাতে করি,
কাতর কণ্ঠে কহে সম্ভাষি
আঁখি দু'টি জলে ভরি :—
আমি ব্রাহ্মণ, দীন দরিদ্র,
এক গাঁয়ে করি বাস,
শত্রু সদাই খুঁজিছে ছিদ্র
করিতে সর্ব্বনাশ।
সবার উচ্চে ধর্ম্ম আপন,
করিলে ধর্ম্ম রক্ষে,
রাখিবে ধর্ম্ম,—শাস্ত্রবচন !"—
ধারা দর দর বক্ষে।
কাঁপিয়া উঠিল কৃষক-হৃদয়
শুনিয়া করুণা-ভিক্ষা,
হইল বিচারে সত্যের জয়,
ভেসে গেল শত শিক্ষা !
বছর না যেতে, হায়, তার পর
প্রভু নির্ম্মম ক্রূর ;
দীন-আঁখি-জলে নিজ অন্তর-
অগ্নি করিল দূর।
বাজে শৃঙ্খলে চরণে চরণ,
ধরণী কিরণতপ্ত ;
যাচি' একমনে মরণ শরণ

কোথায় গৃহিণী কাঁদিছে কুটীরে,
কোথা সে স্নেহের গেহ ?
রাখিয়া এসেছে বালক হু'টিরে—
জুড়াত জীবন দেহ !
কোথা সে ক্ষেত্র, শস্যের ভার—
উজল সোনার বন্যা !
শ্যামা সন্ধ্যায় পথ চাহি তার
থাকিত হুলালী কন্যা !
নিশ্বাস ত্যজি মুছিল নেত্র—
"চারি মাস বাকি আর,"
চিরিল পৃষ্ঠ তীখন বেত্র—
বহিল শোণিতধার !

* * *

তখন সন্ধ্যা, মেঘ-মাখা দিক্,
ছায়া-বিপন্না ধরণী ;—
তীর হ'তে হাঁকি আর্ত্ত পথিক
কহে, "রাখ রাখ তরণী !"
গরজে নীরদ গভীর মন্দ্রে
সম্বরি' বারিধারা,
খেলিছে বিজলী জলদ-রন্ধ্রে
লাজবন্ধন-হারা।
মেঘেতে মেহুর গগন-প্রান্ত,
তটিনী তিমিরবরণী,
ভৈরব রবে গরজে পান্থ,—
"রাখ, ওগো রাখ তরণী !"
উতলা বাতাসে এল উত্তর,—
"স্থান নাহি এক তিল ;
এই শেষ খেয়া !"—চিরি অম্বর
ফিরি গেল 'গাঙ্‌চিল'।

জনহীন তট!—পথিকে ঘিরিয়া
নাচিছে লহরী ক্রুদ্ধ,
চলিছে সঘনে সলিল চিরিয়া
নিশ্বাস অবরুদ্ধ!
ভীষণ দৃশ্য!—বিস্ময়-মূক
শিহরিল যত যাত্রী,
উছল উর্ম্মি অতি উন্মুখ,—
ঘনায় প্রলয়রাত্রি!

* * *

কাঁপিছে কুটীর আর্দ্র পবনে,
ঝিল্লীমুখরা যামিনী,
তিমিরে-মগন ভূতল গগন,
চমকিছে ঘন দামিনী।
নিভ-নিভ করি জ্বলিছে কুটীরে
চঞ্চল দীপ-শিখা,
নিশীথ-ভীষণ-মরণ-তিমিরে
কি ছবি রয়েছে লিখা।
শীর্ণা রমণী অশ্রুনয়না
লুণ্ঠিতা ধূলিশয়নে,
কি যেন বেদনা কি যেন বাসনা
ভাসিছে তৃষিত নয়নে;
অঙ্কে তাহার কঙ্কালসার
শিশুটি মরম-রত্ন,
মরণ-মুদিত আঁখি দুটি তার,
মিছে আকুলতা যত্ন!
ধিক্কার সহি ভিক্ষার তরে
'আকালে' মেলেনি অন্ন,
উপবাসকৃশ সুত সহ জ্বরে
অবশেষে অবসন্ন

সমুখে নগ্ন পুরুষ-মূর্ত্তি—
নারী-মুখ-নত দৃষ্টি,
আননে নাহিক বচনস্ফূর্ত্তি,
নয়নে অনলবৃষ্টি!
চাহিয়া চাহিয়া শুষ্ক নয়নে
মুক্ত যুগল ধারা,—
ডাকিল বেদনা-ব্যাকুল-বচনে
"তারা রে—আমার তারা!"
নির্ব্বাক নারী, বারেক চাহিতে
কণ্ঠে কাঁপিল স্বর,
মরমের কথা পতিরে কহিতে
মিলিল না অবসর।
শোকে রোষে ক্ষোভে তাপিয়া কাঁপিয়া
দ্বিধা-বিদীর্ণ মর্ম্ম,
গর্জ্জিল দোঁহে বক্ষে চাপিয়া—
"মোরে বাঁধিয়াছে ধর্ম্ম!"
অট্ট হাসিয়া উঠিল ঝটিকা,
নাচিল চপলা ঈশানে,
ধ্বনিল মরণ-মুক্তি-গীতিকা
ভীষণ বজ্র-বিষাণে।

সহযোগী সাহিত্য।

বিবিধ।

চীনসমাজ।

সম্প্রতি একখানি ইংরাজী পত্রিকায় রেভারেণ্ড ই. জে. হার্ডি এম্. এ. নামধেয় হংকং সহরের এক জন ইংরেজ পাদ্রী চীনদেশের আচারব্যবহারের সহিত ইংরেজের আচারব্যবহারের তুলনা করিয়া একটি সুন্দর কৌতুহলোদ্দীপক প্রবন্ধ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আমরা সেই প্রবন্ধের সারসংগ্রহ করিতেছি।

মিষ্টার হার্ডি বলেন, আমাদের চক্ষে অদ্যাপি চীনের সবই বিপরীত বলিয়া মনে হয়। চীনদিগের চক্ষে ইংলণ্ডও কতকটা সেইরূপ। চীনের দিক্‌দর্শন যন্ত্র দক্ষিণ দিকের,

ও আমাদের দিক্‌দর্শন যন্ত্র উত্তর দিকের নির্দ্দেশ করে। চীনদেশীয় পোতসমূহের পুরোভাগ অস্মদ্দেশীয় পোতসমূহের পশ্চাদ্ভাগের তুল্য; গতিশীল চৈনিক পোত দেখিলে মনে হয়, যেন তাহা পশ্চাৎদিকে পরিচালিত হইতেছে। পাশ্চাত্যদেশে মস্তকরক্ষার জন্য পক্ষীর পালকে উপাধান নির্ম্মিত হয়। চীনেরা উপাধানে মস্তকের পরিবর্ত্তে গ্রীবাদেশ রক্ষা করে। চীনদেশে বংশনির্ম্মিত অনুচ্চ একটি চৌকি-বিশেষ, কাষ্ঠখণ্ড, অথবা সামান্য ইষ্টকখণ্ড উপাধানরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইংরাজেরা উপাধির পূর্ব্বে নাম ব্যবহার করিয়া থাকেন; চীনদেশে উপাধির পরে নাম ব্যবহৃত হয়। অভিবাদনকালে চীনদেশীয়েরা মস্তকে টুপি পরে, আমরা কিন্তু উন্মোচন করিয়া থাকি। কোন মন্দ সংবাদ শ্রবণ করিলে চীনেরা দুষ্ট প্রেতাত্মাকে বঞ্চনা করিবার অভিপ্রায়ে হাস্য করিয়া থাকে। হস্তের অঙ্গুলিতে বড় বড় নখ রাখা চীনদেশে সম্মানের লক্ষণ, ইংলণ্ডে কিন্তু তাহা অপরিচ্ছন্নতার পরিচায়ক।

চীনদেশের কোনও ভোজে গৃহস্বামীর ঠিক বামপার্শ্বের আসনই সম্মানের আসন বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। চৈনিক অশ্বারোহিগণ রেকাবে পদের অগ্রভাগের পরিবর্ত্তে গুল্‌ফের উপর ভর দিয়া অশ্বারোহণ করিয়া থাকেন। অন্য কাহারও সহিত ভ্রমণকালে চীনেরা কখনও পাশাপাশি গমন করে না; হয় অগ্রে, না হয় পশ্চাতে গমন করে। তাহারা পশ্চাদ্দিক হইতে পুস্তক পাঠ করিতে আরম্ভ করে, এবং আমরা যে প্রণালীতে লিখি, তাহার বিপরীত ভাবে লিখিয়া থাকে। তাহাদের শোকবস্ত্র শ্বেত, আমাদের কৃষ্ণ। বড় বড় ভোজে তাহাদের সূপ সর্ব্বশেষে আনীত হয়; আমরা কিন্তু সর্ব্বপ্রথমেই সূপ পান করি। চীন রমণীগণ পাজামা পরিধান করেন, এবং পুরুষেরা অনেক সময় গাউন পরিয়া বেড়ান। চীনদেশীয়েরা নিজে ও পরিবারবর্গ সুস্থদেহে কালযাপন করিবে মনে করিয়া চিকিৎসকদিগকে প্রচুর অর্থ প্রদান করে; আর আমরা পীড়িত হইলে চিকিৎসকদিগকে অর্থদান করি। চীনদেশীয়েরা পরিচিত লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাহার করকম্পনের পরিবর্ত্তে নিজের করকম্পন করে।

শরীররক্ষার্থ ব্যায়াম চৈনিকদের মতে নিতান্তই উন্মাদের লক্ষণ! এমন কি, চীনদেশের ক্ষুদ্র শিশুটিও বেশ শান্তভাবে খেলা করিয়া থাকে। ক্ষুদ্র শিশুগণ কর্ম্মরতা মাতার পৃষ্ঠদেশে বদ্ধ হইয়া সম্পূর্ণ শান্তভাবে অবস্থিতি করে। এক জন ক্যাণ্টন-বাসী একদা জনৈক বিদেশিনী মহিলাকে টেনিস ক্রীড়ায় রত দেখিয়া তাঁহার ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "এই রকম ছুটাছুটি করিবার জন্য ইনি কত পেয়ে থাকেন?" যখন শুনিল, কিছুই নহে, তখন কিছুতেই তাহা বিশ্বাস করিল না!

চীনদেশীয়েরা যে অত্যন্ত রক্ষণশীল, তাহা আমি প্রশান্ত মহাসাগর পার হইবার সময় প্রথম বুঝিতে পারিলাম। প্রথম দিন ষ্টীমারে আরোহণ করিয়া যেরূপ খাদ্য আহার করিয়াছিলাম, প্রত্যহই সেই একই প্রকার খাদ্যদ্রব্য আমার জন্য আনীত হইত। বোধ হয়, তাহারা মনে করিত, সেই কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট দ্রব্য ব্যতীত খাদ্য সম্বন্ধে অন্য কোনও পরিবর্ত্তন আমার রুচিকর নহে।

এক রকম পিষ্টক প্রস্তুত করিবার পূর্ব্বে জনৈক পাচক প্রত্যেক বারই একটি করিয়া

ডিম ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া দিত; কারণ, প্রথম দিন যখন সে পিষ্টক প্রস্তুত করিতে শেখে, তখন প্রথম ডিম্বটি খারাপ ছিল বলিয়া সেটা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছিল!

চীন-ভ্রমণ-কালে অর্থ সত্য সত্যই একটি বড় রকমের 'বোঝা' বলিয়া মনে হয়; এমন কি, মেক্সিকো দেশের একটি সামান্য ডলারও নিতান্ত অল্প নহে। একটি মেক্সিকো ডলারের পরিবর্ত্তে ৮০০ শত হইতে ১০০০ পিত্তলখণ্ড পাওয়া যায়। তাহাদের নাম 'ক্যাশ'। প্রত্যেক পিত্তলমুদ্রার মধ্যস্থলে একটি করিয়া ক্ষুদ্র ছিদ্র বর্ত্তমান। মুদ্রাগুলি একগাছি দড়িতে গ্রথিত থাকে। সুতরাং অতি অল্প দিনের জন্য চীনভ্রমণ করিতে গেলেও কতগুলি মলিন মুদ্রা স্কন্ধে করিয়া ভ্রমণ করিতে হয়, তাহা সহজেই অনুমেয়। মুদ্রাগুলি অত্যন্ত অপরিচ্ছন্ন ও নিতান্ত মলিন। হস্ত কলুষিত না করিয়া তাহা ব্যবহার করিবার উপায় নাই। রৌপ্য-মুদ্রায় এ দেশে অনেক ক্ষতি হয়; কারণ,—দেশের এক প্রান্তের মুদ্রা অন্য প্রান্তে চলে না। যেখানে চলে, সেখানেও কখনও কখনও অত্যন্ত অধিক বাটা দিতে হয়। ভ্রমণকারী যদি অনভিজ্ঞ হন, তাহা হইলে আদান ও প্রদান, উভয় সময়েই অল্পবিস্তর ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকেন। দড়িবাঁধা ক্যাশের মূল্য প্রত্যেক প্রদেশে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে।

পিতা মাতার উপযুক্ত অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য আবশ্যক হইলে পুত্র স্বীয় ভবন, ভূমি প্রভৃতি সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া থাকে। তিন বৎসর যাবৎ শোকপ্রকাশই পিতৃমাতৃভক্তি-প্রদর্শনের প্রকৃষ্ট উপায়। তিন বৎসরের মধ্যে পুত্র অনেক সময় একাকী পিতামাতার সমাধিপার্শ্বে বসিয়া সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত করে।

সন্তানস্নেহ ও পত্নীপ্রেম পিতৃমাতৃভক্তির অভাব বলিয়া পরিগণিত হয়। চীনদেশের শিক্ষাই এই। চৈনিকদের পিতৃমাতৃভক্তি অসাধারণ। একটি উদাহরণ এই,—এক দরিদ্রের একটি পুত্র ছিল। সে তাহার সহধর্ম্মিণীকে কহিল, 'দেখ! আমরা এত দরিদ্র যে, মাতার ভরণপোষণও করিতে পারি না। এস, আমরা ছেলেটিকে জীবন্ত কবর দিয়া ফেলি। যদি আমরা জীবিত থাকি, আবার পুত্র পাইতে পারি। কিন্তু মাকে হারাইলে আর মা পাইবার কোনও সম্ভাবনা নাই।' স্ত্রী সাহস করিয়া প্রতিবাদ করিতে পারিল না। স্বামী সমাধি খনন করিতে গেল। কিছু ক্ষণ খনন করিতে করিতে সে মুদ্রাপূর্ণ একটি বৃহৎ পাত্র প্রাপ্ত হইল।

পাত্রের উপরে খোদিত ছিল, 'পরমেশ্বর মাতৃভক্ত সন্তানের জন্য এই পুরস্কার দিলেন!'

চীনেরা অত্যন্ত মিতব্যয়ী। চীনের উত্তর প্রদেশে বাসকালে এ কথা প্রথম জানিতে পারি। সেখানে লোকে অশ্বতর, গর্দ্দভ, বা অন্য কোনও জন্তু পাইলে ভক্ষণ করে। কোনও প্রকার জন্তু পাইলে তাহারা সহজে পরিত্যাগ করিতে চায় না। রোগে মৃত পশুও পরিবর্জ্জিত হয় না। তাহারা ক্ষুদ্র শিশুদিগকে শুষ্ককাষ্ঠ সংগ্রহ করিতে ইতঃস্তত প্রেরণ করে। ক্ষুদ্র বালকদিগকে সর্ব্বদা বৃক্ষোপরি বৃক্ষপত্রে আঘাত করিতে দেখা যায়। বৃক্ষতলে তাহারা সামান্য একটি তৃণও পড়িয়া থাকিতে দেয় না; চীনদেশীয়দিগের মিতব্যয়িতার সহিত স্কট্‌লণ্ডবাসীদিগের মিতব্যয়িতার তুলনাই হয় না। সাধারণ গৃহস্থের বাটীতে একটি অতি অল্পমূল্যের স্তিমিতপ্রায় আলোক দুই গৃহের মধ্যবর্ত্তী প্রাচীরের ছিদ্রে এমন ভাবে রক্ষিত হয় যে, তাহাতে উভয় গৃহই সামান্যরূপ আলোকিত হইয়া থাকে।

এক দিন দেখিলাম, একটি বৃদ্ধা রোগযন্ত্রণায় কাতর হইয়া অতিকষ্টে গমন করিতেছে। জিজ্ঞাসা করিয়া জানা গেল, সে তাহার কোনও আত্মীয়ের বাড়ীতে মরিতে যাইতেছে। তাহার আত্মীয়ের বাটী হইতে পারিবারিক সমাধিক্ষেত্র অধিক দূরবর্ত্তী নহে। সেখানে মৃত্যু হইলে আর শববাহকদিগের জন্য অধিক ব্যয় করিতে হইবে না।

চীনদেশীয়েরা কখনও ব্যস্তভাবে কোনও কাজ করে না। কিন্তু ধীরভাবে ও প্রফুল্লচিত্তে তাহারা যে পরিমাণ কাজ করে, তাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। ভ্রমণকালে মাইল হিসাবে দূরত্বের কথা শুনিলে, মাইল ক্ষুদ্র কি বৃহৎ, তাহা জিজ্ঞাসা করা নিতান্ত আবশ্যক। দূরত্বহিসাবে এখানে মাইলের গণনা ঠিক হয় না; পথভ্রমণের কষ্টের অনুপাতে তাহা নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। স্থানীয় গ্রামে কত ঘর পরিবার আছে? অকস্মাৎ কোনও চীনকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে, 'after hundred,' 'several hundred' কিম্বা 'not a few' এই উত্তর দিয়া থাকে। চীনদেশের লোকসংখ্যা এত অধিক যে, অনুমান করিয়া বলা অতি সুকঠিন।

চীনদেশে পুণ্যসঞ্চয়ের বিধি কিছু বিচিত্র। যাহারা পুণ্য অর্জ্জন করিবার চেষ্টা করে, তাহারা একটি জমাখরচ রাখে। তাহাতে কোনও পাপকার্য্য করিলে খরচের ঘরে, এবং কোন পুণ্যকার্য্য করিলে জমার ভাগে লিখিয়া লয়। এই পাপপুণ্যের জমাখরচ মিলাইয়া তাহারা ইচ্ছামত যে কোনও সময়ে পাপপুণ্যের হ্রাসবৃদ্ধি নিরূপণ করে। ইহাদিগের মতে জীবিত পক্ষী বা মৎস্য ক্রয় করিয়া তাহাদিগকে স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে দিলে খুব পুণ্য হয়। তাহারা নদীতীরে দণ্ডায়মান হইয়া ধীবরজালধৃত মৎস্যসমূহ ক্রয় করিয়া তৎক্ষণাৎ জলে নিক্ষেপ করে; কিন্তু কোনও বিপন্ন স্ত্রীলোক কি পুরুষকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হয় না।

একদা কোনও স্থানীয় ভদ্রলোক জনৈক মিশনরী ডাক্তারকে এক জন অন্ধ ভিক্ষুকের নেত্রচিকিৎসার জন্য অনুরোধ করেন। তাহার চোখে ছানি পড়িয়াছিল; অস্ত্রচিকিৎসার পরে অন্ধ দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া পাইল। কিছু দিন পরে সেই ভদ্রলোকটি মিশনরী ডাক্তারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন, 'আপনি অন্ধের দৃষ্টিদান করিয়া তাহার অন্ন মারিয়াছেন; কারণ, এখন তাহার আর ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার কোনও উপায় নাই। সুতরাং এখন আপনার তাহাকে গৃহের দ্বারবান্ নিযুক্ত করিয়া রাখা কর্ত্তব্য।'

বিবাহের দিনে কন্যাকে অত্যন্ত কঠোর পরিহাস সহ্য করিতে হয়। নবক্রীত অশ্বের দোষ গুণ সম্বন্ধে লোকে যেরূপ তীব্র সমালোচনা করে, স্বামিগৃহে সমাগতা নববধূ সম্বন্ধেও সকলে তাহার সম্মুখে সেইরূপ কঠোর সমালোচনা আরম্ভ করিয়া দেয়। কোন কোন স্থলে এরূপ রীতি প্রচলিত আছে যে, যে কেহ ইচ্ছা করিলে পথিমধ্যে কন্যার Sedan Chairর পরদা সহসা উন্মোচন করিয়া বধূর মুখ দেখিতে পারে। কেহ বা তাহার তৈল-নিষেকচিক্কণ কেশকলাপে তৃণবীজ বা ঐরূপ কোনও আবর্জ্জনা নিক্ষেপ করে।

চীনদেশে দায়িত্ববোধ সম্বন্ধে যে মতবাদ প্রচলিত আছে, আমাদের পাশ্চাত্য দেশবাসীর চক্ষে তাহা নিতান্ত অন্যায় বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কিন্তু আর এক দিক দিয়া দেখিলে

এ সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ অনুকূল মত প্রকাশ করা যাইতে পারে। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে এক জন চীনা-ম্যান রাজবংশের সমাধি উৎপাত করিয়া শবাধার হইতে স্বর্ণ রৌপ্য ও রত্নালঙ্কার অপহরণ করিয়াছে বলিয়া অভিযুক্ত হয়; অভিযুক্তের বংশের সমস্ত লোক, সর্ব্বসমেত চারি পুরুষ, নবতিবৎসরবয়স্ক বৃদ্ধ হইতে দুই এক মাসের কন্যাসন্তান পর্য্যন্ত আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই প্রাণদণ্ড হইয়াছিল। এ দেশে কার্য্যবিভাগের কর্ত্তারা অধস্তন কর্ম্মচারিবর্গের সমস্ত ক্রটীর জন্য দায়ী। ইহা ইউরোপীয় কর্ম্মচারিবর্গের পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক বলিতে হইবে। একটি গল্প প্রচলিত আছে;—একদা কোনও ব্যাঙ্কের বালক ভৃত্যের অসাবধানতায় ব্যাঙ্কের কার্য্যাধ্যক্ষের মশারীর মধ্যে একটি মশক প্রবেশ করিয়াছিল;—সে জন্য কার্য্যাধ্যক্ষ তাঁহাদের কর্ত্তার কৈফিয়ৎ তলব করিয়াছিলেন।

চীনেরা পরিচিতের সহিত সাক্ষাৎ হইলে 'আপনি কেমন আছেন?' জিজ্ঞাসা না করিয়া, 'আপনি আহার করিয়াছেন কি?' এই কথা জিজ্ঞাসা করে। পরিচিত ব্যক্তি যদি আহার করিয়া আসিয়া থাকেন, তাহা হইলে বলেন, 'হাঁ, আমায় ক্ষমা করুন।' অর্থাৎ, তিনি আহার করিয়াছেন, ইহা তাঁহার পরিচিত ব্যক্তি পূর্ব্বে হইতে জানিতে পারিয়াছেন মনে করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

প্রতিশ্রুতিপালনের গুরুত্ব চীনবাসীরা আদৌ অনুভব করিতে পারে না। কাহাকেও প্রতিজ্ঞাভঙ্গকারী বলিয়া দোষী করিলে সে কিছুমাত্র লজ্জিত না হইয়া (শিতাস্ত সপ্রতিভের মত) বলে, 'তা, হয়েছে কি? এ রকম আর একটি Engajment ইচ্ছা করিলেই করা যাইতে পারে।' অধিকাংশ চীনবাসীই এইরূপ প্রকৃতির লোক। [ইংরেজ লেখকের উক্তিটি সাবধানে গ্রহণ করিতে বলি।] অশিষ্টভাবে কাহারও অনুরোধ উপেক্ষা করা উচিত নহে। কার্য্যতঃ না করিলেও মুখে স্বীকার করিয়া লইতে দোষ কি? অনুরুদ্ধ হইলে 'কাল করিব' বল। ক্রমে কাল আসিলে, আবার 'কাল করিব' বল। এইরূপে ক্রমেই অনুরোধকারী শান্ত হইয়া যাইবে।

চীনদেশে বক্তা আপনারই নিন্দা করে;—এবং বক্তৃতার বিষয়ীভূত ব্যক্তির প্রশংসা করে। ইহাই শিষ্টাচার বলিয়া পরিগণিত। আহা, সেখানে পরনিন্দা নামক পরম উপাদেয় সামগ্রী নাই দেখিতেছি! মার্জ্জিতরুচি চীনবাসীরা কথোপকথনকালে পত্নীর কথা উল্লেখ করিতে হইলে তাহাকে ভোঁতা কাটা, অথবা তাদৃশ কোন মনোজ্ঞ আখ্যায় অভিহিত করিয়া থাকেন। ইতর লোকেরা তাহাদের সুখদুঃখভাগিনী জীবনসঙ্গিনীকে 'দুর্গন্ধময়ী নারী' বলিয়া থাকে। অথচ কথাস্থলে তাহারা শিষ্টাচারের অনুরোধে 'আমাদের মাননীয়া স্ত্রী, মাননীয় গৃহ, মাননীয় কুকুর' ইত্যাদিও বলিয়া থাকে।

অন্য কোন শিক্ষিত জাতি চীনদেশীয়দিগের মত কুসংস্কারাপন্ন ও অন্ধবিশ্বাসী নহে। প্রত্যেক মাসের দুই দিবস কেবল শৃগাল, নকুল, শূকর, সর্প, ইন্দুর প্রভৃতি জীবের পূজার জন্য নির্দ্দিষ্ট।

জনসাধারণের নিকট সব ধর্ম্মই সত্য; দার্শনিকদিগের নিকট সব ধর্ম্মই মিথ্যা; এবং বিচারকদিগের নিকট সব ধর্ম্মই আবশ্যক; ঐতিহাসিক গিবন্ রোমবাসীদের সম্বন্ধে এই যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা চীনদিগের সম্বন্ধেও খাটে। রোমের রাজার ন্যায় চীন-রাজকেও একাধারে বড় পুরোহিত, নাস্তিক ও পরমেশ্বর বলা যাইতে পারে।
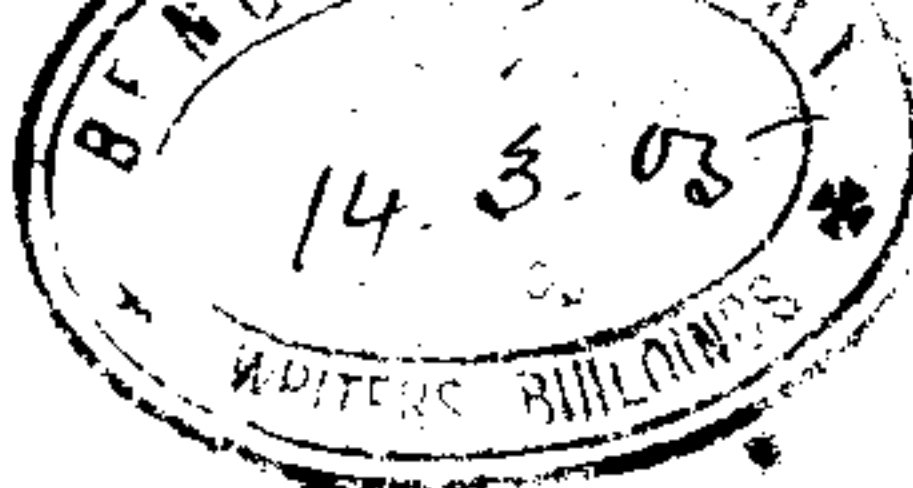
মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

ভারতী। আষাঢ়। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের "কমল কুঁয়ারের কারামুক্তি" নামক কবিতাটির বর্ণনীয় বস্তু রহস্যপূর্ণ, রমণীয়; কিন্তু লিপিকৌশলের অভাবে রচনাটি অত্যন্ত মলিন ও ব্যর্থ বলিয়া মনে হয়। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহের "পুরীর আদালতে" বিশেষত্ব নাই। শ্রীযুক্ত ধর্ম্মানন্দ ভারতীর "বাঙ্গালীর বিদেশিনীবিবাহে" অনেক নুতন সংবাদের সমাবেশ আছে। সংবাদপত্রের 'বিবিধ সংবাদে'ও অনেক সংবাদ থাকে, তথাপি তাহা প্রবন্ধ-পর্য্যায়ে পরিগণিত হয় না। ভাষায় ভাবে মন্তব্যে—প্রবন্ধটির সর্ব্বত্র অসংযত লেখনীর কলঙ্ককালিমা সুস্পষ্ট। সাময়িক পত্রে এমন অসংযম শোভা পায় না। শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র গুপ্তের "বৈদ্যজাতির ইতিবৃত্ত" কায়স্থ-বৈদ্য যুদ্ধের আর এক পালা। বৈদ্যজাতির মুখরোচক হইবে, সাহিত্যের ও সাধারণের সহিত সম্বন্ধ অল্প। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত "ভূমিকর আন্দোলনের ফলাফল" লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। 'অফল'ই পর্য্যাপ্ত, ফলের বোঁটাও দেখিতে পাইবার যো নাই। শ্রীযুক্ত জগদিন্দ্রনাথ রায়ের "ভারত-ইতিহাসের একাংশ" সুখপাঠ্য। শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ভিক্টর হুগোর "হারা ধন" নামক বিচিত্র কবিতাটি বাঙ্গালীর জন্য সংগ্রহ করিয়াছেন। দুধের স্বাদ ঘোলে মিটিবে। "প্রাচী ও প্রতীচী" প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর সুপ্রথিত "চীনেম্যানের চিঠি" হইতে সারসঙ্কলন করিয়া দিয়াছেন। এখন জানা গিয়াছে, 'জন্ চায়নাম্যান্' কল্পিত নাম, লেখক অক্স্‌ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, জাতিতে ইংরেজ। দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ! লেখক যিনিই হউন, তিনি চক্ষুষ্মান্, সহৃদয়;—এবং তাঁহার উক্তি ও মন্তব্য দিবালোকের ন্যায় সমুজ্জ্বল ও সত্য। 'চীনেম্যানের চিঠি'তে আমাদের শিখিবার ও ভাবিবার বিষয় অনেক আছে।

প্রদীপ। আষাঢ়। মলাটে দেখিতেছি, শ্রীবিহারীলাল চক্রবর্ত্তী। ইনি সম্পাদক, কি প্রকাশক, কি আর কিছু, মলাটে তাহার কোনও পরিচয় নাই। "প্রদীপ" অত্যন্ত ম্রিয়মাণ। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের চলনসই সঙ্কলন "সাগর" ভিন্ন আর কোনও প্রবন্ধই উল্লেখযোগ্য নহে। উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ না থাক, একটি উল্লেখযোগ্য কবিতা আছে। পাঠককে সে রসে বঞ্চিত করিব না। শ্রীযুক্ত ব্রজসুন্দর সান্যাল ভক্তিবিনোদের রচিত "দক্ষিণা" কবিতা-গুচ্ছের শীর্ষে প্রদত্ত হইয়াছে। মোট দশ পংক্তি পয়ার,—তাহার প্রথম দুই চরণ আবার 'যা পদ্য যা মিলে যা!' যথা,—

> "যবে মহাপ্রেমদান সমাপন করি
> হাসিমুখে সুধাইনু 'অয়ি হৃদিরাণি,"

তেলে জলে বরং মিলিতে পারে, 'করি' ও 'রাণি' কিন্তু কখনও মিলিবার নহে। দশ চরণ লিখিতে বসিয়া যখন দুই চরণে 'গোঁজামিল' দিতে হয়, তখন এ বিড়ম্বনা কেন মহাশয়? গদ্যে কি 'মহা প্রেমদান' প্রভৃতি মহাকাণ্ড নিতান্ত অচল? কবি শেষ দুই চরণে কবিতাটির দক্ষিণান্ত করিয়াছেন,—

> "তোমারে দক্ষিণা দিনু মোর 'তৃষা'খানি
> পাত হাত, লও তুলে অয়ি মনোরাণি!"

কি ভাগ্য, পাত পাতিবার হুকুম হয় নাই! আশা করি, আগামী নববর্ষে 'দক্ষিণা'র কবি 'রায় সাহেব' খেতাব লাভ করিবেন।

বরেন্দ্র দেশ।
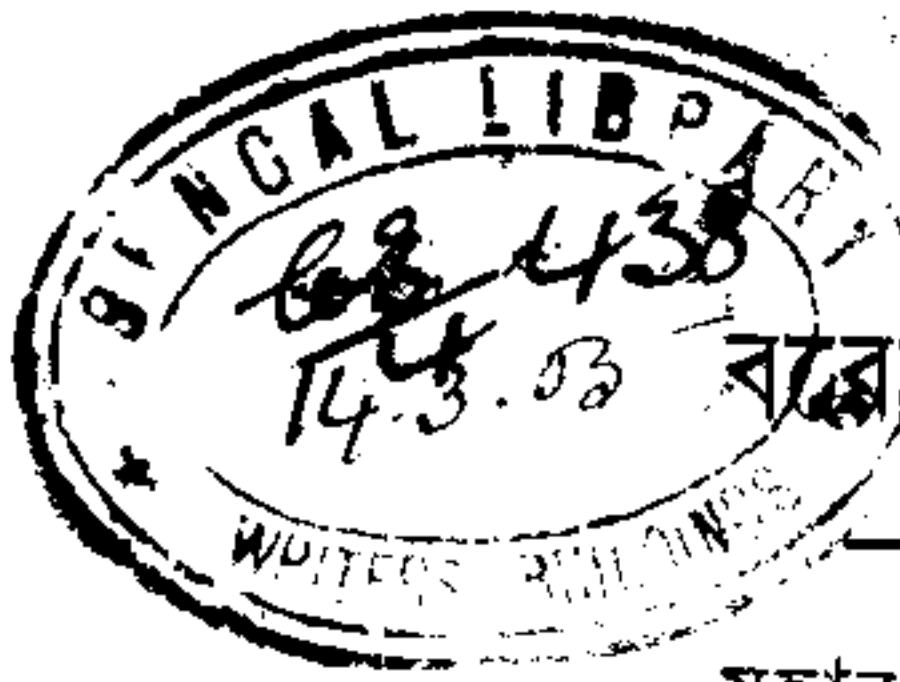
মহানন্দা নদী।

দার্জিলিঙ্ জেলায় হিমালয়ের পাদদেশ হইতে এই নদীর উদ্ভব হইয়াছে। দক্ষিণ-বাহিনী হইয়া কিছু দূর গিয়া জলপাইগুড়ি জেলার পশ্চিম প্রান্তে শিলিগুড়ি নগরকে বাম তীরে ফেলিয়া, সন্ন্যাসীকাটা নামক স্থানের নিকটে পূর্ণিয়া জেলায় প্রবিষ্ট হইয়াছে, এবং পশ্চিম-দক্ষিণে বক্র হইয়া ক্রমশঃ কৃষ্ণগঞ্জের সন্নিকটে আসিয়াছে। পুনর্ব্বার দক্ষিণ ও পূর্ব্ব-দক্ষিণ মুখে ধনুকের ছিলার ন্যায় বাঁকিয়া পূর্ণিয়া নগরকে প্রায় নয় ক্রোশ ডান দিকে ছাড়িয়া মালদহ জেলার উত্তর সীমায় আসিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছে। তৎপরে কিছু দূর উক্ত জেলার উত্তর সীমায় প্রবাহিত থাকিয়া পুনরায় দক্ষিণাভিমুখে দিনাজপুর জেলার পশ্চিম সীমা দিয়া মালদহের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে, এবং উহাকে প্রায় সমান দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া মালদহ ইংরেজ-বাজার ভোলাহাট ও নবাবগঞ্জ নগর অতিক্রম করিয়া অবশেষে রাজসাহী জেলার সীমায় চাঁদলাই পরগণাতে পদ্মা নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে।

মালদহ নগরে পশ্চিম দিক হইতে গঙ্গার একটি শাখা আসিয়া মহানন্দার সহিত মিশিয়াছে। এই শাখার বর্ত্তমান নাম কালিন্দী। কেহ কেহ কালিন্দী-গঙ্গাও বলে। মূল গঙ্গাস্রোত পূর্ণিয়া জেলার দক্ষিণে বরাবর পূর্ব্ব মুখে আসিয়া মালদহ ও পূর্ণিয়া জেলার সীমায় হায়াৎপুর নামক স্থানে একবারে মোচড় দিয়া দক্ষিণে বাঁকিয়াছে। এই বক্রতার স্থানেই কালিন্দীস্রোত গঙ্গা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে; এবং দিয়ারা অর্থাৎ নদীনির্ম্মিত কর্দ্দম ও বালুকাময় নিম্ন সমতল ভূমির মধ্য দিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া দক্ষিণপূর্ব্বাভিমুখে রতুয়া থানা অতিক্রম করিয়া অমৃতি চটীর সন্নিকটে গঙ্গারামপুরে আসিয়া উপনীত হইয়াছে।

স্থানীয় ভাষায় এই স্থানকে গঙ্গারামপুরের কাঠাল বলে। কাঠাল, অর্থাৎ জঙ্গলাকীর্ণ স্থান। গঙ্গারামপুরের কাঠালে নদীর উভয় তীরেই উচ্চ মৃত্তিকার বাঁধ দৃষ্টিগোচর হয়। নদীস্রোত এই স্থানে উত্তর-দক্ষিণাভিমুখ; তাহার পশ্চিম তীরে এক্ষণে গঙ্গারামপুর গ্রাম, এবং পূর্ব্ব তীরে কোলপুর গ্রাম। গঙ্গারামপুরের কাঠালের মধ্যে ভূগর্ভে অনেক ইষ্টক দৃষ্টিগোচর হয়; এবং ইহারই এক স্থানে স্থানীয় কৃষকেরা আজিও মহারাজা লক্ষ্মণসেনের রাজবাটী ছিল বলিয়া দেখাইয়া

দেয়। ফলতঃ, অনুসন্ধানের দ্বারা জানা যায়, এই স্থানেই কালিন্দীর উভয় তীরে পালবংশীয় রাজাদের রাজধানী গৌড় নগর অবস্থিত ছিল। নগরের যে অংশ অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত ও সমৃদ্ধ, তাহা পশ্চিম পারে অর্থাৎ গঙ্গারামপুরের দিকে অবস্থিত ছিল। পালবংশের পর এই গৌড়নগর সেনবংশীয় রাজাদের হস্তগত হয়; এবং উক্ত বংশের তৃতীয় রাজা মহারাজ লক্ষ্মণসেন কালিন্দী-গঙ্গার তীরস্থ রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া তাহার কিয়দ্দূর দক্ষিণে মূল গঙ্গাস্রোতের পূর্ব্ব তীরে 'লক্ষ্মণাবতী' নাম দিয়া এক নূতন নগর আরম্ভ করিয়াছিলেন। ফলতঃ, তাহা সম্পূর্ণ না হইতে হইতেই এই প্রদেশ তুরুস্কদের করকবলিত হইয়া গেল। ইতিহাসলেখক মিন্‌হাজ উদ্দীন জেবরজানী যে গৌড়নগরে আসিয়াছিলেন, তাহাই এক্ষণে গঙ্গারামপুরের কাঠালে পরিণত হইয়াছে।

গঙ্গারামপুর অতিক্রম করিয়া পূর্ব্বাভিমুখে কালিন্দীস্রোত নিমাসরাই ও মালদহ নগরের মধ্যে মহানন্দার সহিত মিশিয়াছে। সঙ্গমস্থানের নিম্ন হইতে মহানন্দা অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত হইয়াছে। ফলতঃ, এই স্থান হইতে মহানন্দাকে গঙ্গার শাখা বলিলেও চলে।

কালিন্দীস্রোত এক্ষণে ক্রমশঃ শুষ্ক হইয়া আসিতেছে। বর্ষায় ইহা স্ফীত হয়। কিন্তু গ্রীষ্মকালে অতীব সঙ্কীর্ণভাব ধারণ করে। হাগ্রাৎপুরের নিকট ইহার মুখ এক প্রকার বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সম্প্রতি কাটাহাদিয়ারা নামক স্থানে ইহার মুখ হইয়াছে। এই স্থানের অপর পার্শ্বেই রাজমহলের গিরিশ্রেণী।

কালিন্দী ও মহানন্দার সঙ্গমের প্রায় পাঁচ ক্রোশ উত্তরে মহানন্দার পশ্চিমতীরে পীরগঞ্জ গ্রাম। এবং এই গ্রামের নিকট পথুরিয়া নদী নামে একটি স্রোতঃ পশ্চিম দিক হইতে আসিয়া মহানন্দার সহিত মিলিত হইয়াছে। পথুরিয়া নদী এক্ষণে অতীব সঙ্কীর্ণ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু স্থানীয় পরিদর্শনে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, প্রাচীনকালে ইহাও কালিন্দীর ন্যায় গঙ্গার একটি প্রবল শাখা ছিল। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, মূল গঙ্গাই এক সময়ে এই স্থানে আসিয়া মহানন্দার সহিত মিলিত হইয়াছিল; কিন্তু তাহা না হইলেও পথুরিয়া নদী যে একদা গঙ্গার একটি প্রবল শাখা ছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই শাখার পশ্চিম মুখ এক্ষণে বুজিয়া গিয়াছে, তথাপি বর্ষাকালে গঙ্গার জলে ইহা স্ফীত হয়।

যে স্থানে পথুরিয়া নদী মহানন্দার সহিত মিলিত, তথায় শেষোক্ত নদীর পূর্ব্ব তীরে এক্ষণে একটি বিস্তীর্ণ জঙ্গলাকীর্ণ উচ্চভূমি দেখা যায়; ইহাকে স্থানীয় লোকে পাঁড়ুআর কাঠাল বলে। ফলতঃ বর্ষাকালে নদীর উপর নৌকার ছাদে

বসিয়া এই স্থানের আকৃতি অতীব বিচিত্র দেখা যায়। মনে কর, তুমি মহানন্দার উপর দিয়া দক্ষিণাভিমুখে মালদহ নগরের দিকে আসিতেছ। তোমার ডান দিকে একটি সুপ্রশস্ত, সমতল, বৃহদ্‌বৃক্ষবিহীন, নিম্ন জলাভূমি কেবল লম্বা ঘাসে সমাচ্ছাদিত হইয়া প্রসারিত রহিয়াছে, এবং জলপ্লাবিত হইয়া গিয়াছে। পশ্চিম-দক্ষিণে রাজমহলের শ্যামসুন্দর তুঙ্গ গিরিশ্রেণী সমুচ্ছ্রিত হইয়া বক্রাকারে তাহাকে বেষ্টন করিয়া আছে। আর বাম দিকে সন্নিকটে একটি ঘনতরুষণ্ডাবৃত, তরঙ্গায়িত 'শ্যামল' উচ্চ ভূখণ্ড একবারে দৃষ্টি অবরুদ্ধ করিতেছে, এবং তাহারই উপকূলে খরস্রোতে কলনাদিনী আবর্ত্তময়ী নদী অতি বহিয়া যাইতেছে! এই ভূখণ্ড কোনও কালেই জলমগ্ন হয় না। ইহার বর্ত্তমান নাম পাড়ুআ প্রাচীন 'পুণ্ড্র' নামের অপভ্রংশমাত্র। এবং এই স্থানেই প্রাচীন পুণ্ড্র দেশের রাজধানী অবস্থিত ছিল।

পীরগঞ্জের অপর অর্থাৎ পূর্ব্ব পারেই 'দীঘি' নামে একখানি গ্রাম আছে। একটি প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা হইতেই এই গ্রামের নামকরণ হইয়াছে। ইহা উত্তর-দক্ষিণে লম্বা, হিন্দুর কৃত খাত। দীর্ঘে প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ। পাহাড় যেমন প্রশস্ত, তেমনই উচ্চ; তথায় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ জন্মিয়াছে। জল আজিও ঢল ঢল করিতেছে। উত্তর দিকের পাহাড়ে কনকচম্পার জঙ্গলের মধ্যে একটি প্রকাণ্ড অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে। ইহা এক সময়ে অবশ্যই এক জন ভাগ্যবান ব্যক্তির নিকেতন ছিল।

ফলতঃ, এই দীর্ঘিকা প্রাচীন পুণ্ড্র বা তাহার উপনগরের অন্তর্গত ছিল। ইহারই নাতিদূরে মুসলমান রাজধানী পাড়ুআর ভগ্নাবশেষ সকল পড়িয়া আছে।

মহানন্দা ও গঙ্গাস্রোতের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত থাকায় পুণ্ড্র জনপদ কৃষি বাণিজ্যে অতি প্রাচীনকালেই সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। এই স্থানের মৃত্তিকা অতিশয় উর্ব্বরা; এখানে অল্প পরিশ্রমে বিবিধ শস্য অর্জ্জন করা যায়। গাছ পালা অল্প যত্নেই বৃদ্ধি পায়। নদীতে প্রচুরপরিমাণে মৎস্য জন্মে। মাঠে ও জঙ্গলে পশুপালন অতীব সুকর। গঙ্গাপথে নৌকা দ্বারা কৃষি ও শিল্পজাত পণ্য দ্রব্য বিনিময়ের পক্ষে একদা এই স্থান অতীব সুবিধাজনক ছিল। শকাব্দা-প্রবর্ত্তনের সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বে যখন বঙ্গ বা বাঙ্গলা দেশের নাম পর্য্যন্ত শ্রুত হওয়া যায় না, তখনও প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে পুণ্ড্র দেশের নাম প্রসিদ্ধ।

ভাগীরথী নদী।

দেশে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। একটি শাখা পূর্ব্ব-দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইয়া মহানন্দায় মিশিয়াছে, এবং মূল স্রোত দক্ষিণাভিমুখে বাঁকিয়া রাজমহল নগরে উত্তীর্ণ হইয়াছে। এই স্থানে গঙ্গাস্রোত চিরকালই অতীব পরিবর্ত্তনশীল হইয়া প্রবাহিত হইয়াছে। কিছু দিন পূর্ব্বে রাজমহল হইতে ইহা বর্ত্তমান মালদহ জেলার মধ্যস্থ ইনায়েৎপুর ও মিল্কীহাট গ্রামের নিম্ন দিয়া, মুসলমান রাজধানী গৌড়ের পশ্চিম প্রান্ত বিধৌত করিয়া, দক্ষিণাভিমুখে তুর্তিপুর ছাড়াইয়া,সুতী গ্রাম হইয়া মুর্শিদাবাদ জেলার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে এই পথ ছাড়িয়া ইহা রাজমহল হইতে উধুয়ানালা, এবং তথা হইতে সুতীতে উপনীত হইয়াছে। অপিচ, সুতীর পরও মূল স্রোত আর এক্ষণে ভাগীরথীর প্রাচীন পথ অনুসরণ করিতেছে না। সুতী হইতে নবদ্বীপ ও কলিকাতা পর্য্যন্ত ভাগীরথী নামক প্রাচীন মূল স্রোতঃ এক্ষণে কেবল একটি শাখাতে পরিণত হইয়াছে ; এবং সুতীর নিকট ইহার মুখ ক্রমশঃ ভরাট হইয়া যাইতেছে। মূল স্রোতঃ এক্ষণে পদ্মা নামে রাজসাহী ও পাবনার দক্ষিণে, এবং মুর্শিদাবাদ ও নদীয়ার উত্তর সীমায় প্রবাহিত ; এবং গোয়ালন্দে যমুনা নামক ব্রহ্মপুত্রের একটি প্রবল শাখার সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। তাহার পর ফরিদপুর ও ঢাকা জেলার মধ্য দিয়া কিছু দূর অতিক্রম করিয়া অবশেষে ব্রহ্মপুত্রের সহিত মিলিত হইয়া মেঘনা নাম ধারণপূর্ব্বক সমুদ্রের সহিত মিশিয়াছে।

মহানন্দার উভয় তীরে ও ভাগীরথীর পূর্ব্ব তীরে অদ্যাপি প্রাচীন পুণ্ড্র জাতির সন্তানসন্ততিগণ অধিক সংখ্যায় বসবাস করিতেছে, দেখা যায়। মহানন্দাতীরে ইহারা 'পুঁড়া' নামে, এবং ভাগরথীতীরে 'পোদ' নামে বিখ্যাত। পুঁড়ারা সাধুভাষায় আপনাদিগকে 'পুণ্ডরী'ও বলে। পোদ ও পুঁড়া একজাতীয় লোক বলিয়া আজিও গণ্য। ইহারা কখনও কখনও 'পুণ্ডরীকাক্ষ' বলিয়াও আপনাদের পরিচয় দেয়। এই জাতিরই প্রাচীন ইতিহাস বাঙ্গলার পুরাবৃত্তের আদিকাণ্ড হইতেছে। এবং ইহাদেরই প্রাচীন রাজধানী 'পুণ্ড্র' নগর বর্ত্তমান সময়ে পাঁড়ুয়ার কাঠাল নামক বিজনে পরিণত হইয়াছে।

কথিত হইয়াছে, মহানন্দা ও ভাগীরথীর প্রথম সঙ্গম স্থানে 'পুণ্ড্র' নগর অবস্থিত ছিল।—পদ্মা নামে ভাগীরথীর অপেক্ষাকৃত নিম্নবর্ত্তিনী শাখা (যাহা পূর্ব্বে সঙ্কীর্ণ ছিল, কিন্তু এক্ষণে গঙ্গার মূলস্রোতে পরিণত হইয়াছে) যথায় মহানন্দার সহিত মিলিত, এই স্থানে অতি প্রাচীনকালে চন্দেল নামে এক জনপদ অবস্থিত ছিল ; এবং সেই জনপদের কিয়দংশ এক্ষণে চাঁদলাই পরগণা বলিয়া বিখ্যাত।

এই জনপদের লোকেরা চান্দেল বা চান্দাল নামে বিখ্যাত ছিল, এবং সংস্কৃত-ভাষী ব্রাহ্মণেরা নামসাদৃশ্যে ভ্রান্ত হইয়া ইহাদিগকে 'চণ্ডাল' এই হেয় নাম প্রদান করিয়াছেন। চান্দালেরা কিন্তু আপনাদিগকে 'চণ্ডাল' বলিয়া স্বীকার করে না, এবং হিন্দুসমাজের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যদিও আপনাদিগকে 'শূদ্র' বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছে, তথাপি আপনাদের প্রাচীন প্রভুত্ব স্মরণ করিয়া ইহারা আজিও আপনাদিগকে 'নমশূদ্র' অর্থাৎ পুজনীয় শূদ্র বলিয়া পরিচয় দিতে ভালবাসে।

প্রকৃতপক্ষে চান্দালেরা প্রাচীন পুণ্ড্র জাতিরই এক শাখামাত্র। পূর্ব্ববঙ্গে এক্ষণকার ভাষায় যাহারা 'চণ্ডাল' বলিয়া কথিত হয়, তাহারা এই 'চান্দাল'-গণেরই বংশধর। বরেন্দ্র দেশেও ইহাদের সংখ্যা এক সময়ে অতীব বহুল ছিল; কিন্তু তথায় ইহারা প্রায়ই মুসলমান হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গেও ইহারা ভূরিপরিমাণে মুসলমান হইয়া গিয়াছে।

করতোয়া নদী।

কুচবিহার প্রদেশে বিলের মধ্যে এই নদীর উৎপত্তি। এবং ইহা দক্ষিণ-পূর্ব্বাভিমুখে বর্ত্তমান রঙ্গপুর ও বগুড়া জেলার মধ্য দিয়া বাঙ্গালী নদীর সহিত মিশিয়া বিবিধ স্থানীয় নাম লইয়া অবশেষে যমুনায় গিয়া পড়িয়াছে।

মহানন্দা ও করতোয়ার মধ্যবর্ত্তী ভূভাগের নাম 'বরেন্দ্র' দেশ। ভাষা কথায় ইহাকে 'বরিন্দ' বলে। আমার বোধ হয়, 'বরিন্দ' ও 'পুণ্ড্র' একই শব্দের ভিন্ন ভিন্ন আকারমাত্র। কোচ ও মেচ জাতীয় লোকের মুখে 'পুণ্ড্র' শব্দ 'বরিন্দে' পরিণত হইয়া থাকিবে। পুণ্ড্রেরা কোন দেশ হইতে স্বনামখ্যাত দেশে আসিয়া বসবাস করিয়াছিল, তাহা জানা যায় না। কিন্তু ইহা জানা যায় যে, অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে কোচ মেচ লেপচা প্রভৃতি পার্ব্বত্য জাতি-গণ হিমালয় প্রদেশ হইতে তরাই অতিক্রম করিয়া দক্ষিণাভিমুখে বরেন্দ্রের উচ্চ লোহিতবর্ণ তরঙ্গায়িত ভূখণ্ডে উপনিবেশ স্থাপন করিতে আরম্ভ করে। ইহাদের উপদ্রবে পুণ্ড্রেরা বরেন্দ্রের উত্তরাঞ্চলে প্রায় নির্ম্মূল হইয়া গিয়াছে। এবং তথায় এক্ষণে কোচজাতীয় লোকই অধিকপরিমাণে দৃষ্টিগোচর হয়।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে পুণ্ড্র দেশকে পুণ্ড্রবর্দ্ধন নামে বিখ্যাত দেখা যায়, এবং মহানন্দাতীরে 'পুণ্ড্র' নামক যেমন ইহার এক রাজধানী ছিল,—তেমনি কর-তোয়ায় ও ব্রহ্মপুত্রের একটি প্রবল শাখার মধ্যবর্ত্তী স্থানে ইহার আর একটি প্রকাণ্ড নগর ও দুর্গ অবস্থিত ছিল। ইহার নাম 'বর্দ্ধন কোট'। 'কোট'

শব্দের অর্থ 'দুর্গ'। এই বর্দ্ধন কোট এখন একটি গ্রামে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু ইহার সন্নিকটে অনেক প্রাচীন কীর্ত্তির ভগ্নাবশেষ দৃষ্টিগোচর হয়। বর্দ্ধন কোটের পুর্ব্বাংশে যে প্রবল নদী ছিল, বখ্তিয়ার খিলজীর সময়ে তাহা 'রাঙ্গামাটী' নদী বলিয়া বিখ্যাত ছিল। এই নদীর অপর পারেই তদানীন্তন কামরূপ দেশ অবস্থিত ছিল, এবং কামরূপের একাংশের নাম রাঙ্গামাটী। নদীটি এক্ষণে পূর্ব্বদিকে বহু দূর সরিয়া গিয়াছে; এবং ইহার বর্ত্তমান নাম উত্তর ভাগে 'দাওকোপা', এবং দক্ষিণ ভাগে যমুনা।—ব্রহ্মপুত্রের মূল স্রোত এক্ষণে 'দাওকোপা' ও যমুনা দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে।

মহানন্দা ও করতোয়ার মধ্যবর্ত্তী দেশের নাম পুণ্ড্র বা বরেন্দ্র দেশ। মহানন্দার অপর পারে গঙ্গার সমতল চর; করতোয়ার অপর পারে ব্রহ্মপুত্রের সমতল চর। এই উভয়-নদী-নির্ম্মিত চরভূমি অতিশয় উর্ব্বরা, এবং নানাবিধ শস্য উৎপাদন করে। বরেন্দ্রের মধ্যে উত্তর-দক্ষিণে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী প্রবাহিত থাকিয়া কৃষি বাণিজ্যের সুবিধা করিতেছে। ইহার মধ্যে পূর্ণভবা নামক নদী তীরে বর্ত্তমান দিনাজপুর নগরী অবস্থিত। দিনাজপুরের কিছু দূর নিম্নে এই নদীর তীরে পূর্ব্বকালে দেবকোট নামে একটি সমৃদ্ধ নগর ছিল। পুণ্ড্র রাজধানী হইতে দেবকোট পর্য্যন্ত একটি প্রশস্ত রাজপথ নির্ম্মিত হইয়াছিল; ইহার ভগ্নাবশেষ এখনও বিদ্যমান, এবং স্থানীয় ভাষায় 'ডোখলার বাঁধ' নামে বিখ্যাত। মহানন্দা ও পূর্ণভবার মধ্যে টাঙ্গন নামে অপর একটি নদী আছে; তাহা 'আইহাই' বা 'আইহো' নামক স্থানে এক্ষণে মহানন্দাতে পড়িয়াছে। উক্ত রাজপথ যে স্থানে টাঙ্গন নদী অতিক্রম করিয়াছিল, ঐ স্থানকে এক্ষণে রাণীগঞ্জ বলে। তথায় একটি ক্ষুদ্র দুর্গের ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের লক্ষ্মণাবতী লুণ্ঠন করিয়া বখ্তিয়ার খিলজীর তুরুষ্ক সৈন্যগণ এই পথেই প্রধাবিত হইয়া দেবকোটে উত্তীর্ণ হয়; এবং কিছু কালের জন্য উক্ত নগরে মুসলমানদের জয়স্কন্ধাবার স্থাপিত হয়। দেবকোট অধিকার করিয়া মুসলমানেরা বর্দ্ধনকোটে পঁহুছেন। এই সকল বিবরণ পরে যথাস্থানে সবিস্তার লিখিত হইবে।

বর্দ্ধন কোটের নাতিদূরে করতোয়ার উজানে ঘোড়াঘাট নগর। ইহা মুসলমান রাজত্বের সময় একটি প্রসিদ্ধ স্থান ছিল। এখানে রাজ্যের পূর্ব্বসীমা শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য এক জন মুসলমান সেনানায়ক সসৈন্যে অবস্থান করিতেন। সম্প্রতি ঘোড়াঘাট একটি সামান্য গ্রামমাত্র।

ঘোড়াঘাটের প্রায় ৮ ক্রোশ ভাটিতে করতোয়ার পশ্চিম তীরে বর্ত্তমান বগুড়া জেলার মধ্যে মহাস্থান গড় নামে একটি প্রসিদ্ধ প্রাচীন স্থান দেখা যায়। ইহার গড়বেষ্টন মুসলমান আমলের। ঐ সময়ে ইহা একটি দুর্গে পরিণত হয়; কিন্তু তৎপূর্ব্বে উহা একটি হিন্দু তীর্থস্থানমাত্র ছিল। এই প্রদেশে একদা বৌদ্ধধর্ম্ম অতীব প্রবল ছিল; এবং অনেক শীলসম্পন্ন ও বিদ্বান্ বৌদ্ধ পরিব্রাজকের এই স্থানে সমাগম হওয়ায় ইহার পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশ 'শীলবর্ষ' নামে, এবং ইহা 'শীলদ্বীপ' নামে বিখ্যাত হয়। ইহার দ্বীপ নামের হেতু এই যে, ইহার উত্তরে করতোয়া নদীর একটি শাখা নির্গত হইয়া আবার কিছু দুর নিম্নে তাহার সহিত মিলিত হইয়াছে, এবং স্থানটি এইরূপ জলবেষ্টিত ছিল। লিপিকর-প্রমাদ-বশতই হউক, অথবা অপভ্রংশবশতই হউক, কোনও কোনও আধুনিক সংস্কৃত গ্রন্থে 'শীলদ্বীপ' 'শীলাদ্বীপ' এই আকারে লিখিত হইয়াছে। তজ্জন্য কেহ কেহ ইহাকে শীলাদ্বীপও বলে। এই স্থানে করতোয়া নদীর তীরে চারিটি বৌদ্ধ স্তূপ ছিল। ইহার সর্ব্বোত্তরের স্তূপটি আজিও বর্ত্তমান আছে। ১৮১৭ শকাব্দে আমি যখন এই স্থান দর্শন করি, তখন এই স্তূপের শিখরদেশে একটি বৈরাগীর কুটীর নির্ম্মিত হইয়াছে, দেখিয়াছিলাম। স্থানীয় মুসলমান কৃষকেরা আমাকে বলিল যে, এই সকল স্তূপে এক সময়ে মুনিরা বাস করিতেন। জনপ্রবাদে এইরূপে পুরাবৃত্তের আভাস বিদ্যমান রহিয়াছে। মহাস্থানের চারিটি স্তূপের মধ্যে যেটি সকলের দক্ষিণে, উহাতে বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতির সময়ে এক শিবালয় নির্ম্মিত হয়, এবং তন্মধ্যে একটি প্রকাণ্ড শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হয়। শৈবধর্ম্ম এইরূপে বৌদ্ধধর্ম্মের স্থান অধিকার করিল। মহাস্থানের আশ পাশ গ্রামে বহুসংখ্যক শিবলিঙ্গ দৃষ্টিগোচর হয়। তদ্ভিন্ন করতোয়াতীরে পরস্পর প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ ব্যবধানে আর দুইটি প্রসিদ্ধ দেবমন্দির ছিল। একটিতে স্কন্দ বা কার্ত্তিকেয়-মূর্ত্তি, অপরটিতে গোবিন্দের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। স্কন্দ ও গোবিন্দের মধ্যবর্ত্তী করতোয়া স্রোত একটি মহা তীর্থস্থান বলিয়া পরিগণিত ছিল; ছিল কেন, আজিও আছে। মধ্যে মধ্যে পৌষমাসে নারায়ণী যোগ নামক শুভক্ষণে এই তীর্থে স্নান করিবার জন্য দেশ বিদেশ হইতে বহুসংখ্যক হিন্দুর সমাগম হইয়া থাকে।

বৌদ্ধ স্তূপের উপর যে শিবলিঙ্গ স্থাপিত হইয়াছিল, তাহার দশা স্মরণ করিলে হিন্দুমাত্রকেই বিশেষ দুঃখিত হইতে হয়। শিবালয় এক্ষণে শা-সুলতান নামক এক মুসলমান পীরের আস্তানায় পরিণত হইয়াছে; শিবলিঙ্গের ভগ্ন গৌরীপট্ট তাহার দ্বারদেশে পড়িয়া আছে। ব্রাহ্মণেরা যাহা তীর্থোদকে অভিষিক্ত করিয়া

পূজা করিতেন—আস্তানের মুসলমান খাদিম এক্ষণে তাহার উপর পদধৌত করিয়া থাকে, এবং শুনিতে পাই, তাহা সময়ে সময়ে গোরক্তেও অভিষিক্ত হয়। প্রাচীন মন্দিরের সন্নিকটে এক্ষণে একটি মুসলমান মস্‌জিদ্‌ নির্ম্মিত হইয়াছে; তথায় পাঁচ ওক্‌ত নমাজ পঠিত হইয়া থাকে।—ফলতঃ, এই মহাস্থানের বক্ষে বাঙ্গলার ইতিহাস মুদ্রাঙ্কিতের ন্যায় রহিয়াছে। শিবের তাড়নায় যে স্থান হইতে একদা বুদ্ধ পলায়ন করেন—আবার মহম্মদের ভ্রূকুটীদর্শনে শিবকেও সে স্থান ত্যাগ করিতে হইয়াছে। স্কন্ধ ও গোবিন্দের মন্দিরের এক্ষণে চিহ্নমাত্র নাই; কিন্তু ঐ দুই মন্দিরের স্থান হিন্দুদের স্মৃতিতে এখনও জাগরূক আছে। পৌষনারায়ণী যোগের স্নানের সময় আজিও ঐ দুই স্থান নিশ্চিতরূপে প্রদর্শিত হইয়া থাকে।

পুণ্ড্রদেশের প্রাচীন ইতিহাস।

কথিত হইয়াছে, পুণ্ড্রের ইতিহাসই বাঙ্গলার পুরাবৃত্তের আদিকাণ্ড। পুণ্ড্রের পশ্চিমে প্রাচীন মিথিলা প্রদেশ; এবং গঙ্গার অপর পারে পশ্চিম-দক্ষিণে মগধরাজ্য অবস্থিত ছিল মগধ কি মিথিলাকে বাঙ্গলা দেশের অন্তর্গত বলিয়া বিবেচনা করা যায় না;—এবং ঐ দুই রাজ্যের ইতিহাস ও বাঙ্গলার ইতিহাস পরস্পর বিভিন্ন বলিয়াই বিবেচিত হইবার যোগ্য। পুণ্ড্রের ভাষা বাঙ্গলা, মগধ ও মিথিলার ভাষা মাগধী ও মৈথিলী হিন্দী। ভাষার পার্থক্যে জাতির পার্থক্য সূচিত হয়; এবং যদিও সময়ে সময়ে ভিন্ন ভিন্ন জাতি একই রাজার অধীন হয়, তথাপি তাহাতে তাহাদের জাতীয় অস্তিত্ব বা ইতিহাসের বিভিন্নতা বিনষ্ট হয় না।

যৎকালে মানবধর্ম্মশাস্ত্র নামক স্মৃতিগ্রন্থ সংকলিত হইয়াছিল—তখন পুণ্ড্রক-গণ অর্থাৎ পুণ্ড্রদেশের শাসনকর্ত্তারা শূদ্রভাবাপন্ন ক্ষত্রিয় জাতি বলিয়া আর্য্য-সমাজে পরিগণিত ছিল। ইহাদের মধ্যে বহুকাল ব্রাহ্মণের অদর্শন হেতু বৈদিক ক্রিয়াকলাপ লুপ্ত হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইত;—তাহাতে তৎকালে ইহারা যে ব্রাহ্মণের অযাজ্য ছিল, ইহাই সূচিত হয়।

বস্তুতঃ, আজিও পুঁড়া, পোদ ও চান্দালেরা উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণের যজমান হইতে পারে নাই। ইহারা এক্ষণে ব্রাহ্মণ পাইয়াছে, কিন্তু সেই ব্রাহ্মণেরা পতিত বলিয়া গণ্য।

খৃষ্ট-পূর্ব্ব ৪২৫ অব্দে প্রসিদ্ধ শূদ্র ভূপতি মহারাজা নন্দ মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন বিষ্ণুপুরাণের প্রমাণ অনুসারে তাহার ১০১৫ বৎসর

পূর্ব্বে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তদনুসারে খৃষ্ট-পূর্ব্ব ১৪৪০ অব্দ কুরুক্ষেত্রের মহাসমরের সময় বলিয়া নির্ণীত হইতেছে। এই সময়ে দেবকীনন্দন কৃষ্ণ বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহার অসামান্য পুরুষকারদর্শনে তদীয় সমকালীন লোকে তাঁহাকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া পূজা করিয়াছিল। মগধরাজ জরাসন্ধ তাঁহার এক জন পরম শত্রু ছিলেন; এবং পুণ্ড্রাধিপতিও তাঁহার এক জন বিপক্ষ ছিলেন। কথিত আছে, এই সময়ে পুণ্ড্রদেশের এক জন নরপতিও স্বকীয় দেশে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া পূজিত হইয়াছিলেন। পুরাণে এই নরপতির নাম পৌণ্ড্রক বাসুদেব। তিনিও কৃষ্ণের ন্যায় বিষ্ণু-চিহ্ন সকল ধারণ করিয়াছেন শুনিয়া কৃষ্ণের ক্রোধানল প্রদীপ্ত হইয়াছিল।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের ন্যূনাধিক এক শত বৎসর পূর্ব্বে কীকট বা প্রাচীন মগধের সন্নিকটবর্ত্তী কোনও প্রদেশে, সম্ভবতঃ শোণ নদের পশ্চিমে বর্ত্তমান ভোজপুর নামক প্রদেশে, কুশিকবংশাবতংস গাধিপুত্র মহর্ষি বিশ্বামিত্র বিদ্যমান ছিলেন।— তিনি ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও ব্রাহ্মণের বৃত্তি অবলম্বন করেন; তিনি বেদশাস্ত্রের এক জন প্রসিদ্ধ অধ্যাপক বলিয়া অঙ্গীকৃত হইয়াছিলেন; এবং নিজেও বহুসংখ্যক ঋক্-সূক্তের রচনা করিয়াছিলেন।

কথিত আছে, বিশ্বামিত্রের এক শত পুত্র ছিল; এবং তদ্ভিন্ন তদীয় পরিষদে আরও অনেক ছাত্র অধ্যয়ন করিত। এই শেষোক্ত ছাত্রবৃন্দের মধ্যে শুনঃশেপ নামে একটি দরিদ্র ঋষিপুত্র ছিল। তাহার পিতামাতা অর্থকৃচ্ছ্রতানিবন্ধন তাহাকে নরবলি দিবার জন্য বিক্রয় করে; কিন্তু বিশ্বামিত্র তাহার প্রাণরক্ষা করিয়া তাহাকে আপন গৃহে আনয়ন করেন, এবং তাহার দেবরাত অর্থাৎ 'দেবদত্ত' এই নাম স্থাপন করেন। দেবরাতের নৈসর্গিক ধীশক্তি অতি উৎকৃষ্ট ছিল, এবং তিনিও অবশেষে এক জন ঋষি বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। দেবরাতের গুণে আকৃষ্ট হইয়া বিশ্বামিত্র কেবল তাঁহাকে পুত্র বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, প্রত্যুত তাঁহাকেই জ্যেষ্ঠ পুত্রের পদ ও অধিকার অর্পণ করিয়া আপন ব্রহ্মজ্ঞান পরম্পরাক্রমে অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য তাঁহার হস্তে ন্যস্ত করেন। তিনি আপন শত পুত্রকে আহ্বান করিয়া দেবরাতের প্রাধান্য স্বীকার করিতে বলিলে পুত্রেরা দুই ভাগে বিভক্ত হইল। মধুচ্ছন্দা প্রভৃতি পঞ্চাশ পুত্র পিতৃ-আজ্ঞা পালন করিতে স্বীকৃত হইল, কিন্তু অপর পঞ্চাশ পুত্র তাহাতে স্বীকৃত হইল না। তাহাতে বিশ্বামিত্র ক্রুদ্ধ হইয়া এই শেষোক্ত পুত্রগণকে অবাধ্য বলিয়া তাড়াইয়া দিলেন। ইহারা পিতৃস্থান হইতে এইরূপে নিঃসারিত হইয়া

নানা স্থানে গমন করিল। তন্মধ্যে কেহ কেহ পুণ্ড্রদেশে গিয়া বসতি করিল।

এই পুরাবৃত্ত ঋগ্বেদের ঐতরেয় ব্রাহ্মণে সংরক্ষিত হইয়াছে; এবং আমার যত দূর দৃষ্টি, তাহাতে ইহার পূর্ব্বে পুণ্ড্রদেশঘটিত আর কোন কথাই লিপিবদ্ধ হয় নাই। ফলতঃ, খৃষ্টপূর্ব্ব ষোড়শ শতাব্দীর কথাও স্বল্প প্রাচীন নহে। ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, এক্ষণকার সময়ের সার্দ্ধ ত্রিসহস্র বৎসর পূর্ব্বেও পুণ্ড্রজাতি এবং পুণ্ড্রদেশ বর্ত্তমান ছিল।

পুণ্ড্রেরা তখন ব্রাহ্মণগণের অযাজ্য ও বর্ব্বর বলিয়া পরিগণিত ছিল সত্য, কিন্তু তখন হইতেই ব্রাহ্মণসন্তান বৃত্তিকর্ষিত হইলে পুণ্ড্রে আসিয়া বসতি করার সূত্রপাত হইয়াছিল, দেখা যায়। পুণ্ড্রদেশ যজ্ঞীয় দেশ বলিয়া তৎকালে পরিগণিত না হইলেও, অল্পে অল্পে দ্বিজাতিসভ্যতার আলোক তথায় প্রবিষ্ট হইতেছিল। এবং পুণ্ড্রক বাসুদেবের বিবরণে অবগত হওয়া যায় যে, পুণ্ড্রে উপনিবিষ্ট হীনযাজক ব্রাহ্মণেরা এতদ্দেশে বিষ্ণুপূজা প্রবর্ত্তিত করিয়াছিল। বিষ্ণু উপাস্য দেবতা বলিয়া পরিগণিত না হইলে পুণ্ড্ররাজ আপনাকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া খ্যাপন করিতেন না।

দ্বিজাতিসমাজের সহিত পুণ্ড্রকসমাজের প্রধান বৈলক্ষণ্য এই যে, শেষোক্ত সমাজে চাতুর্ব্বর্ণ্য প্রবর্ত্তিত হয় নাই। পুণ্ড্রকদের মধ্যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রের ভেদ ছিল না; তাহাদের বংশধরগণের মধ্যে আজিও নাই। বৃত্তিভেদে জাতিভেদ তাহাদের মধ্যে অঙ্গীকৃত হয় নাই। বর্ত্তমানকালীন কোনও উরাওঁ যেমন একই জাতির দুই শ্রেণীমাত্র, তেমনই পুণ্ড্রদের মধ্যে পুণ্ড্র চান্দাল ইত্যাদি অবান্তর শ্রেণীবিভাগ ছিল; কিন্তু তাহাদের মধ্যে এক জন ব্রাহ্মণ এক জন ক্ষত্রিয় ও এক জন বৈশ্য এরূপ বিভাগ, অথবা ব্রাহ্মণের সন্তান ক্ষত্রিয়ের কার্য্য করিতে পারিবে না, কি ক্ষত্রিয়সন্তান ব্রাহ্মণের কার্য্য করিতে পারিবে না, এরূপ নিয়ম কোনও কালেই প্রবর্ত্তিত হয় নাই। তাহাদের মধ্যেও দেবদেবীর উপাসনা ছিল। তবে সে সকল দেবদেবীর সহিত বৈদিক দেবদেবীর কোনও সাদৃশ্য ছিল না, এবং উপাসনাপদ্ধতিও ভিন্ন ছিল;—তাহাতে বেদপাঠ বা ব্রাহ্মণ ঋত্বিকের প্রয়োজন ছিল না। চব্বিশ পরগণা অঞ্চলের পুণ্ড্রসন্তানদিগকে ‘দক্ষিণ রায়’ নামক এক দেবতাকে পূজা করিতে আজিও দেখা যায়। কালী, শীতলা, মনসা ইত্যাদি দেবতারাও তাহাদের আদিম দেবতা বলিয়া বোধ হয়। তাহারা আপনাদের স্বতন্ত্র পদ্ধতি অনুসারে এই সকল দেবতার পূজা করিত, এবং ভূমিজদের মধ্যে

'লামার' ন্যায় তাহাদের মধ্যে এক প্রকার পূজকশ্রেণী ছিল, ইহাও সম্ভব। ডোম জাতির মধ্যে যেমন 'পণ্ডিত' দেখা যায়, সেই পূজকেরা তদ্রূপ ছিল; কিন্তু ব্রাহ্মণ-দের ন্যায় তাহারা এক জাতিতে পরিণত হয় নাই। ফলতঃ, এক্ষণকার কালে সাঁওতালসমাজকে যে অবস্থায় দেখা যায়, প্রাচীন পুণ্ড্র সমাজের অবস্থাও তদ্রূপই ছিল; তবে পুণ্ড্রেরা কৃষি বাণিজ্যের উন্নতিসাধন করিয়া আপনাদের এক স্বতন্ত্র রাজত্ব স্থাপিত করিয়াছিল, এবং আর্য্যসাম্রাজ্যের পূর্ব্বপ্রান্তবর্ত্তী একটি চাতুর্ব্বর্ণ্য-বহির্ভূত স্বতন্ত্র জাতি বলিয়া পরিগণিত ছিল।

কৈবর্ত্ত প্রভৃতি জাতিচক্র।

প্রাচীন আর্য্য সাম্রাজ্যের অব্যবহিত পূর্ব্বভাগে অবস্থিত থাকাতে অতি প্রাচীন-কালে বাঙ্গলা দেশে যে সকল জাতীয় লোক বাস করিত, তন্মধ্যে পুণ্ড্রেরাই দ্বিজাতি-গণের সমধিক পরিচিত হইয়াছিল; কিন্তু তাহাদের পূর্ব্বদেশে পুণ্ড্রদের ন্যায় স্বাধীন অন্যান্য জাতির লোকও যে বাস করিত, তাহার স্পষ্ট উপলব্ধি হয়। এই সকল জাতির মধ্যে কৈবর্ত্ত ও বাগ্দীদিগকেই প্রধান বলিয়া গণ্য করিতে হয়। কোচদিগকে বাঙ্গলা দেশের প্রাচীন অধিবাসী বলিয়া গণ্য করা যায় না। ইহারা অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে এতদ্দেশের উত্তরভাগ অধিকার করিয়া তথায় বসবাস করিয়াছে। কিন্তু কৈবর্ত্ত ও বাগ্দীরা পুণ্ড্র ও চান্দালদের ন্যায় বাঙ্গলা দেশের এক একটি প্রাচীন স্বাধীন জাতি। মেদিনীপুর, হুগলী ও হাবড়া অঞ্চলের কৈবর্ত্তজাতীয় লোক সমধিকপরিমাণে দেখা যায়। ছোটনাগপুর বিভাগের গিরিশ্রেণী হইতে শিলাবতী ও দারুকেশ্বর নামে দুইটি নদী উদ্ভূত হইয়া মেদিনী-পুর ও হুগলী জেলার সীমায় ঘাঁটাল বন্দরের সন্নিকটে মিলিত হইয়া রূপনারায়ণ নাম পরিগ্রহ করিয়াছে; এবং তাম্রলিপ্ত বা তমলুক নগর এড়াইয়া গেঁওখালি বন্দরে এক্ষণে গঙ্গাস্রোতের সহিত মিলিত হইয়াছে। এই রূপনারায়ণ নদের উভয়তীরবর্ত্তী জনপদ সকলেই প্রাচীন কৈবর্ত্তগণ স্বতন্ত্রভাবে বাস করিত। ইহাদের জাতীয় নাম 'কেওট';—ব্রাহ্মণেরা সংস্কৃত করিয়া তাহা 'কৈবর্ত্তে' পরি-ণত করিয়াছেন। চণ্ডালের ন্যায় কৈবর্ত্তও কল্পিত নামমাত্র। অতি প্রাচীনকালে সমুদ্রের একটি খাড়ী তমলুক পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল; এবং তমলুকই প্রাচীন 'কেওট' রাজধানী। এই স্থানের চতুষ্পার্শ্বের কেওটেরা কৃষি বাণিজ্যের উৎকর্ষসাধন দ্বারা অতি প্রাচীন কালেই বিশেষ সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়া উঠে। ইহারা নৌকা দ্বারা সমুদ্রে গতিবিধি করিত। এবং অর্ণবপোত নির্ম্মাণ করিয়া উপকূলের নিকটে

নিকটে দক্ষিণাভিমুখে সিংহল পর্য্যন্ত গতিবিধি করিত। তজ্জন্যই কেওটের সংস্কৃত প্রতিশব্দ কৈবর্ত্তের 'কে জলে বর্ত্তন্তে ইতি কৈবর্ত্তাঃ' এইরূপ ব্যুৎপত্তি করা হইয়া থাকে। ফলতঃ, ইহারা নৌকাচালনেও যেমন দক্ষ, হলচালনেও তাদৃশ কুশল ছিল। এবং বাঙ্গালীদের মধ্যে কৈবর্ত্তেরা অতি প্রাচীনকালেই উচ্চ স্থান অধিকার করে। পুণ্ড্রদের ন্যায় ইহাদের মধ্যেও চাতুর্ব্বর্ণ্যের অস্তিত্ব ছিল না। অশোকের অনুশাসনলিপিতে 'কেবট'দের নাম শ্রুত হওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে অনেকেই নৌকাযোগে জাল দ্বারা সমুদ্রে ও প্রকাণ্ড নদীতে মৎস্য শিকার করিত বলিয়া, ঐরূপ বৃত্তি কালে 'কেবট' বা 'কেওট'দের জাতিবৃত্তি বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। 'কেওট' রাজধানী তমলুক যে এক সময়ে বিশেষ সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল, তাহার অনেক নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। কালুরায় নামে একটি বিশেষ দেবতার উপাসনা আজিও ইহাদের মধ্যে প্রচলিত আছে, দেখা যায়।

ভাগীরথীর পূর্ব্ব দিকে পুণ্ড্রদেরই সমধিক আধিপত্য ছিল। পশ্চিমে বাঙ্গলার দক্ষিণ প্রান্তে রূপনারায়ণের উভয় তীরে যেমন কেওটেরা প্রবল ছিল, তেমনই তাহাদের উত্তর দিকে দারুকেশ্বর ও দামোদর নদের মধ্যবর্ত্তী ভূখণ্ডে বাগদী জাতির স্বাতন্ত্র্য দেখা যায়। বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান ও হুগলী জেলার পশ্চিমখণ্ডে একদা বাগদীদের একটি প্রবল রাজত্ব বহুদিন অক্ষুণ্ণভাবে ছিল। বিষ্ণুপুর এই রাজ্যের রাজধানী। 'বাগদী' ইহাদের জাতীয় নাম। বিষ্ণুপুরের রাজবংশের ইতিহাসে ইহাদের আধিপত্যের ইতিহাস কিয়ৎপরিমাণে সংরক্ষিত হইয়াছে।

বাগদীভূমির উত্তরে 'গোপভূমি'। এই গোপেরাই বাঙ্গলা দেশের আর্য্যজাতীয় আদিম ঔপনিবেশিক বলিয়া বোধ হয়। বর্দ্ধমানের কিয়দংশ, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলাতে গোপ ঔপনিবেশিকেরা প্রাধান্য লাভ করিয়া একটি গোপরাজ্যের সৃষ্টি করিয়াছেন। বাঙ্গলা দেশের এই অংশের নাম 'রাঢ়' বা 'লাঢ়' দেশ। এবং সংস্কৃতে ইহা কখনও কখনও 'লাট' বলিয়াও কীর্ত্তিত হইয়াছে, দেখা যায়। রাঢ়ের পশ্চিমে ছোটনাগপুর বিভাগের ও সাঁওতাল প্রদেশের যে গিরিশ্রেণী দেখা যায়, তাহারই অপর পারে প্রাচীন মগধ রাজ্য অবস্থিত ছিল। প্রোক্ত পার্ব্বতীয় প্রদেশে সাঁওতাল কোল প্রভৃতি নিষাদ শ্রেণীর দরিদ্র বর্ব্বরজাতীয় লোক যেমন এক্ষণে, তেমন পূর্ব্বকালেও বিদ্যমান ছিল।—কৃষিকার্য্যের তাদৃশ সুবিধা না থাকায় মগধের গোপেরা এই পার্ব্বতীয় দেশ অতিক্রম করিয়া তাহার পূর্ব্বভাগে রাঢ়ের উর্ব্বর ক্ষেত্রে আপনাদের জনপদ সকল স্থাপিত করিয়াছিল। ইহারা বহুলপরিমাণে রাঢ়ের পূর্ব্বতম আদিম অধিবাসীদের সহিত

মিশিয়া যাওয়ায় অপকৃষ্ট জাতি ও ব্রাহ্মণের অযাজ্য বলিয়া পরিগণিত হয়; কিন্তু ইহাদের মধ্যে উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা তদ্রূপ মিশ্রিত না হওয়ায় 'সদ্গোপ' এই নাম লাভ করিয়াছে, এবং তাহারা সমধিক উৎকৃষ্ট জাতি এবং ব্রাহ্মণের যজমান বলিয়া অঙ্গীকৃত হইয়া থাকে।

বাঙ্গলা দেশের কৃষক শ্রেণীর লোকের মধ্যে রাঢ়দেশীয় গোপেরাই আর্য্যবংশ-সম্ভূত। ইহারা কৃষিকার্য্যে বিশেষ দক্ষ; বোধ হয়, বাঙ্গলা দেশের অপর কোন জাতীয় কৃষকই কৃষিকার্য্যে সদ্গোপদের সমকক্ষ নহে। কৃষিকার্য্য কেন? বিদ্যা বুদ্ধিতেও কৃষিব্যবসায়ী বঙ্গদেশীয় কোনও জাতিই সদ্গোপদের সমকক্ষ নহে।

পোদ, চান্দাল, কোচ, কৈবর্ত্ত, বাগ্দী, এক্ষণে সকলেই বাঙ্গলা ভাষায় কথাবার্ত্তা কহে। কিন্তু ঐ সকল জাতিদের আদি ভাষা বাঙ্গলা ছিল না। ইহাদের মধ্যে যেরূপ বাঙ্গলা আজিও প্রচলিত, তাহাতে বহুবিধ অদ্ভুত শব্দ মিশিয়া গিয়াছে। 'কেওট' ভাষায় বালককে 'পড়াক্' বলে; এবং শব্দরূপকালে বহুবচনে 'মনে' বিভক্তি প্রযুক্ত হয়। তাহাতে সাধারণ বাঙ্গলায় যথায় 'ছেলেরা' বা 'বালকেরা' বলা যায়, তমলুক অঞ্চলের কেওটেরা তথায় 'পড়াক্মনে' বলে। ইহাতেই বলা যায় যে, ইহাদের আদিম ভাষা বাঙ্গলা ছিল না। কিন্তু সদ্গোপদের ভাষা বিশুদ্ধ বাঙ্গলা। বাঙ্গলা ভাষায় সাহিত্য প্রথমে রাঢ় দেশেই উৎপন্ন। বাঙ্গলার এক্ষণে যিনি আদিকবি বলিয়া পরিগণিত, সেই চণ্ডীদাস এক জন রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ। বাঙ্গলা দেশের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে রাঢ়ভূমিতেই সমধিকপরিমাণে বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণের বসবাস ঘটিয়াছিল। আর্য্যজাতীয় কৃষকেরা এই প্রদেশে উপনিবিষ্ট হওয়াতেই তথায় সর্ব্বাতিরেকে ব্রাহ্মণসমাগম আরব্ধ হয়। এবং এই স্থানেই বাঙ্গালী জাতির সংস্কৃতমূলক প্রাকৃত ভাষা প্রথমে সর্ব্বসাধারণ লোকের ভাষায় পরিণত হইয়াছিল, বিবেচনা হয়। রাঢ়ের পশ্চিম প্রান্তে ভাগীরথীতীরে নবদ্বীপে বাঙ্গলা দেশের এক নূতন রাজধানী ক্রমশঃ আবির্ভূত হইলে রাঢ়ের গৌরব আরও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়স্থাপনের পূর্ব্বে নবদ্বীপই বাঙ্গলার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান বিদ্যাস্থান বলিয়া বহু শতাব্দী ব্যাপিয়া পরিগণিত ছিল। নবদ্বীপেই বাঙ্গলার, হিন্দু রাজবংশের স্বাধীনতা-সূর্য্য অস্তমিত হয়।

পুণ্ড্রেরা কোন সময়ে বাঙ্গলা ভাষা গ্রহণ করে, তাহা জানা যায় না। তবে ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে গোপজাতীয় আর্য্যদের সহিত, এবং মহানন্দার পশ্চিম তীরে মিথিলাদেশীয় আর্য্যদের সহিত যখন তাহাদের পরিচয় ও কারকারবারের সূত্রপাত হয়, তখন হইতেই তাহারা ক্রমশঃ বাঙ্গলা ভাষা গ্রহণ করিতে আরম্ভ

করে। এক্ষণে সাঁওতালেরা যেমন দ্বিভাষী, অর্থাৎ বাঙ্গালীদের সহিত কথাবার্ত্তা কহার সময়ে বাঙ্গলাতে, এবং আপনাদের মধ্যে ঠারে কথা কহে, তদ্রূপ পুণ্ড্রেরাও আর্য্যসম্পর্কে প্রথমে আর্য্যজাতীয় ঔপনিবেশিকগণের সহিত আলাপস্থলেই বাঙ্গলা শব্দ ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। অবশেষে পুণ্ড্রদেশেও আর্য্যাধিপত্য বিস্তৃত হইলে বাঙ্গলাই তথায় চলিত ভাষা হইয়া গেল।

পুণ্ড্রনগরকে বাঙ্গলা দেশের 'বৌদ্ধ' রাজধানী, এবং নবদ্বীপকে 'ব্রাহ্মণ' রাজধানী বলিলেও চলে। বাঙ্গলার সর্ব্বত্রই এক সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত ধর্ম্ম ছিল। এবং বৌদ্ধ প্রচারকদের ভাষা মাগধী বা পালী নামক প্রাকৃত ভাষা ছিল। চাতুর্ব্বর্ণ্যবাদী অদৃশ্যদেবোপাসক ব্রাহ্মণেরা বঙ্গদেশের অধিবাসিগণের মধ্যে যাদৃশ সমাদৃত না হইয়াছিল, সাম্যবাদী প্রতিমাপূজক বৌদ্ধেরা তদপেক্ষা অধিকপরিমাণে লোকের চিত্তাকর্ষণ করিতে সমর্থ ছিল। বৌদ্ধ প্রচারকগণের দ্বারাই আর্য্যজাতির সভ্যতা বাঙ্গলা দেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এবং সর্ব্বসাধারণ লোকের মজ্জাগত হইতে সমর্থ হইয়াছে। বৌদ্ধ ভিত্তির উপরেই ব্রাহ্মণদের দ্বারা বাঙ্গলা দেশের হিন্দুয়ানী গঠিত হইয়াছে। অতএব বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণদের ইতিহাসবিষয়ক স্থূল স্থূল কথা অতঃপর বলা আবশ্যক হইবে। (১)

উমেশচন্দ্র বটব্যাল।

আকবর শাহ।

আকবর বৈরাম খাঁর অধীনে পাঁচ বৎসর কাল শিক্ষানবিশী করিয়া এবং সাত বৎসর কাল দুরাকাঙ্ক্ষ রাজপুরুষগণের বিদ্রোহদমনে ব্যাপৃত থাকিয়া, ১৫৬৬ খৃষ্টাব্দে রাজত্বের প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত করিলেন। এই বার দ্বিতীয় অধ্যায়ের আরম্ভ।

বাদশাহ সমগ্র ভারতের প্রকৃতিপুঞ্জ ও রাজন্যবৃন্দকে প্রীতির মোহন মন্ত্রে সম্মিলন-সূত্রে গ্রথিত করিয়া এক সার্ব্বভৌম সাম্রাজ্যের ভিত্তিপত্তন করিবার মনন করিলেন। তিনি প্রতিভাবলে দেখিতে পাইলেন যে, এই সার্ব্বভৌম সাম্রাজ্যের

(১) বাঙ্গালীর দুর্ভাগ্যবশতঃ বাঙ্গালার পুরাবৃত্তের এই সূচনামাত্র লিপিবদ্ধ করিয়াই পূজ্যপাদ বটব্যাল মহাশয় লোকান্তরিত হইয়াছেন।—সাহিত্য-সম্পাদক।

কর্ণধার ভারতবর্ষের হিন্দু নরপতি ও প্রজাগণ কর্তৃক কেবলমাত্র অধিনেতৃরূপে গৃহীত হইলে অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে না, তাঁহাকে ভারতবর্ষের অস্থি মজ্জার সহিত মিশ্রিত হইয়া জাতীয় অধিনেতার স্থায় প্রতীয়মান হইতে হইবে। ইহা একান্ত দুরূহ সমস্যা। বিগত সার্দ্ধ তিন শতাব্দীর মোসলমান নরপতিগণ কখনও এ দিকে মনোনিবেশ করেন নাই। তাঁহারা সামরিক বলেই ভারতবর্ষে আধিপত্য করিয়াছেন, এবং তাহার হ্রাসবৃদ্ধিতেই বারংবার রাজবিপ্লব সংঘটিত হইয়াছে।

আকবর প্রথমতঃ খণ্ডরাজ্যসমূহ জয় করিয়া সমগ্র ভারতবর্ষ একচ্ছত্রবর্ত্তী করিতে সঙ্কল্প করিলেন। তিনি এ জন্য বহুলপরিমাণে হিন্দুর বাহুবল প্রয়োগ করিয়া কার্য্যোদ্ধার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজ্যজয়ের সঙ্গে সঙ্গে রাজন্যবৃন্দ ও প্রকৃতিপুঞ্জের মঙ্গলবিধায়ক বিধানসমূহ প্রবর্ত্তিত হইতে লাগিল। বিপদে অকৃত্রিম বন্ধু, বহিঃশত্রুর আক্রমণকালে উদ্ধারকর্ত্তা, জাতীয় ভাব ও আচার ব্যবহারের মর্য্যাদারক্ষক, জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিগণের প্রতি-পালক এবং হিন্দু-মোসলমান-সমাকীর্ণ দেশে অপক্ষপাতী বিচারকর্ত্তা ও সম-বিধির প্রবর্ত্তক-রূপে, কি রাজা কি প্রজা, সর্ব্বসাধারণের শ্রদ্ধা ও প্রীতির ভাজন হইবার কল্পনাতেই তিনি এইরূপ নীতি অবলম্বন করিলেন।

আকবর উজবেগ, আফগান, হিন্দু, পার্সী ও খৃষ্টান প্রভৃতি বিভিন্নজাতীয় যোদ্ধাদিগকে সমরবিভাগে গুণানুসারে নিযুক্ত করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। আকবর আপনার সেনাপতিবর্গকে বিজিত শত্রুর স্ত্রী পুত্র কন্যাদিগকে দাসত্বে নিয়োজিত অথবা দাসবিপণীতে বিক্রয় করিতে নিষেধ করিলেন; বহু অর্থাগমের পথস্বরূপ যাত্রিকর তুলিয়া দিলেন। হিন্দুর পক্ষে একান্ত ঘৃণ্য ও অপমান-জনক জিজিয়া রহিত করিলেন, এবং গোহত্যাহ্রাসের জন্য সচেষ্ট হইলেন। অবশেষে তিনি রাজপুত রাজন্যবৃন্দের সহিত দুশ্ছেদ্য পরিণয়বন্ধন সংস্থাপন করিয়া তাঁহাদিগকে মোগল সাম্রাজ্যের হিতাকাঙ্ক্ষী করিয়া তুলিলেন। (১) ফলতঃ, আকবর বাহুবলে ও কৌশলে রাজ্যের পর রাজ্য বশীভূত করিয়া বিচ্ছিন্ন ভারত-বর্ষকে একীভূত করিলেন।

---

(১) ভারতবর্ষের মোগল সম্রাটগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে আকবরই হিন্দুরমণীকে ধর্ম্মপত্নীরূপে গ্রহণ করেন। তাঁহার প্রথমা হিন্দু পত্নী জয়পুরাধিপতি বিহারী মল্লের কন্যা ছিলেন। আকবরের আর এক হিন্দু পত্নী ছিলেন, তিনি যোধপুরাধিপতির কন্যা। যোধপুরী বেগমের পুত্রের নাম জাহাঙ্গীর। জাহাঙ্গীর জয়পুরাধিপতি বিহারী মল্লের পৌত্রীকে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ-

আকবর পর রাজ্যবিজয়ে প্রবৃত্ত হইয়া সর্ব্বপ্রথমেই রাজপুতানার দিকে দৃষ্টিপাত করেন। রাজপুত জাতির বাসভূমি কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের সাধারণ নাম রাজপুতানা, অথবা রাজওয়ারা। ইহার পশ্চিমে সিন্ধু প্রদেশ, পূর্ব্বে বুন্দেলখণ্ড, উত্তরে জঙ্গল দেশ নামক বালুকাভূমি, এবং দক্ষিণে বিন্ধ্যপর্ব্বত।

জয়পুরাধিপতি বিহারী মল্ল প্রথমেই আকবরের সঙ্গে সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হইয়া তাঁহাকে আপনার কন্যা সমর্পণ করেন, আকবর রাজপুতানার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সর্ব্বপ্রথমে যোধপুর (মাড়য়ার) রাজ্যে সৈন্য প্রেরণ করেন। তথাকার রাজা কিছু দিন যুদ্ধ করিয়া দিল্লীর বশ্যতা স্বীকার করেন। বাদশাহ তদীয় কন্যাকে ধর্ম্মপত্নী-রূপে গ্রহণ করিয়া রাজান্তঃপুরে স্থান প্রদান করেন। যোধপুরী বেগমের এক ভগিনী বিকানীরের অধিপতি রায়সিংহের পত্নী ছিলেন। সুতরাং রায়সিংহও এই সূত্রে বাদশাহের সহিত সম্মিলিত হন। এই ভাবে কোথাও বা যুদ্ধক্ষেত্রে জয়-লাভ করিয়া, কোথাও বা সৌহৃদ্যসংস্থাপন করিয়া, বাদশাহ সমগ্র রাজপুতানায় প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন। একমাত্র মিবারাধিপতি রাণা ও তাঁহার অনুগত কতিপয়

করেন। মহাত্মা টড্ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, জয়পুরের রাজবংশ বিহারী মল্লের পৌত্রীর বিবাহের পূর্ব্বে মোগলের সঙ্গে বৈবাহিকসূত্রে আবদ্ধ হন নাই। কিন্তু আকবরের সমসাময়িক ইতিহাস-বেত্তা নিজাম উদ্দীন আহম্মদ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, জয়পুরাধিপতি বিহারী মল্ল তাঁহার হস্তে আপন কন্যা সমর্পণ করিয়াছিলেন। আকবরের সর্ব্বসমেত আট ধর্ম্মপত্নী ছিলেন। আমরা এখানে তাঁহাদের নাম উল্লেখ করিতেছি।

১ম। সুলতানা রাকিয়া বেগম।—ইনি মিরজা হিন্দালের কন্যা।

২য়। সুলতানা সালিমা বেগম।—ইহাঁর কবিত্বশক্তি ছিল। ইনি প্রথমতঃ বৈরাম খাঁর সহিত পরিণীতা হয়েন। তাঁহার মৃত্যুর পর আকবর ইহাঁকে ধর্ম্মপত্নীরূপে গ্রহণ করেন। ইনি বাবরের দৌহিত্রী।

৩য়। জয়পুরাধিপতি বিহারী মল্লের কন্যা।

৪র্থ। আবদুলওয়াসীর রূপবতী পত্নী।

৫ম। যোধপুরের মহারাজের কন্যা।

৬ষ্ঠ। বিবি দৌলদশাদ।

৭ম। আবদুল্লা মোগলের কন্যা।

৮ম। খান্দেশ প্রদেশের মবারক শাহের কন্যা।

এতদ্ব্যতীত তাঁহার বহুসংখ্যক উপপত্নী ছিল। একবার নওরোজের সময় তিনি কামবিহ্বল হইয়াছিলেন, ইহা ইতিহাসপ্রসিদ্ধ। ফলতঃ, সর্ব্বগুণালঙ্কৃত আকবর ইন্দ্রিয়দোষবর্জ্জিত হইতে পারেন নাই।

ক্ষুদ্র সামন্ত আকবরের নিকট মস্তক অবনত করেন নাই। আকবর ইঁহাদিগকে বশীভূত করিবার জন্য বহু চেষ্টা করেন। কিন্তু ক্রমাগত দশ বৎসরের অবিশ্রান্ত চেষ্টায় ও বিপুল অর্থব্যয়ে মিবার-বিজয় সম্পন্ন করিতে না পারিয়া আকবর আপনার সংকল্প পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

আকবর রাজপুতানার বিজয় সম্পন্ন করিয়া, এবং উদারতা ও সমদর্শিতা গুণে প্রধান প্রধান হিন্দু রাজার সঙ্গে সদ্ভাবসংস্থাপন করিয়া, প্রধানতঃ হিন্দুর বাহুবল নিয়োগপূর্ব্বক ভারতবর্ষের খণ্ড খণ্ড মোসলমান রাজ্য স্বাধিকারভুক্ত করিতে প্রবৃত্ত হন। বাদশাহী সৈন্যের ক্ষিপ্রকারিতায় ও রণচাতুর্য্যে গুজরাট রাজ্যে, মালবদেশে, বঙ্গভূমিতে ও উড়িষ্যা প্রদেশে অল্পকালের মধ্যেই মোগল-পতাকা উড্ডীন হইয়াছিল। ১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে মোগল সেনাপতি উড়িষ্যা-বিজয় সম্পন্ন করেন।

এই সময় আকবরের গৌরবরবির মধ্যাহ্নকাল। বৈরাম খাঁকে পদচ্যুত করিবার সময় পঞ্জাব, পশ্চিমোত্তর প্রদেশ, আজমীর, গোয়ালিয়ার এবং অযোধ্যায় আকবরের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই সময় এক দিকে নর্ম্মদা নদীর তটবর্ত্তী পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে অক্সাস-নদী-বিধৌত প্রদেশ পর্য্যন্ত, এবং অন্য দিকে বঙ্গোপসাগরের তীরদেশ হইতে ভারতমহাসাগরের উপকূল পর্য্যন্ত সমগ্র ভূভাগের নরনারী তাঁহাকে সম্রাটরূপে গ্রহণ করিয়াছিল। ক্ষমতায়, বৈভবে, প্রতাপে কেহই তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। রাজনীতিবিশারদ তোডরমল্ল রাজস্ব-মন্ত্রীর পদে, বীরশ্রেষ্ঠ মিরজা আব্দুর রহিম প্রধান সেনাপতির পদে, এবং মহামহোপাধ্যায় ফৈজি ও আবুল ফজল প্রধান সচিবের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

আকবর বাহুবলে ও সৌহৃদ্যসূত্রে প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষের প্রভুত্ব লাভ করিলেন। কিন্তু কেবলমাত্র সামরিক শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াই উচ্চাকাঙ্ক্ষ সম্রাটের পরিতৃপ্তি হইল না; তিনি মানবের মানসিক রাজ্যেও আধিপত্য স্থাপন করিবার অভিলাষী হইলেন। কিন্তু তিনি তরবারিহস্তে জনসাধারণকে আপনার মতাবলম্বী করিতে প্রবৃত্ত হন নাই। বস্তুতঃ, সম্রাটের আত্মীয় বন্ধুগণও মতস্বাতন্ত্র্যের জন্য কখনও তাঁহার বিরাগভাজন হন নাই। কি ভাবে মানবের পারত্রিক মঙ্গল সাধিত হইতে পারে, তাহা তাঁহার জ্ঞাননয়নে উজ্জ্বলভাবে প্রতিভাত হইয়াছিল। তিনি নিজে ধর্ম্ম বিষয়ে যে স্বাধীনতা উপভোগ করিতেছিলেন, তাহা প্রকৃতিপুঞ্জকে প্রদান করিবার মানস করিলেন। এবং তদ্রূপ স্বাধীনতাকেই সুবিশাল মোগল সাম্রাজ্যের প্রকৃষ্ট ভিত্তি বলিয়া স্থির করিলেন। কারণ, যদিও তিনি সর্ব্বসাধারণের হিতকল্পে বিবিধ সুবিধানের প্রবর্ত্তন

করিতে আরম্ভ করেন, তথাপি মোসলমান ধর্ম্মের সঙ্কীর্ণ অনুশাসনের জন্য তাঁহার শাসনসংস্কার সর্ব্বত্র প্রস্তুত হয় নাই। এ জন্য তীক্ষ্ণবুদ্ধি আকবর স্পষ্ট অনুভব করিলেন যে, উদার ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা ব্যতীত শাসনকার্য্য অভীষ্টানুরূপ পরিশুদ্ধ ও শৃঙ্খলাবদ্ধ হইবে না।

মোসলমান ধর্ম্মের অনুশাসন একান্ত সঙ্কীর্ণ বলিয়া মোসলমানমাত্রই পরধর্ম্মবিদ্বেষী। তাহারা ভারতবর্ষে আধিপত্য স্থাপন করিয়া অত্যাচার ও অবিচারের একশেষ করিয়াছে। তাহাদের পরধর্ম্মবিদ্বেষ তাদৃশ প্রবল না হইলে অত্যাচার ও অবিচারের স্রোত সেরূপ খরবেগে প্রবাহিত হইত না। আকবরের সময়েও মোসলমানগণ তরবারির সাহায্যে ধর্ম্মপ্রচার করিত। আকবর এইরূপ সমাজে আজন্ম বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার ধর্ম্মবিশ্বাসও সেই সমাজের অনুরূপ ভাবেই গঠিত হইয়াছিল। বস্তুতঃ, তিনি রাজত্বের প্রথম ভাগে কোরাণ-অনুগত ধর্ম্মবিশ্বাসের পরিচয় প্রদান করিতেন। তিনি তীর্থস্থানদর্শন ও মোসলমান মহাপুরুষগণের সাক্ষাৎলাভের অনুরাগী ছিলেন। এমন কি, তিনি এসলাম-শাস্ত্রবিরুদ্ধ উদার ধর্ম্মমত প্রচার করিবার তিন বৎসর পূর্ব্বেও মক্কা গমন করিয়া পুণ্যসঞ্চয় করিবার জন্য আন্তরিক অভিলাষী ছিলেন। আকবরের সমসাময়িক ইতিহাসবেত্তা শিখ নরুলহক নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, বাদশাহ ১৫৭৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজধানীতেই থাকুন, কি শিবিরেই অবস্থান করুন, প্রত্যহ পাঁচবার নমাজ পড়িতেন, এবং রাজকীয় কোরাণ-পাঠকগণ উপাসনাকালে ও অন্যান্য সময়ে কোরাণ আবৃত্তি করিতেন। উপাসনাকালে বাদশাহ স্বয়ং সকল বিষয়ে অগ্রবর্ত্তী থাকিতেন।

আকবরের ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তিত হইবার কারণ কি? সাম্রাজ্যের হিতকামনায় তিনি অসঙ্কোচে পরধর্ম্মাবলম্বী রাজপুরুষগণের সঙ্গে মিলিত হইতেন, এবং এইরূপ অবাধ মিলনের ফলে তাঁহাদের গুণরাজি সুস্পষ্টভাবে বাদশাহের নিকট প্রকাশিত হইয়াছিল। তিনি তাঁহাদের গুণরাজিদর্শনে আকৃষ্ট হইয়া বিভিন্ন ধর্ম্মশাস্ত্রের আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। আমরা শেখ নুরুলহকের গ্রন্থ হইতে সে বিবরণের অনুবাদ প্রদান করিতেছি।

"আকবরের রাজসভা সকল সম্প্রদায়ের, সকল মতাবলম্বীর, এবং সকল জাতির, খোরাসান, হরাক, মাওরাওন্নাহার ও হিন্দুস্থানের বিদ্বজ্জনের, শাস্ত্রবেত্তা ও ধর্ম্মবিদের, সিয়া ও সুন্নির, দর্শনশাস্ত্রজ্ঞ ও খৃষ্টানের, ব্রাহ্মণের ও প্রত্যেক প্রচলিত ধর্ম্মের প্রচারকের আকর্ষণকেন্দ্র ছিল। বাদশাহের কথোপকথনস্পৃহা ও সৌজন্যের খ্যাতি, তদুপরি তাঁহার রাজমর্য্যাদা ও ক্ষমতার কথা, এমন

কি, তাঁহার দীনভাব ও শ্রেষ্ঠতার বিষয় পরিশ্রুত হওয়াতে ইঁহারা দলে দলে তাঁহার সন্নিধানে উপনীত হন, এবং ইতিহাস ও ভ্রমণের বর্ণনা ও প্রত্যাদেশ, Prophecy ও ধর্ম্মবিষয়ক আলোচনায় আপনাদিগকে নিরত করিয়া সর্ব্বদা বাগ্-বিতণ্ডায় কালযাপন করিতে আরম্ভ করেন। সাধারণতঃ তার্কিকদের যেরূপ হইয়া থাকে, তাঁহারাও সেইরূপ অন্যকে স্বমতাবলম্বী করিবার জন্য সচেষ্ট ছিলেন। বাদশাহ এই প্রথম অন্যান্য জাতির ইতিহাস, আচার ব্যবহার ও ধর্ম্মমতের বিষয় শ্রবণ করিয়া উহাদের অভিনবত্ব দেখিয়া বিস্মিত হন। তিনি কেবল সত্যসিদ্ধান্তের জন্যই উদ্‌গ্রীব ছিলেন বলিয়া, যে সকল পরস্পরবিরোধী মত ব্যক্ত হইত, তাহা হইতে সবিশেষ মনোযোগ পূর্ব্বক বিবেচনা করিয়া সার গ্রহণ করিতেন। তিনি রাজকর্ম্মচারী, শাস্ত্রবেত্তা ও সামন্তগণের সমক্ষে প্রকাশ্যভাবে বলিতেন, "হে জ্ঞানী মোল্লাগণ, সত্যনির্দ্ধারণ ও প্রকৃত ধর্ম্মমত লাভ করিয়া প্রচার করা এবং ধর্ম্মের ঈশ্বরাদিষ্ট মূল অনুসন্ধানে বাহির করাই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য। অতএব মনুষ্যোচিত দুর্ব্বলতার বশীভূত হইয়া সত্যগোপন ও ঈশ্বরাদেশের বিরোধী কোন মত প্রকাশ করিতে প্রলুব্ধ হইও না। যদি তোমরা তদ্রূপ কর, তাহা হইলে তোমরা অধর্ম্মাচরণের জন্য ঈশ্বরের নিকট দায়ী হইবে। * * * পূর্ব্বোক্ত অভিমত পরিব্যক্ত হইবার পূর্ব্বে মৌলানা আবদুল্লা সুলতান পুরি ও শেখ আবদুল নবি অবিরত রাজসভায় উপস্থিত থাকিতেন, এবং বাদশাহের নিকট বহু অনুগ্রহ লাভ করিতেন। এই দুই জন শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি এসলাম ধর্ম্ম ও শাস্ত্র সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ মতদাতা বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। তাঁহারা অধিকাংশ সময়েই পরস্পরবিরোধী মত পোষণ করিতেন, এবং স্ব স্ব বক্তব্য উত্তেজনা ও পরিবাদ-সহকারে প্রকাশ করিতেন। অবশেষে বাদশাহের নিকট তাঁহাদের প্রতিপত্তি ও প্রতিষ্ঠা হ্রাস প্রাপ্ত হয়, এবং তাঁহারা যে ধর্ম্মের প্রচার করিতেন, তৎসম্বন্ধে বাদশাহের ঔদাসীন্য জন্মে।" আমরা বদায়ুনির গ্রন্থ হইতেও কিয়দংশের অনু-বাদ প্রদান করিতেছি।

"পাথরের উপর যেমন ক্রমে ক্রমে রেখা অঙ্কিত হইয়া থাকে, সেইরূপ বাদশাহের হৃদয়েও এই বিশ্বাস দৃঢ়মূল হইয়াছিল যে, সকল ধর্ম্মেই বুদ্ধিমান ব্যক্তি, এবং সকল জাতিতেই সুধীর বিবেচক ও অলৌকিক ক্ষমতাশালী মনুষ্য রহিয়াছেন। যদি প্রকৃত জ্ঞান কিয়ৎপরিমাণে সর্ব্বত্রই লাভ করা যাইতে পারে, তাহা হইলে এক ধর্ম্মেই, অথবা এসলাম ধর্ম্মের ন্যায় একটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক ও অনধিকসহস্রবর্ষবয়স্ক ধর্ম্মেই সত্য আবদ্ধ থাকিবে কেন? এক

সম্প্রদায় যাহা অস্বীকার করে, অন্য সম্প্রদায় কেন তাহা দৃঢ়তাসহকারে যথার্থ বলিয়া প্রচার করিবে, এবং কোন এক সম্প্রদায়কে উৎকর্ষ প্রদত্ত না হইয়া থাকিলেও সে সম্প্রদায় কেন শ্রেষ্ঠতার দাবি করিবে?

"বিশেষতঃ, শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বদা বাদশাহের সঙ্গে নির্জ্জন সাক্ষাতের বন্দোবস্ত করিতেন। তাঁহারা নৈতিক, শারীরিক ও আধ্যাত্মিক গ্রন্থ বিষয়ে অন্যান্য বিদ্বজ্জনের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন, এবং পারলৌকিক জ্ঞান, পারমার্থিক ক্ষমতা ও মানবীয় পূর্ণতার উচ্চাদর্শ লাভ করিয়াছিলেন; এ জন্য তাঁহারা আপনাদের ধর্ম্মের সত্য ও পরধর্ম্মের ভ্রমপ্রদর্শনার্থ জ্ঞান ও প্রমাণমূলক যুক্তি উপস্থিত করিতেন। তাঁহারা আপনাদের ধর্ম্মমত এরূপ দৃঢ়ভাবে প্রচার করিতেন, এবং যে সব বিষয় বিবেচনাসাপেক্ষ, তাহাও এরূপ সুকৌশলে স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতেন যে, কেহই সন্দেহপ্রকাশ করিয়া (এমন কি, পর্ব্বত ধূলিসাৎ হইয়া গেলেও এবং আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িলেও,) বাদশাহকে সন্দিগ্ধ করিয়া তুলিতে পারিত না।

"এ জন্য বাদশাহ resurrection day of judgment ও তৎসম্বন্ধীয় অন্যান্য বিবরণ, এসলাম ধর্ম্মের প্রত্যাদেশ ও আমাদের পয়গম্বরের জনশ্রুতির অনুগত যাবতীয় ব্যবস্থা বর্জ্জন করেন।"

এই ভাবে যে সময় তাঁহার ধর্ম্মবিশ্বাস শিথিল হইতেছিল, তখন তিনি সাম্রাজ্যের শাসন সংরক্ষণের জন্য অভিনব পন্থার উদ্ভাবনে নিযুক্ত ছিলেন। শাসন-সংস্কার কার্য্যে এসলাম ধর্ম্মের অনুশাসন তাঁহাকে পদে পদে বাধা প্রদান করাতে তিনি আপনার ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তিত করিয়া উদারধর্ম্মাবলম্বী হইলেন, এবং প্রকৃতিপুঞ্জের মধ্যেও নূতন ধর্ম্মের প্রচার করিতে সঙ্কল্প করিলেন। অগাধধীসম্পন্ন আবুল ফজল তাঁহার সহায় হইলেন।

রাজত্বের একবিংশতিতম বর্ষে (১৫৭৬ খৃঃ) গুরুতর পরিবর্ত্তনের সূচনা হইল। আকবর রাজমুদ্রা প্রচলিত কল্‌মা পরিত্যাগ করিয়া আপনার নাম-সংবলিত বচন অঙ্কিত করিবার আদেশ দিলেন। তিনি রাজমুদ্রায় "আল্লাহু আকবর" বচন অঙ্কিত করা যাইতে পারে কি না, তৎসম্বন্ধে মতজিজ্ঞাসু হইলেন। অধিকাংশ ব্যক্তিই এই পরিবর্ত্তনের অনুমোদন করিলেন। কেবল হাজি ইব্রাহিম প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন যে, উহার দুই প্রকার (১) অর্থ হইতে পারে, সুতরাং কোরাণের "নাজিকর আল্লাহি আকবর" নামক একার্থমূলক (২) শ্লোকাংশ গ্রহণ করাই সঙ্গত।

(১) ঈশ্বর মহান্, অথবা আকবর ঈশ্বর।

(২) ঈশ্বরের বিষয় ধ্যান করাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কার্য্য।

ইব্রাহিমের যুক্তি বাদশাহের মনোমত হইল না। তিনি বলিলেন, "মনুষ্যের অক্ষমতা এত দূর জাজ্বল্যমান যে, কেহই ঈশ্বরত্বের দাবি করিতে পারে না। অতএব 'আল্লাহু আকবর' বচন মুদ্রায় অঙ্কিত করিলে দূষণীয় হইবে না।"

সুপ্রসিদ্ধ মিষ্টার ব্লকম্যান নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, "আল্লাহু আকবর" বচনের দুই অর্থ হইতে পারে বলিয়াই বাদশাহ উহা রাজমুদ্রায় অঙ্কিত করিবার আদেশ দেন। "আকবর ঈশ্বর," এই অর্থবোধক মুদ্রালিপি মোসলমান-সমাজে সহিয়া গেলে তিনি আবুল ফজলের সাহায্যে ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমূল পরিবর্ত্তন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

আবুলফজল প্রস্তাব করিলেন যে, রাজা পরমার্থিক বিষয়েও প্রকৃতিপুঞ্জের অধিনেতা। কোরাণের অনুশাসন মানবীয় ব্যবস্থা কর্ত্তৃক নিয়মিত হইতে পারে না, ইহাই এসলামধর্ম্মের মূলমত। আবুল ফজলের প্রস্তাব উহার মূলোচ্ছেদক হইল। মোসলমান শাস্ত্রবেত্তৃগণ বিষম সমস্যায় পতিত হইলেন। এ দিকে আবুল ফজলের মত প্রত্যাখ্যান করিলে বাদশাহ আপনাকে অসম্মানিত বলিয়া বিবেচনা করিবেন, অপর দিকে উহা গ্রহণ করিলে এসলাম ধর্ম্মের ভিত্তিতে সাংঘাতিক আঘাত করা হইবে। অবশেষে রাজসম্মান রক্ষা করাই তাঁহাদের স্পৃহনীয় হইল। মখদুম উল-মল্ক, শেখ আবুল নবি, কাজি জালাল উদ্দীন মুলতানি, শেখ মবারক ও গাজি খাঁ বদক্ষি ন্যায়পরায়ণ রাজাকেই পারমার্থিক বিষয়েরও অধিনেতা বলিয়া আপন আপন নাম স্বাক্ষরপূর্ব্বক ঘোষণাপত্র প্রচার করিলেন। আমরা সেই ঘোষণাপত্রের অনুবাদ প্রদান করিতেছি।

"আমরা একমতাবলম্বী হইয়া মীমাংসা করিতেছি যে, ঈশ্বরের দৃষ্টিতে মুজতাহিদগণের পদ অপেক্ষা এক জন সুলতান-ই-আদিলের (ন্যায়পরায়ণ সম্রাটের) পদ শ্রেষ্ঠ। আমরা আরও ঘোষণা করিতেছি যে, এসলামের সুলতান, মনুষ্য জাতির আশ্রয়স্থল, বিশ্বাসিগণের নেতা ও পৃথিবীতে ঈশ্বরের প্রতিচ্ছায়া আবুল ফতে জালালউদ্দীন মহম্মদ আকবর বাদশাহ গাজি (ঈশ্বর তাঁহার রাজ্য চিরস্থায়ী করুন) এক জন অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ, জ্ঞানী ও ঈশ্বরভীরু রাজা। অতএব মুজতাহিদগণের মধ্যে কোনও মতদ্বৈধ উপস্থিত হইলে যদি বাদশাহ স্বীয় তীক্ষ্ণ ধারণায় ও অভ্রান্ত বিচারে কোন এক পথ অবলম্বন করেন, এবং মানব জাতির মঙ্গলবিধান ও পৃথিবীর উপযুক্ত পরিচালনার নিমিত্ত নিজের মীমাংসা প্রকাশ করেন, তাহা হইলে সেই মীমাংসা সমস্ত জাতির ও আমাদের গ্রহণীয় বলিয়া আমরা এতদ্দ্বারা স্বীকার করিতেছি। আমরা আরও ঘোষণা করিতেছি

যে, বাদশাহ স্বীয় অভ্রান্ত বিচারে যদি কোরাণের অবিরোধী ও জাতির মঙ্গলবিধায়ক কোন আদেশ প্রচার করেন, তাহা হইলে, তাহা প্রত্যেক ব্যক্তির অবশ্য গ্রহণীয় ও পালনীয়। এই আদেশের প্রতিকূলাচরণ পরলোকে অনন্ত নরক বিধান করিবে, এবং ইহলোকে ধর্ম্ম ও উন্নতির ক্ষতিকারক হইবে। ঈশ্বরের গৌরব ও এসলাম ধর্ম্মের বিস্তারের জন্য সাধু উদ্দেশ্যে এই ঘোষণাপত্র লিখিত ও হিজিরা ৯৮৭ অব্দের রজব মাসে প্রধান প্রধান উলমা ও শাস্ত্রজ্ঞ কর্ত্তৃক স্বাক্ষরিত হইল।"

পূর্ব্বোল্লিখিত ঘোষণাপত্র প্রচারিত হইলে বাদশাহের ধর্ম্মসংস্কারের পথ পরিষ্কৃত হইল, এবং ইমামের মীমাংসাই গরীয়সী বলিয়া গৃহীত হইতে লাগিল। এক্ষণে বাদশাহ প্রকাশ্যভাবে আপনার অভিনব ধর্ম্মবিধানের প্রচার করিতে সঙ্কল্প করিলেন।

৯৮৮ (খৃঃ ১৫৮০) হিজিরার জমাল আউল মাসের প্রথম তারিখে ফতেপুরের জুমা মসজিদে আকবর প্রকাশ্যভাবে আপনার অভিনব ধর্ম্মবিধানের প্রচার করিলেন। বাদশাহ প্রথমতঃ মঙ্গলাচরণের জন্য ফৈজীর রচিত নিম্নলিখিত কবিতা আবৃত্তি করিয়া তাহার পর মূলসূত্রগুলির ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন।

"The Lord to me the kingdom gave,
He made me wise, and strong, and brave.
He girdeth me in right and truth,
Filling my mind with love of truth.
No praise man can sum His state,
Allahu Akbar !—God is great."

আকবর অভিনব ধর্ম্মমতের নাম তৌহিদ-ই-ইলাহি রাখিয়াছিলেন।

আকবর-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মমতের মূলসূত্রগুলি কি? এসলাম ধর্ম্মের গোঁড়া ও আকবরবিদ্বেষী বদায়ুনি নূতন ধর্ম্মের বহু নিন্দা করিয়া লিখিয়াছেন যে, উহা তাঁহার (বাদশাহের) হৃদয়দর্পণের প্রতিবিম্বস্বরূপ। প্রত্যেক ধর্ম্মের সারাংশ গ্রহণ করিয়াই আকবর আপনার অভিনব ধর্ম্মবিধানের প্রচার করেন। তৌহিদ-ই-ইলাহির গঠনে হিন্দু ও খৃষ্টান ধর্ম্ম সবিশেষ সাহায্য করিয়াছিল। বীরবল সিংহ সূর্য্যই সৃষ্টির আদি কারণ বলিয়া বাদশাহের প্রতীতি জন্মাইয়াছিলেন; অগ্নিউপাসকগণও গুজরাট হইতে রাজসভায় উপস্থিত হইয়া তাঁহার নিকট আপনাদের ধর্ম্মমত সত্যমূলক বলিয়া প্রমাণিত করিয়াছিলেন।

(১) বস্তুতঃ, আকবর-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম যাবতীয় ধর্ম্মের সারাংশের সমবায়ে গঠিত হইয়াছিল। এক অদ্বিতীয় ঈশ্বর, ও আকবর তাঁহার খলিফা (প্রতিনিধি); ইহাই প্রথম সূত্র। এসলামধর্ম্মানুগত উপাসনাপ্রণালী সঙ্কীর্ণ বলিয়া তাহার পরিবর্ত্তে অভিনব প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। প্রার্থনাংশ পারসীক ধর্ম্মের অনুকরণে রচিত হইয়াছিল, এবং অনুষ্ঠানাংশ হিন্দুপদ্ধতির অনুযায়ী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। আকবর আপনার ধর্ম্মবিধান হইতে পৌরোহিত্যের প্রথা তুলিয়া দিয়াছিলেন। নূতন ধর্ম্মবিধান যেন সকল সম্প্রদায়েরই হিতসাধক হয়, এবং যেন কাহারও পীড়নের হেতু হইতে না পারে, তদুদ্দেশ্যেই আকবর সকল ধর্ম্মের সারাংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন; আকবর বিবেকের স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছিলেন; কিন্তু সে স্বাধীনতা-পরিচালনার সময় অন্যের অনিষ্টোৎপাদন হইলে তাহা দমন করিবার জন্য নিয়ম বিধিবদ্ধ ছিল। অতিরিক্ত উপাসনা, উপবাস ও দান অনেক সময় কপটাচরণের প্রতিপোষক হইয়া থাকে, এই জন্য তৎসম্বন্ধে সকলকে নিরুৎসাহ করা হইত; কিন্তু তাহাদের আচরণ রাজবিধি দ্বারা নিষিদ্ধ ছিল না।

বাদশাহ সহমরণ প্রথা তুলিয়া দেন; বিধবাবিবাহের বিধি প্রচার করেন; বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা বাহির করেন; বহুবিবাহের বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশ করেন; এবং ধর্ম্মার্থ পশুহত্যার নিবারণ করেন। কিন্তু এই সকল বিষয়ে রাজাজ্ঞা প্রতিপালন করিবার জন্য বলপ্রয়োগ না করিয়া তিনি দৃষ্টান্ত ও যুক্তি প্রদর্শন করিয়া প্রকৃতিপুঞ্জকে নববিধির অনুরাগী করিবার যত্ন করিতেন। বাদশাহ আহার সম্বন্ধে বিচার তুলিয়া দেন,—সর্ব্বপ্রকার মাংসই ভক্ষ্য বলিয়া নির্দ্ধারণ করেন। চান্দ্র বৎসরের পরিবর্ত্তে সৌর বৎসর গণনা করিবার আদেশ প্রচারিত হয়। আকবর এসলাম ধর্ম্মের গোঁড়া বিচারকদিগকে পদচ্যুত করিয়া বিচার্য্য বিষয়ের সঙ্গে ধর্ম্মের সম্পর্ক পরিত্যাগ করেন, এবং হিন্দুর দায়াধিকারসম্বন্ধীয় তর্কের মীমাংসার জন্য হিন্দু পণ্ডিত নিযুক্ত করেন।

মোসলমানসম্রাটকুলতিলক আকবর ধর্ম্ম, সমাজ ও শাসন কার্য্যের নানাবিধ সংস্কার করিয়াছিলেন; কিন্তু রাজস্ববিষয়ক সংস্কারই তাঁহার সর্ব্ব-

(১) প্রথম হইতেই আকবর হিন্দু মহিষীগণের মনোরঞ্জনার্থ রাজান্তঃপুরে হোমাগ্নি প্রজ্বলিত রাখিবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। রাজত্বের পঞ্চবিংশতিতম বর্ষে তিনি সূর্য্য ও অগ্নির সম্মুখে প্রকাশ্যভাবে ভূলুণ্ঠিত হন, এবং সন্ধ্যাকালে দীপমালা প্রজ্বলিত হইলে রাজাজ্ঞায় সমস্ত সভাসদ সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মান হইয়া অগ্নির সম্বর্দ্ধনা করেন। এই বর্ষেই বাদশাহ এক দিন ললাটে ত্রিপুণ্ড্রক ও গলদেশে স্বর্ণোপবীত ধারণ করিয়া রাজসভায় আগমন করেন।

প্রধান কীর্ত্তি। রাজনীতিবিশারদ শের শাহ রাজস্বনীতির যে রেখাপাত করেন, আকবর তাহাই পরিস্ফুট করিয়া তুলেন। আকবর প্রথমতঃ সমস্ত ভূমির বিশুদ্ধ পরিমাপ করিয়া প্রত্যেক বিঘায় কি পরিমাণ শস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহারই নির্দ্ধারণে প্রবৃত্ত হন। এ জন্য তিনি সর্ব্ব স্থানের জন্য একজাতীয় নলের সৃষ্টির করেন। এই নল দ্বারা সমস্ত ভূমির পরিমাপ হইলে কোন ভূমিতে কি পরিমাণ শস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহার নির্দ্ধারণ করেন। উর্ব্বরতা অনুসারে সমস্ত ভূমি তিন ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল।

শ্রেণী	গম	তুলা
প্রথম শ্রেণীর জমিতে প্রতি বিঘায়	১৮/০	১০/০
দ্বিতীয় শ্রেণীর জমিতে প্রতি বিঘায়	১২/০	৭৷৹
তৃতীয় শ্রেণীর জমিতে প্রতি বিঘায়	৮৶৫	৫/০
	৩৮৶৫	২২৷০

এই তিন শ্রেণীর জমিতে গমের গড় উৎপন্ন বার মণ সাড়ে আটত্রিশ সের ও তুলার গড় উৎপন্ন সাত মণ বিশ সের। ইহার একতৃতীয়াংশ রাজার প্রাপ্য। গমের জমির প্রত্যেক বিঘা হইতেই যে চারি মণ সাড়ে বার সের ও তুলার জমির প্রত্যেক বিঘা হইতেই যে দুই মণ বিশ সের শস্য রাজকরস্বরূপ গ্রহণ করা হইত, তাহা নহে। ইহা রাজস্বের সর্ব্বোচ্চ হার মাত্র ছিল। প্রজা ইচ্ছা করিলেই আপন জমির উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ নির্দ্ধারিত করিবার জন্য আবেদন করিতে পারিত। এই পরিমাণ দ্বারা যে শস্য পাওয়া যাইত, তাহারই তৃতীয়াংশ গ্রহণ করিবার নিয়ম ছিল। এতদ্ব্যতীত এ সম্বন্ধে অন্যরূপ আদেশও ছিল। যে জমিতে বীজবপনের জন্য চাষের আবশ্যক ছিল না, তাহার রাজস্ব প্রত্যেক ফসলের সময় পূর্ণহারে গ্রহণ করা হইত। যে জমিতে বীজবপনের জন্য চাষের আবশ্যক হইত, তাহার রাজস্ব কেবলমাত্র আবাদের সময়েই প্রদান করিবার

নিয়ম ছিল। জমী জলপ্লাবনে নষ্ট হইলে, অথবা একাদিক্রমে তিন বৎসর অনাবাদী অবস্থায় পতিত থাকিলে, অথবা জমীর পুনঃকর্ষণের জন্য অতিরিক্ত ব্যয়ের প্রয়োজন হইলে, প্রথম বৎসর দুই পঞ্চমাংশ রাজস্ব-স্বরূপ গ্রহণ করিবার নিয়ম ছিল। তাহার পর ক্রমান্বয়ে পাঁচ বৎসরে অল্প অল্প করিয়া রাজস্ব বাড়াইয়া পূর্ণহারে আদায় করা হইত। ভূমির উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিয়া শস্যের পরিবর্ত্তে মুদ্রায় রাজস্ব গ্রহণ করিবার নিয়ম ছিল। এ নিমিত্ত কোন জমির পরিমাপ দ্বারা রাজস্বের বন্দোবস্ত করিবার সময় তৎপূর্ব্ববর্ত্তী ঊনবিংশ বর্ষের শস্যের মূল্যতালিকার গড় অনুসারে মুদ্রার পরিমাণ নির্দ্ধারণ করা হইত। কিন্তু এ নির্দ্ধারণও কখনও কখনও বাজারদর মত পুনরায় বিবেচনাধীন করিবার নিয়ম ছিল, এবং কোন প্রজা মুদ্রার হার অতিরিক্ত মনে করিলে শস্য দ্বারাই রাজস্ব পরিশোধ করিতে পারিত। প্রথমতঃ প্রতি বৎসর রাজস্বের বন্দোবস্ত করিবার নিয়ম ছিল; কিন্তু পরে এক কাজে পুনঃপুনঃ নিযুক্ত হওয়া বিরক্তিকর হইয়া উঠাতে প্রতি দশ বৎসর অন্তর নূতন বন্দোবস্ত করিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। জমীর পরিমাণ, শ্রেণীবিভাগ, পত্তন ও রাজস্বের হ্রাস বৃদ্ধি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে গ্রাম্য কর্ম্মচারীর সেরেস্তায় লিপিবদ্ধ থাকিত।

আকবর রাজস্ব বন্দোবস্তের পূর্ব্বোক্তরূপ উন্নতিবিধান করিয়া নানাবিধ রাজপ্রাপ্য ও আমলান-প্রাপ্য কর তুলিয়া দেন। ইহার ফলে প্রজার করভার বহুলপরিমাণে লঘু হইয়াছিল; কিন্তু অন্য দিকে আদায়কারী রাজস্বকর্ম্মচারিগণের তহবিল তছরূপ করিবার পথ পূর্ব্বাপেক্ষা সঙ্কুচিত হইয়া পড়াতে রাজকোষের কোন প্রকার ক্ষতি হয় নাই। আকবর রাজস্বকর্ম্মচারীদিগকে যে সকল উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিয়া আমরা অবগত হই যে, প্রজাবর্গের সুখ স্বচ্ছন্দতা ও রাজস্ববিষয়ক নববিধানের ঔদার্য্যমূলক পরিচালনার নিমিত্ত তিনি একান্ত যত্নশীল ছিলেন। কোন বিভাগের রাজস্ব আদায়ের জন্য ইজারা বন্দোবস্ত করিবার প্রথা ছিল না। গ্রাম্যমণ্ডল ও পাটওয়ারীর কথায় সম্পূর্ণ নির্ভর না করিয়া চাষী প্রজার সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে বন্দোবস্ত করিবার জন্য বাদশাহের আদেশ ছিল। রাজস্বমন্ত্রী টোডরমলের সাহায্যে আকবর রাজস্বসংস্কার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

আকবর শাসনসৌকর্য্যার্থ সমস্ত সাম্রাজ্য পনর সুবায় বিভক্ত করিয়াছিলেন। (১) প্রত্যেক সুবার জন্য এক জন করিয়া শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তাঁহার

(১) ১। দিল্লী, ২। আগ্রা, ৩। কাবুল, ৪। লাহোর, ৫। মুলতান, ৬।

উপাধি সুবাদার বা নাজিম ছিল। তিনি বাদশাহের উপদেশ মত শাসন ও সৈন্যবিভাগসম্বন্ধীয় সকল প্রকার কার্য্যের পরিচালন করিতেন। প্রত্যেক সুবার রাজস্বসংক্রান্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার জন্য এক এক জন দেওয়ান নিযুক্ত থাকিতেন। স্বয়ং বাদশাহ দেওয়ান মনোনীত করিতেন। প্রত্যেক সুবা কতিপয় সরকারে, প্রত্যেক সরকার কতিপয় পরগণাতে এবং প্রত্যেক পরগণা কতিপয় দাস্তরে বিভক্ত ছিল। এই সকল বিভাগে বিভিন্ন শ্রেণীর কর্ম্মচারিগণ নিযুক্ত থাকিয়া স্ব স্ব কার্য্য সম্পাদন করিতেন। প্রত্যেক সরকারের জন্য এক জন করিয়া ফৌজদার নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহারা আপন আপন বিভাগের সৈন্যদলের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতেন। সরকারসমূহের শান্তিরক্ষা ও সুশাসনের নিমিত্ত তাঁহারাই দায়ী থাকিতেন। কাজি ও মুফ্‌তির সাহায্যে বিচারকার্য্য সম্পন্ন হইত। বৃহৎ বৃহৎ নগরের শান্তিরক্ষার জন্য কোতওয়ালগণ নিযুক্ত ছিলেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগরে রাজস্বকর্ম্মচারিগণই শান্তিরক্ষার কার্য্য সম্পাদন করিতেন। পল্লীগ্রামের বিচারকার্য্য পঞ্চায়তী প্রথায় নির্ব্বাহিত হইত। উইলসন নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, কোনও বিবাদে উভয় পক্ষ হিন্দু হইলে ব্রাহ্মণগণ তাহার মীমাংসা করিয়া দিতেন।

আকবর এই কর্ম্মচারীদিগকে যে সকল আদেশলিপি প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহা পড়িলে তাঁহার প্রজাপ্রীতি ও ন্যায়পরায়ণতার প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি গুজরাটের শাসনকর্ত্তাকে একখানি আদেশপত্রে প্রাণদণ্ড, বেত্রদণ্ড ও লৌহদণ্ড ব্যতীত অন্য কোন প্রকার দণ্ডবিধান করিতে নিষেধ করেন; কিন্তু একমাত্র প্রবল রাজদ্রোহ ব্যতীত অন্য কোন প্রকার অপরাধে প্রাণদণ্ডবিধান না করিবার আদেশ ছিল। প্রাণদণ্ডবিধান করা আবশ্যক হইলে বাদশাহের নিকট সমস্ত কাগজপত্র প্রেরণ করিয়া তাঁহার অনুমতি গ্রহণ করিতে হইত। প্রাণদণ্ডবিধানকালে বিকলাঙ্গ অথবা অন্য কোন প্রকার নিষ্ঠুরাচরণও নিষিদ্ধ ছিল।

ভারতবর্ষে সৈন্যাধ্যক্ষদিগকে বৃত্তিস্বরূপ নগদ অর্থের পরিবর্ত্তে জায়গীর দান করিবার প্রথা ছিল। এই প্রথার ফলে সৈন্যাধ্যক্ষগণ আপন আপন জায়গীরে যথেচ্ছভাবে কর আদায় করিয়া প্রজাপীড়ন করিতেন। সৈন্যসংগ্রহের প্রণালীও দূষণীয় ছিল। জায়গীরের উপস্বত্ব দ্বারা সৈন্যাধ্যক্ষদিগকে নিয়মমত যে পরিমাণ সৈন্যপরিপোষণ করিতে হইত, তাঁহারা তত সংখ্যক সৈন্য রাখিতেন না। সৈন্য

আজমীর, ৭। গুর্জ্জর, ৮। মালব, ৯। অযোধ্যা, ১০। এলাহাবাদ, ১১। বিহার, ১২। বঙ্গ, ১৩। খান্দেশ, ১৪। বেরার, ১৫ আমেদনগর।

সহ উপস্থিত হইবার জন্য রাজাদেশ প্রচারিত হইলে তাঁহারা যাহাকে তাহাকে ধরিয়া সৈনিক পরিচ্ছদে শোভিত করিতেন, এবং তাহার পর তাহাদিগকে ভাড়াটিয়া অশ্বে আরোহণ করাইয়া সসৈন্যে রাজশিবিরে উপস্থিত হইতেন। এই জন্য আকবর বৃত্তিস্বরূপ জায়গীর প্রদান করিবার প্রথা পরিবর্ত্তিত করিয়া নগদ অর্থ দিবার নিয়ম প্রচলিত করেন। তদ্ব্যতীত বৃত্তিপ্রদানের সময় সৈন্যদিগকে উপস্থিত করিবার নিমিত্ত আদেশ ছিল। তিনি প্রত্যেক সৈনিক পুরুষের আকৃতি ইত্যাদি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লিপিবদ্ধ রাখিবার ও প্রত্যেক অশ্বের গাত্রে চিহ্ন অঙ্কিত করিবার রীতি প্রচলিত করেন। আকবর সৈন্যাধ্যক্ষদিগকে মনসবদার নাম প্রদান করেন, এবং তাঁহারা গুণানুসারে দশ সহস্র, সপ্ত সহস্র, পঞ্চ সহস্র, বা তদপেক্ষা ন্যূনসংখ্যক সৈন্য রক্ষা করিতেন। এই সকল সেনার বেতন রাজকোষ হইতে প্রদান করা হইত। সৈন্যাধ্যক্ষদিগকে তাঁহাদের অধীনস্থ সৈন্যের সংখ্যানুসারে দশহাজারী, সাতহাজারী, অথবা পাঁচহাজারী বলা হইত।

অভিনব ধর্ম্মবিধানের সংগঠন, শাসনকার্য্যের সর্ব্বাঙ্গীন পরিবর্ত্তন ও রাজস্ব সম্বন্ধে নববিধির প্রচলন রাজত্বের সপ্তত্রিংশত্তম বর্ষে (১৫৯২ খৃঃ) সম্পন্ন হইল। এই সময় আকবর "প্রদীপ্ত যশঃপ্রভায় দীপ্তিসম্পন্ন।" মোগল সাম্রাজ্যের গৌরব সর্ব্বত্র বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল, এবং "দূরদূরান্তর হইতে শত সহস্র প্রজার হৃদয়স্রোত ছুটিয়া আসিয়া" মোগলের সিংহাসনতলে ভক্তি ও প্রীতিতে উচ্ছ্বসিত হইতেছিল।

এই সময় মন্ত্রিপ্রধান টোডরমল পরলোকে গমন করিলেন। আকবর তাঁহার সাহায্যেই রাজস্বের নূতন বন্দোবস্ত সুসম্পন্ন করিয়া যশোমন্দিরে অক্ষয় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া গিয়াছেন। টোডরমল আজীবন রাজসেবায় নিরত থাকিয়া জীবনের শেষভাগ ধর্ম্মকর্ম্মে অতিবাহিত করিবার জন্য পুণ্যক্ষেত্র হরিদ্বারে গমন করেন। আকবর এই সর্ব্বগুণসম্পন্ন মন্ত্রীর অভাবে একান্ত ব্যথিত হইলেন। ১৫৯২ খৃষ্টাব্দে আবুল ফজল দুইহাজারী মনসব লাভ করিয়া ওমরাহ-শ্রেণীর মধ্যে গৃহীত হইলেন। এই বৎসরই ফৈজী দৌত্যপদে বৃত হইয়া দক্ষিণাপথে গমন করিলেন। ১৫৯৩ খৃষ্টাব্দে আকবরের সুহৃদযুগলের পিতা শেখ মবারক পরলোকে গমন করিলেন। ইহার দুই বৎসর পরেই ফৈজী ইহলীলা সংবরণ করিলেন। বাদশাহ অন্তরঙ্গ বন্ধুর মৃত্যুতে একান্ত শোকাকুল হইলেন। পর বৎসর আকবর দক্ষিণাপথ বিজয় করিবার সঙ্কল্প করিলেন। এই সময় দক্ষিণাপথ খণ্ড খণ্ড রাজ্যে বিচ্ছিন্ন ছিল। ১৫৯৭-৯৮ খৃষ্টাব্দে আবুল ফজল সর্ব্বপ্রথম যুদ্ধ করিবার জন্য

দক্ষিণাপথে গমন করিলেন। সাহিত্যরথী যুদ্ধক্ষেত্রেও শৌর্য্যবীর্য্যের একশেষ প্রদর্শন করিয়া সকলকে বিস্মিত করিয়া তুলিলেন! এই সময় তিনি রাজভক্তি ও নিঃস্বার্থপরতারও যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করেন। তদীয় ভগিনীপতি খান্দেশের অধিপতি ছিলেন। তিনি আবুল ফজলকে মহার্ঘ্য উপহার প্রদান করিয়া বশীভূত করিবার প্রয়াসী হইলে তিনি বলেন যে,বাদশাহের অনুগ্রহেই তাঁহার সমস্ত ধনলিপ্সা নির্ব্বাপিত হইয়াছে। পর বৎসর আবুল ফজল আশির দুর্গ অধিকার করিলেন। ১৬০২ খৃষ্টাব্দে বাদশাহী সৈন্য খান্দেশ দেশে বিজয়পতাকা উড্ডীন করিতে সমর্থ হইল। এই বৎসরই আবুল ফজল রাজাজ্ঞায় দক্ষিণাপথ হইতে রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সময় পথিমধ্যে শাহজাদা সেলিমের ষড়যন্ত্রে নিহত হইলেন। বাদশাহ চিরসহচরের অপঘাতে শোকাকুল হইয়া দুই দিন অন্নজল পরিত্যাগ করিলেন।

খান্দেশ-বিজয় সম্পন্ন হইলে আকবর নিজপুত্র দানিয়ালের নামানুসারে সে দেশের নাম দান্দেশ রাখিলেন, এবং ফতেপুরের রাজপ্রাসাদের সিংহদ্বারে খান্দেশ-বিজয়ের স্মারকলিপি উৎকীর্ণ করিলেন। এই স্মারকলিপিতে বাদশাহের বহু গুণানুবাদের পর নিম্নলিখিত বাক্যটি খোদিত ছিল। "Said Jesus, (on whom be peace!) The world is a bridge, pass over it, but build no house there. He who hopes for an hour hopes for an eternity. The world is but an hour: spend it in devotion, the rest is unseen."

খান্দেশ-বিজয়ের চারি বৎসর পরে শাহজাদা দানিয়াল অকস্মাৎ মানবলীলা সংবরণ করিলেন। প্রিয়তম পুত্রের অকালমৃত্যুতে বাদশাহ শোকে মুহ্যমান হইলেন। তিনি বৃদ্ধদশায় এই দারুণ শোকতাপ সহ্য করিতে না পারিয়া অন্তিম শয্যায় পতিত হইলেন। ১৬০৫ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে দারুণ ব্যাধি তাঁহাকে প্রবলরূপে আক্রমণ করিল। তৎকালীন ভিষকশ্রেষ্ঠ হাকিম আলী রাজচিকিৎসায় নিযুক্ত হইলেন। তিনি রোগের লক্ষণসমূহ পরীক্ষাপূর্ব্বক ঔষধ প্রয়োগ না করিয়া রোগীর শারীরিক তেজেই উহা দূরীভূত হইবে এই আশা করিয়া অষ্টাহ প্রতীক্ষা করিলেন। নবম দিবসে বাদশাহের দুর্ব্বলতা ও ব্যাধি বৃদ্ধি পাওয়াতে চিকিৎসক বৈদ্যকশাস্ত্রের শরণাপন্ন হইলেন; কিন্তু কোনও ফললাভ হইল না। উদরাময় গুরুতর আকার ধারণ করিল; এবং সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অবশ হইয়া পড়িল। সকলেই বুঝিতে পারিল যে, বাদশাহের আর জীবনের আশা নাই।

আকবরের জ্যেষ্ঠ পুত্র সেলিম ইহার কিছু দিন পূর্ব্বে বিদ্রোহাচরণ করিয়া তাঁহার অপ্রীতিভাজন হইয়াছিলেন। বাদশাহ পীড়াক্রান্ত হইলে রাজ্য-সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্যের ভার সচিবশ্রেষ্ঠ খান-ই-আজমের উপর অর্পিত ছিল। রাজা মানসিংহ আকবর শাহের এক জন প্রধান সেনাপতি ছিলেন; মোগল দরবারে তাঁহার প্রভূত ক্ষমতা ছিল। সেলিমের জ্যেষ্ঠ পুত্র খসরু মানসিংহের ভাগিনেয় ও খান-ই-আজমের জামাতা ছিলেন। বাদশাহের জীবনদীপ নির্ব্বাপিত হইবার উপক্রম হইলে তাঁহারা উভয়ে মিলিত হইয়া সেলিমের পরিবর্ত্তে খসরুকে রাজসিংহাসনে বসাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

বাদশাহ এই সংবাদ পরিজ্ঞাত হইয়া অন্তিম মুহূর্ত্তে রাজসভার সমস্ত ওমরাহকে আপনার শয়নকক্ষে আনয়ন করিবার জন্য সেলিমকে ইঙ্গিত করিলেন। তিনি বলিলেন, "আমার পুত্র ও আমার জীবনের সুখদুঃখভাগী রাজপুরুষগণের মধ্যে যে মনোমালিন্য থাকিবে, তাহা আমি সহ্য করিতে পারি না।" ওমরাহগণ সমবেত হইলে বাদশাহ তাঁহাদের নিকট সময়োপযোগী বাক্যে বিদায় গ্রহণ করিলেন, এবং তাহার পর তাঁহাদের প্রতি সাগ্রহে দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহাদের কাহাকেও মনঃকষ্ট দিয়া থাকিলে তজ্জন্য ক্ষমা ভিক্ষা চাহিলেন ইহার পর সেলিম বাদশাহের পদতলে পতিত হইয়া অশ্রুজলে বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিতে লাগিলেন। বাদশাহ সেলিমকে স্বীয় প্রিয় তরবারি গ্রহণ করিতে ইঙ্গিত করিলেন। অনন্তর বাদশাহের আদেশে সেলিম রাজপরিবারভুক্ত মহিলাবর্গের সুখস্বচ্ছন্দতার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে এবং তদীয় পুরাতন বন্ধুদিগকে প্রতিপালন করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। আকবর সেলিমকে উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করিয়া ধীরে ধীরে চিরকালের জন্য চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। "ঈশ্বর তাঁহাকে সংসারে পাঠাইয়াছিলেন, ঈশ্বরের নিকটই তিনি প্রতিগমন করিলেন।"(২)

---

(২) কোন কোন ইতিহাসবেত্তা নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, আকবর শাহ মানবলীলা-সংবরণ করিবার পূর্ব্বে এসলাম ধর্ম্ম পরিত্যাগ করার জন্য অনুতাপ প্রকাশ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার কলমা পাঠ করেন। ইহা কি বিশ্বাস্য? যে মোল্লার সাহায্যে আকবর মৃত্যুর পূর্ব্বে কলমা পাঠ করিয়াছিলেন বলিয়া ঐতিহাসিকগণ বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহার নাম কাদির জাহান, এবং তিনি নিজেও একজন নবধর্ম্মবিশ্বাসী ছিলেন। কাফি খাঁ আকবরের পুনর্ব্বার এসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার বিষয় কিছুই লেখেন নাই। এরূপ কিছু ঘটিলে কাফি খাঁ অবশ্যই তাহার উল্লেখ করিতেন। কাফি খাঁ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, বদায়ুনি আকবরের ধর্ম্মমত সম্বন্ধে এমন অনেক কথা বলিয়াছেন, যাহা তাঁহার বলা কর্ত্তব্য ছিল না। মোল্লা তাতারসনের সহচর

আকবরের জীবনের উদ্দেশ্য কি ছিল? আবুল বাকি নামক তাঁহার এক জন সভাসদ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন যে, "His obgect being to unite all men in common bond of peace." আকবরের জীবন সফল; সার্দ্ধ তিন শত বৎসরেও যে দেশে মোসলমান শাসন শৃঙ্খলাপূর্ণ ও বদ্ধমূল হয় নাই, তিনি সেই দেশের আপাদমস্তক একসূত্রে গ্রথিত করিয়া মোগলের সিংহাসন দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। আহম্মদ আমিন আকবরের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে লিখিয়াছিলেন, "আকবর স্বীয় সুবিশাল সাম্রাজ্যের প্রত্যেক কোণের শাসনকার্য্য দৃঢ়তাসহকারে ও ন্যায়ানুমোদিতভাবে নির্ব্বাহ করিয়াছেন। তাঁহার রাজসভায় সকল প্রকার অবস্থাপন্ন লোকের সমাগম হইত। এবং সকল শ্রেণীর মধ্যে অনন্ত-শান্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের প্রজাবৃন্দ তাঁহার আশ্রয়ে নিরাপদ-ভাবে বাস করিত। ফলতঃ, ম্যালিসন সাহেব যথার্থই লিখিয়াছেন, "We are bound to recognise in Akbar one of those illustrious men whom Providence sends in the hour of a nation's troubles to re-conduct it into those paths of peace and toleration which alone can assure the happiness of millions."

শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত।

আশ্রম-চিত্র।

গৌতম	... ... আশ্রমের ঋষি।		কক্ষিবান	... দীর্ঘতমার পুত্র।
মহর্ষি গৌতমের শিষ্যগণ।			দীর্ঘতমা	... সূর্য্যপুরবাসী জনৈক ঋষি।
সব্য ও কুৎস	... ... অঙ্গিরার পুত্র।		মালিনী	... দীর্ঘতমার শিশুকন্যা।
মেধাতিথি, কপিঞ্জল	... কণ্বপুত্র।		উশীজা	... দীর্ঘতমার অঙ্কশ্রী।
নোধা	... ... গৌতমপুত্র।			

আকবরের যে কুৎসা প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতেও বুঝা যায় যে, তিনি কখনও এসলাম ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিবার জন্য অনুতাপ করেন নাই।

১। মহাপদ্মসরস্তীরে সূর্য্যপুর।
দীর্ঘতমার কুটীর।

উশীজা।

ভুলে যাও সেই কথা, ভুলে যাও বাছা!

কক্ষিবান।

ভুলিতে পারি না, মা গো, হৃদয়বেদনা;
মা গো, মা গো, মনে মোর পড়ে প্রতিক্ষণ
কঠোর ধিকার সেই প্রিয় বয়স্তের,—
আমি বেদহীন, অন্ধ, অসুর সমান;
কুলপতি গৌতমের আশ্রমপালিত
মৃগগণ(ও) মোর চেয়ে শ্রেয়ঃ শতগুণে!
জিজ্ঞাসি' জেনেছি, মাতঃ, পিতৃদেবমুখে
কেমন গৌতমদেব, তপোবন তাঁর
কি অপূর্ব্ব প্রেমরসে সরস শীতল!
দেখিব সে গৌতমের আশ্রমকানন,
পবিত্র পরশে তাঁর জ্ঞানের অঞ্জনে,
খুলে যাবে চিরবদ্ধ অন্ধ এ নয়ন!
যেতে হবে মা গো, আজ গৌতমআশ্রমে
দ্বিজযোগ্য ব্রহ্মচর্য্যসাধনের তরে;
পেয়েছি মা! অনুমতি জনকের কাছে;
এসেছি মা! কাছে তব; চাহি মা, আশীষ,
অক্ষর, অমৃত তোর পদরজঃকণা।

উশীজা।

বাছা! তুই জন্মাবধি যাস্নি কখনো
আমার অঞ্চল ছাড়ি', কি করিয়া তোরে
ছেড়ে দিই আজ? তুই মণিযষ্টি মোর
এই অন্ধ হৃদয়ের—অবলম্বহীন!
তুই মোর একমাত্র আশ্রয়, আরাম;
এই অন্ধ নয়নের তুমিই কেবল
সমুজ্জ্বল দীপশিখা; তুই গেলে চলে
কে মোর পূজার তরে করিবে চয়ন
পার্শ্বশ্যাম কুরুবক, কনক অশোক,
নবকর্ণিকার? রৌদ্রতপ্ত মধ্যদিনে
কে মোরে লইয়া যাবে ধরিয়া ধরিয়া
গৃহপাশে সুশীতল সপ্তপর্ণচ্ছায়?
কে করিবে পদ্মপত্রে শীতল বীজন?
মণিশিলা-সোপানের শতপংক্তিক্রম
কি করিয়া অতিক্রমি' প্রাতঃস্নানশেষে
আসিব কুটীরে মহাপদ্ম-সরঃ হ'তে?

কক্ষিবান (সবাষ্পে)

স্নেহময়ী অয়ি মাতঃ, যদিও আমার
হয় ইচ্ছা অনুদিন, শত শত বার
তোমার হৃদয়-সরে ডুবিয়া ডুবিয়া,
করি স্নেহামৃতপান; যদিও হৃদয়
তোমার বাৎসল্য-রস অমৃতনির্ঝর
ছাড়িয়া কোথাও শান্তি পায় না কখন;
তবুও, তবুও আজি হে দেবি, জননি!—

উশীজা।

যাবে যদি, যেতে যদি একান্ত বাসনা
নির্ম্মল সারদাস্থানে শান্ত তপোবনে
গৌতমের, পুণ্যতোয়া মধুমতীতীরে,
কি আর বলিব তোরে? এস বাছা, তবে;
আশীষিনু তোমা বৎস! হে নয়নমণি
দীন অন্ধ উশীজার, যদি কোন দিন
মনে পড়ে তোর এই অন্ধ জননীর
এই পর্ণকুটীর অঙ্গন; গৌতমীর
প্রাণপণ স্নেহরাশি ভুলিয়া কখন
যদি মনে পড়ে এই উটজ আশ্রম
তোর অন্ধ জননীর, বাছা কক্ষিবান,
শুধু একবার তরে আসিও হেথায়
নিয়ে গুরু-অনুমতি; বাছা, জান তুমি,
তোমা ছাড়া প্রাণ মোর অতি অসহায়

কক্ষিবান্।

কেন মা গো, কেন হেরি এত আকুলতা
হৃদয়ের? অগ্নিকণা সম আজি তব
তোমার সে দীপ্তবাণী, সংযম সাধনা
শিখাতে যখন মাতঃ, আজি তা' কোথায়?

অনুদিন সমাহিত তপোযজ্ঞানল
করে কি হৃদয় এত তরুণ তরল ?
জননি, তোমার এই আকুলতা হেরি
সমগ্র পরাণ মোর গুরুশিলা-ভারে
হইয়াছে অবনত ; ভগিনী আমার
ঘুরিতেছে এত ক্ষণ হেথায় হোথায়
শূন্য বিচলিত মনে ; স্নেহে সুতরল
পরিপূর্ণ বুকখানি নিরুদ্ধ নিশ্বাসে
যেন বাঁধ ভাঙ্গে ভাঙ্গে ; ফুলিয়া ফুলিয়া

[মালিনীর প্রবেশ।]

হৃদয়-আবেগ চাপি' কাঁদে অনিবার ;

মালিনী।

দাদা, দাদা, পিতা মোর আসিছেন হেথা,—
যাবে ? যাবে ? যাবে তুমি আমাদের ছেড়ে ?
মনে কি হবে না তব সে মাধবীলতা
কুটীরের পূর্ব্বদেশে ? মনে কি হবে না
সেই দুটি মৃগশিশু 'অমলা' 'মঙ্গলা' ?
মনে কি হবে না তব সে পলাশতরু
চম্পকবনের পাশে আলবালে যার
তুমি আমি দুই জনে ঢালিতাম জল ?
একা আমি সারারাত্রি করি' জাগরণ
কি করিয়া নিবারিব মুস্তা-উৎপাটন
বন্য বরাহের ? পিতা মোর এইবার
নিয়ে যাবে তোমা, দূর গৌতমআশ্রমে ;
কি করিয়া থাকি হেথা জননীরে লয়ে ?
তুমি চলে গেলে দাদা, এলালতাগুলি
লুটাইবে ভূমিতলে, শোকে, অনাদরে।

কক্ষিবান।

অয়ে মোর স্নেহময়ি, ভগিনি, মালিনি,
পিতার আদেশ মোর, যাব আমি আজ
মহাঋষি গৌতমের পবিত্র আশ্রমে।
বাষ্পবারিপূত তোর নয়ন, অধর
মেঘজল-পরিস্নাত পল্লবের মত,
দিতেছে আশ্বাস মোরে ; আমি গেলে চলে'
এই দেবী মহীয়সী জননী আমার,
আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রীতি-উপবন,
সবি তোর স্নেহবুকে পাইবে জীবন !
আসি তবে, প্রাণপ্রিয় ভগিনি আমার !

মালিনী।

আনিয়াছি আজি এই বিদায়ের দিনে,
দাদা, দাদা, তব প্রিয় পিয়ালমঞ্জরী
করহ গ্রহণ ; দাদা, এই নিদর্শন
রাখিনু চরণে তব ; দেখিবে যখন
অধ্যয়ন-অবসরে এ তনু মঞ্জরী,
পড়িবে—পড়িবে মনে মোদের কুটীর,
এই উপবন তব,— তব ভগিনীর।
যাব কিছু দূর আমি তোমার সহিত ;
কিছু দূর যেতে দাদা, দিবে না আমায় ?

কক্ষিবান।

যেও বোন ! যেও মোর সাথে কিছু দূর ;
মা গো, স্নেহময়ি, দেবি, দাও অনুমতি ;
দাও মোরে পদধূলি !

উশীজা (সাবেগে)

বাছা কক্ষিবান,
এস'গে এসগে আজ গৌতম আশ্রমে ;
আমি বুঝেছিনু যাহা এতক্ষণ ধরি'
তাহা শুধু হৃদয়ের আবেগের ভুল !
যাও বৎস, যাও তুমি অমর আশ্রমে
গৌতমের চিরপূত দিব্যনিকেতনে !
বহুছায়াসমাকীর্ণ বহুশাখি-বৃত
একমাত্র সনাতন বৃদ্ধ বট সম
মহর্ষি গৌতমদেব ; এই ভারতের
প্রসন্ন ললাটতলে মহারাজ-টীকা !
আর আর্য্যা গৌতমীর প্রতি রোমকূপ
পরিপূর্ণ প্রীতিরসে ; মূর্ত্তিমতী দয়া
তিনি সে আশ্রমগৃহে ; অন্নপূর্ণা সমা
চিরদিন মুক্তহস্ত স্নেহবিতরণে,
চন্দনলেপন সম পরশ তাঁহার

মুছে নেয় শত ব্যথা হৃদি-ক্ষত হ'তে!
সুশ্রূষার মত তিনি সদা প্রতিভাত
কোমল মধুর ; আজি সে তীর্থসঙ্গমে
যেতে চাও তুমি বৎস, নিষেধিব আমি ?
কভু নহে, কভু নহে ; ভুলো না কখন—
মনে রেখো অনুদিন পিতৃদেবে তব
শুভ্র মহিমায় অই হিমবান সম,
সগৌরবে সমুন্নত!

কবি' প্রাণপণ

পূত মহানাম্নী ব্রত করিও সাধন,
শুভ চতুর্দ্দশনীতি করিয়া পালন।
শিখিও শকরীছন্দঃ বৃষ্টিজলধারে,
সৌদামিনী-পরকাশে, মেঘের গর্জ্জনে ;
বিদ্যাব্রত স্নাতকের অমল মূরতি
দেখাইও মোরে বৎস, শিক্ষাসমাপনে।
সাবিত্র উচ্ছ্বাসময় পূত ঋকমালা
শুনিব ও মুখ হ'তে পশ্চিম বয়সে ;
শুষ্ক এ হৃদয় মোর পুরাইও বাছা,
বেদকল্পতরুফলে—পূর্ণ সুধারসে।
লও বাছা, এ আশীষ, এ নির্ম্মাল্য মোর ;
দয়াময় ভগবান করুন তোমার
পূর্ণ মনস্কাম ; মনে রেখো, বাছা মোর,
একমনে অনুদিন বিপদে সম্পদে
সেই দিব্য ধ্রুবতারা দেব বিশ্বনাথে!

কক্ষিবান।

জননি গো! তবে আসি ; স্নেহের ভগিনি,
আসি তবে; নিশিদিন করি' প্রাণপণ
থাকিও মায়ের কাছে ছায়ার মতন ;
মা গো, আসি—

মালিনী।

দাদা আমি যাব সাথে তোর!

[মালিনী ও কক্ষিবানের প্রস্থান।]

উশীজা।

বিশ্বনাথ, দেখো দেব, তনয়ে আমার!
কক্ষি অতি অসহায়, দেখো তুমি দেব!
সঁপিনু, সঁপিনু দেব! উৎসঙ্গে তোমার
আজ, এ পুষ্পকোরক—হৃদয় আমার;
করো তারে বিকশিত সৌরভে গৌরবে
প্রসারি' অভয়-কর—

[ইতি প্রস্থিত।

২। সারদা-স্থান।

মধুমতী-সরস্বতী-তীরে গৌতমাশ্রম।

[মহর্ষি গৌতমের প্রবেশ।]

গৌতম।

এ কি সুপ্তি সুতরল! ধরণীর কোলে
নীরবে মিলায়ে গেছে মানব-হৃদয়!
ধ্বনিহীন, গতিহীন স্তম্ভন অক্ষয়!
আছে শুধু অতিমৃদু শান্ত আবরণ
প্রকৃতিলক্ষ্মীর বুকে ; তরুণ জীবন
ফেনসম অতি তনু আস্তরণতলে
জাগিবে—জাগিবে যেন মদবেগভরে।
ধূসর অধরপ্রান্তে পূত পূর্ব্বাশার
হৈম মহিমার এক ম্লান রেখাপাত
দেখা যায় ধীরে ধীরে! বনতরুশাখে
চমকিত বিহগের নিদ্রালসধ্বনি
প্রকৃতির মর্ম্মতলে পশিছে সুধীরে
হরষ-রোমাঞ্চ সম এই ধরণীর!
শিরঃশিলা, তেজবন, নদী সরস্বতী,
মধুমতী স্রোতসীর প্রাণ সুচঞ্চল,
দূর হয়াশ্রম, কিংবা এ সারদাস্থান,
সকল লইয়া বুকে কি সুপ্তি নির্ম্মল!
অই আসিছেন ঊষা, দেব-বরণীয়া,
ধরণীর আমাদের প্রসন্ন জীবন!
হে অর্য্যমা, বৃহস্পতি, হে মিত্রাবরুণ,
প্রীতিমান দেবগণ, কর গো চালিত
বিশ্বদেবগণে (১) সদা অকুটিল পথে!

(১) বিশ্বদেব—অতিথি।

এ মর জগতে মোরা অনিত্য, সচল
বিদূরি' রাক্ষসগণে দাও দেখাইয়া
সনাতন ঋজু পথ হোমসমাপনে!
তোমাদের সুকল্যাণ আশীষে নিয়ত
অভাব দূরিত হোক যজ্ঞায় পশুর!
বনস্পতি অনুদিন হ'ক মধুময়;
কর আরো মধুময় ওষধি, আকাশ,
বায়ু, নদী, প্রস্রবণ, সর্ব্ব-জনপদ!
হউক মধুরতর উষা, ধেনুগণ—
মোদের ধরণী! আর অমৃত-জীবন,
করুক বর্ষণ অই সবিতৃ-কিরণ
বিদূরিয়া সর্ব্বগ্লানি! হে মিত্রাবরুণ!
নিবেদন এই মোর। ওঁম্ শান্তি ওঁম্!
মেধাতিথি! মেধাতিথি!

[মেধাথিতির প্রবেশ।]

অই দেবী উষা
কামদাত্রী, আসিছেন আমাদের পানে;
ছাড়ি' বেদপাঠ তুমি অপর রাত্রের,
সব্য, কুৎস, নোধা আদি শিষ্যগণে মোর
কর জাগরিত, আমি চলিনু এখন
পুণ্য সরস্বতীনীরে করিবারে স্নান।
দেখো' যেন আশ্রমের সর্ব্ব অনুষ্ঠান
সাবধানে হয় সমাহিত; অয়ি বৎস,
তুমি মোর চিরসৌম্য, পবিত্র, নির্ম্মল,
লব্ধকাম, প্রিয় শিষ্য, সত্যে অবিচল।
মনে রেখো' আশ্রম-মর্য্যাদা!

[ইতি প্রস্থিত।

মেধাতিথি।

সস্নেহ, সরল,
কি মধুর আর্য্য-উপদেশ! যত শুনি তাঁর
সুনৃত অমর বাণী, হৃদয়-আধার
তত পূর্ণ হয়ে উঠে; কি মূর্ত্তি মহান্,
সুকঠোর! মধুরসে কত গরীয়ান্
হৃদিপদ্ম তাঁর! মানি ধন্য সেই জন,—
সেই পুত স্নেহসরে করি' সন্তর্পণ
সার্থক যাঁহার জন্ম!

(উচ্চস্বরে) প্রিয়সখাগণ!
অয়ি সব্য, অহে কুৎস, কপিঞ্জল, নোধা,
উঠ, উঠ, ছাড় নিদ্রা; আসিছেন অই
সবিতার মাতৃদেবী, উষা জ্যোতির্ম্ময়ী!
উঠ, উঠ;

[কপিঞ্জল ও কুৎসের প্রবেশ।]

প্রাণ ভরি' স্তব কর তাঁর!
পরিচর্য্যা-প্রিয় আমি আশ্রম-ধেনুর
চলিনু এখন।— [ইতি প্রস্থিত।

কপিঞ্জল ও কুৎস।

এস, আকাশ-দুহিতে!

(সমস্বরে)

কর দূর অন্ধকার অন্তরে, বাহিরে,
সমগ্র সৃষ্টির; আন, আন, বরণীয় ধন
এ বিশ্বকুটীরে, অয়ে ধনবতি উষে!
হে বিচিত্রে! নেত্রী তুমি সুনৃত বাক্যের।
সুকল্যাণরূপা তুমি; কর দেবি! দান
বহু ধেনু, অশ্ব ধন; অয়ে স্তুতিপ্রিয়ে!
সত্যবতি, সনাতনি, অয়ি চন্দ্ররমে!
ঢাল হেম-হাসিধারা, দিগন্তরঙ্গিনী!
খুলিতেছ অন্নবতি! হে দেবদুহিতে!
ধীরে ধীরে ধরাধামে রুদ্ধ কর্ম্মস্রোত;
তোমার প্রসন্ন বক্ষে কত অভ্রপোত
পেলব শিশুর মত ঢালে মৌনবাণী;
অয়ে ধরণীর ধ্রুব ধাত্রী পুরাতনী!
রহিয়াছে তোমাতেই চেষ্টিত জীবন
ধরণীর; রূপ তব ভুবনপ্রকাশ!
খুলিয়াছ দ্বার দেবি! বিশ্ব-হৃদয়ের!
কিরণ-অঙ্গুলি-দল-পরশে, কোমল।
অখণ্ড উপমা তুমি সৌন্দর্য্যসৃষ্টির;
রমণীয়া তুমি দেবি! পুষ্টির মতন;
বিস্তীর্ণা ধরণী মত; স্নেহনিকেতন

পর্ব্বতনির্ঝর মত ; শিশুকন্যা সম
সঞ্চারিণী আনন্দের ছায়া অনুপম!
অয়ি মাতঃ! কর তুমি যশস্বী মোদের,
অসুর-আহবে দেবি! কর তুমি জয়ী,
ভিক্ষা এই পদে তোর উষে হিরণ্ময়ী!
এই ক্ষুদ্র হৃদয়ের প্রীতিপাত্র সম
এই হেথা সোমাধার ; হে অর্জ্জুনি উষে,
কর দয়া, কর পান অভিষুত সোম—
ওম্ শান্তি, ওম্ শান্তি, ওম্ শান্তি, ওম্!

[ইতি প্রস্থিত।

৩। গৌতমাশ্রম ; পুষ্পবাটিকা।

[সব্য ও কুৎসের প্রবেশ।]

কুৎস।

এ ভাবে হেথায় কেন প্রিয় কপিঞ্জল ?

সব্য।

কেন কাঁদিতেছ বৎস ? কে তোমারে হায়
বাঁধিয়াছে এইরূপে ?

কুৎস।

সে কোন্ কঠোর ?

(বন্ধন খুলিতে খুলিতে)

কেন তোর এই দশা ? কেন কাতরতা
এই বৎস, তোর ? (বুকে চাপিয়া ধরিয়া)
কেঁদ না, কেঁদ না আর।
বল কি হয়েছে ? কোন্ নির্ম্মম নিষ্ঠুর
এরূপে বেঁধেছে তোরে অমৃতা লতায়
এত দৃঢ়রূপে এই কুরুবক-শাখে ?

সব্য।

শান্ত হও, স্নেহময়, কাঁদিও না আর।
বল কি হয়েছে তব প্রিয় কপিঞ্জল ?
অনুদিন প্রাণ ভ'রি কত ভালবাসি,
এ নিরীহ, ঋজুদৃষ্টি, সরলহৃদয়,
উৎসুক আননখানি প্রীতির ৺কুর ;

কত বেঁধেছিস্ মোরে এই কয় দিনে
সুকোমল শতবাহু প্রীতির বেষ্টনে!
শান্ত হও প্রাণময়, কাঁদিও না আর!
বলে যাও অকাতরে কি দুঃখ তোমার!

কপিঞ্জল।

দেব, আজ এসেছিনু জননীর তরে
এই পুষ্পবাটিকার মাধবীবিতানে
কসুমচয়ন তরে ; করি তাড়াতাড়ি,
আর্য্য নোধা এসে মোরে দিলেন আদেশ,—
অশোকের মূলে অই শুষ্ক পত্ররাজি
ফেলিতে সরায়ে দূরে ; করিতে নির্ম্মল
ওই বেদীপীঠ, তাঁর আসনের তরে।
'অবহেলি জননীর একান্ত আদেশ
কভু পারিব না' আমি বলিনু যেমনি,
রোষভরে আকর্ষিয়া শিরোজটাভার,
অমনি আনিল মোরে এই তরুতলে।

সব্য।

বুঝেছি সকল, বৎস, ভুলে যাও সব।

কুৎস।

জান, বৎস কপিঞ্জল, আমরা সকলে
কত ভালবাসি তোরে। পেয়েছিস্ ব্যথা,
এই করদ্বয়ে বৎস ? চুম্বিনু হেথায়।
সব ব্যথা চলে গেছে ?

কপিঞ্জল।

নাহি ব্যথা মোর!
যাবে না তোমরা দাদা, গোচরণভূমে,
সেই স্নিগ্ধ শষ্পশ্যাম ঘন তালীবনে,
'কজ্জলা' 'মাণিক' আদি নিয়ে ধেনুগণ।
বড় ভালবাসি আমি দেবদারুছায়
লভিতে বিশ্রামসুখ, শির রাখি ধীরে
গোবৎসের সুকোমল তনু উপাধানে!
বড় সাধ যায় মোর নির্ভীক জীবন
মধুকণ্ঠ বিহগের শুনিতে কূজন ;
দরীমুখ হ'তে যবে বহে সমীরণ

কাঁপায়ে নীরব, শান্ত, মোদের আশ্রম,
মনে হয় শৈলরাজি নিবিড় নিভৃতে
প্রকাশিছে রাশি রাশি রহস্যনিচয়।
যাবে না, যাবে না আজ নিয়ে ধেনুগণ?

কুৎস।

আমরা সকলে মিলি যাব গোচারণে;
আয়ুষ্মন্, যাও ত্বরা, নিয়ে এস সাথে
বৎস সহ ধেনুগণ, এই বনপথে।
আমরা সকলে মিলি' যা'ব গোচারণে।

[কপিঞ্জল প্রস্থিত।

সত্য।

প্রিয় কুৎস, যবে আমি হেরি কপিঞ্জলে—
ভাসে মনে অনুজার প্রসন্ন আনন,
তারি সনে জনকের দিব্য তপোবন।
মনে পড়ে সেই মোর শ্যামলা জননী,
নদীতীরে সেই পর্ণশালা, সেই দেবী
অভয়া বরদা সম, সে মূরতি মার।
মনে হয় সেই শেষ বিদায়ের দিনে
শির'পরি জননীর অমৃত পরশ;
মনে হয় জনকেরে; স্নিগ্ধ প্রাণারাম
পরিপূর্ণ স্নেহরসে হৃদয় যাঁহার,—
মধুভরা হিরণ্ময় অমৃত-আধার।

কুৎস।

দাদা, তব মধুমুখে অমৃতকাহিনী
শুনিতে শুনিতে মোর সমগ্র হৃদয়
কি এক আবেগভরে উঠিছে উথলি'।
আজি দিব্য মনে হয় কনক-বাহিনী
তর্ তর্ বহে যায় সরল সচল
পিতার আশ্রমপার্শ্বে ধীর সমীরণে।
মনে হয়, তুমি, আমি, ভগিনী আমার,
কত না আকুল হ'য়ে কত শত বার
ঝাঁপিয়াছি সেই জলে! ঘন স্নিগ্ধচ্ছায়
বনস্পতিতলে মোরা বসিতাম যবে
করিত বীজন কত বেতসমঞ্জরী;
কত অনিমেষনেত্রে রহিতাম চাহি'
সেই দূর শৈলমালা, শ্যাম সানুমান,
লীলাময় শত শত তরঙ্গ তরল,
কজ্জল ভ্রূভঙ্গী সম শ্যামা প্রকৃতির!
দেখিতে দেখিতে মোরা আবেশবিহ্বল
এলাইয়া পড়িতাম, শান্ত, অবিচল
ধরিত্রীর শ্যাম বুকে, প্রাণকপোতের
দুরু দুরু অনিবার হৃদয়কম্পন
মনে হ'ত ধরণীর হৃদয়স্পন্দন!

সত্য।

গৃহ ছাড়ি যবে মোরা সাবিত্রচর্য্যায়,
উপদেশ আশীর্ব্বাদ জনক জননী
দিয়াছেন যত, আজি অক্ষরে অক্ষরে
কনকনিকষতলে তড়িতলেখায়
জাগিতেছে তাহা। (নতজানু)

হে পিতঃ! জননী!

করযোড়ে মাগি আমি পদে তোমাদের
যেন মোরা নাহি হই অযোগ্য সন্তান
তোমাদের! হয় যেন মোদের জীবন
পুণ্য, মূর্ত্তিমান সিদ্ধ উপদেশ সম।

[কপিঞ্জলের প্রবেশ।]

কপিঞ্জল।

চায় দাদা! আর্য্য নোধা প্রহারিতে মোরে।
এস হেথা; দেখ, দেখ, অই বনপথে
ধায় সব গাভীগণ হর্ষে পুচ্ছ তুলি'!

মেধাতিথি। (নেপথ্যে)

এস, এস, এস হেথা অয়ি বৎসগণ!

প্রবেশ করিয়া।

মধ্যন্দিন সবনের কর আয়োজন।
গৌতমী জননী সবে ডাকিছেন অই
নিয়ে শক্তু করতলে প্রাতরাশ তরে।
যাও সবে করি' ত্বরা; কুৎস প্রীতিমন্!
যাবে তুমি আজি তব প্রিয় গোচারণে,
ফিরো' তুমি মধ্যদিন সবনসময়;

সমিৎ কুশ-আহরণে বৎস কপিঞ্জল
যাবে আজ সাথে মোর সুষোমার তীরে।
যাবে সব্য সোমলতা, গীন্‌’তার তরে
এ আশ্রম-উপকণ্ঠে সুগহন বনে।
আর যেতে হ’বে তোমা ফল-আহরণে।
[ইতি প্রস্থিত।

৪। গৌতমাশ্রমের একদেশ।

(বিবদমান সব্য, কুৎস ও নোধা।)

সব্য।

ভারি ত বুঝেছ তুমি! অগ্নিদেব চেয়ে
শ্রেষ্ঠ বুঝি ইন্দ্রদেব? কি বিদ্যা তোমার!

নোধা।

তা' নয় কি? ইস্! তুমি কত না পণ্ডিত
নন বুঝি ইন্দ্রদেব সর্ব্বদেবতার
মহারাজ? বুঝ না ত কিছু, সুনিপুণ
বাক্যজালে বিশ্বজয়ী তুমি!

কুৎস।

থামো' এবে।
নাহি হ’লে অগ্নিদেব শ্রেষ্ঠ মহত্তর,
গুরুপাদ কভু কিগো করিতেন তাঁর
প্রাণ ভরি' স্তবগান?

সব্য।

ওই খাঁটি কথা!
দেখিছ না একাদশ গৌতম-সূক্তের
দেবতা পাবক দেব, শুদ্ধ, মূর্ত্তিমান?

নোধা।

হ’লেই বা; ইন্দ্রদেব বড় সব চেয়ে;
তিনি বৃষ্টি-অধিপতি, বলপতি তিনি!

কুৎস।

অগ্নিদেব দ্যুতিমান সবিতার মত
অশ্রান্ত পালনে রত এ বিশ্বমণ্ডলে।
অহর্নিশি একতানে মেধাবী সকল
তাঁরি স্তবগানে পূর্ণ করে নভঃস্থল।

নোধা।

ইন্দ্রদেব মহীয়ান, যা' বল না ভাই,
সে ত স্বতঃসিদ্ধ কথা! বল দেখি তবে
'ঋদ বীরস্য বৃহতঃ' কাহাকে বুঝায়?

কুৎস।

কি হ’ল তাহাতে? সে ত মিত্রাবরুণির
আখ্যা এক!

নোধা।

হা, হা, তুমি বলিলে ত বেশ!
তর্কবলে কেড়ে' নিয়ে পদবী ইন্দ্রের
অনায়াসে দিতে দেব মিত্রাবরুণিরে
কত না চতুর তুমি?

সব্য।

বিদ্বান্ আর কি!
'মুষিবান' অর্থটুকু সেই ত সেদিন
ভুলেও আসেনি হায় বুদ্ধিতে যাহার,
সেই সুপণ্ডিত আজি করিছে বিচার—
ইন্দ্রদেব, অগ্নিদেব, কে উচ্চে কাহার!

নোধা।

কে ডেকেছে তোমা হেথা? জানি আমি ভাল
গিয়ে' মেধাতিথিপাশে জিজ্ঞাসি' এখন
জানিব কে মূর্খ হেথা।

[দীর্ঘতমা ও কক্ষিবানের প্রবেশ।]

দীর্ঘতমা।

অয়ি বৎসগণ,
কত মনোরম এই আশ্রমকানন!
সুপবিত্র হোমগন্ধে পবিত্র আমার
সমগ্র অন্তর। যেন তীর্থস্নানশেষে
পাইয়াছি মূর্ত্তিমান পুণ্যের মন্তন,
পদ্মের কোরকসম তোদের আনন!
বৎসগণ! কুলপতি কোথা তোমাদের?

নোধা।

প্রণাম তোমায় দেব!

সব্য ও কুৎস।

প্রণমিনু, তাত।

ও পদকমলে; করুন বিশ্রাম, দেব,
ক্ষণকাল এই বৃদ্ধ বকুলের ছায়।

সব্য।

যাই আমি, নিবেদিতে আগমন তব
মহর্ষির পদে।

[প্রস্থানোদ্যত।

দীর্ঘতমা।

হও সুখী, লব্ধকাম।
বৎস! তিষ্ঠ ক্ষণতরে; শুন এক কথা;
ব'লো বাছা মহর্ষিরে, সুর্য্যাপুর হ'তে
দীর্ঘতমা সুত সহ যাচে দরশন
তাঁর।

সব্য।

শিরোধার্য্য অনুমতি তব।

[নিষ্ক্রান্ত।

দীর্ঘতমা।

আহা, আহা, বাছাদের সুকোমল বাণী
ঢালি' দেয় প্রাণে মম কি অমৃতধার!
কত কমনীয় অহো ঋষির আশ্রম!
পথে পথে কতবার দেখিয়াছি কত
হোমধূমে হইয়াছে কজ্জ্বলবরণ
আশ্রমপল্লবগুলি; বৃদ্ধ বটচ্ছায়
বিশ্রামিছে মৃগশিশু নিঃশঙ্ক-অন্তরে!
আশ্রমবীথিকাতলে অরধ-চর্ব্বিত
পড়িয়াছে কুশতৃণ খণ্ড রেখাকারে!
কত শত পশুপক্ষী নির্ভীকহৃদয়ে
একাধারে আলবালে করিতেছে পান
সুনির্ম্মল জল! এ আশ্রমসরসীর
শীকরে শীতল, শান্ত, পবিত্র পবন,
আনে দূর হ'তে শালনির্য্যাসসৌরভ!
আতাম্র পল্লবগুলি কত মনোহর
আশ্রমের উচ্ছ্বসিত প্রাণরস সম।
দেখিয়াছি ঊর্দ্ধগামী পূত যজ্ঞধূম
স্খলিত-বসন সম জটিল, চঞ্চল,
আঁকি বাঁকি ধীরে ধীরে উঠে শূন্য পানে!
বৎসগণ, তোমাদের মৃণালকোমলে
পরিপূর্ণ দেহযষ্টি নেত্রোৎসব মোর!
নাম কি তোমার, বৎস!

কুৎস।

প্রণমি চরণে।

নাম মোর কুৎস; আমি অঙ্গিরার পুত্র
কনকবাহিনীতীরে ভূতেশ্বরপুরে
আছে মোর জনকের আশ্রমকুটীর।
সরল-পাদপমূলে অই শিলাতল
কর অলঙ্কৃত দেব! অতিশ্রান্ত তুমি;
কিন্তু—দেব—কিন্তু—

দীর্ঘতমা।

বলে যাও, বল তাত।
কোন ভয় নাই বাছা!

কুৎস।

পূজ্য আর্য্যপাদ
পিতার আশ্রমবাসী ছিলেন কি কভু?

দীর্ঘতমা।

বৎস! আমি তুচ্ছ শিষ্য তব জনকের;
আজি বহু বর্ষ গত, গুরুপদতলে
বসিবার সে অদৃষ্ট হয়নি আমার!
বৎস কি নাম তোমার?

কুৎস।

দেব, ইনি পুত্র
মহাঋষি গৌতমের; নোধা নাম তাঁর।

নোধা।

প্রণমি তোমায় দেব!

দীর্ঘতমা।

হও চিরজীবী!
বৎস! পূর্ণ হোক্—

[গৌতম, সত্য ও মেধাতিথির প্রবেশ।]

দীর্ঘতমা ও কক্ষিবান।

প্রণমি চরণে তব!

গৌতম।

হও পূর্ণমনস্কাম, হও চিরজীবী!
বল বৎস, সার্ব্বাঙ্গীন কুশল তোমার—
শিশুকন্যা মালিনীর, জায়া উশীজার?
আছে ত কুশলে তথা সর্ব্ব জনপদ?

দীর্ঘতমা।

সকলের সার্ব্বাঙ্গীন কুশল তথায়।
এই বৎস মোর, চাহে ব্রহ্মচর্য্য তরে
থাকিতে ও পদতলে, দাও দেব স্থান;
দীর্ঘশ্রবা নামে এক বয়স্য ইহার,
তীব্র পরিহাসে বহু করি তিরস্কার
বলে'ছিল এরে দেব, 'তব আশ্রমের
মৃগগণও বহু উচ্চে এই বালকের;'
সেই হ'তে এ বালক মানে না নিষেধ,
চাহে শুধু তব পদধূলিকণাসম,
থাকিতে ও পাদমূলে।

কক্ষিবান্।

দাও প্রভু স্থান,

(ভূমিষ্ঠ হইয়া)

সুদুষ্কর ব্রহ্মচর্য্যসাধনের তরে
ও পদকমলে দেব, দাও মোরে স্থান!
এ তুচ্ছ পরাণ মোর নিতান্ত আকুল,
দাও স্থান, দাও প্রভু!

গৌতম।

বৎস! ভয় নাই।

হেথা তুমি পুত্রসম থেকো অনুদিন
সত্য, কুৎস, কপিঞ্জল, মেধাতিথি সহ।

দীর্ঘতমা।

আজি হ'তে কক্ষিবান, ইনি পিতা তব,
জননী গৌতমী আজি জননী তোমার!
যতদিন, —যত দিন, ব্রতসমাপন
নাহি হয় তব, তত দিন কিংবা চিরদিন
এ আশ্রমবাটিকার পর্ণশয্যাতল
তোমারি বিরামস্থান; আজি হ'তে, বৎস,
এ আশ্রম ধরণী তোমার; আজি হ'তে
ভুলে যাও সংসারের বিলাসবিভ্রম;
জ্ঞানের সাধনা তরে হও ব্রহ্মচারী;
এই তব অতি শুভ সঙ্কল্পসময়;
প্রাণপণে সত্যমধু করি' আহরণ
পূরিও হৃদয়-কোষ; ঋজু প্রাণমন
রাখিও অক্ষত, করি' সত্যে বিচরণ!
আজি হ'তে অনুদিন সম্মুখে তোমার
সত্যের পুরাণ কবি অপূর্ব্ব মহান
মহর্ষি গৌতম দেব; প্রেমকাব্য তাঁর
অক্ষয় অতুল এই আশ্রমকানন!
কভু ভুলিও না বৎস, মর্য্যাদা সত্যের;
ভুলিও না গুরু ব্রত আশ্রমশিষ্যের!

গৌতম।

যাও সত্য, মেধাতিথি, এঁরা পথশ্রমে
নিতান্ত কাতর; প্রিয় পরিচর্য্যা করি'
শ্রমখেদ কর দূর;

আজি বৎসগণ!

কক্ষিবান তোমাদের এক সহোদর;
কক্ষিবান যেন বৎস তোমাদেরি হয়;
জ্ঞানতীর্থে সকলের ঋজু প্রাণস্রোত
বহে যেন এক দিকে—অভিন্ন, অক্ষয়!

[ইতি প্রস্থিত।

মেধাতিথি।

আর্য্যপাদ, অই বৃক্ষবাটিকার পাশে
আছে পম্পাসর। দেব! শৈলের-সৌরভে
আমোদিত তীরবন; চলুন সেথায়;
অবগাহি' তথা, দেব, মণিবেদিকায়
করিবেন সন্ধ্যা শেষ।
(সত্যের প্রতি) যাও সাথে এঁর।

[সত্য ও দীর্ঘতমা প্রস্থিত।

কুৎস, তুমি নিয়ে' যাও, বৎস কক্ষিবানে

আশ্রমজননী আর্য্যা গৌতমীর কাছে।
চল নোধা! যাই মোরা ফল-আহরণে,
ঋষিবর দীর্ঘতমা, কক্ষিবান তরে।

[প্রস্থিত।

৫।

আশ্রমোপকণ্ঠে নির্জ্জন প্রদেশ।

সব্য ও কুৎস।

আজ ভাই, প্রাণ মোর একান্ত আকুল;
জানি না, জানি না, কোথা ঝটিকা, ভীষণ
জমিতেছে ধীরে ধীরে; অন্তরে বাহিরে
এক মহা আকুলতা ঘিরিয়া, ব্যাপিয়া,
করিয়াছে অভিভূত হৃদয় আমার!
প্রতি রোমকূপপথে গ্লানি, অবসাদ
পশিছে জীবনমূলে!

কুৎস।

দাদা, এই তুমি
আসিয়াছ বহু দূর গোচারণ হ'তে;
শ্রমখেদে হইয়াছ আকুল, কাতর;
আর কিছু নহে, দাদা! ললাট তোমার
স্বেদজলে পরিস্রুত রয়েছে এখনো;
এখনো রয়েছে তব উরসে, কপোলে,
বিন্দু বিন্দু তরলিত অবসাদকণা।

সব্য।

যেন মনে হয়, বৎস, জনক জননী
পড়েছেন কোন এক বিপদ মাঝারে;
যেন তাঁরা সারাদিন করি' প্রাণপণ,
তবুও পান্‌নি কূল; শ্রমে, অবসাদে,
এই দীর্ঘ দিবাশেষে পড়িয়া কাতর;
ঝলকে ঝলকে যবে বহে সমীরণ,
মনে হয় জননীর কাতর নিশ্বাস
এ আশ্রমে আমাদের করিছে উদ্দেশ!
যাই কোথা? কিছুতেই স্বস্তি নাহি পাই।

কুৎস।

কিছু না, কিছু না দাদা, আজি প্রাণ মোর
সুপ্রসন্ন শরতের নীলাকাশ মত!
কিছু না, কিছু না দাদা; জনক জননী
আছেন আরামে অতি। মনে হয় মোর
শ্রমখেদবশে, দাদা, হৃদয়বিকার
আসিয়াছে প্রাণে তব, নহে কিছু আর!

[বিবদমান নোধা ও কক্ষিবানের প্রবেশ]

নোধা।

চুপ কর, কক্ষিবান; তোমার মতন
বহু সাধু দেখা আছে! আশ্রমে সেদিন
আশ্রয় নিয়েছ মাত্র; বিক্রমে তোমার
হইতেছি নিশিদিন কত জ্বালাতন!

কক্ষিবান।

বেশ তবে! করিব না জ্বালাতন আর!
নীরব রহিলে আমি, দুষ্কৃত তোমার
রবে না নীরব কভু; শত শত রূপে,
বাহিরি' আসিবে তাহা জগৎসম্মুখে;
যাই আমি।

নোধা।

যাবে? বুঝি মেধাতিথি পাশে?
একটি অক্ষর এর হইলে প্রকাশ
জেনো এ আশ্রমে তব নাহি আর স্থান!

কক্ষিবান।

এ আশ্রম নহে ত নোধার! জান তুমি
অসার তর্জনে তব নহে ভীত কভু
কক্ষিবান? শিশুকালে কোলে জননীর
পেয়েছি পরম তত্ত্ব, অব্যর্থ, গভীর:
সত্যের সরল পথ, চির অনর্গল,
চিরন্তন মনোহর, শিব, সুনির্ম্মল।
কেন তবে—

নোধা।

থাক্ তাহা; শুনেছি অনেক!
ভীরুদের একমাত্র জীবনসম্বল

দু' চারিটি পরিশুষ্ক উপদেশকথা!
চুপ কর, কঙ্কিবান; জান না অবোধ!
গৌতম জনক মম? চুপ কর তবে।

কঙ্কিবান।

যাহা ইচ্ছা কর তুমি; রহিনু নীরব;
কিন্তু নোধা, নিন্তু নোধা, ভেবে দেখ মনে,
কভু আর্য্যা গৌতমীর পশিলে শ্রবণে
তব এ দুষ্কৃত-কথা, কত না কুপিত
হইবেন—

নোধা।

এই বুঝি নীরবতা তব?
নয় আর গৌতমীর সহস্র নয়ন!
কোথা, কোন্ সুবিজন আশ্রমের কোণে
ক্ষুদ্র হরিণক এক নীপের তলায়
রয়েছে প্রোথিত, তাহা দেখিবেন তিনি!

কঙ্কিবান।

নাহি বা দেখেন যদি, তুমি কেন শুধু
ক'বে মিথ্যা কথা?

নোধা।

ভারি সত্যবাদী তুমি!
অত সত্যবাদী হ'লে চলে কি সংসার?

কঙ্কিবান।

খুলে যদি বল তুমি অপরাধ তব,
জানি আমি, ক্ষমিবেন গৌতমী জননী,
কেন তবে?

নোধা।

হও ভাই, নীরব এখন,
পায়ে পড়ি তব; কেন মিছে আর
দিতেছ যাতনা মোরে; রহিলে নীরব
তুমি, সকলি চলিয়া যাবে!—

কুৎস।

(কঙ্কিবানের প্রতি) কি হয়েছে?
কি হয়েছে, কি হয়েছে বৎস কঙ্কিবান?
বল মোরে; কেন আজি প্রীতিমান্ নোধা
হেন উগ্রমূর্ত্তি ধরি নিন্দিল তোমায়
নির্ম্মল প্রকৃতি হেন পরুষ, কঠোর?

কঙ্কিবান।

দাদা,—আজ সন্ধ্যাবেলা—যবে গোচারণে—

সব্য।

বলে' যাও, বৎস, তুমি খুলিয়া হৃদয়;
নিতান্ত আকুল আজি পরাণ আমার।
বলে' যাও, ভয় নাই; পবিত্র আশ্রমে
অসত্য-অপ্রিয়ভাষী শত শত নোধা
পারিবে না পরশিতে কেশাগ্র তোমার!
বলে' যাও বৎস মোর! ঋষি গৌতমের
কল্যাণ অভয় হস্ত তোমার উপর
রয়েছে অর্পিত সদা; বৎস, বলে' যাও।
অই ক্ষুদ্র বালকের রুদ্রমূর্ত্তি হেরি
জ্বলিছে হৃদয় মোর, সমগ্র হৃদয়;
ঘৃণা বোধ হয় মোর দৃষ্টিবিনিময়
করিতে এ মিথ্যাভাষী সনে!

কঙ্কিবান।

দাদা—আজি

নোধা।

থামো' থামো'; কেন তুমি অযথা আমায়
এত দিলে গালি? আছে কি সাধ্য তোমার
দুষিতে আমায় হেথা? বুঝি মনে নাই
আশ্রমকানন এই আমার পিতার!
তোমরা ভিখারী মাত্র; মুষ্টিভিক্ষা নিয়ে'
করিছ জীবনপাত শ্বাপদের সম;
বুঝি ভুলে গে'ছ তুমি সে প্রথম দিন—
যখন জনক তব, পিতৃপদে মম,
কাঁদিতে কাঁদিতে স্থান মাগিলা হেথায়
তোমাদের তরে? কি হে হ'য়েছ বিস্মৃত
এ তোমার নহে জন্মস্থান?—নহে কভু
দর্পভরে দাঁড়াবার স্থান? দীনহীন
এসেছ ভিখারী সম, পিতৃপাদপাশে,
দাঁড়াও আনতমুখে, তুলিও না শির;

ভাল মন্দ, সত্য মিথ্যা—যা' কিছু হেথায়
সে বিচার তোমাদের নাহি কভু হাতে।

সবা।

হায়, হায়, প্রকৃতির কিবা পরিণাম
শোচনীয় দুঃখকর; শুকের শাবক সম
কত সুমধুর অহো শিশু কণ্ঠস্বর।
শিশু বক্ষ সুকোমল শুকোদর সম;
কিন্তু আজি, কিন্তু আজি, এই কচি মুখে
এত অসংযত ভাষা পরুষ, কঠোর,
শুনিতে শুনিতে আমি অতি শ্রান্ত আজি।
অত বিষ ছিল তোর অই বুকখানি
পরিপূর্ণ করি? অত শিতধার তোর
অই ক্ষুদ্র রসনার আবিলা ভারতী?

নোধা।

ফের যদি এইরূপে—

কুৎস।

চুপ কর্, চুপ কর্, রে কপটভাষী।
আহত উরগশিশু সম ফণা তুলি'
চা'স্ তুই দংশিবারে? কখনো হবে না।
ভুলেছিস্ মহাঋষি জনক গৌতমে,—
সত্যের অক্ষয়বট জনকেরে তোর;
ভুলে'ছিস্ মাতৃদেবী আর্য্যা গৌতমীরে;
সন্দেহ হয়েছে মোর, কভু তুই ন'স,
তাঁদের সন্তান প্রিয়, ঘৃণা বেদনায়
চাহিনে হেরিতে তোর এই কালামুখ।

নোধা।

যদি অত ব্যথা লাগে হৃদয়ে তোমার
দেখিতে আমার মুখ—দূরে চ'লে যাও,
এ আশ্রম হ'তে মোর—আমার পিতার।
এ কোন কুবুদ্ধিদোষে জনক আমার
জানি না দিয়াছে হেথা তোদের আশ্রয়।
যদি অত ব্যথা বাজে চ'লে যাও দূরে;
সাধে কে তোমায় অত ভুগিতে যন্ত্রণা?
কি ছার ভিখারী তোরা, তোর সুখতরে
কেন চ'লে যাব আমি নিজ গৃহ ছাড়ি'?

[মেধাতিথির প্রবেশ।]

মেধাতিথি।

প্রিয়তম নোধা, কুৎস, মহর্ষি গৌতম
ডাকিছেন তোমাদের; পূত সান্ধ্যস্নান,
স্তবপাঠ করিবার হ'য়েছে সময়।
বৎসগণ যাও তথা; জনক তোমার
স্নানশেষে উপাসনা হ'লে সমাপন
শুধাবেন সকলের কার্য্যবিবরণ
সমগ্র দিনের আজি।

[নোধা, কুৎসের প্রস্থান।

[মেধাতিথি প্রস্থানোদ্যত।

মেধাতিথি তাত!

শুন নাই, দেখ নাই প্রকৃতি নোধার!
জ্বলিতেছে আজি মোর সমগ্র পরাণ
রাগে, ঘৃণা, অবসাদে!

(কক্ষিবানের প্রতি)

কি হয়েছে আজ?

কেন এ ঘোরাল আঁখি, বৎস কক্ষিবান?
কেন তোরে হেরি আজ এত আকুল?
কি দুঃখ হয়েছে তোর, বল মোরে বাছা।

কক্ষিবান (সাবেগে)

অয়ি তাত, যবে আজ অপরাহ্নবেলা
যজ্ঞ তরে সমিৎকুশ করি' আহরণ
যবে এ আশ্রমে পশি, ছাড়ি' শমীবন,
বসিনু সে অতি বৃদ্ধ ভূর্জতরুচ্ছায়,
মুহূর্ত্ত বিশ্রাম আশে, শুনিনু তখন
এক মহা আর্ত্তনাদ অদূরে পশ্চিমে।
রাখি' সমিৎকুশভার গেনু সেই স্থানে;
দেখিনু তথায় নোধা, নিশিত নারাচে,
বিঁধিয়াছে এক মৃগশিশু সুকুমার।
কত ধড়ফড় করি অস্ত্রের জ্বালায়
ম'রে' গেল মৃগশাব; ভর্ৎসিনু তখন

নোধার,—সে ঘোরে করি বিদ্রূপবর্ষণ
কত উপেক্ষিছে, তাত, সারা পথে পথে,
শিখায়েছে কত মতে অসত্য বলিতে,—

মেধাতিথি।

বুঝেছি সকল বৎস, তোমরা সকলে
থাকিও নীরব; একদিন—কভু একদিন
নোধার দুষ্কৃতগন্ধ এই আশ্রমের,
প্রতি পুণ্য তরুলতা আনিবে বহিয়া,
আশ্রম-জনক দেব গৌতমের পদে!

[ইতি প্রস্থিত।

সব্য।

নোধা ত মানুষ নয়! অভিশাপ সম
আসিয়াছে পীড়িবারে মহর্ষি গৌতমে!

[প্রস্থিত।

৬। গৌতমাশ্রমৈকদেশ।

(সব্য, কুৎস, কক্ষিবান।)

কুৎস।

দেখিলে ত!

কক্ষিবান।

কি বিষম সাহস নোধার!

সব্য।

দেখেছি অনেক; কিন্তু নোধার মতন
অসত্য কুটিল পথে এত সুচতুর
দেখিনি কখনো!

কক্ষিবান।

আর্য্যা গৌতমীর কাছে
কি করিয়া একশ্বাসে এত মিথ্যা কথা
ব'লে গেল, স্মরি' তাহা হ'তেছে বিস্ময়!

কুৎস।

দেখিয়া সাহস তার কেমন কেমন
বোধ হয় মোর!

সব্য।

ভাল, বৎস কক্ষিবান,
নোধার দুষ্কৃত কথা বলেছ কি তুমি
আর্য্যারে?

কক্ষিবান।

বলিনি দেব!

সব্য।

কি করে' জননী
জানিলেন সেই কথা? কাল সন্ধ্যাকালে
বলেছেন মেধাতিথি বুঝি দেবীপদে!

কুৎস।

প্রত্যয় না হয় তাহা; এই পূর্ব্ব দিন
এত মৃদু, মিষ্টবাক্যে নিষেধি' মোদের
নিজে কি কখনো তাহা বলিবেন তিনি?

কক্ষিবান।

অসম্ভব! মধুপূর্ণ হৃদয় তাঁহার!
অনাবিল এত স্নেহ হৃদয়ে যাঁহার
গেলে সুসংযত ভাবে দিবসযামিনী—
বিশ্বাস হয় কি দেব, বলেছেন তিনি?

কুৎস।

ঠিক কথা, শত ছিদ্র—শত আবরণী
অসত্যের, মৃগবধ-দুরিত নোধার
পারে কি গো লুকাইতে? পাপ কদাকার
পড়ে ধরা অনায়াসে গন্ধে আপনার।

সব্য।

কিরূপে জানিলা তাহা জননী গৌতমী?

কক্ষিবান।

জান না কি সর্ব্বময়ী, সর্ব্বদর্শী তিনি?
আশ্রমের প্রতি মৃগ, প্রতি তরুলতা,
অঙ্গীভূত জননীর হৃদয়ের সনে,
অতি ক্ষুদ্র তৃণাঙ্কুর মরে' যায় যদি,—
দেখিয়াছি কত ব্যথা বাজে তাঁর মনে!

কুৎস।

ধরা ত পড়েছে নোধা,

সব্য।

হয়েছে মঙ্গল;

দেখিলে না সেই দিন, বৎস কপিঞ্জলে
কত না কঠোর হস্তে করিল প্রহার?
সেই দিন অনর্থক কত তিরস্কার
করে গেল আমাদের; প্রিয় ধেনুদলে
সুকোমল দূর্ব্বাঙ্কুর অদূর শাদ্বলে
দেয়নি খাইতে হায় এই সেই দিন!
হইতেছে নোধা ক্রমে সংযমবিহীন—
ধরা ত পড়েছে এবে, হবে শিক্ষা তার!

কুৎস।

এতই করেছে হায়, দেখিলে না তবু
কিবা দৃঢ় প্রাণ তার, কত না অটল
কথায় কথায় মিথ্যা রচিতে কেবল
সুকৌশলে!

[মেধাতিথির প্রবেশ।]

মেধাতিথি।

গুরুদেব আসিছেন হেথা।
এ আশ্রমবাটিকায় হইবে অচিরে
বিচার নোধার! হায়, সব কথা তার
হয়েছে প্রকাশ, কিন্তু জানিনে কেমনে!

[দণ্ডহস্তে গৌতম ও কপিঞ্জলের প্রবেশ।]

গৌতম।

কোথা সে অমৃতভাষী বল বৎসগণ,
আজি দণ্ড হ'বে তার, বৎস মেধাতিথি
যাও তুমি, শীঘ্র তারে নিয়ে এ'স হেথা।

[মেধাতিথির প্রস্থান।

কেন আঁখি ছল ছল, বল কপিঞ্জল?
নাহি কোন অপরাধ তব, শান্ত হও
কাঁদিও না আর। বল সবে বৎসগণ,
কি কি করিয়াছে নোধা আশ্রমে আমার।

(সকলে নতমুখ)

[নোধা ও মেধাতিথির প্রবেশ।]

বলে যাও একে একে দুষ্কৃতকাহিনী
সকলি নোধার!

(সকলে নীরব)

বল কুৎস, বল মোরে,
কি কি জান তুমি!

কুৎস।

গুরুদেব!

গৌতম।

বলে' যাও
নিঃশঙ্কহৃদয়ে।

কুৎস।

সেই দিন গোচরণে
করেছে প্রহার প্রিয় ধেনুবৎসগণে,
উপেক্ষিয়া আমাদের একান্ত নিষেধ!

নোধা।

কেন কুৎস অকারণে দুষিছ আমায়?
অপকার করেছি কি তব?

গৌতম।

চুপ কর;
বল, বলে' যাও বৎস!

কুৎস।

সেই দিন দেব,
প্রিয়তম কপিঞ্জলে বেঁধেছিল নোধা
তাপসতরুর কাছে!

সব্য।

কেন কর ভুল!

নোধা।

সে ত এক মিথ্যাবাদী! দেখিছ না, তাত,

(সব্যের প্রতি)

বলিছে সে কত মিথ্যা।

গৌতম।

চুপ কর্ নোধা!
বল, বাছা সব্য! মোরে,—কি কি জান তুমি!

সব্য।

নয় সে তাপসতরু; প্রিয় কপিঞ্জলে
বেঁধেছিল নোধা অই নিশিপুষ্প কাছে
এক কুরুবক সনে। নির্ম্মম পরাণে

লঘু হস্তে উপাড়িয়া লতাবরী তরু
প্রহারিয়া সুকোমল সর্ব্বাঙ্গ ইহার
করেছিল বহুক্ষত !

গৌতম ।

বৎস কপিঞ্জল,
কেন তুমি এতদিন বলনি আমায় ?

কপিঞ্জল ।

গুরুদেব, দেব দেব,—

গৌতম ।

বল কক্ষিবান !
কে বধেছে মৃগশিশু !

কক্ষিবান ।

নোধা, গুরুদেব ।
দেখিয়াছি সেই দিন অপরাহ্নবেলা
বৃদ্ধ রক্তাশোক পাশে নীপতরুমূলে
নোধা বধেছিল এক ক্ষুদ্র মৃগশিশু ।

কুৎস ।

গুরুদেব, ক্ষম আজি অপ্রিয় নোধার—
এই তার পাপ কায !

গৌতম ।

ক্ষমিব নোধায় ?

মেধাতিথি ।

এখনো সময় আছে; বৎস ! তুমি আজ
করহ স্বীকার তব দুস্কৃত সকলি ;
দেখিছ না মহাঋষি অগ্নিদেব সম
জ্বলিছেন কত রোষে সম্মুখে তোমার ;
বিতত মরমভেদী তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তাঁর ;
যাও বৎস, পড় গিয়ে' ও তীর্থচরণে,
সর্ব্ব ভয় চলে' যাবে ও পদপরশে ।
খুলি' প্রাণ অপরাধ করহ স্বীকার ।

নোধা ।

কোন' দোষ অপরাধ করি নাই আমি ;
ইহারা অসত্যভাষী ; এদের বিশ্বাস
করেছেন পিতৃদেব; আমি দোষী নই ।

গৌতম ।

সকলে অসত্যবাদী ;—সুবোধ সরল
কেবল—কেবলমাত্র নোধাটি আমার !
চুপ কর্, মিথ্যাবাদী, কপট, বঞ্চক ;
সব্য, কুৎস, মেধাতিথি, বৎস কক্ষিবান
সকলে অনৃতভাষী, ধ্রুব সত্য তুমি !

মেধাতিথি ।

এখনো সময় আছে। করহ স্বীকার
অপরাধ তব ; ক্ষমা-ভিক্ষা কর, বাছা ।

নোধা ।

কোন দোষে দোষী নই, কেন শুধু আমি
করি ক্ষমা-ভিক্ষা ? কেন শুধু কলঙ্কিত
করিব আমার মন পবিত্র, নির্ম্মল ?
তোমার এ অনুরোধ নিতান্ত গর্হিত !
পবিত্র আমার মন ; করিব না কভু
ক্ষমা ভিক্ষা ; ভিখারী তোমরা ;—তাই বুঝি
ভিক্ষা, ভিক্ষা কথা দুটি বড় সাজে মুখে ?

গৌতম ।

মনে করে' দেখ দেখি কত শত বার
বলিলি অসত্য কথা মৃগবধ পাপ—
অপ্রিয় গর্হিত কার্য্য লুকাবার তরে !
দোষ হ'তে বাঁচাইতে শুধু আপনারে,
পবিত্র, কোমল, তোর কত বন্ধুগণে
অযথা কলঙ্কজালে জড়াইলি বৃথা !
মনে ক'রে দেখ্ তোর ক্ষুদ্র বুকখানি
অসত্যে জড়িত হয়ে' দুরু দুরু কত
কাঁপিতেছে অনিবার ! আজ অবিরত
কঠোর পরুষ বাক্যে প্রিয়সঙ্গিগণে
করেছিস্ প্রাণপণে মরম-আহত ।

কুৎস ।

আর্য্যপাদ, গুরুদেব, ক্ষমুন ইহায় ।

গৌতম ।

বল তুমি প্রিয় কুৎস ক্ষমিতে ইহায় ?
ক্ষমিতে এ শিলীভূত নির্ম্মম নোধায় ?

কভু না, কভু না, বোধ্য ক্ষমা-যোগ্য নহে!
অনুতাপে জ্বলি' যার হৃদয় আধার,
শোধিত-কনক সম হ'য়েছে তরল,
ক্ষমা শুধু তাহারেই সাজে; সে হৃদয়ে,
হিরণ্ময়ী সুবিমল গৌরব ছটায়,
ক্ষমা দেবী হন রত, শিবানীর মত
ক্ষত শুশ্রূষায়; বল ক্ষমিতে বোধ্যায়?
অশ্রুহীন, রক্তহীন, প্রাণ কোষ যার
হইয়াছে শিলাসম কঠিন শীতল
ক্ষমা নহে তার তরে; বলেছে এখনি
ক্ষমা নাহি চাহে তার পবিত্র-হৃদয়!
কেন ক্ষমি' তারে? সে ত ক্ষমা যোগ্য নয়।

মেধাতিথি।

বৎস, খুলে' বল তবু কে মেরেছে সেই,
ক্ষুদ্র মৃগপোত পুণ্য আশ্রম সীমায়!
কোন ভয় নেই বাছা; প্রাণমন খুলে
বলে' ফেল দোষ যত; কর অনুতাপ
পিতৃদেব করিবেন মার্জ্জনা তোমায়

বোধ্য।

আমি—মারি নাই সেই তুচ্ছ হরিণকে

গৌতম।

কে বধেছে মৃগশিশু? জান কিছু তুমি!
প্রিয় কপিঞ্জল?

কপিঞ্জল।

পিতঃ ক্ষম এ রে আজ!

গৌতম।

বলো' না ক্ষমার কথা; বলে' যাও ত্বরা।

কপিঞ্জল।

গুরুদেব, আর্য্যাসনে বিগত সন্ধ্যায়
গিয়েছিনু চিরপ্রিয় নীপতরুমূলে
জলসেক তরে,—

বোধ্য।

বলো' না অসত্য কথা
সন্ধ্যাবেলা ছিলে তুমি সরসী সোপানে!

চুপ কর্, হে নির্দ্দোষ; বল কপিঞ্জল
কি হ'ল তাহার পর?

সেকান্তে যখন

ফিরিব দু'জনে ধীরে আশ্রমকুটীরে,
জননী দেখেন এক কৌষেয় অঞ্চল
রয়েছে প্রোথিত ভূমে! দু' জনে মিলিয়া
খুঁড়িলাম বৃক্ষতল, কিছুক্ষণ পরে
দেখি এক রক্তময় কৌষেয়ে আবৃত
মৃত হরিণক এক; মসৃণ কোমল
রোমরাশি ঘনীভূত রক্তে জটাকার;
সচঞ্চল দেহলীলা কি জড় শীতল!
সে করুণ ছবিখানি দেখিয়া নয়নে
রহিনু স্তম্ভিত আমি! অমনি জননী,
জড়ায়ে হৃদয়ে তারে—কাঁদিলেন কত
প্রিয়তম সন্তানের বিয়োগবিধুরা
জননীর মত! ইঙ্গিতে আদেশি' মোরে
লইতে সে মৃগপোতে আশ্রমের পানে,
লইলেন সে কৌষেয় উত্তরীয়খানি
নিজ করে, পদমাত্র হয়ে' অগ্রসর
রুদ্ধকণ্ঠে সিক্তনেত্রে বলিলেন মোরে—
দেখ, বৎস, এ কৌষেয় বোধ্যরে আমার
দিয়েছিনু সবেমাত্র কাল মধ্যদিনে
ফল-আহরণ তরে; সেদিন হইতে
জননীর মুখপদ্ম একান্ত মলিন।

গৌতম।

বল্ তবু, বধিস্নি আশ্রমে আমার
সেই মৃগশিশু? বল্, বস্, বল ত্বরা!

বোধ্য।

কে বধেছে নাহি জানি! কক্ষি, কপিঞ্জল,
ঈর্ষ্যাবশে করিতেছে কলঙ্ক-আরোপ!

গৌতম।

হায়—বুঝিলাম তবে, অপরাধী নও
তুমি, বৎস; কলুষিত আশ্রম আমার,
তারি তরে দোষী আমি! সেই হরিণক

আশ্রমে পালিত মোর তনয়ের সম;
আমারি আশ্রম মাঝে মৃত্যু যদি তার,
তারি' তরে দোষী আমি;—লও বাছা, তুমি,
এই দণ্ড!

(নোধার হস্তে শাসনদণ্ড প্রদান করিয়া)

প্রাণপণে করহ আঘাত
মৃগবধ-কলুষিত এ দেহে-হৃদয়ে।
করিও না কোন শঙ্কা; দাও শাস্তি মোরে;
দোষী আমি, দোষী মোর এ অন্ধ হৃদয়;
তা' না হলে' শতরন্ধ্র কলুষনিচয়
করিত কি কলঙ্কিত আশ্রম আমার?
দোষী আমি, কর মোরে নিঃশঙ্ক প্রহার।
কেন কাঁপিতেছ বৎস? কোন' ভয় নাই;
নির্ম্মল হৃদয় তব, কি ভয় তোমার?
বুকে মোর প্রাণপণে কর কশাঘাত।

(গৌতমের পদতলে নোধার পতন)

কি কর, কি কর বৎস? তুমি দোষী নও,
দোষী আমি; তুমি বৎস পবিত্র নির্ম্মল!

নোধা।

পিতৃদেব, গুরুদেব, সব দোষ মোর,—

গৌতম।

বলিলে কি? বাছা মোর, সব দোষ তব?
অসম্ভব; তুমি বৎস পবিত্র নির্ম্মল!

নোধা।

ক্ষমা কর—

গৌতম।

বল, বৎস, কাহারে বিশ্বাস
করিব এখন? এই ত বলিলে তুমি
কোন দোষে দোষী নও! কেন শুধু
তবে কর ক্ষমা-ভিক্ষা?

নোধা।

দেব দেব, পিতৃদেব—

গৌতম।

কিছুই করনি তুমি; সত্যভাষী নোধা,
বিশ্বাস করেছি তারে; ধ্রুব জানি আমি
করেনি সে এত রূপে আশ্রমে আমার
এত দোষ, ভুলে' তা'র পবিত্র জনম।
সাজে কি তাহারে এত হেয় অনুষ্ঠান?
সে ত ঋষি গৌতমের সুত প্রিয়তম!

নোধা।

হে পিতঃ জানিনে—

গৌতম।

কি ক'রে জানিবে তুমি?
ধ্রুব জানি পরিপূত নোধার হৃদয়!
মৃগশিশু মরিয়াছে আশ্রমে আমার—
তারি তরে দাও দণ্ড, একান্ত নির্ভয়!

নোধা।

পিতৃদেব, দেবদেব, সব দোষ মোর;—
ক্ষম মোরে আজ দেব; না জানি কেমনে
কি এক মদিরমোহে শত মিথ্যা কথা
বলিয়াছি তব কাছে! ক্ষম মোরে পিতঃ;
আমি ডুবিয়াছি দেব অসত্যসাগরে;—
তুমি যদি নাহি তোল, কে আমারে আর
তুলিবে এ ঘনঘোর অন্ধকার হ'তে?

মেধাতিথি।

আর্য্যপাদ, ক্ষম আজি অপ্রিয় নোধার!

গৌতম।

কাহারে ক্ষমিব বল বৎস মেধাতিথি?
নোধা ত নির্দ্দোষ বলি' দিলে পরিচয়!

মেধাতিথি।

সে নোধা এ নোধা নয়; গুরুদেব, আজ,
সে যে বুঝিয়াছে তার দুষ্কৃত সকলি,
অশ্রুজলে পুরিয়াছে নেত্রকোণ তার!

কক্ষিবান।

গুরুদেব ক্ষম তাঁরে;

কপিঞ্জল।

কাঁদিছেন নোধা,
দেবদেব ক্ষম তাঁরে।

কুৎস।

কণ্ঠরোধ তার

হইয়াছে হৃদয়ের রুদ্ধ অনুতাপে!

গুরুদেব ক্ষমা কর!

গৌতম।

ক্ষমিব সোধায়?

সোধা।

(গৌতমের পদদ্বয় জড়াইয়া)

পিতঃ! আমি অতি তুচ্ছ পতিত সন্তান!

তুমি না চাহিলে পিতঃ নাহি অন্য গতি;

পিতা তুমি, হৃদি তব পিতার হৃদয়;

ক্ষমি' মোরে, কর পিতঃ, অমল অক্ষয়

আবিল হৃদয় মোর; অহে সখাগণ

ক্ষম মোরে, শত্রুরূপে অপরাধী আমি

তোমাদের পদতলে; ক্ষম মোরে আজ

কক্ষিবান, কপিঞ্জল, সব্য প্রিয়তম!

ক্ষমা কর প্রিয় কুৎস, দেব মেধাতিথি!

গৌতম।

বৎস মেধাতিথি, যাও ইহাদের নিয়ে',

জেলো' দীপ, চারি পাশে যজনবেদীর।

[শিষ্যদিগের প্রস্থান।

রূপ-রস-গন্ধবতী ধরা সুন্দরীর

অপূর্ব্ব সৌরভময় পুষ্পের মতন

মানব-হৃদয়গুলি; চিত্তরহস্যের

আদি নাই, অন্ত নাই; আমি এত দিন

বুঝি নাই ক্ষুদ্র শিশু সোধার হৃদয়।

তাই এত উপদেশ হৃদয়ে তাহার

পায়নি প্রবেশপথ! তাই মনে হয়

যে সৌরভে যে গৌরবে আজ বিকশিত

সব্য, কুৎস, মেধাতিথি, কক্ষি, কপিঞ্জল,

তার কোন' রেখাপাত হৃদয়ে সোধার

পড়েনি'ক এতদিন! এত অন্ধকার

ঘন তাই ঘিরেছিল হৃদয় তাহার।

আজি খুলিয়াছে তার হৃদয়ের দ্বার;

আজি হ'তে জ্ঞানতীর্থ আনন্দ নির্ম্মল

ফুটাইবে হৃদিকোষে কত মুক্তাফল!

বিশ্বনাথ, দেব, বিশ্বনাথ!

কর দেব, কর মোরে দিব্য আশীর্ব্বাদ;—

এ কয়টি দেবফুল অমৃত আধার,

এ সংসারে হয় যেন নির্ম্মাল্য তোমার!

আমরা প্রহরিমাত্র তব উদ্যানের;

পুষ্প হ'তে কীটগুলি বাছিব আমরা;

বৃক্ষমূলে জলসেক আমাদেরি' কায!

হে দেব, তুমিই শুধু বিধাতা, জনক,

সকলের; একমাত্র পালক, পোষক;

মধুরসে পরিপূর্ণ এদের জীবন,—

অমর মানবরাজ্যে করি' বিচরণ

হয় যেন বেদগাথা সূক্তের মতন!

প্রভাজালে বিকাশিয়া এই মহাব্যোম

থাক্ এরা, থাক সম শুকদেব, সোম!

ওম্ শান্তিঃ! ওম্ শান্তিঃ! ওম্ শান্তিঃ ওম্!

[ইতি প্রস্থিত।

সন্ধ্যা।

১

এত বড় শারদীয়া পূজা দেখিতে দেখিতে শেষ হইয়া গেল। উৎসব ও কলরবের অবসানে বিশ্রান্ত কলেবর ইজিচেয়ারে লম্ববান করিয়া তেতালার মুক্ত ছাতে বসিয়া

পড়িলাম। কয়টা দিন এ সুখে বঞ্চিত ছিলাম। ঊর্দ্ধে পূর্ণিমার চন্দ্র সুন্দরী-কুলের অধরচুম্বিত শীতল বায়ু লইয়া কাড়াকাড়ি করিতেছিল। উত্তর দিক হইতে একটা শীতের তরঙ্গ উঠিতেছিল। মনে ভাবিলাম, "চন্দ্র! তোমার গর্ব্ব কত দিন!" একটা আধ্যাত্মিক রকম ভাব আসাতে তাড়াতাড়ি সিগারেটটা শেষ করিয়া ফেলিলাম। পুনর্ব্বার চা খাইয়া বন্ধুবর সতীশকে ডাকিলাম।

কর্ম্মবীরগণের মধ্যে আমি শীর্ষস্থানীয়, ইহাতে কাহারও সংশয় ছিল না। কিন্তু সতীশের মতে জীবনে মধ্যে মধ্যে অবসাদ স্বভাবসিদ্ধ, অতএব হঠাৎ নির্দ্দিষ্ট রেখা হইতে পরিভ্রষ্ট হওয়া বিচিত্র নহে। ইহা শুনিয়া অচিরাৎ শান্তিলাভের সম্ভাবনা সত্য বলিয়া বোধ হইল।

টাকা কড়ির অভাব নাই। পিতামহী-প্রমুখ-বৃহৎ-সংসার-পরিবৃত উদীয়মান সূর্য্যের ন্যায় আমি বিষয়কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও একাকী। দার-পরিগ্রহ কর্ম্ম-বীরগণের কলঙ্ক, এ সম্বন্ধে সতীশের মত স্থির দৃঢ়, সুতরাং এত দিন ভয়ে কোন কথা বলিতে পারি নাই। কিন্তু আজিকার নিশীথিনী অধিকতর রমণীয় বলিয়া বোধ হওয়াতে আসল কথাটার পুনরাবৃত্তি করিবার ইচ্ছা হইল।

পুনরায় চা খাইবার অভিলাষ ব্যক্ত করিয়া সতীশের মুখের দিকে একটা রহস্যময় কটাক্ষপাত করিলাম। সতীশ বুঝিতে পারিয়াও বলিল, "কথাটা কি?"

আমি। জীবনের অভাবগুলি শীঘ্র মিটাইয়া ফেলা ভাল।

সতীশ। তোমাকে কে বাধা দিয়াছে?

আমি। ও কথাটা তোমার সম্বন্ধে বলিতেছিলাম।

সতীশ একটু ক্ষীণ উপেক্ষার হাসি দ্বারা ওষ্ঠাধর কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "দারপরিগ্রহ প্রভৃতি গুরুতর বিষয়ে অন্যের মতাপেক্ষা পরিবর্জ্জনীয়, বিশেষতঃ মনের কথা তোমাকে অনেক দিন পূর্ব্বেই বলিয়াছি।"

আমি ভাবিলাম, এই পরিবর্ত্তনশীল জগতে সতীশের মতের পরিবর্ত্তন না হওয়াটা কিছু বিচিত্র; ইহার কারণ নায়িকার অভাব। বেতর লোকের এইরূপই ঘটিয়া থাকে।

আমি বলিলাম, "মহাজনের পথ অনুসরণ করা কর্ত্তব্য; বিশেষতঃ, তোমার মত লোকের একটা ছাপ পৃথিবীতে রাখিয়া যাওয়া নিতান্ত আবশ্যক—আরও মনে করিয়া দেখ—পুন্নাম নরক—"

এবার সতীশচন্দ্র যথার্থই হাসিয়া ফেলিল। আমি সিগারেটের ধূমের মধ্য দিয়া বলিলাম, "যাক্—সে কথা যাক্—"

ঈষৎশীতক্লিষ্ট শরীরে গাত্রবস্ত্রখণ্ড টানিয়া দিলাম। "শীতবস্ত্র থাকিলে এমন দুর্দ্দান্ত ঋতুটাকেও জয় করিয়া আরামলাভ করা সুসাধ্য—"

সতীশ। আর যাহার অন্নের সংস্থান নাই?

আমি। তোমার ত আর অন্নের অভাব নাই।

সতীশ। প্রশ্ন জটিল।

২

প্রাতঃকালে উঠিয়া খাস্‌কামরায় গেলাম। বোধ হইল, সংসারের কর্ম্মতালিকার মধ্যে এমন আর কিছু নাই, যাহা আমার দ্বারা সুসম্পন্ন হইতে পারে। উৎক্ষিপ্ত মন নিতান্তই অবলম্বনশূন্য!

একটি বিদেশিনী সুন্দরীর চিত্রের নিম্নভাগে লম্বমান দর্পণের মধ্যে নিজের চেহারা দেখিয়া লইলাম, এবং ধীরে ধীরে চিত্রের পানে চাহিয়া শ্মশ্রু, গুম্ফ ও কেশ প্রভৃতির বাঞ্ছনীয় স্থিতি নির্দ্দিষ্ট করিয়া আসামী মুগার 'সুট' পরিধান করিলাম।

কোথায় যাই? কে আমাকে চায়? সংসার কাহাকে লইয়া? আর যাহা চাই, তাহা পাইলেই বা কি? এ জীবনটা যে 'কিছু', তদ্বিষয়ে শ্রুতিতে যথেষ্ট প্রমাণ আছে, অতএব বেদান্তবাগীশের প্রহেলিকায় পড়িয়া অনর্থক অকর্ম্মণ্য হওয়া নিতান্ত কাপুরুষতা।

"যাই, যে দিকে দুটি চক্ষু যায়"—মনে করিয়া বাটী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলাম। কোন্ দিকে যাই, স্থির নাই। আক্ষেপ, অশান্তি, ব্যাকুলতা প্রভৃতির দুরূহ বর্ম্মে ঘূর্ণ্যমান হইয়া অবশেষে দেখি যে, হাবড়া ষ্টেশনে আসিয়া পড়িয়াছি।

এক জন লোক স্থিরদৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া আছে।

আমি বলিলাম, "ভাল আছেন ত?"

তিনি বলিলেন, "নরেশ! তুমি আমাকে চিনিতে পার নাই?"

আমি মোটেই চিনিতে পারি নাই, কিন্তু আসন্ন বিপদ হইতে উদ্ধার হইবার উপায় না দেখিয়া বলিলাম, "ওঃ! এখন চিনিয়াছি!"

কিন্তু এই মিথ্যা উক্তির ফলে আমার হৃৎকম্প হইতেছিল।

পূর্ব্বপরিচিত আমার হাত ধরিয়া প্লাটফরমে উপস্থিত হইলেন।

প্লাটফরম জনাকীর্ণ। ইহারই কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে পঞ্জাব মেল আসিয়াছিল। পূর্ব্বপরিচিত বলিলেন, "নরেশ! তোমার ছোট খুড়ীকে দেখো, আমি ঠিকা গাড়ী ঠিক্ করিতে চলিলাম।"

সহসা মনে হইল, আমার ছোট খুড়া বিধুভূষণ মুখোপাধ্যায় রাউলপিণ্ডিতে থাকেন। সাত বৎসর দেখি নাই। ওঃ কি বিস্মৃতি! ছি! ছি! দ্রুত চালে গাড়ীর দিকে গেলাম—কিন্তু—ছোট খুড়ীকে ত চিনি না!

সারি সারি সুন্দরীভরা প্লাটফরমের একটি অংশে উপস্থিত হইয়া মনে করিলাম, ইহার মধ্যে ছোট খুড়ী নিশ্চয় আছেন। কিন্তু 'ছোট খুড়ী কোথায়?'—এরূপ সম্বোধনে তাঁহার অগ্রসর হইবার সম্ভাবনা নিতান্ত অল্প, কেন না, তিনি আমাকে কখন দেখেন নাই। 'বিধুবাবুর স্ত্রী কোথায়, আমি তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র'—এরূপ চীৎকার করা নিতান্ত নীতিবিরুদ্ধ, এবং পরিহাসের কথা। দেখিলাম, ত্রস্তা হরিণীর ন্যায় দীর্ঘকায়া একটি সুন্দরী অনতিদূরে দণ্ডায়মানা। কিছু না বলিয়াই পুরাতন প্রথানুসারে তাঁহাকে একটি প্রণাম করিলাম।

একটি ভদ্রলোক দ্রুতগতি আমার নিকট আসিয়া বলিলেন, "তুমি কে?" আমি বলিলাম, "নরেশ; ছোট খুড়ীকে প্রণাম করিতেছি।" আগন্তুক ভদ্রলোকটি কিছু বিরক্তিসহকারে বলিলেন, "আপনার ভ্রম হইয়াছে, উনি আমার স্ত্রী।"

কি বিভ্রাট! আমি যথাযোগ্য ক্ষমা-প্রার্থনা করিয়া পুনরায় গাড়ীর দিকে গেলাম। সেখানে তিন চারিটি লোক একটি স্থূলকায়া রমণীর অর্দ্ধনিষ্ক্রান্ত দেহ ইণ্টারমিডিয়েটের মেয়ে-কামরা হইতে টানিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছে। গলদ্‌ঘর্ম্ম স্ত্রীলোকটির চক্ষু উল্‌টিয়া গিয়াছে। আমি ব্যথিতহৃদয়ে বলিলাম, "উঁহার মধ্যদেশ অত্যন্ত স্থূল, অতএব হামাগুড়ি ভিন্ন উপায় নাই।"

আমার উক্তি যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা হওয়াতে স্ত্রীলোকটির দেহ সম্বন্ধে তদনুরূপ প্রণালী অবলম্বনপূর্ব্বক তাঁহাকে বাহির করিয়া আনিল।

৩

তিনিও আমার ছোট খুড়ী নহেন। বুঝিলাম, তিনি অনতিপূর্ব্বপরিচিতা ভুল ছোট-খুড়ীর দাসী। নাম "অমৃত"। অমৃত ঝির এইরূপ বিপদে সকলেই হাসিতেছিল, কেবল একটি বালিকা বিষাদপরিপূর্ণ মুখে তাহার হাত ধরিয়া আমার অনতিপূর্ব্ব-পরিচিত আগন্তুক ভদ্রলোকটির নিকট লইয়া গেল।

"বাবা! অমর্ত্তর বড় লেগেছে।"

সম্ভবতঃ সেই বালিকার জ্যেষ্ঠা ভগ্নী বলিয়া উঠিল, "কেবল খেয়ে খেয়ে মোটা হচ্চে, বাবা! আমি আগেই বলেছিলাম, ওকে এনো না, তখন কারু কথা না শুনে—"

কনিষ্ঠা বালিকা রুষ্টমুখে বলিল, "দিদি, তুমি বড় বেহায়া।"

উভয় ভগ্নীর বিবাদ দেখিয়া ভদ্রলোকটি বলিলেন, "সন্ধ্যা, তুই এ দিকে আয়।" কনিষ্ঠা পিতার নিকট গেল।

উভয়ের মাতা, অর্থাৎ ভদ্রলোকটির পূর্ব্বোল্লিখিতা স্ত্রী মৃদুস্বরে বলিলেন, "সরস্বতী!—মা, ছি, সকলের সম্মুখে কি ও রকম কথা বলিতে হয়?"

আমি বিস্ফারিতনয়নে উভয় ভগ্নীর অভাবনীয় সৌন্দর্য্য দেখিতেছিলাম।

আগন্তুক ভদ্রলোকটি আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আপনি না থাকিলে আমি ঝিকে লইয়া মহা মুস্কিলে পড়িতাম।" পুনরায় বলিলেন, "আপনার ছোট খুড়ীকে পাইয়াছেন?"

আমি বলিলাম, "আমাকে মার্জ্জনা করিবেন। আমার ছোট খুড়া বিধুবাবু রাউলপিণ্ডি হইতে সপরিবারে এই গাড়ীতে আসিয়াছেন। তিনি এইমাত্র ঠিকা গাড়ী আনিতে গেলেন, এখনও দেখা নাই।"

"ওঃ! আপনি বিধুবাবুর ভ্রাতুষ্পুত্র?—কি জ্বালা! আমি পূর্ব্বে বুঝি নাই। আমার নাম সদাশিব বন্দ্যোপাধ্যায়, আমিও রাউলপিণ্ডিতে থাকি—বিধু আমার প্রাণের বন্ধু—তা, আমার স্ত্রীও আপনার খুড়ী। বরং আমাকে মার্জ্জনা করিবেন।"

সকলেরই মুখমণ্ডল পরিষ্কৃত হইয়া আসিল, কেবল সন্ধ্যার বিমর্ষভাব গেল না।

সদাশিব বাবু বলিলেন, "বিধু বাবুর স্ত্রী গাড়ীতেই আছেন।" "মা সরস্বতী, তুমি বাবুকে লইয়া তোমার খুড়ীমাকে দেখাইয়া দাও।"

সরস্বতীর কৃপায় আমি আসল ছোট খুড়ীকে গিয়া প্রণাম করিলাম। সেই গাড়ীতে আমাদিগের কুলপুরোহিত চন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় নভোমণ্ডলের মত একটা টাক মাথায় করিয়া ঘন ঘন নস্য লইতেছিলেন, তিনি আমাকে দেখিয়াই ছোট খুড়ীর নিকট পরিচয় দিলেন।

আর আমার ছোট খুড়ীই বা কি? তিনিও ত সরস্বতীর মত একটি বালিকা, না হয় একটু বড়। খুড়া মহাশয় অল্প দিনই বিবাহ করিয়াছিলেন। এ সংবাদ আমি পূর্ব্বে জানিতাম না।

বিবাহিত জীবনের গভীর মর্য্যাদা হৃদয়ঙ্গম করিয়া বালিকা ছোট খুড়ী প্রশান্তমুখে আমাকে বলিলেন, "বসুন।" সরস্বতী আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

তরঙ্গায়িত মনের বেগ রুদ্ধ করিয়া একটি সিগারেট লইয়া বলিলাম, "আপনারা আসুন, গাড়ী বেশীক্ষণ প্লাটফরমে থাকিবে না।"

অতঃপর ছোট খুড়াও বহুসন্ধানের পর বাগবাজার পর্য্যন্ত সাত আনায় একখানা গাড়ী স্থির করিয়া আসিয়া পঁহুছিলেন।

৪

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণের মধ্যে আপাততঃ আমিই সর্ব্বপ্রধান। খুড়ার নির্ব্বাচিত ঠিকা গাড়ী নামঞ্জুর করিয়া আমি ভাল দেখিয়া দুইখানা গাড়ী বাছিয়া লইলাম, এবং তাহাতে উভয় পরিবারের স্ত্রীপুরুষবর্গকে যথাযোগ্যভাবে স্থাপিত করিয়া কোচবক্সে চড়িয়া বসিলাম।

সন্ধ্যা ছোট খুড়ার সঙ্গে সাত আনার গাড়ীতে গেল। সরস্বতী, ছোট-খুড়ী ও ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সহিত আমার গাড়ীতেই রহিল। যথাকালে সদাশিব বাবু আমাদিগের প্রতিবাসী বাঁড়ুযোদের বাটীতে সপরিবারে অবতীর্ণ হইলেন, এবং আমি আমার তেতালার গৃহে সস্ত্রীক ছোট খুড়ার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিলাম।

ছোট খুড়া পিতার বিস্তীর্ণ জমিদারীর চারি আনার সরিকদার। শৈশব-কালেই আমার পিতামাতার কাল হয়। বৃদ্ধা পিতামহী খুড়াকে দেখিয়া রুদ্ধ-শোক এফ্ স্বরে ছাড়িয়া দিলেন, এবং সেই সঙ্গে ছোটখুড়ীও কথাটা সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে না পারিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন।

ক্রমে জানিতে পারিলাম, ছোটখুড়ী রন্ধনকার্য্যে সুনিপুণা। বালিকা হইলেও প্রবীণা, রসিকা ও স্নেহময়ী। খুড়ামহাশয়ের পা পূজা করিয়া ছোটখুড়ী রন্ধন-শালায় অবতীর্ণা হইলেন। বৃদ্ধা পিতামহী আনন্দনীরে ভাসিয়া পূর্ব্বস্মৃতির বিশ্লে-ষণ করিতে লাগিলেন। আমি চুপি চুপি ছোটখুড়ীর কাণে কাণে বলিলাম, "পা পূজা করা কি পঞ্জাবের প্রথা?"

ছোটখুড়ী সরল হৃদয় উন্মুক্ত করিয়া মধুর বলয়নিক্কণসহকারে খুব হাসিলেন। সে হাসি গান অপেক্ষাও মধুর। ষোড়শী গৌরী কেন জগৎমাতা, তাহা আজ বুঝিলাম। ছোটখুড়ীর নাম গৌরী। ছোট খুড়ী ষোড়শী।

"দেখ নরেশ, আমার রান্না তেমন ভাল নয়, সন্ধ্যা রাঁধে ভাল, তাহাকে ডাকিয়া আনি।"

রাত্রি দশটার পূর্ব্বে প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবীর তালিকা হইতেও বৃহৎ রকমের আয়োজন করিয়া ছোটখুড়ী আমাকে খাওয়াইলেন। অনুকূল ঠাকুরের মুখ শুক্না কতবেলের মত ছোট হইয়া গেল। বলা বাহুল্য, বন্ধুবর সতীশচন্দ্র নিম-ন্ত্রিত ব্যক্তিগণের মধ্যে ভোজন সম্বন্ধে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চাসন প্রাপ্ত হইল।

ছোটখুড়ী বলিলেন, "এ সব সন্ধ্যা রাঁধিয়াছে, বার বৎসরের মেয়ের এমন রান্না আর কখন খাইয়াছ?"

কিন্তু সন্ধ্যাকে দেখিলাম না। সন্ধ্যা বাঁধিয়া বাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে।

সন্ধ্যার পরিবর্ত্তে তাম্বূলহস্তে সরস্বতী আসিয়া ধন্তবাদের ভাগটা কাড়িয়া লইল। সরস্বতী চলিয়া গেলে সতীশকে বলিলাম, "এমন রূপ দেখেছ?"

সতীশ। দুই একখানা ছবিতে দেখেছি। এইবার অভাব পূর্ণ করিয়া ফেল।

আমি। কথাটা কিছু গুরুতর। আমার ইহার মধ্যে একটা 'প্ল্যান' আছে।

এই বলিয়া একটু গভীর রহস্তপূর্ণ হাসি হাসিলাম। সতীশ পূর্ব্বাবধি জানিত, আমি একটা ক্ষ্যাপা লোক। সুতরাং একটুও আশ্চর্য্য না হইয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। আমি নিস্তব্ধ রাত্রিকালে কর্ম্মক্ষেত্রের নূতন বিস্তৃত স্তরের বহুবিধ স্বপ্ন দেখিলাম।

৫

প্রতিবাসী বাঁড়ুয্যে মহাশয়ের বিপুল সংসার বেলেঘাটার পুরাতন বাগানের মত ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িয়াছিল। অত বড় বাড়ীর মধ্যে মোটে তিনটি প্রদীপ জ্বলিত। ঘুণ-ধরা কড়ির মধ্যে কেবল টিক্‌টিকীর বাসা, তাহারই তলে স্বনামধন্ত হৃদয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এক জোড়া পুরাতন চটিজুতা ও তদপেক্ষা পুরাতন বাঁধা হুঁকা লইয়া দিবানিশি জীবনযাপন করিতেন। কালক্রমে গৃহিণীর পরলোকপ্রাপ্তির পর হইতে বাঁড়ুয্যে মহাশয় তাম্বূলচর্ব্বণ ছাড়িয়া দিয়াছিলেন।

বাঁড়ুয্যে মহাশয় কর্ণেল ডি. এল্. রিচার্ডসনের শিষ্য। সেক্সপীয়র আগাগোড়া মুখস্থ, তাহার উপর ভবভূতি, কালিদাস প্রভৃতি কণ্ঠস্থ। সদাশিব বাবু বাঁড়ুয্যের একমাত্র পুত্র, এবং বুড়া বয়সের সম্বল। সদাশিব বাবু পঞ্জাব কমিসেরিয়েটের মধ্যে কেবল একটিমাত্র সচ্চরিত্র সাধু কর্ম্মচারী, অতএব তাঁহার বেতনবৃদ্ধি না হইয়া এক শত টাকাতেই বদ্ধ হইয়া গিয়াছিল।

শত্রুর মুখে ছাই না দিয়া সদাশিব বাবু নিজেই মলিন বসন পরিধান করিয়া এবং ছাই ভস্ম মাখিয়া কলিকাতা ও পঞ্জাবের সংসার চালাইতেন। বিষাদপূর্ণ জীবনের শেষ অঙ্কের ছায়া সোহাগিনী কন্যা সন্ধ্যা।

সন্ধ্যা রূপসী। মাথা ভরা চুল, বাঁধিতে গেলে ফুরায় না। সারাদিন সন্ধ্যা লুকাইয়া গৃহকর্ম্ম করে। যেখানে যেটুকুর অভাব, তাহা মিটাইয়া দেয়। স্মৃতি ও বিস্মৃতি, হাসি ও কান্না, দুঃখ ও প্রফুল্লতার মধ্যে সরল রেখার ন্যায় সন্ধ্যা উভয় দিকের ঘাত প্রতিঘাত সহ্য করিয়া রাত্রিকালে ঘুমাইয়া পড়িত। তখন সরস্বতী ও পাড়ার মেয়েরা তাস খেলিতে বসিত। সেই হাসির গর্‌রার মধ্যে সন্ধ্যার মৃদু ও মঙ্গলময় দীর্ঘনিশ্বাস কেহই শুনিতে পাইত না।

বৃদ্ধ বন্দ্যোপাধ্যায় সন্ধ্যাকে কোলে করিয়া পুত্র সদাশিবকে বলিলেন, "বাবা! তুমি এটাকে কোথায় পাইলে?"

নয়নজলে বক্ষ প্লাবিত করিয়া বৃদ্ধ গোটাকতক কুমারসম্ভবের শ্লোক ও গোটা-কতক সেক্সপীয়রের কবিতা পুরাতন মস্তিকদুর্গের দক্ষিণভাগ হইতে উদ্ধার করিলেন। বৃদ্ধ বলিলেন," সন্ধ্যা, তোর গায়ে হাত বুলাইতে আমার পুনর্জন্মের কথাটা অবশ্যম্ভাবী বলিয়া বোধ হয়।"

ম্লানমুখী সন্ধ্যার কিন্তু বিমর্ষভাব যাইত না। সরস্বতী বলিত, "তোর মুখখানা যেন প্যাঁচার মত গম্ভীর।" কিন্তু সন্ধ্যা না থাকিলে সরস্বতী অস্থির হইয়া পড়িত। বাঁড়ুয্যে পরিবারের জীবন-সন্ধ্যাকালে সন্ধ্যাই জীবন। দুঃখপূর্ণ মন্দিরে সন্ধ্যাই আরতি, সন্ধ্যাই মৃদু আক্ষেপসঙ্গীত। রোগশয্যায় সন্ধ্যাই অবলম্বন, আত্মহারার সন্ধ্যাই প্রজ্ঞা।

বিশাল নগরীর জনস্রোতের দিকে লক্ষ্য করিয়া সন্ধ্যা অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিত। তাহাদের কলরব মিটিয়া না গেলে সন্ধ্যার শান্তি হইত না।

কিন্তু সন্ধ্যার হৃদয়ের ব্যাকুলতা কিছুতেই মিটিত না। সন্ধ্যা যাঁহাকে চাহে, সন্ধ্যা যাঁহাকে ডাকে, তাঁহার কথা কেহ সন্ধ্যাকে বলে না! সন্ধ্যা ভাবিত, "দয়াময়! জগৎপতি! তোমার করুণা কোথায় বর্ষিত হয়! সে দেশের কথা কে আমাকে বলিবে?"

৬

দিন আসে, রাত্রি যায়, কিন্তু সন্ধ্যার আধফুটন্ত মনের ভাব মনেই থাকে। সন্ধ্যা কথা জানে না। সেই অন্বেষণব্রতে সন্ধ্যার সাথী নাই। উপবাসেই সন্ধ্যার দিন কাটিয়া যাইত। সন্ধ্যার প্রাণ শীর্ণ, হৃদয় অর্দ্ধশূন্য। সেই কোমল হৃদয়-নীড়ে কেবলমাত্র একটি ছোট পাখী বাসা করিয়াছিল।

সে দিন সূর্য্য পাটে যাইবার সময় সন্ধ্যা ম্লাননয়নে ধীরে ধীরে তেতলার ছাতে উঠিল। সেই বাটীর সংলগ্ন মুখুয্যেদের পূর্ব্বদুয়ারী ঘরের নিভৃত কোণে বসিয়া একটি যুবক উপাসনায় রত ছিল। অদৃষ্ট সন্ধ্যার চক্ষু আকর্ষণ করিয়া সেই যুবকের মুখের দিকে ফেলিয়া দিল।

নিখুঁত সুন্দর মুখে পবিত্র স্বর্গীয় জ্যোতির সঞ্চার হইলে যে কত রমণীয় হয়, তাহা সন্ধ্যা পূর্ব্বে দেখে নাই। সন্ধ্যা অনিমেষনয়নে তাহাই দেখিতে লাগিল। সন্ধ্যার হৃদয়ে কখনও যৌবনের উষ্ণ সমীর বহে নাই। সন্ধ্যা প্রেমের কথা জানে না। তবে সন্ধ্যা কি দেখিতেছিল, তাহা কে জানে?

যখন উপাসকের নয়ন হইতে দুই চারি বিন্দু অশ্রু নিঃসৃত হইল, তখন সন্ধ্যা মলিন অঞ্চল দিয়া নিজের চক্ষু মুছিল।

উপাসক করযোড় করিল। সন্ধ্যাও নিজের কোমল কর দুটি ভাঙ্গিয়া চুরিয়া হৃদয়ের সম্মুখে স্থাপিত করিল। সন্ধ্যার চক্ষু নিমীলিত হইয়া আসিল।

সূর্য্য অস্তে গিয়াছে। মুদিতনয়না সন্ধ্যা তাহাকেই দেখিতেছে। উপাসকের ভাব সন্ধ্যায় অনুপ্রাণিত হইয়াছে। যুবক প্রকোষ্ঠ হইতে নির্গত হইয়া ছাতে উঠিয়াছে, তখনও সন্ধ্যার মোহ ভাঙ্গে নাই।

যুবক সে অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দেখিল। ক্রমে নিকটে গেল। এত নিকটে গেল যে, আর যাওয়া যায় না।

যুবক ভাবিতেছিল, এ তরুণী সন্ন্যাসিনী কে? মুখ দেখিয়া বুঝিল—সন্ধ্যা।

সন্ধ্যা নয়ন উন্মীলিত করিয়া সম্মুখেই উপাসককে দেখিল। সন্ধ্যা ভাবিল, ইষ্টদেবতা।

তখন উভয়েই চমকিত হইয়া উঠিল! স্বর্ণস্থলিতার ন্যায় সন্ধ্যার মুখ লজ্জায় ভরিয়া গেল। সতীশচন্দ্র অবাক্!

সতীশ বলিল, "তুমি সন্ধ্যা?"

সন্ধ্যা মুখ নত করিয়া রহিল।

সতীশ। তোমার দিদিমণি কৈ?

সন্ধ্যা। ও বাড়ী। (অর্থাৎ নরেশদের বাটী)

সতীশ। তুমি আমাকে দেখিয়া ভয় পাও নাই ত?

সন্ধ্যা। না।

দুর্গম অরণ্যে সাথী পাইলে যেমন বলের সঞ্চার হয়, সন্ধ্যা হৃদয়ে সেই বল পাইয়াছে। সাহস আসিয়া লজ্জা ভাঙ্গিয়া দিল।

সতীশ। আমি নিকটে আসায় তোমার ভ্রম হইয়াছিল। আমার আসা উচিত হয় নাই। কিছু মনে করিও না। তুমি ত প্রত্যহ এরূপ কর না? আমি মোটেই জানিতাম না তোমার মত বালিকার—,

ইহা বলিয়া সতীশ চুপ করিয়া রহিল।

সন্ধ্যা। আমি কি কচ্ছিলাম্? আপনি কোথায় ছিলেন?

সতীশ। তুমি প্রার্থনা করিতেছিলে। তোমাকে ইহা কে শিখাইল?

সন্ধ্যা। আমি ভগবানকে ডাক্‌ছিলাম। তাঁকে ডাক্‌লে মঙ্গল হয়, না?

সতীশ। তোমার মঙ্গল হ'বে।

সন্ধ্যা। আমি ডাক্‌লে আমার মঙ্গল হবে কেন? আমি ডাক্‌লে যদি মঙ্গল হ'ত, তবে বাবার এত দুঃখ কেন? বোধ হয়, অন্য কেহ ডাকিলে মঙ্গল হয়।

সতীশ। হাঁ, সহায় আবশ্যক। সহায় ও সাথী। কেবল আত্মনির্ভরতা বিপৎ-সঙ্কুল। সন্ধ্যা! তুমি যাও, আমি তোমাদের হইয়া তাঁহাকে ডাকিব।

জীবনের সেই প্রথম দিনের বল, উৎসাহ ও অবলম্বনের মধ্য দিয়া সন্ধ্যার হৃদয়ে প্রেম অঙ্কুরিত হইল।

৭

প্রভাতে উঠিয়া ছোটখুড়ীকে ডাকিলাম। ত্রিতল কৈলাসে বসিয়া ছোট খুড়ী গৌরী দেবী মাথাঘষা মশ্‌লার মোড়ক হস্তে ঘন ঘন আঘ্রাণ লইতেছেন।

ছোটখুড়ী। নরেশ! এই দশ পয়সার মশ্‌লা!

আমি। ছোটখুড়ী! আপনি দশ পয়সায় সংসার কিনিতে চান নাকি?

ছোটখুড়ী। সস্তায় সংসার পাইলে সকলেই কিনিতে চায়, তবে এক সংসার কত লোকে লইবে, এই জন্যই ত দরদস্তর?

আমি। আপনার মত সকলেই মাথাঘষা লইয়া ব্যস্ত।

ছোটখুড়ী। বিশেষতঃ সরস্বতী। সে দশ পয়সার জিনিস দশ টাকায় কিনিতে চায়। আচ্ছা নরেশ, তুমি সরস্বতীকে পছন্দ কর, না সন্ধ্যাকে পছন্দ কর?

আমি বলিলাম যে, "সেটা এখনও ঠিক ভাবিয়া দেখি নাই। প্রথম দৃষ্টিতেই প্রেমসঞ্চার মহাভারতের আমলের প্রথা। দুষ্মন্ত রাজা নল রাজা অপেক্ষা কিয়ৎ-পরিমাণে অধিক বুদ্ধিমান ছিলেন, কিন্তু তখনও জীবের সম্পূর্ণ আবর্ত্তন হয় নাই।"

ছোটখুড়ী আমার দিকে সকৌতুহল দৃষ্টিতে চাহিলেন। ভাবটা যেন এই, "তোমার মত স্থূলকায় গর্দ্দভ যদি আবর্ত্তিত জীব হয়, তবে সংসারের লয় হইতে এখনও বহু যুগ বাকি!"

আমি। আচ্ছা, সন্ধ্যা হাসে না কেন, বলিতে পারেন?

ছোটখুড়ী। কাল রাত্রিতে সন্ধ্যার মুখখানি একটু জ্বলন্ত দেখিয়াছিলাম। কিন্তু সন্ধ্যা হাসে না। সন্ধ্যা হাসিলে যে প্রভাত হ'বে।

আমি। আচ্ছা, খুড়ীমা! সন্ধ্যার সঙ্গে সতীশের বিবাহ দিলে কেমন হয়?

ছোটখুড়ী। তুমি একটি গাধা। সন্ধ্যা রাজরাণীর যোগ্যা। সন্ধ্যা রাজ-লক্ষ্মী। তোমাদের কি পছন্দ,—বুঝিতে পারি না।

ছোটখুড়ীর মুখ গম্ভীর হইয়া আসিল। আবার বলিলেন,—(এবার একটু

ধীরে ধীরে) "নরেশ! তোমার যেমন চঞ্চল উড়ন্ত স্বভাব, তাহাতে আমার ইচ্ছা হয় যে, তুমি সন্ধ্যাকে বিবাহ কর। সন্ধ্যা মানবী নয়, দেবী। তেমন আর একটি পাওয়া অসম্ভব।"

ছোটখুড়ীকে এইরূপে মন্ত্রিপদে আত্মবলে প্রতিষ্ঠিতা হইতে দেখিয়া আমি যৎপরোনাস্তি গর্ব্বিত হইলাম।

আমি। অবশ্য স্বীকার্য্য যে, অমন রান্না আমি কখনও খাই নাই। কিন্তু অনুকূল ঠাকুরকে পদচ্যুত করাটা ঘোর নিষ্ঠুরতা—

ছোটখুড়ী। তোমার মাথা! সতীশ গরীব, তার ঘরে ডাল ভাত রাঁধিবার জন্যই কি সন্ধ্যা জন্মিয়াছিল?

স্ত্রীলোকের অদৃষ্টবাদের সহিত পরহিতব্রতের চিরকালই এত রহস্যময় বিবাদ যে, আমার মত বিচক্ষণ লোকও তাহা কখন বুঝিতে পারে নাই।

আমি। সতীশের জন্য ভাবিও না। সতীশের যাহা সংস্থান আছে, তাহাতে একটা গৃহস্থের বেশ চলে; আর সতীশ এম্. এ. পাশ করিয়াছে, কোন না একটা চাকরী জুটিবে? অবশেষে কোন উপায় না হয়, তবে—তবে কি জানেন, সতীশ ত আমাদেরই জ্ঞাতি—সতীশের বিবাহে আমার রাজগ্রামের তালুকখানা যৌতুক দিব।

ছোটখুড়ীর চক্ষে জল আসিল। হয় ত তালুকখানা যাইবে বলিয়া। কিন্তু বোধ হয়, তাহাও নয়। হয় ত আমার বুদ্ধির প্রাখর্য্যে কিংবা বদান্যতার মাধুর্য্যে ছোটখুড়ী অশ্রুসিক্ত মুখে একটু সত্যযুগের হাসি বিকীর্ণ করিলেন। ছোটখুড়ী কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন, "তোমরা সবই এক রকম।" (অর্থাৎ, ছোট খুড়া ও আমি।)

৮

বাটীর মধ্যে গিয়া দেখি যে, আমার পূর্ব্ববর্ণিতা স্থূলকায়া অমর্ত্ত ঝি বৃদ্ধা পিতামহীর নিকট সরস্বতীর রূপের বর্ণনা করিতেছে, এবং পিতামহীও ঢিমতেতালার লয়ে শুভ্র মস্তক নাড়িয়া তাহার অনুমোদন করিতেছেন। গর্ব্বিতা সরস্বতী আমার ম্যাণ্টলপিসের উপরিস্থিতা ডায়েনার প্রস্তরমূর্ত্তির নগ্ন দেহে একখণ্ড রুমাল জড়াইয়া দিতেছে।

বর্ণভ্রান্তের ন্যায় আমি সরস্বতীর দিকে চাহিয়া রহিলাম। সরস্বতীর স্বচ্ছ দেহে যেন আমাকেই দেখিলাম।

বোধ হইল, যেন কে আমাকে আকর্ষণ করিতেছে। ছয়টা রিপুর মধ্যে

পাঁচটাকে বরখাস্ত করিয়াছিলাম, কিন্তু মোহটা কোথায় থাকিয়া গিয়াছিল, তাহা জানিতাম না।

সরস্বতী আব্দার করিয়া বলিল, "এ রকম ক'টা আছে?" (অর্থাৎ প্রস্তরমূর্ত্তি)

আমি। এই একটি—

সরস্বতী। হয় কাপড় পরাইয়া রাখুন, নয় ত ভাঙ্গিয়া ফেলুন।

আমি। আমাদের বাগানে কত বিলাতী মাছ আছে—দেখ্‌বে?

সরস্বতী মাথা নাড়িয়া সায় দিল। আমি যেন একটু অন্যমনস্ক হইয়া সরস্বতীর রাঙ্গা হাতখানি তুলিয়া লইলাম। বোধ হইল, আর্দ্র, অতি কোমল, এবং আমা হইতেও কিঞ্চিৎ উষ্ণ। আমি উত্তেজনার মাত্রা একটু বাড়াইয়া হাতখানি টিপিয়া দিলাম।

মনে করিলাম, এইবার কোন রকমের একটা বিপ্লব ঘটিবে। কিন্তু তাহা কিছুই ঘটিল না। হেলিয়া দুলিয়া জীবন্ত ছবিখানির মত সরস্বতী আমার সঙ্গে বাগানে গেল। কত ফুলের নাম, কত বৃক্ষের নাম, প্রশ্নের উপর প্রশ্ন, উত্তরের উপর উত্তর, এইরূপ অর্দ্ধঘণ্টা কাল অতিবাহিত করিয়া আমার ধারণা হইল যে, নায়িকা একটু বড় না হইলে কোর্টশিপের মত একটা কিছুর অভিনয় সম্পূর্ণ নিষ্ফল!

কাচের টবের মধ্যে নানাবর্ণের ছোট ছোট মাছ বিচরণ করিতেছে। অতুলনীয় সুন্দর মুখ বাড়াইয়া বালিকা তাহাই দেখিতে লাগিল। আমিও জলের মধ্যে তাহারি প্রতিবিম্বের দিকে চাহিলাম। হঠাৎ আমার আপাদমস্তক কবিত্বময় হইয়া উঠিল। আমি বলিলাম, "আচ্ছা সরস্বতী, আমার হৃদয় যদি জল হইত, আর তুমি মাছ হইতে, তবে কত সুখের হইত!"

সরস্বতী কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল, "তাহা হইলে আহার যোগাইত কে? খালি ফটিকজল খাইয়া মাছ কত দিন বাঁচে?"

সরস্বতী হাতখানি সরাইয়া লইল, আরও বলিল,—"আর দেখুন, আমি টবের মধ্যে কখনও থাকিব না।"

আমি ভাবিলাম, তবেই ত বিভ্রাট! এমন চঞ্চল পাখী ত পিঞ্জরের জন্য নহে! কি জানি কেন, আমি সেই ভাবেই মগ্ন হইয়া গেলাম।

একে তের বৎসরের মেয়ে, তাহাতে ঐ রূপ, ঐ ছটা, এবং ঐ কথা, আমার পক্ষে অতিশয় নূতন বলিয়া বোধ হইল।

আমি বলিলাম, "এ বাড়ী তোমার মনের মত ?"

সরস্বতী। বেশ বাড়ী।

আমি। যদি তোমার হইত ?

সরস্বতী। তা কেমন করিয়া হইবে ?

আমি। যদি তোমাকে দান করি ?

সরস্বতী। আমি অমন পরের জিনিস লইব কেন ?

আমি। যাহার জিনিস, সে যদি তোমাকে বিবাহ করে ?

সরস্বতী। ও—তা হ'লে তার সন্ধ্যাকে বিবাহ করা উচিত। আমি এত বড় বাড়ী রাখিতে জানি না।

যৌবনসুলভ আরক্তিম বর্ণ সরস্বতীর কপোলে ছুটিতেছিল। আমি লোভে পড়িয়া একটা চুম্বন করিলাম। এই অভিনব আচরণে সরস্বতী চকিতা হরিণীর ন্যায় ছুটিয়া উদ্যান পার হইয়া গেল।

৯

এই দুর্লভ মানবজীবনে বিবাহের পূর্ব্বে একটি তের বৎসরের ভুবনমোহিনী বালিকার আরক্তিম কপোলের চুম্বনলাভ প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ না থাকিলে সচরাচর ঘটিয়া উঠে না। স্নায়বিক তাড়নাতেই হউক, কিংবা অন্য কোনও কারণেই হউক, আমার জ্বর হইল।

নায়িকাগণেরই প্রায় জ্বর হইয়া থাকে। এ পক্ষের জ্বর হওয়াটা অধিকতর বিচিত্র। ডাক্তার অভয়চন্দ্র আমার লক্ষণ দেখিয়া পল্‌সেটিলা (ষষ্ঠ দাশমিক ডাইলিউশন) ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। ইহাতে বিশেষ কোনও উপকার হইল না।

দুই দিন পরেই রোগের আকার দেখিয়া সকলেই ভয় পাইল। বুঝিতে পারিলাম, আমার প্লেগের মত একটা কিছু হইয়াছে। স্ফীত গলদেশ তাহার একটি প্রধান প্রমাণ।

সেবার ত্রুটী হইল না। ছোটখুড়ী কাঁদ-কাঁদ মুখে বলিলেন, "নরেশ ! তুমি একটু আমাদের কথা শোন, ভাল করিয়া ঔষধ খাও।"

সতীশ জোর করিয়া কতকগুলা তীব্র ঔষধ সারা রাত্রি বসিয়া আমার গলাধঃকরণ করাইল।

আমি বলিলাম, "সতীশ ! এ সংসার অলীক, স্নেহমমতাও অলীক, রূপও অলীক, কেবল অলীক নহে বেদান্তবাগীশের কথাটা। কেন ঔষধ খাওয়াইয়া আমার যাতনা বৃদ্ধি কর ?" আমার বিকার বৃদ্ধি পাইল।

অতি প্রত্যুষে, – তখনও উদ্যানের শান্তিপূর্ণ নীড়গুলিতে বিহঙ্গ জাগিয়া উঠে নাই, – তখনও একটি কোমল করপল্লব আমার মস্তকে সঞ্চারিত হইতেছিল। রোগের যাতনা যত বাড়ে, কোমলতাও তত ভাল লাগে। ধীরে ধীরে চাহিয়া দেখিলাম, শিয়রে সন্ধ্যা বসিয়া আছে। সতীশ ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। সন্ধ্যা কখন আসিয়াছে, জানিতে পারি নাই।

বালিকা হাঁটু গাড়িয়া করযোড়ে বসিয়া আছে। উষার ক্ষীণ আলোক বাতায়ন ভেদ করিয়া তাহার দীন মুখের উপর পড়িয়াছে।

সেই মুখ দেখিয়া বিশ্বের কোন অলক্ষ্য স্তরের পূর্ব্বস্মৃতি জাগিয়া উঠিল। ভাবিলাম, সংসারের মঙ্গলের জন্যই এই সব জীবের সৃষ্টি হয়।

আমি সতীশকে ডাকিলাম। সন্ধ্যা তখন চলিয়া গিয়াছে।

আমি বলিলাম, "ভাই, একটা কথা বলিয়া রাখি। কিছু মনে করিও না— তোমার নামে আমার এই ক্ষুদ্র বিষয়ের অর্দ্ধেকটা উইল করিয়া গিয়াছি।—ছি! তুমি কাঁদিও না—আমার ছোট ভাই থাকিলে তাহারই প্রাপ্য হইত। তুমি ভাই অপেক্ষাও স্নেহের। মরিব কি না, তাহার নিশ্চয়তা নাই—তবে যদি মরি— একটা মিনতি আছে—"

সতীশ বাষ্পপূর্ণনয়নে আমার মুখের দিকে অতি গম্ভীরভাবে চাহিয়া রহিল।

আমি পুনরায় বলিলাম, "সন্ধ্যা একটি রত্ন। তুমি যাহা চাও, সন্ধ্যা তাহাই। এমন রত্ন অবহেলা করিয়া ঠেলিয়া ফেলিও না। সংসারে অনেক ফুল ফুটিয়া ঝরিয়া যায়, যদি বাছিয়া লইতে হয় ত সন্ধ্যার মত ফুল বাছিয়া লইও। আর একটা কথা, তুমি উঠিয়া যাও—প্লেগ সংক্রামক রোগ।"

সতীশ সে কথা শুনিল না—আমার কণ্ঠ, কপাল প্রভৃতি যাতনাক্লিষ্ট স্থানগুলিতে তাহার পবিত্র ওষ্ঠ আরোপিত করিল। ভাবিলাম, যদি বাঁচিয়া থাকি, তবে এরা দুটিতে আমাকে পাগল করিয়া তুলিবে।

অবসন্ন দেহ আশা ও স্নেহের হিল্লোলে কাঁপিয়া উঠিল। এ সংসার সুখের নয় কে বলে? এ সংসার অলীক, কেমন করিয়া স্বীকার করিব?

চক্ষু নিদ্রাজড়িত হইয়া আসিল। তৎপরদিন সূর্য্যাস্তের সময় আমার জীবনসূর্য্য অস্তগামী না হইয়া একটু পূর্ব্ব দিকে বসিয়া রহিল। ক্রমে দুই দিবসের কালচক্রে দক্ষিণ দিক এড়াইয়া যথাস্থানে আসিল।

একটা শক্ত রোগের পর ক্ষুধার উদ্রেক হওয়া স্বাভাবিক। রুগ্নের পথ্য সম্বন্ধে সন্ধ্যার হস্তনৈপুণ্য অদ্বিতীয়, এবং পঞ্জাব প্রদেশে বিখ্যাত। বিশেষ নিরী-

ক্ষণ করিয়া দেখিলাম, আমার অপেক্ষাকৃত স্থূলদেহ রোগের তাড়নায় অর্দ্ধাংশ ছাড়িয়া দিয়াছে। আমি সন্ধ্যাকে ডাকিয়া চুপি চুপি বলিলাম, "দেখ বোন্, আজ থেকে তুমি আমার সর্ব্বাপেক্ষা আদরের। আমাকে একটু ভাল করিয়া খাওয়াইও, আমি সংসারে আর কিছু চাহি না।"

সন্ধ্যা মিটিমিটি চাহিয়া বলিল, "তুমি দিদিমণির চুমো খাইয়াছিলে?"

আমি। তাই ত এ যন্ত্রণার মূল।

সন্ধ্যা। তুমি বড় দুষ্ট।

আমি। আর তোমার দিদিমণি এমন শিষ্ট যে, আমি মরিতে বসিয়াছিলাম, তা একবার খবরটা লইলেন না।

সন্ধ্যা। দিদিমণিকে চিনিতে পার নাই। সে আজ তিন দিন উপবাসী—

আমি সংবাদদাত্রীকে কৃতজ্ঞতাস্বরূপ চুম্বন করিতে গেলাম। সে হাসিয়া পালাইল। সেই প্রভাতের হাসি।

১০

ঈশ্বরের বিধান মঙ্গলের। কেবল তোমার আমার মঙ্গলের জন্য নয়, সমগ্র বিশ্বসমষ্টির। তাহাতে আমরা হাসিলে কাঁদিলে কিছু আসে যায় না।

পুনর্ব্বার ইজিচেয়ারে বসিয়া জগৎকে নূতন দেখিলাম। আমার পরিবর্ত্তনের সহিত সতীশেরও পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। কেবল অমর্ত্ত ঝির কোনও পরিবর্ত্তন ঘটে নাই।

আমি বলিলাম, "ঝি! তুমি একবার পঞ্জাবে চল।"

ঝি। দাদাবাবু, আর অমন কথা বলিবেন না, এ গতর আর গাড়ীতে ঢুকিবে না।

আমি। তবে একটা প্লেগের অপেক্ষায় বসিয়া থাক।

বলা বাহুল্য, এ অনেক দিনের পরের কথা। প্রায় এক মাস কাটিয়া গিয়াছে। ছোটখুড়ীর যন্ত্রণায় আমি দারপরিগ্রহ করিতে স্বীকৃত হইয়াছি। কেবল সতীশ এখনও রাজি হয় নাই। একচোটে দুই জনের বিবাহ হইয়া যায়, ইহাই ছোটখুড়ীর অভিপ্রেত।

আমি। খুড়ীমা, তুমি এইবার নাকের নোলক খুলিয়া ফেল।

ছোটখুড়ী। নরেশ, আজকাল আমার বয়সে লোক নাৎনীর মুখ দেখিয়া থাকে।

অতএব আমার পরামর্শ গ্রহণ না করিয়া ছোটখুড়ী কর্ণের আরও দুইটি

ছিদ্র বাড়াইয়া ছোট ছোট ইহুদী মাকড়ী পরিধান করিলেন। তাহাতে কর্ত্তৃপক্ষ হইতেও কোন বাধা পড়িল না।

আমি কালবিলম্ব না করিয়া চট্‌পট সদাশিব বাবুর জামতা হইয়া পড়িলাম। বৃদ্ধ বাঁড়ুয্যে মহাশয় বৃদ্ধা পিতামহীকে দেখিয়া সেক্সপীয়র ও কালিদাসের শ্লোক ছাড়িয়া দিলেন।

"বলি বেয়ান্! এ সব বুঝিতে পার কি ?"

পিতামহী। আর ছাই কানেই শুনিতে পাই না। আর চ'খেই বা কয় দিন দেখিতে পাইব ?

বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা আমার গৃহিণীকে লইয়া ক্রমশঃ মস্তকে আশীর্ব্বাদবারি ঢালিতে লাগিলেন।

সন্ধ্যা প্রাঙ্গণে দাড়াইয়া ছিল। আমি ছুটিয়া ধরিলাম। "এবার জান ত সম্বন্ধটা কি ?"

শ্যালিকাশ্রেষ্ঠা কোনও আপত্তি করিল না।

আমি। একবার সতীশকে ভুলাইয়া গলায় দড়িটা দিয়া ফেল না।

সন্ধ্যা। তিনি আমার ইষ্টদেবতা, অমন কথা বলিও না।

আমি। পা পূজা করা পঞ্জাবের প্রথা।

আর কিছু দিন পরেই বোধ হয় সতীশচন্দ্রের জীবনে সন্ধ্যা আরোপিত হইবে। প্রদীপ জ্বলিয়াছে।

সহযোগী সাহিত্য।

শিক্ষা।

জাপানে শিক্ষার উন্নতি।

আজকাল অনেক ভারতবাসী 'কারিগরী' (Technical) বিদ্যা শিখিবার জন্য জাপানে যাইতেছেন। এ দেশে সকলের বিশ্বাস, জাপানে ইউরোপ অপেক্ষা স্বল্পব্যয়ে ইউরোপের মত শিক্ষা লাভ করা যায়। কিন্তু যে সকল ভারতবাসী শিক্ষার্থ জাপান যাত্রা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মত অন্যরূপ। তাঁহারা বলেন, জাপানে যথেষ্ট কষ্ট ও অসুবিধা ভোগ করিয়া তাঁহাদিগকে শিক্ষা সমাপ্ত করিতে হইয়াছে; এবং ভারতীয় শিক্ষার্থীদের কোন মতেই তাঁহাদের দৃষ্টান্তের অনুসরণ কর্ত্তব্য নহে।

সম্প্রতি 'ইষ্ট এণ্ড ওয়েষ্ট' পত্রে শ্রীযুক্ত বৈজনাথ এ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, "সম্প্রতি আমার মিষ্টার ও-কাকুরা কাকুজোর সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তিনি জাপান গবর্মেণ্টের Archœlogical Commissionর এক জন সভ্য। তিনি কিছু দিন পূর্ব্বে 'টোকিও ফাইন্ আর্ট একাডেমি'র অধ্যক্ষ ছিলেন। ইনি জাপানের একজন শিক্ষা-প্রবর্ত্তক। এক্ষণে তিনি স্বয়ং একটি কলা-বিদ্যালয় (Art Academy) প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তিনি এক জন Gakshi, অর্থাৎ তাঁহাকে চীন ও জাপানের সাহিত্যে এম্-এর সমকক্ষ বলা যাইতে পারে। জাপানের শিক্ষাসংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় তিনি বিশেষরূপ অবগত আছেন। যাঁহারা শিক্ষার্থ জাপানে গমন করিতে উৎসুক, অথবা যাঁহারা কোন শিক্ষার্থীকে জাপানে প্রেরণ করিতে চাহেন, তাঁহাদের পক্ষে শ্রীযুক্ত ও-কাকুরার ন্যায় অভিজ্ঞ ব্যক্তির অভিমত মূল্যবান হইবে। তাঁহার সহিত শিক্ষা সম্বন্ধে আমার যে কথোপকথন হইয়াছিল, তাহা তাঁহার অনুমতি লইয়া সর্ব্বসাধারণের গোচর করিতেছি। আমাদের দেশের material ও নৈতিক উন্নতি বিষয়ে তাঁহার সহানুভূতি দেখিয়া বাস্তবিক আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম। ভারতীয় শিক্ষার্থীদিগকে সাধ্যমত সাহায্য করিবার জন্য তাঁহার যেরূপ আগ্রহ দেখিলাম, তাহা বিস্মৃত হইবার নহে।

"ও-কাকুরা বলিলেন, যদিও তাঁহাদের স্কুল, হাইস্কুল, কলেজ প্রভৃতি অসংখ্য ছাত্রে পরিপূর্ণ, তথাপি তিনি ভারতীয় শিক্ষার্থীদিগকে সাধ্যমত সাহায্য করিতে প্রস্তুত। কোন কোন অধ্যাপক ভারতীয় শিক্ষার্থীদিগের সুবিধার জন্য ক্লাসে ইংরাজীতে শিক্ষা দিয়া থাকেন, এবং তাঁহার নিজের বিদ্যালয়ে এক জন শিক্ষক একটি পঞ্জাবী ছাত্রকে বিনামূল্যে চিত্রবিদ্যা শিক্ষা দিতেছেন। যে সকল ছাত্র জাপানের বাহিরে অন্য কোন কলেজ হইতে গ্রাজুয়েট হইয়া আসিয়াছেন, তাঁহারাও স্থানীয় গ্রাজুয়েটদিগের মতই সম্মান প্রাপ্ত হন। উদাহরণস্বরূপ তিনি মিষ্টার শালিগ্রামের নাম করিলেন; ভারতবাসী শালিগ্রাম ওসাকা খনিজ কারখানায় চাকরী করিবার জন্য অনুরুদ্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি স্বীকৃত হন নাই। আর এক জন বঙ্গদেশীয় গ্রাজুয়েট,—শ্রীযুক্ত রায়, একটি তাম্রখনিতে চাকরী গ্রহণ করিতে অনুরুদ্ধ হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনিও সে চাকরী গ্রহণ করেন নাই।* জাপানীরা ভারতবাসীদিগের আগমন বড় স্পৃহনীয় মনে করেন না বটে, কিন্তু তাঁহারা ভারতবাসীদিগকে শিক্ষার্থ জাপানে উপস্থিত হইলে সম্ভবমত সাহায্য করেন, এবং তাঁহাদের সহিত স্বদেশীয় ন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকেন। ভারতীয়কোন ছাত্র যদি সেখানে গিয়া কোনরূপ অসুবিধা ভোগ করিয়া থাকেন, সে জন্য জাপানীরা দোষী নহেন; কারণ, জাপানের সমস্ত শিক্ষাপদ্ধতি হয় 'কারিগরী' বিদ্যাশিক্ষা দিবার জন্য, নয় জাপানের নিজের আবশ্যক অনুসারেই স্থাপিত হইয়াছে সে ক্ষেত্রে ভারতের আবশ্যকতা বিবেচিত হয় নাই। ইউরোপের যেরূপ জীবনযাত্রাপ্রণালী জাপানের সেরূপ নহে, এবং শ্রমশিল্পের শ্রীবৃদ্ধি কল্পেও পাশ্চাত্য দেশের অনুসরণ করিতে গিয়া জাপান অন্ধভাবে প্রতিচীর অনুকরণ করে নাই, বরং নিজের আবশ্যকমত পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রণালী গ্রহণ করিয়াছে, এবং প্রয়োজন মত অর্থ ও পরিশ্রম দ্বারা সুবিধার পথ প্রশস্ত করিয়া লইয়াছে!

* শ্রীযুক্ত রমাকান্ত রায় এক্ষণে জাপানে একটি খনিতে চাকরী করিতেছেন।

"জাপান Technical Schoolর ছাত্রবৃন্দকে কখনও ইউরোপীয় কারখানায় ব্যবহৃত বৃহৎ বৃহৎ কল চালান অথবা ঐরূপ কোন অপ্রয়োজনীয় শিক্ষা প্রদান করে না। ভারতবর্ষের অবস্থাও কতকটা ঐরূপ। জাপানের মত ইহারও দ্রব্য উৎপন্ন করিবার প্রতীচ্য উপায়সমূহ, এদেশীয়দিগের প্রয়োজন অনুসারে প্রাচ্য অর্থ দ্বারা সুবিধামত করিয়া লওয়া উচিত। অতএব ভারতবর্ষের পক্ষে কি আবশ্যক কি অনাবশ্যক, জাপান তাহা বলিয়া দিবে, অথবা শুদ্ধ ভারতবাসীদিগের জন্য জাপানী ভাষায় শিক্ষা দেওয়া বন্ধ হইবে, কিংবা জাপান তাঁহাদের জন্য যতখানি করিতেছেন, তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক করিবেন, এরূপ আশা করা নিতান্তই যুক্তিহীন। যদি সত্যসত্যই ভারতবাসীরা জাপানের সহানুভূতি হইতে কিছু লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে যে প্রণালীতে জাপান তাহার নিজের ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিতেছেন, তদনুযায়ী কার্য্য করা উচিত। তাহা হইলে শীঘ্রই প্রতীয়মান হইবে যে, এই উদ্যমশীল, কর্ম্মনিষ্ঠ জাপানীগণের নিকট হইতে এমন অনেক শিক্ষা লাভ হইয়াছে, যাহা অতি সহজেই স্বদেশে প্রবর্ত্তিত হইতে পারে। নিশ্চয় বলা যায়, তাঁহারা জাপানে কারিগরী শিক্ষার যেরূপ সুবিধা ও অবসর প্রাপ্ত হইবেন, তাহা পাশ্চাত্য দেশের কোথাও পাইবেন কি না সন্দেহ।

"গত কয়েক বৎসরের মধ্যে জাপান এত উন্নত হইয়াছে যে, মনে করিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। জাপান এখন সভ্যজগতে প্রথম শ্রেণীর শক্তিসমবায়ে পরিগণিত হইতে পারে। শ্রীযুক্ত ও-কাকুরার মতে, অল্পব্যয়ে রাজ্যশাসন করিবার প্রথাই জাপানের এইরূপ অসাধারণ উন্নতির মূল। তিনি বলেন, তাঁহাদের রাজমন্ত্রী বৎসরে ১০,০০০ দশ হাজার ইয়েনের অধিক বেতন পান না। এমন কি, প্রধান বিচারপতির বার্ষিক বেতন ৮০০০ ইয়েন মাত্র। এক ইয়েন আমাদের দেশের প্রায় ১৸০ এক টাকা বার আনার সমান। তাঁহার মতে, কর্ম্মচারীদের বেতনের হার এইরূপ বলিয়াই জাপান অন্যান্য পাশ্চাত্য জাতির সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারে। জাপানের তুলনায় ভারতবর্ষে বেতনের পরিমাণ অত্যন্ত অধিক। শ্রীযুক্ত বৈজনাথ বলেন, ও-কাকুরার এই মত ভ্রান্ত কি না, তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু তাঁহার এ সন্দেহের কারণ কি, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। ভারতে যে ইংরেজ কর্ম্মচারীদের বেতন বেশী, তাহাতে কাহার সংশয় হইতে পারে? ও-কাকুরা বলেন, দিন দিন জাপানে দ্রব্যাদি যেরূপ দুর্ম্মূল্য হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে বোধ হয়, নিম্নশ্রেণীর কর্ম্মচারীদিগের বেতনের হার বাড়াইতে হইবে।

"জাপানে দুইটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। একটি টোকিও ও আর একটি কিওটো নগরে প্রতিষ্ঠিত। উভয় বিশ্ববিদ্যালয়েই শিক্ষাদানের ও পরীক্ষা-গ্রহণের ব্যবস্থা আছে। টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন শত ও কিওটো বিশ্ববিদ্যালয়ে এক শত আশী অধ্যাপক আছেন। এখানে সাহিত্য, আইন, চিকিৎসাবিদ্যা, ইঞ্জিনিয়ারিং ও বিজ্ঞান শিখাইবার ব্যবস্থা আছে। অধ্যাপকগণের অধিকাংশই জাপানদেশীয়, এবং জার্ম্মনি, ফ্রান্স, অষ্ট্রীয়া ও আমেরিকা হইতে প্রশংসার সহিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আসিয়াছেন।

"মেধাবী ছাত্রগণ অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। অধ্যাপকগণের বেতন বৎসরে ২০০০ ইয়েন হইতে ৬০০০ ইয়েন। অধ্যাপকগণ জাপানী ভাষাতেই শিক্ষা দেন, কেবল ইউরোপীয় অধ্যাপকগণ ইংরাজী ভাষায় শিক্ষা দিয়া থাকেন। ছাত্রদিগকে জর্ম্মান অথবা ফরাসী ভাষা শিক্ষা করিতে হয়। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে গবর্মেণ্ট আফিসে, কোনও সওদাগরী কার্য্যালয়ে, বা কারখানায় তাঁহারা চাকরী পাইয়া থাকেন। প্রথমে বৎসরে ১০০০ ইয়েন বেতনে কাজ আরম্ভ করিতে হয়। জাপানে যে পরিমাণ লোকের আবশ্যক, কর্ম্মপ্রার্থীর সংখ্যা তাহার অনুপাতে অল্প। এ জন্য জাপানে কোনও গ্রাজুয়েটকেই প্রায় বসিয়া থাকিতে হয় না। জাপান বিশ্ববিদ্যালয়ে একমাত্র উপাধি আছে, তাহার নাম Gakshi। Haksoi নামে চিকিৎসকগণের এক উপাধি আছে। এই উপাধি পাইবার পূর্ব্বে ছাত্রদিগকে বিজ্ঞান বা সাহিত্যে একটি মৌলিক প্রবন্ধের রচনা করিতে হয়। টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় আট শত, এবং

কিওটো বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় চারি শত ছাত্র আছেন। ইঁহারা সকলেই প্রায় সহরে বাস করেন, কেবল অধ্যাপনার সময় বিশ্ববিদ্যালয়ে গমন করেন।

"ছাত্রদিগের মাসিক বেতন ছয় ইয়েন। বাসস্থান ও আহারাদির জন্ম মাসিক প্রায় ২৫৲।৩০৲ টাকা লাগে। পুস্তকের জন্য মাসে ১০৲ টাকা ও পরিচ্ছদের জন্ম মাসিক আরও দশ টাকা আবশ্যক হয়। অবশ্য ইহা মোটামুটি হিসাব। ছাত্র সৌখীন হইলে স্বতন্ত্র কথা। ভারতীয় ছাত্রের আরও কিছু অধিক ব্যয় পড়ে। কারণ,—তাহার পাক করিবার ও অন্যান্য কাজের জন্য একটি স্বতন্ত্র ভৃত্য আবশ্যক। এই জন্য মাসিক আরও ১৫৲।২০৲ ধরিতে হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের অন্তর্গত টোকিও, কিওটো, কুমাটো, মেন্তাই ও কানাজোয়াস, এই পাঁচটি প্রধান নগরে পাঁচটি হাইস্কুল আছে। এই সকল বিদ্যালয়ে, বিশ্ববিদ্যালয় ও সাধারণ কাজকর্ম্ম, উভয়ের উপযুক্ত শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা আছে। প্রত্যেক বিদ্যালয়েই প্রায় সহস্র ছাত্র আছে। প্রত্যেক ছাত্রকেই মাসিক চার ইয়েন বেতন দিতে হয়।—তিন বৎসরে শিক্ষা সমাপ্ত হয়। অষ্টাদশবর্ষ বয়সে ছাত্রগণ বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে পারেন। শিক্ষা সমাপ্ত হইলে মাসিক পঞ্চাশ ইয়েন বেতনে চাকরী পাইয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত সর্ব্বত্রই কারিগরী ও বাণিজ্য শিখিবার বিদ্যালয় আছে। প্রত্যেক প্রধান কেন্দ্রে স্থানীয় শ্রমজীবী বিদ্যালয় আছে। তদ্ভিন্ন টোকিও নগরে বাণিজ্যবিষয়ক ও উচ্চশ্রেণীর আরও দুইটি বিদ্যালয় বিদ্যমান। টোকিও নগরে সর্ব্বপ্রকার শিল্প ও শ্রমসম্বন্ধীয় শিক্ষা প্রদত্ত হইয়া থাকে। জাপানী শিক্ষাপ্রণালী কেবল প্রশংসনীয় নহে, ইহা ইউরোপের শিক্ষাপ্রণালীর সহিত তুলনীয়ও বটে। যে সকল ইউরোপবাসী এই বিদ্যালয়সমূহ পরিদর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। অনেক বিষয়ে এই সকল বিদ্যালয় বিলাতের সমশ্রেণীস্থ বিদ্যালয়ের সহিত তুলিত হইতে পারে। মিঃ ও-কাকুরার নিজ বিদ্যালয়ে চিত্রবিদ্যা, ভাস্কর্য্য ও জাপানের নিজস্ব শিল্প ল্যাকারিং ও ব্রোঞ্জিং শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা আছে।

"এই সকল বিষয়ের আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, জাপানীরা আপনাদের অভাবপূরণে সর্ব্বদাই জাগরূক। প্রাচ্য জাপান প্রতীচ্য বিজ্ঞান ও শিক্ষাপদ্ধতি স্বদেশের আবশ্যকমত ছাঁচে ঢালিয়া আপনাদের আবশ্যকমত আয়ত্ত করিয়া থাকেন। জাপানের শিক্ষাপ্রণালী উৎকৃষ্ট, জাপানীদের প্রয়োজনের অনুরূপ। জাপানের শিক্ষা দ্বারা আমরা অনেক উপকারের প্রত্যাশা করি। সুতরাং জাপানের শিক্ষাপ্রণালী প্রয়োজনমত আমাদের অবিকল গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।"

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

প্রবাসী। শ্রাবণ। শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বচন্দ্র দত্তের "সূর্য্যসম্ভব" একটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ। সাধারণের পক্ষে সহজ ও সুগম করিতে না পারিলে এরূপ প্রবন্ধ প্রায়ই ব্যর্থ হয়। "কুণ্ডলিকাকার গতি," "উল্কাশয় প্রভৃতি" কণ্টকের মত প্রবন্ধটির আদ্যন্তে উদ্যত হইয়া আছে। তাহাতে নিতান্ত জ্ঞানপিপাসু পাঠকও প্রত্যেক পদক্ষেপে আহত হইবেন। ইহাও বলা আবশ্যক, বৈজ্ঞানিক সন্দর্ভের লেখকগণ অনেক ক্ষেত্রে প্রায় নিরুপায়। কেন না, বাঙ্গালা ভাষায় বৈজ্ঞানিক পরিভাষার এখনও সৃষ্টি হয় নাই; নামমাত্র যাহা আছে, তাহাও সর্ব্বত্র স্বীকৃত হয় নাই। তাহার উপর অনেক সুপণ্ডিত বিজ্ঞানবিৎ লেখকও বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সাধারণের উপযোগী ও চিত্তাকর্ষক করিতে জানেন না। "পচ্‌মঢ়ি শৈল" শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র

বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক রচিত চলনসই ভ্রমণকাহিনী। পচ্মঢ়ির বিবরণ এ অঞ্চলের অনেকেই জ্ঞাত নহেন, সুতরাং বলা বাহুল্য, প্রবন্ধটির বিষয় নূতন ও চিত্তাকর্ষক। লেখক যদি রচনার দিকে আর একটু দৃষ্টি দিতেন, তাহা হইলে প্রবন্ধটি আরও রমণীয় হইতে পারিত। এক স্থানে লেখক বলিতেছেন,—"পচ্মঢ়িতে প্রথম দেখিবার জিনিস জঙ্গল,—গ্রীষ্মপ্রধান দেশের আরণ্য দৃশ্য। ইহার বর্ণনা করিতে আমি চেষ্টা করিব না; কারণ আমরা অনেকেই কবিতা সম্ভোগ করিতে পারি সত্য, কিন্তু কবি না হইলে কবিতারচনা করিতে পারি না।" লেখক বোধ করি এই জন্যই প্রবন্ধটির 'আট-পৌরে' পোষাকের ব্যবস্থা করিয়াছেন। কবিতার হীরা মতি না জুটুক, তিনি ইচ্ছা করিলে পচ্মঢ়িকে একখানি 'পোষাকী' কাপড়ও দিতে পারিতেন। সূচীপত্রে সতীশ বাবুর একটি বিশেষণ দেখিয়া থাকি, এবারও দেখিতেছি,—তিনি "প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তিভুক্।" 'বৃত্তিভুক্' শুনিলেই বাল্যশ্রুত 'পিপীলিকাভুক্' মনে পড়ে। বিশেষতঃ, একবারমাত্র যাঁহারা প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি পান, তাঁহারা একবারমাত্র সেই বৃত্তি ভোগ করিয়া থাকেন। তাঁহারা কি বৃত্তিভুক্? শ্রীযুক্ত বামনদাস বসুর "সিন্ধুদেশ" একটি চলনসই প্রবন্ধ। ভাষার সৌষ্ঠবসাধনে লেখকের অত্যন্ত অকুণ্ঠ। নূতন লেখকগণের পুরাতন রোগ। শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রীর "ধর্ম্মের রূপ ও স্বরূপ" একটু অস্বরূপ, বোধ করি ব্রাহ্ম ধর্ম্মের রূপ ও স্বরূপ। 'ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং'—সুতরাং সকলের অধিগম্য নহে। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেনের "বীণা" নামক কাব্যটি মন্দ নহে। "বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গে" বিবিধ জ্ঞাতব্য বিষয়ের আলোচনা আছে। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রচন্দ্র সোমের "নবমীতে বিসর্জ্জন" একটি ক্ষুদ্র অকালপক্ব বিশেষত্ববর্জ্জিত গল্প।

মুকুল। শ্রাবণ। "সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ড" প্রবন্ধে অনেকগুলি সুন্দর চিত্র আছে। "বিদেশে" শিশু পাঠকগণের আনন্দদায়ী হইবে। ভাষার প্রতি সম্পাদক মহাশয় নিতান্ত উদাসীন। ভাব ও ভাষা যাহাতে শিশুদের উপযোগী হয়, সে বিষয়ে সম্পাদক মহাশয়ের অবধান প্রার্থনীয়। যে ভাব বিদেশের আমদানী, এবং যে ভাষা ইংরেজীর প্রতিধ্বনি, তাহা সুকুমার শিশুদের কখনও সুপথ্য হইতে পারে না।

রূপ।

মিছে চেয়ে আছ তুমি মুগ্ধ মর্ত্তবাসী!
কামনা-তৃষিতনেত্রে নিত্য মোর পানে,
আনন্দ-চঞ্চল চারু মম রশ্মিরাশি
অপূর্ব্ব অনন্ত ধ্রুব,—বন্ধন না মানে।
পুলকিয়া ঝলকিয়া উচ্ছল উল্লাসে,
ফুটিয়া টুটিয়া যাই নিত্য নব নব,
দিকে দিকে লোকে লোকে সুধাকলভাষে
উচ্ছ্বসিয়া উঠে শত গীতি স্তুতি স্তব।

আমি আছি নিখিলের জীবনে যৌবনে
হাসি ভাসি লীলাভরে শত লক্ষ ধারে,
এক আমি বহু আমি অনন্ত ভুবনে
পুষ্পে পর্ণে জলে স্থলে আলোকে আঁধারে
সবে মোর তৃষা-তপ্ত—আপনা বিস্মৃত
লালসায় মৃত্যু পায়—সাধনে অমৃত।

বাসনা।

কবে উঠিয়াছ বাজি' হে মহারাগিনী!
আশা অতৃপ্তির মুগ্ধ সকরুণ তানে
কোন্ তন্ত্রী হ'তে? লীলানুরাগিনী
বিশ্বলক্ষ্মী তখনি কি তোমার আহ্বানে
বৃন্তহীন পুষ্প সম উঠিয়াছে ফুটে
রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শ-গন্ধে শূন্যমাঝে
আলোকিয়া দিগ্দিগন্ত কিরণমুকুটে
আমরা তোমারি শিশু,—শুনি নিত্য বাজে
তোমার ও গীতখানি গ্রহে উপগ্রহে
মেঘমন্দ্রে সমীরণে জল-কল-স্বরে
জড়ে ও চেতনে কত আকুল আগ্রহে—
জীবনের প্রতি কর্ম্মে, মরণ ভিতরে।
মুক্তি কি উহারি রোধ? তব অবসান
সৃষ্টির প্রলয়—বিশ্ব-প্রদীপ-নির্ব্বাণ?

প্রিয়জনকে

উপহার।

প্রিয়জনকে উপহার দিবার জন্য যত প্রকার সৌখীন সামগ্রী আছে, তন্মধ্যে সুগন্ধি দ্রব্য সর্ব্বপ্রধান, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। মুল্যবান কাপড় এবং আরও বহুমূল্য অলঙ্কারে সজ্জিত হইলেও একটু সুগন্ধ ছড়াইতে না পারিলে বেশভূষা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। আমাদের প্রস্তুত কুন্তলীন, দেলখোস্ ও তাম্বুলীন, এই তিনটী সুগন্ধি দ্রব্য অল্পকালের মধ্যে ভারতের সর্ব্বত্র সমাদৃত হইয়াছে, এবং সম্ভ্রান্ত, সৌখীন পুরুষ ও রমণী কর্ত্তৃক নিত্য ব্যবহারের সামগ্রী মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। পূজার সময় প্রিয়জনকে উপহার দিবার জন্য অন্য যাহাই ক্রয় করুন, এই তিনটী সখের জিনিস ক্রয় করা আপনার নিতান্ত আবশ্যক।

এইচ, বসু

ম্যানুফ্যাকচারীং পারফিউমার,

৬২ নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১৩০৯ সনের কুন্তলীন পঞ্জিকায় আমাদের প্রস্তুত অন্যান্য এসেন্সের তালিকা দেখুন। নাম ও ঠিকানা পাঠাইলে বিনা মূল্যে আমরা কুন্তলীন পঞ্জিকা পাঠাইয়া থাকি।

অরণ্যে রোদন।*

এই উপস্থিত সভ্যমণ্ডলীকে যদি অরণ্যের সহিত উপমিত করি, তাহা হইলে সভ্যমণ্ডলীর প্রতি এবং সভার আহ্বানকর্ত্তা চৈতন্য লাইব্রেরীর অধ্যক্ষগণের প্রতি নিতান্ত অবিচার করা হয় সত্য, কিন্তু আমাদের এই রোদন যে নিতান্তই অরণ্যে রোদনের ন্যায় নিষ্ফল, সে বিষয়ে কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সন্দেহ করিবেন না। তবে এই নিষ্ফল পরিশ্রমে কাজ কি, বলিয়া কেহ যদি প্রবন্ধপাঠককে এইখানেই নিরস্ত হইতে বলেন, তাহা হইলে তদুত্তরে বলা যাইতে পারে, বিনা রোদনে এই বাঙ্গালী জীবন অতিবাহন করা যাইবে কিরূপে? আমাদের এই সমগ্র শিক্ষিতসমাজ যদি আজ সহসা প্রতিজ্ঞা করিয়া বসেন যে, কিছুতেই আমরা আর কাঁদিব না, তাহা হইলে তাঁহাদের জীবনে আর কর্ত্তব্য কি অবশিষ্ট থাকে, খুঁজিয়া মেলা দুর্ঘট হইয়া উঠে। নিতান্তই অন্য কর্ম্মের অভাবে আমরা এত দিন ধরিয়া বাল্যকালে মাষ্টার মহাশয়ের বেত্র-গৌরবের ও যৌবনে আপিসের কর্ত্তার উপানৎ-গৌরবের উপলব্ধি করিয়া আসিতেছিলাম; কেন করিতেছিলাম, তাহা নিজেও ঠিক জানিতাম না, অন্যে জিজ্ঞাসা করিলেও উত্তর দিতে পারিতাম না; আমাদের রাজপুরুষেরা আমাদের এত দিনের সেই প্রিবিলেজটা, সেই অধিকারটা, কাড়িয়া লইতে উপস্থিত হইয়াছেন, ইহাতেও যদি একবার রোদন না করি, তাহা হইলে রোদনক্ষমতাই বা বিধাতা আমাদিগকে দিয়াছেন কিসের জন্য? এইরূপে উদ্দেশ্যসমর্থনের পর কর্ত্তব্যসাধনে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতে পারে।

* ১৫ই আশ্বিন তারিখে শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত সি. আই. ই. মহোদয়ের সভাপতিত্বে চৈতন্য লাইব্রেরির অধিবেশনে পঠিত।

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার লইয়া যে কোলাহল সম্প্রতি উপস্থিত হইয়াছে, সেই কোলাহলের অর্থ বুঝিবার পূর্ব্বে বিশ্ববিদ্যালয় জন্তুটা কিরূপ, বুঝিবার একবার চেষ্টা করা উচিত। কেহ বলেন, উহা মাংসাশী, উহা কেবল বালকবৃন্দের রক্ত খায় ও হাড় চিবায়; কেহ বা বলেন, না, উহা উদ্ভিজ্জাশী ও তৃণভোজী, উহার বাঁটে দুধ পাওয়া যায়, উহার শিঙে ভেঁপু হয়, ও উহার হাড়ে আত্মারাম সরকারের প্রেতপুরুষ চমকিত হয়। প্রাণিতত্ত্বে বিদ্যা না থাকিলেও আমরা যখন উহার দুধ খাইয়া মানুষ হইয়াছি, উহার হাড়ে ভেলকি বাজি দেখাইয়া আসিতেছি, এবং এই মুহূর্ত্তেই যখন তারস্বরে ভেঁপু বাজাইতে দাঁড়াইয়াছি, তখন উহার সহিত আমাদের পরিচয় কিছু না আছে, এমন নহে। এবং সেই পরিচয়ের উপর নির্ভর করিয়া আপনাদের ধৈর্য্য ভিক্ষা করিতেছি।

শিক্ষা বা উচ্চশিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই, কিন্তু সেই শিক্ষাটাই বা কিরূপ, বিশ্ববিদ্যালয়ের কিরূপ শিক্ষা দেওয়া উচিত, তৎসম্বন্ধে নানাবিধ থিওরি প্রচলিত আছে। এক সম্প্রদায় বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য লিবারাল এজুকেশন দেওয়া। এই লিবারাল এজুকেশন শব্দটা খুব জমকাল শুনায়; দূর হইতে উহা সূর্য্যকর-মণ্ডিত আকাশচারী একখণ্ড মেঘের মত খুব জাঁকাল মূর্ত্তি গ্রহণ করে; কিন্তু কাছে ধরিতে গেলেই উহা কুয়াসার মত ধরা দেয় না। একটু চাপিয়া ধরিলে লিবারাল এজুকেশনের অর্থ দাঁড়ায়—সকল শাস্ত্রেই জ্ঞানলাভ, এবং সকল শাস্ত্রে জ্ঞানলাভের নামান্তর সকল শাস্ত্রেই অপরিপক্কতা ও পল্লবগ্রাহিতা। সকল শাস্ত্রে বলিলে বোধ করি ভুল হয়; যে সকল পণ্ডিতেরা কোন গূঢ় কারণে গণিত শাস্ত্রকে ও বিশেষতঃ বিজ্ঞান শাস্ত্রকে একটু সন্দেহের চক্ষে দেখিয়া থাকেন, তাঁহারা বোধ করি ঐ দুই শাস্ত্রকে লিবারাল এজুকেশনের বিষয় করিতে চাহেন না। ভাষা সাহিত্য দর্শন ইতিহাস প্রভৃতি সকল শাস্ত্রই এই লিবারাল এজুকেশনের বিষয় হইতে পারে; গণিত বিজ্ঞানও যে না পারে তাহা নহে; তবে ঐ দুই বিদ্যা কতকটা টেকনিকাল গোছের; বিশ্ববিদ্যালয়ে তাহার স্থান না থাকিলেও তত ক্ষতি নাই। কিন্তু কি প্রাচীন কি আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ইতিবৃত্ত আলোচনা করিলে, সকল শাস্ত্রেই কিছু কিছু জ্ঞান-দান এবং টেকনিকাল শাস্ত্রকে যথাসাধ্য বর্জ্জন করিয়া লিবারাল বিদ্যাদানই যে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান উদ্দেশ্য, তাহা বোধ হয় না। বরং বোধ হয়, কোন একটা বিশেষ শাস্ত্রে পারদর্শী করাই বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য। ইউরোপের

প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ন্যায়শাস্ত্র, থিয়লজি, আইন, গণিত শাস্ত্র, এমন কি সঙ্গীতশাস্ত্র প্রভৃতি টেক্‌নিকাল শাস্ত্রে পারদর্শিতা জন্মাইবার ব্যবস্থা ছিল। কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয় কোন কোন টেক্‌নিকাল শাস্ত্রের আলোচনার জন্য ও অধ্যাপনার জন্য খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। একালের অনেক বিশ্ববিদ্যালয়েই চিকিৎসা, ইঞ্জিনিয়ারিং, আইন প্রভৃতি টেক্‌নিকাল শাস্ত্রের অধ্যাপনা হয়। আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে কৃষি, বাণিজ্য প্রভৃতির স্বতন্ত্র ফ্যাকল্‌টির যোগ হইতেছে। আর বিজ্ঞানের কথা,—বিবিধ বিজ্ঞান শাস্ত্রের অধ্যাপনাই একালের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের যেন সর্ব্বপ্রধান কাজ হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের দেশের প্রাচীন চতুষ্পাঠীগুলিকে যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থানভুক্ত মনে করি, সেখানেও দেখিবে, কোথাও সাহিত্য, কোথাও ন্যায়শাস্ত্র, কোথাও বা ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যাপনার বিশেষ বন্দোবস্ত আছে। কাজেই লিবারাল শিক্ষাদান অপেক্ষা টেক্‌নিকাল শিক্ষাদানই, সর্ব্বশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য জন্মাইবার চেষ্টা অপেক্ষা একটা কোন শাস্ত্রে গভীরতর পাণ্ডিত্য জন্মাইবার চেষ্টাই বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য বলিয়া বোধ হয়। এবং এক একবার বোধ হয়, তাহা হওয়াই উচিত। একটা দেশের দশটা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেকটিতেই সকল শাস্ত্রের অধ্যাপনার ব্যবস্থা থাকিলে কোনটারই ব্যবস্থা সুচারুরূপে ঘটে না; এক একটা বিশেষ শাস্ত্র অধ্যাপনার ভার এক এক বিশ্ববিদ্যালয় লইলে সকল শাস্ত্রেরই সম্যক্ চর্চ্চার সুবিধা হয়; এক জায়গায় না হইলে অন্য জায়গায় হয়।

আমাদের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মোহরের গায়ে মোটা হরপে খোদা আছে "Advancement of Learning" অর্থাৎ বিদ্যার উন্নতি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই উন্নতিসাধনে কতটা সফল হইয়াছে, তাহা অনেকেই সন্দেহ করেন; কিন্তু পাশ্চাত্য দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি বিদ্যার উন্নতিসাধনেই নিযুক্ত রহিয়াছে। একালে জর্ম্মান বিশ্ববিদ্যালয়গুলির যেরূপ খ্যাতি প্রতিষ্ঠা আছে, সেরূপ আর কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের নাই; আর সর্ব্বত্রই লোকে শিক্ষা বিষয়ে জর্ম্মানির অনুকরণের জন্যই লালায়িত। জর্ম্মাণ বিশ্ববিদ্যালয়ে আজকাল অধ্যাপনা বা জ্ঞানপ্রচার গৌণ উদ্দেশ্য; এবং জ্ঞানের উন্নতিই মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া বিবেচিত হয়। সেখানে বড় বড় পণ্ডিতগণ নূতন নূতন তত্ত্ব আবিষ্কারে, নূতন নূতন সত্যের উদ্ঘাটনে সর্ব্বদা নিযুক্ত আছেন। শিক্ষার্থীরাও অধ্যাপকগণের নিকট সেই সত্য আবিষ্কারের পন্থা শিখিতেছে, কালে তাহারাও সেই কার্য্যে ব্রতী হইবে। গবেষণা এখন অধ্যাপনার স্থান গ্রহণ করিতেছে।

সেকালে অধ্যাপকেরা পুরাণ কথা শিখাইয়াই তৃপ্ত থাকিতেন ; একালে আর পুরাতনের উপর নির্ভর করিয়া থাকা চলে না ; এখন নূতনকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্যই সকলে ব্যস্ত। অকস্‌ফোর্ড ও কেম্ব্রিজের প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় সত্যানুসন্ধানের বন্দোবস্তে জর্ম্মাণ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পায়ের নিকট বসিতে পারে না।

একটা অতি পুরাতন থিওরি আছে যে, মানুষ গড়িয়া তোলাই শিক্ষার মুখ্য ও চরম উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। বঙ্কিমবাবুর ভাষায় বলিলে বলিতে হয়, মনুষ্যের সমুদয় বৃত্তিগুলির সর্ব্বতোভাবে সামঞ্জস্যবিধান দ্বারা উহাদের সর্ব্বাঙ্গীণ স্ফূর্ত্তিসাধনই শিক্ষার চরম উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। অধ্যাপক হক্‌স্‌লীও এক জায়গায় এইরূপই বলিয়াছেন। অকস্‌ফোর্ডের মত বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদিগের মধ্যে শাস্ত্রাধ্যাপনার ও শাস্ত্রালোচনার সঙ্গে সঙ্গে, ক্রীড়া কৌতুক ব্যায়াম প্রভৃতির দ্বারা দেহের স্ফূর্ত্তি ও বিবিধ সামাজিকতাবর্দ্ধক অনুষ্ঠানের দ্বারা মানসিক স্ফূর্ত্তিসাধনের ব্যবস্থা আছে। ইংরাজেরা কথায় কথায় তাঁহাদের স্পর্দ্ধিত জাতীয় জীবনের সহিত অক্‌স্‌ফোর্ডের সম্বন্ধের বর্ণনা করিয়া গর্ব্ব প্রকাশ করিয়া থাকেন। উপরে যাহাকে লিবারাল এজুকেশন বলিয়াছি, সমগ্র চিত্তবৃত্তির সর্ব্বাঙ্গীণ স্ফূর্ত্তিসাধনই বোধ করি উহার প্রকৃত তাৎপর্য্য, এবং তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে উহার বিরুদ্ধে বলিবার কিছুই থাকে না। আজ কাল শাস্ত্রবিশেষে ব্যুৎপত্তি অর্থাৎ specializationএর একটা ধুয়া উঠিয়াছে ; কিন্তু একটা বিষয়ে, সে বিষয়টা যতই গুরু হউক না, একটা বিষয়ে আবদ্ধ থাকিলে সঙ্কীর্ণতা ও একদেশদর্শিতার প্রশ্রয় দেওয়া হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই, এবং একদেশদর্শিতা ও সঙ্কীর্ণতা ব্যক্তিগত বলবৃদ্ধির পক্ষে যতই অনুকূল হউক না কেন, সমস্ত জাতির সাধারণ শিক্ষায়, উহা জাতীয় বলবৃদ্ধির বা মনুষ্যত্ববৃদ্ধির অনুকূল হইতে পারে না। কাজেই লিবারাল এজুকেশনের কথাটা হাসিয়া উড়াইয়া দিলে চলিবে না। অপর পক্ষ যে ইহা অস্বীকার করেন, তাহা নহে ; তাঁহারা বলেন, ঐরূপ উন্নত অর্থে লিবারাল শিক্ষা বড় ভাল কথা ; এমন কি আর একটু নীচে যাইয়া, প্রত্যেক ব্যক্তিরই মানুষ হইতে হইলে সকল বিষয়েই কিছু কিছু জ্ঞান থাকা আবশ্যক, উহাও অস্বীকার্য্য নহে। কিন্তু ইঁহারা বলিবেন, বিশ্ববিদ্যালয় ঠিক এইরূপ শিক্ষার স্থান নহে। সকল শাস্ত্রে কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা, যাহা সভ্যদেশে মনুষ্যমাত্রেরই আবশ্যক, তাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিম্ন পর্য্যায়ে যে শিক্ষা দেওয়া হয়, সেখান হইতেই আনা উচিত।

আর ঐ যে খুব লম্বা কথাটা—সর্ব্বাঙ্গীণ স্ফূর্ত্তিসাধন,—তাহা কোন বিদ্যা-মন্দিরের প্রাচীরের মধ্যে ঘটিতে পারে না। সেই স্ফূর্ত্তিসাধনের জন্য বিদ্যা-মন্দিরের প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া মনুষ্যসমাজের সুবৃহৎ কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে হইবে; বিদ্যামন্দিরের অন্তর্গত ক্ষুদ্র সমাজে তাহার অনুকরণ বা অভিনয় হইতে পারে বটে; কিন্তু প্রকৃত মনুষ্যত্বশিক্ষার স্থান অন্যত্র। সৃষ্টিকর্ত্তা, সকল মানুষকে এক ছাঁচে ঢালিয়া গড়েন নাই। বিভিন্ন ব্যক্তির রুচি প্রবৃত্তি শক্তি বিভিন্ন দিকে। সেই জন্য প্রত্যেক ব্যক্তির রুচি প্রবৃত্তি ও শক্তি বুঝিয়া সেই সেই ব্যক্তিগত শক্তিবর্দ্ধনের চেষ্টা করিলে অধিক ফললাভের সম্ভাবনা। সকলকে এক ভাবে গড়িতে গেলে কোনটার গঠনই মজবুত হয় না; প্রত্যেকের কাঠামোর বিশিষ্ট দিকে নজর দিয়া বিশিষ্টভাবে গড়িবার চেষ্টা করিলে, তাহার বলবিধানে অধিকতর সফলতা ঘটিতে পারে। পৃথিবীর কর্ম্মক্ষেত্র অতি ভীষণ; এখানে কেহ কাহাকেও খাতির করে না; এখানে দয়া নাই, মমতা নাই; এখানে সকলেই আপনাকে বাঁচাইবার জন্য ব্যতি-ব্যস্ত। এই বিশাল কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে সম্মুখসমরের উপযোগী বলসঞ্চয় করিয়া রাখা আবশ্যক। যে ব্যক্তি যে পথে গেলে শক্তিসঞ্চয় করিতে পারিবে, তাহাকে সেই পথে যাইতে স্বাধীনতা দিলে তবেই সে যথাযথ শক্তি-সঞ্চয়ের অবসর পাইবে; নতুবা একটা কাল্পনিক সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ আদর্শ খাড়া করিয়া অন্ধ, খঞ্জ, মূক বধির সকলকেই নিজ নিজ স্বাভাবিক বিকৃতি ও হীনতা হইতে মুক্ত করিয়া সেই আদর্শের গঠন দিতে গেলে, অনর্থক পরিশ্রম ভিন্ন বিশেষ ফল হইবে না। বিশ্ববিদ্যালয় প্রত্যেক শিক্ষার্থীর পক্ষে সেই শক্তিসঞ্চয়ের স্থান। শিক্ষার্থী যখন নাবালক থাকে, যখন সে নিজের মতিগতি প্রকৃতি কোন্ দিকে, তাহা নিজেই জানে না, তখনই নিম্নতর বিদ্যালয়ে তাহার যথাসম্ভব লিবারাল শিক্ষার বিধান কর, এবং পরে সে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া যখন আপনাকে চিনিতে পারে, তখন তাহাকে আপন রুচি ও প্রবৃত্তি অনু-সারে নির্দ্দিষ্ট পথে স্বাধীনভাবে চলিতে দাও; সকলকে জোর করিয়া এক রাস্তায় চলিতে বাধ্য করিও না; তাহা হইলেই প্রত্যেকের পক্ষে মঙ্গল হইবে ও সমাজের পক্ষেও মঙ্গল হইবে।

উভয় পক্ষের বাদপ্রতিবাদের গণ্ডগোলে আর সময় নষ্ট করিবার দরকার নাই। ফলে, উভয় পক্ষের উক্তিতে কিছু না কিছু সত্য আছে। মনুষ্যের প্রবৃত্তি ও রুচি অনুসারে তাহার একদেশের গঠন দ্বারা তাহার বলবিধান, অতি

উত্তম কথা; এবং মনুষ্যের সমস্ত বৃত্তির সামঞ্জস্য বিধান করিয়া তাহার মনুষ্যত্বকে পূর্ণতা প্রদান আরও উত্তম কথা। কিন্তু যে উদ্দেশ্যটা যত উত্তম, সেই উদ্দেশ্য কার্য্যতঃ সাধন করা তত কঠিন। ইংরাজেরা বলিতে পারেন, আমাদের অক্‌সফোর্ড আমাদের সামাজিকত্বে আমাদের মনুষ্যত্বে পূর্ণতাপ্রদান করিয়া আমাদের জাতীয় শক্তি প্রদান করিয়াছে; তাহারই বলে আমরা ভূমণ্ডলকে তোলপাড় করিতেছি, তাহারই বলে আমাদের পৃথিবীব্যাপী বাণিজ্য, আমাদের পৃথিবীব্যাপী সাম্রাজ্য, আর আমাদের পৃথিবীবিপর্য্যাসকারী অহঙ্কার। হইতে পারে; তোমরা বড়, তোমাদের মুখে সকল কথাই শোভা পায়। আবার জর্ম্মানি বলিতে পারেন, আমাদের সহস্র বিদ্যামন্দিরে আজ শত বৎসর ধরিয়া যে ব্যক্তিগত বিশিষ্ট শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহারই ফলে দেখ আজিকার জর্ম্মান সাহিত্য, জর্ম্মান বিজ্ঞান, জর্ম্মান দর্শন, জর্ম্মান পাণ্ডিত্য, জর্ম্মান শিল্প, জর্ম্মান সঙ্গীত এবং সকলের উপর সেই উদ্ধত, স্পর্দ্ধিত, জর্ম্মান জাতীয়তা, যাহার ফলে সীডানক্ষেত্র, যাহার ফলে "mailed fist", যাহার ফলে "make no prisoners," যাহার ফলে অন্য জাতির চক্ষুঃশূল "made in Germany।" আমরাও বলি, সত্য কথা; তোমরাও বড়, তোমাদের মুখেও সকল কথাই শোভা পায়! সফলতা দেখিয়া বিচার করিতে গেলে হয় ত জর্ম্মান শিক্ষানীতিকেই প্রাধান্য দিতে এক একবার ইচ্ছা হয়; জর্ম্মানের জীবনগঠনে জর্ম্মান শিক্ষানীতির প্রভাব অস্বীকার করিবার উপায় নাই; এবং যখন দেখা যায়, অতি অল্প দিনের মধ্যেই জর্ম্মানি কি ছিল, কি হইয়াছে, তখন ঐ শিক্ষানীতির প্রতি পক্ষপাত আপনা হইতে আসিয়া পড়ে। আর ইংরাজ যখন অক্‌সফোর্ডের গল্প করেন, তখন ইংরাজের বর্ত্তমান অবস্থা কতটা ইংরাজের শিক্ষানীতির ফল, আর কতটাই বা ইংরাজের বহুশতাব্দীব্যাপী রাষ্ট্রিক অভিব্যক্তির ফল, আর কতটাই বা তাহার নিবাসভূমি ক্ষুদ্র দ্বীপের ভৌগোলিক অবস্থানের ফল, তাহার সম্যক্ মীমাংসা দুষ্কর বলিয়া বোধ হয়।

শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আজকাল একটা নূতন কথা শুনা যাইতেছে; কিছু দিন পূর্ব্বে এ কথাটা তেমন স্পষ্টভাবে শুনা যাইত না। ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক বিষয়ে দুইটা পরস্পর বিপরীত থিওরি প্রচলিত আছে। একটার ইংরাজী নাম individualism ব্যক্তিতন্ত্রতা, আর একটার নাম socialism সমাজতন্ত্রতা। এক দল বলেন, ব্যক্তির জন্যই সমাজ; আর এক দল উল্টাইয়া বলেন, সমাজের জন্যই ব্যক্তি। ব্যক্তির উন্নতি না হইলে সমাজের উন্নতি হয়

না, ও সমাজের উন্নতি না হইলে ব্যক্তির উন্নতি হয় না ; কাজেই একের স্বার্থে অন্যের স্বার্থ প্রতিষ্ঠিত। সত্য কথা ; কিন্তু সত্য হইলে কি হয়। এক দল বলেন, ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে ও স্বতন্ত্র ভাবে স্ফূর্ত্তিলাভ করিতে দাও ; সমাজের যে ব্যবস্থা ব্যক্তিগত স্ফূর্ত্তির অনুকূল, তাহাই বজায় রাখ ; তবে কি না, সমাজ না থাকিলে ব্যক্তির উন্নতি নাই ; সেই জন্য সমাজ রাখিবার জন্য যতটুকু দরকার, সমাজের খাতিরে ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের ততটুকু সঙ্কোচন কর। এই মতের এক জন প্রসিদ্ধ প্রচারক সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক হার্বার্ট স্পেন্‌সর। অন্য পক্ষ বলেন, যখন সমাজের কুশলের উপরই ব্যক্তিগত কুশল সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত, তখন সমাজের মঙ্গলার্থ ব্যক্তিকে আপনার স্বার্থ সম্পূর্ণ বিসর্জ্জনের জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিতে হইবে। তজ্জন্য ব্যক্তিকে সর্ব্বতোভাবে সমাজের অধীন রাখিতে হইবে ; তবে যেটুকু স্বাধীনতা দিলে সমাজের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অনিষ্টের আশঙ্কা নাই, সেইটুকু স্বাধীনতা তাহাকে দিতে পার। আজ-কালকার অনেক বিখ্যাত ও অখ্যাত পণ্ডিত এই মতের পোষণ করেন।

বেশী দিনের কথা নহে, যখন রেলওয়ে ও ষ্টীমার সহসা ধরাপৃষ্ঠে আবির্ভূত হইয়া ধরাপৃষ্ঠের আয়তন সঙ্কীর্ণ করিয়া ফেলিল, এবং টেলিগ্রাফের তার বায়ু-পথে উড্ডীন ও জলপথে নিমগ্ন হইয়া কালেরও সংক্ষেপসাধন করিয়া ফেলিল, তখন বড় বড় তত্ত্বজ্ঞ মহানন্দে নৃত্য করিয়া বলিলেন, এইবার মানবজাতিসমূহ চিরন্তন হিংসাবিদ্বেষ বিসর্জ্জন দিয়া পরস্পর সখ্যবন্ধনে আবদ্ধ হইবে ও পরস্পর প্রেমালিঙ্গনে জড়াজড়ি করিবে। অধিক দিন গত হয় নাই, কিন্তু ফলে দেখা যাইতেছে, মনুষ্যের এই ঘনিষ্ঠতাবন্ধনের ফল অন্যরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। জাতির সহিত জাতির প্রেমালিঙ্গনের পাশটা অত্যন্ত দৃঢ় হইয়াছে, সন্দেহ নাই ; বিশেষতঃ, সভ্যজাতি যখন অসভ্যজাতিকে প্রেমপাশে বাঁধিয়া ফেলে, সে দড়ি ছেঁড়ে কাহার সাধ্য! আর সভ্যজাতির প্রীতিচুম্বনের ফলে পরস্পরের গণ্ডদেশ হইতে রুধিরধারা সবেগে ক্ষরিত হইতেছে, এবং তৎকালে উভয়ের বিকসিত দন্তচ্ছটা ও কণ্ঠধ্বনি প্রতিদ্বন্দ্বী সারমেয়যুগলের সাক্ষাৎকার ও প্রীতিসম্ভাষণকেও পরাভূত করিতেছে। এই বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে সভ্য জাতির প্রেমালিঙ্গন শিবাজী ও আফজল খাঁয়ের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ প্রেমালিঙ্গনকে স্মরণ করায়। হাবার্ট স্পেন্‌সর আশা করিয়া বসিয়া ছিলেন, অচিরে সভ্য জগতে সামরিক যুগের অশান্তির অবসান ঘটিয়া বাণিজ্য যুগের চিরশান্তির প্রতিষ্ঠা হইবে। সেই মহামনা বৃদ্ধ দার্শনিক আজ পর্য্যন্ত ধরাপৃষ্ঠ অলঙ্কৃত

করিতেছেন; কিন্তু তাঁহার সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; এবং তিনি দুঃখ ও নৈরাশ্যের আর্ত্তনেত্রে চাহিয়া দেখিতেছেন, বাণিজ্যকে উপলক্ষমাত্র করিয়া মনুষ্য মনুষ্যের প্রতি, সমাজ সমাজের প্রতি তীক্ষ্ণ ছুরিকা আস্ফালন করিতেছে। যাহাদের সহিত বন্ধুত্বের আশা ছিল, তাহারা দারুণ শত্রুতে পরিণত হইয়াছে; এবং বিশাল বসুন্ধরা প্রত্যেকের পক্ষে এক বিশাল শত্রুপুরীতে পরিণত হইয়াছে। প্রত্যেক জাতি, প্রত্যেক রাষ্ট্র আপনার প্রতিবেশী হইতে আত্ম-রক্ষার জন্য সর্ব্বদা বিনিদ্রভাবে সশস্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, এবং কিসে শত্রুর ক্ষয় ও আপনার জয় হয়, তাহাই উহার একমাত্র ধ্যানের বিষয় হইয়াছে। বর্ত্তমান অবস্থার অবশ্যম্ভাবী ফল ব্যক্তিতন্ত্রের অবনতি ও সমাজতন্ত্রের অথবা রাষ্ট্রতন্ত্রের অভিব্যক্তি। রাষ্ট্র কিরূপে বড় হইবে, রাষ্ট্র কিরূপে বলিষ্ঠ হইবে, রাষ্ট্রের কিরূপে গৌরব বাড়িবে, রাজনীতিবিৎ হইতে সাহিত্যসেবী পর্য্যন্ত সকলেরই তাহাই প্রধান চিন্তার কারণ হইয়াছে। ব্যক্তির জীবন কিসের জন্য? রাষ্ট্রের জন্য, রাষ্ট্রকে বাড়াইবার জন্য। রাষ্ট্রের জন্য সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিতে ব্যক্তিকে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিতে হইবে। বিংশ শতাব্দী এই রাষ্ট্র-তন্ত্রকে বক্ষে লইয়া অবতীর্ণ হইয়াছে।

কোন্ শিক্ষানীতি উৎকৃষ্ট, এখন কি আর খুলিয়া বলা আবশ্যক? উহাই প্রকৃষ্ট শিক্ষানীতি, যাহা প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার সমাজের, তাহার রাষ্ট্রের স্বার্থরক্ষণে সম্যক্‌রূপে সমর্থ করে। সেই শিক্ষাই শিক্ষা, যে শিক্ষা প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যক্তিগত দৌর্ব্বল্য দূর করিয়া প্রত্যেকের ব্যক্তিগত প্রবৃত্তির বলাধান করিয়া, প্রত্যেকের ব্যক্তিগত শক্তির স্ফূর্ত্তি সাধন করিয়া, তাহাকে সমাজের বা রাষ্ট্রের দাসত্বের জন্য উপযোগী করে। প্রত্যেক রাষ্ট্র তাহার প্রতিবেশীর জন্য যুদ্ধার্থ সর্ব্বদা প্রস্তুত আছে; রাষ্ট্রভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তি যেন সর্ব্বদা শিক্ষিত সৈনিকরূপে আপন রাষ্ট্র রক্ষার জন্য প্রস্তুত থাকে। সেই সকল পুরাতন কথা এখন আর শোনা যায় না, অথবা এখন তাহা নূতন অর্থ গ্রহণ করিয়াছে। শিক্ষা দ্বারা প্রত্যেক ব্যক্তির সমগ্র বৃত্তির সর্ব্বাঙ্গীণ স্ফূর্ত্তি-সাধন করিতে হইবে;—উত্তম কথা; কেন না, তাহার সমগ্র বৃত্তি সর্ব্বাঙ্গীণ স্ফূর্ত্তি লাভ করিলে উহা রাষ্ট্রের ইষ্টসাধনেই আবশ্যক হইবে। শিক্ষা দ্বারা প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যক্তিগত রুচি প্রবৃত্তি ও ক্ষমতা বিশিষ্টভাবে আপন আপন পথে অভিব্যক্ত করিতে হইবে;—অতি উত্তম কথা; কেন না, ক্ষমতা অভিব্যক্ত হইলেই ত রাষ্ট্রের স্বার্থসাধনে নিয়োজিত হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য

শিক্ষাদান বা উচ্চশিক্ষাদান ; কিন্তু সংসারের ভীষণ ক্ষেত্রে আত্মরক্ষার্থ বা আত্মহিতার্থ শিক্ষার্থীকে প্রস্তুত করা সেই শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য নহে ; রাষ্ট্রকে বলিষ্ঠ করিয়া রাষ্ট্রের হিতসাধনই সেই শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য ; তবে রাষ্ট্রের হিতেই যখন তাহার হিত, রাষ্ট্র নষ্ট হইলে তাহার ব্যক্তিত্বও যখন ধ্বংস পাইবে, তখন গৌণভাবে এই শিক্ষা দ্বারা তাহার ব্যক্তিগত মঙ্গল সাধিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। শাস্ত্রবিৎ, রাজনীতিবিৎ ও একালের শিক্ষানীতি-বিৎ, সকলেই শিক্ষার এই উদ্দেশ্য আবিষ্কার করিয়াছেন, এবং কি বিশ্ববিদ্যালয়, কি নিম্ন বিদ্যালয়, কি লাবরেটরি, কি লাইব্রেরি, কি কারখানা, সর্ব্বত্র, এই শিক্ষার উৎকর্ষবিধানের জন্য ব্যস্ত রহিয়াছেন। বলা বাহুল্য, জর্ম্মানিতে এই শিক্ষানীতি সম্যক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এবং জর্ম্মানিতেই এই শিক্ষানীতি-অনুসারে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালী গঠিত সংস্কৃত ও পুনঃসংস্কৃত হইয়াছে। অন্যান্য দেশ ও অন্যান্য জাতি এই নীতির অনুসরণের জন্য ব্যাকুল রহিয়াছে মাত্র। অনেকটা সফলও যে না হইয়াছে, তাহা নহে ; চক্ষুর সম্মুখে উদাহরণ জাপান।

বস্তুতই আজ আমি অরণ্যে রোদনে প্রস্তুত হইয়াছি, কিন্তু আমাকেও স্বীকার করিতে হইতেছে যে, এতক্ষণ শিক্ষানীতি সম্বন্ধে এত বাগ্‌বাহুল্য দ্বারা পরমসহিষ্ণু শ্রোতৃবৃন্দের কর্ণপীড়া উৎপাদন করিলাম, আমার রোদনের ও চীৎকারের এই অংশের বর্ত্তমান প্রসঙ্গে কোনই আবশ্যকতা ছিল না। কেন না, আমাদের ভারতবর্ষের শিক্ষাপ্রসঙ্গে ইহার মধ্যে কোন শিক্ষানীতিরই প্রয়োগের অবসরমাত্র নাই। আমাদের দেশে যে রাষ্ট্র সম্প্রতি বর্ত্তমান, অধ্যাপক সীলি সেই শ্রেণীর রাষ্ট্রকে inorganic state, অঙ্গহীন বা ছিন্নাঙ্গ সুতরাং জীবনহীন রাষ্ট্র, সংজ্ঞা দিয়া তাহাকে আলোচনার অযোগ্য বলিয়া অবজ্ঞাত করিয়াছেন। আমাদের দেশের রাষ্ট্রীয় শক্তি বৈদেশিকের হস্তে ; যেখান হইতে শক্তির পরিচালনা হয়, তাহার সহিত সমগ্র সমাজের কোন জীবন্ত সম্বন্ধ নাই, কোন চেতনার সম্পর্ক নাই। সমাজশরীর তাহার মস্তিষ্ক হইতে এতটা বিচ্ছিন্ন হইয়া রহিয়াছে যে, একের উপর আঘাত অন্যকে স্পর্শ করে না, একে বেদনা পাইলে অন্যত্র তাহার সমবেদনার সঞ্চার হয় না। রাষ্ট্রীয় শক্তির সহিত যখন রাষ্ট্রভুক্ত জনসঙ্ঘের কোন সম্পর্ক নাই, তখন ইউরোপের বর্ত্তমান শিক্ষানীতির প্রয়োগেরও এখানে কোন অবসর দেখি না। আমরা আমাদের রাষ্ট্রের স্বার্থসাধনে ও হিতসাধনে সম্পূর্ণ অক্ষম। মৃত্তিকা

রস যোগাইয়া ও সার যোগাইয়া গাছকে পোষণ করে সত্য কথা, কিন্তু তাহা বলিয়া মৃত্তিকা গাছের অঙ্গপ্রত্যঙ্গমধ্যে গণ্য হয় না; সেইরূপ, আমরাও কর দিয়া ও অন্ন যোগাইয়া রাষ্ট্রের পোষণ করিতেছি, সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহা বলিয়া আমরা রাষ্ট্রের অঙ্গমধ্যে গণিত নহি; আমরা রাষ্ট্ররূপী বৃক্ষের শাখা পল্লব ফল ফুল কিছুরই মধ্যে নহি, আমরা তলস্থ উর্ব্বরা ভূমিমাত্র; তাহার উপর ভর দিয়া বনস্পতি দাঁড়াইয়া আছে, তাহার রস শোষণ করিতেছে, এবং তাহাকে অনুগ্রহ করিয়া ছায়া দিতেছে, এবং প্রতিবেশী গাছ আগাছার আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতেছে। আমাদের এই অধম নির্জীব অস্তিত্ব যে কখনও রাষ্ট্রীয় হিত-সাধনে ও স্বার্থের রক্ষণে নিযুক্ত হইবে, রাষ্ট্র তাহা আশা করে না, বা অপেক্ষা করে না। আমাদের যাহা রাষ্ট্র, তাহা আমাদের হইতে স্বাধীন, তাহা আমাদের মুখাপেক্ষা করে না, তাহা আমাদের বলে বলীয়ান্ নহে, তাহা আপন বলে বলীয়ান্—অমিততেজে বলীয়ান্; এই অক্ষম দুর্ব্বল মেরুদণ্ডহীন মনুজ-সমষ্টির সাহায্যের অপেক্ষা করা সে নিজের দুর্ব্বলতার লক্ষণ মনে করে।

সুতরাং ইউরোপের প্রচণ্ড রাষ্ট্রিক শিক্ষানীতির আমাদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ হইতে পারে, এরূপ মনে করা বাতুলতামাত্র। তবে আমাদের মহামহিম মহাবল মহানুভাব রাষ্ট্র আমাদিগকে যে নির্জ্জীব মানবজীবনধারণের অধিকার দিয়াছেন, সেই মানবজীবনের যথাসম্ভব স্ফূর্ত্তির জন্য আমাদেরও একটা শিক্ষার প্রয়োজন আছে, এবং আমাদেরও একটা শিক্ষানীতি আছে। তাহার সহিত পাশ্চাত্য দেশের শিক্ষানীতিসমূহের তুলনায় আলোচনার কোনই প্রয়োজন নাই। রাষ্ট্রের উন্নতি, রাষ্ট্রের বলবিধান, রাষ্ট্রের হিতসাধন প্রভৃতি ত দূরের কথা; শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অন্যান্য যে সকল থিওরির উল্লেখ করিয়াছি, সে সকলেরও এ দেশে যথাযথ অর্থে প্রয়োগ সম্ভবে না। লিবারাল এজুকেশনের উচ্চতম অর্থ বলিয়াছি—সমস্ত বৃত্তির সামঞ্জস্যসাধন দ্বারা সর্ব্বাঙ্গীণ স্ফূর্ত্তি-সাধন; কিন্তু যে জাতির সমস্ত শুভাশুভ পরহস্তগত, যাহাদের পায়ে শিকল, হাতে শিকল, গলায় শিকল, তাহাদিগের উদ্দেশে অত দীর্ঘ সুললিত বাক্য প্রয়োগ করিলে নিতান্তই উপহাস করা হয়। আবার টেকনিকাল এজুকেশন অর্থাৎ বিশিষ্ট ঐকদেশিক শিক্ষা ব্যক্তিগত শক্তির উন্মেষণের পক্ষে উপযোগী; এ সকল বাক্যও তাহাদের প্রতি প্রয়োগ করা নিষ্ফল। যাহাদের প্রবৃত্তি থাকিতে পারে, কিন্তু সেই প্রবৃত্তির পরিতৃপ্তির উপায় নাই; যাহাদের রুচি থাকিতে পারে, কিন্তু সেই রুচির পরিতৃপ্তির উপায় নাই; যাহাদের ব্যক্তিগত

ক্ষমতা থাকিতে পারে, কিন্তু সেই ক্ষমতার প্রয়োগের স্থান বা অবকাশ নাই; তাহাদের পক্ষে এই শিক্ষানীতির কথা তোলাও অনাবশ্যক। ঐ সকল লম্বা লম্বা কথা, ঐ সকল দীর্ঘ সমাস, ঐ সকল সুললিত বিশেষণঘটা, ঐ সকল পাণ্ডিত্য-পূর্ণ থিওরি ত্যাগ করিয়া আমাদের দুর্ব্বল হীন inorganic জীবনের উপযোগী শিক্ষানীতি অবলম্বন করিতে হইবে।

ফলেও দাঁড়াইয়াছে তাহাই। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় যে আইনের দ্বারা স্থাপিত হইয়াছে, সেই আইনের preamble মধ্যে আমাদের শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য কি, তাহা স্পষ্টাক্ষরে লেখা আছে। "It has been determined to establish a University at Calcutta for the purpose of ascertaining by examination the persons who have acquired proficiency in different branches of Literature, Science and Art and of rewarding them by academical degrees as evidence of their respective attainments." এই ইংরাজীর বাঙ্গালা অনুবাদ আবশ্যক নহে; কিন্তু ইহার মধ্যেও দুই চারিটা সুদীর্ঘ ও সুললিত বিশেষণ যখন রহিয়াছে, তখন ইহার তাৎপর্য্য বুঝিবার চেষ্টা আবশ্যক।

শিক্ষার উদ্দেশ্য যাহাই হউক, অন্যান্য দেশে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাকার্য্য ও পরীক্ষাকার্য্য উভয়ই স্বহস্তে গ্রহণ করেন। লণ্ডনে একটা আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় ছিল, সেই বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার ভার না লইয়া কেবল পরীক্ষার ভার লইতেন। সেই লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণে আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি স্থাপিত হইল। ছাত্রেরা যেখানে হউক, বনে জঙ্গলে হাটে মাঠে ঘাটে শিক্ষা পাইয়া আসিবে; বিশ্ববিদ্যালয় কেবল দেখিবেন, তাহাদের কোন্ শাস্ত্রে কিরূপ জ্ঞান জন্মিয়াছে। তাহাদিগকে এক একটা ছাপ দিয়া, এক একটা উপাধি দিয়া সংসারে ছাড়িয়া দিবেন; লোকে যেন বুঝিতে পারে, এই এই ব্যক্তির জ্ঞান জন্মিয়াছে, আর অন্য ব্যক্তির জ্ঞান জন্মায় নাই। শিক্ষাদান ও পরীক্ষাগ্রহণ, দুই কার্য্য সম্পূর্ণ বিভিন্ন; শিক্ষার উদ্দেশ্য অমানুষকে মানুষ করা; আর পরীক্ষার উদ্দেশ্য অমানুষ মানুষ হইয়াছে কি না দেখা, অমানুষের মধ্য হইতে মানুষ বাছিয়া লওয়া। বলা বাহুল্য, পৃথিবীতে এমন কোন উপায় এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই, যাহার সাহায্যে অমানুষ হইতে নিঃসন্দেহে মানুষ ছাঁকিয়া লওয়া যাইতে পারে। এই শ্রেণীর বিশ্ববিদ্যালয়কে একটা বৃহৎ ছাঁকনি বা চালুনি যন্ত্র মনে করিতে পারি। চালুনিতে হাজার কতক মানুষ অমানুষ ফেলিয়া

দেওয়া হয়; চালুনিতে নাড়া দিলে তাহার ছিদ্র দিয়া মানুষগুলা বাহির হইয়া আসে; অমানুষগুলা তফাত হইয়া যায়। বলা বাহুল্য, চালুনি যেমনই হউক, উহার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা যায় না। যখনই নাড়া দেওয়া যায়, তখনই মানুষের গা লাগিয়া কতকগুলি অমানুষও বাহির হইয়া আসে; আর অদৃষ্ট-দোষে অতি উৎকৃষ্ট মানুষও সময় সময় আটকাইয়া যায়। কাজেই একবার নাড়া দিলে চলে না, দুই তিন বার নাড়া দিয়া শস্য হইতে তুষকে পৃথক করিতে হয়। কিন্তু শস্যের শস্যত্ব-উৎপাদনের জন্য চালুনি যন্ত্র দায়ী নহে। সে কেবল আপনাকে নাড়া দিয়াই খালাস। শস্য যেখান হইতে আসুক, তাহাতে তাহার কিছুই আসে যায় না।

যে এজুকেশন ডেস্প্যাচের পরামর্শে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল, তাহাতে স্পষ্ট লেখা ছিল, the Universities were to be established *not so much to be in themselves places of instruction, as to test the values of the education obtained elsewhere*; অর্থাৎ কি না, শিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় একেবারে দায়ী থাকিবেন না; মূর্খে যেন ফাঁকি দিয়া পণ্ডিত নামে উতরাইয়া আসিতে না পারে, বিশ্ববিদ্যালয় তাহার জন্যই দায়ী। বিশ্ববিদ্যালয়ের মোহরের উপর Advancement of Learning যতই চক্‌চক্ করুক, বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে Advancement of Learning এর কোনই উপায় নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, হাটে মাঠে ঘাটে লোকে শিক্ষা পাইয়া আসিবে, বিশ্ববিদ্যালয় তাহাকে বাজাইয়া লইবেন মাত্র; যেন মেকি চালান না হয়। হাট মাঠ ঘাট হইতে যদি কেহ শিক্ষা পাইয়া বাদন সহ্য করিতে না আসে, বিশ্ববিদ্যালয়ের তাহাতে কিছু যায় আসে না। কেহ আসে, ভালই; তাহাকে বাজাইয়া লইব; কেহ না আসে, আরও ভাল, বাজানর পরিশ্রম রহিল না। তবে নিতান্তই হাট মাঠ ঘাট যে যেখান হইতে আসিবে, সকলকেই বাজাইতে হইলে পরিশ্রমের বড় আধিক্য হয়; তজ্জন্য নিয়ম হইল যে, সকল ঘাটের ও সকল হাটের পরীক্ষার্থীকে আমরা বাজাইব না; আমাদের জানা শুনা চিহ্নিত হাট মাঠ ঘাট হইতে যাহারা আসিবে, তাহা-দিগকেই খুব জোরে বাজাইব। উহার উদ্দেশ্য কেবল পরিশ্রম বাঁচান।

ফলে দাঁড়াইল এই, এ দেশে কয়েকটি ছাঁকনি যন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করা হইল, তাহাদের খুব জাঁকাল নাম দেওয়া হইল, বিশ্ববিদ্যালয়; কিন্তু কার্য্যতঃ হইল বিশ্বপরীক্ষালয়। সে হেতু কোন যন্ত্র হইতে এক ক্রান্তি বিদ্যার উদ্গমের

কোন ব্যবস্থা থাকিল না। লোকে অন্য স্থান হইতে বিদ্যা পাইয়া আসিবে, চালুনিতে নাড়া দিয়া দেখা যাইবে, কাহার বিদ্যা কত মোটা। ও যাহাদের বিদ্যা বেশ মোটা সোটা, তাহাদিগকে তপ্ত মুদ্রায় চিহ্নিত করিয়া সংসারে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে ও বলা হইবে, যাও বৎস, এই বিশাল সংসারক্ষেত্রে তৃণ শষ্পের অভাব নাই, চিহ্নিত পুচ্ছ লইয়া সুখে চরিয়া খাও ; "and ever in your life and conversation show yourself worthy of the same." এইখানে বলা আবশ্যক যে, যে সকল পরীক্ষার্থী এই চিহ্ন লইবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারদেশে উপস্থিত হইতেন ও হইয়া থাকেন, এই চরিয়া খাইবার অধিকারপ্রাপ্তি ভিন্ন তাঁহাদের মনের মধ্যে অন্য কোন উচ্চ আকাঙ্ক্ষার লেশমাত্র ছিল না ও নাই। আমাদের দেশে যখন ইংরাজি শিক্ষার বিস্তার হয় নাই, তখনও এক প্রকার দেশী বিদ্যা প্রচলিত ছিল, এবং ভট্টাচার্য্যের টোলে ঐ বিদ্যা প্রদত্ত হইত ; সে বিদ্যার অন্য কোন মূল্য থাক আর নাই থাক, উহার সহিত রজতকাঞ্চনের বড় একটা সম্পর্ক ছিল না। যে মূঢ়েরা সেই বিদ্যা-উপার্জ্জনে জীবন অতিবাহিত করিত, তাহাদিগকে ঘরের কড়ি খরচ করিতে হইত না, এবং যাহারা বিদ্যা উপার্জ্জন করিত, তাহারাও বিদ্যার বিনিময়ে পরের কড়ি আদায় করিবার সুবিধা পাইত না। কিন্তু ইংরাজি বিদ্যা দেশে প্রচলিত হইবামাত্র লোকে দেখিতে পাইল যে, ইংরাজেরা সমুদ্রপার হইতে নানাবিধ অদ্ভুত সামগ্রী আনিয়াছেন, তার মধ্যে এও একটা অত্যন্ত অপরূপ সামগ্রী। অতি সহজে এ একটা পেট ভরিবার উপায়। এই বিদ্যার উপার্জ্জনে প্রথমতঃ কিঞ্চিৎ কড়ি খরচ করিতে হয় বটে ; কিন্তু তার পর ইহা বেচিয়া, বা ইহার বিনিময়ে, বা ইহার নামে, যথেষ্ট কড়ি ঘরে আইসে। অর্থোপার্জ্জনের যত পন্থা দেশের মধ্যে প্রচলিত ছিল, তন্মধ্যে এইটাই সব চেয়ে সহজ পন্থা হইল। ইহাতে অধিক মূলধনের দরকার হয় না, ইহাতে অধিক ব্যবসায়বুদ্ধি আবশ্যক হয় না, এবং সব চেয়ে সুবিধা—ইহাতে দেউলিয়া হইবার কোন আশঙ্কা থাকে না। কাজেই এই নিরন্ন দেশের ক্ষুধাতুর লোকেরা দলে দলে এই বিলাতী বিদ্যা অর্জ্জন করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ লইবার জন্য ঝুঁকিতে লাগিল ; এবং দলে দলে বিশ্ববিদ্যালয়ের চালুনির ভিতর প্রবেশ করিয়া মুহুর্মুহুঃ চালুনির ঝাঁকড় সহ্য করিতে লাগিল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক কনভোকেশনে ভাইস চ্যান্সেলার বিদ্যার মহিমা ও শিক্ষার গরিমা সম্বন্ধে যতই তত্ত্বকথা উপদেশ দিন না কেন, এ দেশের শিক্ষার্থীর

মধ্যে পৌনে ষোল আনার পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারস্থ হইবার একমাত্র উদ্দেশ্য কোন রূপে জীবিকার সংস্থান। ইহা অত্যন্ত সত্য কথা, ইহা লুকাইবার কোন প্রয়োজন নাই। আমাদের দেশের বিদ্যার্থীরা সাহিত্য চাহে না, দর্শন চাহে না, তাহারা চাহে কেবল উদরান্ন। পৃথিবী গোলই হউক, আর ত্রিকোণই হউক, পৃথিবী স্থিরই থাকুক, আর বন্ বন্ করিয়াই ঘুরুক, চন্দ্র মৃৎপিণ্ড হউন বা সুধাভাণ্ড হউন, ম্যাকবেথের রচনাকর্ত্তা সেকস্‌পীয়র হউন আর নেপেলিয়ন বোনাপার্টি হউন, পলাশী যুদ্ধের বিজেতা ক্লাইবই হউন, আর চৈতন্য লাইব্রেরীর সম্পাদকই হউন, তাহাদের তাহাতে কিছুই যায় আসে না; তাহাদিগকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপের প্রত্যাশায় দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, যাহাই গলাধঃকরণ করিতে বলিবে, তাহারা তাহাই করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত আছে। এবং তাহারা যেরূপ সম্পূর্ণ নিষ্কামভাবে পূর্ণ বৈরাগ্যের সহিত দর্শন বিজ্ঞান সাহিত্যের বিবিধ মিষ্টান্ন, তিক্তান্ন, পলান্ন, খেচরান্ন উদরস্থ করে, তাহাতে তাহাদের অধ্যবসায়ের, তাহাদের সহিষ্ণুতার, তাহাদের অনাসক্তির, তাহাদের বৈরাগ্যের, তাহাদের বীরত্বের প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। এবং আমরা তাহাদিগকে কিছুতেই দোষ দিতে পারি না। এই নিরন্ন দেশের দরিদ্র শিক্ষার্থী দর্শন বিজ্ঞানের মাহাত্ম্য বুঝে না, কাব্যসাহিত্যের রসাস্বাদন করিতে জানে না, "বিদ্যার জন্য বিদ্যার গৌরব" করিতে জানে না, ইত্যাদি দীর্ঘচ্ছন্দ কথা বলিয়া যাঁহারা বিদ্রূপ করেন ও টিটকারি দেন, তাঁহারা নিতান্তই হৃদয়হীন। তাহারা যে উচ্চতর উদ্দেশ্য লইয়া বিদ্যামন্দিরে প্রবেশ করে না, তজ্জন্য তাহাদিগকে উপহাস করা নিতান্ত অমানুষের কাজ। এবং যখন দেখিতে পাই যে, আমাদের অধিকাংশ দরিদ্র শিক্ষার্থী পরের নিকট ধার-করা জীর্ণ গাউনে কথঞ্চিৎ শরীর আবৃত রাখিয়া ভাইস চ্যান্সেলারের হস্ত হইতে কম্পিতহস্তে সাধের ডিপ্লোমাখানি গ্রহণ করিয়া মুহূর্ত্তের জন্য উৎফুল্ল হয়, কিন্তু তাহার পর সেনেটহাউসের সোপানাবলী অতিক্রম করিয়াই আপনাদের ভবিষ্যৎ জীবন আঁধার দেখে; যখন দেখিতে পায়, তাহাদের বৃদ্ধ পিতা মাতা, তাহাদের বিধবা পিসী মাসী, তাহাদের ক্ষুধার্ত্ত ভাই ভগিনী, বড় আগ্রহের সহিত বহুবৎসর ধরিয়া তাহাদের মুখ চাহিয়া বসিয়া আছে, কিন্তু সেই আশা-পূরণের বিশেষ কোন ভরসা নাই; যখন দেখিতে পাই, শতের মধ্যে পাঁচ জন মাত্র সংসারে প্রবেশ করিয়া কিঞ্চিৎ সফলতা উপার্জ্জন করে, কিন্তু বাকী পঁচানব্বই জনকে অধম কেরাণীজীবন অথবা তদপেক্ষা হীনতর অন্য কোন

বৃত্তি আশ্রয় করিয়া প্রত্যহ শত অপমান নীরবে সহ্য করিতে হয়, অপমানের অশ্রুধারা তাহাদের গণ্ডদেশ দিয়া বিগলিত হইতে পারে না, কিন্তু লোক-লোচনের অন্তরালে তাহাদের অভ্যন্তরে ক্ষরিত হইয়া তাহাদের হৃদয়কে ক্লিষ্ট করে, তাহাদের প্রাণকে জীর্ণ করে, তাহাদের অন্তরিন্দ্রিয়কে অবসন্ন করে; এবং সে এই অপমান নীরবে সহ্য করে, কেবল নিজের জন্য নহে, পরের জন্য, পিতা মাতার জন্য, স্ত্রী পুত্রের জন্য, ভাই ভগিনীর জন্য, নিরাশ্রয় মাসী পিসীর জন্য, তখন বলিতে ইচ্ছা হয়, ধর্ম্মপালনে যদি জ্ঞানার্জ্জনের অপেক্ষা গৌরব থাকে, এবং গার্হস্থ্য ধর্ম্ম যদি মানব ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা হয়, তবে হে বিধাতঃ, হে দেবদেব, এই দরিদ্র জীবগণকে তুমি দয়া করিও।

গার্হস্থ্য ধর্ম্মপালন যে কেবল আমাদের দেশেই আছে, এমন নহে, এবং অন্নাভাব যে কেবল ভারতবর্ষীয় জনগণেরই একচেটিয়া সম্পত্তি, তাহা নহে। অন্য দেশেও জীবনসংগ্রাম অধিকাংশ নরনারীর পক্ষে অতি তুমুল ব্যাপার; এবং সেই জীবনসংগ্রাম হইতে সর্ব্বদেশে রাজনীতি, সমাজনীতি, শিক্ষানীতি, ধর্ম্মনীতি প্রভৃতি সকলেরই উৎপত্তি। দর্শন, বিজ্ঞান, কাব্য, সাহিত্য অতি উৎকৃষ্ট বস্তু; উহারা মনুষ্যকে উন্নত করে, উচ্চ পর্য্যায়ে অধিরূঢ় করে, মনুষ্যত্বের বৃদ্ধি ও স্ফূর্ত্তি ও বিকাশ সাধন করে। কিন্তু জগতে মনুষ্যসংখ্যার তুলনায় অন্নের সমষ্টি যখন নিতান্ত অধিক নহে, এবং সেই অন্নের জন্য সংগ্রামেই জীবজগতের প্রতিষ্ঠা, তখন সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে মনুষ্যসমাজের অধিকাংশ যে অন্নার্জ্জনের জন্য অবকাশহীন হইয়া নিযুক্ত থাকিবে, তাহা বিচিত্র কি? এ বিষয়ে পাশ্চাত্যে ও ভারতবর্ষীয়ে কোন প্রভেদ নাই। কিন্তু এক বিষয়ে প্রভেদ আছে। পাশ্চাত্য সভ্যদেশে মনুষ্যের অন্নার্জ্জনের জন্য সহস্র পন্থা বিদ্যমান আছে। যে সকল দেশ ভাগ্যবলে ও ঐতিহাসিক নিয়মবলে আজকাল উন্নতির পদবীতে দণ্ডায়মান আছে, তাহাতে অন্নার্থীর অন্নাগমের জন্য সহস্র পন্থা মুক্ত রহিয়াছে। সমগ্র রাষ্ট্রশক্তি দেশের শিল্প বাণিজ্যের বিস্তারের জন্য ভীষণ উন্মুক্ত কৃপাণহস্তে দণ্ডায়মান আছে। দেশের মধ্যে সহস্র কল কারখানা, সহস্র টেকনিকাল স্কুল, দেশের লোককে অন্নার্জ্জনের উপায় দেখাইবার জন্য প্রস্তুত আছে। এমন কি, পাশ্চাত্য দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রচার, সত্যের আবিষ্কার প্রভৃতি অতি উন্নত ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া যে স্পর্দ্ধা করেন, সেই জ্ঞানবিস্তারের মূলে, সেই সত্যাবিষ্কারের মূলেও যে মানবের অন্নার্জ্জনস্পৃহা, মনুষ্যজীবের চিরন্তন বুভুক্ষা বর্ত্তমান নাই, এমন নহে।

সংক্ষেপে বলিতে গেলে ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়ে যাহারা প্রবেশ করেন, তাঁহারা সকলেই যে পাণ্ডিত্যপ্রয়াসী, সকলেই যে সত্যান্বেষী, সকলেই যে বিদ্যার উপাসক, অন্নার্জ্জন তাঁহাদের উদ্দেশ্য নহে, তাহা বলিতে পারা যায় না। বিদ্যার সহিত অন্নের সম্বন্ধ থাকা বড়ই পরিতাপের বিষয়, সন্দেহ নাই; এবং বিদ্যার সহিত অন্নের সম্পর্কের অভাব যদি কোন দেশে বর্ত্তমান ছিল বা থাকে, তাহা এই আমাদের অন্নহীন ভারতবর্ষেই ছিল, এবং এখনও বোধ করি ব্রাহ্মণের চতুষ্পাঠীর ভগ্ন প্রাচীরের মধ্যেই বর্ত্তমান আছে। কিন্তু পাশ্চাত্য দেশে তাহা নাই। তবে সে দেশে যে কেবল অন্নার্থিমাত্র, তাহার জন্য অন্য উপায় নির্দ্দিষ্ট আছে; বিশ্ববিদ্যালয় তাহার একমাত্র দ্বার নহে। আমাদের দেশের অবস্থা অন্যরূপ। আমাদের দেশে রাষ্ট্রীয় শক্তি ভিতরে শান্তি রক্ষা করেন, বিচার দান করেন, দেশকে পরের আক্রমণ হইতে রক্ষা করেন, এবং টেলিগ্রাফ ও রেলপথ খুলিয়া বৈদেশিক সামগ্রীর শুভাগমনের ও দেশীয় সামগ্রীর অন্তর্দ্ধানের উৎকৃষ্ট উপায় বিধান করেন। কিন্তু তদ্ভিন্ন দেশের লোককে অন্নার্জ্জনে সাহায্য করা আমাদের রাষ্ট্রীয় শক্তির কর্ত্তব্যমধ্যে গণিত হয় না। এ দেশে কল নাই, কারখানা নাই, টেকনিকাল স্কুল নাই, শিল্প নাই, বা যাহা ছিল, তাহাও যাইতে বসিয়াছে; বাণিজ্য নাই, কেন না, দেশীয় বণিকের পণ্যদ্রব্যবাহী পোতকে বিদেশে প্রেরণের জন্য যে সঙ্গীন বন্দুক কামানের প্রয়োজন, সেই সঙ্গীন বন্দুক কামান সরবরাহ করিতে কেহ প্রস্তুত নহে; সকলের উপর সভ্যতার ধ্বজা স্কন্ধে লইয়া পরের ভূমি লুণ্ঠন করিবার ও পরের দ্রব্য আত্মসাৎ করিবার কোন উপায়ই বর্ত্তমান নাই। এ দেশের ভূমিতে কেবল শস্য জন্মে, দেশের প্রায় সমস্ত লোকে সেই শস্য-উৎপাদনে নিযুক্ত থাকে, এবং যে বৎসর শস্য জন্মে, সে বৎসর খাইতে পায়, যে বৎসর জন্মে না, সে বৎসর মরিবার অধিকার কেহ কাড়িয়া লয় না; আমাদের রাষ্ট্রশক্তি সেই শস্যসম্পত্তির রাজভাগ গ্রহণ করেন, তাহাতে প্রজার জীবনোপায় সম্যক্ বর্ত্তমান থাকে কি না, তাহা যে মাননীয় মহোদয় * অদ্য সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া আমাকে ও আপনাদিগকে সম্মানিত করিয়াছেন, তাঁহার নিকট তাহার সদুত্তর পাইবেন, আমার কোন কথা বলিবার প্রয়োজন নাই। এ দেশের লোক যখন আবিষ্কার করিল যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ পাইলে অন্নার্জ্জনের কিছু সুবিধা হইতে পারে, তখন যে

---

* শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত সি, আই, ই,।

তাহারা সেই সুবিধার আশ্রয় গ্রহণ করিবে, তাহাতে তাহাদের দোষ দেওয়া যায় না। যে সময়ে এ দেশে ইংরাজি বিদ্যার প্রবর্ত্তন হইয়াছিল, সেই সময়ে ইংরাজের রাজকার্য্য সুচারুভাবে পরিচালনের জন্য কুলি মজুর চাপরাসী হইতে মুন্সেফ ডেপুটি পর্য্যন্ত আবশ্যক হইয়াছিল; তাঁহারাও বিশ্ববিদ্যালয়ের চিহ্নিত ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে অনুগ্রহ করিয়া কুলি মজুর মুন্সেফ ডেপুটি প্রভৃতি অসঙ্কোচে গ্রহণ করিতে লাগিলেন। দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় 'ইণ্ডিল মিণ্ডিলে' কিঞ্চিৎ অধিকার না থাকিলে ঐ সকল কার্য্য সম্পাদন করিবার উপায় নাই, এবং গবর্মেণ্ট যখন চিহ্নিতগণের জীবিকার সংস্থান করিতে লাগিলেন, তখন দেশের লোকেও যে অত্যন্ত আগ্রহের সহিত 'ইণ্ডিল মিণ্ডিলে' অধিকারী হইতে লাগিল, তাহা বিচিত্র কি?

ফলে অন্য দেশে শিক্ষানীতি যাহাই হউক, আমাদের দেশে সে সকলের প্রয়োগের একান্ত অভাব। অন্য দেশে বিশ্ববিদ্যালয় জ্ঞানচর্চ্চা করেন, সত্যাবিষ্কার করেন, মনুষ্যের ব্যক্তিগত ক্ষমতাবিকাশের চেষ্টা করিয়া তাহাকে রাষ্ট্রের কর্ম্মঠ ভৃত্যে পরিণত করেন, মনুষ্যের সমগ্র চিত্তবৃত্তির সর্ব্বাঙ্গীণ স্ফূর্ত্তি সাধন করেন। তাঁহারা যথার্থতই শিক্ষা দেন, এবং এত যত্নেও যদি কেহ শিক্ষা না পায়, তাহাকে শিক্ষিতের চিহ্ন না দিয়া জীবিকার জন্য অন্য পন্থা আশ্রয় করিতে বলেন। আমাদের দেশে শিক্ষার সে সকল উদ্দেশ্য নাই। এ দেশের শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য ঐরূপ বুঝিলে শিক্ষানীতিকে উপহাস করা হয়, এবং স্বয়ং প্রতারিত হইতে হয়। এ দেশের বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাই দেন না; তাঁহারা কেবল পরীক্ষা করেন। যাঁহারা অন্যত্র শিক্ষা পাইয়া পরীক্ষার জন্য আবেদন করেন, তাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য জীবিকার্জ্জন, চিত্তবৃত্তির স্ফূর্ত্তিলাভও নহে, মনুষ্যত্বের বৃদ্ধিও নহে, পাণ্ডিত্যের অর্জ্জনও নহে। তবে মনুষ্য কোন দেশেই নির্জ্জীব পদার্থ নহে; দুই এক জন মনুষ্য লক্ষ্যভ্রষ্ট ও উদ্দেশ্যভ্রষ্ট হইয়া সহসা পাণ্ডিত্য উপার্জ্জন করিয়া ফেলে, জীবিকার্জ্জনের জন্য তেমন লালায়িত হয় না; সে তাহার দোষ নহে, তাহার মনুষ্যত্বের দোষ। এ দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ও শিক্ষার্থীদিগের সাহিত্য বিজ্ঞান দর্শনাদিতে পরীক্ষা গ্রহণ করেন সত্য বটে, এবং কেহ কেহ অকস্মাৎ সাহিত্য দর্শন বিজ্ঞানে পরিপক্বও হইয়া উঠে, সত্য কথা; কিন্তু এ দেশের অধিকাংশ শিক্ষার্থীর সে উদ্দেশ্য নহে। অপিচ বিশ্ববিদ্যালয় যে উপায়ে পাণ্ডিত্যপরীক্ষা করেন, সে উপায়ও পাণ্ডিত্যপরীক্ষার প্রকৃষ্ট উপায় নহে। এ দেশের সকল শিক্ষার্থীরই যে

এই হীন উদ্দেশ্য, তাহা আমি বলিতে চাহি না; অন্যান্য সভ্যতর দেশেও অধিকাংশ শিক্ষার্থীর উদ্দেশ্য ইহা অপেক্ষা উচ্চ নহে। কিন্তু সে দেশে সকলে বিশ্ববিদ্যালয়ে যায় না; তাহাদের জীবিকার্জ্জনে শক্তি প্রদানের জন্য অন্য সহস্র শিক্ষাগার বর্ত্তমান আছে। আমাদের এক বিশ্ববিদ্যালয়মাত্র অগতির গতি, একমাত্র উপায়। সত্য বটে, আজকাল গবর্মেণ্ট দেশের লোকের জন্য কৃষি-বিদ্যালয়, চিকিৎসা-বিদ্যালয়, পশু-চিকিৎসা-বিদ্যালয়, গুটিপোকা-বিদ্যালয় প্রভৃতি নানা বিদ্যার আলয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বাহিরে স্থাপন করিতেছেন, কিন্তু তাহা দেশের কোটি সংখ্যায় গণিত লোকের পক্ষে ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নহে। এ দেশে জীবনোপায়ের একমাত্র দ্বার বিশ্ববিদ্যালয়, এবং জীবিকার্জ্জনই শিক্ষানীতির একমাত্র লক্ষ্য।

এ দেশে বিশ্ববিদ্যালয় বিদ্যা দেন না, বিদ্যার পরীক্ষা করেন, অন্য স্থান হইতে বিদ্যা লইয়া আসিতে হয়। এবং এই বিদ্যা লইবার জন্য অনেকগুলি স্থান দেশের মধ্যে ছড়াইয়া আছে। এই সকল স্থানই প্রকৃতপক্ষে এ দেশের বিদ্যালয়; বিশ্ববিদ্যালয়কে বিদ্যালয় না বলিয়া পরীক্ষালয় বলাই উচিত। বিদ্যা দিবার জন্য যে সকল আলয় আছে, তাহার কতক সরকারী, কতক বেসরকারী। বিদ্যার্থীরা সেখানে পয়সা দিয়া বিদ্যা খরিদ করে। বিদ্যার মূল্য সরকারী আলয়ে বেশী, বেসরকারী আলয়ে কম। কোথাকার বিদ্যা ভাল, কোথাকার বিদ্যা মন্দ, তাহা নির্ব্বাচনের ভার শিক্ষার্থীর উপর। বিদ্যার্থীরা আপনাপন অবস্থা বুঝিয়া মোটের উপর যেখানে সস্তা পায়, সেইখানেই বিদ্যা খরিদ করে। বেসরকারী আলয়গুলির চেয়ে সরকারী আলয়গুলির চাকচিক্য অনেক বেশী; আর establishment খরচার তারতম্যে একই মাল বিভিন্ন দোকানে বিভিন্ন মূল্যে পাওয়া যায়। আর দেশী দোকানে শাদা রঙের আকর্ষণ নাই; এই কাল দেশে শাদার অস্তিত্ব অন্ততঃ æsthetic culture এর জন্যও আবশ্যক।

আমাদের গবর্মেণ্ট এ দেশের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের, নিম্ন শিক্ষা ও উচ্চ শিক্ষা, উভয় শিক্ষার বিস্তারের দায়িত্ব স্বয়ং ইচ্ছাপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছেন। বেণ্টিক ও মেকলের সময় হইতে গবর্মেণ্ট এ দেশের লোককে উচ্চ শিক্ষা দিবার ভার হাঁকিয়া ডাকিয়া, দেশীয় প্রচলিত শিক্ষা-প্রণালীকে গালিগালাজ করিয়া, স্বয়ং স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন। তাহার পরবর্ত্তী কালেও গবর্মেণ্ট কখনও আপনাকে এ দায় হইতে সম্পূর্ণ মুক্তি দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন নাই।

সম্পূর্ণ মুক্তি বলিলাম, কেন না, ইদানীং ইংরাজ গবর্মেণ্টের উচ্চ-শিক্ষা-বিষয়িণী নীতি একটু অন্যরূপ মূর্ত্তি ধারণ করিতেছিল; রাজপুরুষগণের কণ্ঠ হইতে উচ্চ-শিক্ষার কথাগুলা বাহির হইবার সময়, এক আধটুকু আটকাইয়া যাইতেছিল। ইদানীং রাজপুরুষেরা বলিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, গবর্মেণ্ট নিম্ন শিক্ষা-বিস্তারের জন্যই মুখ্যতঃ দায়ী, উচ্চশিক্ষার জন্য তেমন দায়ী নহেন। এই কথা বলিবার সময় একটা থিওরির আশ্রয় লওয়া হইত। কিছু দিন পূর্ব্বে বিলাতে পণ্ডিতদের মধ্যে একটা থিওরি উঠিয়াছিল, গবর্মেণ্ট প্রজার কাজে যত হাত না দেন, ততই ভাল। গবর্মেণ্টের প্রধান কার্য্য, বোধ হয়, একমাত্র কার্য্য, শান্তিরক্ষা। তদ্ভিন্ন প্রজার কিসে ভাল হইবে না হইবে, সে বিষয়ে রাজার হস্তক্ষেপ না করাই ভাল। প্রজা স্বাধীনভাবে আপনার কাজ আপনি করিবে। রাজা স্বয়ং প্রজার ভাল করিতে গেলে উদ্দেশ্য ভাল থাকিলেও ফল প্রায় উল্টা হইয়া পড়ে। এই নীতির নাম laissez faire নীতি। যেমন অন্য বিষয়ে, তেমনই শিক্ষা বিষয়েও; প্রজা আপনার উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা আপনি করিবে; রাজার তাহাতে হস্তক্ষেপের প্রয়োজন নাই। এতদ্ভিন্ন আরও একটা কথা ছিল। গবর্মেণ্টের টাকা প্রজাসাধারণের টাকা; উহা সাধারণের শিক্ষার জন্য, mass education এর জন্য, খরচ করিতে পারা যায়। উচ্চশিক্ষা সাধারণের জন্য নহে, অল্প লোকের জন্য, উচ্চতর শ্রেণীর জন্য; সাধারণের অর্থ শ্রেণীবিশেষের মঙ্গলের জন্য ব্যয় করিলে অবিচার হয়, অন্যায় হয়।

এই সকল কারণ দেখাইয়া কিছু দিন পূর্ব্বে আমাদের রাজপুরুষগণ উচ্চ-শিক্ষা হইতে ক্রমশঃ হাত গুটাইবার সংকল্প করিতেছিলেন। যত দিন দেশের লোকে উচ্চশিক্ষার মূল্য বুঝিত না, তত দিন রাজা তাহাদিগকে পথ দেখাইয়াছেন; এখন দেশের লোকে উচ্চশিক্ষার মূল্য বুঝিয়াছে, তাহারা উচ্চশিক্ষার উপায়বিধান নিজেই করিয়া লউক। গবর্মেণ্ট বড় বড় কলেজগুলি ক্রমশঃ উঠাইয়া দিয়া কেবল উচ্চ আদর্শ বজায় রাখিবার জন্য দুই একটা বড় কালেজ রাখিয়া নিম্নশিক্ষার প্রচারে প্রবৃত্ত হউন।

কিন্তু থিওরিগুলার পরমায়ু অনেক সময় কম হয়। পাশ্চাত্য দেশে উচ্চ-শিক্ষার জন্য গবর্মেণ্ট অজস্র অর্থ ব্যয় করিতে লাগিলেন; এক একটা বিশ্ববিদ্যা-লয় এক একটা রাজার হালে বাড়িতে লাগিল; এবং এই বিশ্ববিদ্যালয়প্রদত্ত উচ্চশিক্ষার ফলে দেশের উন্নতি বিষয়ে কোন থিয়োরিষ্ট সন্দেহ করিতে সাহস

পাইলেন না। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে রাজব্যয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষণ হইতে লাগিল। সহসা জাপানের অভ্যুদয় হইল। জাপানের অভ্যুদয়ে অনেক ঐতিহাসিক থিওরি বিপর্য্যস্ত হইয়া গেল। রাজা অকাতরে অর্থব্যয় করিয়া প্রজাকে উচ্চশিক্ষা দিতে লাগিলেন; প্রজার মুখ চাহিয়া বসিয়া থাকিলেন না; দেখিতে দেখিতে দেশের অবস্থা ফিরিয়া গেল। "অসভ্য জাপান" ইউরোপের সভ্যজাতির প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া পড়িল। পৃথিবীর লোক স্তব্ধ হইল।

পৃথিবীর বর্ত্তমান অবস্থায় আর সেই পুরাতন থিওরির দোহাই দেওয়া চলে না। ষ্টেটের চেষ্টায় জাতীয় উন্নতি ঘটে না, এ কথা বলিবার আর উপায় নাই। উচ্চশিক্ষাদান ষ্টেটের কর্ত্তব্য নহে, তাহা আর বলা চলে না। আমাদের গবর্মেণ্টও সে কথা পূরা সাহসে কখনও বলিতে পারেন নাই। বরং লর্ড কর্জ্জন ভারতবর্ষে আসিয়াই অন্যরূপ কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। লর্ড কর্জ্জন স্বয়ং University man বলিয়া গর্ব্ব অনুভব করেন। লর্ড কর্জ্জনের আগমনে শিক্ষানীতি কাজেই একটু অন্য মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছিল। যখন আমাদের পরলোকগতা ভারতেশ্বরীর স্মরণচিহ্ন স্থাপনের উদ্যোগ হয়, তখন কেহ কেহ ইচ্ছা করিয়াছিলেন, সংগৃহীত অর্থ উচ্চশিক্ষার জন্য ব্যয়িত হউক; ভারতেশ্বরীর নামে ভারত সাম্রাজ্যের উপযুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, স্থাপিত হউক। তাহার উত্তরে শুনা যায়, ভারত গবর্মেণ্ট প্রজাগণকে উচ্চশিক্ষা দিবার দায় হইতে মুক্তিলাভের ইচ্ছা করেন না; উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে কর্ত্তব্য গবর্মেণ্ট স্বয়ং সম্পাদন করিবেন। সংগৃহীত অর্থে অন্যরূপ স্মরণচিহ্ন স্থাপিত হউক। তার পর যখন লর্ড কর্জ্জন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর স্বরূপ সকলকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, My one ambition is to make this University worthy of India—to set before it a high ideal and to render it capable of following the footsteps of its European prototypes. Indeed I should like to open up before it, vistas of future expansion and influence such as have not yet dawned upon its vision; তখন আর কাহারও মনে কোন সন্দেহের অবসর থাকিল না। লর্ড কর্জ্জনের আশ্বাসবাণী আমাদের হৃদয় আর্দ্র করিয়া তুলিল; আমরা মনে করিলাম, এইবার বুঝি আমাদের অদৃষ্ট ফিরিল, আমরা এত দিন পরে বুঝি পাশ্চাত্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মত বিশ্ববিদ্যালয় দেশের মধ্যে স্থাপিত দেখিব। আশা করিলাম, দেশের মধ্যে স্থানে স্থানে

Teaching University প্রতিষ্ঠিত হইবে। সেখানে বড় বড় মনস্বী অধ্যাপক আসিয়া জ্ঞান দান করিবেন, জ্ঞানের প্রচার করিবেন, জ্ঞান অর্জ্জন করিবেন, এবং ভারতবাসীকে জ্ঞানার্জ্জনের পন্থা দেখাইবেন। শিক্ষাবিভাগের বর্ত্তমান কর্ম্মচারিগণের অন্ততঃ কিয়দংশ বুয়র যুদ্ধের সেনাপতিত্বগ্রহণে প্রেরিত হইবেন, এবং তাঁহাদের স্থানে, যাঁহারা পাশ্চাত্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের গৌরব, যাঁহারা জ্ঞান-বৃক্ষের তলে বসিয়া তাহার ছায়া উপভোগ করিয়াছেন, তাহার ফল আস্বাদ করিয়াছেন ও তাহার আহরণের উপায় জানিয়াছেন, এবং অপরকে সেই ফলের আস্বাদনে অধিকারী করিবার জন্য আগ্রহান্বিত আছেন, সেইরূপ ধীমান প্রতিভাবান জ্ঞানান্বেষী মনস্বিগণ নূতন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত হইবেন। অধ্যাপকের সহিত ছাত্রের যথোচিত গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ স্থাপিত হইবে। অধ্যাপক আপনার চরিত্র ও আপনার পাণ্ডিত্য ও আপনার সহৃদয় ব্যবহার দ্বারা ছাত্রগণের প্রীতি ভক্তি আকর্ষণের চেষ্টা করিবেন। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি যথোপযুক্ত লাইব্রেরি, লাবরেটরি, মিউজিয়াম, উদ্যান, ক্রীড়াক্ষেত্র প্রভৃতিতে সুশোভিত হইয়া দিগ্‌দেশ হইতে শিক্ষার্থীদিগকে আকর্ষণ করিবে, এবং পুনরায় আমরা নগরে নগরে নালন্দা ও বিক্রম-শিলার পুনরভ্যুদয় দেখিয়া জাতীয় জীবনে পুনরভ্যুদয়ের আশায় উৎফুল্ল হইব।

এত দিন পর্য্যন্ত আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় বিদ্যার উন্নতির যে চেষ্টা করিয়া-ছিলেন, অনেকে বলেন, তাহাতে দেশে বিদ্যার তেমন উন্নতি ঘটে নাই। ঘটে নাই, তাহাতে বিস্ময়ের কথা কিছুই ছিল না। ঘটিলেই বরং বিস্ময়ের কারণ জন্মিত। ঘোড়ার ডিমে শত বৎসর ধরিয়া তা দিলেও পংক্ষিরাজ বাহির হয় না। লর্ড কর্জ্জনের আশ্বাসবাণীর পরে আশা হইয়াছিল, এবার বুঝি বাস্তবিকই শিক্ষারথ টানিবার জন্য উচ্চৈঃশ্রবার আমদানি করা হইবে। তার পর লর্ড কর্জ্জন বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন নিযুক্ত করিলেন। কমিশন পবন-গতিতে অঙ্গ বঙ্গ দ্রাবিড় কেরল কাশী কোশল পরিক্রমণ করিয়া ফিরিলেন। কিন্তু হায়! এখন লোকে বলিতেছে, রাবণবংশের ধ্বংশ হইল কিন্তু সীতা-উদ্ধারের কোন ব্যবস্থা হইল না।

আমাদেরই দুরদৃষ্ট, সন্দেহ নাই; কেন না, কমিশনের মধ্যে যে সকল মনস্বী ব্যক্তি বিদ্যমান ছিলেন, তাঁহারা সকলেই মাননীয় শ্রদ্ধাভাজন মহাশয় ব্যক্তি; এমন কি, ভারতবর্ষের বিশাল মুসলমানসমুদ্র মন্থন দ্বারা আবিষ্কৃত

কৌস্তুভটিকেও আমরা যথোচিত শ্রদ্ধা করিতে বাধ্য। ইঁহাদের মত লোকের চেষ্টায় যদি আমাদের আশা পূর্ণ না হয়, সে আমাদের অদৃষ্টেরই দোষ। অভাগা যদ্যপি চায়, সাগর শুকায়ে যায়; আমরা অভাগা, আমাদের অদৃষ্টগুণে মহাসাগরের জলটুকু সমস্ত শুকাইয়া গিয়া কেবল নুনটুকুমাত্র তৃষ্ণানিবারণের জন্য অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাতে বিস্ময়ের কারণ কিছুই নাই। এখন ইউনিভার্সিটী কমিশনের উপদেশমধ্যে দুই চারিটির সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাউক।

ইউনিভার্সিটী কমিশন একবারে গোড়ায় হাত দিয়া সেনেটসভার সংস্করণে উপদেশ দিয়াছেন; বর্ত্তমানে সেনেটের যে সকল সভ্য আছেন, তাঁহাদের অনেকেই কেবল সেনেটের অলঙ্কারমাত্র; কমিশন বলিতেছেন, তাঁহারা অলঙ্কারস্বরূপ বিশ্ববিদ্যালয়ের শোভাবর্দ্ধন করুন; শিক্ষানীতিতে তাঁহাদের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন নাই। বর্ত্তমান সদস্যগণের মধ্যে এক শত জনকে লইয়া নূতন সেনেট গঠিত হউক; অন্যান্য সদস্যেরা কনভোকেশনের দিন academic costume পরিয়া সভার শোভাবর্দ্ধন করুন। দুষ্ট লোকে বলিতেছে, সভার শোভাবর্দ্ধনের জন্য সেই সকল সদস্যগণকে টানিয়া আনার প্রয়োজন কি? প্রস্তর হাউসের অধিবাসীদিগকে ধরিয়া আনিয়া চেয়ারের উপর বসাইয়া দিলে বোধ করি সভার শোভা আরও উজ্জ্বল হইত; এবং তাঁহাদের অঙ্গসৌষ্ঠব-বর্দ্ধনের জন্য রঙ্গিল গাউনেরও দরকার হইত না। এক শত জন সদস্য লইয়া যে নূতন সেনেট-সভা গঠিত হইবে, তাহার হস্ত হইতে প্রায় সমস্ত প্রধান ক্ষমতা গ্রহণ করিয়া নূতন সিণ্ডিকেটে অর্পণ করিবার জন্য কমিশন উপদেশ দিয়াছেন। নূতন সিণ্ডিকেটের গঠনপ্রণালী যেরূপ হইবে, ও সিণ্ডিকেটের হস্তে যেরূপ প্রভুশক্তি অর্পণ করা হইতেছে, তাহাতে সকলে আশঙ্কা করিতেছেন, বিশ্ববিদ্যালয় একটা গবর্মেণ্টের ডিপার্টমেণ্টে পরিণত হইবে; উহার আর স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীনতা কিছুই থাকিবে না। আমরা সেনেটের পুনর্গঠনে বা সিণ্ডিকেটের স্বাধীনতাসঙ্কোচে তত আশঙ্কার কারণ দেখি না। কেন না, কমিশন নিরতিশয় ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় সহকারে নূতন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কর্ত্তব্য কার্য্য সমস্তই খুঁটিনাটি করিয়া নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন, এবং নূতন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে ঐ সকল দুশ্চিন্তার দায় হইতে একবারে অব্যাহতি দিয়াছেন। কোন্ কালেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত থাকিবে, কোন্ কালেজ থাকিবে না, তাহা গবর্মেণ্ট স্বয়ং নির্দ্ধারণ

করিয়া দিবেন। গবর্মেণ্টের কর্ম্মচারীরা কালেজের অবস্থা তদন্ত করিয়া খারিজ দাখিলের রিপোর্ট করিবেন; সিণ্ডিকেটকে তজ্জন্য স্বতন্ত্র কর্ম্মচারী রাখিতে হইবে না। ছাত্রেরা কোন্ বয়সে পরীক্ষা দিবে, কি বিষয়ে পরীক্ষা দিবে, কত মার্ক পাইলে পাশ হইবে, এই সমস্তই কমিশন বিধিবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন; সুতরাং নূতন সিণ্ডিকেটের বা নূতন সেনেটের এই সকল চিন্তায় মাথা-ব্যথা জন্মাইবার কোন অবসর থাকিবে না। বরং নূতন সেনেট ও নূতন সিণ্ডিকেট জন্মগ্রহণ করিয়া কি কর্ম্ম লইয়া জীবনযাপন করিবেন, তাহাই অনেকের ভাবনার বিষয় হইয়াছে। সুতরাং সিণ্ডিকেটের ভাবী প্রভুত্বের আশঙ্কায় আজি হইতে আমাদের চিন্তিত হইবার কোনই কারণ নাই। তদ্ভিন্ন বেসরকারী বিদ্যালয়গুলির উন্নতিবিধানের জন্য কমিশন নানাবিধ উপদেশ দিয়াছেন। ঐ সকল বিদ্যালয়ের বর্ত্তমান অবস্থা অতি শোচনীয়। যাহাতে বিদ্যালয়গুলিতে যন্ত্রাগার হয়, পুস্তকালয় হয়, ছাত্রাবাস হয়, ইত্যাদি বিবিধ উপদেশ দিয়া প্রাইভেট কালেজের অধ্যক্ষদিগকে উপকৃত করিয়াছেন। তবে ঐ সকল উন্নতিসাধনের জন্য অর্থ কোথা হইতে আসিবে, তাহার কোন উপায়নির্দ্দেশ করেন নাই। কেবল ছাত্রপ্রদত্ত অর্থ হইতে আধুনিক প্রণালীর উচ্চশিক্ষা নির্ব্বাহিত হইতে পারে, এ কল্পনা এই আধুনিক ভারতবর্ষ ভিন্ন অন্যত্র কার্য্যকর হইয়াছে কি না, জানি না। এ দেশের ধনিগণ উচ্চশিক্ষার জন্য যথোচিত ব্যয়বিধানে পরাঙ্মুখ বলিয়া গালি খান; কিন্তু ধনিগণকে গালি দিয়াও বিশেষ লাভ নাই। রাজপুরুষগণ তাঁহাদিগকে যে ভাবে দোহন করিতেছেন, তাহাতে তাঁহাদিগের নিকট আর অধিক দুগ্ধের আশা করিলে প্রায়শ্চিত্তের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। আর অন্য দেশে এক এক কার্ণেজি এক এক নিশ্বাসে যে ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করেন, আমাদের অধিকাংশ ধনীর পক্ষে তাহা নিশার স্বপন। কাজেই এই বিদ্যালয়গুলির উন্নতির আশা দেখি না। উন্নতির আশা না থাকিলেও এই বিদ্যালয়গুলির উন্নতি বাঞ্ছনীয়, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু লোকে জিজ্ঞাসা করিতেছে, সরকারী কালেজগুলির উন্নতি সম্বন্ধে কমিশন কোন কথা বলেন নাই কেন? সরকারী কালেজের অবস্থা কি এতই উন্নত যে, সে সম্বন্ধে কোন উপদেশের প্রয়োজন নাই? বলা বাহুল্য, এ দেশে গবর্মেণ্ট কালেজগুলিই বেসরকারী কালেজের পক্ষে আদর্শ স্বরূপ। সরকারী আদর্শ উন্নত করিলে বেসরকারী আদর্শকেও বাধ্য হইয়া ঊর্দ্ধে উঠিতে হইবে, অথবা জীবন-সংগ্রামে নষ্ট হইতে হইবে। কিন্তু

আমরা বলি, কমিশনের এই নীরবতার জন্যও আমাদের দুঃখিত হওয়া উচিত নহে। গবর্মেণ্টকে সদুপদেশ দেওয়া তাঁহারা অনাবশ্যক বোধ করিয়াছেন; বাহিরের লোককে তাঁহারা যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহা শিরোধার্য্য করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। তৎপরে কমিশন ভারতবর্ষের দরিদ্র ছাত্রবর্গের উপর নিতান্তই দয়াপরবশ হইয়া একটা বিধি দিয়া ফেলিয়াছেন। দুরন্ত শয়তান আমাদের দরিদ্র ছাত্রগণকে নিতান্ত অসহায় অবস্থায় পাইয়া, খল সর্পের মত, তাহাদিগকে জ্ঞানবৃক্ষের রসাস্বাদনে প্রলোভিত করিয়া সর্ব্বনাশের পথে লইয়া যাইতেছিল। বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন সেই নিঃসহায়দিগের একমাত্র ত্রাণকর্ত্তা স্বরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, ইহাতে কোন্ ব্যক্তি তাঁহাদিগকে প্রেম করিতে দ্বিধা বোধ করিবে?

এই কয়েকটি নমুনা হইতেই কমিশনের রিপোর্টের ধরণটা বুঝা যাইবে। অকারণে আর পুঁথি বাড়াইয়া কাজ নাই। সংসারকার্য্যে পুরাতনকে ভাঙ্গিয়া নূতন গড়িতে হয়; কমিশন পুরাতনকে ভাঙ্গিবার অনেক সুব্যবস্থা করিয়াছেন, নূতন গড়িবার তেমন উপায় করেন নাই। কমিশনের রিপোর্ট পড়িয়া এই কারণেই আমাদের নৈরাশ্য জন্মে। আমাদের দেশের শিক্ষাক্ষেত্র জঞ্জালে ও জঙ্গলে পরিপূর্ণ, ইহা অস্বীকার করিবার কোন উপায় দেখি না। কমিশন সম্মার্জ্জনী ও কুঠার হস্তে ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন; এবং দুই হাতে সেই সম্মার্জ্জনীর ও কুঠারের প্রয়োগের দ্বারা জঞ্জাল ও জঙ্গল সাফ করিতে বসিয়াছেন। যে সকল কলেজের ভাল বাড়ী নাই, তাহা উঠাও; যাহাতে লাইব্রেরি ল্যাবরেটরি নাই, তাহা উঠাও; যাহাতে হোষ্টেল নাই, ছাত্রদের ক্রীড়াস্থল নাই, মাষ্টারদের বসিবার ঘর নাই, সে সকল উঠাও। তার উপর যে সকল কালেজ সেকেণ্ড গ্রেড্ কালেজ, সেগুলাকেও লজিকের খাতিরে একদম উঠাইয়া দাও। ভাল কথা; এইরূপ কুঠারচালনার পর যে সকল কালেজ থাকিবে, তাহা নিশ্চয়ই উচ্চ অঙ্গের বিদ্যালয় হইবে। তাহাদের অবস্থা বর্ত্তমান কালেজগুলির সাধারণ অবস্থা অপেক্ষা উচ্চ হইবে, সন্দেহ নাই। আবার কমিশন বলিতেছেন, এণ্ট্রান্সে ছাত্রদের বয়স বাড়াইয়া দাও; তাহাদের পরীক্ষা আরও শক্ত কর; তাহাদিগকে, ফেল হইলে, বারে বারে পরীক্ষা দিতে দিও না; সকলের উপর গরীবের ছেলেকে, বিশেষ ক্ষমতা না থাকিলে পড়িতে দিও না, এবং এণ্ট্রান্স পাশের পর চাকরীর প্রলোভন দিও

না; তাহা হইলে অধিক ছাত্র পাশ করিতে পারিবে না; যাহারা পাশ করিবে, তাহারা অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান বিচক্ষণ মানুষের মতন হইবে। ইহাও ঠিক কথা। এখন জিজ্ঞাস্য, তবে কি এইরূপেই আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি পাশ্চাত্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সমকক্ষ হইবে? এইরূপেই কি ভারতসন্তান অর্থান্বেষণে ও অন্নান্বেষণে বিমুখ হইয়া জ্ঞানান্বেষণে প্রবৃত্ত হইবে? এই উপায়ে কি জাতীয় শক্তির বৃদ্ধি, জাতীয় বিদ্যার বৃদ্ধি ঘটিবে? একটা জাতির গায়ে বলসঞ্চারের দুইটা উপায় আছে। এক উপায়, যে সকল ব্যক্তি আশৈশব দুর্ব্বল, তাহাদিগকে খাওয়াইয়া পরাইয়া, স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম পালন করাইয়া তাহাদের বলবর্দ্ধনের চেষ্টা। এইরূপে দুর্ব্বলের গায়ে কালক্রমে বলসঞ্চার হইতে পারে; ও বলিষ্ঠের বল আরও বাড়িতে পারে। কিন্তু এতদ্ভিন্ন আর একটা উপায় আছে। যে শিশু দৌর্ব্বল্য লইয়া ভূমিষ্ঠ হয়, তখনই তাহাকে নুন খাওয়াইয়া বা গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলা। তাহা হইলে দুর্ব্বল মানুষগুলা, যাহাদের হাড়ে দোষ, তাহারা মূলেই নষ্ট হইবে ও সমাজ অচিরে বীরের সমাজে পরিণত হইবে। শুনা যায়, পুরাকালে স্পার্টানেরা আপনাদের জাতীয় শক্তিবর্দ্ধনের জন্য এই দ্বিতীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিল। এখনও যাহারা গরু ঘোড়ার breed তৈয়ার করে, তাহারাও এই ব্যবস্থার আশ্রয় লয়। ডারুইন ইহার নাম দিয়াছেন artificial selection। প্রকৃতির হাতে এই ব্যবস্থার নাম natural selection। কোন্ ব্যবস্থাটাতে বেশী ফল হয়, বলিতে পারি না; কিন্তু আমাদের কমিশন্ এই artificial selection এর ব্যবস্থাই গ্রহণ করিয়াছেন। দু হাতে কুঠার ধরিয়া সজোরে প্রয়োগ কর; যে দুর্ব্বল, সে মারা যাউক; যে বাঁচিবার উপযুক্ত, সে বাঁচিয়া আসুক। কমিশন আমাদের পরীক্ষালয়গুলিকে বিদ্যালয়ে পরিণত করিতে বলেন নাই; পরীক্ষা কার্য্যকেই আরও কঠিন করিয়া তুলিতে বলিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়কে যথোচিত অর্থসাহায্য করিবার জন্য গবর্মেণ্টকে বলেন নাই; তৎপ্রতি শিক্ষাভার অর্পণের কথা অতি সন্তর্পণে তুলিয়াছেন; প্রতিভাবান্ অধ্যাপক সংগ্রহ করিবার কথা তুলেন নাই, শিক্ষক ছাঁকিয়া লইবার জন্য নূতন একটা পরীক্ষা প্রবর্ত্তনের উপদেশ দিয়াই ক্ষান্ত রহিয়াছেন; দেশব্যাপী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থানে নগরাবদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথা তোলেন নাই; দেশীয় ভাষার সাহায্যে বিজ্ঞান দর্শন ইতিহাসাদি শাস্ত্রশিক্ষার ব্যবস্থা দিতে সাহস না করিয়া প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালীর গোড়ায়

গলদ রাখিয়া দিয়াছেন। আমাদের কিন্তু আশা ছিল অন্যরূপ; বোধ হয়, লর্ড কর্জ্জনের ইচ্ছাও ছিল অন্যরূপ। লোকে বলিতেছে, কমিশন নিজের কথা বলেন নাই, তাঁহাদের হৃদিস্থিত হৃষীকেশ তাঁহাদিগকে যে কথা বলাইয়াছেন, তাঁহারা সেই কথাই বলিয়াছেন। আমরা তাহাতে বিশ্বাস করি না, এরূপ বিশ্বাসে আমাদের প্রবৃত্তি নাই। আমরা এখনও আশা করিয়া বসিয়া আছি, লর্ড কর্জ্জন আপনার University man এই গর্ব্বের সার্থকতা প্রদর্শন করিবেন; তাঁহার বাক্যে ও কার্য্যে সামঞ্জস্য থাকিবে; তাঁহার প্রতিশ্রুতি কার্য্যে পরিণত হইয়া তাঁহার শাসনকালকে ও মহামহিম ভারতেশ্বরের মহাভিষেক বর্ষকে ভারতেতিহাসের পৃষ্ঠে মহিমান্বিত করিয়া রাখিবে।

আমরা এই কয় মাস ধরিয়া শুষ্ক হৃদয় লইয়া বারিবিন্দুর প্রত্যাশায় উর্দ্ধমুখে দাঁড়াইয়া ছিলাম। ইউনিভার্সিটী কমিশন বারিবর্ষণের পরিবর্ত্তে শিলাবৃষ্টির ব্যবস্থা করিলেন; আমাদের শুষ্ক হৃদয় আর্দ্র করিবার জন্য এক ফোঁটা তরল জল দিলেন না। কেবল পরীক্ষা দ্বারা, কেবল বাছাই করিয়া, কেবল চালুনি নাড়িয়া ছাঁকনি ঝাড়িয়া একটা জাতির মধ্যে বিদ্যার উন্নতি, জ্ঞানের উন্নতি ঘটান যায় না। একালের সরস্বতীর উপাসনায় যে সকল বহ্বাড়ম্বর, যে সকল উপকরণ সাজসরঞ্জাম আবশ্যক, সেই সকল না জোটাইলে সরস্বতী কখনই কৃপাদৃষ্টি করিবেন না। সেকালে সরস্বতী কুটীরবাসিনী ছিলেন, কিংবা পদ্মবনে পদ্মের উপর দাঁড়াইয়া গোটাকতক পদ্মফুল উপহার পাইলেই তৃপ্ত হইতেন। একালের পাশ্চাত্য সরস্বতী তেমন নহেন, ইঁহার উপাসনার সরঞ্জাম জোটাইতে এক একটা রাজ্য দেউলিয়া হয়। আমার statistics সংগ্রহ করিবার অবসর নাই, শ্রোতৃগণের ধৈর্য্যচ্যুতিরও আশঙ্কা আছে। আপনাদিগকে অনুরোধ করি, জর্ম্মানি, ফ্রান্স, আমেরিকার এক একটা বিশ্ববিদ্যালয় কত কোটি টাকার সম্পত্তি অধিকার করিয়া আছে, একবার অনুসন্ধান করিয়া দেখিবেন। যে অক্‌স্‌ফোর্ড কেম্ব্রিজের আমরা এত গল্প শুনি, তাহারা ঐ সকল বিদ্যালয়ের নিকট লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া থাকে। কিন্তু অক্‌স্‌ফোর্ড কেম্ব্রিজেরও সম্পত্তির সহিত আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সম্পত্তির একবার তুলনা আবশ্যক।

যাহা হউক, সে সকল বড়লোকের বড় কথায় আমাদের দরকার কি? আমাদের টাকাও নাই, টাকা দিবার লোকও নাই। ইউনিভার্সিটী কমিশন, যেখানে টাকার কথা উঠিয়াছে, সেইখানেই চোখে সরিষার ফুল দেখিয়াছেন।

তাঁহাদের রিপোর্টে পদে পদে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। Teaching University কি পদার্থ, কমিশন না জানেন, এমন নহে; কিন্তু গবর্মেণ্টের কাছে তাহার ব্যয় চাহিতে কমিশন সাহস করেন নাই। কমিশন বলিয়াছেন, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি কালে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বিদ্যাদানে প্রবৃত্ত হইবে, কালে আপনার অধ্যাপক নিযুক্ত করিবে, পুস্তকালয় রাখিবে, যন্ত্রাগার বসাইবে, ইত্যাদি। তবে তাহার খরচ;—বিশ্ববিদ্যালয়ের ত তেমন অর্থসামর্থ্য নাই; গবর্মেণ্ট ত আর সে টাকা দিতে পারিবেন না; তবে দেশের রাজা মহারাজ আছেন, তাঁহাদিগকে উপাধি দিব, তাঁহাদিগকে ফেলো সাজাইয়া দিব; আর এই যে প্রাইভেট কলেজগুলি—উহাদের কাছেও কিছু পাওয়া উচিত। অক্‌সফোর্ডের মত বিশ্ববিদ্যালয় ষ্টেটের খরচে চলে না; বাহিরের লোকের প্রচুর দানেই উহাদের জীবিকা; অন্যপক্ষে গবর্মেণ্ট উহাদের শিক্ষানীতিতেও হস্তক্ষেপ করেন না। আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষানীতি গবর্মেণ্টের অধীন; যে টুকু স্বাতন্ত্র্য ছিল, তাহাও বুঝি থাকে না; অথচ গবর্মেণ্ট আশা করেন, বাহিরের বদান্যতায় বিশ্ববিদ্যালয় পুষ্ট হইবে। উত্তম কথা,—প্রাইভেট কালেজের মধ্যে যাঁহাদের জীবন বড়ই কঠিন, যাঁহারা বর্ত্তমান আঘাত হজম করিয়াও বাঁচিবেন, তাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়কে অর্থ সাহায্য করিয়া বেত্রাঘাত সহ্য করিতে থাকুন; আমাদের ধনিগণ উপাধি লাভের নূতন পন্থায় ধাবমান হইয়া জনগণের নেত্রোৎসব সম্পাদন করুন; এবং আমাদের গবর্মেণ্ট ঢাল-তলোয়ার-হীন নিধিরাম সর্দ্দারকে রণক্ষেত্রে প্রেরণ করিয়া উচ্চশিক্ষার লড়াই ফতে করুন। কিন্তু হে ভারতসন্তান, তোমাকে মিনতি করি, তুমি এই অবসরে শিখিয়া রাখ, পরান্নে শরীর পোষণ হয় না, দ্বারদেশে চীৎকার করিয়া গৃহস্থের কর্ণশূল উৎপাদনে বিশেষ কোন লাভ নাই; জানিয়া রাখ, সরস্বতী কুটীরবাসী দরিদ্র উপাসককে ঘৃণা করেন না। অতএব হে ভারতসন্তান, হে সৌম্য, হে প্রিয়দর্শন, পুনশ্চ বলিতেছি, দেবোপাসনার জন্য পুরোহিতের সাহায্য নিতান্তই আবশ্যক নহে; যে উপাসনাপ্রণালী জানে ও প্রণালীমত উপাসনা করে, দেবতা তাহারই প্রতি প্রসন্ন হন। ফাঁকি দিয়া মানুষ ভোলাইতে পারা যায়, কিন্তু দেবতা ভুলাইতে পারা যায় না; বিনা সাধনায় সিদ্ধিলাভ হয় না। দেখ, সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে সাধনার নাম পরিশ্রম, সাধনার নাম অনুরাগ, সাধনার নাম শ্রদ্ধা, সাধনার নাম ভক্তি, সাধনার নাম ত্যাগ। তোমরা স্বাবলম্বন অভ্যাস দ্বারা শ্রমের সহিত, অনুরাগের সহিত, শ্রদ্ধার

সহিত, ভক্তির সহিত, ত্যাগের সহিত, দেবতার উপাসনা কর; তোমাদের আয়াস নিষ্ফল হইবে না। নতুবা সমস্তই নিষ্ফল হইবে; আমাদের মত দরিদ্রের,—যাহাদের অবস্থা ঘোর অস্বাভাবিকতারূপ মহাব্যাধিতে গ্রস্ত, তাহাদের,—অর্থ নিষ্ফল, শ্রম নিষ্ফল, বিদ্যা নিষ্ফল, বুদ্ধি নিষ্ফল, জীবন নিষ্ফল এবং সর্ব্বাপেক্ষা নিষ্ফল অদ্যকার মত অরণ্যে রোদন।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

কাহিনী।

মহাজন-পুত্র-বন্ধু-কথা।

এক দেশে এক মহাজন ছিল। তার 'অচলাচল' সম্পত্তি। তার একটি ছেলে, একটি বউ। মহাজন বুড়ো হলো। তার 'ঘরণী' একদিন মহাজনকে বল্লে, "আমরা ত বুড়োবুড়ী হলুম, দিনকতক পরে ত ঘর দোর ছেড়ে চলে যাব। কিছু ত সঙ্গে নিয়ে যাব না। দেশে কোনও কীর্ত্তি রেখে গেলে না? কথায় বলে,—

'যাহা খাইযিব পেটকু,
যাহা দেইযিব বাটকু,
যাহা রাখিযিব খণ্টকু।"

শেষে দু জনে ঠিক কল্লে, একটা পুকুর 'খোলাতে'। দুই ক্রোশ লম্বাচৌড়া একটা পুকুর খোলালে। বার বছর গেল, তবুও পুকুরে জল উঠলো না। মহাজন বড় ব্যস্ত হলো। একদিন একটি বাবাজী এসে উপস্থিত হলো। বাবাজী বল্লে, "তোমরা বউকে এখানে বলি দিলে এ খালে জল উঠ্‌বে।" মহাজন অনেক কষ্টে তার কথায় সায় দিলে। তার পর দিন বউকে বলি দেওয়া হবে, ঠিক হলো। দাসীরা গিয়ে বউকে এই সব বল্লে। বউ রাত্রে তার 'গেরস্ত'কে বল্লে। তাতে সে আস্তাবল থেকে পক্ষিরাজ ঘোড়া বেছে নিয়ে 'হাতহেতের' বেঁধে টাকাকড়ি সঙ্গে নিয়ে ও বউকে ঘোড়ার ওপর বসিয়ে চলে গেল। যেতে যেতে বেলা দুপুরের সময় এক জঙ্গলে পঁহুছিল। একটা

গাছের উপর উঠে এক বড় গ্রাম দেখ্‌তে পেলে। সেই গাঁয়ে বড় বড় বাড়ী বাগান প্রভৃতি আছে। মহাজনের ছেলে সেই গাঁয়ে গেল। একটি বড় বাড়ীতে কেউ নাই। সেই বাড়ীতে বউকে রেখে খাবার যোগাড় কর্ত্তে বেরুল। এই সময়ে একটা রাক্ষস এসে তার রাস্তা আগ্‌লে দাঁড়াল। সে গাঁয়ের সব লোককে সেই রাক্ষসই খেয়ে নির্ম্মূল করেছে। মহাজনের ছেলেকে দেখে হাঁ করে খেতে দৌড়ুল। মহাজনের ছেলে তলোয়ার বার করে তাকে কাট্‌তে গেল। কিছু উপায় না দেখে রাক্ষসটা তার পায়ের তলায় পড়ে বল্লে, "যা হবার হয়েছে, আমাকে সাত দিন রাখ, তার পর কেটো। এক ঘরে চাবি দিয়ে আমাকে রাখ।" মহাজনের ছেলে তাই কল্লে। যাবার সময় সব ঘরের চাবিগুলি বউকে দিয়ে গেল; রাক্ষসের কথা কিছু বল্লে না, খালি বল্লে, "সব ঘর খুলো, কিন্তু এই ঘর খুলো না।" এই বলে সে চলে গেল।

বউ তো হাজার হ'ক মেয়েমানুষ। মনে কল্লে, "সব ঘর কেন খুলতে বল্লে, এই ঘরটা খুল্‌তে কেন বারণ কল্লে? নিশ্চয় কোন জিনিস আমায় লুকিয়ে এখানে রেখেছে।" এই মনে ক'রে ঘর খুলে দেখে যে, রাক্ষস বসে আছে। রাক্ষস তাকে দেখে বল্‌লে, "আমার এত সম্পত্তি, এত বিষয় ভোগ করতে আমি একা। তুমি আমার সঙ্গে থাক্‌লে দু জনে বেশ সুখে থাক্‌ব।" বউ প্রথমে রাজী হ'ল না, কিন্তু শেষে হ'ল। রাক্ষস বল্লে, "তোমার 'গেরস্ত'কে না মাল্লে আমরা ত সুখে থাক্‌তে পার্‌বো না। তুমি একটি কাজ কর। মহাজনের ছেলে জঙ্গল থেকে ফিরে আসবার সময় তুমি চোখে কর্পূরের গুঁড়ো ফেলে চোখ্ রগড়ে রগড়ে লাল ক'রে বসে থাক। সে এলে বলো, চোখ্ উঠেছে। সে যত উপায় কর্ব্বে, তুমি বলো, কোনটাতেও ভাল হ'ল না। তুমি বলো, "আমার ছেলেবেলায় ঐ রকম হয়েছিল, কোন মতেই ভাল হ'ল না। শেষে, বাবা বাঘের দুধ এনে দেওয়ায় ভাল হ'ল।"

মহাজনের ছেলে এসে দেখে যে, বউয়ের চোখ উঠেছে। রাক্ষস যা শিখিয়ে দিয়েছিল, বউ তাই বল্লে। প্রথম প্রথম বল্লে যে, গিয়ে কাজ নাই। কিন্তু মহাজনের ছেলে একজিদ্ ধরলে। না খেয়ে দেয়েই বাঘের দুধ আন্‌তে ঘোড়ায় চড়ে বেরুল। সে যাওয়ার পর, চাবি খুলে দু জনে আমোদ আহ্লাদ কর্ত্তে লাগল।

এ দিকে মহাজনের ছেলে যেতে যেতে দেখ্‌লে, এক বনের চার ধারে আগুন লেগেছে; মাঝখানে দুটি বাঘের ছানা পড়ে ছট্‌ফট্ ক'চ্ছে। তাই দেখে ঘোড়াশুদ্ধ সে আগুনের ভিতর লাফিয়ে পড়ল ও তাদের নিয়ে বাইরে এল। বাঘ-

ছানাদের গা ধুইয়ে দিয়ে তাদের মুখে জল দিল। খানিক দূরে এসে ঘোড়া থেকে নেবে ঘোড়া গাছের শুঁড়ীতে বাঁধলে। ঘোড়ার ওপর থেকে সতরঞ্চ খুলে নীচে পেতে সেই ছানা ছুটিকে নিয়ে শুল। এমন সময় বাঘ ও বাঘিনী ছেলেদের খুঁজতে খুঁজতে সেখানে এল। তারা ভাবলে যে, তাদের ছানা ছুটিকে সেই মানুষটি নিয়ে পালাচ্ছে। এই ভেবে তাকে খেতে যাচ্ছে, এমন সময় ছানা ছুটি উপকারের কথা তাদের বল্লে। বাঘ বাঘিনী শুনে বড় খুসী হল। মহাজনের ছেলের যাবার সময় বাঘ বাঘিনী তার খাবার জন্তে ভাল ভাল খাবার ও ঘোড়ার জন্তে ঘাস টাস এনে তার পায়ে পড়ল। মহাজনের ছেলে বল্লে যে, "যে জন্য আমি এসেছি তা না হলে, আমি জলগ্রহণ কর্ব্বো না।" বাঘিনী এই শুনে উঠে দাঁড়াল ও বল্লে, "যত ইচ্ছা, ছুয়ে নাও।" মহাজনের ছেলে এক ঘটী ছুধ ছুয়ে নিলে। তার পর খেয়ে দেয়ে ও ঘোড়াকে খাইয়ে বেরুল। বেরোবার সময় বাঘ বাঘিনী অনেক মিনতি করে বল্লে, "তুমি আমাদের ছানা ছুটির প্রাণ বাঁচিয়েছ, ছুটি থেকে একটি নিয়ে যাও, কখন না কখন তোমার উপকারে আস্‌বে।" তাই শুনে সে একটিকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এল। বউকে বাঘের ছুধ দিলে। বড় পরিশ্রম করে এসেছিল, যেমন শুল, অমনি ঘুমিয়ে পড়ল। তার পর বউ গিয়ে রাক্ষসকে বাঘের ছুধ আনার কথা বল্লে। তাতে রাক্ষস বল্লে, "তবে আর এক কাজ কর। খুব আছড়াকাছড়ি কর। বল, ভাল হ'ল না, আবার চোখ কর্‌কর্ কচ্ছে। তার পর সে জিজ্ঞাসা কল্লে বলো যে, বাবা ছেলেবেলায় বলে দিয়েছিলেন যে, যদি বাঘের ছুধ খেয়ে ভাল না হয়, তা হ'লে 'দেবকুণ্ড' হতে 'অমৃতপানি' এনে দিলে ভাল হবে। তা না হলে চোখ অন্ধ হয়ে যাবে। 'দেবকুণ্ড' স্বর্গে, তাতে আবার দেবতারা আগলদার। সেখানে মানুষ গেলে আর ফিরে আস্‌তে হবে না। দেবতারা মেরে ফেল্‌বে। সেখানে গেলে তোমার 'গেরস্ত' আর ফিরবে না। আমরা ছু জনে সুখে স্বচ্ছন্দে থাক্‌ব।" ছু এক দিন পরে বউ আবার কল্লা কর্ত্তে আরম্ভ কল্লে ও রাক্ষসের কথামত বল্লে। মহাজনের ছেলে 'অমৃতপানি' আন্‌বে বলে বেরুলো। যেতে যেতে রাস্তায় বেলা ছুপুর হল। এক গাছের তলায় ঘোড়া বেঁধে তার তলায় রইল। সেই গাছে ছুটি 'গণ্ডভৈরব' পাখীর বাসা। সে পাখীরা এসে মর্‌তে বসেছে, তাদের একটিও ছেলে রইল না। পাখীরা খাবার খুঁজতে যায়, এসে দেখে যে ছানা নাই। সেদিন মহাজনের ছেলে পঁহুছিবার সময় তারা খাবার খুঁজতে গেছে। মহাজনের ছেলে দেখ্‌লে, গাছের তলা

থেকে একটি 'অহিরাজ' সাপ বেরিয়ে উপরে উঠল। গাছের উপর ছানা ছুটি সাপ দেখে কাঁ্যা কাঁ্যা কর্ত্তে লাগল। মহাজনের ছেলে তীর দিয়ে সাপকে মেরে ফেল্লে। সাপটা তিন-কুচি ক'রে কেটে ঢাল ঢাকা দিয়ে রেখে ঘুমুল।

শুয়ে আছে, এমন সময় বুড়ো বুড়ী পাখী ছুটি এল। ছানারা তাদের বল্লে, "আমাদের আর খাবার কি দেবে, যে লোকটি আমাদের বাঁচিয়েছে, 'তার কথা বোঝ'। তাই তারা তার জন্যে খাবার দাবার এনে রাখ্‌লে। মহাজনের ছেলে উঠলে তার পায়ে পড়ে খেতে বল্লে। সে বল্লে, "আমি যে জলের জন্যে এসেছি, তা না পেলে খাব না।" বুড়ো পাখী বল্লে, "সেখান থেকে 'অমৃতপানি' আনা সহজ কথা নয়। তুমি আমাদের ছানাদের বাঁচিয়েছ, আমাদের প্রাণ যায় যাক্, তোমার উপকার কর্ব্বো। তুমি খেয়ে দেয়ে নিশ্চিন্ত থাক, আমি যাচ্ছি। যদি তিন দিনের মধ্যে না ফিরি, তবে জান্‌বে, দেবতারা আমাকে মেরে ফেলেছে। তার পর বুড়ী পাখী যাবে। সে ফিরে না এলে ছেলেরা যাবে। তার পর তোমার অদৃষ্ট।"

এই বলে, বুড়ো পাখী একটি ঘটিতে সাত হাজার হাত দড়ী বেঁধে সঙ্গে নিয়ে গেল। দিনরাত উড়ে উড়ে সেখানে পঁহুছিল। কাছে উড়লে পাছে দেবতারা দেখ্‌তে পায়, তাই সে ৭০০০ হাত উপরে উড়তে লাগল। ছুপুরবেলা আগলদারেরা খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। সেই সময় পাখী আস্তে আস্তে ঘটিটি ডুবিয়ে জল নিয়ে পালাল ও ঘটি মুখে করে উড়ে উড়ে ফিরে এল। মহাজনের ছেলে ঘরে ফেরবার সময় পাখীরা বল্লে, "তুমি আমাদের এত উপকার করেছ, একটি ছানা নিয়ে যাও। একদিন না একদিন তোমার উপকারে আস্‌তে পারে।"

মহাজনের ছেলে বাঘের ছানা ও পাখীর ছানা সঙ্গে নিয়ে ফিরিল। রাস্তায় এক রাজার দেশ পড়ল। সেই রাজার মেয়ে অমরবর পাবে ব'লে মহাদেবের কাছে বার বৎসর তপস্যা করেছিল। মহাদেব বর দিয়ে ছিলেন, "তুমি নিশ্চয় অমর বর পাবে, কিন্তু প্রথমে একটি মরা লোক পাবে; তাকে তুমি বাঁচাবে। সে বাঁচলে তোমরা ছু জনে অমর হয়ে ঘরকন্না কর্ব্বে।" রাজকন্যার 'কাকচরিত্র' জানা ছিল। মহাজনের ছেলে সে দেশে এলে রাজকন্যা জানতে পাল্লে। রাজকন্যা নেয়ে ছাতে উঠে চুল শুকুচ্ছে, এমন সময় কিছু দূরে মহাজনের ছেলেকে বাঘের ও পাখীর ছানা শুদ্ধ দেখ্‌তে পেলে। রাজকন্যা দাসী পাঠিয়ে তাকে ডেকে আনলে। বল্লে, "আমায় বে কর।"

মহাজনের ছেলে বারণ কল্লে। রাজকন্যা তাকে খুব ভাল ক'রে খেতে দিলে। সে খেয়েদেয়ে ঘুমুল। রাজকন্যা 'কাকচরিত্র'র দ্বারা জান্‌তে পারলে, বউ কল্লা করে এই ফিকির করেছে। রাজকন্যা ঘটী থেকে 'অমৃতপানি'টুকু ঢেলে রাখলে ও অন্য জল পুরে রেখে দিলে। আর বাঘের ও পাখীর ছানাদের বলে দিলে যে, "আজ রাত্রে যখন বউ একে মেরে বাহিরে ফেলে দেবে, অমনি তোমরা ওর মাথাটা এক জন ও ধড়টা এক জন আমার কাছে নিয়ে আসবে।" মহাজনের ছেলে এ সব কিছুই জানে না, জলের ঘটী নিয়ে বাড়ী এল। এ দিকে বউ আর রাক্ষসে পরামর্শ হয়ে থাকে, যে যদি মহাজনের ছেলে এবারও না মরে, 'অমৃতপানি' নিয়ে ফিরে আসে, তা হলে তাকে সেই রাত্রেই কেটে ফেল্‌তে হবে। সত্যি সত্যি সে ফিরে এল। অনেক পরিশ্রম করেছিল, তাই বড় ঘুম পেয়েছিল। বউ বল্লে, "হাঁ; এই জল দিয়ে চোখ ভাল হয়ে গেছে। আমি তোমার সঙ্গে অনেক দিন পাশা খেলিনি, আজ খেল্‌ব।" মহাজনের ছেলে অতিকষ্টে পাশা খেল্‌লে। খেলে খেলে বড় ক্লান্ত হয়ে, যেখানে বসেছিল, সেইখানেই ঘুমিয়ে পড়ল। সেই সময় বউ খাঁড়া এনে তাকে দুআধখানা ক'রে কেটে ফেল্লে। তার পর রাক্ষসের ঘরের চাবি খুলে দিলে। রাক্ষস বেরিয়ে তাকে কোথায় ফেল্‌বে ভাব্‌ছে, এমন সময় বাঘের ও পাখীর ছানারা বল্লে, "ও আমাদের ধরে এনে বড় কষ্ট দিয়েছিল। ওর উপর আমাদের বড় রাগ আছে। এখন আমাদের ছেড়ে দাও, আমরা বাড়ী যাই; আর ওর মুণ্ডটা ও ধড়টা দাও, আমরা রাস্তায় মনের সুখে খেতে খেতে যাব।" এই ব'লে তাদের ঠকিয়ে মহাজনের ছেলের মুণ্ড ও ধড়টা ঠিক নিয়ে গিয়ে তারা রাজকন্যার কাছে গেল। রাজকন্যা তাদের প্রত্যাশায় না ঘুমিয়ে বসেছিল। এরা পঁহুছিলে সেই মুণ্ড ও ধড়টা জুড়ে' একখানা খাটে বিছানা ক'রে শুইয়ে দিলে। হরপার্ব্বতীর নাম ক'রে 'অমৃতপানি' ছড়িয়ে দেওয়ায় মহাজনের ছেলে উঠে বস্‌ল। চোখ মুছতে মুছতে বল্লে, "ওঃ! কত ঘুমিয়ে প'ড়েছিলেম!" এই ব'লে বউকে খুঁজতে লাগল। রাজকন্যা তাকে সব বুঝিয়ে বল্লে। প্রথমে সে বিশ্বাস কল্লে না, তার পর সেখানে গিয়ে সত্যি সত্যি দেখে যে, তার বউ রাক্ষসকে নিয়ে আমোদ আহ্লাদ কচ্ছে। তলোয়ার বার ক'রে রাক্ষসকে মেরে ফেল্লে, একটা গর্ত্ত ক'রে বউকে 'ওপর কণ্টা তল কণ্টা' ক'রে পুতে ফেলে। ফিরে এসে রাজকন্যাকে বে কল্লে। "দিহেঁ যাক আনন্দরে ঘরদুয়ার কল্লে। মুঁ গলাক্ক কথা কহিলে নাহি।"

চট্টগ্রামের নবাবগণ।

চট্টগ্রামের অশেষশাস্ত্রপারদর্শী স্বর্গীয় মৌলুভী হামিদুল্লা খাঁ বাহাদুর সাহেব পারস্য ভাষায় 'তওয়ারিখি হামিদী' নামে চট্টগ্রামের একখানি বৃহৎ ইতিহাসের রচনা করিয়া গিয়াছেন। খাঁ সাহেব চট্টগ্রামের এক জন সম্ভ্রান্ত জমীদার ও ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তাঁহার বংশধরগণ আজও সম্পন্ন আছেন। কিন্তু তাঁহার জীবনকাহিনী বিবৃত করিবার জন্য এ প্রবন্ধের অবতারণা নহে।

গ্রন্থখানি ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। এই ইতিহাসখানি কঠিন পারস্য ভাষায় রচিত। এই গ্রন্থের প্রকৃত নাম 'আহাদিছল্ খওয়ানি'; কিন্তু গ্রন্থকর্ত্তার নামানুসারী নামেই ইহা বিশেষ পরিচিত। ইহার রচনাকাল ১২৬১ হিজ্‌রী, বা ১২৫১ বাঙ্গালা।

চট্টগ্রামের অন্যতম জমীদার ৺ ফজর আলী খাঁর (বর্ত্তমান কোর্ট অব ওয়ার্ডের অধীন শ্রীযুক্ত ছালামত আলী খাঁর) জমীদারী-দপ্তরে চট্টগ্রামের শাসনকর্ত্তৃগণের পারস্য ভাষায় লিখিত একখানি 'ফেরস্ত' ছিল; গ্রন্থরচনার সময়ে স্বর্গীয় মৌলুভী সাহেব উহার এক নকল সংগ্রহ করিয়া তাহা স্বীয় গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করেন। গ্রন্থের সেই অংশটিই বর্ত্তমান প্রবন্ধের মূল ভিত্তি।

আমি পারস্য ভাষায় অলব্ধপ্রবেশ বলিয়া অপরের দ্বারা এই অনুবাদ কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইয়াছে। সুতরাং ভ্রমপ্রমাদ থাকিবারই খুব সম্ভাবনা। পক্ষান্তরে, ইতিহাসে আমার কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা নাই। অতএব পাঠকগণের নিকট ভাবী ভ্রমপ্রমাদের জন্য সবিনয়ে ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি।

প্রবন্ধটি নীরস ও ঘটনা-শূন্য হইলেও, বঙ্গসাহিত্যের দপ্তরে ইহার সমাবেশ অনাবশ্যক নহে। আমাদের ইতিহাসের উপকরণরাজি প্রায়ই ইংরেজী ভাষার কুক্ষিগত; তাহার সংগ্রহ ত সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। বলা বাহুল্য, সেরূপ উপকরণের অভাবেই প্রবন্ধটি সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ করিতে পারিলাম না। আশা আছে, কোনও বিজ্ঞ ঐতিহাসিক বর্ত্তমান প্রবন্ধের বিস্তারিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া দেশের ও মাতৃভাষার এই অভাব দূর করিবেন। বলিয়া রাখা ভাল, প্রবন্ধমধ্যে আমার নিজের মতামত অতি অল্পই আছে।

তত্তৎস্থলে ফুটনোট ও বন্ধনীর ব্যবহার করা গিয়াছে। আলোচনার সুবিধার জন্য নবাবগণের পার্শ্বদেশে শাসনকালজ্ঞাপক খ্রীষ্টীয় অব্দের নির্দ্দেশও আমি করিয়া দিয়াছি। *

১। নবাব বুজুরগ উমেদ খাঁ। (১৬৬৬—১৬৬৮ খ্রীঃ অঃ)

ইনি তিন-হাজারী ('আলমগির' মতে কিন্তু দেড়হাজারী) মন্‌সবদার। শাসনকাল ১০২৭ মঘীর ২৬শে মাঘ হইতে ১০৩০ মঘী পর্য্যন্ত—তিন বৎসর। উমেদ খাঁই সর্ব্বপ্রথম চট্টগ্রাম জয় করেন। ইনি প্রথমে ১১০৩ হিজ্‌রীতে সুবা বেহারের শাসনকর্ত্তা ও তৎপরে সুবা এলাহাবাদের নাজিম ছিলেন। ১১০৫ হিজরীর জুমাদিয়ল্ আউয়াল্ পর্য্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন কি না, বলা যায় না। প্রসিদ্ধ 'জামেসঙ্গিন' নামক মসজীদ ইহাঁর প্রতিষ্ঠিত। ইনি নবাব শায়েস্তা খাঁর পুত্র। ইঁহার অপর ভ্রাতা মুজাফর বা জাফর খাঁ জৈনপুরের ফৌজদার ছিলেন। ইঁহার দেওয়ান—নরসিংহ রায়। বক্‌সী—মির্জ্জা খলিল। †

২। নবাব আছ্‌কর (আস্কর) খাঁ। (১৬৬৯—৭১)।

তিন-হাজারী মন্‌সবদার। শাসনকাল ১০৩১—১০৩৩ মঘী পর্য্যন্ত—তিন বৎসর। চট্টগ্রাম সদরের নিকটবর্ত্তী 'আস্করাবাদ' গ্রাম ও 'আস্কর তালাও' নামক দীর্ঘিকা ইহাঁরই কীর্ত্তি-চিহ্ন। ইহাঁর দেওয়ান—ভগওয়ানী (ভগবান?) দাস। বক্‌সী—মির্জ্জা মুজঃফর হোসেন।

৩। নবাব রসিদ খাঁ। (১৬৭২—৭৩ খ্রীঃ।)

তিন-হাজারী মন্‌সবদার। শাসনকাল ১০৩৪—১০৩৫ মঘী পর্য্যন্ত দুই বৎসর। তাঁহার দেওয়ান—ভগবান দাস। বক্‌সী—মীর মহম্মদ (হোসেন)।

৪। নবাব বুজুর্‌গ উমেদ খাঁ। (২য় বার।) (১৬৭৪—৭৭ খ্রীঃ)

তিন-হাজারী মন্‌সবদার। শাসনকাল ১০৩৬—১০৩৯ মঘী পর্য্যন্ত চার

---

* কৃতজ্ঞহৃদয়ে স্বীকার করিতেছি, এই প্রবন্ধের অনুবাদ কার্য্যে আমার পরমপূজনীয়, ভিঙ্গরোল-বাসী শ্রীযুক্ত মিঞা অছিয়র রহমান চৌধুরী সাহেবই আমার প্রধান সহায়। তজ্জন্য আমি তাঁহার নিকট ঋণী।—লেখক।

* শ্রীযুক্ত বাবু তারকচন্দ্র দাস গুপ্তের 'চট্টগ্রামের ইতিবৃত্তে'র মতে, উমেদ খাঁর পরবর্ত্তী শাসনকর্ত্তা মিরহদ্দি খাঁ। কিন্তু তাঁহার কোন নামই ত এই গ্রন্থে দেখা যায়-না। তারক বাবুর মতে চট্টগ্রামের নবাবগণের নাম যথাক্রমে এইরূপ ;—

১। উমেদ খাঁ। ২। মিরহদ্দি খাঁ। ৩। ওলিবেগ খাঁ। ৪। কেদীরত হোসেন খাঁ। ৫। জলকদর খাঁ। ৬। মীর আয়োজন। ৭। আকা বাকর। ৮। দেওয়ান মহা সিং। ৯। আকা নাজিম। ১০। মহম্মদ রেজা খাঁ।

বৎসর। তাঁহার দেওয়ান—ভগবান দাস। বক্সী—মীর মুজঃফর হোসেন।

এই 'মুজঃফর হোসেনে'র দুটি ভিন্ন উপাধি (মির্জ্জা ও মীর) মাত্র; তদ্দ্বারা দুই জন ব্যক্তির কল্পনা সঙ্গত নহে।

৫। নবাব ফর্হাদ খাঁ। (১৬৭৮—৭৯ খ্রীঃ)

দেড়হাজারী। শাসনকাল ১০৪০—১০৪১ মঘী পর্য্যন্ত দুই বৎসর। তাঁহার দেওয়ান—হোসেন কুলী খাঁ। বক্সী—মীর জাফর।

(চট্টগ্রাম সদরে স্থিত 'ঘাঠ ফর্হাদ বাগ' নামক গ্রাম ইঁহারই স্থাপিত।)

৬। নবাব জাফর খাঁ। (১৬৮০—৮৭ খ্রীঃ)

দেড়হাজারী। শাসনকাল ১০৪২—১০৪৯ মঘী পর্য্যন্ত, আট বৎসর। ইনি নবাব উমেদ খাঁর ভ্রাতা ও নবাব শায়েস্তা খাঁর পুত্র। তাঁহার দেওয়ান—জৈনল্ আবদিন। বক্সী—মীর জাফর ও মহম্মদ হোসেন।

৭। নবাব মুজাফর খাঁ। (১৬৮৮ খ্রীঃ)

ইঁহাকে পাঁচ-শতী মনসবদার লেখা হইত, কিন্তু তিনি দেড় হাজার সৈন্য রাখিতেন। ১০৫০ মঘীতে এক বৎসরমাত্র শাসন করেন। ইনি বাহাদুর খাঁর পুত্র ও 'মাসির আলম্গির' মতে আমিরুল ওমরা মুজাফর খাঁর পিতা। তাঁহার দেওয়ান—মহম্মদ খান। বক্সী—মহম্মদ হোসেন।

৮। নবাব কেদাই খাঁ। (১৬৮৯—৯৩ খ্রীঃ)।

দোহাজারী। শাসনকাল ১০৫১—১০৫৫ মঘী পর্য্যন্ত পাঁচ বৎসর। তাঁহার দেওয়ান—মহম্মদ খান। বক্সী—মহম্মদ নইম।

৯। নবাব নুরল্লা খাঁ। (১৬৯৪ খ্রীঃ)

দেড়হাজারী। শাসনকাল ১০৫৬ মঘীতে এক বৎসর মাত্র। তাঁহার—দেওয়ান—মহম্মদ খান। বক্সী—মহম্মদ নইম।

১০। নবাব এয়াকুব খাঁ। (১৬৯৫—৯৭ খ্রীঃ)

দেড়হাজারী। ১০৫৭—১০৫৯ মঘী পর্য্যন্ত তিন বৎসর শাসনকাল। দেওয়ান—মহম্মদ খান। বক্সী—মহম্মদ নইম।

১১। নবাব রহমতল্লা খাঁ। (১৬৯৮ খ্রীঃ)।

নয়-শতী। শাসনকাল ১০৬০ মঘীতে এক বৎসর মাত্র। দেওয়ান—মহম্মদ খান। বক্সী—মহম্মদ নইম।

১২। নবাব আকিদত খাঁ। (১৬৯৯ খ্রীঃ)

দেড়হাজারী। শাসনকাল ১০৬১ মঘীতে এক বৎসর মাত্র। দেওয়ান—মহম্মদ খান। বক্‌সী—মহম্মদ নইম।

মহম্মদ নইম সাকল্যে পাঁচ জন নবাবের একাদশ বৎসর বক্‌সী, ও মহম্মদ খান ছয় জন নবাবের বারো বৎসর দেওয়ান ছিলেন। 'জোলা পাড়া'র মসজিদ ও তন্নিকটবর্ত্তী দীঘি মহম্মদ খাঁরই কীর্ত্তি। আজও ঐগুলি তাঁহার নামে অভিহিত হয়।

১৩। নবাব রহমতল্লা খাঁ। (দ্বিতীয় বার) (১৭০০—১৭০৬ খ্রীঃ)

নয়-শতী। শাসনকাল ১০৬২—১০৬৮ মঘী পর্য্যন্ত সাত বৎসর। ইঁহার আমলে 'নায়েবী' পদ প্রথম সৃষ্ট হয়। সর্ব্বপ্রথম—নায়েব—আকা হাসেম। দেওয়ান—সুলতান মহম্মদ। বক্‌সী—নুরদ্দিন আমেদ।

১৪। নবাব বসারত খাঁ। (১৭০৭—১৭০৮ খ্রীঃ)

দেড়হাজারী। শাসনকাল ১০৬৯—১০৭০ মঘী পর্য্যন্ত দুই বৎসর। নায়েব—আবু তালেব। দেওয়ান—মীর আমজদ। বক্‌সী—নুরদ্দিন মহম্মদ।

১৫। নবাব সর্‌বোলন্দ্‌ খাঁ। (১৭০৯—১৭১০ খ্রীঃ)

এক-হাজারী। শাসনকাল ১০৭১—১০৭২ মঘী পর্য্যন্ত দুই বৎসর। ইঁহার আমলে দেওয়ান ছিল না; নায়েবই তৎকার্য্য সম্পন্ন করিতেন। নায়েব—নুর খাঁ ও ফতে খাঁ। বক্‌সী—নুরদ্দিন মহম্মদ।

১৬। নবাব মুর্শিদ কুলী খাঁ। (১৭১১—১২ খ্রীঃ) চার-হাজারী। ১০৭৩—১০৭৪ মঘী পর্য্যন্ত দুই বৎসর শাসনকাল। নায়েব—সাহ অর্দ্দি খাঁ। দেওয়ান—মণিরাম। বক্‌সী—নুরদ্দিন।

বিভিন্ন ভাবে নাম বা উপাধি লিখিত থাকিলেও, এই সকল 'নুরদ্দিন'ই এক ব্যক্তি বলিয়া বোধ হয়। তিনি চারি জন নবাবের আমলে বার বৎসর বক্‌সী ছিলেন।

মুর্শিদাবাদ মুর্শিদ কুলি খাঁরই প্রতিষ্ঠিত। তিনি প্রথমে ইস্‌লামাবাদের (চট্টগ্রামের) ফৌজদার ও থানাদার ছিলেন। আলমগীর বাদশাহের রাজত্বের শেষ সময়ে তিনি বাঙ্গালার সুবাদার হয়েন, এবং তৎপরবর্ত্তী সম্রাট-গণের নিকট 'জাফর খাঁ' উপাধি লাভ করেন। (তাঁহার শাসনকালেই, বোধ হয়, চট্টগ্রামে 'নবাবী' উঠিয়া গিয়া তৎস্থলে 'নায়েবী' পদের সৃষ্টি হয়।) সর্ব্বপ্রথম নায়েব মীর এওজি কি এয়াছিন খাঁ, নিশ্চয় বলা যায় না। ইঁহারা দুই জনই আগে পরে নবাব জাফর খাঁর (মুর্শিদ কুলি খাঁর?) নায়েব হয়েন।

মীর এওজি কেবল ছয় মাস নায়েব ছিলেন। তাঁহাদের কাহারও দেওয়ান কি বক্সীর নাম জানা যায় না। ‘কদম মোবারক’* ও ‘জামে সঙ্গিন’ প্রায় ৬০ বৎসর আগে পরে প্রস্তুত হয়।

১৯। নবাব আলিবেগ খাঁ ও মির্জ্জা বাকর। (ইঁহারা দুই জন যুগপৎ নায়েব ছিলেন কি?)

আলি খাঁর আমলে নবাবী কাছারী চকবাজারে অবস্থিত ছিল; তাহার ভগ্নাবশেষ আজও তথায় আছে। চকবাজারের পশ্চিম দিকে আলি খাঁর মস্‌জিদ অবস্থিত; মস্‌জিদের সম্মুখে দীঘি। দেওয়ান—কিষণ চন্দ্র (কৃষ্ণ চন্দ্র) এবং তৎপরে মণিরাম দেওয়ান বা বক্সী হয়েন।

ইঁহাদের শাসনকালের সন তারিখ জানা যাইতেছে না। (তবে দেখা যাইতেছে যে, ইঁহারা চারি জনে ১৭১৩—১৭২৭ খ্রীঃ অঃ পর্য্যন্ত দেশশাসন করেন।)

২০। নবাব কিদ্‌বি হোসেন খাঁ। (১৭২৮—৩৫ খ্রীঃ।)

ইনি মুর্শিদ কুলি খাঁর জামাতা ও বাঙ্গালার নবাব সুজাউদ্দিন খাঁর প্রথম নায়েব। শাসনকাল ১০৯০—১০৯৭ মঘী, মোতাবেক ১১৪১—১১৪৮ বাঙ্গালা পর্য্যন্ত সাত বৎসর। বক্সী ও দেওয়ানের নাম অজ্ঞাত।

২১। নবাব হোসেন মহম্মদ খাঁ। (১৭৩৫—৩৬ খ্রীঃ।)

ইনি নবাব সুজাউদ্দিনের দ্বিতীয় নায়েব। শাসনকাল মাহ ভাদ্র ১০৯৭—১০৯৮ মঘীর আশ্বিন, (মোতাবেক ১১৪৩ বাঙ্গালা—কিরূপে?) এক বৎসর দুই মাস। বক্সীর নাম নাই। দেওয়ান—শোভাচান্দ পেস্কার।

২২। (দেওয়ান) মণিরাম। (১৭৩৬ খ্রীঃ অঃ।)

কার্য্যে ইনি ‘নায়েব’ হইলেও ইঁহাকে ‘থানাদার’ বলা হইত। তিনি পূর্ব্ববর্ত্তী নায়েব হোসেন মহম্মদ খাঁর নায়েবীর শেষ হইতে জোলকদর খাঁর নায়েবীর আরম্ভ পর্য্যন্ত কিছু দিন নায়েবের কাজ করিয়াছিলেন। ‘মণিরাম বাগ’ নামক গ্রাম তাঁহারই স্থাপিত। তাঁহার বক্সীর নাম নাই, কিন্তু দেওয়ান—মাহাকুম সিং।

২৩। নবাব জোলকদর খাঁ। (১৭৩৬—৩৮ খ্রীঃ।)

ইনি নবাব সুজাউদ্দিনের তৃতীয় নায়েব। শাসনকাল মাহ কার্ত্তিক ১০৫৮

* ইহা এয়াছিন খাঁর নির্ম্মিত।

—১১০০ মঘীর ৭ই আষাঢ়, (মোং ১১৪৫ বাঙ্গালা ?) দুই বৎসর লিখিত দেখা যায়, কিন্তু হিসাবে এক বৎসর আট মাস সাত দিন হয়। বকসীর নাম নাই। দেওয়ান—বাঙ্গালী লাল।

এই 'বাঙ্গালী লালের হাট' আছে। (কোথায় ?)

২৪। নবাব মীর মহম্মদ রেজা খাঁ। (১৭৩৮—৩৯ খ্রীঃ।)

ইনি চতুর্থ নায়েব। ইনি নবাব সুজাউদ্দিনের পুত্র ও মুর্শিদ কুলী খাঁর দৌহিত্র সরফরাজ খাঁর নায়েব। শাসনকাল মাহ আষাঢ় ১১০০—মাহ চৈত্র ১১০১ মঘী এক বৎসর দশ মাস। বকসীর নাম নাই। দেওয়ান—বড়ুন (বরুণ ?) দত্ত।

২৫। নবাব সেরাজদ্দিন মহম্মদ খাঁ। (১৭৪০—৪১ খ্রীঃ।)

ইনি নবাব মহব্বত জঙ্গ আলিবর্দ্দি খাঁর প্রথম নায়েব। শাসনকাল মাহ ৮ই জ্যৈষ্ঠ ১১০২—১১০৩ মঘী, এক বৎসর এক মাস আট দিন মাত্র। বকসীর নাম নাই। দেওয়ান—লক্ষ্মীনারায়ণ।

২৬। নবাব মীর আফজল। (১৭৪১—৪৩ খ্রীঃ।)

ইনি দ্বিতীয় নায়েব। শাসনকাল মাহ ৯ই জ্যৈষ্ঠ ১১০৩—২রা ভাদ্র ১১০৫ মঘী (মোং ১১৫০ বাঙ্গালা ?), দুই বৎসর লেখা, কিন্তু হিসাবে দুই বৎসর দুই মাসের অধিক হয়। বকসীর নাম নাই। দেওয়ান—মহা সিং।

২৭। নবাব হাছন কুলী খাঁ। (১৭৪৩—৫১ খ্রীঃ)

ইনি তৃতীয় নায়েব। শাসনকাল মাহ ১৩ই ভাদ্র ১১০৫ (মোং ১১৫০ বাঙ্গালা ?)—১১১৩ মঘী, আট বৎসর তিন মাস বারো দিন। ইঁহার ও ইঁহার পরবর্ত্তী নায়েব ছদাকত মহম্মদ খাঁর নায়েবী-গ্রহণের মধ্যে ন্যূনাধিক চারি মাস নায়েবী পদ শূন্য ছিল। বকসীর নাম নাই। দেওয়ান—মহা সিং।

২৮। নবাব ছদাকত মহম্মদ খাঁ। (১৭৫১—৫৩ খ্রীঃ)

ইনি বোধ হয় চতুর্থ নায়েব। ইঁহার পিতার নাম আকা বাকর খাঁ। শাসনকাল ১১১৩ মঘীর চৈত্র—১১১৫ মঘীর ভাদ্র (মোং ১১৬০ বাঙ্গালা ভাদ্র) পর্য্যন্ত, এক বৎসর ছয় মাস। বকসীর নাম নাই।—দেওয়ান—চৈতন কিষণ (কৃষ্ণ ?)।

২৯। মহা সিং। (১৭৫৩—৫৮খ্রীঃ)

ইনি পঞ্চম নায়েব। শাসনকাল মাহ আশ্বিন ১১১৫—মাহ আষাঢ় ১১২০ মঘী, (মোং ১১৬৫ বাঙ্গালা ?), চার বৎসর দশ মাস। ইনি নবাব মহব্বত

জঙ্গ আলিবর্দ্দীর আমলে এক বৎসর, সিরাজুদ্দৌলার আমলে এক বৎসর, এবং নবাব জাফর খাঁর আমলে এক বৎসর দশ মাস নায়েবী করেন। ইঁহার দেওয়ান বা বক্সীর নাম নাই।

৩০। নবাব আকা মহম্মদ নেজাম। (১৭৫৮—৫৯ খ্রীঃ)

মহা সিংহের পর ইনি নায়েব হইয়া আসেন। শাসনকাল ১১২০ মঘীর শ্রাবণ—১১২১ মঘী (মোং ১১৬৬ বাঙ্গালা ?), এক বৎসর দুই মাস। বক্সীর নাম নাই। দেওয়ান—বাঙ্গালী লাল।

৩১। নবাব মীর মহম্মদ রেজা খাঁ। (১৭৫৯—৬০ খ্রীঃ)।

ইনিই বাদশাহী আমলের শেষ নায়েব। ইঁহার হস্ত হইতেই চট্টগ্রাম ইংরেজ কোম্পানীর হস্তে আইসে। রেজা খাঁকে 'মুজঃফর জঙ্গ' উপাধি দান করিয়া মুরশিদাবাদের নায়েব-নাজিম নিযুক্ত করা হয়। তাঁহার নায়েবীর সময়ে রাম সিংহ বা রামশঙ্কর দেওয়ান ছিলেন। বক্সীর নাম অজ্ঞাত। এই সময়ে মহম্মদ হাসেম দারোগা ছিলেন।

রেজা খাঁর পর ১১২২ মঘী, ১১৭৬ বাঙ্গালা, বা ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে, মিঃ হারি ওয়ার্লচ চট্টগ্রামের 'হাকিম আমলদার' হইয়া আসেন। লোকে ইঁহাকে 'বড় সাহেব' ও মিঃ মারিটকে 'ছোট সাহেব' বলিত। এই সময়ে মিঃ রেনল বক্সী ও গোকুলচান্দ ঘোষাল দেওয়ান ছিলেন।

চট্টগ্রামের নিম্নলিখিত গ্রামগুলির নামের সহিত প্রাগুক্ত কোন কোন নবাবের বা দেওয়ান প্রভৃতির কিছু না কিছু সংস্রব থকিবার সম্ভাবনা। যথা,—রশিদাবাদ, জাফরাবাদ, জাফরনগর, মুজাফারাবাদ, এয়াকুবনগর, রহমতগঞ্জ, বসারতনগর, মাহামুদাবাদ, হাছনদণ্ডী, নেজামপুর (চাকলা), সুলতানপুর, ফতে খাঁর ঠোণ্ডা, ইত্যাদি। অনুসন্ধান বাঞ্ছনীয়।

শ্রীআবদুল করিম।

স্মৃতি।

১

প্রশান্ত সুনীল নভঃ,
মধুর পবন বায় ;—
যে দিকে ফিরাই আঁখি,
দিকবালা হাসি চায়!

২

নশ্বর্ গ্রাসেতে ঢাকা
ধরণীর ভরা বুক ;
হেথা হোথা ফুল-বধূ
তুলিছে সলাজ মুখ।

৩

সমুখেতে তরঙ্গিণী
শত হাসি মুখে ফুটে,
দূরে শুভ্র পাল তুলে
তরীগুলি যায় ছুটে।

৪

কোথা সুখে ডাকে পাখী
পূর্ণ-কণ্ঠ—উতরোল,
দিবারে উজ্জ্বল করি
কল্পনারে দিয়া দোল।

৫

ফুটন্ত ফুলের মত,
নগ নদী নভ বন
হাসিছে—পড়িছে ঢলি
কি মোহ পরশে মন।

৬

এমন সুন্দর ছবি,
পুলক আলোক, হায়!
কোন মায়া-মন্ত্র-বলে
আঁখি হ'তে সরে যায়?

৭

কোথা হ'তে উঠে স্মৃতি
কুহেলিতে ঢাকে সব।
এসেছিনু হেথা কভু?
শুনেছিনু এই রব?

৮

অতীত কাহিনী এ কি?
গত জীবনেরকথা?
কি বিষাদে মাখা সুখ!
কি আনন্দে ভরা ব্যথা!

৯

সঙ্গীত-মাধুর্য্যে হারা
মুগধ হৃদয় যথা,
বর্ত্তমানে ভুলি ভাবে
কোন ছায়াপথ-কথা,

১০

চোখে আসে কোন ছবি,
মনে পড়ে কোন কথা!
কি মিলনে মাতে প্রাণ,
জাগে কি বিরহ-ব্যথা!

১১

তেমনি হে বনভূমি,
দেখিয়া তোমার মুখ
কোন স্মৃতি প্রাণে এল?
জাগিল কি সুখ-দুখ?

১২

বিচিত্র মানব-মন!—
আঁধার অতলে তার
হারাণ মাণিক কত,—
সুদূর-কাহিনী-ভার!

১৩

কবে—কোথা—কোন বাণী
কোন আলো—কোন ঠাঁই
হঠাৎ জাগায়ে তোলে
অতীতে ভাসিয়া যাই।

শ্রীপ্রিয়নাথ সেন।

বিচিত্র বন্ধন।

১

উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের—আধুনিক যুক্ত প্রদেশের একটি বড় সহরে আমরা এক ঘর সামান্য গৃহস্থ ছিলাম। সরীকদিগের সহিত মোকদ্দমার পর যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, তাহা বিক্রয় করিয়া কলিকাতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক বাবা এই-খানে আসিয়া ডাক্তারী ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন, এবং একটি ডাক্তারখানা স্থাপন করেন। পশার কিছু জমিয়া আসিলে অপেক্ষাকৃত অধিক বয়সে এই দেশে-রই প্রবাসী এক ঘর বাঙ্গালী পরিবারে বিবাহ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর আমাদের সংসারে এখন মা, আমি, আমার ছোট ভাই বীরেন, আমাদের মানুষ করা ঝি জান্‌কী ও বাবার পুরাণ চাকর কীর্ত্তিবাস।

আমাদের ঐশ্বর্য্যের মধ্যে যমুনার ধারে আমাদের কোঠা গৃহখানি, একটি গাভী, ডাক্তারখানার মাসিক আয় গুটি পঞ্চাশ টাকা, মার চার পাঁচখানি অলঙ্কার ও প্রায় তিন শত টাকা দেনা, এবং মা সুদে খাটাইতেন যে নগদ এক শত টাকা, তাই।

তাঁহার মৃত্যুর পর হইতে বাবার বন্ধু মাষ্টার মশায়ই ডাক্তারখানা দেখেন। বীরেন স্কুলে যায়, আমি রন্ধনাদি করি, জান্‌কী জল তোলে, বাটনা বাটে, আটা ভাঙ্গে, গরুকে জাব দেয়, এবং অবসরকালে সুতা কাটিতে কাটিতে মার সঙ্গে গল্প করে। মা বড়ী দেন, আচার, আমসত্ত, কাসুন্দি করেন, এবং সন্ধ্যার পর খানিক করিয়া মাষ্টার মশায়ের স্ত্রীর সঙ্গে গল্প করিতে যান, এবং জান্‌কীর সঙ্গে পরামর্শ করেন—সে আমার ছেলের ঝি হইবে, না বীরেনের ছেলেদের মানুষ করিবে। জান্‌কী দু কূল রাখিয়া জবাব দেয়,—"কি জান মা, তোম্‌-হার বেটী ত পরের ঘরে যাবে, তাদের কি আর জান্‌কী বুঢ়ীর কাম পছন্‌ হোবে? হামার দাদা বাবুর লেড়কা হামাকে ফুপী বলবে, হামি ওনাদের থাকব; কি বোল্‌ দিদিমণি?" কীর্ত্তিবাস সমস্ত দিন ডাক্তারখানার কাজ করে, রাত্রে বীরেনকে আগলাইয়া বাবার ঘরে শুইয়া থাকে, এবং গল্প বলিতে বলিতে অত্যন্ত ঝিমায়।

আমি বীরেনের মত অত গৌরবর্ণ নই; তবে শুনিতে পাই, কালোর উপরেও নাকি আমার খুব শ্রী। আমরা জাতিতে ব্রাহ্মণ,—কুলীন।

২

বাবার মৃত্যুর পর এইরূপে আমাদের দুই বৎসর কাটিয়া গেল। আমার বয়স এখন চতুর্দ্দশ বর্ষ। মাষ্টার মশায়ের পরিবার আজ কাল মাকে প্রায়ই বলেন—শুনিতে পাই,—"হ্যাঁগা দিদি, মেনীকে আরও কত বুড়ো ক'রে বিয়ে দেবে? মেয়ে অত বড় ডাগর হয়ে উঠল, আরও কি ওর বে' না দিলে চলে?" মা বলেন, "ফুল ফুটলেই হ'বে বোন! মানুষের ত আর হাত নয়। তা ছাড়া, তোমার কর্ত্তাটির চেষ্টাও ত খুব!" অপ্রতিভ হইয়া মাষ্টার মশায়ের স্ত্রী সন্ধ্যার পর মাষ্টার মশায়কে পাঠাইয়া দেন। এবং তিনি আসিয়া বীরেনকে দিয়া বলান, "যদি সে সম্বন্ধটায় গিন্নীর মত থাকে ত সেইটেই না হয় ঠিক ক'রে ফেলা যায়; বল না বীরুবাবু। সত্যি, মেন্‌কী বুড়ী দেখতেও ত ডাগরটি হ'য়ে উঠেছে।" মা বলেন, "বেশ ত, হ'ক না।" কিন্তু আসল কথা, দরিদ্র কুলীনকন্যাকে কেহই বিবাহ করিতে সম্মত হয় না। সুতরাং মাসখানেক হয় ত আবার অমনি চলিয়া যায়, এবং আমিও বাঁচি। বিবাহের কথা আমার তেমন ভাল লাগিত না। বিশেষতঃ, পুত্রের বিবাহ দিয়া মাষ্টার মশায়ের স্ত্রী যে বাবু বধূ আনিয়াছিলেন, তাহার সামান্য অসাবধানতার কারণ ঘটিলেও তাহার পিতা মাতাকেও যারপরনাই লাঞ্ছিত করিতেন। তাই আমার মনে ভয় হইত, যদি এইরূপ তুচ্ছ কারণে আমার শাশুড়ী আমার মা বাপের এইরূপ লাঞ্ছনা করেন, যদি বরদাস্ত করিতে না পারিয়া আমি তাঁহাকে তুল্য রূঢ় কথা শুনাইয়া ফেলি, তবে তাহার কি পরিণাম হইবে! পশ্চিমে বাঙ্গালীর মেয়ে বলিয়া বোধ হয় অকারণে অপমানিত হইলে তাহার প্রতিবিধানে উত্তেজিত সিংহীর মত রুখিয়া দাঁড়াইবার এই ভাব আমার প্রবল ছিল। অথচ আমার নাম প্রসন্নময়ী।

৩

এইরূপে আরও দুই বৎসর কাটিয়া গেল, তবু আমার বিবাহ হইল না। বোধ করি সম্বন্ধ জুটিল না। অনেক দিন অবধি মাষ্টার মশায়ের স্ত্রীর তীর্থভ্রমণের কামনা প্রবল হইয়া উঠিতেছিল, কিন্তু তিনি সঙ্গী পাইতেছিলেন না। আমার বিবাহের এখনও বিলম্ব আছে, এবং তিনি নিজে মার কতক খরচ বহন করিবেন আশ্বাস দিয়া, মাকেও তীর্থভ্রমণে বাহির করিলেন। মার যে সামান্য নগদ পুঁজি ছিল, তাহাতে হাত পড়িল। মাষ্টার মশায় অমত করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার স্ত্রীই প্রবলা, সুতরাং তাঁহার সদ্‌যুক্তি আর

দ্বিতীয়বার মাথা তুলিতে পারিল না। সঙ্গে গেল কীর্ত্তিবাস ও মাষ্টার মশায়ের মধ্যম পুত্র ক্ষেতু। ক্ষেতু একলাই এক শ', এবং এ সকল কাজে বিশেষ পটু। তীর্থে প্রায় দুই তিন মাস কাটিয়া গেল।

একেই ত মার শরীর কখনই ভাল ছিলনা। তাহার উপর আবার কষ্টের তীর্থের নাছোড়বন্দা সহচর কঠিন পীড়া সঙ্গে করিয়া ফিরিলেন। প্রথম যেমন হইয়া থাকে, তাহাই হইল। 'নাইতে খেতে যাবে' ভাবিয়া রোগকে প্রথমে উপেক্ষাই করা হইল। তার পর যখন দেখা গেল, 'নাইতে ও খেতে' দেওয়াতেই রোগ আরও ভাল করিয়া আসর জমাইয়া বসিল, তখন ডাক্তার আনিয়া তাহাকে তাড়াইবার ব্যবস্থা হইল। কিন্তু রোগ তখন কিছুতেই অধিকারচ্যুত হইতে চাহিল না। তাহার উপর আবার ডাক্তারই বা কোথায়! ডাক্তার ডাকেই বা কে? মা ফিরিবার পূর্ব্বেই মাষ্টার মহাশয় কন্যার সাংঘাতিক পীড়ার সংবাদ পাইয়া কলিকাতায় গিয়াছেন। তাঁহার স্ত্রীও তীর্থ হইতে ফিরিয়া আসিয়া ক্ষেতুকে সঙ্গে করিয়া কন্যাকে দেখিতে গেলেন। বঙ্কু বাবু, মাষ্টার মশায়ের বড় ছেলে, সিমলা পাহাড়ে চাকরী করেন। সুতরাং থাকিবার মধ্যে এক কীর্ত্তিবাস, বীরেন ও মাষ্টার মশায়ের ছোট ছেলে হরি। আর ডাক্তারের মধ্যে, কলিকাতা হইতে হাওয়া খাইতে আসিয়াছিলেন প্রায় ত্রিশ বৎসরের এক যুবা অনুকূল বাবু,—মাষ্টার মশায় কলিকাতা যাইবার সময় তাঁহাকে আমাদের ডাক্তারখানার ভার দিয়া গিয়াছিলেন। ইনিই মার চিকিৎসা করিতেছিলেন, এবং তাঁহার চেষ্টারও ত্রুটি ছিল না। দিনে রাতে নিজে আসিয়া ঔষধ খাওয়াইতেন; এবং রোগিণীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া পুস্তকের সহিত রোগের লক্ষণ মিলাইবার কালে নানা গল্পে রোগযন্ত্রণাতুরার কষ্টলাঘব করিতেন। আমার মাকে যে তিনি এত অল্প সময়ে ও এত সহজে নিজের মায়ের মত করিয়া লইতে পারিয়াছিলেন,—আমার মনে হয়, অযথা সঙ্কোচের প্রতি তাঁহার আন্তরিক ঘৃণাই তাহার কারণ। কলিকাতাবাসী হইয়াও তিনি এই চরিত্রগত গুণ কোথা হইতে লাভ করিলেন, তাই ভাবিয়া আমি বিস্মিত হইতাম।

মার অবস্থা ক্রমে অত্যন্ত মন্দ হইতে লাগিল। একদিন অনুকূল বাবু কোনও নিকটবর্ত্তী সহর হইতে তার করিয়া ভাল ডাক্তার আনাইবার জন্য ব্যস্ত আছেন, এমন সময়ে হঠাৎ মা তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, এবং তিনি আসিলে বলিলেন, "বাবা অনুকূল, একবার পাঁজীখানা আনাও ত।"

মাষ্টার মশায়দের ইঁদারা হইতে কাপড় কাচিয়া আসিবামাত্র জান্‌কীর চার বছরের নাত্‌নী পার্ব্বতী বাঙ্গালা-মিশ্রিত ভাঙ্গা-ভাঙ্গা হিন্দীতে আমায় বুঝাইয়া দিল, আমি কাপড় কাচিতে যাইবার পর মা ও অনুকূল বাবু পরস্পরের হাত ধরিয়া বিস্তর কাঁদিয়াছেন, এবং মা অনুকূল বাবুর মাথায় হাত দিয়া আরও কত কি বলিয়াছেন। ইহাতে অবশ্য বিস্ময়ের কিছু ছিল না; কেন না, আমি অনেক দিন হইতেই বুঝিয়াছিলাম, আমাদের সুখের বাসা ভাঙ্গিয়া পড়িবার আর বড় বিলম্ব নাই। মাও তাহা বুঝিয়াছিলেন। আমিও মাকে লুকাইয়া কাঁদিতাম; মাও তাই আমাকে লুকাইয়া অনুকূল বাবুর নিকট কাঁদিতেছিলেন। কিন্তু তাহার পরদিন যাহা ঘটিল, তাহার বিস্ময়ের পরিমাণ নিরূপণ করিতে পারিবার পূর্ব্বেই দেখিলাম, আমি অনুকূল বাবুর পরিণীতা সহধর্ম্মিণী হইয়াছি। লজ্জায় ও ঘৃণায় আমি মরিয়া গেলাম। বিবাহের কি এই সময়, না এই অবসর? পূর্ব্ব দিন মার পাঁজী আনিতে পাঠাইবার অর্থ বুঝিলাম। জান্‌কীর পুত্রবধূ বাসন্তী আমাকে পশ্চিমে রকমে কনে করিয়া সাজাইয়া দিল। বীরেন মন্ত্র পড়িয়া আমায় সম্প্রদান করিল। অনুকূল বাবু বিষাদগম্ভীরমুখে মন্ত্র পড়িয়া আমায় গ্রহণ করিলেন। অপরিচিত পুরোহিত উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। মাতার অন্তিমশয্যার পার্শ্বে সাশ্রুনয়নে আমার বিবাহ হইয়া গেল।

মার কণ্ঠ তখন রুদ্ধ হইয়া আসিয়াছে। তিনি কিছু বলিতে পারিলেন না, কেবল হাত তুলিয়া উপরের দিকে দেখাইলেন, এবং আমাকে আমার স্বামীর হাতে সঁপিয়া দিলেন। অবিরলধারে তাঁহার চক্ষে অশ্রু ঝরিতে লাগিল। আমার তখনকার অবস্থা ভাষায় প্রকাশ করিবার নয়।

ফাল্গুন মাসের রাত্রি। পূর্ণিমা। কিন্তু এ অবস্থায় বাসর-যাপন শোভনও নয়, সম্ভবও নয়। তবু বাসন্তী ছাড়িল না; চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল, "নহিলে মঙ্গল কাজে অশুভ হ'বে।" লজ্জাহীন পূর্ণিমার চাঁদ আমার লজ্জা লুকাইবার আবরণটুকুও যেন কাড়িয়া লইতে উদ্যত হইল।

প্রায় আধ ঘণ্টা বাসরে ছিলাম, সমস্ত ক্ষণই বিছানায় মুখ লুকাইয়া কাঁদিয়াছিলাম। স্বামীর অলক্ষ্যে তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া বোধ হইয়াছিল, তিনিও কাঁদিয়াছিলেন। বাসরের প্রথম পরিচয়ে স্বামী করুণাবিকম্পিতকণ্ঠে দুটিমাত্র কথা কহিয়াছিলেন,—"কেঁদ না, ছি, চুপ কর।" আর,—"এখন শেষ রক্ষে হ'লে হয়।" তখন তাঁহার সে কথার অর্থ বুঝি নাই।

আজও তাঁহার সেই কণ্ঠস্বর মনে পড়ে। তাহা অত্যন্ত করুণ, অথচ অত্যন্ত গম্ভীর ও দৃঢ়।

আমাদের বিবাহের পর চব্বিশ ঘণ্টা উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব্বেই আমার স্নেহময়ী মার স্বর্গপ্রাপ্তি ঘটিল।

৪

ইহার প্রায় তিন মাস পরে মেডিকেল কলেজে তাঁহার অধ্যয়ন সমাপ্ত করিতে আমার স্বামী কলিকাতায় চলিয়া গেলেন। আমি ও বীরেন মাষ্টার মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে রহিলাম। ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া স্বামী আবার যখন ফিরিয়া আসিলেন, খোকা তখন চার মাসের। ছ' মাসে পড়িলে তাহার অন্নপ্রাশন হইয়া গেল। জান্‌কী ও বাসন্তীর জেদে খোকার নাম হইল, বাবুলাল। সে দেখিতে খুব সুন্দর হইয়াছিল।

মার স্নেহের প্রভাব শীতের রৌদ্রের মত যে মাধুরী ও মধুর উত্তাপ দিয়া আমাদিগকে উজ্জ্বল ও সুখতপ্ত করিয়া রাখিয়াছিল, তদ্ব্যতীত আর সমস্তই পূর্ব্বের মত চলিতে লাগিল। কিন্তু আমি বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিলাম, আমার স্বামী খোকাকে যথেষ্ট আদর করিতেন, আমাকেও যত্ন করিতেন, এবং বীরেনের পড়াশুনা ও ডাক্তারখানার তত্ত্বাবধান প্রভৃতি কোন কর্ত্তব্যেই তাঁহার অবহেলা ছিল না; কিন্তু আমার মনে হইত, সে সকলই যেন কর্ত্তব্যের খাতিরে; তাহার ভিতর প্রাণ ছিল না। সে কর্ত্তব্য যেন পাঁচড়া-প্রস্ত রোগীর মত আড়ষ্ট, মুক্তপক্ষ বিহঙ্গের ন্যায় সহজ, স্বাভাবিক, স্বাধীন নয়। অধিকন্তু এত স্বাস্থ্যকর প্রদেশে থাকিয়াও তিনি যেন দিন দিন আরও ক্ষীণ হইয়া যাইতে লাগিলেন। আমি প্রসঙ্গক্রমে এ কথার উত্থাপন করিলে তাহার উত্তরে তিনি কেবল একটু হাসিতেন, কিন্তু সে হাসিতে তাঁহার বিষাদ ও মলিনতা যেন আরও সুস্পষ্ট হইয়া উঠিত। চার মাস পরে আমরা সপরিবারে কলিকাতা যাইব, স্থির হইয়া গেল। বীরেনও কলিকাতায় থাকিয়াই পড়াশুনা করিবে, তবে আপাততঃ নয়,—আরও চারি পাঁচ মাস পরে। আমার স্বামীর সদ্ব্যবহারে ও খোকার প্রতি তাহার মমতার বশে জান্‌কী বীরেনের ছেলের ঝি হইবার কথা একেবারে ভুলিয়া গেল, এবং আমার সহিত কলিকাতায় আসিবার জন্য প্রস্তুত হইল; কিন্তু আসিবার দু দিন আগে জ্বরে পড়ায় আমাদের সঙ্গে আসিতে পারিল না।

একে প্রায় দুই দিনের পথ, তাহার উপর আবার সঙ্গে ছোট ছেলে; তেমন

লোক জনেরও অভাব; সুতরাং আমার স্বামী একখানি গাড়ী রিজার্ভ করিলেন। শুভদিনে শুভক্ষণে সিন্দূর ও দধির ফোঁটা পরিয়া, নারায়ণকে স্মরণপূর্ব্বক বাম পদ বাড়াইয়া যাত্রা করিলাম। হর্যবিহ্বলচিত্তে স্বামীর সঙ্গে শ্বশুর-ঘর করিতে চলিলাম। নারীজন্মের ইহাই পরিণতি। যাত্রাকালে আমার দক্ষিণ চক্ষু স্পন্দিত হইতেছিল। শঙ্কিতচিত্তে আমি পিতৃগৃহ ত্যাগ করিলাম।

৫

কলিকাতা পঁহুছিবার মধ্য পথে গাড়ীতে স্বামীর মুখে যাহা শুনিলাম, তাহাতে আমার মূর্চ্ছার উপক্রম হইয়াছিল। কিন্তু মূর্চ্ছিত না হইয়া আপনাকে সামলাইয়া লইলাম। তখন নিমেষের মধ্যে আমার বিবাহের সকল ঘটনা মনে পড়িয়া গেল। বাসরঘরের প্রথম আলাপে স্বামী বলিয়াছিলেন, "এখন শেষ রক্ষা হ'লে হয়।" এখন তাহার অর্থ বুঝিলাম। বুঝিলাম ও শুনিলাম, আমার এক সপত্নী বিদ্যমান! আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া যখন বুঝিলাম যে, রূপের জন্য নয়,—কেন না, আমি সুন্দরী নহি;—বা অর্থলালসার জন্যও নয়,—কেন না, আমরা দরিদ্র,—কেবলমাত্র অনাথিনী, রোরুদ্যমানা, মুমূর্ষু বিধবার অন্তিমকালের অনুরোধে আমাদেরই জাতি রক্ষা করিবার জন্য আমার স্বামী আপনাকে এইরূপে বিপন্ন করিয়াছেন, এবং আমার সপত্নী আমার অপেক্ষা সুন্দরী ও ধনাঢ্যের কন্যা, তখন তাঁহার প্রতি আমার অকৃত্রিম শ্রদ্ধা আরও বাড়িয়া গেল। কিন্তু তিনি অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে শান্ত করিলাম, বলিলাম, "শোন,—আমি যা বলি, তাই কর; এখন আর উপায় নাই।" তোমরা আমাকে মুখরা ও বাচাল মনে করিতেছ, কিন্তু কি করিব, বোধ করি নারীর স্বভাবই এই।—আমি বলিলাম, "তোমার পরামর্শ যুক্তিযুক্ত নয়। আমি অন্য বাড়ীতে যাইব না, তোমার বাড়ীতেই থাকিব। বরং আপাততঃ তোমার বন্ধুপত্নীর পরিচয়ে উঠিব। পরে কি হয়, দেখা যাইবে।" তাহাই ঠিক হইল। সংসারানভিজ্ঞা মাতৃহীনা অপরিচিতা অন্তঃসত্ত্বা বিস্ময়বিহ্বলা বালিকা সপত্নীর অধীনে শ্বশুরগৃহে স্বামী ভাগ করিয়া লইতে চলিলাম। অবশিষ্ট পথটুকু ভয়, বিস্ময়, আত্মবিশ্বাস ও সকলের অধিক কৌতূহলে আমার বেপমান বক্ষ বিদীর্ণ হইতে লাগিল।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে কম্পিতপদক্ষেপে স্পন্দিতহৃদয়ে স্বামিগৃহে অবতীর্ণ হইলাম। গাড়ীতে আসিতে আসিতে আমার সপত্নীর আদর্শ কল্পনায় অঙ্কিত করিয়া-

ছিলাম, তাহাকে চাক্ষুষ করিয়া দেখিলাম, আমার কল্পিত মুখসের সহিত আসলের অত্যন্ত প্রভেদ। পশ্চিমেও অনেক সুন্দরী দেখিয়াছি, কিন্তু এমন জ্যোতির্ম্ময় লাবণ্য, এমন অপরূপ মাধুর্য্য, এমন বিচিত্র সৌন্দর্য্য আমার চক্ষে কখনও পড়ে নাই।

তোমাদের কাছে সকল কথা সত্য বলিব কি? তোমরা কি আমার তখনকার মনের অবস্থা বুঝিতে পারিবে? আমি নিজেই তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে পারি না। তবে এইটুকু বুঝিতে পারি যে, তখন আমার বক্ষে ভাবের যে আকস্মিক উদয় ও দ্রুত বিলয় ঘটিতেছিল, তাহা স্বাভাবিক নিয়মের অনুযায়ী নয়। শারদ গগনে যেমন কোন বিচার না করিয়া এই রৌদ্র ও পরক্ষণেই মেঘ দেখা দেয়, তখন আমার মনেও সেইরূপ বিপরীত ভাবের সঞ্চার হইতেছিল। তাই মনে মনে আমার সপত্নীর রূপের প্রশংসা করিবার সঙ্গে সঙ্গে আমার স্বামীর উপর অকারণ হঠাৎ অত্যন্ত রাগ হইল। তর্ক করিয়া দেখিতে গেলে এ রাগের কোনও কারণ ছিল না। কিন্তু আমার মনে হইল, আমার সপত্নী যখন এত সুন্দরী, তখন নিশ্চয়ই তিনি আমায় ভালবাসিতে পারিবেন না;—তবে কুরূপা দেখিয়াও আমায় বিবাহ করিলেন কেন? চরিত্রের মহত্ত্ব? সে কেবল উচ্ছ্বসিত আবেগের বিকারমাত্র। পরক্ষণেই ভাবিলাম, তাও কি হয়? তা যদি হইত, তাহা হইলে এই যে কত কুরূপ স্ত্রীলোকের স্বামী রূপজ মোহে আকৃষ্ট হইয়া বিপথগামী হয়, কিন্তু কই, তাহাদের স্ত্রীর প্রতি ভালবাসা ত একেবারে যায় না। ফিরিয়া পাইতে দু দিনের স্থলে দশ দিন হইতে পারে, কিন্তু সে ভালবাসার তাঁবাদি নাই। তোমরা হাসিতেছ, কিন্তু আমার মত অবস্থায় পড়িলে তোমাদের মনে কি হইত, আমার একবার দেখিতে ইচ্ছা হয়।

এইরূপ সন্দিগ্ধহৃদয়ে, বন্ধুপত্নীর ছদ্মবেশে, সপত্নীভবনে আসিয়া উঠিলাম। আমার শ্বশুর শাশুড়ী কেহ ছিলেন না।

৬

অধিকার লইয়া পরস্পরের মধ্যে কোনও সংস্রব না থাকিলে একে অন্যকে আপনার করিয়া লইতে কুণ্ঠিত হয় না। আমাদের দুই জনের মধ্যে সম্পর্কগত যে বৈষম্য ছিল, আমার সপত্নী তাহা জানিত না; সুতরাং আমাকে নিতান্ত আপনার করিয়া লইতে তাহার বড় বিলম্ব হইল না। অতি সহজেই সরলা অসন্দিগ্ধা সন্তান-বৎসলা করুণাময়ী বন্ধ্যা নারী নিজের সপত্নী-পুত্রের মা হইয়া

উঠিল। স্বামী বাহিরের ঘরে শয়ন করিতেন। আমরা দুই জনে এক ঘরে থাকিতাম; স্তন্যদান ভিন্ন খোকার আর কিছু আমি করিতে পাইতাম না। সেবায় দাসী ও স্নেহে জননী হইয়া বিনা কলহে আমার সপত্নী কখন কোন অজ্ঞাত মুহূর্ত্তে আমার মাতৃ-অধিকার আত্মসাৎ করিল, আমি তাহা জানিতেও পারিলাম না। কেবল এইটুকু অনুভব করিলাম, আমি আর আমার গর্ভজাত সন্তানের জননী নহি,—ধাত্রী মাত্র। সর্ব্বপ্রকারে তাহার মাতার লজ্জার মাত্রা বাড়াইবার জন্যই যেন খোকাও তাহার বিমাতার অত্যন্ত অনুগত ও অনুরক্ত হইয়া উঠিল। মুহূর্ত্তের জন্যও সে আমার সপত্নীকে চোখের আড়াল হইতে দিত না। আমি একদিন সুবিধা বুঝিয়া অতি সন্তর্পণে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"আচ্ছা দিদি, খোকা যদি তোমার সতীন-পো হ'ত, তা হ'লে কি তুমি ওকে এত ভালবাসতে?"—অসন্দিগ্ধা নিঃসঙ্কোচে উত্তর করিল, "পাগলী আর কি! ভালবাসা কি সোনা পিতল বিচার করে? এমন বাঁধন কি আর আছে রে! —তুই ছেলেমানুষ—কি জানবি বল্!" আমি এ প্রসঙ্গে আর দ্বিতীয় কথা কহিতে সাহস করিলাম না। তবে বিলক্ষণ বুঝিতে পারিলাম যে, মুক্তকণ্ঠা মুক্তহৃদয়াও বটে। আমার সপত্নী আমা অপেক্ষা প্রায় ছয় সাত বৎসরের বড়।

বন্ধ্যার সন্তানের লোভ অত্যন্ত প্রবল; তাই আমাদের মধ্যে এমনও ঠিক হইয়া গেল যে, এবার যদি আমার কন্যা হয়, তবে সে তাহার হইবে; পুত্র হইলে আমার থাকিবে।

৭

আমাদের উভয়ের সম্পর্কের মধ্যে বিষের যে কণা চাপা ছিল, তাহা আমার সপত্নীকে স্পর্শ করে নাই। সে জন্যও বটে, এবং খোকার প্রতি তাহার স্নেহাতিশয্যের ফলে ও নিজের মিষ্ট স্বভাবের গুণেও বটে, আমাদের সংসারে দুঃখ ছিল না। আমার দায়িত্ববোধ ছিল, এবং আমাদের দুই জনে কি সম্পর্ক, তাহাও আমি জানিতাম; সুতরাং আমি সহজেই সংসারের সামঞ্জস্য রাখিয়া চলিতে শিখিলাম; ইহাতে আমার স্বামীও যেন অনেকটা সুস্থ হইলেন। কিন্তু প্রচ্ছন্ন যাতনার গুরুভার যে একাকী নীরবে বহন করে,—শীঘ্রই হউক বিলম্বেই হউক,—তাহাকে ভাঙ্গিয়া পড়িতে হয়। আমারও তাহাই হইল। ক্রমে আমার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইল; এবং উচিত সময়ের পূর্ব্বেই আমি এক কন্যা প্রসব করিলাম। প্রসবের পরই আমার জ্বর হইল। সেই জ্বর ক্রমে প্রবল হইয়া

উঠিল; শেষে বিকারে পরিণত হইল। বিকারের অবস্থায় কয় দিন কাটিয়াছিল, স্মরণ নাই। বিকারমুক্ত হইয়া দেখিলাম, আমার গুপ্ত বেদনা যেন সারিয়া গিয়াছে। রোগশয্যায় আমার ছদ্মবেশ খসিয়া পড়িয়াছে; বীরেন ও জানকী আসিয়াছে; আমার স্বামী ধরা পড়িয়াছেন; অথচ আমি কেমন করিয়া ভাল হইব, এই চিন্তার ছায়া ভিন্ন আমার সপত্নীর প্রসন্ন মুখে বিষাদের আর কোনও নিদর্শন দেখিলাম না। তাহার সেই দিব্য হাসি, তেমনই উজ্জ্বল, তেমনই মধুর ও তেমনই অকৃত্রিম! তাহার চোখের আলো তেমনই সকরুণ; তাহার কণ্ঠের স্বর তেমনই স্নেহপূর্ণ!

ভাল করিয়া সারিয়া উঠিতে আমার অনেক দিন লাগিল। এ যাত্রা রক্ষা পাইলাম দেখিয়া আমার সপত্নী কন্যার নাম রাখিলেন,—'জীবনবালা।' বাবুলাল আমার সপত্নীকেই মা বলিয়া ডাকিত, এবং মা বলিয়াই জানে। আমি কেবল 'বৌমা'-মাত্র।

আমি অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইলে একদিন অবসর বুঝিয়া আমার সপত্নী বলিল, "ভাই মেনা, আমি সব শুনেছি। তোর দোষ কি ভাই? ওরই বা দোষ কি? আর তাতে ক্ষতিই বা কি? ও কেবল সংস্কারমাত্র। তুমি কিছু ভেব না দিদি। ভগবান করুন, তুমি সেরে ওঠ। নইলে বাবুলাল আমার শুকিয়ে যাবে।—ও যে এখনও তোর দুধ খায়।" আমার নিরীহ সপত্নীর আশ্বাসবাণী যে ঈর্ষ্যা সহচরীর শ্লেষোক্তি নয়, তাহা আমি সহজেই বুঝিতে পারিলাম। এবার মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিলাম, মুক্তকণ্ঠা মুক্তহৃদয়াও বটে।

অসম্ভব নারীচরিত্রের বিচিত্র বিকাশ! আমি আনন্দে, বিস্ময়ে, কৃতজ্ঞতায় অত্যন্ত অভিভূত হইয়া পড়িলাম। কি বলিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না, রুদ্ধকণ্ঠে সাশ্রুনয়নে তাহার কোলে মুখ লুকাইলাম।

মহানন্দা নদী।

[স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বটব্যাল এম্. এ. প্রণীত।]

এই নদী দার্জ্জিলিং জেলায় হিমালয়ের পাদদেশ হইতে উৎপন্ন হইয়া, জলপাইগুড়ী ও পূর্ণিয়া জেলার মধ্যে দক্ষিণ-পশ্চিমাস্যে বক্রগমনে প্রবাহিত হইতে হইতে, ক্রমশঃ আবার দক্ষিণ-পূর্ব্ববাহিনী হইয়াছে। এই ভাবে নদীটি আসিয়া উত্তর-পশ্চিম কোণে মালদহ জেলাতে প্রবিষ্ট হইয়াছে। কিয়ৎ-দূর মালদহের উত্তরসীমান্তে বিচরণ করিয়া দক্ষিণ মুখে জেলার মধ্য দিয়া অবশেষে গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। নদীটি মালদহ জেলাকে প্রায় তুল্যরূপে দ্বিখণ্ড করিয়াছে। বোধ হয়, সমৃদ্ধ ও ধনধান্যপূর্ণ জনপদ সকল এই নদীর তীরে বর্ত্তমান থাকায়, সংস্কৃতভাষী আর্য্যগণ ইহার 'মহানন্দা' এই নামকরণ করেন।

এ দিকে পশ্চিম দিক হইতে গঙ্গা সমুদ্রের অন্বেষণে প্রধাবিত হইয়া মাল-দহ জেলার পশ্চিমসীমান্তে হায়াতপুর নামক স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে এই স্থানে গঙ্গার স্রোত হঠাৎ দক্ষিণ মুখে বাঁকিয়াছে; কিন্তু পূর্ব্বকালে বরাবর পূর্ব্ব মুখে এই স্থান হইতে মহানন্দার তীরে পীরগঞ্জ নামক গ্রাম পর্য্যন্ত, হয় গঙ্গার মূল প্রবাহ, না হয় একটি প্রকাণ্ড শাখা, প্রবাহিত হইয়া মহানন্দার সহিত মিলিত হইয়াছিল। এই স্রোত ক্রমশঃ শুষ্ক হইয়া এক্ষণে বড়ই সঙ্কীর্ণ হইয়াছে।

বর্ত্তমান সময়ে হায়াতপুর হইতে গঙ্গার আর একটি শাখা, দক্ষিণ-পূর্ব্ব মুখে, অতীব বক্রগমনে, মালদহ নগরের সম্মুখে মহানন্দার সহিত মিলিত হই-য়াছে। কেহ কেহ অনুমান করেন,—ইহাই এক কালে গঙ্গার মূল স্রোত ছিল। কিন্তু এক্ষণে এই নদী চড়া পড়িয়া সঙ্কীর্ণ হইয়াছে; তবে বর্ষায় এখনও ইহা একটি প্রবল স্রোতস্বিনী হইয়া প্রবাহিত হয়। এই গঙ্গাস্রোতের নাম কালিন্দী। গ্রাম্য লোকে ইহাকে 'কালেন্দী' বলে।

মহানন্দার তীরবর্ত্তী প্রদেশের বিবরণ।

গঙ্গাস্রোতের সহিত পীরগঞ্জ ও মালদহ নগরের নিকটে—যে স্থানে মহা-নন্দা মিলিত হইয়াছে,—এই স্থানটিতে দুইটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন-আকার প্রদেশ পরস্-

স্পর সম্মিলিত হইয়াছে, দেখা যায়। পূর্ব্বাংশের মৃত্তিকা কঠিন আঁঠিয়াল, এবং ভূতল উচ্চ ও বন্ধুর। বর্ষাকালে মহানন্দা যখন স্ফীতকলেবরা হইয়া তীরের কাণাকাণি হয়, তৎকালে নৌকার ছাদ হইতে দেখিলে উভয় পার্শ্বের ভূমি যুগপৎ অবলোকন করা যায়। পূর্ব্বাংশে বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষের জঙ্গলে সমাকীর্ণ উচ্চাবচ উন্নত ভূতল, আর পশ্চিমাংশে নদীর কর্দ্দম ও বালুকায় নির্ম্মিত লম্বা লম্বা তৃণে সমাকীর্ণ সমতল নিম্নভূমি। বর্ষায় পশ্চিম ভাগ একবারে জলমগ্ন হয়, পূর্ব্বভাগের ভূমি কোনও কালেই জলমগ্ন হয় না। দেশীয় ভাষায় পূর্ব্ব ভাগের নাম 'কাঠাল'।

পথিক মালদহ হইতে অর্দ্ধ ক্রোশ গিয়া 'রাঙ্গামাটি' নামক স্থান হইতেই দেখিতে পাইবেন, রাস্তার দুই পার্শ্বে পুষ্করিণীর শ্রেণী। পুষ্করিণী গুণিয়া শেষ করা যায় না। এক্ষণে 'পাণা' ও 'হদে' আচ্ছন্ন হইয়াছে, কোথাও বা মজিয়া গিয়াছে। পুষ্করিণীশ্রেণী ও রাস্তার মধ্যে রাস্তার উভয় পার্শ্বেই ন্যূনাধিক চল্লিশ হাত পরিমিত ভূমি এক্ষণে সাঁওতালগণের দ্বারা আবাদ হইয়া সর্ষপের ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। এই সর্ষপক্ষেত্রে অনেক স্থানে মৃত্তিকানিখাত ইষ্টকরাশি এখনও বর্ত্তমান। ইহাতে স্পষ্টই উপলব্ধি হয়, পথের উভয় পার্শ্বে গৃহশ্রেণী ছিল,—এবং গৃহের পশ্চাদ্‌ভাগে গৃহস্থগণের ব্যবহারের জন্য পুষ্করিণী খনন করা হইয়াছিল।

প্রায় দেড় ক্রোশ অগ্রসর হইলে দৃষ্ট হইবে, একটি প্রশস্ত পরিখাপরিবৃত্ত উচ্চ মৃণ্ময় গড়। পরিখার উপরে পুল প্রস্তুত হইয়াছে, এবং রাস্তাটি গড় ভেদ করিয়া অগ্রসর হইয়াছে। গড়ের অভ্যন্তরেও এক্ষণে রাস্তার উভয় পার্শ্বে কিয়দ্দূর পূর্ব্বের ন্যায় পুষ্করিণীশ্রেণী। কিন্তু ক্রমশঃ পুষ্করিণীর সংখ্যা অল্প। গড়ের মধ্যে রাজধানী থাকায় প্রাসাদ ও বাসগৃহের আধিক্যবশতঃ ঐ পুষ্করিণীর সংখ্যার হ্রাস হইয়া থাকিবে। কিয়দ্দূর আরও অগ্রসর হইলে দেখা যায়, রাস্তার উভয় প্রান্তে ইষ্টকের বাঁধাই। সে কালে এখনকার মত রাস্তা বাঁধান হইত। এক্ষণে ইষ্টক বিছাইয়া তাহার উপর খোয়া ও রাবিশ দিয়া পথ প্রস্তুত হয়, কিন্তু সে কালে ইষ্টক খপর (?) করিয়া চূণ সুরকি দিয়া কুট্টিমের ন্যায় রাস্তা বাঁধান হইত। এই রাস্তাও ঐরূপে ইষ্টকের দ্বারা বাঁধান ছিল, রাস্তা ভগ্ন হইয়া এক্ষণে কাঁচা হইয়াছে; কিন্তু কাঁচার প্রান্তে এখনও পাকা রাস্তার ভগ্নাবশেষ ও ধূলিমধ্যে বহুসংখ্যক ইষ্টক নিপতিত থাকায় শকটে বা অশ্বে গমনে বড় ক্লেশ বোধ হয়। রাস্তার পার্শ্বে পুরাতন অট্টালিকার ভিত্তি এখনও কোথাও কোথাও দেখা যায়।

এইরূপ পথে অগ্রসর হইতে হইতে পথিক দক্ষিণ দিকে একটি প্রস্তর ও ইষ্টকে নির্ম্মিত তোরণ দেখিতে পাইবেন। তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া একটি সামান্য গ্রামের পথ। দুই পার্শ্বে সামান্য গ্রাম্য কুটীরশ্রেণী। ইহাই বর্ত্তমান 'পাঁড়ুয়ার' একটি পটী। এই পথে অল্প দূর গেলেই 'মখদূমশাহ জালাল তাব্রিজী' নামক এক মুসলমান পীরের স্থান।

এই পীরের 'বাইশ-হাজারী' নামক একটি দেবোত্তর বিষয় আছে। কেহ বলেন, বাইশ হাজার বিঘার সম্পত্তি, তাই বাইশ-হাজারী নাম; কেহ বলেন, বাইশ হাজার টাকার লভ্য ছিল, তাই বাইশ-হাজারী নাম। ফলতঃ পাঁড়ুয়ার অধিকাংশ স্থানই এই বাইশ-হাজারী দেবোত্তরের অন্তর্ভুক্ত। ইহা এক্ষণেও একটি নিষ্কর সম্পত্তিরূপে ভুক্ত হইতেছে। পীরের সেবায় এই বিষয়ের লভ্য ব্যয়িত হইবার কথা। বর্ত্তমান মুতবল্লীর নাম সৈয়দ সদরুদ্দীন। ইনি বর্দ্ধমান জেলার বোহয় গ্রামে বাস করেন। তাঁহার কর্ম্মচারীরা বাইশ-হাজারী মসজীদের তত্ত্বাবধারণ করেন।

এই মসজীদ বা 'চিলা' হিন্দু মন্দিরের ভগ্নাবশেষে নির্ম্মিত বলিয়া স্পষ্টই উপলব্ধি হয়। যে সকল প্রস্তর ইমারতে যোজনা করা হইয়াছে, তাহা পরস্পর মিল খায় না। আদিমস্বস্থানভ্রষ্ট শিলাখণ্ড সকল পরে এই মহম্মদীয় উপাসনাগৃহে যোজিত হইয়াছে বলিয়া স্পষ্টই উপলব্ধি হয়। চিলার প্রবেশ-দ্বারের দক্ষিণ পার্শ্বে একটি প্রস্তররচিত বাতায়ন, এবং চিলার বারান্দার অগ্রভাগে ছাদের যে ফলক সকল দেখা যায়, তাহাতে এইরূপই প্রতিপন্ন হয়।

পীর শাহ জেলালুদ্দীন গৌড়বিজেতা বখতিয়ার খিলজীর সঙ্গেই হউক, বা তাহার অল্প কাল পরেই হউক, মুসলমান ধর্ম্মপ্রচারের জন্য এ প্রদেশে আগমন করেন। পারস্য দেশে তাব্রিজ নগর তাঁহার জন্মভূমি থাকায় তিনি 'তাব্রিজী' নামে বিখ্যাত। ৬৪২ হিজরা ১২৪৪ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। কোথায় তাঁহার মৃত্যু হয়, তাহার ঠিকানা নাই। তাঁহার যে শিষ্য তাঁহার মৃত্যু সমাচার লইয়া পাঁড়ুয়াতে আগমন করেন, মসজিদের প্রাঙ্গনে তাঁহার কবর অদ্যাপি প্রদর্শিত হয়; কিন্তু জেলালুদ্দীনের কবর এ স্থানে নাই।

মসজীদের প্রস্তরলিপিতে প্রকাশ যে, ইহা খ্রীঃ অব্দ ১০৭৫ হিজরা ১৬৬৪ বৎসরে নির্ম্মিত। ১৩৮৪ হিজিরা ১৬৭৩ খ্রীঃ অব্দে বদ খাঁ কোতওয়াল নামক এক ব্যক্তি মসজিদের অঙ্গ বর্দ্ধিত করেন। প্রস্তরলিপিতে প্রকাশ,

আমি যে সময়ে (১৮৯২ খ্রীঃ অব্দের ১৭ই নবেম্বর) এই মসজীদ পরিদর্শন করিতে যাই, তখন শুনিলাম, ইহার মধ্যে সংস্কৃত পুঁথি এখনও বিদ্যমান আছে। মসজীদের দারোগা সৈয়দ ওআছেদ আলী আসিয়া আমাকে ঐ পুস্তক দেখাইলেন। যে গৃহে পীরের আসন, তাহারই মধ্যে একটি সিন্ধুকে পুস্তক বহুকাল যত্নের সহিত সংরক্ষিত হইয়া আসিতেছিল। মধ্যে কীটদষ্ট হইয়া দুইটি পুঁথির মধ্যে যেটি তালপত্রে লেখা, তাহা একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে ; তালপত্র সকল একেবারে গুঁড়া হইয়া গিয়াছে। দ্বিতীয়টি কাগজে লেখা, ইহাও মুড়িয়া ও জমাট হইয়া পত্রে পত্রে সংলগ্ন হইয়া গিয়াছে, হাত দিলে পত্র প্রায় খসিয়া পড়ে। অক্ষর স্থানে স্থানে অস্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। এই শেষোক্ত পুস্তকটি এখনও যত্ন করিলে উদ্ধার করা যায়। সময়াভাবে ইহাতে কি লেখা আছে, তাহা আমি অবধারণ করিতে পারিলাম না। ভাষা সংস্কৃত—অক্ষর বাঙ্গালা। কাল কালীতে লেখা।

প্রবাদ শুনিলাম, কিঙ্করনারায়ণ চৌধুরী নামে জনৈক হিন্দু একদা এই বাইশ-হাজারীর মুতবল্লী ছিলেন। নবাব—সরকার হইতে তিনি কি দলীলে মুতবল্লীর কার্য্য করেন, তাহা দেখাইবার আদেশ হয়। তিনি অপারক হওয়াতে ঢাকায় কারাবদ্ধ হয়েন। এইরূপে বিপন্ন হইয়া একদিন রাত্রিকালে তিনি পীর জালালকে স্মরণ করিয়া আপন দুঃখকাহিনী নিবেদন করেন। স্বপ্নাদেশ হইল যে, নবাবকে কহিবে যে, তিনি যে দলীল দেখিতে চাহিয়াছেন, তাহা গঙ্গা দেবীর হস্তে আছে। কল্য প্রাতে গঙ্গাতীরে গেলে দলীল দেখিতে পাইবে। নবাব যেন দলীলের নকল লইয়া দলীল গঙ্গাকে প্রত্যর্পণ করেন। নবাব এই বার্ত্তা শুনিয়া কিঙ্করনারায়ণের সহিত এক লেখককে গঙ্গাতীরে প্রেরণ করেন। তৎকালে গঙ্গার স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে দুইখানি পুঁথি আসিয়া পঁহুছিল। তাহার নকল রাখিয়া পুঁথি দুইখানি পুনর্ব্বার গঙ্গায় ফেলিয়া দেওয়া হইল। পুঁথির সেই নকলই অদ্যাবধি মসজীদে রক্ষিত হইতেছে।

পরে নবাব সন্তুষ্ট হইয়া কিঙ্করনারায়ণকে অব্যাহতি দিলেন, এবং চাঁদ খাঁ কোতওয়ালকে লক্ষ মুদ্রা সহ বাইশ-হাজারীতে প্রেরণ করিলেন। চাঁদ খাঁ কর্ত্তৃক মসজীদের কিয়দংশ নির্ম্মিত হইয়াছিল, এইরূপ প্রকাশ। মসজীদের বহির্দ্দেশে চাঁদ খাঁর কবর এখনও প্রদর্শিত হয়।

দারোগা ওআছেদ আলী, যিনি আমার নিকট এই প্রবাদ বর্ণনা করিলেন, তিনি এক জন শিষ্ট ব্যক্তি। তিনি পূর্ব্বাপর যেরূপ শুনিয়াছেন তদ্রূপই আমাকে

কহিলেন। তিনি আরও কহিলেন, অতি অল্পদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত শ্রীপঞ্চমীপূজা-কালে স্থানীয় ব্রাহ্মণ আসিয়া এই পুঁথির পূজা করিয়া যাইতেন। মসজীদের মধ্যে শ্রীপঞ্চমী পূজা! আমি অনুসন্ধানে জানিয়াছি, পাঁড়ুয়ার কিয়দ্দূর পূর্ব্বে ভক্তিপুর নামক গ্রামের ব্রাহ্মণ আসিয়া মসজীদে পুঁথির পূজা করিতেন।

অনুমান হয়, "বাইশ-হাজারী" পূর্ব্বকালে হিন্দু দেবোত্তর বিষয় ছিল, এবং ইহার সংস্পৃষ্ট কোন দেবালয় ছিল। খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে পীর জেলালুদ্দীন শাহ গৌড়বিজেতা পাঠানদের সঙ্গে আসিয়া এই দেবালয় বিনষ্ট করেন, এবং তথায় মুসলমান ধর্ম্মপ্রচারের স্থান নির্ম্মাণ করেন। কিন্তু দেবোত্তর বিষয়টি পূর্ব্বাধিকারী হিন্দুদের হস্তে কিঙ্করনারায়ণ চৌধুরীর সময় পর্য্যন্ত থাকিয়া যায়। হিন্দু দেবোত্তরের মালিকেরা এইরূপে মহম্মদীয় দেবোত্তরের মুতবল্লী হইয়া পড়েন। বিষয়ের লভ্য আর হিন্দু দেবসেবায় নিয়োজিত না হইয়া পীরের অনুচরগণের ভোগে পর্য্যবসিত হয়। অবশেষে কিঙ্করনারায়ণের সময় মোগল বাদশাহের নবাবদের দৃষ্টি তৎপ্রতি নিপতিত হয়। এবং তদবধি মুসলমান মুতবল্লীই নিযুক্ত হইয়া আসিয়াছে। বর্ত্তমান মসজীদ কিঙ্কর-নারায়ণের সময়েই নির্ম্মিত হইয়াছিল। তিনি পীড়াপীড়ি দেখিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন, অনুমান হয়।

বাইশ-হাজারী দেখিয়া পথিক পুনর্ব্বার রাজপথে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলেই বামপার্শ্বে ছয়-হাজারীর টিলা বা পীরের পীঠস্থান দেখিতে পাইবেন। একটি ইষ্টক ও প্রস্তরে নির্ম্মিত তোরণের মধ্য দিয়া প্রবেশ করিয়া সম্মুখে একটি পুষ্করিণী দেখা যায়। ইহার পার্শ্ব ইষ্টকের দ্বারা বাঁধান, এবং দুই দিকে দুইটি পাথরের ঘাট। এই ঘাটে যে সকল পাথর ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা দেখিলে স্পষ্টই প্রাচীনতর ভগ্ন প্রাসাদের মালমশলা বলিয়া উপলব্ধি হইবে। পুষ্করিণীর অপর পার্শ্বে বহুসংখ্যক কবর। তন্মধ্যে নূর কুতব আলম নামক পীরের কবর মুসলমানদের বিশেষ ভক্তির সামগ্রী। ইহার উপর একটি শামিয়ানা বিস্তৃত থাকে। ইহারই সম্মুখে কুতবের পিতা আলাউদ্দিন হকের কবর।

নূর কুতবের মৃত্যুকাল সম্বন্ধে অনেক মতভেদ দেখা যায়। কোনও কোনও গ্রন্থকারের মতে হিজরী ৮৫১—অর্থাৎ ১৪৪৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। মসজীদে একটি পুস্তক ছিল (শুনা যায়, এক্ষণে তাহা চুরি গিয়াছে।) তাহাতে তাঁহার যে মৃত্যুর কাল লিখিত আছে, তাহাতে ১৪১৪ খ্রীঃ অব্দ, ৮২৮ হিজরী হয়। ইংরেজবাজার-নিবাসী স্বর্গীয় মৌলবী এলাহি বক্স একটি কেতাব

লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। তাহাতে নূর কুতবের মৃত্যুকাল ৭ জিলকদ, ৮১৮ [মহম্মদীয়] সাল বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ইহাতে খ্রীঃ অব্দ ১৪১৫।১৬ পাওয়া যায়।*

হিঃ ৮৮৪ অব্দের ২০এ রজব তারিখে কুতব আলমের মসজীদ নির্ম্মিত হয়। প্রস্তরলিপিতে উল্লিখিত আছে, তৎকালে মহম্মদ শাহের পুত্র, বারবক্ শাহের পৌত্র য়ুসক্ শাহ রাজ্য করিতেছিলেন।

নূর কুতব আলম রাজা গণেশের সমকালীন ব্যক্তি।

কুতব আলমের স্থান প্রস্তরনির্ম্মিত অট্টালিকার ভগ্নাবশেষে পরিপূর্ণ। কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরে খোদিত একটি মকরমূর্ত্তি [মগর মাছ] এই স্থানে পাওয়া যায়; মালদহের ভূতপূর্ব্ব ম্যাজিষ্ট্রেট্ মিষ্টার কিং তাহা কলিকাতা মিউজিয়মে প্রেরণ করেন।

কুতবের স্থানের কিঞ্চিৎ উত্তরে পাঁড়ুয়ার মনোহর সোনা মসজীদের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হইবে। এই মসজীদ ৯৯০ হিজরীতে নির্ম্মিত হয় বলিয়া প্রস্তরলিপিতে প্রকাশ।

রাজপথে আরও কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে বাম দিকে "একলক্ষী" নামক মসজীদ দৃষ্টিগোচর হইবে। চতুর্দ্দিক জঙ্গলে পরিপূর্ণ; কিন্তু মসজীদটি এ পর্য্যন্ত দণ্ডায়মান। ইহাকে মসজীদ না বলিয়া সমাধিস্থান বলিলেই ভাল হয়। এটি একটি প্রশস্ত চতুষ্কোণ অট্টালিকা, এবং ইহার ছাদ একটি প্রশস্ত গম্বুজ। মধ্যে তিনটি সমাধিমাত্র বিদ্যমান। কেহ কেহ বলেন যে, একটি কবর সুলতান গিয়াসুদ্দীনের ও আর দুইটি তাঁহার পত্নী ও পুত্রবধূর। কিন্তু গিয়াসুদ্দীনের কবর সুবর্ণগ্রামেও প্রদর্শিত হয়। দ্বিতীয় প্রবাদ এই যে, কবরত্রয় রাজা জেলালুদ্দীন মহম্মদ শাহ ও তাঁহার পত্নী ও পুত্রবধূর। ইহাই সত্য বলিয়া বিবেচনা হয়। এই জেলালুদ্দীন রাজা কংশ বা গণেশের পুত্র। ইঁহার আদি নাম যদু সেন। ইনি মুসলমান ধর্ম্ম পরিগ্রহ করিয়া জেলালুদ্দীন মহম্মদ শাহ নামে রাজত্ব করেন। ইঁহার সময়ে পাঁড়ুয়ার সমৃদ্ধি অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছিল বলিয়া প্রকাশ। যিনি পাঁড়ুয়ার তাদৃশী শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন, তাঁহার পাঁড়ুয়াতেই সমাহিত হওয়া বিচিত্র নহে। জেলালুদ্দীনের সময়ে বিস্তর হিন্দু তাঁহার অনুকরণ করিয়া মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, এইরূপ শুনা যায়।

---

* খ্রীষ্টীয় ৫৯৭ অব্দ হিজরীর আরম্ভ করিয়া এই সময় নির্ণীত হয়।

'একলক্ষী' মসজীদে কোনও প্রকার প্রস্তরলিপি দৃষ্টিগোচর হয় না। প্রবাদ আছে, ইহার নির্ম্মাণে লক্ষ মুদ্রা ব্যয়িত হইয়াছিল, তাই ইহার নাম "একলক্ষী"।

এই সমাধিস্থানের প্রস্তরনির্ম্মিত দ্বারদেশে প্রস্তরে ক্ষোদিত হিন্দু বা বৌদ্ধ দেব দেবীর মূর্ত্তি লক্ষিত হয়। সে মূর্ত্তি আর গোটা নাই। উহা কাটিয়া চাঁচিয়া ফেলা হইয়াছে; তবে চিহ্ন জাজ্জল্যমান রহিয়াছে। হিন্দু বা বৌদ্ধ দেবালয়ের মালমশলা আনিয়া তাহাতে ক্ষোদিত হিন্দু বা বৌদ্ধ দেবমূর্ত্তি কাটিয়া ও চাঁচিয়া ফেলিয়া যদু সেন বনাম জেলালুদ্দীন মহম্মদ শাহের সমাধিগৃহে ব্যবহৃত হইয়াছিল। কালের কি বিচিত্র গতি!

"একলক্ষী" হইতে আরও কিয়দ্দূরে অগ্রসর হইলে সুবিখ্যাত আদিনা মসজীদের ভগ্নাবশেষ। আদিনার বিবরণ পুস্তকে পড়া অপেক্ষা চক্ষে দেখিয়া আসা ভাল। এই বাদশাহী ভজনালয় সামসুদ্দীন ইলিয়াস্ শাহের পুত্র সিকন্দর শাহের রাজত্বকালে তাঁহার আদেশে নির্ম্মিত হয়। প্রস্তরলিপিতে নির্ম্মাণের তারিখ হিজরী ৭৭০ ৬ই রজব বলিয়া লিখিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে সিকন্দর শাহের সমাধিও ছিল। তাহা এক্ষণে ভগ্ন। এই মন্দিরের আয়তন ও শিল্প কার্য্য আশ্চর্য্য। এক্ষণে এইরূপ শিল্প আর দেখা যায় না।

এই ভজনালয়ের মধ্যে প্রস্তরের স্তম্ভের উপরে "বাদশাহের তক্‌থ" রচিত হইয়াছিল, অদ্যাপি তাহার কিয়দংশ বর্ত্তমান। বাদশাহের স্তম্ভের উপরে গুম্বজমালাও অদ্যাপি বর্ত্তমান। এই "তক্‌থে" বাদশাহ, আমীর ও ওমরাগণ বসিয়া ভজন কার্য্য সম্পন্ন করিতেন।

বাদশাহের কক্ষে প্রবেশদ্বার বড় বিচিত্র। ইহা প্রস্তররচিত। ইহাতে ধাপ নাই, তবে প্রস্তরের উপর কাটা কাটা রেখা আছে। পদস্খলননিবারণের জন্য এইরূপ রেখা রচিত হইয়াছিল। প্রবেশদ্বারের শিরোভাগে যে প্রস্তরখণ্ড আজিও যথাস্থানে রহিয়াছে, তাহাতে একটি বৌদ্ধ মূর্ত্তি ক্ষোদিত ছিল। তাহা কাটিয়া ও চাঁচিয়া তাহাতে চূণ বালী লেপা হইয়া ছিল। এক্ষণে চূণ বালি খসিয়া গিয়া কাটা ও চাঁচা বৌদ্ধমূর্ত্তির অবয়ব বহির্গত হইয়াছে। আদিনার মধ্যে অন্যান্য স্থানেও পুরাতন হিন্দু দেবমন্দিরের প্রস্তর আনিয়া যোজনার স্পষ্ট চিহ্ন উপলব্ধি হয়।

"ছয়-হাজারী" ও "বাইশ-হাজারী" নামক মহম্মদীয় দেবোত্তরের স্থানীয় কর্ম্মচারিগণের বিশ্বাস যে, পাণ্ডুয়াতে পূর্ব্বে পাণ্ডবদের রাজধানী ছিল। আদিনার প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ পূর্ব্বে জঙ্গলের মধ্যে "সাতাইশ ঘর" নামক এক

অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। দীর্ঘে ২০০ হাত প্রস্থে ১৬০ হাত একটি পুষ্করিণীর কোণে এই অট্টালিকা ছিল। এই অট্টালিকা সিকন্দর শাহের প্রাসাদ ছিল বলিয়া প্রবাদ। কেহ কেহ বিবেচনা করেন, ইহা স্নানাগার ছিল। পুষ্করিণী উত্তর দক্ষিণে লম্বা। কিম্বদন্তী যে, পাণ্ডব অর্জ্জুন ইহা খনন করিয়াছিলেন।

পীর জেলালুদ্দীন শাহ তাব্রিজী যখন পাঁড়ুয়ায় আইসেন,—তখন স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে যে, পাঠানগণ কর্ত্তৃক গৌড়াধিকারের সমকালেই "পাঁড়ুয়া" একটি প্রধান নগর ছিল; কিন্তু ইহার বহু পূর্ব্বেই পাঁড়ুয়ার অধঃপাত হইয়াছিল। পাঁড়ুয়া বা পুণ্ড্রের অবনতি ও গৌড়ের উন্নতি একই সময়ে সংঘটিত হইয়াছিল। কিরূপে পাঁড়ুয়ার অধঃপাত হয়, ইতিহাসে তাহা লিপিবদ্ধ নাই। ইহা যে এক সময়ে প্রস্তরনির্ম্মিত অট্টালিকা ও দেবালয়ে ভূষিত ছিল, এবং সেই সময় যে মুসলমান রাজত্বের অনেক পূর্ব্বের সময়, ভগ্নাবশেষ সকল তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। ইহা যে এক সময়ে রাজধানী ছিল, তাহারও ভূরি ভূরি নিদর্শন রহিয়াছে। গঙ্গাস্রোতের সহিত মহানন্দার আদি সঙ্গমস্থলের নিকটেই প্রাচীন পুণ্ড্রনগর অবস্থিত ছিল। দেশের মৃত্তিকা উর্ব্বরা, এবং দুই নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত হওয়ায় বাণিজ্যেরও বিলক্ষণ সুবিধা ছিল। এই কারণে "পুণ্ড্র" রাজ্য অতি প্রাচীন কালেই ধন-ধান্যে স্ফীত হইয়া উঠে। পুণ্ড্ররাজ্য ও পুণ্ড্র নগরেই সর্ব্বপ্রথমে বাঙ্গালা দেশে সভ্যতার আলোক বিকীর্ণ হয়। পুণ্ড্রেরাই বাঙ্গালা দেশের সর্ব্বপ্রথম ঐতিহাসিক জাতি।
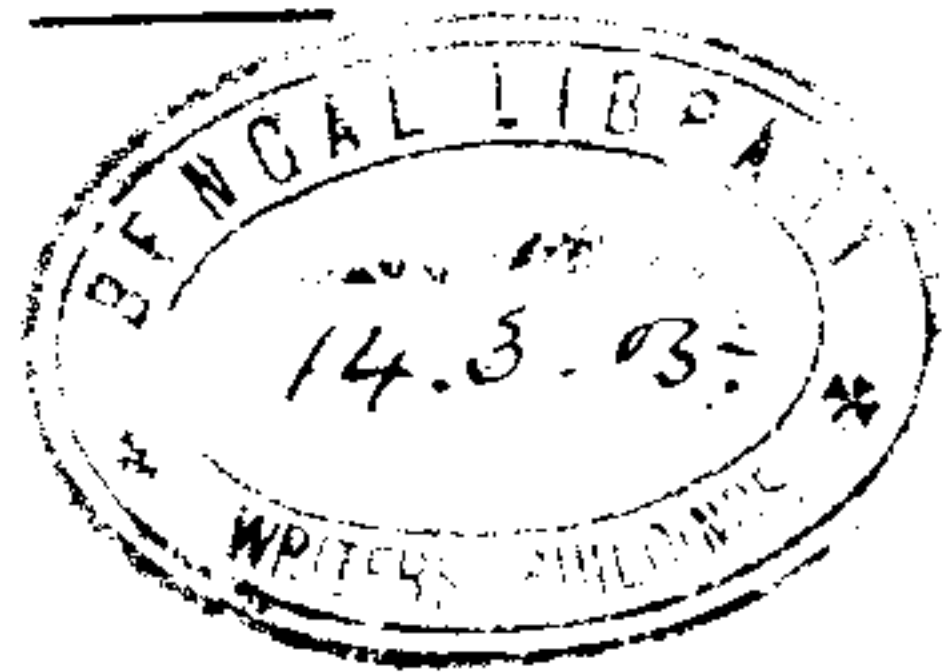
সহযোগী সাহিত্য।

জীবনচরিত।

ব্যারণ শিবুসোয়া।

"আমেরিকান্ রিভিউ অফ্ রিভিউ" পত্রে সম্প্রতি মিষ্টার স্যান্স্ জাপানের মহানুভব ব্যারন্ আইচি শিবুসোয়ার সম্বন্ধে অনেক কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। প্রবন্ধটি পরম রমণীয় ও সুখপাঠ্য। ইহাতে শিল্প বিষয়ে ব্যারন্ মহোদয়ের সর্ব্বজনবিদিত মতামতনিচয় সুপরিস্ফুটভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। শিবুসোয়া সর্ব্বপ্রথমে রাজনীতিক্ষেত্রে প্রবেশ করেন, এবং অচিরে রাজস্ব-বিভাগের সহকারী সচিবের পদে উন্নীত হন। এই সময়ে সাম্রাজ্যের সর্ব্বোচ্চশ্রেণীর পদলাভ তাঁহার পক্ষে অনায়াসসাধ্য হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু তিনি সহসা এই গৌরবদীপ্ত রাজনীতি-ক্ষেত্র হইতে অপসৃত হইলেন। পদোচিত বিপুল পুরস্কার ও প্রতিষ্ঠালাভের উচ্চাকাঙ্ক্ষা আর তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়া রাখিতে পারিল না। এক অভিনব আলোক তাঁহার নয়নে প্রতি-ভাত হইল। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, সামরিক গৌরবই জাতীয় জীবনের নিদানভূত নহে; স্থায়ী উন্নতি, সমৃদ্ধি, সভ্যতা ও অনুশীলনলব্ধ সুশিক্ষাই তাহার প্রকৃত ভিত্তিস্বরূপ। এই পদত্যাগের ও স্বার্থবিসর্জ্জনের অর্থ অধুনা আমরা যত সামান্য মনে করি, প্রকৃতপক্ষে ব্যাপারটি তদপেক্ষা অনেক গুরুতর। সে সময়ে জাপানের বণিক্ ও শিল্পিসম্প্রদায় নিতান্ত হীন ও ঘৃণাস্পদ বলিয়া বিবেচিত হইত। তৎকালে শিল্পবাণিজ্যে লিপ্ত হইলে জাতি ও সর্ব্বপ্রকার সামাজিক সম্মান হারাইতে হইত। কিন্তু উৎসাহদৃপ্ত সংস্কারকের নিকট এইরূপ সামাজিক শ্রেণীবিভাগ জাতীয় উন্নতির অন্তরায়, অন্তঃসারশূন্য, ন্যায়বিরুদ্ধ ও অবমাননাজনক বলিয়া উপেক্ষিত হইল। তিনি স্বদেশের মঙ্গলমন্দিরে আত্মোৎসর্গ করিয়া ব্যবসায় বাণিজ্যে লিপ্ত ও সমাজের নিম্নতর শ্রেণীতে অবনত হইলেন। অতঃপর তিনি আত্মপ্রভাবে ও নিজ কর্ম্মপরম্পরা দ্বারা বণিক্-সম্প্রদায়কে সমাজমধ্যে এরূপ সমুন্নত ও গৌরবান্বিত করিয়া তুলিলেন যে, এই শ্রেণীর লোকেরা সম্রাটের মন্ত্রণা-মন্দিরেও স্থানলাভ করিতে লাগিলেন। পৃথিবীর বিজ্ঞতম নরপতি সম্রাট্ মাটসুহিটো তাঁহাদিগকে নিজ সাম্রাজ্যের লর্ড ও পীয়র পদ প্রদান পূর্ব্বক আত্মগৌরব অনুভব করিলেন।

অধুনা সমগ্র জাপান দেশে ব্যারন্ শিবুসোয়ার সম্পর্কশূন্য কোন প্রকার বৃহৎ ব্যবসায়াদি দৃষ্টিগোচর হয় না। কেবল তাহাই নহে, কোরিয়া, ফরমোজা ও চীনদেশও তাঁহার অশ্রান্ত উদ্যমের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। উল্লিখিত দেশসমূহের মধ্যে, বোধ করি, কোরিয়াই তদীয় চেষ্টায় অপেক্ষাকৃত অল্পকালের মধ্যেই জাপানের ন্যায় সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিবে।

কেহ কেহ ব্যারন্ মহোদয়কে জাপানের পিয়েরপণ্ট মর্গ্যান নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে তাঁহার গৌরব তদপেক্ষা অনেক অধিক। বোধ করি, আর কোন

নেতা ও সংস্কারক এরূপ অধিকসংখ্যক ও বৈচিত্র্যবহুল ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন নাই। তাঁহার কার্য্যকলাপের বাহুল্যে ও বৈচিত্র্যে অনভিজ্ঞ লোকের চিত্ত বিকল ও বিস্ময়-বিহ্বল হইয়া পড়ে। ব্যারণ মহোদয়ের জনৈক জাপানী ভক্ত তৎপ্রবর্ত্তিত কোম্পানিসমূহ ও লোকহিতকর সভা সমিতি প্রভৃতির একটি তালিকার সংগ্রহ করিয়াছেন। তিনি নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, উহার সংখ্যা প্রায় সার্দ্ধ শত হইবে। জাপানের শিল্প-বাণিজ্য-সংক্রান্ত যাবতীয় উন্নতিকর ব্যাপার, দেশের শ্রীবৃদ্ধির মূলীভূত ও জাতীয় জীবনের কল্যাণকর বিবিধ বিষয় ও দানধ্যানাদি লোকহিতকর অনুষ্ঠানসমূহও ইহার অন্তর্নিবিষ্ট। ব্যারন্ মহোদয় জাপানী নরনারীর উন্নতি ও সাহায্যকল্পে দীননিকেতন, শিক্ষাভবন ও শিল্পবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তাঁহারই চেষ্টায় জাপানভূমি শিল্প, বাণিজ্য, নৌশক্তি ও লৌহবর্ম্ম প্রভৃতিতে পৃথিবীর একটি প্রধান দেশে পরিগণিত হইয়াছে। এইরূপ আবদানপরম্পরার সম্পাদন করিয়াও, যিনি সমগ্র জাপান দেশে সর্ব্বাধিক লোকপ্রীতি অর্জ্জন করিয়াছেন, তিনি কখনও সামান্য ব্যক্তি নহেন।

ফ্রান্সবাসীর চক্ষে কাউণ্ট টলষ্টি।

ম্যাডাম বেণ্টজন Revue des Deux Mondes নামক পত্রে কাউণ্ট টলষ্টি সম্বন্ধে একটি মনোজ্ঞ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ম্যাডাম সংপ্রতি রুষভ্রমণকালে কাউণ্ট মহোদয়ের গৃহে একদিন আতিথ্য স্বীকার করেন। লেখিকা বলেন, তিনি সাগ্রহে কাউণ্ট মহোদয়ের সাক্ষাৎকার লাভ করিবার জন্য তদীয় ভবনে উপনীত হইলে কাউণ্ট অগ্রসর হইয়া তাঁহাদিগের সংবর্দ্ধনা করিলেন। কাউণ্টের দেহ উন্নত ও বলিষ্ঠ। প্রতিকৃতি দেখিয়া লোকে তাঁহার আকৃতি সম্বন্ধে যেরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হয়, প্রকৃতপক্ষে তাঁহার মূর্ত্তি তদপেক্ষা মহিমাপূর্ণ। কোন চিত্রকরই সেই কল্পনা-কুশল উপন্যাসিকের সিংহসুলভ মস্তকের গঠন, তরঙ্গায়িত শ্মশ্রুর বিচিত্র সম্ভ্রম-ব্যঞ্জক ভাব, উদারললাটতলশোভী সামঞ্জস্যহীন মুখাবয়ব সম্যক চিত্রিত করিতে সমর্থ হন নাই। তাঁহার হাস্য কারুণ্যপ্লাবিত,-বেশ, কৃষকোচিত ও সামান্য। কিন্তু সেই সামান্য পরিচ্ছদে তাঁহার উচ্চকুলগত শিষ্টব্যবহার প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়ে নাই। লেখিকা ক্ষিপ্রতাসহকারে কাউণ্টেস্ টলষ্টির একটি বাক্য-চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন,—তাঁহাকে দেখিবামাত্র মনে হয়, এই রমণী বিষয়বুদ্ধিসম্পন্না, মধুরপ্রকৃতি ও ধীশক্তিশালিনী। তাঁহার দেহলতা এখনও যৌবনলাবণ্যে উদ্ভাসিত রহিয়াছে। তিনি পতি অপেক্ষা পঞ্চবিংশ বৎসরের বয়ঃকনিষ্ঠা, এবং ভর্ত্তৃসমীপে আত্মস্বাতন্ত্র্যরক্ষণনিপুণা হইলেও পতির বিপৎকালে অকৃত্রিম প্রীতি-শালিনী ও সহায়।

কাউণ্ট টলষ্টি ম্যাডাম বেণ্টজনের সহিত ফরাসী সাহিত্যের আলোচনাকালে অধুনাতম অতিরিক্তবাস্তব-প্রিয় লেখকদিগের প্রতি তীব্র শ্লেষাত্মক বাক্যের প্রয়োগ করেন। কিন্তু উনবিংশ

শতাব্দীর দার্শনিক লেখকদিগের—বিশেষতঃ রুসোর ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন। অপেক্ষাকৃত আধুনিক লেখকদিগের মধ্যে ব্যালজ্যাগ্‌ই তাঁহার প্রিয়। মোপাসাঁ সম্বন্ধে তিনি সমধিক আশান্বিত বটে, কিন্তু তাঁহার বিষয়নির্ব্বাচনে নৈপুণ্যের অভাব দেখিয়া কাউণ্ট মহোদয় ক্ষুব্ধ হইয়াছেন। তাঁহার বিবেচনায়, ফরাসী উপন্যাসিকদিগের মধ্যে রমণীজনসুলভ কোমল ভাবের প্রভাবই অত্যন্ত অধিক। তিনি কথাপ্রসঙ্গে সসম্মানে ও সানুরাগে এডওয়ার্ড রডের আন্তরিকতা ও ভাবসম্পৎপূর্ণ গ্রন্থ ও মারগারেট ভ্রাতৃযুগলের প্রণীত পুস্তকের উল্লেখ করেন। চার্লস ডিকেন্স টলষ্টির উপন্যাসিক। ডিকেন্স দীন দরিদ্র ও অধঃপতিত নরনারীর পক্ষাবলম্বী ছিলেন বলিয়া কাউণ্ট মহোদয় তাঁহার রচনার সমধিক সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া থাকেন। রডিয়ার্ড কিপলিং তাঁহার মর্ম্মান্তিক ক্রোধ ও অবজ্ঞার ভাজন। কিপলিংকে তিনি ক্ষমতাশালী লেখক বলিয়াও স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। যুদ্ধবিগ্রহ তাঁহার নিকট নিতান্ত বীভৎস ব্যাপার বলিয়া পরিগণিত। বোধ করি, কাউণ্ট স্বয়ং ক্রীমিয়ার যুদ্ধে লিপ্ত থাকাতেই তাঁহার এইরূপ সংস্কার জন্মিয়াছে।

কাউণ্ট মহোদয়ের সহিত লেখিকার ধর্ম্ম সম্বন্ধেও অনেক আলোচনা হইয়াছিল। ফরাসী বিদ্যালয়সমূহে ভবিষ্যতে শিক্ষার্থীদিগকে ঈশ্বর সম্বন্ধে কোনও প্রকার শিক্ষা প্রদান করা হইবে না শুনিয়া কাউণ্ট নিতান্ত ভীত ও চমকিত হইয়াছেন। তিনি এক জন অকপট খ্রীষ্টান, বা গস্পেল-মতাবলম্বী। তিনি বলেন, গস্পেল গ্রন্থচতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও আলোচনা ধর্ম্মজীবনলাভের পক্ষে যথেষ্ট। কাউণ্টেস মহোদয়া স্বামীর ধর্ম্মবিষয়ক মতামত নীরবে শ্রবণ করিয়া থাকেন। কিন্তু গ্রীক খৃষ্টসম্প্রদায়ের ধর্ম্মমতে তাঁহার আন্তরিক আস্থা আছে। যে সময়ে টলষ্টি তাঁহার "রেসরেক্সন" নামক উপন্যাসের রচনা করেন, কাউণ্টেস মহোদয়া সেই সময়ে তাঁহার লিপিকরের কার্য্য করিতেন। ঐ সময়ে গ্রন্থমধ্যে "মাস" পর্ব্ব সম্বন্ধে কাউণ্টেসের মতের বিরুদ্ধ কতিপয় কথা লিপিবদ্ধ করিবার প্রয়োজন হওয়াতে কাউণ্টেস তাহা লিখিতে অসম্মতি প্রকাশ করেন।

নিজের ভবিষ্যৎ রচনা সম্বন্ধে টলষ্টি ম্যাডাম বেণ্টজনকে বলিয়াছেন, তাঁহার "রেসরেক্সন" উপন্যাসের একখানি উপসংহার গ্রন্থ লিখিবার অভিলাষ আছে। তবে উক্ত পুস্তক রচনা করিবার পূর্ব্বে তাঁহাকে বহু বিষয়ে লেখনীধারণ করিতে হইবে। হাসিতে হাসিতে কাউণ্ট বলেন, "বিষয়গুলি এরূপ বিস্তৃত যে, তাহা লিখিয়া শেষ করিতে চল্লিশ বৎসর সময় লাগিতে পারে।" সংপ্রতি কাউণ্ট তাঁহার ডায়েরী বা দৈনিকলিপির প্রকাশে নিযুক্ত আছেন। ঐ পুস্তকে বিবেকের স্বাধীনতা সম্বন্ধে মতামত লিপিবদ্ধ করিতেছেন। প্রসঙ্গতঃ তাঁহার শত্রুদিগের কথা উত্থাপিত হইলে তিনি সহৃদয় ও অনুকূলভাবে তাঁহাদিগের উল্লেখ করেন। কিন্তু তাঁহার পত্নী অতিথির সমক্ষে স্থানীয় পোপের একখানি পত্র ক্রোধভরে পাঠ করিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে কাউণ্টকে পুনর্দীক্ষিত করিবার জন্য ঐ পত্রে কাউণ্টেসকে অনুরোধ করা হইয়াছে। তাঁহারা যে স্থানেই অবস্থিতি করেন, পোপের দল তাহার সন্নিহিত স্থানে উপস্থিত হইয়া টলষ্টির মত ও গ্রন্থাদির প্রতিকূলে বক্তৃতা জুড়িয়া দেন। সিম্ফারোপলের আর্কবিশপ ধর্ম্মমন্দিরে বক্তৃতা করিবার সময় কাউণ্টকে অ-খ্রীষ্টান বলিয়া ঘোষণা করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই।

প্রেম-সাধন।

কত আর সাধি তোরে বল্?
আরণ্য রূপের ডালা, স্বাধীন বিহগবালা,
উদাস উদ্ভ্রান্ত চিত, সদা সুচঞ্চল;—
কিসে আমি সাধি তোরে বল্?

আকুল সমুদ্র-আশে তুই রে তটিনী;
দৈবাৎ খেলায় ভুলে এ মোর হৃদয়-কূলে
চকিতে পরশি যা'স্ তরঙ্গ তরল;—
কিসে আমি বাঁধি তোরে বল্?

নবীন যৌবন তোর, নূতন বাসনা;
মত্ত শত আশা হায়, শত পথ পানে ধায়,
আপন পূর্ণতা-ল'য়ে আপনি পাগল;—
কিসে আমি ধরি তোরে বল্?

গণিয়া আড়াই-ছত্র পত্রের রচনা;
তা'ও অনুরোধে লেখা, সাত যুগ পরে দেখা;
একটু বিদায়-দৃষ্টি, তা'তে'ও বিফল;—
কিসে আমি লভি তোরে বল্?

৺নিত্যকৃষ্ণ বসু।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

[প্রবাসী। ভাদ্র। "ভারতে প্রাচ্যপ্রতীচ্যের সংমিশ্রণ" শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রীর রচিত। শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে, "যাঁহারা আপনাদের চিন্তা, ভাব ও কার্য্যে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সমাবেশ করিতে না পারিবেন, ভাবী ভারত সম্বন্ধে তাঁহাদের কার্য্য নাই, এবং শিক্ষিত দলের সারথ্যে তাঁহারা বৃত হইবেন না।" তাহার পর, "জাতীয় জীবনের অন্তস্তম তলেও প্রতীচ্য চিন্তার ধাক্কা লাগিতেছে। ফলস্বরূপ হিন্দুর জীবনের প্রাচীন প্রাচীর সকল ভগ্ন হইয়া যাইতেছে।" শাস্ত্রী মহাশয় মনে করেন, এই 'ভাঙ্গা প্রাচীর মেরামত করিবার' চেষ্টা বৃথা। আমাদের তাহা মনে হয় না। আমাদের অস্তিত্ব যদি রাখিতে হয়, তাহা হইলে স্বাতন্ত্র্যও রাখিতে হইবে। মনে হয়, যে "প্রাচীন ইমারতের ভিত্তি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে," তাহার স্থলে প্রতীচ্য গির্জ্জা গড়িলে আমাদের স্বাতন্ত্র্য থাকিবে না। সে স্বাতন্ত্র্য যদি বজায় রাখিতে না পারি, আমরা কালসমুদ্রে ভাসিয়া যাইব;—প্রতীচ্য ইমারতে প্রাচ্য জাতীয়তা প্রতিষ্ঠিত করিলে শুভ ফলের সম্ভাবনা নাই। মিশরের 'মমী'র মত বিদেশীর যাদুঘরে হিন্দুত্বের শব সুরক্ষিত হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে হিন্দুর বিন্দুমাত্র লাভ নাই। আমরা যদি পুরুষপরম্পরাগত সংস্কার ও প্রাচ্যজাতিগত স্বাতন্ত্র্য পরিহার করিয়া প্রতীচ্য আদর্শের অনুসরণ করি, তাহা হইলে আমরা প্রাচীন ভারতের 'মমী' হইলেও হইতে পারি, আপনাদের জীবন-প্রবাহ অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিব না। শাস্ত্রী মহাশয় বলেন, "পাশ্চাত্য জগৎকে এই বিষয়-সুখাসক্তিরূপ ব্যাধি হইতে রক্ষা করিবার একমাত্র উপায় প্রাচীন ভারতের আধ্যাত্মিকতাকে তাহাদের মধ্যে স্থাপন করা।" স্বর্গীয় মহাপুরুষ বিবেকানন্দ স্বামীও বার বার এই কথা বলিয়া গিয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দ বুঝিয়াছিলেন, ভোগবিষে ভারতবর্ষও অত্যন্ত জর্জ্জরিত হইয়াছে। তাই তিনি স্বদেশের জন্যও উপযুক্ত ঔষধের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। মুমূর্ষু ভারতের কল্যাণচিন্তায় মনস্বী মহাপুরুষের দেহপাত হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার প্রভাব তদীয় শিষ্য-সম্প্রদায়কে এখনও অনুপ্রাণিত করিতেছে। সেই পুণ্য প্রভাব ভারতবর্ষে চিরজাগরূক থাকুক।] শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "লাঠির কথা" সুখপাঠ্য ক্ষুদ্র গল্প। শ্রীযুক্ত প্রমদাগোবিন্দ চৌধুরীর "কোষকীট" ও শ্রীযুক্ত

সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের "গিলগিটের পুরাতন রাজ্যশাসন প্রথা" জ্ঞাতব্য তথ্যে পরিপূর্ণ। "বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গে"র পূর্ব্ব প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ আছে। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় "কপিলবস্তু"র পুরাকাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। "স্বনামখ্যাত শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় অল্প সময়ে অল্প ব্যয়ে হিমালয়ের পাদতললগ্ন তরাই অঞ্চলে নেপাল রাজ্যের শালবনসমাচ্ছন্ন নতোন্নত ভূমিভাগে ভূগর্ভপ্রোথিত যে সকল কীর্ত্তিচিহ্ন খনন করাইয়া লোকলোচনের বিস্ময়োৎপাদন করিয়াছেন, তদ্দ্বারা কপিলবস্তুর রাজ-দুর্গের পরিখা, প্রাচীর, প্রাসাদ, তোরণ সমস্তই পুনরায় দৃষ্টিগোচর হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে। বিদেশের বিদ্বন্মণ্ডলী এই নবাবিষ্কারের পথপ্রদর্শক হইলেও, তাহার সহিত এক জন বাঙ্গালীর নামও যে চিরসংযুক্ত হইয়া রহিল, তাহা অল্প আহ্লাদের কথা বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না।" বোধ করি, কোনও বাঙ্গালীই অক্ষয় বাবুকে তাহা স্বীকার করিতে বলিবেন না। অক্ষয় বাবুর ভাষায় আমরা বলি, শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় "আমাদের ললাটপট হইতে একটি কলঙ্করেখা অপনয়ন করিয়া বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল করিয়া দিয়াছেন।"

অক্ষয় বাবু বলিতেছেন,—"কপিলবস্তু কোথায় ছিল, তাহার সাধারণ জ্ঞান লাভ করিলেও, ঠিক কোন্ স্থান কপিলবস্তু, তাহা নির্ণয় করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল। সে অঞ্চলের নতোন্নত ভূমিভাগ সর্ব্বত্র একরূপ, সর্ব্বত্রই ভগ্নস্তূপ, সর্ব্বত্রই অরণ্যের পর অরণ্য! মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই অরণ্য-সমাচ্ছন্ন তরাই অঞ্চলে উপনীত হইয়া, তৌলিভা নামক নেপালী তহশীল কাছারী হইতে অনুসন্ধান কার্য্য আরম্ভ করেন। * * * এই স্থানে নানা পুরাকীর্ত্তির চিহ্ন দর্শন করিয়া, মুখোপাধ্যায় মহাশয় ইহাকেই বৌদ্ধসাহিত্য-বর্ণিত যক্ষমন্দির কল্পনা করিয়া অনুসন্ধান-কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন। ইহার এক ক্রোশ উত্তরে তিলৌরা। তাহা এখনও পাহাড়ীদের নিকট তিলৌরাকোট নামে পরিচিত। কোট শব্দের অর্থ দুর্গ। মৃত্তিকা খনন করাইয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয় সে দুর্গের ভিত্তি মূলাদি আবিষ্কৃত করিয়াছেন। নানা প্রমাণে তাহাই কপিলবস্তুর রাজদুর্গ বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। ভগবানপুর তহশীল কাছারীর এক ক্রোশ উত্তরে 'রুম্মিন্‌দেয়ী' নামে একটি পুরাতন স্থান দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাই 'লুম্বিনীবন' নামক বৌদ্ধ তীর্থ; শাক্য সিংহের জন্মস্থান। লুম্বিনীবনের মায়াদেবীর মন্দির, মায়াদেবীর প্রস্তর-

মূর্ত্তি এবং অশোকস্তম্ভ আবিষ্কৃত হইয়া সকল সন্দেহ নিরস্ত করিয়া দিয়াছে। * * * এক জন বঙ্গবাসীর চেষ্টায় যে এই লুপ্তোদ্ধার সাধিত হইয়াছে, তাহা চিরদিন ইতিহাসপাঠকের স্মৃতিপথে আরূঢ় হইয়া বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল করিবে।" কপিলবস্তুর কাহিনীবর্ণনায় অক্ষয় বাবু নিপুণতার পরিচয় দিয়াছেন। ফেনিল ভাষায় অক্ষয় বাবু সিদ্ধহস্ত, কপিলবস্তুর ভাষা দেখিয়া বোধ হয়, এ ক্ষেত্রে তিনি আপনাকেও পরাজিত করিয়াছেন। শব্দের ঘোর-ঘটা দেখিলে নৈষধ-প্রণেতাকে মনে পড়ে। সে যাহা হউক, প্রবন্ধটি বাঙ্গালী পাঠকের অবশ্যপাঠ্য, তাহা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেনের "র‍্যাফেল্, চিত্রবিদ্যা ও ম্যাডোনা" একটি অমিত্রাক্ষর-গ্রথিত কবিতা। নাম দেখিয়াই মনে হয়, কবিতাটি লিখিবার সময় কবিবরের কল্পনা নন্দনের কল্পতরুতলে পুষ্পশয়নে সুপ্তিসুখে মগ্ন ছিলেন, সহৃদয় কবি র‍্যাফেলের খাতিরেও তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ করেন নাই। আর একটি কবিতা—"স্বপ্ন"ও দেবেন্দ্র বাবুর রচিত। ইহাতেও বিশেষত্ব নাই। দুইটি কবিতাই "প্রবাসী"তে প্রকাশিত দুইখানি চিত্রের ব্যাখ্যাস্বরূপ লিখিত হইয়াছে। বুঝা যাইতেছে, 'ফরমাসে' কবিতা হয় না। তাহা হইলে দেবেন্দ্র বাবুর ন্যায় স্বভাবকবি এ ক্ষেত্রে বিফল হইতেন না। যাঁহারা নূতন ব্রতী, তাঁহারা দেখিয়া শিখিবেন, তাই এ কথার উল্লেখ করিলাম। "ব্রহ্মদেশে বাঙ্গালী" পড়িয়া মনে হয়, প্রবাসী বাঙ্গালী সর্ব্বত্র সমান। লেখক লিখিয়াছেন,—"বঙ্গকুলতিলক ৺রামগোপাল ঘোষ রেঙ্গুনে থাকিয়া বাণিজ্য করিতেন।"
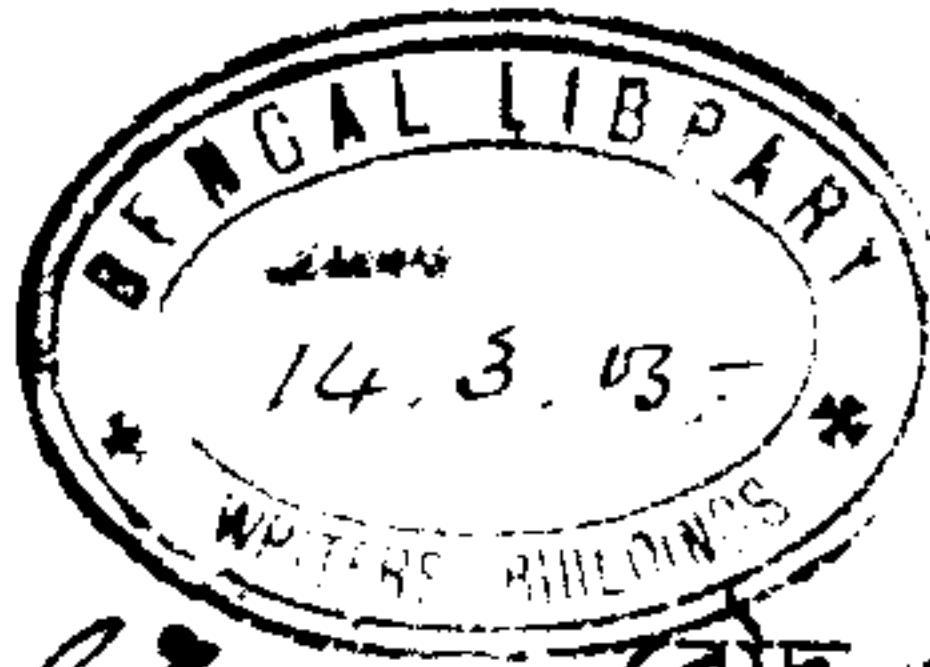
সাহিত্য, ১৩শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা।

বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব।

[স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বটব্যাল এম্. এ. প্রণীত।]

চৈতন্যদেবের সময়ে নবদ্বীপে একটি বৈষ্ণব-সম্প্রদায় বিদ্যমান ছিল। যাঁহারা শক্তিপূজক ও শিবপূজক, তাঁহাদের সহিত ইঁহাদের বড় বনিত না। ইঁহারা শ্রীমদ্ভাগবত নামক পুরাণকে বেদ অপেক্ষাও অধিক সম্মান করিতেন। শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণব্রহ্মের অবতার বলিয়া ইঁহাদের বিশ্বাস ছিল। রাধাকৃষ্ণের লীলাতে ইঁহারা অতীব গুহ্য ধর্ম্মোপদেশ আছে বলিয়া বিবেচনা করিতেন। ইঁহারা ঈশ্বরারাধনায় তান্ত্রিকমতানুসারে মদ্যমাংসের ব্যবহারের বিরোধী ছিলেন, এবং তজ্জন্য ইঁহারা প্রশংসনীয়। কিন্তু ইহাঁদের নিজেদের মধ্যেও অনেক কদাচার ছিল।

বেদে যিনি পরম দেবতা, তাঁহার নাম 'বিষ্ণু'। ঋগ্বেদে বিষ্ণুর বিবরণ যেমন সুন্দর, তেমনই পবিত্র। তিনি দেবতাদের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থানে বাস করেন। ত্রিভুবন তাঁহার তেজে পরিপূর্ণ। মনুষ্যের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে তাঁহার মহিমার ইয়ত্তা করা যায় না। পরলোকে তাঁহার সমীপস্থ হইলে মনুষ্য শ্রেষ্ঠ আনন্দের ভাগী হয়। এই ত্রিভুবনে যে কিছু সৌন্দর্য্য দেখা যায়, তাহা তাঁহারই সৌন্দর্য্যের ছায়ামাত্র। যে মাধুর্য্যরসে ত্রিভুবন প্লাবিত—বিষ্ণুর আবাসস্থানেই তাহার উৎস বিরাজমান। বৈদিক ঋষিরা সকলেই বিষ্ণুর উপাসক ছিলেন। কিন্তু তৎকালে বৈষ্ণব নামে কোনও সম্প্রদায় ছিল না।

এই বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের উৎপত্তি কিরূপে হইল, তাহা নিশ্চয় করা যায় না;—তবে কৃষ্ণোপাসনার সহিত এই সম্প্রদায়ের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দেখা যায়।

দেবকীনন্দন কৃষ্ণ এক জন ঐতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন, কি সম্পূর্ণ কবি-কল্পিত, তদ্বিষয়ে অনেক মতভেদ আছে। সে বিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হওয়া আমাদের অনাবশ্যক। তবে প্রণিধানের বিষয় এই যে, কৃষ্ণোপাসনার সহিত বুদ্ধোপাসনার অনেকগুলি সদৃশ্য আছে। আমার বিশ্বাস যে, বৌদ্ধসম্প্রদায় হইতেই কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইয়াছে। বৌদ্ধগণই রূপান্তরিত হইয়া বৈষ্ণব হইয়াছেন। যে যে কারণে আমি এই বিশ্বাসে উপনীত হইয়াছি, তাহাই সংক্ষেপে লিখিত হইতেছে।

(১) বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে ব্রাহ্মণপন্থী সমাজে প্রতিমাপূজা একবারেই ছিল না। বেদে কুত্রাপি প্রতিমা-নির্ম্মাণ করিয়া তাহার পূজা করিবার নিদর্শন নাই। প্রতিমার পরিবর্ত্তে ব্রাহ্মণেরা অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া তদীয় জ্যোতিতে ঈশ্বরের জ্যোতির আভাস দেখিতেন। যজ্ঞীয় অগ্নিতে হোম করা, এবং বেদমন্ত্রের দ্বারা ঈশ্বরের প্রশংসা করাই ব্রাহ্মণ-উপাসনার প্রধান অঙ্গ। পক্ষান্তরে, বেদবহির্ভূত সমাজে অতি প্রাচীনকাল হইতেই নানাবিধ বিকটাকার দেবদেবীর প্রতিমা-নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিবার প্রথা বর্ত্তমান ছিল। বৌদ্ধ ধর্ম্ম এই সমাজে বহুলপরিমাণে প্রচারিত হয়। এবং ইহারা বুদ্ধকেই এক দেবতা করিয়া তদীয় প্রতিমা-নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিতে আরম্ভ করে। কৃষ্ণোপাসনাতেও প্রতিমা-পূজা দেখা যায়। ইহা যদি বিশুদ্ধ বৈদিক উপাসনা হইত, তাহা হইলে ইহাতে প্রতিমা-পূজা প্রবিষ্ট হইত না।

(২) কৃষ্ণপূজক-সম্প্রদায়ে ভগবানের মৎস্য-কূর্ম্মাদি যে সকল অবতারের কথা শুনা যায়, তৎসমুদায় বৌদ্ধ জাতক উপাখ্যান হইতে সমুদ্ভূত, সন্দেহ নাই।

(৩) কৃষ্ণের শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী যে বাসুদেবমূর্ত্তি, তাহা সম্পূর্ণ 'বুদ্ধজিনে'র মূর্ত্তি।

(৪) বৈষ্ণবেরা যে মাংস আহার করেন না, ইহা নিরবচ্ছিন্ন বৌদ্ধাচার।

(৫) বৈষ্ণব বৈরাগীরা অদ্যাপি বৌদ্ধ শ্রমণদের বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া ভ্রমণ করে।

(৬) বৈরাগীদের ভিক্ষাবৃত্তি, বৌদ্ধ শ্রমণদের ভিক্ষাবৃত্তিরই রূপান্তরমাত্র।

(৭) বৌদ্ধদের মধ্যে যেরূপ ভিক্ষু ভিক্ষুণী ছিল, বৈষ্ণবদের মধ্যেও তদ্রূপ রহিয়াছে।

(৮) বৌদ্ধদের মধ্যে যেমন জাতিভেদ ছিল না, তেমনই বৈষ্ণবদের মধ্যেও নাই।

(৯) বৈষ্ণবেরা স্পষ্টাক্ষরে বুদ্ধকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।

(১০) সন্ন্যাস যেমন বৌদ্ধদের মধ্যে প্রশংসনীয়, বৈষ্ণবদের মধ্যেও তদ্রূপ।

(১১) একদা এই বাঙ্গলা দেশ বৌদ্ধদেরই দেশ ছিল। বাঙ্গলা দেশে এমন স্থান নাই বলিলেই হয়, যেখানে বুদ্ধ-পূজার নিদর্শন না পাওয়া যায়।

মানভূম অঞ্চলে দেখিয়া আসিয়াছি, এখনও 'সরাক' নামে একটি জাতি বর্ত্তমান। 'শ্রাবক' হইতে 'সরাক' হইয়াছে। ইহারা এক্ষণে হিন্দু বলিয়া গণ্য, কিন্তু মৎস্য মাংস খায় না। এককালে যাহারা দেশব্যাপী ছিল, মানভূমের জঙ্গলের মধ্যে সেই 'শ্রাবক'দের কিঞ্চিৎমাত্র অবশেষ বর্ত্তমান;—কিন্তু অবশিষ্ট 'শ্রাবক'-সম্প্রদায়ের কি হইল? নিশ্চয়ই প্রাচীন শ্রাবকেরা হিন্দুসমাজের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছে। গৃহী বৌদ্ধেরা 'শ্রাবক' নামে, এবং বৈরাগী বৌদ্ধেরা 'ভিক্ষু' নামে অভিহিত হইত। যাঁহারা এতদ্দেশের শাক্ত ও গাণপত্য হিন্দু, তাঁহারাই রূপান্তরিত 'শ্রাবক'; আর যাঁহারা বৈষ্ণব, তাঁহারাই রূপান্তরিত 'ভিক্ষু' হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। বুদ্ধদেবের মাতার নাম মায়াদেবী; বুদ্ধের জন্মের সময় তিনি স্বপ্ন দেখেন যে, দিব্যহস্তী দন্ত দ্বারা তাঁহার উদর বিদীর্ণ করিয়া তাঁহার গর্ভে প্রবিষ্ট হইল। তজ্জন্য বৌদ্ধেরা বাল-বৌদ্ধকে হস্তিমুখ-নরাকৃতি প্রদান করিয়া পূজা করিত। ইনিই এক্ষণে আমাদের 'গণপতি' বা গণেশ। এবং তাঁহার মাতা মায়াদেবীই আমাদের 'দুর্গা'। আর যিনি শ্রীমতী রাধা, তিনি প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধপত্নী 'গোপিকা'। গৃহী শ্রাবকগণ বুদ্ধমাতার পূজা করেন; বৈরাগী ভিক্ষুগণ বুদ্ধপত্নীর পূজা করেন।

(১২) স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দেখাইয়াছেন যে, গোপীদের সঙ্গে আদিম কৃষ্ণের কোন সুবাদ সম্পর্ক ছিল না। যিনি ভগবদ্গীতার 'কৃষ্ণ', বুদ্ধধর্ম্মের বিনাশ করিবার জন্যই তাঁহার জন্ম। গীতাকার অর্জ্জুনকে রণক্ষেত্রে 'বৌদ্ধ' সাজাইয়া ভগবানের মুখে 'অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ' মতের খণ্ডন করিয়াছেন। বৌদ্ধধর্ম্মকে 'ক্লৈব্য' বা ক্লীবভাব, এবং হৃদয়দৌর্ব্বল্য বলিয়া নিন্দা করিয়া গিয়াছেন। বৌদ্ধগণকে কৃষ্ণপূজক করিবার চেষ্টা গীতার সময় হইতেই আরব্ধ, দেখা যায়। গীতার মনোহর উপদেশে অনেক বৌদ্ধ কৃষ্ণপূজক হইতে থাকেন, এবং অলক্ষিতভাবে এই সময় হইতেই বৌদ্ধ বৈষ্ণবদের আবির্ভাবের সূত্রপাত হইয়াছিল, বিবেচনা হয়। যাহা হউক, কৃষ্ণোপাসনায় 'গোপিকা' আসিল কোথা হইতে? ইহা বড় বিচিত্র কথা। বুদ্ধপন্থী ও ব্রাহ্মণপন্থী সমাজ কোন কালেই পৃথক ছিল না; মেশামেশি ছিল। এখন যেমন শাক্ত, শৈব ও বৈষ্ণব সমাজে মেশামিশি। কোনও এক বৌদ্ধপরিবার কৃষ্ণভক্ত হইলে বুদ্ধমূর্ত্তি যেমন বিষ্ণুমূর্ত্তি বলিয়া পূজিত হইতে থাকিল, তেমনই বুদ্ধের চরিত্র কৃষ্ণের চরিত্রে মিশিয়া যাইতে লাগিল। বৌদ্ধেরা বুদ্ধের অসংখ্য প্রকার প্রতিমার নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিত। তিনি কোনও সময়ে মৎস্য-

যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, বরাহ-যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাতে অনেকে তাঁহাকে 'মৎস্ত'-বিগ্রহে, অনেকে 'বরাহ'-বিগ্রহে, অনেকে অন্যান্য জাতকের বিগ্রহে তাঁহার পূজা করিত। এখন এই সকল মূর্ত্তি ভগবানের দশাবতারে পরিণত হইল। তাহার পর বুদ্ধের বাল্যকালের ছবি, কৈশোরের ছবি, বৃদ্ধ বয়সের ছবি, ইত্যাদি নানাপ্রকার প্রতিমা নির্ম্মিত হইত। বাল-বুদ্ধ আমাদের গণেশ। কৈশোরে বুদ্ধদেব পত্নীর সহিত যখন একত্র বাস করিতেন, তখনকার বুদ্ধ ও বুদ্ধপত্নীর যুগলমূর্ত্তি, অথবা বুদ্ধপত্নীর পৃথক মূর্ত্তি এক এক প্রকার বৌদ্ধপ্রতিমা ছিল। এই বুদ্ধপত্নীর নাম 'গোপিকা'। যখন এই মূর্ত্তি কৃষ্ণপূজার মধ্যে গৃহীত হইল, তখন এক বিষম সমস্যা উপস্থিত হইল। কৃষ্ণের ত 'গোপিকা'-নামে কোনও পত্নী নাই? তখন পুরাণকর্ত্তা ভট্টাচার্য্য মহাশয় বৃন্দাবনের গোপী শ্রীমতী রাধার গঠন করিলেন। বুদ্ধদেব তরুণ বয়সে বহুসংখ্যক সুন্দরী মহিলাগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকিতেন; ইহারই অনুকরণে গোপিকাগণের সহিত কৃষ্ণের রাস-লীলার গল্প তদীয় উপাখ্যানমধ্যে প্রক্ষিপ্ত হইল।

আদিম রাধা গোপী কৃষ্ণের নায়িকা বলিয়া বর্ণিতা নহেন। রাধা ও তদীয় সহচরী গোপীদের সহিত কৃষ্ণ কিশোর বয়সে ক্রীড়া কৌতুক করিয়াছিলেন মাত্র, সদাচারের উল্লঙ্ঘন করেন নাই। কিন্তু বৌদ্ধ ভিক্ষু ভিক্ষুণীদের মধ্যে অনেক অসচ্চরিত্র নরনারী বিদ্যমান ছিল। ইহারা গোপীগণের মধ্য হইতে রাধাকে লইয়া কৃষ্ণের নায়িকা করিয়া দিল। এবং রাধাকৃষ্ণের দোহাই দিয়া আপনাদের মধ্যেও তাহার প্রকাশ্য অনুকরণের সূত্রপাত করিল। এই রাধাকৃষ্ণের প্রবল আকর্ষণে বৌদ্ধ ভিক্ষু ভিক্ষুণীরা দলে দলে কৃষ্ণপূজক বৈষ্ণব হইয়াছিল।

গৌরাঙ্গের সময়ে এইরূপে প্রাচীন বৌদ্ধসমাজের এক অংশ বৈষ্ণব-সমাজে পরিণত হইয়াছিল। এই সমাজে 'প্রেমভক্তির' বড় সমাদর। সেই প্রেমভক্তি কিরূপ ছিল, কুতূহলী পাঠক স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্তের 'উপাসক সম্প্রদায়' নামক গ্রন্থে 'বাউল' ও 'সহজ' সম্প্রদায়ের প্রেমভক্তির বিবরণে কিঞ্চিৎ দেখিতে পাইবেন।

দত্ত মহাশয় 'বাউল' ও 'সহজ' সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবদিগকে গৌরাঙ্গ-প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব-সমাজের শাখা বলিয়া ধরিয়াছেন; কিন্তু আমার বিবেচনায়, ঐ দুই সম্প্রদায়ই, অন্ততঃ সহজ সম্প্রদায়, চৈতন্যের পূর্ব্বেও বিদ্যমান ছিল। কেন না, চণ্ডীদাসের পদে সহজ-মতের স্পষ্ট বর্ণনা দেখা যায়।

জাহাঙ্গীর বাদশাহ।

মোগলকুলরবি আকবর অস্তমিত হইলে, ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে তদীয় পুত্র সেলিম জাহাঙ্গীর উপাধি ধারণ করিয়া রাজসিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। মোসলমান রাজন্যবৃন্দের মধ্যে আকবরের কর্ত্তব্যজ্ঞান সর্ব্বাপেক্ষা তীক্ষ্ণ ছিল। তাঁহার রাজত্বকালে বিবাদ বিসংবাদ প্রশমিত, অবিশ্বাস দুরীভূত ও স্বদেশ-হিতৈষণার প্রাধান্য সংস্থাপিত হইয়াছিল। আকবর বিশ্বাস করিতেন, তাঁহার গৃহীত ব্রত পবিত্র, এবং তাহার প্রতিপালনের জন্য তিনি ঈশ্বরের নিকট দায়ী। তিনি এই কর্ত্তব্য যথাযথরূপে পালন করিবার জন্য শাসন-সংরক্ষণ-সংক্রান্ত ক্ষুদ্র বৃহৎ যাবতীয় কার্য্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্য্যবেক্ষণ আবশ্যক বিবেচনা করিতেন। ফলতঃ তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, "Every minuite spent in comprehending small things is a minuite spent in the service of God." কিন্তু তদীয় পুত্র জাহাঙ্গীর বাক্যে ও কার্য্যে ইহার বিপরীত পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহার স্বরচিত জীবনবৃত্ত পাঠ করিলে এই ধারণা জন্মে যে, তিনি ক্ষুদ্র বিষয়ে মনঃসংযোগ করা রাজোচিত গৌরব ও সম্মানের ক্ষতিজনক বলিয়া বিবেচনা করিতেন। তাদৃশ কর্ত্তব্যনিষ্ঠ পিতার পুত্রের এইরূপ কর্ত্তব্যপরাঙ্মুখতা বিসদৃশ বলিয়া বোধ হইতে পারে। ফলতঃ, পুত্রের কুশিক্ষার জন্য আকবরও কিয়ৎপরিমাণে দায়ী ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। আকবর জাহাঙ্গীরের চরিত্রসংগঠনের জন্য যথোপযুক্ত উপায় অবলম্বন করেন নাই। জাহাঙ্গীরের জন্মবিবরণ অলৌকিক। রাজমহিষী (অম্বরাধিপতির দুহিতা) বন্ধ্যা ছিলেন। বাদশাহ সিংহাসনারোহণের চতুর্দ্দশ বর্ষ পরে তীর্থদর্শনোপলক্ষে আজমীরের অভিমুখে যাত্রা করেন, এবং পুত্রকামনায় রাজমহিষীকে পথিমধ্যে ফতেপুরের সাধুপ্রবর সেলিমের আশ্রমে রাখিয়া যান।

* 1. Keen's Turks in India.
2. Elphinstone's History of India.
3. Dow's History of Hindostan, Vol. III.
4. Elliot's History of India, Vol. VI.
5. Wheeler's History of India.
6. Riaz-us-salatin. 7. Munta-Khabu-l-Lubab.

কথিত আছে যে, সাধু সেলিমের ঈশ্বরারাধনার ফলে রাজমহিষী এই স্থানে পুত্রমুখ সন্দর্শন করেন। রাজকুমার ধর্ম্মপিতার নামানুসারে সেলিম নামে অভিহিত হন, এবং বাদশাহ তাঁহাকে আদর করিয়া সেখুবাবা নাম প্রদান করেন। সাধুপ্রবরের পুত্রবধূ নবজাত রাজকুমারের পালনকর্ত্রী ও শিক্ষয়িত্রীর পদে নিযুক্ত হন। এইরূপ অবস্থায় জন্মগ্রহণ করিয়া ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া রাজকুমার যে অস্থিরমতি, স্বেচ্ছাচারী, কুসংস্কারাপন্ন ও সংসারজ্ঞানানভিজ্ঞ হইয়াছিলেন, তাহা বিস্ময়ের বিষয় নহে।

জাহাঙ্গীরের রাজত্বের সর্ব্বপ্রথম ঘটনা খসরুর বিদ্রোহ। ইহাতে তাঁহার স্নেহশীলতা ও নৃশংসতা একাধারে যুগপৎ পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। বাদশাহ স্বরচিত জীবনবৃত্তে লিখিয়াছেন,—"আমার পিতার পীড়ার সময়ে কতিপয় অপরিণামদর্শী ব্যক্তি * * * তাঁহাকে (খসরুকে) সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিবার ও তাঁহার হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিবার মানস করিয়াছিল। * * * খসরু ও তাঁহার নির্ব্বোধ অনুচরবর্গের দুঃস্বপ্ন অবমাননা ও লাঞ্ছনা ব্যতীত আর কিছুতেই পরিণত হইতে পারে নাই। এই জন্য আমি রাজ্যভার লাভ করিয়া তাঁহাকে অবরুদ্ধ করি। * * * তথাপি আমি তাঁহার প্রতি সদয় ও বিবেচনাশীল হইব, মনে করিয়াছিলাম। * * * কিন্তু সমস্তই বিফল হইয়াছিল। অবশেষে খসরু তদীয় সহযোগিগণের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া জেলহজ্জ মাসের ২০ তারিখে আমাকে জ্ঞাপন করিলেন যে, তিনি আমার পিতার সমাধিভবন দর্শন করিতে যাইতেছেন। * * * কিয়ৎক্ষণ পরেই সংবাদ পঁহুছিল যে, খসরু পলায়ন করিয়াছেন। * * * যাহা ঘটিয়াছে, তাহা শুনিয়া আমি বলিলাম, 'কি করিতে হইবে? আমি কি নিজেই অশ্বারোহণে তাঁহার অনুসরণ করিব, অথবা খরমকে প্রেরণ করিব?' আমীর উলওমরা বলিলেন যে, আমি অনুমতি দিলে তিনি যাইতে পারেন। আমি বলিলাম, 'আচ্ছা'। আমি তাঁহাকে প্রেরণ করিলাম। ইহার পর আমার স্মরণপথে পতিত হইল যে, খসরু তাঁহাকে অবজ্ঞা করিয়া থাকে, এবং তিনিও (আমীর উলওমরা) * * * ঈর্ষ্যান্বিত। ঈশ্বর নিবারণ করুন, আমীর উলওমরা ঈর্ষ্যাকুল হইয়া তাঁহাকে বিনষ্টও করিতে পারেন ভাবিয়া আমার আশঙ্কা উপস্থিত হইল। সুতরাং তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য লোক প্রেরণ করিলাম। * * * সংবাদ আসিল যে, খসরু পঞ্জাবের অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। পরদিন প্রাতঃকালে আমি গাত্রোত্থান করিয়া ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করিয়া কোন

বাধা না মানিয়া অশ্বারোহণে যাত্রা করিলাম। খসরু কর্ত্তৃক লাহোর আক্রমণের উদ্যোগের সংবাদ আমাকে জ্ঞাপন করিতে ও আমাকে সতর্ক করিয়া দিতে দেলওয়ার খাঁর প্রেরিত বার্ত্তাবাহক ফরওয়াদিন মাসের ২৪শে তারিখে (এই সময় দেলওয়ার খাঁ লাহোর রক্ষার জন্য নিযুক্ত ছিলেন ও বাদশাহ লাহোর হইতে কিয়দ্দূরে অবস্থান করিতেছিলেন।) উপনীত হইল। * * (ইহার) দুই দিন পরে খসরু নগরের নিকট উপনীত হইয়া সংগ্রাম আরম্ভ করেন। অবরোধের নবম দিবসে খসরু নিজের এবং অনুচরবর্গের অনুসরণকারী রাজসৈন্যের আগমনবার্ত্তা পরিজ্ঞাত হন। অনন্যোপায় হইয়া খসরু রাজসৈন্যের সম্মুখীন হন। * * * রাজসৈন্য ও বিদ্রোহী দলের মধ্যে প্রবল যুদ্ধ আরব্ধ হয়। * * * ঈশ্বরের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া আমি দ্বিধাশূন্যচিত্তে যাত্রা করি। * * * সেতু উত্তীর্ণ হইবার পরেই বিজয়-বার্ত্তা শ্রবণ করি। (খসরুর) ধৃত হইবার সংবাদ অবগত হইয়া আমি তাঁহাকে আমার নিকট আনয়ন করিবার জন্য তৎক্ষণাৎ লোক প্রেরণ করি। * * * মিরজা কামারণের উদ্যানে আমার নিকটে শৃঙ্খলাবদ্ধ খসরু আনীত হইলেন। তাহাদের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া খসরু কম্পিত হইতেছিলেন ও অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেছিলেন। এই সময় বাদশাহ তাঁহাকে তদীয় অনুচর-বর্গের নাম জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, "আমার অপরাধ অমার্জ্জনীয়। আমি সে জন্য জীবনবিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত, সুতরাং বন্ধুগণের নাম প্রকাশ করিয়া আত্মগৌরবের লাঘব করিতে ইচ্ছা করি না।" ইহার পর বাদশাহ খসরুকে আর কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া তাঁহাকে অবরুদ্ধ করিতে আদেশ দিলেন। হাসন বেগ ও আবদুল রহিম নামক ওমরাহ-দ্বয় খসরুর প্রধান সহযোগী ছিলেন। বাদশাহের আদেশে হাসন বেগকে বৃষের চর্ম্মমধ্যে ও আব্দুল রহিমকে গর্দ্দভের চর্ম্মমধ্যে পুরিয়া গর্দ্দভপৃষ্ঠে নগরপ্রদক্ষিণ করান হইল। হাসন বেগ এই অবস্থায় রুদ্ধনিশ্বাস হইয়া প্রাণপরিত্যাগ করেন। কিন্তু আবদুল রহিম ঈশ্বরানুগ্রহে ও বন্ধুগণের সাহায্যে প্রাণরক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন। ইহার পর খসরুর তিন শত অনুচরকে রাজপথের উভয় পার্শ্বে ত্রিশূল সকল প্রোথিত করিয়া তদুপরি নৃশংসভাবে নিহত করা হইল। অনুগত অনুচরবর্গকে নৃশংসভাবে হত্যা করিয়া খসরুকে ভীতিবিহ্বল ও শোকাকুল করিবার কল্পনায় তাঁহাকে প্রত্যহ বধ্যভূমিতে আনা হইত। ইহার পর কিছু দিন

কতকটা স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহার পরেও রাজকুমার পিতার বিরুদ্ধে বারবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হওয়াতে তিনি তাঁহার দৃষ্টিশক্তি নষ্ট করিবার আদেশ দেন। রাজাজ্ঞা প্রতিপালিত হইলে, জাহাঙ্গীর খসরুর যন্ত্রণা ও অনুতাপদর্শনে ব্যথিত হইয়া তাঁহার চক্ষুর চিকিৎসা করিবার বন্দোবস্ত করিয়া দেন। চিকিৎসাগুণে রাজকুমার পুনর্ব্বার কিঞ্চিৎ দৃষ্টিশক্তি লাভ করেন। জাহাঙ্গীর ইহাতে সন্তোষলাভ করিয়া চিকিৎসককে যথোপযুক্ত পুরস্কার প্রদান করেন।

রাজকুমার খসরুর বিদ্রোহ দমিত হইবার অব্যবহিত পরেই (জাহাঙ্গীরের সিংহাসনারোহণের দ্বিতীয় বর্ষে) বর্দ্ধমানের জায়গীরদার শের আফগানের হস্তে বাঙ্গলার সুবাদার কুতুবউদ্দীন ও কুতুবউদ্দীনের অনুচরগণের হস্তে শের আফগান নিহত হন। ইহাই জাহাঙ্গীরের জীবনের ও রাজত্বের সর্ব্বপ্রধান ঘটনা। রিয়াজ-রচয়িতা গোলাম হোসেন লিখিয়াছেন যে, শের আফগান দুষ্কার্য্যে লিপ্ত হওয়াতে তাঁহাকে দমন করিবার জন্য সম্রাটের আদেশানুসারে কুতুব বর্দ্ধমানে গমন করিয়াছিলেন। এই স্থানে শের তাঁহার আকার ইঙ্গিতে শঙ্কিত হইয়া আত্মরক্ষার জন্য তাঁহাকে বধ করেন, এবং এই হত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য মোগল অনুচরগণ তাঁহাকে শমনসদনে প্রেরণ করে। জাহাঙ্গীর বাদশাহ শেরের বিধবা পত্নী মেহেরুল্‌নেসার-সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাসবেত্তা কাফি উল্লেখ করিয়াছেন যে, শের আফগানের মৃত্যুর পর বাদশাহ যে তাঁহার পত্নীকে হস্তগত করিবেন, তাহা শেরের অবিদিত ছিল না। কোন সূত্রে শের এই বিষয় অবগত হইয়াছিলেন, তাহার আলোচনা করিলে জানা যায় যে, শেরের সহিত বিবাহিতা হইবার পূর্ব্বে জাহাঙ্গীর মেহেরুলনেসার রূপে গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু আকবরের অনভিমত হওয়াতে মেহেরুলনেসা শের আফগানের সহিত পরিণীতা হন। জাহাঙ্গীর ভগ্নমনোরথ হইয়াও মেহেরুলনেসার মূর্ত্তি মানসপট হইতে মুছিয়া ফেলিতে পারিলেন না। জাহাঙ্গীরের প্রবল অনুরাগ ও অদম্য আসক্তির সংবাদ শের আফগানের জীবদ্দশাতেই নানা ভাবে প্রকাশ পাইয়াছিল। জাহাঙ্গীর বাদশাহের রাজত্বের প্রারম্ভে মানসিংহ বাঙ্গলার শাসনকর্ত্তৃপদে বৃত হইয়াছিলেন। কিন্তু জাহাঙ্গীর তাঁহাকে অল্প দিন পরেই রাজধানীতে আহ্বান করেন। রাজা মানসিংহকে বাঙ্গলা দেশ হইতে অপসারিত করিয়াছিলেন কেন, জাহাঙ্গীর

তাঁহার একান্ত প্রীতিভাজন ও অনুগত কুতুবউদ্দীন বাঙ্গলার শাসনকর্ত্তৃপদে নিযুক্ত হন, এবং তিনিই শের আফগানের হত্যার কারণস্বরূপ হইয়াছিলেন। এ জন্য কোন কোন ইতিহাসবেত্তা নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, মেহেরুলনেসার লোভেই জাহাঙ্গীর বাদশাহ শেরকে নিহত করাইয়াছিলেন। (১) আকবরের অন্তরঙ্গ বন্ধু আবুল ফজল জাহাঙ্গীরের ষড়যন্ত্রে নিহত হইয়াছিলেন। বাদশাহ স্বরচিত জীবনবৃত্তে এই গুরুতর অপরাধ স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু শের আফগানের হত্যাকাণ্ডে তাঁহার যোগ ছিল, স্বরচিত জীবনবৃত্তে জাহাঙ্গীর এমন কোনও উল্লেখ করেন নাই। (২) সমসাময়িক ইকবলনামার লেখক ও মহম্মদ হাদি, শেরের দুষ্কৃতিই তাঁহার হত্যার কারণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। (৩) বিধবা মেহেরুলনেসা বাদশাহের নিকট নীত হইবার পর চারি বৎসর জাহাঙ্গীর তাঁহার মুখাবলোকন করেন নাই, এবং তাঁহার ভরণপোষণের জন্য অতি সামান্য বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছিলেন। এই তিন কারণে ঐতিহাসিক কীন্ জাহাঙ্গীরকে শের আফগানের হত্যাকার্য্যে নিষ্পাপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। (১) আবুল ফজল এসলাম ধর্ম্মের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যভাবে যুদ্ধঘোষণা করিয়াছিলেন। এ জন্য তিনি মোসলমানসমাজে একান্ত হেয় ছিলেন। আবুল ফজল জাহাঙ্গীরের উন্নতির পথের কণ্টকস্বরূপ ছিলেন। মোসলমান বাদশাহগণ রাজনৈতিক উন্নতির পথের কণ্টক তরবারি দ্বারা উন্মূলিত করিতেন; মোসলমান-সমাজে তাহা বড় নিন্দনীয় ছিল না। সুতরাং আবুল ফজলকে হত্যা করিয়াও জাহাঙ্গীর পরীবাদভাজন হন নাই। বরং কাফেরতুল্য আবুল ফজলকে হত্যা করিবার ফলে তিনি গোঁড়া মোসলমান-সমাজে প্রশংসাভাজন হইয়াছিলেন। কিন্তু মোসলমান-সমাজে স্ত্রীলোভে কাহাকেও হত্যা করা চিরকালই একান্ত গর্হিত কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। সুতরাং জাহাঙ্গীর লোকাপবাদভয়ে শেরের হত্যাকাণ্ডে স্বীয় সংস্রবের বিষয় গোপন করিয়াছেন, এরূপ অনুমানও অসঙ্গত নহে। (২) ইকবলনামা জাহাঙ্গীরের আদেশে রচিত হইয়াছিল, এবং উহার লেখক মোগল-দরবারে উচ্চপদে নিযুক্ত ছিলেন। প্রভু যে বিষয় গোপন করিবার অভিলাষী ছিলেন, তাহা তিনিও প্রচার করিতে পারেন নাই। মহম্মদ হাদি জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর এক শত বৎসর পরে গ্রন্থ লিখিয়াছেন। কিন্তু তিনি পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থসমূহের, বিশেষতঃ ইকবলনামার অবিকল অনুকরণ করিয়াছেন। (৩) মহম্মদ হাদি নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, বাদশাহ কুতুবের শোকে অধীর হইয়া

মেহেরুন্নেসার সহিত অসদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন। আকবর দীর্ঘকাল অপুত্রক ছিলেন। তাহার পর শেখ সেলিম নামক জনৈক সাধুর কৃপায় পুত্র-লাভ করেন। এই পুত্রের নাম জাহাঙ্গীর। কুতুব সাধু সেলিমের জামাতা ও জাহাঙ্গীরের ধাত্রীপুত্র। তাঁহারা আজন্ম একত্র বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। অন্তরঙ্গ বন্ধুর অপঘাতে শোকে অধীর হওয়া অসম্ভব নহে। কিন্তু যদি মেহেরুল-নেসার অতুল রূপরাশি গৌণ অথবা মুখ্যভাবে কুতুবের বিনাশের কারণ না হয়, তাহা হইলে বাদশাহ যে নিরপরাধা বিধবাকে রাজান্তঃপুরে বন্দিনী করিয়া রাখিয়াছিলেন, ইহা কিছু বিচিত্র বটে। মেহেরুলনেসা তেজস্বিনী বীররমণী ছিলেন। শোকাবেগে প্রথমে তিনি স্বামিহন্তার পাণিগ্রহণ করিতে চাহেন নাই, ইহাও অসম্ভব নহে।

যাহা হউক, মেহেরুলনেসা চারি বৎসর রাজান্তঃপুরে অবস্থান করিবার পর জাহাঙ্গীর মহাসমারোহে তাঁহার পাণিগ্রহণ করেন। বিবাহের পর জাহাঙ্গীর বেগমের অতুলপ্রভাবে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার বশীভূত হইয়াছিলেন। বাদশাহ বেগমের সহিত পরামর্শ না করিয়া কোনও কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন না। বস্তুতঃ, আর কোন বেগম আর কোন মোসলমান নরপতির উপর তাঁহার ন্যায় প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন নাই। ইতিহাসবেত্তা হাদি খাঁ লিখিয়া-ছেন,—"তিনি অচিরে বাদশাহের প্রিয়তমা মহিষী হইয়া উঠেন। তিনি প্রথমতঃ নূরমহাল (The Light of the Palace), এবং তাহার পর অত্যল্পদিনের মধ্যেই নূরজাহান বেগম (The Queen, the Light of the World) উপা-ধিতে ভূষিত হন। তাঁহার আত্মীয় স্বজন সকলেই রাজ্যের প্রধান প্রধান পদে নিযুক্ত হন। * * * বাদশাহ ও তদীয় আত্মীয়বর্গ সমস্ত ক্ষমতাচ্যুত হন, এবং ইতিমদ-দ্দৌলার (নূরজাহানের পিতা মীরজা গিয়াস বেগ্) ভৃত্য ও খোজাগণ খাঁ ও তুরখাঁ পদবীলাভ করে। দিলরাণী নাম্নী প্রাচীনা দাসী বাদ-শাহের প্রিয়তমা মহিষীকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। তিনি হাজি কোকাকে অতিক্রম করিয়া রাজপ্রাসাদের দাসীগণের অধিনেত্রীপদ প্রাপ্ত হন; এবং তাঁহার মোহর-যুক্ত অনুমতিপত্র ব্যতীত সদ্রউস-সদুর দাসীদের বেতন প্রদান করিতেন না। নূরজাহান রাজ্যের সমস্ত কার্য্য স্বয়ং নির্ব্বাহিত করিতেন; সর্ব্বপ্রকার সম্মানবিতরণের ভার তাঁহার হস্তেই ন্যস্ত ছিল। নূরজাহান স্বাধীন নরপতির তুল্য ক্ষমতাই লাভ করিয়াছিলেন। কেবল তাঁহার নিজনামে খোৎবা পঠিত হইত না। ইহা ভিন্ন তাঁহার আর কোনও অভাব ছিল না।

কিছু দিন তিনি ঝরোকার (balcony) পার্শ্বেও উপবিষ্টা থাকিতেন, এবং আমীর ওমরাহবর্গ তাঁহাকে অভিবাদন করিতে ও তাঁহার আদেশ গ্রহণ করিতে আসিতেন। তাঁহার নামে রাজমুদ্রা প্রচারিত হইয়াছিল; (১) এবং সনন্দের রাজকীয় মোহরও তাঁহার স্বাক্ষরে শোভিত হইত। সংক্ষেপে, ক্রমশঃ তিনি সর্ব্বতোভাবে অধীশ্বরী হইয়াছিলেন। বাদশাহ নিজে তাঁহার ক্রীড়ণকে পরিণত হইয়াছিলেন। বাদশাহ বলিতেন, "বেগম রাজকার্য্যনির্ব্বাহের ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন, এবং তিনি তাহার উপযুক্তও বটেন। কেবল এক বোতল মদ ও একটুকরা মাংসই আমার নিজের সন্তোষের পক্ষে যথেষ্ট।"

"নূরজাহান সর্ব্বলোকপ্রিয় ছিলেন। যাহারা তাঁহার সাহায্যপ্রার্থী হইত, তিনি তাহাদের প্রার্থনা পূর্ণ করিতেন। তিনি ন্যায়বতী, দানশীলা ও নিপীড়িতের আশ্রয়স্থল ছিলেন। অনেক উপায়হীনা বালিকা নূরজাহানের অর্থসাহায্যে পরিণীতা হইয়াছিল। নূরজাহান জীবনে প্রায় পাঁচ শত বালিকাকে যৌতুক প্রদান করেন, এবং সহস্র সহস্র ব্যক্তি তাঁহার সদাশয়তায় উপকৃত ও কৃতজ্ঞ ছিল।"

জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে শাসন সংরক্ষণ কার্য্যে আকবর-প্রবর্ত্তিত সুব্যবস্থাই অনুসৃত হইয়াছিল, এবং প্রধান রাজপুরুষগণ সাম্রাজ্যের উন্নতিকল্পে নিঃস্বার্থভাবে নিরত ছিলেন। যদিও বাদশাহ নিজে অলস ও বিলাসী ছিলেন, তথাপি পূর্ব্বোক্ত দুই কারণে তাঁহার শাসনকালে ভারতবর্ষ সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠে; অন্তর্বাণিজ্য ও কৃষিকার্য্যের উন্নতি হয়; এবং সর্ব্বত্র পূর্ণ শান্তি বিরাজ করিতে থাকে। প্রধানতঃ চারি জন কর্ম্মনায়কের অক্লান্ত চেষ্টায় ও যত্নেই সাম্রাজ্যের এইরূপ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। উজীর গিয়াস বেগ, মন্ত্রী আসফ খাঁ, সেনাপতি মহাবত খাঁ ও রাজকুমার খরম, এই চারি জন কর্ম্মনায়কই জাহাঙ্গীরের মূলাধার ছিলেন। গিয়াস বেগ নূরজাহানের পিতা; নূরজাহানের প্রাধান্যই তাঁহার উজীরী-পদপ্রাপ্তির কারণ বটে, কিন্তু তিনিও সর্ব্বতোভাবে এই পদের উপযুক্ত ছিলেন। তিনি নির্ম্মলচরিত্র, রাজকার্য্যে সুদক্ষ ও ন্যায়পরায়ণ বিচক্ষণ শাসনকর্ত্তা ছিলেন। গুণমুগ্ধ প্রকৃতিপুঞ্জ তাঁহার একান্ত পক্ষপাতী

(১) রাজমুদ্রায় জাহাঙ্গীরের নামের পার্শ্বে নূরজাহানের নামও অঙ্কিত থাকিত। যে মনোরম বাক্য সহ নূরজাহানের নাম জড়িত থাকিত, তাহা আমরা উদ্ধৃত করিতেছি;—

"By order of the Emperor Jehangir, gold acquired a hundred times additional value by the name of the Empress Nurgehan."

হইয়া উঠিয়াছিল। আসফ খাঁ নূরজাহানের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। ইনিও পিতার ন্যায় রাজনীতিবিশারদ সুদক্ষ রাজকর্ম্মচারী ছিলেন। প্রজারঞ্জনই আসফ খাঁর জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। তিনি অকুণ্ঠিতচিত্তে সর্ব্বদা দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনে নিরত থাকিতেন।

মহাবত খাঁ পাঠানকুলোদ্ভব ও নূরজাহানের আশ্রিত ছিলেন। তাঁহার ইঙ্গিতেই মহাবতের ভাগ্যলক্ষ্মী সুপ্রসন্না হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার এই অনুগ্রহ অপাত্রে ন্যস্ত হয় নাই। তদানীন্তন রাজপুরুষগণের মধ্যে মহাবত খাঁ সর্ব্বাপেক্ষা প্রতিভাশালী ছিলেন। তাঁহার কার্য্যদক্ষতা, তেজস্বিতা ও সাহস মোগল ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। মহাবত খাঁ বাদশাহের একান্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন।

রাজকুমার খরম বাদশাহের তৃতীয় পুত্র, এবং রণকুশল তেজস্বী বীরপুরুষ। আকবর শাহ এক মিবার ব্যতীত সমগ্র রাজস্থান বশীভূত করিয়াছিলেন। মিবারাধিপতি স্বদেশপ্রাণ প্রতাপসিংহের অলৌকিক বীরত্বে আকবর তথায় প্রবেশাধিকার লাভ করিতে পারেন নাই। জাহাঙ্গীর মিবার বশীভূত করিয়া রাজস্থান-বিজয় সম্পূর্ণ করিতে কৃতসংকল্প হন, এবং সেই উদ্দেশ্যে রাজকুমার খরমের অধীনে মিবারে বিপুল বাহিনী প্রেরণ করেন। প্রতাপের পুত্র অমরসিংহ পিতৃগৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য মোগল সৈন্যের বিরুদ্ধে প্রচণ্ডপরাক্রমে দণ্ডায়মান হন; কিন্তু পরাক্রান্ত শত্রুর হস্তে বার বার পরাজিত হইয়া গত্যন্তর না দেখিয়া অবশেষে মোগলের বশ্যতা স্বীকার করেন। মিবার-বিজয় হইতেই খরমের সৌভাগ্যের সূচনা। বাদশাহ তাঁহার সফলতায় প্রীতিলাভ করেন। খরম পুরস্কারস্বরূপ রাজপ্রসাদ প্রাপ্ত হন। ১৬১৪ খৃষ্টাব্দে মিবার-বিজয় সম্পন্ন হয়। আকবর শাহ দক্ষিণাপথের স্বাধীন মোসলমান রাজ্যসমূহ অধিকৃত করিবার অভিপ্রায়ে প্রথমতঃ দক্ষিণাপথের অন্যতম রাজ্য আমেদনগরের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। দেশের কিয়দংশে মোগলপতাকা উড্ডীন হইলেও আকবর নানা কারণে সন্ধিসংস্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তির পর মালিক আম্বার নামক জনৈক সেনাপতি অস্ত্রধারণ করিয়া মোগলের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করেন। জাহাঙ্গীর বাদশাহ দক্ষিণাপথে লুপ্ত গৌরবের পুনরুদ্ধার করিবার অভিপ্রায়ে ১৬১২ খৃষ্টাব্দে সৈন্য প্রেরণ করেন; কিন্তু মালিক আম্বারের নিকট মোগলশক্তি প্রতিহত হয়, এবং বিজয়শ্রী বিপক্ষের অঙ্কশায়িনী হন। শত্রুহস্তে মোগল সৈন্য বিধ্বস্ত হইবার সংবাদ

শুনিয়া বাদশাহ একান্ত ম্রিয়মাণ হন। তিনি শত্রুর বিষদন্ত ভগ্ন করিবার উপায়-উদ্ভাবনে নিরত ছিলেন; এমন সময় শাহজাদা খরম মিবার-বিজয় সম্পন্ন করিয়া নবোদিত সূর্য্যের ন্যায় রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। বাদশাহ দক্ষিণাপথের দুরূহ কার্য্যেও খরমকে নিযুক্ত করিলেন। এবারও বিজয়লক্ষ্মী খরমের অঙ্কশায়িনী হন, এবং মালিক আম্বার বিজিত স্থানসমূহ খরমের হস্তে সমর্পণ করেন। শাহজাদা এইরূপে স্বকার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া সগৌরবে পিতৃ-সন্নিধানে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। মিবার-বিজয়ে খরমের যে সৌভাগ্যসূর্য্যের উদয় হইয়াছিল, আমেদনগরে মালিক আম্বারের পরাজয়ে তাহা মধ্যাহ্ন-গগনে উপনীত হয়। দক্ষিণাপথ হইতে প্রত্যাগত হইবার পর প্রথমদর্শনে বাদশাহ প্রিয়পুত্রকে বারংবার দৃঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়াও পরিতৃপ্ত হন নাই। মিবারের রাণাকে বশীভূত করিয়া খরম বিংশতি সহস্র পদাতিক ও দশ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্যের অধিনায়কত্ব প্রাপ্ত হন। ইহার পর দক্ষিণাপথে যাত্রাকালে বাদশাহ তাঁহাকে শাহ উপাধিতে ভূষিত করেন। দক্ষিণাপথ হইতে সগৌরবে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি রাজপ্রসাদস্বরূপ ত্রিশ সহস্র পদাতিক ও বিংশতি সহস্র অশ্বারোহী সৈন্যের অধিনায়কতা ও শাহজাহান উপাধি লাভ করেন। বাদশাহ ইহাতেও পরিতৃপ্ত না হইয়া দরবারের সময় রাজসিংহাসনের পার্শ্বেই খরমকে পৃথক আসন প্রদান করেন। এরূপ রাজসম্মান সম্পূর্ণ অভিনব। ইহার পূর্ব্বে তৈমুরবংশীয় আর কোনও রাজকুমার রাজসিংহাসনের পার্শ্বে পৃথক্‌ভাবে উপবিষ্ট হইবার অধিকার পান নাই। শাহজাহান জাহাঙ্গীরের কিরূপ প্রিয়পাত্র ছিলেন, আর একটি ঘটনা হইতে তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। বাদশাহ একান্ত মৃগয়াপ্রিয় ছিলেন। মৃগয়ায় ব্যাপৃত হইয়া অপরিসীম আনন্দ অনুভব করিতেন। একদা শাহজাহা-নের একটি পুত্র সাংঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত হয়। বাদশাহ পৌত্রের আরোগ্য-কামনায় স্বার্থত্যাগ করিবার উদ্দেশ্যে ঈশ্বরের নিকট শপথ পূর্ব্বক মৃগয়া পরিত্যাগ করেন; তাহার পর ক্রমান্বয়ে পাঁচ বৎসর কাল তিনি এই অঙ্গীকার প্রতিপালন করিয়াছিলেন।

যে চারি জন কর্ম্মনায়কের চেষ্টায় ও যত্নে জাহাঙ্গীরের শাসনকালে মোগল সাম্রাজ্যের গৌরব ও বৈভব পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল, তাঁহাদের মধ্যে গিয়াস বেগ ও আসফ খাঁ বাদশাহের অন্তরঙ্গ কুটুম্ব, মহাবত খাঁ তাঁহার নিঃসম্পর্কীয় হইলেও একান্ত প্রীতিভাজন এবং শাহজাহান তাঁহার প্রাণাধিক পুত্র ছিলেন। ফলতঃ

তাঁহারা যে কেবলমাত্র মোগল সাম্রাজ্যের স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন, তাহা নহে; বাদশাহের সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনেও আবদ্ধ ছিলেন। কিন্তু নূরজাহান বেগম বাদশাহকে প্রণয়ের কুহকমন্ত্রে এরূপ আয়ত্ত করিয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহার প্ররোচনায় শাহজাহানের ন্যায় সমরক্ষেত্রের প্রধান অবলম্বন প্রাণাধিক পুত্রকে ও মহাবত খাঁর ন্যায় প্রীতির আস্পদ ও কার্য্যক্ষেত্রের প্রধান সহায় সেনাপতিকেও হৃদয় হইতে অপসারিত করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। আমরা সে বিচিত্র কাহিনীর বর্ণনা করিতেছি।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, দক্ষিণাপথে আমেদনগর রাজ্যে মালিক আম্বার যুদ্ধঘোষণা করিলে জাহাঙ্গীর তাঁহার দমনের জন্য সৈন্য প্রেরণ করেন। প্রথমতঃ মোগলসৈন্য শত্রুহস্তে পরাভূত হয়; কিন্তু তাহার পর শাহজাহান তথায় উপস্থিত হইয়া মোগলের লুপ্ত গৌরবের উদ্ধার করিয়া পিতৃসন্নিধানে প্রত্যাবৃত্ত হন। এই ঘটনা রাজত্বের দ্বাদশতম বর্ষে, অর্থাৎ ১৬১৭ খৃষ্টাব্দে, সংঘটিত হইয়াছিল।

ইহার কতিপয় বৎসর পরে, ১৬২১ খৃষ্টাব্দে, মালিক আম্বার পুনর্ব্বার দক্ষিণাপথে গোলযোগ উপস্থিত করিলে, শাহজাহান দ্বিতীয় বার তথায় প্রেরিত হইলেন। এবারও বিজয়লক্ষ্মী তাঁহার প্রতি প্রসন্না হইলেন। কিন্তু এই সময় নূরজাহানের বিষদৃষ্টিতে পতিত হইয়া তিনি পিতৃস্নেহ হইতে বঞ্চিত হইলেন।

খরম জাহাঙ্গীরের পর মোগল সাম্রাজ্য করতলগত করিবার অভিলাষী ছিলেন, ইহা নূরজাহানের অপরিজ্ঞাত ছিল না। সম্রাটের জ্যেষ্ঠ পুত্র খসরু বিদ্রোহী হইবার পর হইতে বন্দিভাবে অবস্থান করিতেছিলেন। দক্ষিণাপথের তৃতীয় যুদ্ধের সময় তিনি কালগ্রাসে পতিত হইলেন। দ্বিতীয় পুত্র প্রবেজও বাদশাহের অনুরাগী ছিলেন না; বিশেষতঃ, তিনি উচ্চাশাবিহীন নিরীহপ্রকৃতি ছিলেন। সুতরাং তৃতীয় পুত্র শাহজাহানের সাম্রাজ্যলাভের আশা ফলবতী হইবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু তিনি নূরজাহান বেগমের অনুগত ছিলেন না। নূরজাহানের শের আফগানের ঔরসজাতা এক কন্যা ছিল। বাদশাহের চতুর্থ পুত্র শাহরিয়ার রাজাদেশে তাঁহাকে বিবাহ করেন। শাহরিয়ার নূরজাহানের একান্ত অনুগত ছিলেন। শাহজাহান সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলে নূরজাহানের প্রাধান্য ও ক্ষমতা বিলুপ্ত হইবার সম্ভাবনা ছিল। পক্ষান্তরে, শাহরিয়ার পিতৃসিংহাসনের অধিকারী হইলে

আজীবন নূরজাহানের অনুগত থাকিবেন, ইহা লোকে বিশ্বাস করিত। এ জন্য নূরজাহান শাহরিয়ারকে সাম্রাজ্যেশ্বর করিয়া স্বীয় প্রাধান্য ও ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার সঙ্কল্প করেন। কিন্তু শাহজাহান এই আশার কণ্টক ছিলেন। তিনি জানিতেন যে, শাহজাহান বাদশাহের নিকটে থাকিতে তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবার নহে। যখন শাহজাহান দক্ষিণাপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে ব্যাপৃত, সেই সময়ে পারস্যপতি মোগলের হস্ত হইতে কান্দাহার কাড়িয়া লইলেন। নূরজাহান শাহজাহানকে সম্রাটের নিকট হইতে দূরে প্রেরণ করিবার ইহাই উত্তম সুযোগ মনে করিয়া, তাঁহাকে তথায় প্রেরণ করিবার প্রস্তাব করিলেন। তদনুসারে বাদশাহ শাহজাহানকে কান্দাহারে অভিযান করিবার আদেশ দিলেন। শাহজাহান এই আদেশ প্রাপ্ত হইয়া বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার সিংহাসনা-রোহণের পথে কণ্টকরোপণ করিবার জন্যই নূরজাহান চক্রান্ত করিয়া তাঁহাকে দূরদেশে প্রেরণ করিতেছেন। সুতরাং তিনি রাজাদেশ-প্রতিপালনে কাল-বিলম্ব করিলেন। বেগম এই সূত্র অবলম্বন করিয়া সুনিপুণ কৌশলে পিতা-পুত্রের মনোমালিন্য ঘটাইয়া দিলেন। তাহার ফলে বাদশাহ খরমের সমস্ত জায়গীর বাজেয়াপ্ত করিবার আদেশ প্রচারিত করিলেন।

অবশেষে শাহজাহান বিদ্রোহ-পতাকা উড্ডীন করিয়া আপনাকে সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিলেন, এবং সসৈন্যে দিল্লীর অভিমুখে ধাবিত হইলেন। পথিমধ্যে রাজসৈন্যের সহিত তাঁহার সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। শাহজাহান রাজসৈন্যের হস্তে পরাজিত হইয়া দক্ষিণাপথে পলায়ন করিলেন, এবং শাহজাদা প্রবেজ ও সেনাপতি মহাবত খাঁ রাজাদেশে তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিলেন। দক্ষিণাপথের কোনও নরপতি অথবা শাসনকর্ত্তা শাহজাহানের পক্ষ অবলম্বন করিতে স্বীকৃত না হওয়ায় তিনি অনন্যোপায় হইয়া উড়িষ্যার পথে বঙ্গদেশে উপনীত হইলেন। এই সময় নূরজাহানের ভ্রাতা এব্রাহিম ফতেজঙ্গ বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তিনি প্রবলপরাক্রমে শাহজাহানের গতিরোধের জন্য দণ্ডায়মান হইলেন। কিন্তু অবিলম্বে রণক্ষেত্রে শত্রুহস্তে নিহত হইলেন; রাজসৈন্য ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। সমগ্র বঙ্গদেশ রাজকুমারের পদানত হইল। তিনি তথায় স্বীয় প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া বিহারের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তত্রত্য রাজপুরুষগণ রাজকুমারের আগমনবার্ত্তা ও বঙ্গদেশ-বিজয়ের সংবাদ শুনিয়া ভয়ব্যাকুলচিত্তে পলায়ন করিলেন। শাহ-জাহান বিহারের বন্দোবস্ত করিয়া সগৌরবে রাজধানীর অভিমুখে যাত্রা

করিলেন। এলাহাবাদের নিকটবর্ত্তী জুসি নামক স্থানে শাহজাদা প্রবেজ ও মহাবত খাঁর অধীনে রাজসৈন্য তাঁহার সম্মুখীন হইল। তুমুল যুদ্ধের পর শাহজাহান সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইলেন, এবং তাঁহার সমস্ত সৈন্য বিধ্বস্ত হইয়া গেল। শাহজাহান পুনর্ব্বার দক্ষিণাপথে গমন করিয়া মোগল সাম্রাজ্যের চিরশত্রু মালিক আম্বারের সহিত মিলিত হইলেন। বাদশাহ পুত্রের পরাজয়-সংবাদে প্রীত হইয়া মহাবত খাঁকে বঙ্গদেশের সুবাদারপদে নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু শাহজাহান সম্পূর্ণরূপে পরাজিত না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহাকে যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিবার ও তদীয় পুত্র খানজাদ খাঁকে প্রতিনিধিরূপে শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিবার আদেশ দিলেন।

এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই মহাবত খাঁর দুর্দ্দশার সূত্রপাত হইল। জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর শাহরিয়ারকে রাজপদে বরণ করিবার বিষয়ে মহাবত খাঁ নূরজাহানের মতাবলম্বী ছিলেন না। তাঁহার সহিত আসফ খাঁর মনোমালিন্য ছিল। এ জন্য তাঁহারা উভয়েই শাহরিয়ারের অহিতকামী ছিলেন। শাহজাহানের সহিত যুদ্ধকালে বহুসংখ্যক হস্তী মহাবত খাঁর হস্তগত হইয়াছিল। তিনি এই সকল হস্তী যথাসময়ে বাদশাহের নিকট প্রেরণ করেন নাই। নূরজাহান ও তাঁহার ভ্রাতা এই উপলক্ষে মহাবত খাঁকে রাজদ্রোহী ও রাজস্ব-অপহরণকারী প্রতিপন্ন করিলেন। বাদশাহ তাঁহাদের প্ররোচনায় মহাবত খাঁকে কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া অগৌণে দরবারে হাজির হইবার আদেশ দান করিলেন। এই আদেশপত্র প্রাপ্ত হইয়া মহাবত খাঁ বুঝিতে পারিলেন, তিনি শত্রুর ষড়যন্ত্রে বাদশাহের কোপানলে পতিত হইয়াছেন। এ জন্য আবশ্যক হইলে বাদশাহের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার কল্পনায় তাঁহার কার্য্যে উৎসৃষ্টপ্রাণ পঞ্চ সহস্র অসমসাহসী রাজপুত যোদ্ধার সহিত তিনি রাজদর্শনে যাত্রা করিলেন। এই সময় বাদশাহ কাবুলে গমন করিতেছিলেন। পথিমধ্যে ঝিলমের তটে মহাবত খাঁ রাজশিবিরে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু আসফ খাঁর চক্রান্তে রাজদর্শনলাভ করিতে পারিলেন না। মহাবত খাঁ রাজার অনুমতি না লইয়া স্বীয় কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন। এই কারণে বাদশাহ প্রথমে মহাবত খাঁর জামাতার দণ্ডবিধান করিয়া অবশেষে তাঁহাকে কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন। এই সকল ঘটনায় মহাবত খাঁ বুঝিতে পারিলেন, পুনর্ব্বার জাহাঙ্গীরের প্রীতিলাভ সম্পূর্ণ অসম্ভব। তখন তিনি স্থির করিলেন, বলপূর্ব্বক বাদশাহকে হস্তগত করিবেন। এই সময়ে একদিন প্রত্যুষে বাদশাহ

ঝিলমের তটদেশ পরিত্যাগ করিয়া কাবুল-যাত্রার উদ্যোগ করিলেন। বাদশাহের শিবিবের সম্মুখেই ঝিলম; ঝিলমের অপর পার হইতে কাবুলের পথ প্রসারিত। প্রথমতঃ সৈন্যগণের ও তাহার পর বাদশাহের ঝিলম উত্তীর্ণ হইবার বন্দোবস্ত হইয়াছিল। তদনুসারে সৈন্যগণ অতিপ্রত্যুষে বাদশাহ ও তদীয় পার্শ্বচরদিগকে শিবিরে রাখিয়া নৌসেতু-যোগে ঝিলম নদ উত্তীর্ণ হইল। রাজসৈন্য অপর তীরে উপনীত হইবামাত্র মহাবত খাঁ রাজপুত সৈন্যের সাহায্যে নৌসেতু ভস্মীভূত করিয়া বাদশাহকে অবরুদ্ধ করিলেন। এই সময় নূরজাহান বেগম বাদশাহের সহিত অবস্থান করিতেছিলেন। মহাবত খাঁ বাদশাহকে বন্দী করিতে ব্যাপৃত ছিলেন, তাঁহার অন্য দিকে মনঃসংযোগ করিবার অবকাশ ছিল না। বেগম এই সুযোগে অন্যের অলক্ষ্যে ঝিলম নদ উত্তীর্ণ হইয়া অপর তীরে রাজসৈন্যের সহিত মিলিত হইলেন।

বেগম তথায় উপনীত হইয়া ওমরাহদিগকে একত্র সমবেত করিলেন। ওমরাহগণ অপরিণামদর্শীর ন্যায় বাদশাহকে পশ্চাতে রাখিয়া নদী উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদিগকে যথোচিত ভৎসনা করিলেন, এবং মহাবতের হস্ত হইতে বাদশাহকে উদ্ধার করিবার জন্য পরদিন সসৈন্যে আক্রমণ করিবার উদ্যোগে প্রবৃত্ত হইলেন। পরদিন প্রত্যুষে উভয় পক্ষে ঘোরতর সংগ্রামের সূত্রপাত হইল। বেগম স্বয়ং গজারোহণে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া সৈন্যদিগকে উৎসাহিত ও উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। তিনি কেবল উৎসাহ দিয়াই নিশ্চিন্ত হইলেন না, নিজেও শত্রুসৈন্যের মধ্যে ক্ষিপ্রহস্তে তীর-নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ক্রমাগত তিন জন হস্তিচালক শত্রুনিক্ষিপ্ত শরে নিহত হইল, তথাপি বেগমের অদম্য তেজ প্রতিহত হইল না। তিনি ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তেজস্বিনী বীররমণী স্বামীর উদ্ধারকল্পে এইরূপে শৌর্য্য বীর্য্যের একশেষ প্রদর্শন করিলেন। কিন্তু তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইল না। রাজপুত সৈন্যের প্রবল আক্রমণে রাজসৈন্য বিধ্বস্ত ও ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। অগত্যা নূরজাহান লাহোরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

মহাবত খাঁ বাদশাহকে বন্দী করিয়া সগৌরবে কাবুলের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। যদিও তিনি বাদশাহকে বন্দী করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহাকে রাজোচিত সম্মান ও মর্য্যাদা-প্রদর্শনে কখনও ত্রুটী করিতেন না। বাদশাহের রাজকীয় মর্য্যাদা সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ ছিল। আরামপ্রিয় সম্রাটের সন্তোষের পক্ষে তাহাই পর্য্যাপ্ত হইল। বাদশাহ মহাবত খাঁর সহিত আপনার সম্প্রীতির বর্ণনা

করিয়া, তাঁহার হস্ত হইতে আপনাকে মুক্ত করিবার জন্য কোনও উদ্যোগ করিতে নিষেধ করিয়া বেগমকে পত্র লিখিলেন, এবং বেগমকে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতে বলিলেন।

নূরজাহান কাবুলের পথে রাজশিবিরে উপনীত হইলে, মহাবত খাঁ তাঁহাকে রাজদর্শন করিতে দিলেন না। তিনি বেগমের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ উপস্থিত করিলেন। (১) মহাবত জাহাঙ্গীরকে বলিলেন, "জাহাপনা, মোগল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর, আমরা আপনাকে লোকাতীত ক্ষমতাপন্ন বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকি। ঈশ্বরের অনুকরণে আপনার কাজ করা কর্ত্তব্য। আপনি ব্যক্তিত্বের সম্মানরক্ষক নহেন।" বেগমের যে মোহিনী শক্তিতে বাদশাহ অভিভূত ছিলেন, অদর্শনের ফলে তাহা অপসৃত হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন তিনি মহাবত খাঁর সম্পূর্ণ আয়ত্ত ছিলেন। এ জন্য তিনি মহাবত খাঁর অভিযোগ শ্রবণ করিয়া বেগমের প্রাণদণ্ডের আদেশপত্রে স্বাক্ষর করিলেন। এই ভীষণ সংবাদ বেগমের কর্ণগোচর হইলে তিনি অবিচলিত চিত্তে বলিলেন, "বন্দী নরপতিগণ প্রাণদণ্ডবিধানের ক্ষমতা হইতে বিচ্যুত হইয়া থাকেন। একবার আমাকে বাদশাহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে এবং তিনি যে হস্তে আমার প্রাণদণ্ডের আদেশপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন, সেই হস্ত অশ্রুসিক্ত করিতে দাও।" মহাবত খাঁর সাক্ষাতে নূরজাহান বাদশাহের নিকট আনীতা হইলেন। মানসিক যন্ত্রণায় তাঁহার সৌন্দর্য্য আরও বর্দ্ধিত হইয়াছিল। তিনি একটি কথাও কহিলেন না। জাহাঙ্গীর বাষ্পাকুললোচনে বলিলেন, "মহাবত, তুমি কি এ রমণীর জীবন রক্ষা করিবে না? দেখ, নূরজাহান কিরূপ অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেছেন।" মহাবত খাঁ প্রত্যুত্তরে বলিলেন, "মোগলাধিপতির প্রার্থনা কখনও বিফল হইতে পারে না।" তাহার পর নূরজাহান প্রাণদণ্ড হইতে অব্যাহতিলাভ করিলেন।

অতঃপর বাদশাহ কাবুলে উপস্থিত হইলেন। ছয় মাস কাবুলে অতিবাহিত করিয়া তিনি লাহোরে ফিরিয়া আসিলেন। বাদশাহ মধুরপ্রকৃতি ও ক্ষমাশীল ছিলেন। এই জন্য মহাবত খাঁর সহিত তাঁহার মিলন হইয়াছিল। বাদশাহের প্রসাদলাভ করিয়া মহাবত খাঁ আপনাকে নিরাপদ বিবেচনা করিতে লাগিলেন। যদি বেগম গোপনে মহাবত খাঁর বিরুদ্ধে বাদশাহকে কিছু বলিতেন, তাহা হইলে তিনি তাহা অকপটভাবে প্রকাশ করিয়া দিতেন। এই সকল কারণে মহাবত খাঁ নিঃশঙ্ক ও নিঃসন্দিগ্ধ হইয়া অসতর্ক হইয়া পড়িলেন,

এবং সম্রাটকে হস্তামলকের ন্যায় স্বীয় করতলগত রাখিবার জন্য যে রাজপুত সৈন্যদল পালন করিতেছিলেন, তাহার সংখ্যার হ্রাস করিলেন। নূরজাহান জাহাঙ্গীরকে মহাবতের হস্ত হইতে উদ্ধার করিবার জন্য এক দিনের নিমিত্তও নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। মহাবত খাঁকে অসতর্ক দেখিয়া স্থকৌশলে তাঁহার অধীনতাপাশ ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। মহাবত খাঁ প্রাণভয়ে অধীর হইয়া বাত্যাতাড়িত বৃক্ষপত্রের ন্যায় নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। আসফ খাঁ মহাবতের দুরবস্থা দেখিয়া কৃপাপরবশ হইয়া বাদশাহের সঙ্গে তাঁহার পুনর্ম্মিলন ঘটাইয়া দিলেন।

এই সময়ে পিতৃদ্রোহী শাহজাহান দক্ষিণাপথে নানারূপ উৎপাত করিতেছিলেন। তাঁহাকে দমন করিবার জন্য মহাবত খাঁ ও শাহজাদা প্রবেজ পুনর্ব্বার নিযুক্ত হইলেন। তাঁহাদের দক্ষিণাপথে উপনীত হইবার পূর্ব্বেই প্রবেজ অতিরিক্ত স্থরাপান নিবন্ধন অকালে কালগ্রাসে পতিত হইলেন। এ দিকে শাহজাহান পিতার নিকট ক্ষমাপ্রার্থী হইয়া সমস্ত মনোবাদের মূলোচ্ছেদ করিলেন। শাহজাহান ও মহাবত খাঁ উভয়েই বিদ্রোহী হইয়াছিলেন। মহাবত খাঁ পূর্ব্বেই বাদশাহের ক্ষমালাভ করিয়াছিলেন। এক্ষণে শাহজাহানও পুনর্ব্বার রাজানুগ্রহলাভ করিলেন। কিন্তু কাহারও ভাগ্যেই পূর্ব্ব গৌরব ও মর্য্যাদালাভ ঘটিল না। অবস্থার সৌসাদৃশ্যবশতঃ উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হইল, এবং তাঁহারা দক্ষিণাপথে পরস্পর সম্মিলিত হইয়া নির্ব্বাপিত দীপের দশাবৎ অসহ্য দুঃখে প্রধূমিত হইতে লাগিলেন।

মহাবত খাঁ ও শাহজাহানের সম্মিলনের পর জাহাঙ্গীর বাদশাহ অতি অল্পদিন জীবিত ছিলেন। রাজত্বের ষোড়শতম বর্ষে তিনি গুরুতর শ্বাসকাশে আক্রান্ত হন। তিনি এই ব্যাধির দারুণ-যন্ত্রণা-নিবারণের জন্য অনবরত মদ্যপান করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু নূরজাহান অচিরে তাঁহার সেবাস্থশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইয়া চিকিৎসার উপযুক্ত বন্দোবস্ত করেন। বাদশাহ লিখিয়া গিয়াছেন যে, "তিনি (বেগম) বুদ্ধিমত্তা ও বহুদর্শিতায় চিকিৎসক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন, এবং সপ্রেম সেবায় চিত্তবিনোদন করিয়া স্থরার মাত্রাহ্রাস ও ব্যাধির উপযুক্ত ঔষধপ্রয়োগে যত্ন করিতেন। রাজমহিষীর অক্লান্ত সেবাস্থশ্রূষায় তাঁহার পীড়া উপশমিত হয়, কিন্তু তিনি সম্পূর্ণরূপ আরোগ্যলাভ করিতে পারেন নাই।

১৬২৭ খৃষ্টাব্দে নিদারুণ শ্বাসকাশ পুনর্ব্বার প্রবলাকারে দর্শন দিল। এই বৎসরের মার্চ্চ মাসের একাদশ দিবসে বাদশাহ কাশ্মীরযাত্রাকালে পথিমধ্যে

চিনাবের তটদেশে স্বীয় রাজত্বের দ্বাবিংশতিতম বার্ষিক উৎসব সম্পন্ন করিলেন। কিন্তু এই প্রমোদ-উৎসবে রোগক্লিষ্ট সম্রাটের হৃদয়ে আনন্দ-উচ্ছ্বাসের তরঙ্গ উঠিল না। রঙ্গক্ষেত্রের মোহন দৃশ্য, মণি মুক্তার ঔজ্জ্বল্য ও সজ্জাপটের কারু-কার্য্য বাদশাহের তেজোহীন নয়নে সৌন্দর্য্যের দ্বার উন্মুক্ত করিতে পারিল না; নর্ত্তকীগণের মধুর গীতিধারায় বাদশাহের কর্ণবিবর সুধাধারায় অভিষিক্ত হইল না। অহিফেন তাঁহার যন্ত্রণার উপশমে শক্তিহীন হইয়া পড়িল, এবং সুরার প্রভাবে তাঁহার ইন্দ্রিয় আর উত্তেজিত হইত না। তিনি ভূস্বর্গের স্বাস্থ্যপ্রদ জলবায়ুতে আরোগ্যলাভের কামনায় শীঘ্রগামী হইলেন; কিন্তু পার্ব্বত্য জল বায়ুতেও তাঁহার ভগ্নদেহে সঞ্জীবনী শক্তির সঞ্চার হইল না। শীতসমাগমে সম্রাট পুনর্ব্বার লাহোরের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। বৈরাম-কিলা নামক স্থানে উপনীত হইয়া বাদশাহ মৃগয়ার নিমিত্ত কৃষ্ণহরিণ তাড়াইয়া আনিবার আদেশ দিলেন, এবং বন্দুক হস্তে অত্যুচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গের পাদদেশে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এক জন তাড়নাকারী দৈবাৎ পদস্খলিত হইয়া পর্ব্বতশৃঙ্গের উপরিভাগ হইতে নিম্নে পতিত হইল, এবং বাদশাহের সম্মুখেই প্রাণ পরিত্যাগ করিল। দুর্ব্বলদেহ বাদশাহ এই ভীষণ দৃশ্য সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি অবিলম্বে শিবিরে প্রত্যাগমন করিয়া সেই দুর্ভাগ্য ব্যক্তির মাতাকে অর্থপ্রদান পূর্ব্বক অনুতাপদগ্ধ হৃদয় শান্ত করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু বাদশাহ আর মনের শান্তিলাভ করিতে পারিলেন না। অপঘাত মৃতের বিকট দৃশ্য তাঁহার নয়নসমক্ষে সর্ব্বদা ভাসমান হইতে লাগিল। এই সময় তাঁহার স্বাস্থ্য একবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি বৈরামকিলা পরিত্যাগ করিয়া রাজোর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে সুরাপানের জন্য অধীর হইয়া পানপাত্র হাতে তুলিয়া লইলেন, কিন্তু সুরার পিয়ালা অধরস্পৃষ্ট হইবার পূর্ব্বেই বিরক্তিসহকারে দূরে নিক্ষেপ করিলেন। তাহার পরদিন, উনষষ্টিতম বর্ষ বয়ঃক্রমে বিলাসী বাদশাহ জাহাঙ্গীর কালগ্রাসে পতিত হইলেন।

জাহাঙ্গীরের চিত্রসম্মুখে সুরাপাত্র সংস্থাপিত না করিলে, তাঁহার চিত্র অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। তিনি স্বরচিত জীবনবৃত্তে লিখিয়াছেন, "আমি চতুর্দ্দশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত দুই তিন বার ব্যতীত আর কখনও মদ্য স্পর্শ করি নাই। তাহাও আমার মাতা অথবা ধাত্রী শৈশবসুলভরোগ-নিবারণের জন্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন। একবার আমার পিতাও একতোলা পরিমাণ আরক গোলাপ-জলে মিশ্রিত করিয়া কাশি-নিবারণের জন্য আমাকে সেবন করাইয়াছিলেন।

একদিন আমি মৃগয়ার্থ বহির্গত হইয়াছিলাম। মৃগয়াক্ষেত্রে নানা দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল, আমিও অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। এক জন অনুচর আমাকে বলিল যে, এক পেয়ালা সুরাপান করিলে আমার সমস্ত শ্রান্তি ও ক্লেশ দূরীভূত হইবে। সে সময়ে আমি নবীন যুবক ও আমার চিত্ত বিলাসোন্মুখ, সুতরাং আমি শ্রান্তিনাশক পানীয় আনিবার জন্য হাকিম আলীর গৃহে এক জন ভৃত্যকে প্রেরণ করিলাম। এই ভৃত্য একটি ক্ষুদ্র বোতলে দেড় পেয়ালা পরিমিত পীতবর্ণ সুস্বাদু সুরা লইয়া আসিল। আমি উহা পান করিলাম। ইহার ফল আনন্দপ্রদ হইয়াছিল। তদবধি আমি সুরাপানে অভ্যস্ত হইলাম। আমি প্রত্যহই মাত্রাবৃদ্ধি করিতাম। ক্রমশঃ মাত্রাবৃদ্ধি করাতে দ্রাক্ষারসের আর আমাকে প্রমত্ত করিয়া তুলিবার শক্তি রহিল না। ইহার পর হইতেই আমি আরক পান করিতে আরম্ভ করিয়াছি। ক্রমশঃ মাত্রাবৃদ্ধি করিতে করিতে নয় বৎসরের মধ্যে দুইবার চোঁয়ান আরক বিশ পেয়ালা নিঃশেষ করিতে অভ্যস্ত হইয়াছিলাম। ইহার চৌদ্দ পেয়ালা দিবাভাগে ও অবশিষ্ট ছয় পেয়ালা রাত্রিকালে পান করিতাম। এই বিশ পেয়ালা সুরার হিন্দুস্থানী ওজন ছয় সের।

"এই সময়ে আমি একটা মুরগী ও কিঞ্চিৎ রুটী আহার করিতাম। কেহই আমার সঙ্গে বাদানুবাদ করিতে সাহসী হইত না। অবশেষে এমন হইয়াছিল যে, প্রমত্তাবস্থায় আমি হস্তকম্পন-নিবন্ধন পানপাত্র ধারণ করিতে পারিতাম না। কিন্তু অন্যে পানপাত্র ধারণ করিয়া থাকিত, আমি চুমুক দিতাম। অবশেষে হাকিম হুমামকে আহ্বান করিয়া তাঁহার নিকট আমার সমস্ত অবস্থা জ্ঞাপন করিলাম। তিনি দয়া ও যত্নপূর্ব্বক কিছুমাত্র গোপন না করিয়া আমাকে বলিলেন যে, যদি আমি এ ভাবে আর ছয় মাস কাল সুরাপান করি, তাহা হইলে আমার অবস্থা সংশোধনের অতীত হইবে। তাঁহার পরামর্শ উত্তম ও জীবন মূল্যবান। তাঁহার বাক্যে আমার অনেক ফল হইয়াছিল। সেই দিন হইতে আমি সুরার পরিমাণ হ্রাস করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। কিন্তু কলুহা (ভাঙ্গ) সেবন করিতে আরম্ভ করি। সুরার মাত্রা হ্রাস করিবার সঙ্গে সঙ্গেই আমি ভাঙ্গের মাত্রা বর্দ্ধিত করিয়াছি, এবং দুই ভাগ দ্রাক্ষারস ও এক ভাগ আরক মিশ্রিত করিয়া আমার পানীয় সুরা প্রস্তুত করিবার আদেশ দিয়াছি। প্রত্যহ মাত্রার পরিমাণ হ্রাস করিয়া

পেয়ালার সুরার পরিমাণ সওয়া আঠার মিস্কাল। বিগত পঞ্চদশ বৎসর যাবৎ আমি এই পরিমাণ পান করিতেছি ; ইহা অপেক্ষা কম বেশী পান করি না।”

জাহাঙ্গীরের যত দোষই থাকুক না কেন, তাঁহার স্বভাব অমায়িক, মধুর ; এবং হৃদয় স্নেহকোমল ও সরল ছিল। আমরা তাঁহার স্নেহশীলতার একটি উদাহরণ প্রদান করিতেছি। শাহজাদা খসরুর মাতা বাদশাহের প্রথমা মহিষী ছিলেন। খসরু বিদ্রোহপতাকা উড্ডান করিলে তিনি মনঃকষ্টে আত্মহত্যা করেন। এই উপলক্ষে বাদশাহ লিখিয়াছেন, “কিরূপে আমি তাঁহার সদ্‌গুণ-রাজি ও অমায়িক স্বভাবের বর্ণনা করিব ? তাঁহার বুদ্ধি অতিশয় তীক্ষ্ণ ছিল, এবং আমার প্রতি তাঁহার ভালবাসা এরূপ ছিল যে, তিনি আমার একগাছি কেশরক্ষার জন্য সহস্র পুত্র অথবা ভ্রাতাকে উৎসর্গ করিতে পারিতেন। * * * তিনি আমার প্রথমা মহিষী, আমি বাল্যকালে তাঁহার সহিত পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলাম। খসরুর জন্মের পরে আমি তাঁহাকে শাহবেগম উপাধি প্রদান করি। * * * তাঁহার মৃত্যুতে আমি এত দূর অভিভূত হই যে, আমি জীবনে যত্নহীন ও আমোদ আহ্লাদে বীতস্পৃহ হইয়াছিলাম। ক্রমাগত চারি অহোরাত্র আমি গভীর শোকে ও দুঃখে জর্জ্জরিত হইয়া পানাহারেও যত্ন করি নাই।”

জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে ইংরেজগণ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নামে ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করেন। তদানীন্তন ইংলণ্ডপতি এই বণিক-দলকে কোন কোন স্বত্বপ্রদানার্থ বাদশাহকে অনুরোধ করিবার জন্য দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই দূত সুপ্রসিদ্ধ সার্ টমাস্ রো। তিনি আপনার দৌত্যের যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতেও বাদশাহের প্রকৃতি সম্বন্ধে আমরা অনেক কথা জানিতে পারি।

সার টমাস্ রো লিখিয়াছেন, “বাদশাহ প্রত্যহ প্রাতঃকালে সিংহদ্বার-সংলগ্ন প্রাঙ্গনের গবাক্ষপথে উপনীত হইয়া জনসাধারণকে দর্শন দেন। তাহার নিম্নে রেলের ভিতরে প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণ উপস্থিত থাকেন। * * * অপরাহ্ণে তিনি দরবারে উপবেশন করেন। তিনি সায়ংভোজনের পর রাত্রি আট ঘটিকার সময় গোসলখানায় উপস্থিত হইয়া মর্ম্মরপ্রস্তরবিনির্ম্মিত সিংহাসনে উপবেশন করেন। এখানে গুণী ব্যক্তি ব্যতীত আর কাহারও প্রবেশাধিকার নাই, এবং ইঁহাদের মধ্যেও প্রায় কেহ বিনানুমতিতে প্রবেশ করিতে পারেন না। এই স্থানে তিনি সকল বিষয়ে আলাপ করেন। পীড়া অথবা পান

নিবন্ধন উপস্থিত হইতে না পারিলে, এই নিয়মের ব্যত্যয় হয় না। কোন প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইলে তাহা অবশ্যই বিজ্ঞাপিত হইবে। কারণ, সমস্ত প্রজা তাঁহার ক্রীতদাসতুল্য। এ জন্য তিনিও তাহাদের নিকট পারস্পরিকভাবে একপ্রকার দাসত্বে আবদ্ধ। কারণ, এই সকল সময় ও রীতি তিনি এরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে প্রতিপালন করেন যে, বাদশাহকে একদিন দেখিতে না পাইলে ও তাঁহার অনুপস্থিতির উপযুক্ত হেতু প্রদর্শিত না হইলে প্রজাবর্গ বিদ্রোহী হইতে পারে। মঙ্গলবার তিনি বিচারকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। বাদশাহ দীনতম প্রজার অভিযোগও অগ্রাহ্য করেন না, এবং বিচারকালে উভয় পক্ষের বক্তব্য ধৈর্য্যসহকারে শ্রবণ করাই তাঁহার নিয়ম।"

সার্ টমাস রোর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতেই বাদশাহ তাঁহার প্রার্থনামত বণিকদলকে অভীপ্সিত স্বত্ব প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হন। কিন্তু রাজমহিষী নুরজাহান ও মন্ত্রী আসফ খাঁ ও শাহজাদা প্রবেজ বিরুদ্ধাচরণ করাতে, সার টমাসকে তিন বৎসর মোগল-দরবারে অবস্থান করিতে হইয়াছিল। বাদশাহের দরবারে তিনি কি ভাবে গৃহীত হইতেন, তাহার এক দিনের বিবরণ আমরা এখানে প্রদান করিতেছি। রো অভিযোগ করিতেছিলেন, এবং আসফ খাঁ দ্বিভাষীকে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু দ্বিভাষী সার্ টমাসের বাধ্য, সুতরাং আসফ খাঁর ইঙ্গিত নিষ্ফল হইতেছিল। বাদশাহ তাহা বুঝিতে পারিয়া হঠাৎ কোপান্বিত হইয়া উঠিলেন। কে টমাসের সহিত অসদ্ব্যবহার করিয়াছে, তাহা পরিজ্ঞাত হইবার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করেন। বাদশাহ স্বীয় পুত্রের নাম শ্রুত হইয়া অনুমান করেন যে, রো তাঁহার বিরুদ্ধেই অভিযোগ করিতেছেন। আসফ খাঁ কম্পিত হইতেছিলেন। বাদশাহ রাজকুমারকে যথেষ্ট ভর্ৎসনা করিয়া নিজে ক্রটী স্বীকার করেন। এই বাক্‌বিতণ্ডার পরে তিনি গাত্রোত্থান করেন, এবং সেই সময় সার টমাসকে পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইতে বলেন। আমরা আর একদিনের ঘটনা লিপিবদ্ধ করিতেছি। একদিন রাত্রিকালে রাজদূত শয়ন করিয়াছেন, এমন সময় বাদশাহ তাঁহাকে আহ্বান করেন। টমাসের নিকট একখানি চিত্র ছিল, তিনি তাহা বাদশাহকে দেখান নাই। বাদশাহ তাহা অবগত হইয়া তাঁহাকে হঠাৎ আহ্বান করিয়া পাঠান। তিনি ছবিখানি লইয়া তাড়াতাড়ি বাদশাহের সন্নিধানে গমন করেন। সার্ টমাস যখন বাদশাহের কক্ষে প্রবেশ করেন, তখন তিনি পারিষদবর্গের সহিত একাসনে উপবিষ্ট হইয়া সুরাপানে নিরত ছিলেন। চিত্রখানি প্রদর্শিত হইলে

বাদশাহ তাহা নিজে গ্রহণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। রো প্রথমতঃ ইতস্ততঃ করিয়া পরিশেষে ছবিখানি বাদশাহকে উপহার দিলেন। বাদশাহ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, "এরূপ লোকললামভূতা অপরূপ সুন্দরী কি কখনও বর্ত্তমান ছিলেন?" রো প্রত্যুত্তরে বলেন, "হাঁ, কিন্তু এই চিত্রে সেই মহীয়সী মহিলার সৌন্দর্য্য সম্পূর্ণ পরিস্ফুট হয় নাই।" বাদশাহ বলেন, "তুমি আমাকে ইহা অকুণ্ঠিতচিত্তে দান করিয়াছ, আমি আমার অন্তঃপুরিকাগণের দ্বারা ইহার প্রতিকৃতি প্রস্তুত করাইব। তৎপরে তোমার নিকট আসল ও নকল উভয়ই উপস্থিত করিব। যদি আসলখানি বাহির করিতে পার, তবে তুমি উহা পুনঃপ্রাপ্ত হইবে।" রো প্রত্যুত্তরে বলেন, "যথার্থই আমি চিত্রখানি আপনাকে অকুণ্ঠিতচিত্তে দান করিয়াছি, এবং আশা করি, উহা আর প্রত্যর্পিত হইবে না।" উত্তরে বাদশাহ বলেন, "প্রেমাস্পদের প্রতি তোমার অবিচলিত ভালবাসার জন্য তুমি পূর্ব্বাপেক্ষা আমার অধিকতর প্রীতিভাজন হইলে।"

ইংলণ্ডের অধিপতি বাদশাহকে একখানি বিলাতী শকট প্রদান করেন। বাদশাহ এই অভিনব সামগ্রী প্রাপ্ত হইয়া একান্ত প্রীত হন, এবং ওমরাহ-বর্গের প্রত্যেককে এক একখানি তদনুরূপ শকট প্রস্তুত করাইবার আদেশ দেন। অশ্বচতুষ্টয়ের সাহায্যে এই শকট চালিত হইত। এই সকল অশ্বের সাজসজ্জা স্বর্ণমণ্ডিত ছিল। বাদশাহ শকটে আরোহণকালে অত্যন্ত চাক-চিক্যশালী পরিচ্ছদ পরিধান করিতেন। সার টমাস বিলাতী অভিনেতার পরিচ্ছদের সহিত বাদশাহের এই বেশের তুলনা করিয়াছেন।

জাহাঙ্গীর বাদশাহ প্রবেজের বিরুদ্ধে নূতন অভিযোগ শুনিয়া ত্রুটী স্বীকার করিবার জন্য রাজদূতকে আর একবার আহ্বান করেন। তদনুসারে তিনি উপনীত হইলে, বাদশাহ মুসা, যীশু ও মহম্মদের অনুশাসন সম্বন্ধে বিচার ও বিতর্কে প্রবৃত্ত হন। তিনি খৃষ্টান, মুর, ইহুদী, কাহারও ধর্ম্মবিশ্বাসে হস্তক্ষেপ করিতেন না। তিনি সমভাবে সকলের সমাদর করিতেন। সুরাপানে প্রমত্ত হইয়া তিনি নানারূপ রিপুর বশীভূত হইয়া পড়িতেন, এবং তদবস্থায় দ্বিপ্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত অতিবাহিত করিতেন। কিন্তু রাত্রি প্রভাত হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার প্রমত্তাবস্থা তিরোহিত হইত। প্রাতঃকালে তাঁহার স্বাভাবিক জ্ঞান ফিরিয়া আসিত, এবং তাঁহার ইচ্ছাবৃত্তি পুনর্ব্বার নিজের আয়ত্ত হইত।

বস্তুতঃ সার টমাস রোর অঙ্কিত চিত্রে জাহাঙ্গীরের মাধুর্য্যপূর্ণ বিলাসপটু মদিরাসক্ত প্রকৃতি বিলক্ষণ পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত।

স্বর্গারোহণ।

নবীন যোগী হারাধন শাহা স্বর্গারোহণে ব্যস্ত ছিল।

হারাধনের দুর্দ্দম যোগলিপ্সা কিঞ্চিৎ তীব্র আকার ধারণ করিয়াছিল। একটা বহুপুরাকালের গুপ্ত ও লুপ্ত পথের আবিষ্কার করিতে গিয়া সহসা প্রথম উন্মেষেই হতাশ্বাস হওয়াটা নিতান্ত কাপুরুষের কাজ, তাহা হারাধন জানিত।

হারাধনের বিচারে ইহাই দাঁড়াইল, "আমার ত সংসারে কেহই নাই, আমি মরিলে কাহারও কিছুই আসে যায় না, ইষ্টদেবতার নাম করিয়া আর একবার দেখা যাউক।" থাকিবার মধ্যে এক পিসী। তাঁহার জীবদ্দশার উপায় যথেষ্ট ছিল।

হারাধনের উদ্দেশ্য, সপ্তলোকের বিশদ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া লোকহিতের নিমিত্ত জগতে প্রচার করে। আশা বড় সামান্য নয়। এরূপ আশার মূল মহাভারতের স্বর্গারোহণ পর্ব্ব।

স্বর্গারোহণ পর্ব্ব পাঠ করিতে করিতে হারাধনের মনে হয়, "ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির সশরীরে স্বর্গারোহণ কি প্রকারে করিয়াছিলেন?"

ইহা লইয়া সহযোগী কেদারের সহিত তুমুল বাগ্‌বিতণ্ডা হয়। কেদার বলে, উহার অর্থ আধ্যাত্মিক। অন্য এক জন শিষ্য বলিয়াছিল, উহার অর্থ যৌগিক। এক জন বলিয়াছিল, কথাটা সম্পূর্ণ ভূগোলবৃত্তান্তের অন্তর্গত।

আধ্যাত্মিক অর্থের তাৎপর্য্য হারাধন বড় বুঝিত না। হয় যুধিষ্ঠির ইন্দ্রপ্রস্থ ছিল, নচেৎ ছিল না। যদি যুধিষ্ঠির নরপতি মানবদেহধারী ছিলেন, এমন হয়, তবে ইহা নিশ্চয় জানিতেন, সে দেহ ত্যাগ করিলেই অনায়াসে স্বর্গধামে যাওয়া যায়। তবে পাঞ্চালী ও চারি ভ্রাতার সহিত দল বাঁধিয়া কৈলাসের পথে স্বর্গারোহণ করিতে গেলেন কেন? যদি দেহধারী ছিলেন না, এবং কথাটা রূপকই হয়, তবে ধর্ম্ম ইন্দ্রপ্রস্থ শাসন করিয়া, শাখা-প্রশাখাসংবলিত প্রকাণ্ড দেহ লইয়া, দুর্গম তুষারাবৃত হিমাচল ভেদ করিয়া, দ্বাপরের শেষে পলায়নপরায়ণ হইলে কি সে রূপকের মাধুরী থাকে?

যৌগিক অর্থ সম্বন্ধে হারাধনের কিঞ্চিৎ বিশিষ্ট মত ছিল। হইতে পারে, পঞ্চ ভ্রাতাই পঞ্চ তত্ত্ব, এবং জীবলীলা সাঙ্গ করিয়া এক একটি তত্ত্ব এক একটি

গিরিশৃঙ্গে ত্যাগ করিয়া, অবশেষে ধর্ম্মের বলে যুধিষ্ঠির সুমেরুরূপী সহস্রারে উপনীত হইয়াছিলেন। কিন্তু সেটা কি এই দেহে? পঞ্চতত্ত্বাবলম্বিনী দ্রৌপদীস্বরূপা শক্তির গতিটা কিরূপ হইয়াছিল?

প্রাচীন ভূগোলতত্ত্ববিৎ কোন কোন পণ্ডিত বলেন, সে কালে সুমেরুর পরপারেই ভৌম স্বর্গ ছিল। এখন সেটা "গোবি" নামক মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছে। হারাধন কিন্তু এ মতের অনুমোদন করিতে পারে নাই। সেই স্বর্গের পথ ভূতলে না হইয়া অভ্রভেদী গিরিশৃঙ্গের উপর দিয়া হইল কেন? যদি কোন পথ থাকিত, তাহা হইলে স্বর্গ হইতে নিশ্চয় কেহ কেহ ইন্দ্রপ্রস্থে আসিয়া সেই পথ লোকহিতার্থ জগতে প্রচার করিয়া যাইত। ব্যাস, বশিষ্ঠ প্রভৃতি এত ঋষিগণ সে পথের বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করেন নাই কেন?

উপনিষদে উত্তরায়ণের পথ নির্দ্দিষ্ট আছে; সেটার সহিত সুমেরু প্রভৃতির কোন সম্বন্ধ নাই ত? প্রাচীন জ্যোতিষে গোলোক-কদম্বস্থিত সুমেরুর উল্লেখ দেখা যায়,—

"মেরৌ মেষাদিচক্রার্দ্ধে দেবাঃ পশ্যন্তি ভাস্করম্।
সকৃদেবোদিতং তদ্বদসুরাশ্চ তুলাদিগম্॥
ভানোর্ম্মকরসংক্রান্তেঃ ষন্মাসা উত্তরায়ণম্।
কর্কাদেস্তু তথৈব স্যাৎ ষন্মাসা দক্ষিণায়নম্॥"

——সূর্য্যসিদ্ধান্ত, ৮৭।১০৬।

"সুমেরুপর্ব্বতস্থিত দেবগণ মেষাদি চক্রার্দ্ধে অর্থাৎ মেষ-সংক্রমণের আরম্ভ (১লা বৈশাখ) হইতে তুলা-সংক্রমণের (১লা কার্ত্তিকের) পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সূর্য্যকে দেখিয়া থাকেন।" দেবতাদিগের এই ছয় মাস একাদিক্রমে সূর্য্যদর্শন হয় বলিয়া সেই সময়টা তাঁহাদিগের এক দিন, এবং পুনরায় ১লা বৈশাখ পর্য্যন্ত এক রাত্রি। আবার সূর্য্যের মকররাশি-সংক্রমণের আরম্ভ হইতে (মাঘ মাস) ছয় মাস উত্তরায়ণ, এবং কর্কটরাশি-সংক্রমণের আরম্ভ হইতে (শ্রাবণ মাস) ছয় মাস দক্ষিণায়ন।

"সকৃদুদ্গতমব্দার্দ্ধং পশ্যন্ত্যর্কং সুরাসুরাঃ।
পিতরঃ শশিনা পক্ষং স্বদিনঞ্চ নরা ভুবি।"

—সূর্য্যসিদ্ধান্ত, ৮৮।

"সুরগণ ও অসুরগণ সূর্য্যকে ছয় মাস ধরিয়া দেখেন, তদ্রূপ পিতৃগণ (চন্দ্রলোকস্থিত বলিয়া) এক পক্ষ নিরন্তর সূর্য্যকে দেখিয়া থাকেন,

এই জন্য আমাদিগের পনের-দিনে পিতৃগণের এক দিন হয়। পৃথিবীস্থ নরগণ প্রতিদিনই সূর্য্যকে উদিত ও অস্তমিত দেখিয়া থাকে।”

ভূলোক (হিমাচলসীমা) হইতে আরম্ভ করিয়া দ্যুলোক (সুমেরু) পর্য্যন্ত যে একটা প্রকাণ্ড ভ্রমণীয় পথ আছে, তাহা ধর্ম্মপুত্রকে নিশ্চয় অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। গোলোকবিহারী হরির ব্রহ্মলোকে সন্ধান পাইতে নিশ্চয় যুধিষ্ঠির নৃপতির অনেক দিন লাগিয়াছিল। ইহার গূঢ় কথা ব্যাসদেব নিশ্চয় গুপ্ত রাখিয়া গিয়াছেন। হারাধনের তীক্ষ্ণধার বুদ্ধির নিকট দেবযান ও পিতৃযান পথের রহস্য ছিন্নভিন্ন হইবার উপক্রম হইল। হারাধন বলিল, “দাঁড়াও, তোমার চালাকী আমি বাহির করিতেছি।”

হারাধনের কঠোর তপে ইতিপূর্ব্বেই দেবলোক পিতৃলোক অসুরলোক সকলেই শঙ্কিত হইয়াছিলেন। উদ্দেশ্য জানা না থাকিলে তপস্যাচরণে বিশ্বের একটা গাত্রদাহ উপস্থিত হয়। ইহা স্বাভাবিক। ভূলোকেই আমরা কোন মানবকে তপস্যারত দেখিলে চটিয়া লাল হই। গোলোকে দেবগণ চটিয়া নীল হইয়া থাকেন। ফলে, তিন লোকই হারাধনের অভাবনীয় উদ্যমটাকে সাবধানে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

হারাধন নিশ্বাসপ্রশ্বাসের দড়িটাকে শিথিল করিয়া ফেলিয়াছিল। ভস্ত্রিযন্ত্রের মত স্নায়ুচক্রে ফুস্‌ফুস্ দ্বারা বায়ু সঞ্চারিত করিয়া প্রাকৃতিক পরমাণু (মায়া) দগ্ধ করিতেছে। প্রাণ তন্মধ্যে আমি-স্বরূপ, তবে আমরা প্রাণের স্পন্দনকেই প্রাণ বলিয়া থাকি। প্রাণ ভাণ্ডদেহে (gross body) পরমাণু দগ্ধ করিয়া দেখায়, এটা “অন্ন”। মহামায়া অন্নপূর্ণা ক্রমশই পরিপূরণ করিতেছেন।

হারাধন বলিল, “কত দিনই বা এমন করিবে? জোর পঞ্চাশ বৎসর—দাঁড়াও, তোমার কালটা আমি একবার নিরূপণ করি।” হারাধন স্পন্দনের দৈর্ঘ্য বাড়াইল। প্রকৃতি নিরুপায় হইয়া বৃক্ষলতাগুল্মাদির ন্যায় হারাধনের দেহটাকে চালাইতে লাগিল। ক্রমে দেহ প্রস্তরের মত কঠিন হইয়া আসিল। সেই প্রস্তরের উপর শালবৃক্ষের ন্যায় হারাধনের জটাজূট বাহির হইল। রক্তের ভাগ কমিয়া গেল। এ সব মুহূর্ত্তের জন্য। স্পন্দন সম্পূর্ণ কমাইয়া দিয়া হারাধন এক মুহূর্ত্তের জন্য প্রস্তরবৎ দেহ হইতে ছায়াময় পিণ্ডদেহ বাহির করিল। এটা স্থূল দেহের প্রতিকৃতি। তড়িৎবেগে হারাধন প্রেতলোকে আসিয়া পড়িয়াছে। এখন হারাধনের অবস্থাটার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিতান্ত আবশ্যক।

হারাধনের প্রাণ যায় নাই। প্রাণ বিলক্ষণ আছে। প্রাণ যাইবে কোথায়? প্রাণ ছাড়ে কে? ভৌতিক দেহ ছায়ার ন্যায় প্রাণ অবলম্বন করিয়া আছে। প্রাণ বিরক্ত হইয়া এই দেহটাকে ছাড়াইবার জন্য পুনশ্চ প্রেতলোকে অন্য প্রকারের স্পন্দন আরম্ভ করিল।

স্পন্দনের আকার লিসাজুর বক্ররেখার মত। (Lissa jou's curves) ভৌতিক দেহে হারাধন আর ব্যঞ্জনবর্ণ উচ্চারণ করিতে পারে না। স্বরগুলা সানুনাসিক হইয়া গিয়াছে। অঁ আঁ ওঁ উঁ। ইহা ত বড় বিপদ! হারাধন চক্ষে দেখিতে পায় না, কর্ণে শুনিতে পায় না, নাসিকায় গন্ধ পায় না। তবে নিজের অস্তিত্ব অনুভব করিতেছে কি প্রকারে?

অল্পক্ষণের মধ্যেই হারাধন নিজের অবস্থাটা বুঝিল। যত প্রকার স্পন্দন হইতেছে, তাহার এক একটার অনুভূতি স্বতন্ত্র। প্রেতলোকে হারাধনের অনেক বন্ধু জুটিল, তাহাদিগের সহানুভূতিতে হারাধনের অনুভূতি বাড়িয়া গেল। প্রাতঃকালে শৌচক্রিয়া প্রভৃতির (পূর্ব্বাভ্যাসবশতঃ) যে বেগ হইয়াছিল, সেটা একটা ২নং ভূত বুঝাইয়া দিল (সঙ্কেতে)। তৎপরে বর্ণের স্পন্দন, শব্দের স্পন্দন, ত্বকের স্পন্দন, ইত্যাদির বেগ সব বুঝিতে পারিল। ইহার আবার উপরিভাগ আছে, নানাবিধ গতি আছে, তদ্দ্বারা জীব সহজেই পিণ্ড-দেহে নিজের সম্পূর্ণ অস্তিত্ব অনুভব করে। পাঁচটা ইন্দ্রিয় পাঁচটা স্থানে বিস্তৃত না হইয়া একই আধারে নানা রূপে স্পন্দন করিতেছে।

হারাধন ২নং বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিল, (সঙ্কেতে)

২ নং। "আচ্ছা, যদি কেহ তোমাকে পৃথিবীতে শালা বলিয়া গালাগালি দেয়, তবে কি করিয়া জানিতে পার?"

অতি অনায়াসে। দূরত্বানুমান ও সম্পর্কানুমান করিয়া। যখন ভাণ্ডদেহে ছিলাম, তখন অনায়াসে দিক, দূরত্ব, বন্ধু ও শত্রুদিগের শব্দের ওজন (শ্রুতি), এবং অন্যান্য সম্পর্কীয় লক্ষণ, কঠোর মধুর প্রভৃতি (যেমন গৃহিণীর) পঞ্চ ইন্দ্রিয় দ্বারাই উপলব্ধি করিতাম; এখন যদিও পঞ্চ ইন্দ্রিয় নাই, পৃথিবীর আণবিক স্পন্দন ঈথর (আকাশ) ভেদ করিয়া ভৌতিক দেহে আসিতেছে, তাহারই তারতম্য বুঝিয়া সকলই অনুমান করিতে হয়।

হারাধন। তবে এখনও পৃথিবীর সহিত সম্বন্ধ আছে?

২নং ভূত। আমাদিগের পরিত্যক্ত দেহের সহিত ও পৃথিবীর সহিত একটা ভূতপূর্ব্ব সম্বন্ধ আছে। তাহার নাম সংস্কার। "আকাশনিরালম্বো

বায়ুঃ” অর্থাৎ, আমরা বায়ুর ন্যায় আকাশ (আমাদের সংস্কারদেহ) অবলম্বন করিয়া আছি। পৃথিবীর তরঙ্গ আসিয়া আমাদিগকে আপ্লুত করিতেছে। আমরাও তাহা অনুভব করিয়া সুখ দুঃখ ভোগ করিতেছি। আমরাও ইচ্ছা করিলে উৎপাদন করিতে পারি ; তবে দুঃখের বিষয়, আমাদিগের নরলোকের বন্ধুগণ সেটার লক্ষণ না বুঝিয়া আঁউ মাঁউ করিয়া ভয় পাইয়া থাকেন। বৈজ্ঞানিকগণ শক্তিও মানেন, স্পন্দনও মানেন, অথচ প্রেতলোকের তরঙ্গ দেখিলে ভীত হন। যে সকল তরঙ্গ (যেমন পরলোকগত আত্মীয় স্বজনের স্নেহ ও আশীর্ব্বাদ) অপেক্ষাকৃত প্রাচীন ও মধুর, তাহা নরলোকে জাগ্রতে কিংবা স্বপ্নে স্মৃতি জাগাইয়া দেয়। যাহারা ধ্যানরত ও প্রভাসম্পন্ন, তাহারা অনায়াসেই বুঝিতে পারে।

হারাধন। একটা পরীক্ষা করিলে হয় না ?

২ নং ভূত। আচ্ছা। মনে কর—নং হ্যারিসন রোডে তোমার অমুক বন্ধু বিজ্ঞান অধ্যয়ন করিতেছেন, একবার স্পন্দন দ্বারা তাঁহার শরীরে আবিষ্ট হও।

হারাধন অতি অল্প সময়েই পরশরীর-আবেশ-প্রণালীর গূঢ় মর্ম্মটা বুঝিয়া একটা স্পন্দন ছাড়িয়া দিল।

নরলোকে গ্যাসের আলোকে— মহাশয় রসায়নসূত্র পাঠ করিতেছিলেন। তাঁহার হঠাৎ বোধ হইল, একটা ছায়ার মত কিছু তাঁহাকে সম্বোধন করিতেছে,— “দেখ, হাঁইড্রোজেন গ্যাঁস্‌টা মায়্ঁা—মায়্ঁা—।

নরলোকস্থ বন্ধু একটা তীব্র লম্ফ দিয়া গৃহিণীর নিকট গেলেন। “ওগো ! আমি একটা ভূত দেখিয়াছি, শীঘ্র এস !” হারাধন বেগতিক দেখিয়া স্পন্দনের দ্বারা জানাইল, “আমি হারাধন।”

বন্ধু আঁউ মাঁউ করিয়া উঠিলেন, গৃহিণী মূর্চ্ছা গেলেন। সকলেই বলিল, এটা উভয়ের স্নায়বিক বিকার ! হারাধন দুঃখে ভাসিয়া গেল। “আচ্ছা ! যখন প্রেতলোকস্থ দীন দুঃখী আত্মীয় স্বজনের কাতর পূর্ব্বস্নেহ কিংবা করুণার স্বরের এই দশা হয়, তখন সর্ব্বমঙ্গলময় জগদীশ্বরের মহাবাণী লোকে বুঝিতে পারিবে কি করিয়া ?”

“না না, অনেক মহাত্মা জগতে আছেন, যাঁহারা বুঝিতে পারেন ; নচেৎ সংসারটা ভূতের শ্রাদ্ধে পরিপূর্ণ হইত।”

হারাধন চলিয়া গেল। স্পন্দনের দৈর্ঘ্যতাবশতঃ হারাধনের হাত পা লম্বা

পাঠকগণের যেন স্মরণ থাকে, হারাধন Experimental ভূত। বিগতস্থূল-দেহ এবং Experimental ভূতের পার্থক্য এই যে, শেষোক্ত জীব নিজ বলে (কিংবা যোগবলে) আপনাকে অন্ততঃ মুহূর্ত্তের জন্যও নিম্নদেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারে। পাঠকবর্গের ইহাও যেন স্মরণ থাকে যে, বিশ্বের দেশ, কাল, পাত্রাপাত্র, দূরত্ব সকলই আপেক্ষিক (Relative) এবং ইন্দ্রিয়ের উপর নির্ভর করে। অতএব যদিও আমাদিগের হারাধন এখানে ওখানে যাইতেছে বলিয়া অনুমিত হইতে পারে, হারাধনের পক্ষে কিন্তু তাহা নহে। স্নায়ু না থাকিলে ত আর স্নায়বিক অবসাদ ঘটে না ? এবং প্রোফেসার বসুর বৈদ্যুতিক আকুঞ্চন প্রসারণ প্রভৃতিও খাটে না। কিন্তু হারাধনের অবসাদ প্রভৃতির স্নায়ু না থাকিলেও ভৌতিক পিণ্ডদেহ তাহার সঙ্কেত প্রভৃতির প্রতিকৃতি ছিল, এবং তাহারই বলে সে একটু উতলা হইয়া পড়িল।

হারাধন ২নং ভূতকে জিজ্ঞাসা করিল,

"আমি কত দূরে ?"

২নং। এটা আমি বলিতে বাধ্য নহি। তবে তোমার বুঝা উচিত যে, ভূতগণের পক্ষে দূরত্ব প্রভৃতি কিছুই নাই।

হারাধন। আমার পিতা মাতা প্রেতলোকে আছেন, তাঁহাদিগের সহিত দেখা হয় না কি ?

২নং। তোমার এখনও জ্ঞান হয় নাই। বাহ্যিক সঙ্কেত ও স্পন্দন প্রভৃতির দ্বারা প্রেতলোকস্থ জীবাত্মাকে আকর্ষণ করা যায় না। মনে কর, তোমার কোন বন্ধু বলিল, "Oh Dear Dear"! তুমি হয় ত মনে করিলে, হরিণকে (Deer) ডাকিতেছে, সেইরূপ ভূতগণেরওবৃথা সঙ্কেতে ভ্রম হয়। তবে যদি তুমি কামদেহ ছাড়াইয়া মনোদেহের সাহায্যে পিতৃকুল আকর্ষণ করিতে পার, তবে তোমার জয়লাভের সম্ভাবনা।

হারাধন ভাণ্ডদেহ ও পিণ্ডদেহ দেখিয়াছে। এখন তৃতীয় অর্থাৎ কাম-দেহের প্রতি লক্ষ্য করিয়া দেখিল, সেটার সহিত পিণ্ডদেহের বিলক্ষণ সম্বন্ধ আছে। পিণ্ডদেহের সংস্কার কামদেহের অন্ন। প্রাণ কামদেহের স্পন্দন দ্বারা পিণ্ডদেহে সংস্কার খাইতেছে। ভৌতিক দেহে ত আর ক্ষীর সর নবনী, চিংড়ী মাছের কট্‌লেট্, ডিমের মোগলাই কোপ্তা প্রভৃতি নাই, অতএব সংস্কার ছাড়া আর কি আহার হইতে পারে ?

তবে কামদেহটাকে দগ্ধ করে কে ? ২নং ভূত বলিল, "জ্ঞান"। তোমার

যদি জ্ঞান থাকে ত সেই অগ্নি দ্বারা দগ্ধ কর, সংস্কারগুলাকে আহুতি দাও। তুমি দীক্ষিত হইয়াছ কি ?”

হারাধন। না।

২নং। তবে উচ্চস্বরে কাঁদ, কিংবা ভগবানকে ডাক। ডাক শুনিলেই ভৌতিক দেহ খসিয়া যাইবে। রামনামে ভূত পলায়, জান ত ? তোমার সংস্কার দেখিয়া বোধ হইতেছে, তোমার বয়স অল্প। তাহা নহিলে তোমার পুত্র সন্তান শ্রাদ্ধাদি প্রক্রিয়া দ্বারা ভূতশুদ্ধি করিয়া দিত। আমার একটা হতভাগা সন্তান আছে, সে এখনও আমার শ্রাদ্ধ করে নাই, এইবার তার ঘাড় মটকাইব।

২নং। Typhoid fever উপস্থিত করিয়া, কিংবা প্লেগ সঞ্চারিত করিয়া।

হারাধন। কেমন করিয়া ?

হারাধন আর্কর্ষণী যোগ শিখে নাই। সেই মহাশ্মশানরূপী প্রেতলোকে বসিয়া দুঃখী হারাধন হৃদয়ের কাতরতাজড়িতস্বরে পিতামাতাকে ডাকিল। বাবা তুমি কোথায়, মা তুমি কোথায়!

মানসিক দেহে পিতামাতার স্নেহই অবলম্বনীয় শক্তি। যাহারা abstract thinker, তাহারা জনক জননীর স্নেহ মনে করিলেই কাঁদিয়া ফেলে, তা রামের সম্বন্ধেই হউক, কিংবা শ্যামের সম্বন্ধেই হউক। হয় ত কাহার কাহার নিজের পিতামাতাকে স্মরণ করিলে চক্ষে জলই আসে না, কিন্তু abstract পিতৃস্নেহ মনে করিলে আকুল হইয়া পড়ে। ইহা যে দোষের কথা, তাহা নহে। মূর্ত্ত হইতে অমূর্ত্ত জগতে যাইবার ইহাই সোপান।

হারাধনের অমূর্ত্ত পিতামাতা পুত্রকে পিতৃলোকে টানিয়া লইলেন। হারাধনের পিণ্ডদেহ সেখানে খসিয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্বে যে স্পন্দনগুলি ছিল, এখন তাহাও নাই। হারাধনের পুনরায় নিজের অবস্থা বুঝিতে খানিকটা সময় লাগিল। অর্থাৎ, আমাদিগের যাহা বুঝিতে পনের দিন লাগিত, হারাধনের তাহা বুঝিতে এক দিন লাগিল। হারাধন তখন চন্দ্রলোকের শুক্লপক্ষে বিরাজ করিতেছে।

হারাধনের হাত নাই যে, পিতামাতাকে স্পর্শ করে; চক্ষু নাই যে, দেখে; কর্ণ নাই যে, তাঁহাদিগের মধুর ভাষ শুনে; পিণ্ডদেহ নাই যে, বর্ণ শব্দ (সানু-নাসিক) প্রভৃতির সঙ্কেত অনুভব করে। কেবল মন আছে। সেই মন লইয়া জনক জননীকে দেখিবে কি করিয়া ?

হারাধন স্থানের গুণে এবং কালের গুণে ধ্যাননিবিষ্ট হইয়া পড়িল।

বোধ হইল, সে জনকজননীর স্নেহাধারে বিরাজ করিতেছে। হারাধন তাঁহাদিগের মূর্ত্তি জাগ্রত করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু প্রয়াস বৃথা। স্নায়ু নাই, মূর্ত্তি আসে কোথা হইতে?

"বাবা, মা তোমরা এখানে?"

মনে মনে উত্তর হইল, "হুঁ।"

হারাধন। তোমাদের চিনিব কি করিয়া?

পিতা, মাতা। এখানে চিনিবার উপায় নাই।

হারাধন। তোমরা কি অন্যান্য জীবাত্মা হইতে স্বতন্ত্র নহ? তবে Identity কোথায় গেল?

পিতা মাতা। স্বাতন্ত্র্য-বিশ্লেষণের স্থান এখানে নহে। এখানে সকলেই এক। অন্ততঃ তোমার পক্ষে সকলেই এক। যে সকল ব্যক্তিগত সংস্কারের গুণে স্বাতন্ত্র্য অনুভূত হয়, তাহাদিগকে দেবতারা খাইয়া পুনরুদ্গিরণ করিতেছেন, সেইগুলির পিণ্ড রচিত হইলে তবে আমাদিগকে টানিবে।

হারাধন। কোন কালে?

মাতা। কে জানে বাবা, এখানে অনেক কাল বসিয়া আছি। এরূপ হাপ্রত্যাশী হইয়া কত কাল থাকিব?

হারাধন। সংস্কারগুলা দেবতারা খাইয়া না ফেলিয়া নরলোকে পুঁথিতে লিখিয়া রাখিলে ত ভাল হয়?

পিতা। অনেকে লিখিয়া রাখে, কিন্তু বুঝিবার শক্তি দেয় কে?

হারাধন। কে?

পিতা। সেই দেবতারা। ফলে একই দাঁড়ায়। পুঁথি না বুঝিলে পড়া না পড়া সমান। যেমন চৌষট্টি টীকার সমন্বয়।

হারাধন। বাবা, তুমি যে আমার বাবা, আর মা যে আমার মা, তাহা দেখাও।

মা একটু কাঁদিলেন, তাহাতে হারাধনের মানসিক দেহ একটু বিলোড়িত হইল। পিতা বলিলেন, "দেখ হারাধন! এখানে আমরা গোয়াড়ী কৃষ্ণনগরের কারিকর-নির্ম্মিত দশভুজার গলাটার মত। ধড়টা নাই। সব মুখই এক রকম। বাবা! এখানে দীন দুঃখী পাপী পুণ্যবান কে চেনা যায় না, তবে তাহারা নিজের নিজের কর্ম্মানুসারে সুখ দুঃখের অনুভূতি প্রাপ্ত হইতেছে, তাহাতে তোমার আমার কিছু যায় আসে না।"

হারাধন। তবে তোমরা কি জড়শক্তি ?

পিতা। বাবা! শক্তি কি কখনও জড় হয় ? ইন্দ্রিয়-বিকাশ না হইলেই তাহার পক্ষে শক্তি জড় ; নচেৎ বিশ্বই চৈতন্যশক্তিপরিপূর্ণ। আমাদের এখন ইন্দ্রিয় নাই বটে, তবুও মনের সাহায্যে চৈতন্যময় আছি। আত্মজ্ঞানই জড়শক্তির চৈতন্যের প্রতিপাদক। এই পিতৃলোকে বিজ্ঞানবিৎ, দার্শনিক, স্বদেশহিতৈষী, সাধু, চোর, অনেকেই আছে। তাহাদের প্রত্যেকের পিণ্ডে টিকিট মারা আছে। দ্বাদশ রাশি এবং গ্রহগণ, বিশেষতঃ চন্দ্রাধিষ্ঠিত সোম শক্তিসূত্রে আবদ্ধ সেই টিকিটগুলি চিনিয়া লয়, এবং এটাকে ওটাকে (পূর্ব্ব-সম্বন্ধ অনুসারে) ভাঙ্গিয়া চুরিয়া মাতৃগর্ভে মিশায়।

হারাধন। সে কি রকম ?

মাতা। বাবা! সে কথা তোমাদের শুনিতে নাই। ইহা বলিয়া গৃহিণী কর্ত্তার উপর একটু রোধদৃষ্টি করিলেন।

পিতা। দেখ্‌লে বাবা! এখানেও পূর্ব্ব-সংস্কারের উৎপীড়ন! সংস্কার গিয়াছে,:সম্বন্ধ যায় নাই। এবার যদি জন্মাই, তবে দারুনগরের ঠাকুরবাড়ীর কাঠখানা দিয়া তোমার মার মাথা ভাঙ্গিব। হারাধন দারুনগর বুঝিতে পারিল না। তাঁহার চৌদ্দপুরুষ কখনও দারুনগর শুনে নাই। হারাধন বলিল, "বাবা! আমার পিতার বাসস্থান আহিরীটোলায় ছিল, তুমি যে স্থানের কথা বলিতেছ, তাহা ত ভারতবর্ষে নাই।"

পিতা। হা ত দারুনগর সমুদ্রগর্ভে। তোমার আমি কয় পুরুষের বাবা, তাহা কে জানে ? এবং তোমার উপস্থিত মা আমার কয় পুরুষের সহধর্ম্মিণী, তাহাই বা কে জানে ? পুনর্জ্জন্মে Law of Heredity খাটে না, বিশেষতঃ পিতৃলোকে এ বিষয়ে এত গোলমাল যে, সম্প্রতি শুক্লপক্ষীয় চন্দ্রাহত পিণ্ডগণের নিমিত্ত একটা Asylum খোলা হইয়াছে। এই চন্দ্রলোকে আসিতে তোমাকে দুই লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার মাইল পথ অতিক্রম করিতে হইয়াছে। অবশ্য, তোমার পিতৃভক্তির বেগ অতিশয় বেশী, তাই তুমি একদিনে আসিয়াছ ; নচেৎ তোমাকে শূন্যমার্গে (উভয় মাধ্যাকর্ষণের স্থানে) হরিশ্চন্দ্রের ন্যায় আষাঢ় মাস (দক্ষিণায়ন আরম্ভ) পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইত। তাহার পর শঙ্কু (Elliptical) গতি অবলম্বন করিয়া এখানে আসিতে। যাহারা অর্চির (Light) সাহায্যে আসে, তাহারা অবশ্য এক সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল পথ অতিক্রম করে। এ সকল বিরাট কাণ্ড, তবে সূক্ষ্মদেহে কিছুই বোধ হয় না।

মাতা। বাবা! উঁহার কথা শুনিও না। আমি তোমার চিরকালের মা। তোমার স্নেহের টানে আসিয়াছি। উনি কেবল জ্ঞান লইয়াই আছেন; তাই আমাকে শুদ্ধ চন্দ্রমণ্ডলে আটক করিয়া রাখিয়াছেন। নচেৎ কত দিনে জন্মাইতাম। তুমি একটা বিবাহ কর, আমি তোমার কন্যাস্বরূপা হইয়া যাইব। জ্ঞান শুষ্ক অগ্নির মত, আমরা নারী, তাহাতে সোমদেবতার নিকট স্নেহরস লইয়া মিশ্রিত করি।

হারাধন। মা, ইহার গূঢ় কথাটা কি আমাকে বল না! আমি একবার স্বর্গ দেখিব।

মাতা। বাবা, তবে বলি শুন——

পিতা। চুপ! স্ত্রীবুদ্ধিঃ প্রলয়ঙ্করী। তুমি পিতৃলোকের কথা বলিয়া কি আবার আমাকে বিপদে ফেলিবে?

একটা তুমুল আন্দোলনের অবশেষে মা জয়ী হইয়া সন্তানকে খানিকটা আভাষ চুপি চুপি দিলেন।

"দেখ বাবা, তোমার জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্য পবিত্র, তাহাই বলিতেছি। আগে একটু জল খাও না।"

হারাধন। এখানে কচুরী মোণ্ডা পাওয়া যায়?

মা। না বাবা, এখানে শ্রদ্ধা স্নেহ পাওয়া যায়। সেই বারি পান করিয়া জীবাত্মা চকোর বহুকালের পিপাসা মিটাইয়া লয়। মাতা সন্তানকে তাহা পান করাইলেন।

"দ্যুলোক হইতে ভূলোক পর্য্যন্ত যে পঞ্চাগ্নিরূপ যজ্ঞ হয়, তাহা হইতে দিবা রাত্রি হয়। নীহারিকাময়ী প্রকৃতি যখন বিপরীত শক্তিবশতঃ (সংস্কার) গাঢ় হইয়া সৌরজগতের রূপ ধারণ করিয়াছিল, তখন হইতেই দ্যুলোকে অগ্নিক্রিয়া আরম্ভ হয়। দ্যুলোকস্থ অগ্নি আদিত্যনিহিত পরমাণুপুঞ্জরূপী সমিধকে দাহমান করিয়া ধূমরূপিণী রশ্মিকণার সৃষ্টি করে। দিবা তাহার স্পন্দন। সেই স্পন্দন হইতে চতুর্দ্দিকের চৈতন্য উদ্ভূত হয়। এবং সেই চারি দিকের উপরিভাগ তাহার স্ফুলিঙ্গ। এক এক দিকে অধিষ্ঠিত চৈতন্য দিকপাল দেবতা। এইরূপে মহাকাল চৈতন্য হইতে কালের চৈতন্য হয়। এবং তাহা হইতে দেশ পাত্রাপাত্রের জ্ঞান হয়। সেই দেবতাগণ যজ্ঞে ভক্তির আহুতি দিয়া থাকেন। তাহাই সৃষ্টির মূল। অগ্নি শীতল হইয়া সোমরূপে দেখা দেয়।

"এই পঞ্চাগ্নির কথা উপনিষদে আছে। কাল এবং গতির বিভাগ হই

উত্তরায়ণ, দক্ষিণায়ন এবং দ্বাদশ-রাশি-সংক্রমণের প্রণালী স্থ
পর্জ্জন্যদেবতাই অগ্নি, এবং অগ্নি ও সোমের প্রক্রিয়ায়
সংবৎসর সমিধ। মেঘ তাহার ধূম, এবং চপলা তাহার
দেবতা বৎসরটাকে পুড়াইতে চাহেন, কিন্তু দেবগণ সেই যজ্ঞে
আহুতি দিয়া বারির সৃষ্টি করেন। পুনরায় সেই জ্ঞানাগ্নিতে
ভক্তি আত্মবলিদান দেয়, জ্ঞান তাহা খাইয়া সন্তুষ্ট হয়
সৃষ্টির মূল।

"পিতৃলোকে (ভুবর্লোকে) মানবাত্মা অগ্নি। যে
পর্জ্জন্যরূপী, তাহাই ভুবর্লোকে আত্ম-রূপী। মানবের
সমিধ, নিশ্বাস প্রশ্বাস বায়ু তাহার ধূম, বাক্ তাহার স্পন্দন
জ্বলন্ত অঙ্গার, এবং শব্দ তাহার স্ফুলিঙ্গ। এই মহাহোমে
সংস্কাররূপী অন্ন আহুতি দিয়া থাকেন।

"ভূর্লোকে নারী অগ্নিস্বরূপা। প্রকৃতিই নারী, এবং
তাহার অগ্নি। নিম্নভাগ সমিধ। ইন্দ্রিয়গণ (মন প্রভৃতি)
কামোপভোগ (বিষয়োপভোগ) জনিত স্পৃহা তাহার স্ফু
সেই হোমে সংস্কার বর্ষণ করেন। ইহা হইতে 'মানবের' সৃষ্টি

"সেই মানবের দেহ পুনরায় জ্ঞানাগ্নি দ্বারা সংস্কৃত হইল
পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া পুনরায় উর্দ্ধ্বগামী হয়।"

হারাধন। মা, এটা ত রূপক?

মাতা। বাবা! যাহার রূপ জড়চক্ষে দৃষ্ট হয়, তাহাই সত্য,
অনুমিত হইলেই রূপক। জড়জগতে ঋতু প্রভৃতির অনুভূতি
জগতে স্নেহ, রাগ দ্বেষ প্রভৃতির অনুভূতি পদার্থটা একই,
তারতম্যে উহাদিগের রূপ এবং নাম স্বতন্ত্র। জ্ঞান-সূর্য্যের
দক্ষিণায়ন এবং মনোরূপী চন্দ্রের সহিত তাহার সম্বন্ধ ঠিক জ
নিয়মাবদ্ধ। উহাদিগের প্রভেদ এই যে, আত্মা (সূর্য্য)
যদিও সংস্কারাবদ্ধ আত্মা কেন্দ্রস্থ জড়সূর্য্যের ন্যায় আকর্ষণের দাস,
কোন মহাসূর্য্য সেটাকে টানিতেছে, এবং তাহা হইতেই ব্রহ্মলো

হারাধন। মা, জীবাত্মা কি করিয়া দেবযান, পিতৃযানের পথে

মাতা। পুরাতন জ্যোতিষ সূর্য্যকেই অয়নাংশে গতিবিশিষ্ট ক
জড় সৌরজগতে জীব (পৃথিবী প্রভৃতি) সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে

উত্তরায়ণ, দক্ষিণায়ন এবং দ্বাদশ-রাশি-সংক্রমণের প্রণালী সৃষ্ট হয়। স্বর্লোকে পর্জ্জন্যদেবতাই অগ্নি, এবং অগ্নি ও সোমের প্রক্রিয়ায় ঋতুর সৃষ্টি হয়। সংবৎসর সমিধ। মেঘ তাহার ধূম, এবং চপলা তাহার স্পন্দন। পর্জ্জন্য দেবতা বৎসরটাকে পুড়াইতে চাহেন, কিন্তু দেবগণ সেই যজ্ঞে স্নিগ্ধ সোমরাজকে আহুতি দিয়া বারির সৃষ্টি করেন। পুনরায় সেই জ্ঞানাগ্নিতে ভক্তির আহুতি। ভক্তি আত্মবলিদান দেয়, জ্ঞান তাহা খাইয়া সন্তুষ্ট হয়। এই আনন্দই সৃষ্টির মূল।

"পিতৃলোকে (ভুবর্লোকে) মানবাত্মা অগ্নি। যে প্রাণ স্বর্লোকে পর্জ্জন্যরূপী, তাহাই ভুবর্লোকে আত্ম-রূপী। মানবের কামদেহ তাহার সমিধ, নিশ্বাস প্রশ্বাস বায়ু তাহার ধূম, বাক্ তাহার স্পন্দন, চক্ষুর্দ্বয় তাহার জলন্ত অঙ্গার, এবং শব্দ তাহার স্ফুলিঙ্গ। এই মহাহোমে দেবগণ আনন্দ-সংস্কাররূপী অন্ন আহুতি দিয়া থাকেন।

"ভূর্লোকে নারী অগ্নিস্বরূপা। প্রকৃতিই নারী, এবং প্রকৃতিগত শক্তি তাহার অগ্নি। নিম্নভাগ সমিধ। ইন্দ্রিয়গণ (মন প্রভৃতি) তাহার স্পন্দন। কামোপভোগ (বিষয়োপভোগ) জনিত স্পৃহা তাহার স্ফুলিঙ্গ। দেবগণ-সেই হোমে সংস্কার বর্ষণ করেন। ইহা হইতে 'মানবের' সৃষ্টি হয়।

"সেই মানবের দেহ পুনরায় জ্ঞানাগ্নি দ্বারা সংস্কৃত হইল জীবাত্মা নবীন পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া পুনরায় ঊর্দ্ধ্বগামী হয়।"

হারাধন। মা, এটা ত রূপক ?

মাতা। বাবা! যাহার রূপ জড়চক্ষে দৃষ্ট হয়, তাহাই সত্য, এবং মনশ্চক্ষে অনুমিত হইলেই রূপক। জড়জগতে ঋতু প্রভৃতির অনুভূতি এবং অতীন্দ্রিয় জগতে স্নেহ, রাগ দ্বেষ প্রভৃতির অনুভূতি পদার্থটা একই, কিন্তু ক্ষেত্রের তারতম্যে উহাদিগের রূপ এবং নাম স্বতন্ত্র। জ্ঞান-সূর্য্যের উত্তরায়ণ এবং দক্ষিণায়ণ এবং মনোরূপী চন্দ্রের সহিত তাহার সম্বন্ধ ঠিক জ্যোতিষশাস্ত্রোক্ত নিয়মাবদ্ধ। উহাদিগের প্রভেদ এই যে, আত্মা (সূর্য্য) স্বক্রিয়, এবং যদিও সংস্কারাবদ্ধ আত্মা কেন্দ্রস্থ জড়সূর্য্যের ন্যায় আকর্ষণের দাস, কিন্তু আবার কোন মহাসূর্য্য সেটাকে টানিতেছে, এবং তাহা হইতেই ব্রহ্মলোকের গতি।

হারাধন। মা, জীবাত্মা কি করিয়া দেবযান, পিতৃযানের পথে যায় ?

মাতা। পুরাতন জ্যোতিষ সূর্য্যকেই অয়নাংশে গতিবিশিষ্ট করে।

জড় সৌরজগতে জীব (পৃথিবী প্রভৃতি) সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ভ্রাম্যমাণ।

চন্দ্রও তাহার সহিত ঘুরে। কিন্তু সূর্য্যসহিত এই সৌরমণ্ডল যে মহাসূর্য্যের অয়নে ভ্রাম্যমাণ, তাহাই উপনিষদের উক্তি। এক একটা সৌরজগৎ। তবে বুঝাইতে গেলে উল্টা বুঝিতে হয়। যাহারা মোটামুটী গৃহস্থ, তাহারা ন্যূনকল্পে ত্রিশ চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত নিজ কর্ম্মানুসারে সংস্কারগঠিত পূর্ণ ও সবল একটা সূক্ষ্মদেহের সৃষ্টি করিয়া ক্রমে বার্দ্ধক্যের আমলে ধূম প্রাপ্ত হয়। পূর্ব্বে বলিয়াছি, সাধারণ মানবের পক্ষে নিশ্বাস প্রশ্বাসই ধূম, তাহাই ধরিয়া তাহারা মৃত্যুনিশা অতিক্রম করে, এবং তৎপরে চন্দ্রের কৃষ্ণভাগে যায়।

তরণি-কিরণ-সঙ্গাদেব পীযূষপিণ্ডো
দিনকরদিশি চন্দ্রশ্চন্দ্রিকাভিশ্চকাস্তি।
তদিতর-দিশি বালা-কুন্তল-শ্যামলশ্রী-
র্ঘট ইব নিজমূর্ত্তিচ্ছায়য়ৈবাতপস্থঃ॥

—গোলাধ্যায়।

অমৃতকিরণবর্ষী চন্দ্র স্বয়ং তেজোময় নহে। সূর্য্যের সম্মুখদিকস্থিত চন্দ্র সূর্য্যরশ্মি দ্বারা প্রতিভাত হইয়া আলোকিত হইয়া থাকে। পরন্তু রৌদ্রস্থিত ঘটের (বিপরীতাংশ) যেমন সেই ঘটের নিজের ছায়া দ্বারা আবৃত হয়, তদ্রূপ চন্দ্রের যে অংশ সূর্য্যের পশ্চাৎদিকে (সর্ব্বদাই) স্থিত হয়, সেই অংশ বালাস্ত্রীর কেশের ন্যায়। চন্দ্রের এই অপর পৃষ্ঠে পিতৃগণ বাস করেন। পিতৃগণের মধ্যাহ্নকাল তোমাদের অমাবস্যা। তোমাদের এক চান্দ্রমাসে তাঁহাদিগের অহোরাত্র।

হারাধন। তবে কি আষাঢ় মাসের কৃষ্ণপক্ষ হইতে জীব ভ্রমণ আরম্ভ করিয়া দক্ষিণায়নমার্গের গতিতে পিতৃলোকে যায়?

মাতা। বাবা! সকলেই কি আষাঢ় মাসের কৃষ্ণপক্ষের জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকে? যে জীবের মন সূর্য্যপ্রভা (প্রজ্ঞা প্রভা) দ্বারা আলোকিত হয় নাই, তাহারা কাজেই দক্ষিণায়নবিশিষ্ট, এবং তাহাদিগের সংস্কার চন্দ্রলোকের কৃষ্ণভাগ হইতে গঠিত হয়। ফলকথা, তাহাদিগের আত্মচৈতন্য হয় নাই। তাহারা তমসাবৃত, এবং চন্দ্রে থাকিলেও দেবগণের ভক্ষ্য। ইহাদিগকে জড়প্রকৃতির সংস্কার বলিতে পার, এবং তাহাই দেবগণ খাইয়া প্রজাসৃষ্টি করেন।

হারাধন। কিরূপে?

মাতা। সংস্কারগুলি পিণ্ডরূপে আকাশে আসে, সেখান হইতে হোম

প্রদত্ত হইয়া বায়ু ও উষ্ণতার সংস্পর্শে মেঘোৎপত্তি করে, এবং সেখান হইতে পৃথিবীর গর্ভে রোপিত হয়। দেহই পৃথিবী। সেখানে এই সংস্কাররূপী অন্ন ভক্ষিত হয়, এবং জ্ঞানাগ্নিতে পুনরাহুতিস্বরূপ প্রদত্ত হয়, এবং পুনরায় তাহা নারী (ইন্দ্রিয়) হইতে সন্তানস্বরূপে দ্বিতীয়বার জন্মগ্রহণ করে।

হারাধন। সংস্কারের এত ঘুরিবার কারণ কি?

মাতা। শক্তির একটা সংক্রমণপ্রণালী আছে। মানবদেহরূপী ইন্দ্রিয়াধারে পূর্ব্বসংস্কাররূপী (পর্জ্জন্য দেবতার যজ্ঞকৌশলে) বৃষ্টি না হইলে জীবের আত্মজ্ঞানলাভের আনন্দ হয় না।

হারাধন। তবে মা! আমি কি পিতৃযানের পথে আসিয়াছি?

মাতা। তুমি খানিকটা দেবযানের পথ হইতে পিতৃযানের মায়াবশতঃ আসিয়াছ। বাবা হারাধন! তুমি কি যোগ জান?

হারাধন। কিছু কিছু জানি।

মাতা। এই দেবযানের পথ যোগান্তর্গত। যখন জীবদেহ আভ্যন্তরিক প্রাণরূপিণী শক্তি হইতে বিচ্যুত হয়, অর্থাৎ জীব, ইহলোকের কথায়, যখন মরে, তখন বদ্ধাত্মা ধূম অবলম্বন করে। কিন্তু যোগিগণ জ্যোতি অবলম্বন করেন। ধূম গুণবিশিষ্ট। জ্যোতি গুণের অতীত। প্রথমে স্থূল দেহে যোগিগণ বায়ুসাধনপ্রণালী অবলম্বন করিয়া জ্যোতির স্পন্দন স্থির করেন। ধূম কিংবা মায়া উৎপন্ন হইতে দেন না। কোন প্রজ্বলিত দীপে বহির্বায়ুসংযোগে ধূমের উৎপত্তি হয়; কিন্তু আবার যদি আভ্যন্তরিক অন্য একটি শক্তিসংযোগে সেই ধূমের কারণটাকে সংবরণ করিয়া সম্পূর্ণ প্রদাহ উৎপন্ন করা যায়, তবে নির্ধূম জ্যোতি স্বতঃই উপস্থিত হয়। এই জ্যোতিই জ্ঞান। ইহা অন্তর্নিহিত শক্তি। জ্বলন্ত অগ্নি। ইহার পথে প্রথমে 'দিবা'। তৎপরে চন্দ্রের শুক্ল দিক। অর্থাৎ স্থির, নিশ্চল, সূর্য্য-প্রভাসিত মন। তৎপরে উত্তরায়ণ-শীত হইতে আরম্ভ করিয়া বসন্ত ও গ্রীষ্ম পর্য্যন্ত। যোগিগণ এই পথকে 'পিঙ্গলা' কহিয়া থাকেন। শীত (বিশুদ্ধ) হইতে আরম্ভ করিয়া গ্রীষ্ম (অগ্নি) পর্য্যন্ত যে সংক্রমণ, তাহা উত্তরায়ণ। আত্মসংযম, দানপুণ্যাদি নিয়ম, ধীর আসন, প্রাণসংযম ও গুরূপদিষ্ট প্রণালীতে প্রত্যাহার প্রভৃতি প্রক্রিয়ার সাধনা করিলে জীব সুষুম্নাবর্ত্মে (আজ্ঞাচক্রে) আসে, এবং সেই স্থান হইতে জ্যোতিকে টানিয়া লয়। এই জ্যোতির নাম কুণ্ডলিনী। অন্তর্নিহিতা শক্তি। যাহা দ্বারা আত্ম-(প্রাকৃতিক বাহ্যাকর্ষণ)-সংবরণ করা

যায়। তুমি ত জান বাবা যে, পৃথিবীর মধ্যশক্তিটাকে প্রবুদ্ধ করিয়া যদি কোন প্রকারে সূর্য্যলোকে লওয়া যাইত, তবে পৃথিবী কক্ষাচ্যুত হইয়া পিণ্ডের ন্যায় লীন হইয়া যাইত; চন্দ্রও আকর্ষণবিচ্যুত হইয়া সূর্য্যে গিয়া মিশিত। এরূপ ঘটনা জড় সৌরজগতে এখন হয় নাই। অতীন্দ্রিয় সৌরজগতে হইয়াছে। উত্তরায়ণের শেষে এইরূপ একটা আকর্ষণ উপস্থিত করিতে পারিলেই প্রাণ কুণ্ডলীশক্তির সহযোগে অর্চ্চিপথ প্রাপ্ত হয়। কুণ্ডলীর দুইটি স্পন্দন আছে। তাহাই জীবের দুইটা নিশ্বাস, যুগ, কিংবা চন্দ্র সূর্য্যের আকর্ষণ। এইটাকে না থামাইলে কুণ্ডলীশক্তি নিশ্চয় দুই পথে হেলিতে দুলিতে থাকে। ইহার ফলে পিতৃযানের পথ সৃষ্ট হয়। কিন্তু উদ্বোধিত শক্তি স্পন্দনমুক্তা হইলে জ্যোতির্ব্বর্ত্মে সূর্য্যলোকে যাইবে। প্রথমে এই প্রক্রিয়া দ্বারা যোগিগণ দ্বাদশ রাশি,চন্দ্র প্রভৃতির আকর্ষণ এড়াইয়া, কিংবা কাল, দেশ, প্রভৃতি চৈতন্য এড়াইয়া, শীর্ষস্থানীয় সূর্য্যমণ্ডল কিংবা সহস্রারে আসেন। সেখানে উদ্বোধিতা শক্তি চপলার ন্যায় শোভা পায়। নেত্র প্রস্ফুটিত হয়। সেখানে যোগী ধ্যান, ধারণা ও সমাধি প্রাপ্ত হন, এবং সেখান হইতে গুরুরূপী মহাপুরুষ জীবাত্মাকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যায়।

হারাধন। সুমেরুই তবে সহস্রারের পথে, এবং সেখানে ছয় মাস দিন ও ছয় মাস রাত্রি হয়?

মাতা। ওটা কেবল প্রাণসংযমের মার-পেঁচ, এবং সাংখ্য-প্রণালী-নিহিত সে খবরটা আমি জানি না। বাবা! ব্রহ্মলোকে গেলে আর তোমার নিকট আসিব কেন? তবে মুক্তাত্মা পুরুষগণ অর্চ্চির্বর্ত্মে আবার আসিয়া নিম্নস্থ জীবগণের উদ্ধারসাধনে ব্রতী হন। তাঁহাদের করুণাই দেবগণের শ্রদ্ধা ও ভক্তি, এবং তাহাই দ্যুলোকে নবীন সৃষ্টির মূল, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি।

হারাধন। বাঃ! এত বেশ। তবে স্বর্গটা কোথায়?

মাতা। স্বর্গ উত্তরায়ণের পথে দেখিতে পাওয়া যায়। সুমেরু হইতে ঊর্দ্ধে, দেবযান পথের শেষভাগ, স্বর্গটা কিছু এ দিকে। উহা ভোগের ক্ষেত্র-মাত্র। কোনও স্থানবিশেষ নহে। যাহারা সুকৃতিসম্পন্ন, তাহারা পিতৃযানের পথেই স্বর্গের জ্যোতি দেখিয়া সুখভোগ করে।

হারাধন গল্পটা শুনিতে শুনিতে এত উতলা হইয়া পড়িল যে, মাতৃচরণে দণ্ডবৎ করিয়া মানসিক দেহ হইতে এক লম্ফে উত্তরায়ণের পথে গেল। সেখানে এক জন দীর্ঘশ্মশ্রুজটাবিশিষ্ট পুরুষ লগুড়হস্তে দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি হারাধনকে দেখিয়াই বলিলেন, "ব্যাটা যাস্ কোথা?"

হারাধন। ব্রহ্মলোকে।

কালপুরুষ। তোর সাহস ত কম নয়!

হারাধন দেখিল, সেখানে বিস্তীর্ণ তিনটা পথ রহিয়াছে। জ্ঞান, ভক্তি, এবং শক্তির। সৎ, চিৎ, আনন্দের প্রথম বিকাশ সেইখানে। জ্ঞান-মার্গের জন কতক জীবাত্মা সেখানে 'ব্যাসিলি'র (Bacilli) ন্যায় কিল্‌বিল্ করিতেছে। শক্তিমার্গের গোটাকত জীবাত্মা ভক্তিমার্গের অন্য গোটাকতক জীবাত্মার প্রতি ইঙ্গিত করিয়া দেখাইতেছে,

"ঐ দেখ অহং!"

ভক্তিমার্গের পুরুষ (বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী) বলিতেছে, "সঃ!" হারাধন একবার চুমকুড়ি দিয়া বলিল, "বাবা! সোহং! একবার মিলিয়া যাও!"

কালপুরুষ। হাসিয়া বলিলেন, "এ ব্যাটা বড় রসিক দেখিতেছি।"

হারাধন। তোমার দোহাই বাবা! একবার ব্রহ্মলোক দেখাও।

কালপুরুষ। ন্যাথ্, তোকে বারংবার বলিয়াছি যে, গুরু না হইলে ব্রহ্মলোকে যাওয়া যায় না। তুই যদি ফের আবদার কর্‌বি ত গলা টিপিয়া দিব।

হারাধন দেখিল, ব্যাপারটা সুবিধাজনক নহে। অমনই জ্ঞানমার্গের একটা 'ব্যাসিলি'র স্কন্ধে আরোহণ করিয়া বসিল। ব্যাসিলি পুরুষ এই অভিনব উপদ্রবনিবারণার্থ হারাধনকে কামড়াইয়া দিল। হারাধন কিন্তু তাঁহাকে ছাড়িল না, এবং উভয়ে মল্লযুদ্ধ করিতে করিতে চন্দ্রলোকে পতিত হইল।

হারাধন বলিল, "মহাশয়, ঠিক করিয়া বলুন, আপনি হারবার্ট স্পেন্সার, না গজধর তর্কচূড়ামণি?"

ব্যাসিলি। ভাল বিপদ! আমি স্পেন্সরই হই, আর গ্লাডষ্টোনই হই, আর বাইসম্যানই হই, তোমার সে কথার দরকার কি?

হারাধন। আপনি নিশ্চয় চুরি করিয়া ব্রহ্মলোকের সংবাদ লইতে আসিয়াছেন।

ব্যাসিলি। আর তুমি?

হারাধন। আমিও তাই; কিন্তু আমার আত্মপরিচয়-প্রদানে কোন বাধা নাই। আমার নাম 'হারাধন'; নিবাস মধুপুর; সম্বলের মধ্যে কেবল এক পিসী।

ব্যাসিলি। তবে আমিই তোর পিসী। হতভাগা ছোঁড়া! সারাদিন মড়ার মত পড়িয়া আছিস, খাবি কখন?

হারাধন চক্ষু মুছিয়া দেখিল, ঠিক্ তাই। সে এতক্ষণেস্বপ্ন দেখিতেছিল। হারাধন দেখিল, স্বর্গের পথ অন্তর্হিত; তাহার পিসী নিকটে বসিয়া!

কুলরক্ষা।

রীতিমত এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। আকাশ তখনও স্তম্ভিত হইয়া আছে। উদাস বাতাস এক একবার হুহু করিয়া ছুটিয়া আসিতেছে।

পাঠশালার ছুটী দিয়া ষষ্ঠীচরণ একাকী গৃহে বসিয়া ছিলেন। তাঁহার প্রাণটা আজ বাদ্‌লা হাওয়ার মত থাকিয়া থাকিয়া হাহা করিয়া উঠিতেছিল। প্রকৃতির করুণা যখন ধরাতলে বৃষ্টিরূপে নামিয়া আসে, তখন বর্ষার বিচিত্র মোহে নিঃসঙ্গ মানবের মন উদাস হইয়া যায়।

ষষ্ঠীচরণের স্নেহ, প্রেম বা ভক্তির কোনও আধার ছিল না। শৈশব ও কৈশোরের মাঝখানে অদৃষ্ট কখন তাঁহার সকল স্নেহবন্ধন ছিন্ন করিয়া দিয়াছিল, সে কথা ষষ্ঠীচরণের ভাল স্মরণ হইত না। সাহিত্য ও কাব্যের আলোচনায় যৌবনের নিঃসঙ্গ অবসরটুকু অতিবাহিত হইত। অবশিষ্ট সময় পাঠশালার ছেলে পড়াইয়া কাটিয়া যাইত।

সিক্ত বৃক্ষপত্রে মেঘের কৃষ্ণছায়া গাঢ় হইয়া আসিতেছিল। নির্নিমেষ-নয়নে ষষ্ঠীচরণ চাহিয়া চাহিয়া কল্পনার সুদূর স্বপ্নলোকপ্রান্তে আপনাকে নির্ব্বাসিত করিয়া রাখিয়াছিলেন।

সহসা একজোড়া খড়মের খট্ খট্ শব্দ হইল। ষষ্ঠীচরণ মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন, স্বয়ং বিদ্যালঙ্কার মহাশয়। সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইয়া ষষ্ঠীচরণ বৃদ্ধকে নমস্কার করিলেন। বিদ্যালঙ্কার স্মিতমুখে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "বস বাপু, তোমার সঙ্গে নির্জ্জনে একটি কথা আছে।"

এক টিপ্‌ নস্য লইয়া বৃদ্ধ মৃদুস্বরে বলিলেন, "সেই বিবাহের প্রস্তাবটা সম্বন্ধে কি স্থির করিলে?"

ষষ্ঠীচরণের প্রসন্ন মুখ সহসা অন্ধকার হইয়া গেল। তিনি সঙ্কোচনম্রস্বরে বলিলেন, "আমার অবস্থা আপনার অবিদিত নাই। ভাবিয়া দেখিলাম, এরূপ স্থলে দারপরিগ্রহ মূর্খতামাত্র।"

ত্রস্তভাবে বিদ্যালঙ্কার বলিলেন, "তুমি যত দিন না তোমার অবস্থার উন্নতি করিতে পার, সে ভাবনা তোমার করিয়া কায নাই। মেয়ে আমার কাছেই থাকিবে। তাহার কোনও ভার তোমাকে লইতে হইবে না।"

ষষ্ঠীচরণ ম্লানমুখে বলিলেন, "কিন্তু শ্রোত্রিয়ে কন্যাদান করিলে আপনার কুলনাশ হইবে।"

বৃদ্ধ তাচ্ছীল্যভাবে হাসিয়া বলিলেন, "কুলনাশ! আমার আবার কুলনাশ কি? সমাজ ত আমরাই। আমরা যাহা করিব, সমাজ অবনত-মুখে তাহাই মানিয়া চলিবে। তাহাতে প্রতিবাদ করিবে কে?"

মৃদুস্বরে ষষ্ঠীচরণ বলিলেন, "কিন্তু অকারণ কেন একটা গণ্ডগোল বাধাই-বেন? আপনার কন্যার বিবাহের ভাবনা কি? অনেক বড় কুলীনসন্তান আপনার মেয়েকে বিবাহ করিতে পাইলে কৃতার্থ হইয়া যাইবে। আমাকে দয়া করিয়া ক্ষমা করুন।"

বিদ্যালঙ্কার বিস্মিত হইয়া তীক্ষ্দৃষ্টিতে কয়েক মুহূর্ত্ত ষষ্ঠীচরণের শান্ত মুখ-মণ্ডলের দিকে চাহিয়া রহিলেন। কথা কয়টি কি প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ? তাঁহার নির্ব্বোধ কুৎসিত কন্যা যে ষষ্ঠীচরণেরও অযোগ্য, ষষ্ঠীচরণ প্রকারান্তরে কি তাহারই আভাস দিল?

ক্ষুব্ধ ক্রুদ্ধ বিদ্যালঙ্কার বলিলেন, "তবে কি তোমার এ বিবাহে মত নাই?"

বাহিরে তখন অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে। পুনরায় বৃষ্টির সম্ভাবনা দেখা যাইতেছিল। আকাশের দিকে চাহিয়া উদাসভাবে ষষ্ঠীচরণ বলিলেন, "এ বিবাহ বলিয়া নয়, বিবাহ কখনও করিব না, আমার এইরূপ সঙ্কল্প।"

এতখানি উপেক্ষা বিদ্যালঙ্কারের সহ্য হইল না। তিনি ভাবিয়াছিলেন, তাঁহার মত এত বড় কুলীন যাচিয়া শ্রোত্রিয়ে মেয়ে দিতে চাহিতেছেন, ইহাতে ষষ্ঠীচরণ একেবারে গলিয়া কৃতার্থ হইয়া যাইবে। কিন্তু এ কি! এই সহায়সম্পদহীন হতভাগা যুবকটা এমন নিশ্চিন্তভাবে তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিল! এই তীব্র অপমানে তাঁহার হৃদয় যন্ত্রণায় বিচলিত হইয়া উঠিল। বিদ্যালঙ্কার বলিলেন, "দেখ ষষ্ঠী, তোমার বাপ থাকিলে আজ তিনি আমার কথা এমন করিয়া ঠেলিয়া ফেলিতে সাহস করিতেন না; কিন্তু কোন্ সাহসে আজ তুমি আমার এত অপমান করিলে?"

বিস্মিত ষষ্ঠীচরণ কুণ্ঠিতভাবে বলিলেন, "আপনি রাগ করিতেছেন কেন? আমি আপনার কি অপমান করিলাম?"

"অপমানের বাকিটা কি রাখিলে! আমার মত এত বড় এক জন কুলীনকে তুমি অনায়াসে অবহেলা করিলে। কেন? আমার মেয়ে কুৎসিত ব'লে? আরে মুর্খ, যদি কুরূপাই না হইবে, তবে তোর মত হীন শ্রোত্রিয়ে কেন কন্যাদান করিতে যাইব?"

ষষ্ঠীচরণ ধীরে ধীরে বলিলেন, "আমি যে কথা মনেও ভাবি নাই, আপনি কেন সে কথা বলিতেছেন? আপনার কন্যা সুন্দরী কি কুৎসিত, সে সম্বন্ধে আপনাকে কোন কথাই বলি নাই। কেন মিথ্যা আমাকে এতটা নীচ ভাবিতেছেন?"

"কি পাষণ্ড, অর্ব্বাচীন! আমি মিথ্যা বলিলাম? ম্লেচ্ছভাষা শিখিয়া তোর প্রকৃতি ম্লেচ্ছের মত হইয়াছে; কাহাকে কি বলিতে হয়, এখনও শিখিস্ নাই!" বৃদ্ধব্রাহ্মণের পদাঙ্গুষ্ঠ হইতে শিখাগ্রভাগ পর্য্যন্ত বৈদ্যুতিক তারের মত কাঁপিতেছিল। বৃদ্ধের হাতের লাঠি মাটীতে পড়িয়া গেল।

ষষ্ঠীচরণের শান্ত সুন্দর মুখমণ্ডল আরক্ত হইয়া উঠিল। অতিকষ্টে আত্ম-সংবরণ করিয়া যুবক ধীরে ধীরে বলিলেন, "জ্ঞানতঃ আমি আপনাকে কোন অপমানের কথা বলি নাই, আপনিই যথেচ্ছ কটু বলিতেছেন। আপনি বৃদ্ধ, পিতৃতুল্য, তাই নীরবে সহ্য করিলাম।"

বিকট বিদ্রূপ হাস্যে কক্ষ প্রতিধ্বনিত করিয়া বিদ্যালঙ্কার বলিলেন, "বটে! কেন, তাহা না হইলে মারিতে বুঝি? বড় স্পর্দ্ধা তোর। আচ্ছা, যদি আমি সর্ব্বেশ্বর ঠাকুরের সন্তান হই, তবে এর প্রতিফল একদিন নিশ্চয়ই পাইবি।"

কুপিত ব্রাহ্মণ খড়ম খট্ খট্ করিতে করিতে চলিয়া গেলেন। বাতাসের সঙ্গে বৃষ্টি আবার নামিয়া আসিল। সেই বারিবিদ্যুৎব্যাকুল সন্ধ্যার অন্ধকারে ষষ্ঠীচরণ নীরবে বসিয়া রহিলেন।

২

সন্ধ্যার শান্ত ছায়ায় মাঠ ও গ্রাম আচ্ছন্ন হইয়াছিল। গ্রাম্য দেবালয়ে মঙ্গলশঙ্খ বাজিয়া উঠিল। স্নানের ঘাট জনশূন্য। পল্লীবধূরা জল লইয়া কখন ঘরে ফিরিয়া গিয়াছে। খেয়া ঘাটে শূন্য জেলে-ডিঙ্গি বাঁধা। দূরে গঞ্জের নীচে হাটুরে নৌকায় আলো জ্বলিতেছে।

ক্ষীণচন্দ্রালোকে শ্যামল তৃণাসনে বসিয়া ষষ্ঠীচরণ অগাধ ভাবনা-সমুদ্রে নিমগ্ন। স্বজনশূন্য জীবনটা কি এমনই ভাবে এক দিন অজ্ঞাত অন্ধকারে

মিশিয়া যাইবে! স্নেহ, প্রেম ও ভালবাসার দাবীস্বরূপ কেহ কি কখনও তাঁহার শূন্যহৃদয়ে মুহূর্ত্তের জন্যও একটা চিহ্ন অঙ্কিত করিবে না?

পরপারের ছায়ালোকচিত্রিত বননিকুঞ্জ হইতে একটা অলস গন্ধ বাতাসে বহিয়া আসিল। সহসা বিদ্যালঙ্কারের ক্রোধদীপ্ত মুখমণ্ডল, সঙ্গে সঙ্গে শেষ কথা কয়টি ষষ্ঠীচরণের মনে পড়িল। অবিশ্বাস ও ঘৃণার হাস্যরেখা তাঁহার মুখে দীপ্ত হইয়া উঠিল। দাম্ভিকতা কি মানুষকে এতটা আত্মসম্ভ্রমচ্যুত করিতে পারে? বিদ্যালঙ্কার গ্রামের দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ জমীদার বাবুদের কুল-পুরোহিত। ইচ্ছা করিলে তিনি ষষ্ঠীচরণের অনেক অনিষ্ট করিতে পারেন। কিন্তু তাহাতে তাঁহার ভয় কি? যাহার আপনার বলিবার কেহ নাই, তাহার পক্ষে সংসারের সুখ দুঃখ অতি তুচ্ছ।

নদীর জলে কলসী ডুবাইবার শব্দ হইল। স্নানের ঘাটে কে জল তুলিতেছিল। ষষ্ঠীচরণ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। পঞ্চমীর ক্ষীণচন্দ্র আকাশের কোলে ঢলিয়া পড়িতেছিল। তিনি ধীরে ধীরে পাড়ের দিকে উঠিতে লাগিলেন।

আর এক জন কলসীকক্ষে ধীরে ধীরে ঘাটের পথে আসিতেছিল। সহসা ষষ্ঠীচরণের বিষাদখিন্ন মুখ প্রসন্ন হইয়া উঠিল। কোমলকণ্ঠে তিনি বলিলেন, "কে ও? কমল?"

পরিচিত কণ্ঠের আহ্বান শুনিয়া বালিকা মৃদুস্বরে বলিল, "হুঁ।"

"তুমি এত রাত্রে একা ঘাটে আসিয়াছ?"

পূর্ব্ববৎ মৃদুস্বরে কমল বলিল, "ঠাকুরমার আজ বড় জ্বর এসেছে। এতক্ষণ তাঁর কাছে বসেছিলুম। এখন তিনি একটু ঘুমিয়েছেন দেখে তাড়াতাড়ি জল নিতে এসেছি।"

ষষ্ঠীচরণ ব্যস্তভাবে বলিলেন, "ঠাকুরমার আবার জ্বর হলো? চল, তোমাকে বাড়ী রেখে আসি, অমনি ঠাকুরমাকে দেখে আস্‌বো।"

পথে উভয়ে আর কোনও কথা কহিলেন না। কমল আনতমুখে অগ্রে চলিল। পশ্চাতে ষষ্ঠীচরণ বুকভরা ভাবনা লইয়া তাহার অনুসরণ করিলেন।

৩

রৌদ্রোজ্জ্বল মধ্যাহ্নে গ্রামখানি নিস্তব্ধপ্রায়। প্রখর গ্রীষ্মের উত্তাপে পাখীরা পত্রাচ্ছন্ন নীড়ে লুকাইয়াছে। কেবল নিঃসঙ্গ ঘুঘুর করুণতান মৌনমুগ্ধ মধ্যাহ্নের নীরবতায় একটু সুর বাঁধিয়া দিতেছিল।

গ্রামের এক প্রান্তে একখানি কুটীর। ঘরের দাওয়ার উপর মাদুর

বিছাইয়া কমল মহাভারত পড়িতেছিল। ঠাকুরমা মালা করিতে করিতে নিবিষ্টচিত্তে সেই পুণ্যকথা শুনিতেছিলেন। এক মাসের দীর্ঘ পীড়ার যন্ত্রণা তাঁহার শীর্ণ কপোলে, জীর্ণ দেহে স্মৃতিচিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে।

মাঠের উপর দিয়া রৌদ্রতপ্ত বাতাস শুষ্কপত্রে মর্ম্মরধ্বনি জাগাইয়া মাঝে মাঝে ছুটিয়া আসিতেছিল। সেই সুনীরব আলোকমগ্ন মধ্যাহ্নে কমলের মৃদুকণ্ঠোচ্চারিত মহাভারতের কাহিনী সঙ্গীতের মত চারি দিকে একটা স্বপ্নরাজ্যের সৃষ্টি করিতেছিল।

উঠানে পদশব্দ হইল। কমল চাহিয়া দেখিল, ষষ্ঠীচরণ। কমল গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল।

ঠাকুরমা ব্যস্তভাবে বলিলেন, "এস দাদা, বস।"

ষষ্ঠীচরণ বলিলেন, "কয় দিন আসিতে পারি নাই। আজ কেমন আছেন ঠাকুরমা?"

"আর দাদা, এখন মরণ হ'লেই বাঁচি। মরিতে ত বসিয়াছিলাম, পোড়া যম মাঝপথে ছেড়ে দিলে। আর কষ্ট সইতে পারি না ভাই! সবাই আমার ঘাড়ে দুঃখের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে সরে গেছে, সব যন্ত্রণা কেবল আমাকেই ভোগ কর্‌তে হচ্ছে। তবু কমলের যদি একটা গতি হ'তো!"

ঠাকুরমা নিশ্বাস ফেলিয়া অঞ্চলে চক্ষু মুছিলেন। ষষ্ঠীচরণ স্নিগ্ধস্বরে বলিলেন, "ভয় কি ঠাকুরমা, ভগবান্ মুখ তুলে চাইবেন বৈ কি। কৃষ্ণদেব-পুরের সে সম্বন্ধটার কি হলো?"

ঠাকুরমা বলিলেন, "সে ভরসা গেছে। গরীব কুলীনের মেয়ে কেউ নিতে চায় না। তাতে যে রকম জ্ঞাতিশত্রু, তারা ভাঙ্‌চি দিয়ে এ সম্বন্ধটাও ভাঙ্গিয়া দিয়াছে।"

"এ সম্বন্ধ ভেঙ্গে গেল কেন ঠাকুরমা?"

বৃদ্ধা অপেক্ষাকৃত নিম্নস্বরে বলিলেন, "শত্রুরা রটাইয়াছে, মেয়েটি লেখাপড়া শিখেছে। আর তুমি আমাদের উপর দয়া ধর্ম্ম ক'রে দেখ শোন, সদা সর্ব্বদা যাওয়া আসা কর, তাইতে তোমাদের নামে একটা মিথ্যা নিন্দা রটিয়েছে। এই সব শুনে তাদের মন ভেঙ্গে গেছে। সেই অবধি আর কোন সম্বন্ধ আস্‌ছে না।"

ষষ্ঠীচরণ ক্ষণকাল স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। মিথ্যা অপবাদ! এ কথা উচ্চারণ করিবার সময় তাহাদের পাপ রসনা খসিয়া পড়ে নাই! মিথ্যা কলঙ্ক

রটাইয়া তাহাদের কি স্বার্থ সিদ্ধ হইল? তিনি এই নিরাশ্রয় দরিদ্র দুইটিকে অভাবের সময় সাহায্য করেন, তাহাতে কাহার কি ক্ষতি? কমলকে তিনি সযত্নে লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন, তাহার পরিণাম এই দুরপনেয় কলঙ্ক! রুদ্ধকণ্ঠে ষষ্ঠীচরণ বলিলেন, "ঠাকুরমা, আমার জন্য কমলের বিবাহ সম্বন্ধ পর্য্যন্ত ভাঙ্গিয়া গেল, তার উপর আবার এত বড় কলঙ্ক? কি করিলে এ কলঙ্ক মুছিয়া যায় ঠাকুরমা? যদি আমি আর আপনাদের সংশ্রবে না আসিলে মঙ্গল হয়, তবে আজ হইতে আর এখানে আসিব না।"

বৃদ্ধা সকাতরে বলিলেন, "যাহা হইবার, তা' ত হয়ে গেছে। কলঙ্ক যা রটেছে, তা আর মুছিবার নয়। তাই বলে দাদা, তুমিও আমাদের প্রতি বিমুখ হইও না। এ গ্রামে তুমি ছাড়া আর কেউ আমাদের মুখের পানে চায় না। অদৃষ্টে যা লেখা আছে, তা কে খণ্ডাবে বল? মা মঙ্গলচণ্ডী সব দেখছেন, তাঁর বিচারে যা হয়, তাই ভাল। তুমি দাদা আমাদের উপর রাগ ক'রো না।"

দরজার আড়ালে থাকিয়া উদ্বেলিতহৃদয়ে কমল সকল শুনিতেছিল। তাহার আয়ত চক্ষু দুইটি মর্ম্মান্তিক দুঃখে, ব্যর্থ অভিমানে ও ক্ষোভে ছল্ ছল্ করিয়া উঠিল।

অনেকক্ষণ আকাশের দিকে চাহিয়া চাহিয়া ষষ্ঠীচরণ বলিলেন, "এমন কোন উপায় নাই কি, যাহাতে সকল দিক রক্ষা পায়?"

ঠাকুরমা উদাসভাবে বলিলেন, "কি আর আছে দাদা?"

ষষ্ঠীচরণ অবনতমুখে ধীরে ধীরে বলিলেন, "আমি একটা উপায় ঠিক করিয়াছি। আপনারা কুলীন, আমি শ্রোত্রিয়। যদি অন্য কোন বাধা না থাকে, তাহা হইলে কমলকে আমার হাতে সমর্পণ করুন। আমার নিন্দা, আমার কলঙ্কভার আমিই বহন করিব।"

বৃদ্ধা প্রথমে কথাটা ভাল করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। মানুষ যে সম্বন্ধে আশার একটা কাল্পনিক দুর্গ গঠন করিয়া লয়, সেটা সহসা যদি সত্যই বাস্তবে পরিণত হইয়া যায়, তখন সেই সম্ভবটাও অসম্ভবের মত বোধ হয়। অনেক দিনের দুরাশা সত্যে পরিণত হইল দেখিয়া বৃদ্ধার আনন্দের অবধি রহিল না।

আনন্দ-উচ্ছ্বাস বৃদ্ধার মুখমণ্ডলে যখন একটু সংযত ভাব ধারণ করিল, তখন তিনি বলিলেন, "ছাই কুলমান। কাহার জন্য কুল? কমল তোমারই

হইবে দাদা। কিন্তু কাজটা একটু গোপনে ও সাবধানে করিতে হইবে। জ্ঞাতিশক্রদের মনে কি আছে, জানি না; সুতরাং কাজ শেষ না হওয়া অবধি তাদের বিশ্বাস নাই।"

ষষ্ঠীচরণ চিন্তিতভাবে বলিলেন, "কি করিতে হইবে?"

বৃদ্ধা অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলেন, "কমলকে কিছু দিনের মত দেবীপুরে পাঠাইয়া দিব। সেখানে আমার দূর সম্পর্কের এক ভাই আছেন। কয়েক দিন পরে তুমিও গোপনে সেখানে যাবে। খরচপত্র দিলে তাঁরা সব যোগাড় ক'রে বিয়ে দিয়ে দেবেন। তা হলে আর আগে কিছু গোল হবে না। আমি যাবো না, এখানেই থাক্‌বো। সুতরাং জ্ঞাতিরা কোন রকম সন্দেহও কর্‌তে পার্‌বে না। বাধাও দিতে পারবে না।"

এই পরামর্শই ঠিক হইয়া গেল।

৪

বিবাহ করিয়া সস্ত্রীক ষষ্ঠীচরণ যখন গৃহে ফিরিলেন, তখন সংবাদটা গ্রামের মধ্যে পুরাতন হইয়া গিয়াছিল। বধূ বরণ করিবার জন্য ষষ্ঠীচরণের শূন্য গৃহে কাহারও নূপুরগুঞ্জন বা বলয়নিক্কণ শোনা গেল না। গৃহলক্ষ্মী নিজের ঘরে নিজেই প্রবেশ করিল।

এক পক্ষের আবর্জ্জনা পরিষ্কার করিয়া নূতন সংসার পাতাইবার আয়োজন করিতে বেলা গড়াইয়া পড়িল। ঠাকুরমাকে যে আনিতে গিয়াছিল, সে আসিয়া বলিল, "বিদ্যালঙ্কার ঠাকুর তাঁহাকে এখন ছাড়িয়া দিলেন না, কাল সকালে তিনি আসিবেন।"

ধীরে ধীরে জ্যোৎস্নালোক পর্ণকুটীরের উপর তরঙ্গিত হইয়া উঠিল। তুলসীতলার প্রদীপ জ্বলিয়া জ্বলিয়া কখন নিভিয়া গিয়াছে।

আহারাদির পর ষষ্ঠীচরণ শয্যায় আসিয়া বসিলেন। কমল সলজ্জ-কোমল-পদক্ষেপে পানের ডিবা হাতে করিয়া স্বামীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। পত্নীর ব্রীড়ানম্র মুখখানি বুকের উপর স্থাপিত করিয়া ষষ্ঠীচরণ কোমলকণ্ঠে বলিলেন, "কমল! তুমি যে আমার সহধর্ম্মিণী, এ কথা এখনও আমার স্বপ্ন বলিয়া মনে হয়। এত সুখ আমার অদৃষ্টে সহিবে কি?"

সুখাবেশে কমলের কমলনয়নপল্লব নিমীলিত হইয়া আসিয়াছিল। চন্দ্রকর-প্লাবিত অরণ্যকুঞ্জ হইতে পাপিয়ার দূরশ্রুত হৃদয়োচ্ছ্বাস গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। ঝিল্লীমুখরিত যামিনীর স্বপ্নালসসংস্পর্শে নিখিল বিশ্ব সুপ্তিমগ্ন হইয়া পড়িয়াছিল।

"যাও কমল, বড় পরিশ্রম করিয়াছ, আহার করিয়া আইস।" স্বামীর স্নেহপাশ হইতে আপনাকে ধীরে ধীরে মুক্ত করিয়া কমল গৃহান্তরে চলিয়া গেল।

আরাম করিয়া ষষ্ঠীচরণ শয্যায় শয়ন করিতে যাইতেছেন, এমন সময় বাহিরে কেহ ডাকিল, "ঠাকুর মহাশয়! বাড়ী আছেন?"

বিরক্তস্বরে ষষ্ঠীচরণ বলিলেন, "কে হে বাপু, এত রাত্রে ডাকাডাকি কেন?"

যে ডাকিয়াছিল, সে বলিল, "একবার বাহিরে আসুন, বিশেষ দরকার আছে।"

চারি পাঁচ ব্যক্তি আলোকহস্তে বাহিরের উঠানে দাঁড়াইয়া ছিল। ষষ্ঠীচরণ নিকটে আসিয়া বলিলেন, "কে ও? সনাতন না কি?"

সনাতন প্রণাম করিয়া ষষ্ঠীচরণের হাতে একখানি পত্র দিল। ষষ্ঠীচরণ বলিলেন, "কিসের চিঠি?" সনাতন উত্তর করিল, "পড়িয়া দেখুন।"

এক জন একটা আলো তুলিয়া ধরিল। ষষ্ঠীচরণ নিঃশব্দে পাঠ করিলেন। সহসা তাঁহার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। এ কি রহস্য, এ কি বিদ্রূপ!

সনাতন বলিল, "দাদাঠাকুর, বাবু আপনাকে চিঠিখানা দিতে বল্লেন, আর অমনি আপনাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে হুকুম দিয়েছেন।"

ষষ্ঠীচরণ বলিলেন, "দাঁড়াও, আমি আসিতেছি।" দরজা আগুলিয়া সনাতন বাধা দিয়া বলিল, "মাপ কর্‌বেন, দাদাঠাকুর; আমরা হুকুমের চাকর, হুকুম তামিল কর্‌বো। বাড়ীর মধ্যে এখন যেতে পাবেন না, আমাদের উপর এমন হুকুম নাই।"

ক্রোধে, ক্ষোভে ষষ্ঠীচরণ স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন। তিনি আত্মসংবরণ করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, চল।"

৫

জমীদার বাবুদের বহির্ব্বাটীর প্রাঙ্গণতল ও কক্ষগুলি মুণ্ডিতশীর্ষ ব্রাহ্মণে পরিপূর্ণ। হুঁকার শব্দ, তাম্রকুটের ধূম ও বচনজালে সভাতল কুজ্ঝটিকামগ্ন শব্দপূর্ণ সাগরের মত বোধ হইতেছিল। চারি দিকে কেবল শিখাকণ্টকিত মস্তক সারি সারি বিচিত্র ভঙ্গীতে দুলিতেছে, হেলিতেছে।

সেই জনতা ভেদ করিয়া ষষ্ঠীচরণ যখন জমীদার বাবুর কাছে নীত হইলেন, তখন সংক্ষুব্ধ জনমণ্ডলী যেন মন্ত্রবলে সহসা স্তব্ধ হইয়া গেল। চারি দিকে

ক্ষোভে, দুঃখে, রাগে ষষ্ঠীচরণের সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছিল। তিনি জমীদার বাবুকে দেখিয়া উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে বলিলেন, "আমি আপনাদের আশ্রিত প্রজা। এই দীন দরিদ্র ব্রাহ্মণসন্তানের উপর রাত্রি দ্বিপ্রহরে এ কি অত্যাচার হুজুর? আবার এই দেখুন, মহাশয়ে নাম দিয়া দুষ্ট লোকে কিরূপ একটা মিথ্যা পত্র লিখিয়াছে।"

পত্রখানি দেখিয়া জমীদার গম্ভীরভাবে বলিলেন, "মিথ্যা নহে। এ পত্র আমারই অনুমতিক্রমে লিখিত হইয়াছে।"

বিস্ময়বিস্ফারিতনয়নে ষষ্ঠীচরণ বলিলেন, "সে কি! কি বলিতেছেন? স্বর্গীয় বিশ্বম্ভর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের একমাত্র কন্যা কমলকে ত আমিই বিবাহ করিয়াছি। দেবীপুরের সর্ব্বানন্দ ঠাকুর যথাশাস্ত্র আমাদের বিবাহ দিয়াছেন।"

জমীদার কৃষ্ণশঙ্কর উচ্চহাস্যে বলিলেন, "আশ্চর্য্য করিলে! তুমি আবার তাহাকে বিবাহ করিলে কবে? কি বলেন বিদ্যালঙ্কার মহাশয়?"

বিদ্যালঙ্কার বিদ্রূপের স্বরে বলিলেন, "অদ্ভুত গল্প বটে! লোকটা খুব ধড়িবাজ ত!"

ষষ্ঠীচরণ বিদ্যালঙ্কারের দিকে ফিরিয়া চাহিলেন। বৃদ্ধের নয়নে প্রতিহিংসার জ্বালাময় অগ্নি জ্বলিতেছিল! শিহরিয়া ষষ্ঠীচরণ কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন, "হুজুরের বিশ্বাস না হয়, কমলের ঠাকুরমাকে জিজ্ঞাসা করুন, তিনি সব জানেন।"

বিদ্যালঙ্কারের পার্শ্বে স্বপ্নমুগ্ধার মত বৃদ্ধা বসিয়া বসিয়া কাঁপিতেছিলেন। জমীদার গম্ভীর স্বর উন্নত করিয়া বলিলেন, "ঠাক্‌রুণ, ষষ্ঠী বলিতেছে, সে কমলকে বিবাহ করিয়াছে, আপনি স্বচক্ষে সে বিবাহ দেখিয়াছেন?"

ভয়ে বৃদ্ধার হাত পা ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। বিদ্যালঙ্কারের দিকে চাহিয়া বৃদ্ধার কণ্ঠস্বর স্তব্ধ হইয়া আসিল। অস্ফুটস্বরে তিনি বলিলেন, "না, আমি চোখে দেখিনি, তবে—"

বিদ্যালঙ্কার চীৎকার করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সেই সংক্ষুব্ধ ব্রাহ্মণ-মণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া তীব্রস্বরে বলিলেন, "সকলে শুনিলেন, উনি কি বলিলেন? এ বিবাহ তিনি স্বচক্ষে দেখেন নাই। বিবাহ হইলে তবে ত দেখিবেন? আরে, আমরা হলেম জ্ঞাতি, আত্মীয়, আমরা কিছুই জান্‌লেম্ না, শুন্‌লেম্ না, মেয়ের ঠাকুরমা পর্য্যন্ত জান্‌লে না, আর এত বড় একটা গুরুতর

জমীদার বাবু আবার বৃদ্ধাকে ডাকিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, আপনি সে সময় উপস্থিতও ছিলেন না ?"

বৃদ্ধার পদতল হইতে পৃথিবী যেন সরিয়া সরিয়া যাইতেছিল। এ কি হইল ? তিনি কি বলিলেন ? কি সর্ব্বনাশ করিলেন ? তিনি কি স্বপ্ন দেখিতেছেন ?

বিদ্যালঙ্কার ধমক্ দিয়া বলিলেন, "চুপ করে রইলে কেন খুড়ী ? ব'লে ফেল, তুমি সেদিন কোথায় ছিলে ? আমার কাছে ছিলে কি না ?"

যে কথাগুলি বৃদ্ধা বলিবেন বলিয়া গুছাইয়া আনিয়াছিলেন, বিদ্যালঙ্কারের তীব্র ভর্ৎসনায় সব গোলমাল হইয়া গেল। তিনি অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "হাঁ বাবা, তোমার ওখানেই ছিলাম।"

তখন বিদ্যালঙ্কার স্বর আরও উচ্চ করিয়া বলিলেন, "এখন সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন, কি রকম ভয়ানক চক্রান্ত করিয়া আমাদের নির্ম্মল কুলে কালী দিবার জন্য ধূর্ত্ত ষষ্ঠীচরণ চেষ্টা করেছে। আত্মীয়, স্বজন, জ্ঞাতি, বন্ধু, কেহ জানিল না, কেহ শুনিল না,—এমন বিবাহ কখন হইতে পারে ? আর আমি সর্ব্বেশ্বর ঠাকুরের সন্তান, আমি না জানিয়া না শুনিয়াই কি আবার বিবাহের বিধি দিতে পারি ? দেখ হে কৃষ্ণশঙ্কর, তোমার রাজত্বে বাস করে ব্রাহ্মণের কুল মান ইজ্জৎ পর্য্যন্ত রক্ষা করা দায় হয়ে উঠ্‌লো।"

তখন সেই অসংখ্য ব্রাহ্মণ চীৎকার করিয়া বলিল, "দোহাই রাজা বাবুর, আমাদের মান ইজ্জৎ ধর্ম্ম রক্ষা কর। বিদ্যালঙ্কার সত্যই বলিয়াছেন। এমন ব্যবস্থা তিনি দিতে পারেন না।"

বৃদ্ধা কি বলিতে যাইতেছিলেন ; কিন্তু কোলাহলে সে ক্ষীণ কণ্ঠ কোথায় ডুবিয়া গেল। ষষ্ঠীচরণ ক্ষোভে ক্রোধে অধরদংশন করিতেছিলেন। তাঁহার চক্ষের সম্মুখে সমস্ত পৃথিবীটা যেন একটা নিষ্ঠুর রাক্ষসের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাঁহাকে গ্রাস করিতে আসিতেছিল।

একখানি বস্ত্রাবৃত ডুলি আসিয়া থামিল। শঙ্কামলিন কমলের বেপমান দেহ দুই জন দাসী প্রায় টানিয়া বাহির করিল।

ষষ্ঠীচরণের সমুদায় ধমনীতে একটা তীব্র জ্বালাময় আগুনের স্রোত বহিয়া গেল। এক লম্ফে তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন, মুহূর্ত্তে আট দশ জন বলিষ্ঠ লোক তাঁহাকে সজোরে চাপিয়া ধরিল। উন্মত্তের মত চীৎকার করিয়া ষষ্ঠীচরণ

এমন নিদারুণ অবিচার, অধর্ম্ম করিবেন না। কমলকে আপনি জিজ্ঞাসা করিয়া দেখুন, আমি অগ্নি সাক্ষী করিয়া উহাকে বিবাহ করিয়াছি কি না।"

দাসীদের বাহুবেষ্টনের মধ্যে শরীরের পূর্ব্বার্দ্ধ উন্নত করিয়া উন্মুখ তরঙ্গের ন্যায় কমল স্বামীর নিকট যাইতে চাহিল।

"খবরদার!" বিদ্যালঙ্কার বাঘের মত গর্জ্জিয়া উঠিলেন। তার পর জ্বলন্ত আগুনের মত ষষ্ঠীচরণের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "চুপ্ কর্ লম্পট! তোর সঙ্গে উহার বিবাহই হইতে পারে না। কেহ জানিল না, কেহ সম্প্রদান করিল না, বিবাহ!"

চারি দিক হইতে অসংখ্য কণ্ঠে শব্দ হইল, "কখনও হইতে পারে না, কখনও হয় নাই।"

জমীদার কৃষ্ণশঙ্কর বলিলেন, "পাত্র হাজীর আছে?" বিদ্যালঙ্কার এক ষষ্টিবর্ষীয় বৃদ্ধকে দেখাইয়া দিলেন।

কৃষ্ণশঙ্কর বলিলেন, "আপনি এ বিবাহে সম্মত আছেন?"

বৃদ্ধ বলিল, "আজ্ঞে হাঁ। কুলীনের কুলরক্ষা করাই আমাদের ব্যবসায়।"

কাঁপিতে কাঁপিতে কমল মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। বৃদ্ধা চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

বিদ্যালঙ্কার বলিলেন, "ওরে! বাজ্না বাজা।"

চীৎকার, ক্রুদ্ধ গর্জ্জন ডুবাইয়া দিয়া বাজ্না বাজিয়া উঠিল। বিদ্যালঙ্কার সম্প্রদানকর্ত্তার আসন গ্রহণ করিলেন।

ষষ্ঠীচরণের দৃষ্টি হইতে সমুদায় আলোক যেন সহসা অন্তর্হিত হইল। আকুঞ্চিত মাংসপেশী নিষ্ফল আক্রোশে স্ফীত হইয়া উঠিল। তাঁহার বুকের উপর কে যেন পর্ব্বত চাপিয়া ধরিল। তিনি যন্ত্রণারুদ্ধকণ্ঠে একবার চীৎকার করিয়া বলিলেন, "বিদ্যালঙ্কার, ব্রাহ্মণের সর্ব্বনাশ করিও না; রক্ষা কর, ক্ষমা কর।"

প্রত্যুত্তরে দ্বিগুণরবে বাদ্য বাজিয়া উঠিল। হোমের আগুন আরও উজ্জ্বল আলোক বিকীর্ণ করিয়া জ্বলিতে লাগিল। একখানি শীর্ণ কঙ্কালসার হস্তের উপর আর একখানি স্পন্দনহীন শিথিল হস্ত রাখিয়া বিদ্যালঙ্কার ফুলের মালা ও বস্ত্রের বন্ধন দৃঢ় করিয়া দিলেন।

শিবাজীর জন্মকাল।

ছত্রপতি শিবাজীর জন্মতিথি ও জন্মকাল সম্বন্ধে তাঁহার স্বদেশীয় প্রাচীন লেখকগণ বিভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। প্রথমতঃ সেগুলির উল্লেখ করা যাইতেছে। পরে বিচারপূর্ব্বক সিদ্ধান্তস্থাপনের চেষ্টা করা যাইবে।

(১) শিবাজীর সামসময়িক লেখকদিগের মধ্যে কেহই তাঁহার জন্মদিন বা কাল সম্বন্ধে কোন প্রকার উল্লেখ করেন নাই।

(২) পরভাবিক লেখকগণের মধ্যে—

(ক) মহ্লার রাম রাও চিটনীস "১৫৪৯ শকাব্দে (১৬২৭ খৃঃ) প্রভব (১) নাম সংবৎসরে, বৈশাখ শুক্লা দ্বিতীয়া বৃহস্পতিবার" মহারাজের জন্ম হয়, এবং তাঁহার ছয়টি গ্রহ তুঙ্গ ছিল, এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন। (এই গ্রন্থকার শিবাজীর মৃত্যুর ১৩০ বৎসর পরে স্বীয় গ্রন্থ রচনা করেন)।

(খ) অধ্যাপক জি. ডবলিউ. ফরেষ্টের State Papers of Bombay, Maratha Series নামক সংগ্রহপুস্তকে প্রকাশিত বখরের মতে, শিবাজীর জন্ম-সময় ১৫৪৯ শকাব্দের বৈশাখ মাস। (এই বখর ফরেষ্ট মহোদয় রায়গড়ে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন) ইহার অন্যত্র ১৫৪৮ শকাব্দের উল্লেখ আছে।

(গ) শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ কাশীনাথ রাজওয়াডে বি. এ. মহোদয় রায়গড় হইতে যে বখর সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতে "১৫৪৮ শকে (১৬২৬ খৃঃ) ক্ষয় নাম সংবৎসরে বৈশাখ শুক্লা পঞ্চমী সোমবার শিবাজীর জন্ম হয়," এইরূপ লিখিত আছে।

(ঘ) কাব্যেতিহাস-সংগ্রহ নামক মাসিকপত্রের প্রকাশক মহাশয় ধারানগরী হইতে যে ঐতিহাসিক ঘটনার অনুক্রমণী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে শিবাজীর জন্মাব্দস্থলে "১৫৪৯ শকে প্রভব সংবৎসরে বৈশাখ শুক্লা পঞ্চমী সোমবার"—এই তারিখ লিখিত আছে।

(ঙ) "শ্রীশিবদিগ্বিজয়" নামক বখরের উল্লেখ মহ্লার রাম রাওয়ের অনুরূপ। বেশীর ভাগ ঐ দিবস রোহিণী নক্ষত্র ছিল বলিয়া লিখিত আছে।

---

(১) ষষ্টিসংবৎসরময় বার্হস্পত্য বর্ষের প্রথম বর্ষের নাম প্রভব। এই ষষ্টিবর্ষের নামের তালিকা ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় ১৮১৪ শকের চৈত্র মাসের "বৈদিক যুগ" শীর্ষক মল্লিখিত প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।

এই বথরে শিবাজীর জন্মকাল সম্বন্ধে প্রাচীনগণের উক্তি বলিয়া এক স্থানে তিনটি শ্লোকও উদ্ধৃত হইয়াছে। সেগুলি এই,—

অব্দে বৈ প্রভবাভিধে নরপতে শালি-প্রবাহাৎ পরং
শাকে বেদনবাধিকেন্দুশরকে মাসে চ সন্মাধবে।
নক্ষত্রে চ তিথৌ বিধৌ শুক্লদিনে পক্ষে সিতে "শাহজেঃ"
জাতো নাম শিবাজিকো নরবরো যো বৈ হুতাংশো হিতে॥

দ্বিতীয় শ্লোকটি ইহারই মহারাষ্ট্রীয় পদ্যানুবাদ। তৃতীয় শ্লোকটি এইরূপ,—

শিবাজিবর্য্যো নৃপতির্বভূব বিশাখমাসে সিতপক্ষমধ্যে।
গুরৌ দ্বিতীয়া বিধিভান্বিতে হি নাগাক্ষ-(ব্ধি ?) নূনং শশিবাণবর্ষে।

এই বথর ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে রচিত হইলেও, ইহার লেখক অনেক প্রাচীন কাগজপত্র দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন।

(চ) "শ্রীশিবপ্রতাপ" নামক বথরের উক্তি এইরূপ,—"১৫৪৯ শক, রক্তাষি নামক সংবৎসর শিবাজীর জন্মবর্ষ।"

(ছ) "মারাঠি সাম্রাজ্যের ছোটী বথরে" শিবাজীর জন্মদিন "শাকে ১৫৪৯ ক্ষয় নাম সংবৎসরে বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষীয়া পঞ্চমী তিথি সোমবারে" ছিল বলিয়া লিখিত আছে।

(জ) "ভারতবর্ষ" নামক মারাঠী মাসিকপত্রে শিবাজীর যে বথর প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে সংবৎসর, মাস, তিথি ও বার মারাঠী সাম্রাজ্যের ছোটী বথরের অনুরূপ লিখিত হইয়াছে। কেবল শকাব্দের সংখ্যা-নির্দ্দেশ-স্থলে উহাতে ১৫৫৯ অব্দের উল্লেখ পরিদৃষ্ট হয়।

(ঝ) পূর্ব্বোক্ত মাসিকপত্রে প্রকাশিত "শিবাজীর বংশতালিকাযুক্ত ঐতিহাসিক অনুক্রমণীতে" "১৫৪৯ শাকের বৈশাখ শুক্লা পঞ্চমী" এবং "ন্যায়শাস্ত্রী পণ্ডিত রাওয়ের বথরে"—"১৫৪৯ প্রভবে" ভিন্ন আর কোনও উল্লেখ নাই।

(ঞ) ঐ পত্রেই প্রকাশিত ছত্রপতির "প্রতিনিধিদিগের বথর" নামক গ্রন্থে "শকে ১৫৪৯ প্রভব নাম সংবৎসরে বৈশাখ শুক্লা ১৫ (পূর্ণিমা) সোমবার"—এই তারিখের উল্লেখ আছে। এই বথরের টীকার প্রকাশক বলেন, "একখানি ঐতিহাসিক অনুক্রমণীতে 'তৃতীয়া' লিখিত আছে, দেখিয়াছি।"

(ট) কাব্যেতিহাসসংগ্রহে "শিবাজীর জন্মকালের লগ্নকুণ্ডলী" ইতি-

এই কুণ্ডলী অনুসারে শিবাজীর জন্ম মিথুন লগ্নে হইয়াছিল। বৃহস্পতি, মঙ্গল, রবি ও চন্দ্র, এই চারি গ্রহ তুঙ্গী ছিলেন। শুক্র স্বগ্রহে ছিলেন। রবি মেষরাশিস্থিত ও চন্দ্র বৃষভস্থ থাকায় জন্মমাস বৈশাখ ছিল বলিয়া নিঃসন্দেহে স্বীকার করা যায়। ঐ মাসে সাধারণতঃ বেলা ১০টার সময় মিথুন লগ্ন থাকে। কুণ্ডলীতে অব্দের উল্লেখ নাই। তথাপি বৃহস্পতি কর্কট রাশিতে ছিলেন, দেখা যাইতেছে। গণনা দ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে, ১৫৪৫ শাকে বৈশাখ মাসে দেবগুরু কর্কট রাশিতে ছিলেন। ঐ অব্দে রুধিরোদ্গারী নামে সংবৎসর ও বৈশাখ শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে সোমবার ছিল, এবং সূর্য্যোদয়ের ৯।১০ দণ্ড পরে রোহিণী নক্ষত্রে চন্দ্র প্রবেশ করিয়াছিলেন, ইহাও গণনা দ্বারা প্রতিপন্ন হয়। সুতরাং এই কুণ্ডলী অনুসারে ১৫৪৫ শকাব্দে (১৬২৩ খৃষ্টাব্দে) রুধিরোদ্গারী নাম সংবৎসরে, বৈশাখ শুক্লা দ্বিতীয়া সোমবারে সূর্য্যোদয়ের আনুমানিক ১০।১১ দণ্ড পরে রোহিণী নক্ষত্রে শিবাজীর জন্ম হইয়াছিল।

উপরে যে দ্বাদশটি বিভিন্ন মতের উল্লেখ করা গেল, তাহার মধ্যে কোনটি সত্য বা গ্রহণীয়, এ প্রশ্ন সকলের মনেই উদিত হইতে পারে। শিবাজীর ন্যায় প্রসিদ্ধ ব্যক্তির জন্মদিবস সম্বন্ধে এরূপ বহু মত বিদ্যমান রহিয়াছে দেখিয়াও অনেকে বিস্মিত হইবেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু মহাবীর নেপোলিয়নের পরাভবকারী ডিউক অফ্ ওয়েলিংটনের জন্মদিবস "নানা মুনির নানা মত" হেতু অদ্যাপি অনিশ্চিত রহিয়াছে, এ কথা যাঁহারা অবগত আছেন, শিবাজীর জন্মকাল উপলক্ষে মতভেদ দেখিয়া তাঁহাদিগের বিস্ময়োদ্রেক হইবে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। সে যাহা হউক, ফলিতজ্যোতিষ শাস্ত্রে শিবাজীর বিশ্বাস ছিল; তাঁহার আদেশে ২।১ খানি জোতির্বিষয়ক গ্রন্থও রচিত হইয়াছিল। সুতরাং তাঁহার জন্মপত্রিকা বা কোষ্ঠী ছিল না, ইহা সম্ভবপর নহে। কিন্তু যে কারণেই হউক, উহা আর এখন পাওয়া যায় না। শিবাজীর সমসময়ে বা তাঁহার পরলোকগমনের অব্যবহিত পরে যাঁহারা তাঁহার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের কেহ এ বিষয়ে মনোযোগী হইলে বোধ হয় অদ্য আমাদিগকে শিবাজীর জন্মদিবস লইয়া এরূপ বিভ্রান্ত হইতে হইত না। কিন্তু সে জন্য আর বৃথা আক্ষেপ না করিয়া উল্লিখিত মতনিচয়ের মধ্যে কোনটিতে বিশ্বাসস্থাপন করিতে পারি কি না, এক্ষণে তাহাই দেখা কর্ত্তব্য।

(ক) মহ্লার রাম রাও চিটনীস সাতরার রাজদপ্তরের কাগজপত্র অবলম্বন করিয়া স্বীয় গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার কথায় আস্থা স্থাপন করিতে স্বভাবতই প্রবৃত্তি হয়। কিন্তু ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে পরলোকগত জ্যোতির্ব্বিদ্ শঙ্কর বালকৃষ্ণ দীক্ষিত ও মিঃ রবার্ট সিওয়েল মহোদয়দ্বয়ের চেষ্টায় "হিন্দু পঞ্চাঙ্গ" নামে যে গ্রন্থ সংকলিত ও প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে নির্দ্দিষ্ট প্রণালী অবলম্বনে তিথি-বার-নক্ষত্রের একতাসাধনের চেষ্টা করিলে মহ্লার রাওয়ের গ্রন্থ হইতে সত্যলাভ সম্বন্ধে আমাদিগকে নিরাশ হইতে হয়। উক্ত "হিন্দু-পঞ্চাঙ্গ" নামক গ্রন্থে ৩০০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কালের মধ্যে কোন্ তারিখে কোন্ বার তিথি ও নক্ষত্রাদি ছিল, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার সহজ প্রণালী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তদবলম্বনে গণনা করিলে দৃষ্ট হয় যে, মহ্লার রাম রাওয়ের বর্ণিত তারিখে "বৃহস্পতিবার" ছিল না। শনিবারে ঐ শকের "বৈশাখ শুক্লা দ্বিতীয়া" হইয়াছিল। এবং নক্ষত্র ভরণী ছিল।

(খ) ফরেষ্টের প্রকাশিত বখরে বার তিথি প্রভৃতির উল্লেখ না থাকায় তৎসম্বন্ধে বিচার্য্য কিছুই নাই। তবে উহারই অন্য স্থলে আবার শিবাজীর জন্মবর্ষ ১৫৪৮ শকাব্দ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

(গ) এই বখরে বর্ণিত অব্দে বৈশাখ শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে "সোমবার" ছিল না। পূর্ব্বোক্ত হিন্দু-পঞ্চাঙ্গের গণনা অনুসারে বৃহস্পতিবার ও আর্দ্রা নক্ষত্র ছিল।

(ঘ) ধারানগরীর অনুক্রমণীতে তিথিবারাদির ঐক্য আছে। সে দিন সূর্য্যাস্তের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত চতুর্থী ছিল। তদ্ভিন্ন মৃগশিরা বা আর্দ্রা ছিল। অনুক্রমণী-কার নক্ষত্রের উল্লেখ করেন নাই। এ কারণে তাঁহার নির্দ্দেশ সম্পূর্ণ ভ্রমশূন্য কি না, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। তথাপি অন্যান্য বখরের সহিত একবাক্যতা করিবার জন্য কেহ কেহ সে দিন রোহিণী নক্ষত্র ছিল বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। কিন্তু জন্মনক্ষত্র ধরিয়া যদি জন্মতিথির নির্দ্ধারণ করিতে হয়, তাহা হইলে "বৈশাখ শুক্লাপঞ্চমী" প্রকৃত জন্মতিথি বলিয়া কিছুতেই স্বীকার করা যাইতে পারে না। কারণ, ঐ তিথিতে রোহিণী নক্ষত্রের কোনও সম্ভাবনা নাই।

(ঙ) শুক্লদ্বিতীয়ায় রোহিণী নক্ষত্র বা বৃহস্পতিবার—এতদুভয়ের একটিও

আছে, তাহার একাধিক অর্থ হইতে পারে। পরে তাহার সম্বন্ধে সবিস্তার বিচার করা যাইবে।

(চ) এই বখরে তিথি, নক্ষত্র, মাস, বা বারের উল্লেখ নাই। সংবৎসরের নামেও লেখকের ভ্রান্তি ঘটিয়াছে। ১৫৪৯ শকাব্দে রক্তাক্ষি নামক সংবৎসর ছিল না; "প্রভব" সংবৎসর ছিল। রক্তাক্ষি সংবৎসর ধরিলে ১৫৪৬ শকাব্দে শিবাজীর জন্ম স্বীকার করিতে হয়।

(ছ) এ বখরেও সংবৎসরের নাম সম্বন্ধে ভ্রান্তি দৃষ্ট হয়। প্রকৃতপক্ষে ১৫৪৮ শকাব্দে "ক্ষয়" নামক সংবৎসর ছিল। আর সোমবারে সূর্য্যোদয়কালে চতুর্থী ও রাত্রিকালে পঞ্চমী ছিল।

(জ) সংবৎসর ও তিথিবারাদি সম্বন্ধে (ছ)-চিহ্নিত বখরের সহিত ইহার সম্পূর্ণ ঐক্য আছে। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত আপত্তি এখানেও প্রযোজ্য। অধিকন্তু এ বখরে মুদ্রাকরের দোষেই হউক, বা লেখকের প্রমাদবশেই হউক, ১৫৪৯ স্থলে "১৫৫৯ শকাব্দ" হইয়াছে।

(ঝ) এই দুই বংশতালিকাযুক্ত অনুক্রমণীতে বার নক্ষত্রের উল্লেখ না থাকায় তদুক্ত তিথির সত্যতা-পরীক্ষার কোনও উপায় নাই।

(ঞ) প্রতিনিধিদিগের বখরেও ভ্রম আছে। বৈশাখ শুক্লা ১৫ বা পৌর্ণমাসী প্রকৃত তিথি বলিয়া স্বীকার করিলে বখরের উক্ত বারের সহিত অনৈক্য ঘটে। সম্ভবতঃ, এই বখরে পঞ্চমীর দ্যোতক "৫" স্থলে লিপিকর-প্রমাদে "১৫" হইয়া থাকিবে।

(ট) এই লগ্নকুণ্ডলীও বহু দোষে দুষ্ট। ১ম, ইহা কোনও বখরের অন্তর্ভুক্ত নহে। ২য়, কোনও বখরেরই সহিত অব্দ-সংখ্যা-সম্বন্ধে ইহার ঐক্য নাই। ৩য়, গণনা দ্বারা উপলব্ধি হয় যে, ১৫৪৫ শকাব্দে শনি কর্কট-গত ছিলেন,—বৃশ্চিকে ছিলেন না। রাহু তুলা রাশিতে ছিল। কিন্তু কুণ্ডলীতে শনিকে অষ্টম ও রাহুকে পঞ্চমস্থানীয় রূপে চিত্রিত করা হইয়াছে। ৪র্থ, শনি ও রাহু সম্বন্ধে কুণ্ডলীর নির্দ্দেশ সত্য বলিয়া স্বীকার করিলে বৃহস্পতির অবস্থান সম্বন্ধে গোলযোগ ঘটে। সুতরাং এই জন্মকুণ্ডলী অবিশ্বাস্য বলিয়া একেবারে পরিত্যাগ করিতে হয়।

শ্রীযুক্ত দীক্ষিত ও মিঃ সিওয়েলের মতানুসারে গণনা করিলে দৃষ্ট হইবে, উল্লিখিত একাদশটি মতের কোনওটিই

এই সকল মতের আলোচনা করিলে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তনিচয়ে উপনীত হইতে পারা যায়।—

(১) শিবাজীর বৈশাখ মাসে জন্ম হইয়াছিল, এ বিষয়ে সকল লেখকেরই মতের ঐক্য দৃষ্ট হয়।

(২) জন্মশক কেহ ১৫৪৮ ও কেহ ১৫৪৯ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অবশ্য লগ্নকুণ্ডলীর নির্দ্দিষ্ট অব্দ সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক বলিয়া সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়।

(৩) অব্দসংখ্যার ন্যায় তিথি সম্বন্ধেও দ্বিবিধ মত দৃষ্ট হয়, যথা—
(ক) দ্বিতীয়; (খ) পঞ্চমী।

(৪) বারও—কেহ বৃহস্পতি ও কেহ সোম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

(৫) নক্ষত্রের উল্লেখ এক শিবদিগ্বিজয়-কার ভিন্ন আর কেহই করেন নাই। এই লেখকের মতে, সেদিন রোহিণী নক্ষত্র ছিল।

বিচারসৌকর্য্যের নিমিত্ত প্রথমোক্ত চারিটি মত নিম্নলিখিত দুই ভাগে বিভক্ত হইতে পারে।

(ক) ১৫৪৯ শকাব্দে, প্রভবনাম সংবৎসরে, বৈশাখ শুক্লা দ্বিতীয়া, বৃহস্পতিবার; অথবা শুক্লপক্ষীয়া পঞ্চমী সোমবার।

(খ) শকাব্দ ১৫৪৮, ক্ষয় নামক সংবৎসর, বৈশাখ শুক্লা দ্বিতীয়া, (বার অনুক্ত) শুক্লা পঞ্চমী সোমবার।

পূর্ব্বোক্ত "হিন্দু-পঞ্চাঙ্গ" অনুসারে গণনা করিলে দৃষ্ট হইবে যে,—

(১) ১৫৪৯ শকাব্দে প্রভব সংবৎসর ও শুক্লা দ্বিতীয়ায় শনিবার ছিল, তদ্ভিন্ন সূর্য্যোদয়কালে ভরণী নক্ষত্রের চতুর্থ চরণ ছিল। ইংরাজী ১৬২৭ খৃষ্টাব্দের ৭ই এপ্রিল।

(২) ঐ অব্দের পঞ্চমী তিথিতে মঙ্গলবার ছিল। তদ্ভিন্ন সূর্য্যোদয়কালে ভরণী নক্ষত্রের চতুর্থ চরণ ছিল। কিন্তু সোমবার রাত্রিকালে পঞ্চমী প্রবৃত্ত হইয়াছিল। ইংরাজী ১০ই এপ্রিল—১৬২৭ খ্রীঃ।

(৩) ১৫৪৮ শকাব্দে ক্ষয় নামক সংবৎসরের বৈশাখী শুক্লা দ্বিতীয়ায় সোমবার, কৃত্তিকা নক্ষত্র ছিল। সূর্য্যোদয়ে বা তাহার কিঞ্চিৎ পরে দ্বিতীয়া প্রবৃত্ত হইয়াছিল। নিশীথকালে রোহিণী নক্ষত্রের সঞ্চার হয়। ইংরাজী ২৬শে এপ্রেল, ১৬২৬ খৃঃ।

(৪) ঐ অব্দের বৈশাখ শুক্লা পঞ্চমীতে বৃহস্পতিবার—সূর্য্যোদয়কালে

বৈশাখ মাস সম্বন্ধে কোনও লেখকের মতভেদ নাই, এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এখন প্রথমে অব্দনির্ণয়ের চেষ্টা করা যাউক। শিবাজীর জন্মাব্দ সম্বন্ধে লেখকদিগের মধ্যে দ্বিবিধ মত পরিদৃষ্ট হইলেও, তাঁহার মৃত্যু সম্বন্ধে সকলের ঐকমত্য দেখা যায়। ১৬০২ শকাব্দের ১৬৮০ খৃঃ চৈত্রী পূর্ণিমা রবিবারে শিবাজীর মৃত্যু হয়, এ কথা সকল লেখকই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। সে সময়ে যে তাঁহার বয়স ৫৩ বৎসর হইয়াছিল, সে সম্বন্ধেও কাহারও মতভেদ নাই। শিবাজী যে ৫৩ বৎসর বয়সেই ইহলোক ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহার অন্যবিধ প্রমাণও আছে। সে যাহা হউক, এখন তাঁহার মৃত্যুবর্ষ ও বয়ঃসংখ্যা ধরিয়া বিচার করিলে ১৬৪২—৫৩=১৫৪৯ শকাব্দে (১৬২৭ খ্রীষ্টাব্দে) শিবাজীর জন্ম হইয়াছিল, স্বীকার করিতে হয়। পাঠক দেখিবেন, দ্বাদশ জন লেখকের মধ্যে নয় জনের মতে শিবাজীর জন্মাব্দ ১৫৪৯। ঐ অব্দে "ক্ষয়" নামক সংবৎসর ছিল বলিয়া যে দুই তিন জন লেখক নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাঁহারা সে সম্বন্ধে স্পষ্টতঃই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। ১৫৪৮ শকের স্বপক্ষে দুই জনের অধিক লেখক নাই। তাহার মধ্যে এক জন (অধ্যাপক ফরেষ্টের প্রকাশিত বখরের কর্ত্তা) অন্যত্র ১৫৪৯ শকের কথাও লিখিয়াছেন। "জ"-চিহ্নিত বখরের লেখকের ১৫৫৯ অব্দকে সংশুদ্ধ করিয়া যদি ১৫৪৯ বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে মতভেদের অবকাশ আরও কমিয়া যায়। ফলকথা, ১৫৪৯ শকাব্দের বৈশাখমাসে শিবজীর জন্ম হইয়াছিল, এ কথা আমরা অভ্রান্ত বলিয়াই স্বীকার করিতে পারি।

মাস ও বৎসর পাওয়া গেল। এখন তিথির নির্ণয় করিতে হইবে। শিবাজীর জন্ম শুক্লপক্ষীয় দ্বিতীয়ায় অথবা পঞ্চমীতে হইয়াছিল? মহ্লার রামরাও চিটনীসের মতানুসারে দ্বিতীয়া জন্মতিথি ধরিলে সে দিন বৃহস্পতিবার পাওয়া যায় না। ধারানগরীর ঐতিহাসিক অনুক্রমণীর মতে আস্থা স্থাপন করিয়া পঞ্চমী গ্রহণ করিলে বারের সহিত বিশেষ অনৈক্য ঘটে না সত্য, কিন্তু উদ্দিষ্ট তিথি দিবাভাগে আদৌ পাওয়া যায় না। কারণ, সোমবারে রাত্রিকালে চতুর্থী ছিল, ইহা পূর্ব্বে দেখা গিয়াছে। সূর্য্যোদয়ব্যাপিনী তিথি গ্রহণ করিলে সে দিন মঙ্গলবার হইয়া পড়ে। তবে রাত্রিকালে জন্ম স্বীকার করিলে, "১৫৪৯ শকাব্দে প্রভব নাম সংবৎসরে, বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষীয়া পঞ্চমী, সোমবার রাত্রিকাল"—এই পর্য্যন্ত এক রকম মিলিয়া যায়।

এখন নক্ষত্রের কথা। শিবদিগ্বিজয়-কার ভিন্ন আর কেহ নক্ষত্রের উল্লেখ

করেন নাই। কিন্তু ঐ বখর রাজকীয় দপ্তরের অনেক কাগজপত্র অবলম্বনে লিখিত বলিয়া, উহার নির্দ্দেশ একেবারে উপেক্ষিত হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, উপরে আমরা শিবাজীর জন্ম সম্বন্ধে যে তিথির নির্ণয় করিয়াছি, তাহা সম্পূর্ণ ভ্রান্তিশূন্য বলিতে পারা যায় না। তৃতীয়তঃ, শিবাজীর এক জন প্রামাণিক জীবনবৃত্ত-লেখক মহ্লার রাওয়ের সহিত শক, সংবৎসর, মাস, পক্ষ, তিথি ও বার বিষয়ে শিবদিগ্বিজয়-কারের সম্পূর্ণ ঐক্য আছে। এই কারণে নক্ষত্র-বিচারে কিরূপ ফললাভ হয়, তাহা একবার দেখা কর্ত্তব্য।

ইতঃপূর্ব্বে যে জ্যোতিগ্রন্থের উল্লেখ করা গিয়াছে, তদনুসারে গণনা করিলে দৃষ্ট হয় যে, ১৫৪৯ শকাব্দের বৈশাখ শুক্লা পঞ্চমী সোমবারে মৃগশিরা নক্ষত্র ছিল। কেবল ১৫৪৯ শকাব্দে কেন, ১৫৪৮ শকাব্দের ঐ তিথিতেও রোহিণী নক্ষত্র পাওয়া যায় না। তবে যদি শেষোক্ত অব্দ সত্য বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে বৈশাখ শুক্লা দ্বিতীয়ার দিনে সোমবার ও মধ্যরাত্রিতে রোহিণী নক্ষত্রেরও সমাবেশ হইয়াছিল, দৃষ্ট হয়। কিন্তু যে বখরলেখক রোহিণী নক্ষত্রের উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি সোমবারের পরিবর্ত্তে বৃহস্পতিবার গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে গোলে ফেলিয়াছেন। ইঁহার কথায় বিশ্বাসস্থাপন করিলে "পঞ্চমী" তিথি পরিত্যাগ করিতে হয়। ১৫৪৮ শকাব্দে বৈশাখ শুক্লা পঞ্চমী বৃহস্পতিবারে পড়িয়াছিল বটে, কিন্তু সে দিন রোহিণী নক্ষত্র ছিল না, এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন রোহিণী নক্ষত্রের উল্লেখকারী "প্রভব নামক সংবৎসর" ও ১৫৪৯ শকাব্দের পক্ষপাতী। এইরূপে যে দিক দিয়াই দেখুন, অব্দ, সংবৎসর, বার, তিথি ও নক্ষত্রের একবাক্যতাসম্পাদন কিছুতেই সম্ভবপর নহে, দেখা যাইতেছে।

তবে কি হিন্দুসাম্রাজ্যসংস্থাপক ছত্রপতি মহাত্মা শিবাজীর জন্মকালনির্ণয়ের কোনও উপায় নাই? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতে হয়, এত ক্ষণ যে সকল প্রমাণের পরীক্ষা করা গেল, সে সকলের সাহায্যে শিবাজীর জন্মকাল নিঃসংশয়িতরূপে নিরূপিত হইতে পারে না। কাজেই প্রমাণান্তরের অনুসন্ধান করিতে হয়।

এই প্রস্তাবের প্রারম্ভে আমরা যে দ্বাদশটি মতের উল্লেখ করিয়াছি, সূক্ষ্মভাবে সেগুলির পর্য্যালোচনা করিলে দৃষ্ট হইবে যে, মহ্লার রামরাও চিটনীস ও শিবদিগ্বিজয়-কার ভিন্ন আর কেহই শিবাজীর জন্মকালের বিস্তারিত ও সুস্পষ্ট

উল্লেখ করিয়াছেন। শিবদিগ্বিজয় গ্রন্থে এ সকলের উপর নক্ষত্রেরও নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এই উভয় গ্রন্থকারের মধ্যে মহ্লার রাও ১৮১০ খৃষ্টাব্দে ও শিবদিগ্বিজয়-কার ১৮১৮ অব্দে বখরের রচনা করিয়াছেন। উভয়েই রাজকীয় দপ্তরের কাগজপত্র পর্য্যবেক্ষণ করিবার সুবিধা পাইয়াছিলেন। শিবদিগ্বিজয় অপেক্ষা মহ্লার রাওয়ের গ্রন্থ অপেক্ষাকৃত প্রাচীন বলিয়া অনেকেই উহার প্রতি সমধিক শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া থাকেন। পক্ষান্তরে, প্রথমোক্ত বখর মহ্লার রাও-য়ের কৃত বখরের ৮ বৎসর পরে রচিত হইলেও, উহাতে শিবাজীর জন্মসম্বন্ধে কয়েকটি অতি প্রাচীন শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, এ কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই শ্লোকগুলিতে নির্দ্দিষ্ট শক-সংবৎসর-মাস-তিথি-বারের সহিত মহ্লার রাওয়ের উক্তির সাধারণভাবে ঐক্য আছে। শিবদিগ্বিজয়-কারও স্বীয় মারাঠী গদ্যোক্তিতে সাধারণভাবে শ্লোকোক্ত সময়েরই উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু গদ্যে যেরূপ সহজে বিকৃতি ঘটে, পদ্যে ছন্দের বন্ধন থাকায় সেরূপ ঘটিবার অধিক সম্ভাবনা থাকে না। এই কারণে মহ্লার রাও ও শিবদিগ্বিজয়-কারের গদ্যোক্তি অপেক্ষা শেষোক্ত লেখকের লিখিত পদ্যোক্তি অপেক্ষাকৃত অধিক বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে করা অসঙ্গত নহে।

এক্ষণে দেখা যাউক, এই শ্লোকগুলির আলোচনা করিয়া কিরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়।

দ্বিতীয় শ্লোকটি প্রথম শ্লোকের নির্দ্দিষ্ট বিষয়ের অনুবাদ। এক ব্যক্তি যে এই উভয় শ্লোকের রচয়িতা, এরূপ হওয়া সম্ভবপর নহে। কারণ, প্রথম শ্লোকেই যখন বক্তার সমস্ত বক্তব্য শেষ হইয়াছে, তখন তিনি যে অকারণে দ্বিতীয় শ্লোকের রচনা করিবেন, ইহা তেমন সঙ্গত বোধ হয় না। সুতরাং দ্বিতীয় শ্লোকটি অপর লেখকের রচিত ও বখর-কারের দ্বারা প্রথম শ্লোকের পরিপোষকস্বরূপ উদ্ধৃত হইয়াছে, এরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে।

প্রথম শ্লোকে শিবাজীর জন্মবর্ষের উল্লেখস্থলে "বেদ-নবাব্ধিকেন্দুশরকে" এই পদ ব্যবহৃত হইয়াছে। বেদ = ৪, নব = ৯, (অব্ধিক) ইন্দু = ১, শর = ৫, অর্থাৎ ১৫ এর পিঠে ৪৯ = ১৫৪৯ শকাব্দে। এই শ্লোকে "অঙ্কানাং বামতো গতিঃ" এই নিয়ম সম্পূর্ণরূপে অনুসৃত হয় নাই। দ্বিতীয় শ্লোকেও এইরূপ। নাগাব্ধি ৪৯ ও শশিকলা ১৫, অর্থাৎ ১৫৪৯ শকাব্দ। তাহার পর প্রভব সংবৎসরের বৈশাখমাস, শুক্লপক্ষ ও বৃহস্পতিবার—উভয় শ্লোকেরই উদ্দিষ্ট বিষয়। এখন

এ সম্বন্ধে প্রথম শ্লোকে আছে, "নক্ষত্রে চ তিথৌ বিধৌ।" শিবদিগ্বিজয়-কার ও দ্বিতীয় শ্লোকের রচয়িতা ইহার অর্থ—"রোহিণী নক্ষত্র ও দ্বিতীয়া তিথি" এইরূপ করিয়াছেন। এই শ্লোকের একটি মহারাষ্ট্রীয় অনুবাদমূলক শ্লোক আছে, এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সে অনুবাদেও এই অর্থ ই সমর্থিত হইয়াছে। বিধি শব্দের সপ্তমীর একবচনে "বিধৌ" পদ সিদ্ধ হয়। বিধি অর্থে প্রজাপতি, তিনি দ্বিতীয়া ও রোহিণীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বলিয়া প্রসিদ্ধ। সুতরাং "নক্ষত্রে চ তিথৌ বিধৌ" অর্থে দ্বিতীয়া তিথি ও রোহিণী নক্ষত্র।

প্রথম শ্লোকের পূর্ব্বোক্ত প্রকার অর্থ গ্রহণ করিলে শিবাজীর জন্মকাল "১৫৪৯ শকাব্দ, প্রভব সংবৎসর, বৈশাখ মাস, শুক্ল পক্ষ, দ্বিতীয়া, বৃহস্পতিবার, রোহিণী নক্ষত্র" এইরূপ উপলব্ধ হয়। শিবদিগ্বিজয়-কার এই কালেরই উল্লেখ করিয়াছেন। মহ্লার রামরাও নক্ষত্র বাদ দিয়া এই বার-তিথিই উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু এই মতে যে ভ্রান্তি পরিলক্ষিত হয়, তাহা আমরা ইতঃপূর্ব্বেই ক ও ঙ চিহ্নিত আপত্তিতে প্রদর্শন করিয়াছি। সেই প্রসঙ্গে এই শ্লোকের যে অন্যবিধ অর্থ হয়, তাহাও বলিয়াছি। এক্ষণে সেই অপর-বিধ অর্থের আলোচনা করা যাইতেছে।

জ্যোতির্গণনার সহিত ঐক্য রাখিয়া অর্থ করিতে হইলে সমালোচ্য শ্লোকের "নক্ষত্রে চ তিথৌ বিধৌ" এই বাক্যের যেরূপ অর্থ করিতে হয়, স্বনামধন্য পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বালগঙ্গাধর তিলক মহোদয় তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি বলেন, এখানে "বিধি" শব্দের সপ্তমী গ্রহণ না করিয়া "বিধু" শব্দের সপ্তমীর একবচনে "বিধৌ" পদ সিদ্ধ হইয়াছে স্বীকার করিলেই এ সমস্যার সুমীমাংসা হয়। তিলক মহোদয়ের সূচিত অর্থ অনুসারে শিবাজীর জন্মদিনের প্রতিপৎ তিথি ও অশ্বিনী নক্ষত্র পাওয়া যায়। কারণ বিধু = চন্দ্র = ১। "নক্ষত্রে চ তিথৌ বিধৌ" প্রথম নক্ষত্র ও প্রথম তিথি।

এখন পূর্ব্বোক্ত "হিন্দু-পঞ্চাঙ্গ" অনুসারে গণনা করিলে দৃষ্ট হইবে যে, ১৫৪৯ শকাব্দের বৈশাখী শুক্লা প্রতিপদ দিনে অশ্বিনী নক্ষত্র ও শুক্রবার ছিল। কিন্তু প্রতিপৎ তিথি সূর্য্যোদয়ের একাদশদণ্ড পূর্ব্বে বা বৃহস্পতিবার ৪৮ দণ্ড ৫০ পল পরে লাগিয়াছিল। অর্থাৎ, বৃহস্পতিবারের রজনীর শেষ-ভাগে প্রতিপৎ তিথি ছিল। রাত্রিশেষে শিবাজীর জন্ম হইয়াছিল, এ কথা স্বীকার করিতে যদি কোনও আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে তাঁহার জন্ম—

প্রতিপৎ, বৃহস্পতিবার, রজনীর শেষ যামে অশ্বিনী নক্ষত্রে” (১৬২৭ খৃষ্টাব্দের ৬ই এপ্রিল শুক্রবার হইয়াছিল, সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে।

“নক্ষত্রে চ তিথৌ বিধৌ” এই শ্লোকাংশের শ্রীযুক্ত তিলক কর্ত্তৃক সূচিত অর্থ গণিতজ্ঞ ব্যক্তি ভিন্ন অপর কাহারও মস্তিষ্কে প্রতিভাত হইবার সম্ভাবনা নাই। শিবাজীর মৃত্যুর ১৩০ বৎসর পরে আবির্ভূত ও গণিত বিদ্যায় অনভিজ্ঞ বখরলেথক মহলার রাম রাও ও শিবদিগ্বিজয়-কার, বা দ্বিতীয় শ্লোকের রচয়িতা যে উহার উদ্দিষ্ট অর্থ গ্রহণ করিতে পারিবেন, ইহা সম্ভবপর নহে। কাজেই তাঁহারা “বিধৌ” পদকে “বিধি” শব্দের সপ্তমী বুঝিয়া বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন। (১)

শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর।

সহযোগী সাহিত্য।

মাইকেলেটের পরিণয়।

Revue de Paris (রিভিউ ডি প্যারিস) নামক পত্রে মিঃ হেলভি সুবিখ্যাত ফরাসী ঐতিহাসিক (Michelet) মাইকেলেটের কাব্যবৈচিত্র্যময় পরিণয় সম্বন্ধে একটি চিত্তাকর্ষক ও আন্তরিকতাপূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। মাইকেলেটের মৃত্যুর পর তাঁহার পত্নী প্রায় ত্রিশ বৎসর কাল জীবিত ছিলেন। অন্তিমকাল পর্য্যন্ত তাঁহার চরিত্রে কাব্য-কাহিনীর নায়িকা-সুলভ ভাব বিদ্যমান ছিল। বৈধব্যদশায় অতীত কালের চিন্তাই তাঁহার জীবনের অবলম্বনস্বরূপ হইয়াছিল। তিনি উদীয়মান যুবকগণের হৃদয়ে সর্ব্বপ্রযত্নে স্বামীর স্মৃতি জাগরূক রাখিয়াছিলেন।

---

(১) ইংরাজী পদ্ধতি অনুসারে রাত্রি ১২টার পর হইতে বার ও তারিখের গণনা হইয়া থাকে। সুতরাং হিন্দুমতে যাহা বৃহস্পতিবারের শেষ যামিনী, পশ্চাত্যমতে তাহা শুক্রবারের প্রাতঃকাল।

পরিণয়কালে মাইকেলেটের বয়ঃক্রম পঞ্চাশৎ বর্ষ ছিল। লোকান্তরিতা প্রথমা পত্নীর গর্ভজাতা কন্যার একটি সন্তান হওয়াতে তিনি এই সময়ে মাতামহ আখ্যাও লাভ করিয়াছিলেন। তরুণবয়সে তিনি প্রথম পরিণয়পাশে আবদ্ধ হন। এই বিবাহ তাঁহার ভাগ্যে সুখাবহ হয় নাই। কন্যাটিও অল্প বয়সে বিবাহিতা হইয়া পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়াছিল। উত্তরকালে যখন তিনি "পুরোহিত ও পরিবার" রচনা করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন, তৎকালে তাঁহার এই কন্যার সহিত কোনও সংস্রব ছিল না। তিনি একাকী সুখহীন ভবনে কালযাপন করিতেন। যখন যে গবর্মেণ্ট দেশমধ্যে ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিত, তখন সেই গবর্মেণ্ট তাঁহার প্রতি সমুচিত সম্মান প্রদর্শন করিত। জনসমাজেও তিনি শ্রেষ্ঠ ফরাসী ঐতিহাসিক বলিয়া সমাদর প্রাপ্ত হইতেন। তাঁহার হৃদয়ে নারীচরিত্র বিষয়ে সম্যক্ অভিজ্ঞতা-লাভের স্পৃহা বলবতী থাকিলেও তৎকালে তিনি ললনাগণের পরিচয়গ্রহণের সুযোগ প্রাপ্ত হন নাই।

তাঁহার "পুরোহিত ও পরিবার" নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হইবার অল্পকাল পরে অষ্ট্রীয় ডাক-বিভাগের মুদ্রাযুক্ত একখানি পত্র তাঁহার হস্তগত হয়। " পুরোহিত ও পরিবার " পুস্তকের এক নবীনা ও উৎসাহশীলা পাঠিকা তাঁহাকে ঐ পত্র লিখিয়াছিলেন। পত্রের এক স্থানে লিখিত ছিল,—"পুরোহিত-সম্প্রদায়ের প্রতি আমার যে বিশ্বাস ছিল, আপনার গ্রন্থপাঠে তাহা বিনষ্ট হইয়াছে। আমি পিতৃহীনা বালিকা, সর্ব্বদা এক জন উপদেষ্টার অভাব বড়ই অনুভব করিতেছি; আপনি কি আমার এই অভাব পূর্ণ করিবেন?"

মেরি ডি মিলারেট (Marie de Millaret) এই বিচিত্র পত্রের লেখিকা। ফরাসী পিতার ঔরসে ও ইংরাজ জননীর গর্ভে তাঁহার জন্ম হয়। শৈশবে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হওয়ায় তিনি বালিকাবয়সে পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য করিবার জন্য অষ্ট্রিয়ায় গমন করেন। অষ্ট্রিয়ায় অবস্থানকালে ঘটনাক্রমে মাইকেলেটের গ্রন্থাবলী তাঁহার হস্তগত হয়। অধ্যয়নফলে পুস্তকসমূহের ভাব-নিচয় তাঁহার হৃদয়ে এরূপ বদ্ধমূল হইয়া পড়ে যে, তিনি উক্ত প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারের সহিত পত্র-ব্যবহারের সংকল্প করেন। পত্রের উত্তর লাভ করিয়া মিলারেট কিরূপ আহ্লাদিত হইয়াছিলেন, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে

তাঁহাকে বাইবেল, গস্পেল, দান্তে, সেক্সপিয়র ও সারভ্যান্টিস্ প্রণীত পুস্তকাবলী পাঠ করিতে পরামর্শ প্রদান করিয়াছিলেন।

কয়েক মাস উভয়ের মধ্যে সময়ে সময়ে এইরূপ পত্র-ব্যবহার চলিবার পর প্রৌঢ় অধ্যাপক বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার হৃদয় এই অজ্ঞাতকুলশীলা ও অভিনব শিষ্যার প্রতি ক্রমে ক্রমে অধিকতর আকৃষ্ট হইতেছে। তদবধি তিনি নিজ মানসিক অবস্থার বিবরণ নিয়মিতরূপে স্বকীয় দৈনিকলিপিতে লিখিয়া রাখিতে লাগিলেন। বহুকাল পরে এই দৈনিকলিপি তাঁহার পত্নী সাধারণ্যে প্রকাশ করিয়াছিলেন।

১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই নবেম্বর প্রাতঃকালে তিনি নিরূপিত রচনাকার্য্য সম্পন্ন করিয়া বসিয়া আছেন, এমন সময়ে ভৃত্য আসিয়া তাঁহার হস্তে মিলারেটের নামাঙ্কিত একখানি কার্ড অর্পণ করিয়া কহিল, একটি যুবতী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। অন্যান্য লেখকদিগের ন্যায় তিনিও প্রাতঃকালে কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিতেন না। এ বিষয়ে তাঁহার অতিশয় দৃঢ়তা ছিল; সুতরাং ভৃত্যেরা মিলারেটকেও প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল। শুনিবামাত্র দারুণ নৈরাশ্যে মাইকেলেটের হৃদয় আচ্ছন্ন হইল। যাহা হউক, দর্শনপ্রার্থিনী প্রতিগমনকালে বলিয়া গিয়াছিলেন, "আমি অপরাহ্ন ৪ ঘটিকার সময় আবার আসিব।" ইহাতেই তিনি আশ্বস্ত হইলেন। বলা বাহুল্য, মিলারেটের দ্বিতীয়বার আগমন নিষ্ফল হয় নাই। তাঁহার অজ্ঞাতপূর্ব্ব উপদেষ্টা সাগ্রহে তদীয় আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। মাইকেলেট নিজের ডায়েরীতে লিখিয়া গিয়াছেন যে, এই সাক্ষাৎকারকালে মিলারেট নিবিড়কৃষ্ণ পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া আসিয়াছিলেন। কেবল তাঁহার টুপিতে একটি রক্তগোলাপ শোভা পাইতেছিল।

প্রথম দর্শনেই যে এই কবি-ঐতিহাসিক মিলারেটের প্রেমপাশে বদ্ধ হইয়াছিলেন, এ কথা বলা যাইতে পারে না। ভাবিপত্নীর দর্শনলাভের বহু পূর্ব্ব হইতেই যে তিনি তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হইয়াছিলেন, তাহা স্পষ্টই প্রতীত হয়। কিন্তু এক্ষণে মিলারেটের দর্শনলাভে তাঁহার অনুরাগ আরও বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। এই প্রথম দর্শনের পরবর্ত্তী সময়ের বৃত্তান্ত মানবহৃদয়ের রহস্য-বৈচিত্র্যে পরম চিত্তাকর্ষক। তৎকালে এই গম্ভীরমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠাবান লোক-শিক্ষকও নিতান্ত তরুণবয়স্ক যুবকের ন্যায় আচরণ করিয়াছিলেন।

দিবাভাগে গমনপূর্ব্বক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে তিনি সাহসী হইতেন না। রাত্রিকালে তিনি হোটেলের সম্মুখবর্ত্তী পথে পাদচারণ করিতেন। অবশেষে তিনি স্বপ্রণীত "ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস" নামক নবপ্রকাশিত গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড প্রেমোপহারস্বরূপ প্রেরণ করিবার সংকল্প করিলেন। মেরীও লেখকের উদ্দেশ্য সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিয়া তৎপ্রেরিত উপহার গ্রহণ করিলেন। মিলারেট স্বদেশে সমাগত হইয়াছেন শুনিয়া এই সময়ে তাঁহার আত্মীয়বর্গ তাঁহাকে স্বগৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইবার জন্য নির্ব্বন্ধাতিশয়সহকারে অনুরোধ করিতেছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁহাদিগকে সংবাদ দিলেন যে, তিনি আত্মীয় স্বজনের সংস্রব পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্যারিসে অবস্থিতি করিবেন; প্রয়োজন হইলে তিনি মাইকেলেটের ছাত্রীত্ব ও দুহিতৃত্ব পর্য্যন্ত স্বীকার করিতেও প্রস্তুত। প্রথম সাক্ষাৎকারের তিন সপ্তাহ পরে টুইলিরাইস্ উপবনে পরিভ্রমণকালে মাইকেলেট ও কুমারী মিলারেট পরস্পর পরিণয়পাশে আবদ্ধ হইতে প্রতিশ্রুত হইলেন। এই সময়ে মাইকেলেটের কন্যা ও বন্ধুবর্গের জন্য তাঁহাদিগের প্রেমপ্রবাহ প্রতি পদে প্রতিহত হইয়াছিল। তিনি কোন ভাগ্যান্বেষিণী রমণীর কুহকজালে পতিত হইতেছেন মনে করিয়া, তদীয় বন্ধুবর্গ তাঁহাকে এই বিবাহ ব্যাপার হইতে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। এই সময়ে তিনি "কলেজ-ডি ফ্রান্স" নামক বিদ্যামন্দিরে " Art of love " বা "প্রেমকলা" বিষয়ে কতিপয় হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সেই সময়ে নবীনা শিষ্যার চিন্তাই তাঁহার চিত্তে উদ্দীপনার সঞ্চার করিয়াছিল। শুনা যায়, তাঁহার প্রণয়িণীও নাকি বক্তৃতাস্থলে উপস্থিত থাকিতেন। এই প্রসিদ্ধ বক্তৃতানিচয় উত্তরকালে " L' Amour " নামে প্রকাশিত হইয়াছিল।

এই ঘটনার চারি মাস পরে একটি রেজেষ্ট্রী আফিসে ইঁহাদিগের উদ্বাহক্রিয়া সম্পাদিত হয়। সর্ব্বজনপূজিত প্রবীণ কবি বিরাঞ্জার এই বিবাহে কন্যা সম্প্রদান করিয়াছিলেন। ভারসেলস্ নগরে তাঁহাদিগের স্বল্পকালস্থায়ী "Honeymoon" বা মধুযামিনী অতিবাহিত হয়। অতঃপর তাঁহারা সরল সহানুভূতিস্নিগ্ধ সুখময় অথচ কর্ম্মকঠোর জীবনযাত্রা আরম্ভ করেন। দাম্পত্য জীবনে একমাত্র মহাদুঃখ মাইকেলেটের হৃদয় অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়াছিল। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে তাঁহার তরুণী ভার্য্যা একটি পুত্র প্রসব করেন। জন্মগ্রহণের অত্যল্পকাল পরেই শিশুটির মৃত্যু হয়। তিনি নানা বিষয়ে পত্নীর

প্রকাশ করিতেন। পরবর্ত্তী গ্রন্থসমূহের অনেক স্থলেই তিনি পত্নীর উল্লেখ করিয়াছেন। জীবনের শেষ সপ্তদশ বৎসর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ফরাসী ঐতিহাসিক এই রমণীর সুগভীর পতিপ্রেমে জীবনের সকল উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারিয়াছিলেন।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

ভারতী। আশ্বিন। "পথিক" ফরাসী কবি কপের রচিত 'এক অঙ্কে সমাপ্ত পদ্য নাটিকার' পদ্যানুবাদ। অনুবাদক শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। জ্যোতি বাবু কিছু দিন পূর্ব্বে অনেকগুলি সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যের অনুবাদ করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। কলমের কালী শুখাইবার পূর্ব্বেই আবার ফরাসী সাহিত্য হইতে রত্নসংগ্রহ করিয়া মাতৃভাষার চরণে ঢালি দিতেছেন। তাঁহার অধ্যবসায় প্রশংসনীয়, সাহিত্যশ্রম বিস্ময়াবহ,—আমাদের আদর্শ হইবার যোগ্য। "পথিকে"র প্রশান্ত সৌন্দর্য্য সম্পূর্ণ মৌলিক। নায়ক মলয়কুমার স্বভাবকবি, প্রকৃতির প্রিয়পুত্র ;—সৌন্দর্য্য ও সঙ্গীত তাঁহার সর্ব্বস্ব। মলয় সরল, উদার, অনাবিল, অপাপবিদ্ধ। সে খেয়ালী, অথচ উদাসীন ; মুক্ত বায়ুর ন্যায় কামচারী, সদানন্দ ;—কবি, ভাবুক ও প্রেমিকের অপরূপ সংমিশ্রণ। যৌবনের স্বপ্ন, নিসর্গের সুষমা ও দেবদুর্ল্লভ সরলতা ছানিয়া ফরাসী কবি এই স্বপ্নময় মোহময় সুকুমার চরিত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন। অতিক্ষুদ্র চিত্রপটে, অতি সুকোমল বর্ণরাগে, ইন্দ্রজালময়ী তুলিকার দুই চারিটি টানে, যে কবি এমন ছবি উদ্ভাসিত করিয়াছেন, তাঁহার প্রতিভা সামান্য নহে। অনুবাদের বিচার করিবার আমাদের অধিকার নাই। কিন্তু এ কথা বলিতে পারি, অনুবাদে ভাষার প্রবাহ সর্ব্বত্র সমান নহে। অবশ্য, ভাষান্তরে 'আসলে'র 'আদল' ভিন্ন প্রকৃত 'প্রতিরূপে'র আশা করা যায় না ; কিন্তু 'নকলটি'কে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর দেখিবার আশাও ত অসঙ্গত নহে। অনুবাদের ভাষা প্রাণহীন হইলে রসভঙ্গ অনিবার্য্য, তাহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অনুবাদের ভাষা কোথাও শিথিল, কোথাও নিঃস্পন্দ, কোথাও প্রাণহীন না হইলে, পথিককে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বলিতে পারিতাম। জ্যোতিবাবু যাহা দিয়াছেন, তাহাই যথেষ্ট। কিন্তু আমরা তাঁহার নিকট আরও আশা করি। "নেটিভ পীড়ন" কাহার, বলিতে পারি না। 'নেটিভ-পীড়নে'র বিবিধ দৃষ্টান্ত লিপিবদ্ধ করিয়া উপসংহারে লেখক বলিতেছেন,—"কর্ণ-পীড়ন, অর্দ্ধচন্দ্র, আর্থিক ক্ষতি, সকল অপমান ও অসুবিধা অসীম ধৈর্য্যের সহিত সহ্য করিয়া অবশেষে ইঁহারা এই কথা সংবাদপত্রে ঘোষণাপূর্ব্বক নিজের কাপুরুষতা, নিজের অপদার্থতা দেশের সর্ব্বসাধারণের সম্মুখে মুক্তকণ্ঠে প্রচারিত করিতে একটুও লজ্জিত হইলেন না!"—এত দিন লেখকের 'ইঁহারা' 'সংবাদপত্রে' এইরূপ তত্ত্বের ও এইরূপ বীররসের 'ঘোষণা' করিতেন, এবং সেই সকল সংবাদপত্র দুই এক দিন সাধারণের

হাতে ঘুরিয়া ফিরিয়া অবশেষে কশাইটোলার জুতার দোকানে অথবা তৎসদৃশ অন্য কোনও স্থানে চিরনির্ব্বাণ লাভ করিত। কিন্তু লেখকের "নেটিভ-পীড়ন" যে 'ভারতী'র ললাটে 'উল্কি'র ন্যায় চিরস্থায়ী হইয়া রহিল! তাহার কি? পক্ষান্তরে, 'যার শীল, যার নোড়া, তার ভাঙ্গি দাঁতের গোড়া' এই প্রবাদবচনের অনুসরণ করিয়া যদি কেহ লেখকের তিরস্কার-নোড়া কাড়িয়া লইয়া তাঁহারই বীরত্ব-দাঁতের গোড়া ভাঙ্গিতে যায়, অর্থাৎ লেখকের ভাষাতেই বলে,—"অন্যদেশে রমণীর পক্ষেও যাহা ঘৃণিত, এ দেশের পুরুষেরা প্রাণের ভয়ে, বিপদের আশঙ্কায় অনায়াসে তাহা সমর্থন করিয়া যায়, তাহার পর ছাপার অক্ষরে সেই কলঙ্ককে মূর্ত্তিমান করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করে। ধিক্!"—অধিকন্তু তাহাদের চিন্তায়, বাক্যে ও ব্যবহারে বিন্দুমাত্র সামঞ্জস্য নাই, সুতরাং আবার লেখকের ভাষায় "ধিক্!"—তাহা হইলে আশা করি লেখক বক্তার 'কণ্ঠী ছিঁড়িবেন না!' শ্রীযুক্ত পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় "শান্ত হিন্দু" প্রবন্ধে হিন্দু জাতির অধোগতির কারণনির্দ্দেশ করিয়াছেন। নমুনা,—(১) হিন্দুর ধর্ম্মবিশ্বাস নাই। (২) হিন্দু দেবতাদিগকে অতি ক্ষুদ্র ও অতিসঙ্কীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে। (৩) সমাজবন্ধনের ফলেই আমাদের [হিন্দুদের] ধর্ম্ম নষ্ট হইয়াছে। (৪) ধর্ম্মবিশ্বাসের ন্যায় হিন্দু আপন শক্তিতে বিশ্বাসও হারাইয়াছে। (৫) গৌরী-দানের ফলে অধিকাংশ হিন্দুর জন্ম অপক্ক বীজে; তাই তাহারা চিরকালই অপক্কদেহই থাকে। (৬) আহারের ব্যবস্থা এই যে, যাহাতে শোণিতের এতটুকু উষ্ণতা সম্পাদিত হয়, তাহাই হিন্দুর অখাদ্য। (৭) হিন্দু সমাজের আর এক কঠিন নিগড় জাতিভেদ। ভীমরুলের চাকে যেমন শত শত হুল, পরেশ বাবুর প্রবন্ধেও সেইরূপ ইত্যাদি বিবিধ সিদ্ধান্ত নিতান্ত ক্রোধভরে অনবরত বোঁ বোঁ করিতেছে, কাহার সাধ্য অগ্রসর হয়! পরেশ বাবুর যুক্তিসমুদ্রে ডুব দিয়া অনেক 'নাকানি চোবানি' ও 'হাবুডুবু' খাইয়া আমরা সাতটি তত্ত্ব-মুক্তা পাইয়াছি বটে, কিন্তু গাঁথিয়া দেখিতেছি, এমন সুন্দর মুক্তার মালা কোনও 'শান্ত হিন্দু'র গলায় মানাইবে না। সুতরাং এই দুর্দ্দান্ত প্রবন্ধের লেখককেই আমরা ভেট দিতেছি। দেখিতেছি, পরেশবাবুর মতে, হিন্দু যদি 'হিন্দু' থাকে, তাহা হইলে আর রক্ষা নাই! হিন্দুসমাজের সব পরেশবাবুর দুটি চক্ষুর বিষ! তাঁহার সমস্ত সিদ্ধান্তই একরূপ স্বতঃসিদ্ধ, তাঁহার বিচার এক-তরফা ও প্রমাণশূন্য; সুতরাং তাহাদের আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। প্রবন্ধের অনেক স্থলে কটূক্তি বিদ্যমান, তাহাতে লেখকের বা 'ভারতীর' গৌরব বর্দ্ধিত হয় নাই। হায়! বিধাতা পরেশবাবুকে লক্ষ্মীছাড়া 'শান্ত হিন্দু'র পালে ছাড়িয়া দিলেন কেন? যদি দিলেন, তবে তাঁহার এই স্বজাতির উপর অরুচিটুকু স্বর্গেই রাখিয়া দিলেন না কেন? এই অরুচি দিয়া তিনি অনায়াসে অতি [illegible] হিন্দুদ্বেষী গোঁড়া মিশনরী গড়িতে পারিতেন। আমরা বিদ্যাসাগরের ভাষায় [illegible],—"হা পরেশবাবু-গণ! তোমরা কি পাপে ভারতবর্ষে আসিয়া জন্মগ্রহণ কর, ব[illegible] না!" শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহের উৎকল-চিত্র এবার "ঋণ-পরিশোধে" সমাপ্ত হইল; কিন্তু আমরা ঋণী রহিলাম। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "ইতালীর নবজীবনে" জীবনচিহ্ন দেখিতে পাই না কেন? "বহু অমানুষ মধ্যে পুরুষোত্তম পূর্ণচন্দ্র ঘোষ" একটি অপরূপ রচনা। তিলকে কেমন করিয়া তাল করিতে হয়, তাহার উজ্জ্বল

হাতে ঘুরিয়া ফিরিয়া অবশেষে কশাইটোলার জুতার দোকানে অথবা তৎসদৃশ অন্য কোনও স্থানে চিরনির্ব্বাণ লাভ করিত। কিন্তু লেখকের "নেটিভ-পীড়ন" যে 'ভারতী'র ললাটে 'উল্কি'র ন্যায় চিরস্থায়ী হইয়া রহিল! তাহার কি? পক্ষান্তরে, 'যার শীল, যার নোড়া, তার ভাঙ্গি দাঁতের গোড়া' এই প্রবাদবচনের অনুসরণ করিয়া যদি কেহ লেখকের তিরস্কার-নোড়া কাড়িয়া লইয়া তাঁহারই বীরত্ব-দাঁতের গোড়া ভাঙ্গিতে যায়, অর্থাৎ লেখকের ভাষাতেই বলে,—"অন্যদেশে রমণীর পক্ষেও যাহা ঘৃণিত, এ দেশের পুরুষেরা প্রাণের ভয়ে, বিপদের আশঙ্কায় অনায়াসে তাহা সমর্থন করিয়া যায়, তাহার পর ছাপার অক্ষরে সেই কলঙ্ককে মূর্ত্তিমান করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করে। ধিক্!"—অধিকন্তু তাহাদের চিন্তায়, বাক্যে ও ব্যবহারে বিন্দুমাত্র সামঞ্জস্য নাই, সুতরাং আবার লেখকের ভাষায় "ধিক্!"—তাহা হইলে আশা করি লেখক বক্তার 'কণ্ঠী ছিঁড়িবেন না!' শ্রীযুক্ত পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় "শান্ত হিন্দু" প্রবন্ধে হিন্দু জাতির অধোগতির কারণনির্দ্দেশ করিয়াছেন। নমুনা,—(১) হিন্দুর ধর্ম্মবিশ্বাস নাই। (২) হিন্দু দেবতাদিগকে অতি ক্ষুদ্র ও অতিসঙ্কীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে। (৩) সমাজবন্ধনের ফলেই আমাদের [হিন্দুদের] ধর্ম্ম নষ্ট হইয়াছে। (৪) ধর্ম্মবিশ্বাসের ন্যায় হিন্দু আপন শক্তিতে বিশ্বাসও হারাইয়াছে। (৫) গৌরী-দানের ফলে অধিকাংশ হিন্দুর জন্ম অপক্ক বীজে; তাই তাহারা চিরকালই অপক্কদেহই থাকে। (৬) আহারের ব্যবস্থা এই যে, যাহাতে শোণিতের এতটুকু উষ্ণতা সম্পাদিত হয়, তাহাই হিন্দুর অখাদ্য। (৭) হিন্দু সমাজের আর এক কঠিন নিগড় জাতিভেদ। ভীমরুলের চাকে যেমন শত শত হুল, পরেশ বাবুর প্রবন্ধেও সেইরূপ ইত্যাদি বিবিধ সিদ্ধান্ত নিতান্ত ক্রোধভরে অনবরত বোঁ বোঁ করিতেছে, কাহার সাধ্য অগ্রসর হয়! পরেশ বাবুর যুক্তিসমুদ্রে ডুব দিয়া অনেক 'নাকানি চোবানি' ও 'হাবুডুবু' খাইয়া আমরা সাতটি তত্ত্ব-মুক্তা পাইয়াছি বটে, কিন্তু গাঁথিয়া দেখিতেছি, এমন সুন্দর মুক্তার মালা কোনও 'শান্ত হিন্দু'র গলায় মানাইবে না। সুতরাং এই দুর্দ্দান্ত প্রবন্ধের লেখককেই আমরা ভেট দিতেছি। দেখিতেছি, পরেশবাবুর মতে, হিন্দু যদি 'হিন্দু' থাকে, তাহা হইলে আর রক্ষা নাই! হিন্দুসমাজের সব পরেশবাবুর দুটি চক্ষুর বিষ! তাঁহার সমস্ত সিদ্ধান্তই একরূপ স্বতঃসিদ্ধ, তাঁহার বিচার এক-তরফা ও প্রমাণশূন্য; সুতরাং তাহাদের আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। প্রবন্ধের অনেক স্থলে কটূক্তি বিদ্যমান, তাহাতে লেখকের বা 'ভারতীর' গৌরব বর্দ্ধিত হয় নাই। হায়! বিধাতা পরেশবাবুকে লক্ষ্মীছাড়া 'শান্ত হিন্দু'র পালে ছাড়িয়া দিলেন কেন? যদি দিলেন, তবে তাঁহার এই স্বজাতির উপর অরুচিটুকু স্বর্গেই রাখিয়া দিলেন না কেন? এই অরুচি দিয়া তিনি অনায়াসে আট দশটা হিন্দুদ্বেষী গোঁড়া মিশনরী গড়িতে পারিতেন। আমরা বিদ্যাসাগরের ভাষায় বলি,—"হা পরেশবাবু-গণ! তোমরা কি পাপে ভারতবর্ষে আসিয়া জন্মগ্রহণ কর, বলিতে পারি না!" শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহের উৎকল-চিত্র এবার "ঋণ-পরিশোধে" সমাপ্ত হইল। কিন্তু আমরা ঋণী রহিলাম। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "ইতালীর নবজীবনে" জীবনচিহ্ন দেখিতে পাই না কেন? "বহু অমানুষ মধ্যে পুরুষোত্তম পূর্ণচন্দ্র ঘোষ" একটি অপরূপ রচনা। তিলকে কেমন করিয়া তাল করিতে হয়, তাহার উজ্জ্বল

হাতে ঘুরিয়া ফিরিয়া অবশেষে কশাইটোলার জুতার দোকানে অথবা তৎসদৃশ অন্য কোনও স্থানে চিরনির্ব্বাণ লাভ করিত। কিন্তু লেখকের "নেটিভ-পীড়ন" যে 'ভারতী'র ললাটে 'উল্কি'র ন্যায় চিরস্থায়ী হইয়া রহিল! তাহার কি? পক্ষান্তরে, 'যার শীল, যার নোড়া, তার ভাঙ্গি দাঁতের গোড়া' এই প্রবাদবচনের অনুসরণ করিয়া যদি কেহ লেখকের তিরস্কার-নোড়া কাড়িয়া লইয়া তাঁহারই বীরত্ব-দাঁতের গোড়া ভাঙ্গিতে যায়, অর্থাৎ লেখকের ভাষাতেই বলে,—"অন্যদেশে রমণীর পক্ষেও যাহা ঘৃণিত, এ দেশের পুরুষেরা প্রাণের ভয়ে, বিপদের আশঙ্কায় অনায়াসে তাহা সমর্থন করিয়া যায়, তাহার পর ছাপার অক্ষরে সেই কলঙ্ককে মূর্ত্তিমান করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করে। ধিক্!"—অধিকন্তু তাহাদের চিন্তায়, বাক্যে ও ব্যবহারে বিন্দুমাত্র সামঞ্জস্য নাই, সুতরাং আবার লেখকের ভাষায় "ধিক্!"—তাহা হইলে আশা করি লেখক বক্তার 'কণ্ঠী ছিঁড়িবেন না।' শ্রীযুক্ত পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় "শান্ত হিন্দু" প্রবন্ধে হিন্দু জাতির অধোগতির কারণনির্দ্দেশ করিয়াছেন। নমুনা,—(১) হিন্দুর ধর্ম্মবিশ্বাস নাই। (২) হিন্দু দেবতাদিগকে অতি ক্ষুদ্র ও অতিসঙ্কীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে। (৩) সমাজবন্ধনের ফলেই আমাদের [হিন্দুদের] ধর্ম্ম নষ্ট হইয়াছে। (৪) ধর্ম্মবিশ্বাসের ন্যায় হিন্দু আপন শক্তিতে বিশ্বাসও হারাইয়াছে। (৫) গৌরী-দানের ফলে অধিকাংশ হিন্দুর জন্ম অপক্ক বীজে; তাই তাহারা চিরকালই অপক্কদেহই থাকে। (৬) আহারের ব্যবস্থা এই যে, যাহাতে শোণিতের এতটুকু উষ্ণতা সম্পাদিত হয়, তাহাই হিন্দুর অখাদ্য। (৭) হিন্দু সমাজের আর এক কঠিন নিগড় জাতিভেদ। ভীমরুলের চাকে যেমন শত শত হুল, পরেশ বাবুর প্রবন্ধেও সেইরূপ ইত্যাদি বিবিধ সিদ্ধান্ত নিতান্ত ক্রোধভরে অনবরত বোঁ বোঁ করিতেছে, কাহার সাধ্য অগ্রসর হয়! পরেশ বাবুর যুক্তিসমুদ্রে ডুব দিয়া অনেক 'নাকানি চোবানি' ও 'হাবুডুবু' খাইয়া আমরা সাতটি তত্ত্ব-মুক্তা পাইয়াছি বটে, কিন্তু গাঁথিয়া দেখিতেছি, এমন সুন্দর মুক্তার মালা কোনও 'শান্ত হিন্দু'র গলায় মানাইবে না। সুতরাং এই দুর্দ্দান্ত প্রবন্ধের লেখককেই আমরা ভেট দিতেছি। দেখিতেছি, পরেশবাবুর মতে, হিন্দু যদি 'হিন্দু' থাকে, তাহা হইলে আর রক্ষা নাই! হিন্দুসমাজের সব পরেশবাবুর দুটি চক্ষুর বিষ! তাঁহার সমস্ত সিদ্ধান্তই একরূপ স্বতঃসিদ্ধ, তাঁহার বিচার এক-তরফা ও প্রমাণশূন্য; সুতরাং তাহাদের আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। প্রবন্ধের অনেক স্থলে কটূক্তি বিদ্যমান, তাহাতে লেখকের বা 'ভারতীর' গৌরব বর্দ্ধিত হয় নাই। হায়! বিধাতা পরেশবাবুকে লক্ষ্মীছাড়া 'শান্ত হিন্দু'র পালে ছাড়িয়া দিলেন কেন? যদি দিলেন, তবে তাঁহার এই স্বজাতির উপর অরুচিটুকু স্বর্গেই রাখিয়া দিলেন না কেন? এই অরুচি দিয়া তিনি অনায়াসে আট দশটা হিন্দুদ্বেষী গোঁড়া মিশনরী গড়িতে পারিতেন। আমরা বিদ্যাসাগরের ভাষায় বলি,—"হা পরেশবাবু-গণ! তোমরা কি পাপে ভারতবর্ষে আসিয়া জন্মগ্রহণ কর, বলিতে পারি না!" শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহের উৎকল-চিত্র এবার "ঋণ-পরিশোধে" সমাপ্ত হইল। কিন্তু আমরা ঋণী রহিলাম। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "ইতালীর নবজীবনে" জীবনচিহ্ন দেখিতে পাই না কেন? "বহু অমানুষ মধ্যে পুরুষোত্তম পূর্ণচন্দ্র ঘোষ" একটি অপরূপ রচনা। তিলকে কেমন করিয়া তাল করিতে হয়, তাহার উজ্জ্বল

দৃষ্টান্ত! 'বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বীচি' ইহার কাছে হার মানে! 'চা'র পেয়ালায় যিনি এমন তুমুল-তরঙ্গ তুলিতে পারেন, তিনি ধন্য! হার্ব্বার্ট স্পেন্সারের নবপ্রকাশিত Facts and Comments গ্রন্থের Exaggerations and Mis-statements নামক সন্দর্ভটি পুরুষোত্তম-প্রণেতাকে পাঠ করিতে বলি। এত অতি-রঞ্জনে ও অত্যুক্তির পর্ব্বতপ্রমাণ জঞ্জালে আসল উদ্দেশ্য চাপা পড়িয়া যায়, ভাবের আবেগে ও আতিশয্যে লেখক তাহা বিস্মৃত হইয়া অনর্থক লোক হাসাইয়াছেন। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচীর "শরতের আবাহন" একটি 'কাব্যি' শ্রেণীর কবিতা। 'স্যাভেজ বেঙ্গল ল্যাণ্ডরে'র "গর্জ্জন-সরস্বতী-সংবাদ" বেশ।

প্রবাসী। আশ্বিন। শ্রীমতী লজ্জাবতী বসুর "অজ্ঞাত অতিথি" একটি কবিতা। কবিতাটির বক্তব্য কি, বুঝিতে পারিলাম না। "অনঙ্গপ্রভা" শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদারের রচিত একটি গল্প। চর্ব্বিতচর্ব্বণ নহে। মধ্যভারতের প্রাচীন প্রবরপুর গল্পটির রঙ্গভূমি। অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভকালবর্ত্তী বাকাটকবংশীয় প্রবরসেনের কন্যা নায়িকা, আর রাজ-সেনাপতির পুত্র সুব্রত নায়ক। তাঁহাদের প্রণয়কাহিনীও কালোচিত। বিজয়বাবু প্রাচীন সাহিত্য হইতে পুষ্পপল্লব চয়ন করিয়া অনঙ্গপ্রভার প্রসাধন সম্পন্ন করিয়াছেন। অনঙ্গপ্রভায় আধুনিক ছোট গল্পের লক্ষণ নাই; বোধ করি, এই জন্যই লেখক 'আখ্যানক' নাম দিয়াছেন। 'আখ্যানক' হউক বা উপাখ্যান হউক, গল্পটির কল্পনা অভিনব। "বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গে" এবার কেবল প্রত্নতত্ত্ব দেখিতেছি। লেখক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় নবরত্নসভা, উজ্জয়িনী, ধন্বন্তরি ও সুশ্রুত, এই তিন প্রসঙ্গের আলোচনা করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়ের সময়োচিত প্রবন্ধ—"শিক্ষিত ভদ্রলোকের কৃষিবৃত্তি-অবলম্বন" সকলের আলোচ্য। শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের "কলিকাতা পুরাদ্রব্যালয়" ও শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের "পাটলিপুত্র" উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ইংরাজী ভাষায় পাটলিপুত্র সম্বন্ধে যে পুস্তিকার প্রকাশ করিয়াছেন, শেষোক্ত প্রবন্ধে অক্ষয়বাবু তাহার সারসংগ্রহ ও সংক্ষিপ্ত সমালোচনা করিয়াছেন।

নব্যভারত। ভাদ্র ও আশ্বিন। শ্রীযুক্ত 'ম—বি. এ.' "স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁহার প্রচার কার্য্য" নামক যে প্রবন্ধটি লিখিয়াছেন, তাহা প্রত্যেক বাঙ্গালীর অবশ্যপাঠ্য। লেখক এক স্থলে বলিয়াছেন,—"বিবেকানন্দ শুধু পণ্ডিত নন, তিনি সাধু মহাপুরুষ। শুধু পাণ্ডিত্যের জন্য ইংরেজ ও আমেরিকাবাসিগণ তাঁকে ভৃত্যের ন্যায়, সন্তানের ন্যায়, সেবা করেন নাই। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে, ইনি আর একজাতীয় লোক। লোকে সম্মান, টাকা, ইন্দ্রিয়সুখ, সন্ন্যাস, পাণ্ডিত্য লইয়া রহিয়াছে; ইঁহার এক লক্ষ্য ঈশ্বরলাভ।" আবার,— "স্বামী বিবেকানন্দ কামিনীকাঞ্চনত্যাগী। তিনি নির্জ্জনে গুরুর কৃপায় অনেকদিন সাধন করিয়াছিলেন। তিনি যথার্থ কর্ম্মযোগের অধিকারী। তবে তিনি সন্ন্যাসী, মনে করিলেই ঋষিদের মত অথবা তাঁহার গুরুদেব পরমহংস দেবের মত কেবল জ্ঞান ভক্তি লইয়া থাকিতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহার জীবন কেবল ত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখাইবার জন্য হয় নাই। সংসারীরা

যে সকল বস্তু গ্রহণ করে, অনাসক্ত হইয়া তাহাদের কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, স্বামীজী তাহাও দেখাইয়া গিয়াছেন।")

নবপ্রভা। আশ্বিন ও কার্ত্তিক। "বঙ্কিমচন্দ্র" কাশীর আর্য্যধর্ম্মরক্ষিণী সভায় শ্রীমৎ উত্তমানন্দ স্বামীর দ্বিতীয় বক্তৃতা।—আলোচনার যোগ্য। রাসলীলা সম্বন্ধে বঙ্কিমবাবুর মত শ্রীমৎ উত্তমানন্দ স্বামী বুঝিতে পারেন নাই। বঙ্কিম বাবু মহাভারতের ঐতিহাসিকতা ও বিশ্বসনীয়তা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। পক্ষান্তরে স্বামীজী বিন্দুমাত্র বিচারবিতর্কের অবতারণা না করিয়াই মহাভারতকে সাধারণ পুরাণের শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার 'অস্বীকার'কেই 'প্রমাণ' বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। উত্তমানন্দ স্বামী আর এক স্থলে বলিতেছেন,—"বঙ্কিমবাবু বলিয়াছেন রাসলীলা রূপক; অর্থাৎ তাহা ঘটে নাই, তাহা মহাভারতে নাই; আবার বলিয়াছেন, যদিও (তাহা ঘটে নাই তথাচ) তাহার ভিতর গূঢ় রহস্য আছে।" স্বামীজী বঙ্কিমবাবুর উক্তিতে যে বিরোধ দেখিয়াছেন, প্রকৃতপক্ষে তাহাতে সে বিরোধের অবকাশ নাই। বঙ্কিমবাবু যে ঘটনায় বিশ্বাস করেন নাই, পুরাণে তাহা বর্ণিত হইয়াছে। সেই পুরাণ-বর্ণিত ঘটনায় যে গূঢ় তত্ত্ব আছে, বঙ্কিমবাবু তাহারই উল্লেখ করিয়াছেন। আমি যে ঘটনায় বিশ্বাস করি না, সে ঘটনার বর্ণনায় প্রচলিত অর্থ ব্যতীত অন্য কোনও 'গূঢ় তত্ত্ব' থাকিতে পারে না, এমন কোন স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম আছে কি? স্বপক্ষ-সমর্থনের জন্য স্বামীজী এইরূপ কদর্থ ও কষ্টকল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন কেন, বলিতে পারি না। পুরুষ-পরম্পরাগত ধর্ম্মবিশ্বাস ও দেবভক্তি স্বভাবতঃ অন্ধ ও অসহিষ্ণু, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। সেই বিশ্বাসের পরিবর্ত্তন যাঁহাদের উদ্দিষ্ট, ধীরতাই তাঁহাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির উপাদান হইতে পারে। গোঁড়া সংস্কারকের অসংযত বাক্যে, তীব্র মন্তব্যে গোঁড়া বিশ্বাসীর ধৈর্য্যচ্যুতি ভিন্ন অন্য কোনও লাভের আশা করা যায় না, সংসারত্যাগী স্বামী এই সহজ সাংসারিক সত্যটুকু বিস্মৃত হইয়া স্বীয় উদ্দেশ্যের পথে কণ্টকরোপণ করিয়াছেন। সংসারী শ্রোতার নিকট সহিষ্ণুতার আশা না করি, ত্যাগী সন্ন্যাসীর নিকট অন্ততঃ বাক্‌সংযমের প্রত্যাশা না করিয়া থাকিতে পারি না। বক্তার সকল মত সকলের গ্রাহ্য হইবে, সে আশা করি না; কিন্তু তিনি চিন্তাশীল ও স্পষ্টবাদী, এবং তাঁহার উদ্দেশ্য সাধু, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

আরতি। তৃতীয় বর্ষ; ভাদ্র ও আশ্বিন। আরতির ক্রমোন্নতি দেখিয়া আমরা আনন্দিত ও আশান্বিত হইয়াছি। শ্রীমতী বিনয়কুমারী ধরের "সতীর জয়" কবিতা ও শ্রীযুক্ত রামপ্রাণ গুপ্তের "দিল্লীর আফগান শাসনের প্রকৃতি" উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তীর "দক্ষিণ বঙ্গ" নামক সুখপাঠ্য প্রবন্ধে অনেক জানিবার কথা আছে। শ্রীযুক্ত কোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য "দার্শনিক মতের সমন্বয়" করিতেছেন।

পূর্ণিমা। আশ্বিন ও কার্ত্তিক। এক সুরে বাঁধা। "আত্মোৎসর্গ" ও "শারদীয়া"য় পূর্ণিমার পুরাতন সুর বজায় আছে। শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরীর "উড়িয়া কাহিনী" মনোরম। "গদাই পুরুত" সুখপাঠ্য, যদিও গল্পত্ব অল্প।

দুই বন্ধু।

১

বিপিনচন্দ্র এবং বিহারীলাল যখন ২২ নং এবং ২৪ নং———— ষ্ট্রীটের বাটী ভাড়া করিয়াছিল, তখন ২৩ নং বাটী খালি পড়িয়াছিল।

উভয়েরই ২৩ নং বাটী পছন্দ হয়; কেন না, ভাড়া কম, এবং উভয় বন্ধুরই মতিগতি একপ্রকার। বাল্যাবধি উভয়ে দৃঢ়প্রণয়াবদ্ধ। সুতরাং এক জনকে অসুবিধায় ফেলিয়া কেহই ২৩ নং লইতে স্বীকৃত হইল না।

কাজেই ২৩ নং খালি পড়িয়া রহিল।

জগতে এরূপ স্বার্থত্যাগের দৃষ্টান্ত বিরল হইলেও নূতন নহে। যদি উভয় বন্ধু একত্র ২৩ নং ভাড়া লইত, তবে সম্ভবতঃ গোল মিটিয়া যাইত। কিন্তু তাহাতে অনেক বাধা ছিল। প্রথমতঃ, বিপিন, নিরামিষাহারী, কিন্তু মদ্যপায়ী; এবং বিহারী মাংসাশী, কিন্তু তামাক পর্য্যন্ত খায় না। দ্বিতীয়তঃ, বিহারী প্রায় সারারাত্রি জাগিয়া গ্রন্থ পাঠ করে, এবং মধ্যে মধ্যে কবিতা লেখে। বিপিন আপিস হইতে আসিয়াই ঘুমাইয়া পড়ে।

বিহারী আবগারীর দারোগা। বিপিন মার্চেণ্ট আপিসের একটিং হেড বাবু। উভয়েই যুবক, এবং দেখিতে এক রকম। উভয়েই চাঁদনিতে একই দোকানে বস্ত্রাদি এবং ক্রেটীবাজারে একই দোকানে জুতা কিনিত। উভয়েরই সুখদুঃখের কথা প্রায় একরকম, এবং একই কথায় উভয়ে হাসিত, কাঁদিত। কোন হাসির কথা থাকিলে বিহারী বিপিনকে না বলিয়া হাসিত না, এবং কোন কান্নার কথা থাকিলে বিপিন বিহারীকে না বলিয়া কাঁদিত না।

বিহারী আবগারীর দোকান প্রভৃতি বন্দোবস্তের সময় উপরি রোজগার করিয়া যাহা সঞ্চয় করিয়াছিল, বিপিনের সঞ্চিত ধন প্রায় তাহারই সমান। সুতরাং পরস্পরের প্রতি কাহারও কখন লেশমাত্র হিংসার উদ্রেক হয় নাই।

উভয়েই অবিবাহিত, এবং একান্নবর্ত্তী পরিবারের ভার কাহাকেও বহন করিতে হয় নাই।

বিপিনের মদ্যপান করিয়া ঘুমাইয়া যতখানি সুখ হইত, বিহারীর সারারাত্রি জাগিয়া কবিতা-লিখনে তাহাই হইত। উভয়েই সুখী, এবং হরিহর-আত্মা।

প্রতিদিন প্রত্যূষে উঠিয়া হয় বিহারী বিপিনের বাটীতে যায়, নয় ত বিপিন বিহারীর বাটীতে আসে। তখন উভয় বন্ধু সেই জনাকীর্ণ মহানগরীর ছোট বড় কথা পরস্পরের মুখ চাহিয়া কহে। বুয়র যুদ্ধ, আফ্‌গানিস্থানের সম্ভাবিত রাষ্ট্রবিপ্লব, দিল্লীর দরবার, আগামী কন্‌গ্রেস্‌, গীতার দ্বৈতভাবার্থক টীকা, ষ্টার থিয়েটারের "সাবিত্রী" অভিনয়ের পারিপাট্য, ইত্যাদি নানাবিধ বিষয় তন্ন তন্ন করিয়া সমালোচনা করিয়া উভয়ে কলের জলে সর্ব্বাঙ্গ বিধৌত করিয়া মস্তিষ্ক শীতল করিত।

বিহারী বলিত, "বিপিন মদ্‌টা ছাড়, আর যদি মদটাই খাইলে, তবে মাংসটা খাইতে দোষ কি?"

বিপিন। (ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক) "বিহারী, তোমার কল্যাণে দেশীর দরে বিলাতী খাইতেছি, তাহার উপর জীবহিংসা করাটি কি উচিত?"

যখন বিহারী নিরলসভাবে সুদীর্ঘ শীতকালের রাত্রিতে মানবজীবনের বিচিত্র অসারতা কাব্যের ছন্দোবন্ধে পিটিয়া গড়িয়া সূক্ষ্ম করিত, তখন বিপিনের সূক্ষ্মদেহ স্বপ্নক্ষেত্রে বিচরণ করিয়া বিহারীর আত্মার সহিত সদ্ভাবস্থাপনের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিত।

আহা! সে জগতে কেই বা বিহারী, আর কেই বা বিপিন! কিন্তু তাহা হইলে কি হয়। স্থূলদেহের সংস্কার প্রভৃতি হইতে মুক্ত হইলে জীবাত্মা স্বতঃই পরস্পরের সহিত মিলনে ব্যস্ত হয়। এইরূপে অলক্ষ্যে ও অভাবনীয়-রূপে বিহারীর সহিত বিপিনের স্নেহ ক্রমেই উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

উভয় বন্ধুরই দারপরিগ্রহ সম্বন্ধে কোন আসন্ন উদ্বেগ ছিল না।

আর একটা বিশেষ কথা। উভয়ের চরিত্র সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত উভয়ে কিংবা উভয়ের বন্ধু ও প্রতিবাসিগণ কেহই কোন দোষারোপ করিতে সক্ষম হয় নাই। মদ ও মাংস খাইয়াও এরূপ নৈতিক নিষ্কলঙ্কতার দৃষ্টান্ত প্রায়ই পরিলক্ষিত হয় না।

যাহারা জ্ঞানী, তাহারা বলিত, উভয় বন্ধু যোগভ্রষ্ট। কেবল পূর্ব্বজন্মের সংস্কারটার জন্য, অর্থাৎ কর্ম্মফলের দৃঢ় নিয়ম বজায় রাখিবার জন্য, দিনকতক মদ্য মাংস এবং নিরামিষ চলিতেছে।

২

হেনকালে ২০ নং বাটী ভাড়া হইয়া গেল।

পশ্চিম হইতে কোন বৃদ্ধ ভদ্রলোক রুগ্ণা স্ত্রী ও অরুগ্ণদেহা বিধবা

যুবতী কন্যা লইয়া চিকিৎসার জন্য নানা দেশ পরিভ্রমণ করিয়াও কোন ফল না পাইয়া অবশেষে কলিকাতায় আসিলেন, এবং অনেক বাসাবাটী পরিদর্শন করিয়া অবশেষে ২৩ নংই তাঁহার পছন্দ হইল।

সামান্য কারণে ব্রহ্মাণ্ডে বিপ্লব ঘটে। শুনা যায়, ব্রীহি, যব, গোধূম প্রভৃতি অন্নের মধ্য দিয়া স্বর্গচ্যুত জীবগণ আবার ইহলোকে পুনর্জন্ম গ্রহণ করে। টীকাকার বলেন, ইহা ভিন্ন আর উপায় নাই; কেন না, খাদ্যের উপরই জীবন নির্ভর করে। জীব ইচ্ছা করিলে জগতের সমুদায় পথ রুদ্ধ করিতে পারে, কেবল অন্ননালীর পথ পারে না, কার্যাগতিকে অন্ন ভিন্ন জীবাত্মার মানবের দেহকোষে সঞ্চারিত হইবার আর কোনও প্রশস্ত পথ নাই।

সেইরূপ সামান্য কারণেই উভয় বন্ধুর জীবনে একটা বিপ্লব ঘটিয়া গেল। প্রথমতঃ ২৩ নং বাটীতে জনসমাগমবশতঃ উভয়ের প্রাত্যহিক কথোপকথনের মধ্যে একটা নূতন বিষয় আসিয়া পড়িল।

বিপিন। লোকটা একটু ব্রাহ্মধরণের।

বিহারী। বড় ভদ্রলোক, এবং অমায়িক।

বিপিন। আমি তাঁহাকে তাঁহার স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য নীলরতন ডাক্তারকে আনিবার পরামর্শ দিয়াছি।

বিহারী। আমি কেদার ডাক্তারকে ডাকিতে বলিয়াছি।

উভয়েই কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইল। যখন কোন কথাই পূর্ব্বে পরামর্শ না করিয়া বন্ধুদ্বয় ইতিপূর্ব্বে প্রচার করে নাই, তখন এবার সেই নিয়ম কেন লঙ্ঘিত হইল, তাহা বিহারী ও বিপিন কেহই বুঝিল না। তবে উভয়েই ইহা বুঝিল যে, উভয়ের পরস্পরকে না বলিয়া বৃদ্ধ ভদ্রলোকের নিকট সহানুভূতি-প্রকাশ একটু নূতন ধরণের হইয়া গিয়াছে।

সুতরাং যখন ২৩ নং বাটীর শ্যামা ঝি ২২ নং বাটীতে বিপিনকে না পাইয়া ২৪ নং বাটীতে বিহারীকে ডাকিতে গেল, তখন উভয়েই একটু সঙ্কুচিত হইয়াছিল।

বৃদ্ধ নবীন বাবু বিপিন ও বিহারীর ন্যায় সদ্বংশজাত কায়স্থ, এবং করুণা-বাৎসল্যে ভরা হৃদয়। কোন্ ডাক্তারকে দেখাইলে ভাল হয়, তাহারই পুনঃ-পরামর্শের নিমিত্ত বন্ধুদ্বয়কে ডাকিয়াছিলেন।

বিহারী বলিল, "বিপিন! তুমি যাও।"

বিপিন বলিল, "তুমি যাও।"

শ্যামা বলিল, "আপনারা আসিয়া একটা স্থির করিয়া বলুন ; আমি যাই।"

আবার যখন পুরাতন স্নেহ আসিয়া উভয় বন্ধুর হৃদয় আপ্লুত করিল, তখন উভয়েই এক জন ডাক্তার মনোনীত করিয়া নবীন বাবুকে জ্ঞাত করাইল। কিন্তু দুই জনের মধ্যে কেহই ২৩ নং বাটীতে গেল না।

বিপিন। এও একটা আপদ। পরের জন্য এত মাথাব্যথা অনেক সময় অসহ্য হইয়া পড়ে।

বিহারী। ঠিক তাই, দুই বাটীর মধ্যে একটা রুগী আসিয়া পড়িলে কার্য্যগতিকে জঞ্জাল বাধে।

বিপিন। ভদ্রলোকের মেয়েছেলে, এখন তখন ছাতে উঠে ; তাই আমাকে পূর্ব্ব দিকের জানালা বন্ধ করিতে হইয়াছে।

বিহারী। আমিও পশ্চিম দিকের জানালাটা বন্ধ করিয়াছি। তখন যদি তুমি ২৩ নং বাটীটা লইতে, তবে এ অসুবিধা ঘটিত না।

বিপিন। এক জনের ত হইত। এখন না হয় দুই জনের হইয়াছে।

দুই জনেরই সুখদুঃখের ভাগ কার্য্যগতিকে সমান দাঁড়াইয়া গেল। ইহাতে উভয়েরই অবস্থা উভয়ে পর্য্যালোচনা করিয়া আবার পূর্ব্বের ন্যায় মৎস্য মাংস, এবং নিরামিষ ইত্যাদি খাইতে লাগিল।

৩

সুলোচনা বিধবা হইলেও বৈধব্যযন্ত্রণা ভোগ করিবার বিশেষ আধ্যাত্মিক লালসা ছিল না। সত্য, সুলোচনা বিষাদচিহ্নস্বরূপ কালাপেড়ে শাড়ী পরিধান করিত। সুলোচনা দারুণ স্বামিশূন্যতা অনুভব করিয়া মধ্যে মধ্যে চক্ষে জল আনিয়া ফেলিত। তাহাও সত্য। কিন্তু সুলোচনা হাল ছাড়িয়া দেয় নাই। সকলেই জানিত, সুলোচনার পূর্ব্বাপেক্ষাও সুন্দর বর যুটিবে। এরূপ সুখঘটনার কালবিলম্বের কারণ কেবল তাহার জননীর অসুস্থতা।

ঈশ্বরের কৃপায় ও ডাক্তারের সাহায্যে জননী সারিয়া উঠিল, এবং এই শুভসংবাদপ্রচারার্থ সুলোচনা তাহার কাবুলী বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধিল।

সুলোচনার কাবুলী বিড়াল তাহার পরলোকগত স্বামীর প্রদত্ত স্মৃতিচিহ্ন। বিড়ালটি বড় সাধের, এবং অনেকটা উল্লিখিত স্বামীর স্থান অধিকার করিয়াছিল।

স্বামীর মৃত্যুর পর সুলোচনাকে নিজের জন্য এক জন ঝি রাখিতে হইয়াছিল। জ্যাকেট আঁটিয়া দিতে, চুলে কাঁটা পরাইয়া দিতে, সময়ে অসময়ে রূপের

খাইবা দিতে, ক্রন্দনের সময় সহানুভূতি প্রকাশ করিতে, এবং অন্যান্য ছোট বড় কার্য্যে সাহায্য করিতে, কিংবা বাধা দিতে, পূর্ব্বে সুলোচনার স্বামী ভিন্ন আর কেহই ছিল না। সুতরাং সেই কর্ম্মগুলির ভার যথাযোগ্যভাবে, বিড়াল, শ্যামা ঝি, এবং অন্যান্য ব্যক্তির উপর স্থাপন করিয়া সুলোচনা অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়াছিল।

কাবুলী বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধিবার পূর্ব্বে বিপিন ও বিহারী তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে জ্ঞাত ছিল না। সুতরাং যখন টুং টুং শব্দে ভ্রাম্যমাণ বিড়াল ছাতের উপর একবার পূর্ব্ব দিকে এবং অন্যবার পশ্চিম দিকে যাইতে লাগিল, তখন বিপিন ও বিহারী উভয়েই স্ব স্ব গবাক্ষ ঈষৎ উন্মুক্ত করিয়া এই অভিনব শব্দের কারণ নির্দ্দিষ্ট করিয়া লইল।

উভয়েই ইহাও জানিল যে, যখন বিড়াল ছাতে আসে, তখন সুলোচনাও বিড়ালকে ছাত হইতে ধরিয়া লইয়া যায়।

পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ!

পশুর বুদ্ধি হইতে মানববুদ্ধির শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে বোধ হয় কাহারও সন্দেহ নাই। তাহার প্রমাণে আরও বলা যাইতে পারে যে, বিহারী প্রত্যহ প্রাতঃকালে একটা গোটা গল্‌দা চিংড়ী ভাজিয়া স্বীয় অর্দ্ধোন্মুক্ত বাতায়নপথে রাখিয়া দিত। তদবধি বিড়াল যথাসময়ে উক্ত চিংড়ী সম্মুখের পদনখর দ্বারা বিদ্ধ করিয়া বাহিরে টানিয়া লইয়া গিয়া ভক্ষণ করিত।

বিপিন যখন উঁকি মারিয়া এই ব্যাপার দেখিল, তখন তাহার বুঝিতে বাকি রহিল না।

অতএব বিহারীকে টেক্কা দিয়া বিপিন একটি ছোট খুরী দুগ্ধপূর্ণ করিয়া নিজের বাতায়নপথে বৈকালে সাবধানে রাখিয়া দিল।

আমিষ আহার করিতে যেমন বিড়ালের পক্ষে সুবিধা হইয়াছিল, নিরামিষ আহার তেমন সোজা হইল না। কাজেই বিড়ালের গলা বাড়াইয়া দুগ্ধ পান করিতে কিঞ্চিৎ অধিক সময় লাগিত।

সুতরাং সুলোচনা একদিন এই ব্যাপার দেখিয়া বিস্মিত হইল, এবং বাতায়নপার্শ্বে আসিয়া গৃহস্বামীকে লক্ষ্য করিয়া ভবিষ্যতে দুগ্ধ সম্বন্ধে সাবধান হইতে পরামর্শ দিল।

বিপিন (গবাক্ষ পার্শ্ব হইতে)। বড় সুন্দর বিড়াল। খাউক না। ম মন বিড়াল দুগ্ধ খাইয়া যায়, সে ত আমার সৌভাগ্যের কথা।

সুলোচনা (সলজ্জভাবে)। না—না, সে কি!—ইহা বলিয়াই কোমল মুষ্টি প্রহার করিয়াই বিড়ালকে লইয়া গেল। বিপিনের হৃদয়ও সেই বিড়ালের সঙ্গে গেল।

বিহারী হতাশভাবে পশ্চিম দিকের জানালা হইতে এই অভিনয় নিরীক্ষণ করিল। ক্রমে তাহার অসহ্য হইয়া উঠিল।

তৎপরদিন প্রত্যূষে যখন বিহারী ও বিপিন পরস্পরের সুখ দুঃখ সম্বন্ধে কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইল, তখন কথা জুটিল না ; কাজেই বিপিন তামাকু খাইয়া চলিয়া আসিল, এবং বিহারী গত নিশির অর্দ্ধসমাপ্ত কবিতা সমাপ্ত করিল।

৪

নিরামিষভোজী হইলেও বিপিনের ভালবাসার মাত্রা বিহারী অপেক্ষা কম নয়। এই নূতন মদিরার আস্বাদন পাইয়া বিপিন পুরাতন মদিরা ত্যাগ করিল। বিপিনের নিদ্রার ভাগটাও কমিয়া গেল, এবং সময় কাটাইবার উপায় না পাইয়া দুই একটা কই মৎস্য ও হাঁসের ডিম খাইতে লাগিল। ইহার কারণে ইহাই বলা যাইতে পারে যে, কাবুলী বিড়ালের কীটাণু (bacilli) বিপিনের দেহে সংক্রান্ত হইয়াছিল। নবীন প্রেম সম্বন্ধেও তাহাই বক্তব্য। বিজ্ঞান যেমন এ সব কথার রহস্য শীঘ্র বুঝাইয়া দিতে পারে, দর্শন তাহা পারে না।

বিহারীর সম্বন্ধে ইহাই বলা যাইতে পারে যে, ঈর্ষাপ্রযুক্ত তাহার শরীরের অনেক কীটাণু বাহির হইয়া গেল। কামনা হইতে ঈর্ষ্যা এবং ঈর্ষ্যা হইতে ক্রোধ জন্মিয়া থাকে। সুতরাং একদিন প্রাতঃকালে যখন বিড়ালশ্রেষ্ঠ বাতায়নপথে মৎস্য না পাইয়া স্বভাবসুলভ ধ্বনি করিতেছিল, তখন বিহারী তাহার লাঙ্গূল ধরিয়া গোটাকতক বজ্রমুষ্টি প্রহার করিল।

সুলোচনা ছাতের উপর হইতে এই ব্যাপার দেখিয়া তৎক্ষণাৎ জানালার নিকট গেল।

সুলোচনা। আপনি কেমন লোক মহাশয়? বিড়ালকে অত মাচ্ছেন কেন?

বিহারী। আপনি যদি বিড়ালকে না সামলান ; তবে আমি মারিয়া ফেলিব।

সুলোচনা। ও কি দোষ করিয়াছে?

বিহারী। ঘণ্টার শব্দে আমার ঘুম হয় না, আর যতক্ষণ জাগিয়া থাকি—আপনি জানেন ত—আমি রাত্রি জাগিয়া কবিতা লিখি—ততক্ষণ উহার টুং টুং শব্দে আমার মাথা ঠিক থাকে না।

সুলোচনা। আপনি কবিতা লেখেন, তাহা আমি জানিতাম না। আমি কবিতা বড় ভালবাসি। আপনার কবিতা আমাকে দেখাইবেন কি?

বিহারীর ক্রোধ কতকটা প্রশমিত হইয়া অনুতাপের ভাব আসিয়া উপস্থিত হইল। সত্য সত্যই সুলোচনা তাহার বিড়ালের উপর বিহারীর অন্যায় অত্যাচারে কাঁদিয়া ফেলিল।

বিহারী ভাবিল, "আমি কি কাপুরুষ"—

বিহারী। আপনি কাঁদিবেন না;—আমার অপরাধ হইয়াছে, মার্জ্জনা করিবেন।

তখন বিহারী সহৃদয়তা জানাইবার জন্য মার্জ্জারকে লক্ষ্য করিয়া ডাকিল, "পুস্—পুস্—আয়, আয়,—"

বিড়াল লাঙ্গুল নাড়িয়া স্নেহ জানাইল। পশুদিগের কৃতজ্ঞতা স্বতঃই উচ্ছ্বসিত হয়। সুলোচনা ধীরে ধীরে বিড়ালটি লইয়া বিহারীর হাতে দিল।

সুলোচনা। আপনি বড় নিষ্ঠুর। এমন কোমল শরীরে অত মারিলে বাঁচিবে কেন?

বিহারী। আর আমার হৃদয়টা কি পাষাণ?

সুলোচনার কোমল করস্পর্শে বিহারীতেও কীটাণু সংক্রান্ত হইয়াছিল; কারণ, পূর্ব্বোক্ত হিংসা প্রভৃতির কীটাণুর স্থলে এখন অন্য প্রকারের কীটাণু আসিয়া বিহারীর হৃদয়ে একটা মনোহর আন্দোলন উপস্থিত করিল। বিহারী নিজের বাছা বাছা কবিতা লইয়া সুলোচনাকে দিল, এবং সুলোচনাও একে একে তাহা দেখিয়া শুনিয়া লইল। শেষে একটা কবিতা দেখাইয়া বিহারী বলিল, "এটা কোন বিশেষ লোকের জন্য রচিত হইয়াছে।"

সুলোচনা। কে লোক বল না—

বিহারীর হৃদয় ঐ মধুর "বল না" শুনিয়া অনিশ্চিত জগতে একটা লাফ দিল।

বিহারী। ও কবিতা তোমারই জন্য—

সুলোচনা অদৃশ্য হইল, কিন্তু স্বীয় গবাক্ষপার্শ্বে বিপিন মাথায় হাত দিয়া বসিল।

৫

যদিও উভয় বন্ধুর আপাততঃ অবস্থা সমান, কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় তাহারা সুখী নহে। বিপিন আর মোটেই বিহারীর বাটী যায় না, এবং বিহারীও বিপিনের

বাটীতে আসে না। তজ্জন্য কেহই বড় দুঃখিত নহে। উভয়ের মতিগতি, খাদ্যা-খাদ্যেরও পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, এবং খরচপত্রের তালিকা সম্বন্ধেও উভয়ের পূর্ব্বাপর দৃষ্টি নাই। বৃদ্ধ নবীন বাবু স্ত্রীর আরোগ্যাবধি উভয়কে পুত্রের ন্যায় ভালবাসিতেন, এবং নবীন বাবুর স্ত্রীও বিপিন ও বিহারীর পরামর্শ না লইয়া কোন কাজ করিতেন না।

কিন্তু বিপিন ও বিহারীর অদৃষ্টে শান্তি হইল না। সেই কবিতা-অর্পণ-কাল হইতে আর সুলোচনা ছাতে যাইত না, এবং বিড়ালের খাদ্যসংগ্রহ বন্ধ হইয়া গেল। সুলোচনার ও তাহার বিড়ালের আভ্যন্তরীণ ভাবটা যে কি, তাহা উভয় বন্ধু কিছুতেই বুঝিতে পারিল না। বিপিন বিহারীর মুখ দেখিতে এবং বিহারী বিপিনের মুখ দেখিতে অত্যন্ত লজ্জা বোধ করিত।

যদি সুলোচনা বলিত, "বিহারী! তোমাকেই আমি ভালবাসি", কিংবা, "বিপিন! তোমাকেই আমি ভালবাসি", তবে যাহা হউক একটা মীমাংসা হইয়া যাইত। কিন্তু সুলোচনার হঠাৎ রঙ্গস্থল হইতে অন্তর্ধানে উভয় বন্ধুই মনে করিল যে, সুলোচনা চটিয়া গিয়াছে; অথচ উভয়েরই ধারণা যে, সুলোচনা তাহাকেই ভালবাসে। এরূপ স্থলে যাহা ঘটিতে হয়, তাহাই ঘটিল; অর্থাৎ, উভয়েই পূর্ব্বসংস্কার ইত্যাদি বর্জ্জন পূর্ব্বক কেবল দেশী মদ খাইতে লাগিল। বিলাতীর খরচ আর কুলাইল না।

বৃদ্ধ নবীন বাবুর মনে একটা সাধ ছিল যে, বিহারী ও বিপিনের মধ্যে এক জনকে বাছিয়া লইয়া সুলোচনার বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপিত করেন। কিন্তু বিহারী ও বিপিনের মদ্যপানের ঘটা দেখিয়া তাঁহার উভয়েরই উপর ঘৃণা হইয়া গেল।

ইতিমধ্যে একটা সঙ্গীন ঘটনা উপস্থিত হইল। একদিন রাত্রিকালে বিহারীর ঘরে সুলোচনার কাবুলী বিড়াল কোনক্রমে প্রবেশ করে; বিহারী তাহাকে বাঁধিয়া রাখিল।

প্রত্যূষে বিড়ালের সন্ধান না পাইয়া সুলোচনা ছাতে গেল। দেখিল, বদ্ধ বিড়াল নির্জ্জীবপ্রায় হইয়া বিহারীর ঘরে চুপ করিয়া বসিয়া আছে।

তখন বিপিন বাতায়নপথে উদিত হইলে সুলোচনা মুখ ভার করিয়া একবার বলিল, "দেখুন ত কি অন্যায়।"

বিপিন বুঝিতে পারিল। তৎক্ষণাৎ লাফ দিয়া বহির্দ্বারে গেল, এবং তদ্দণ্ডেই বিহারীর ঘরে গিয়া বিড়ালকে বন্ধনমুক্ত করিয়া কোলে তুলিয়া লইল।

উভয়েরই চক্ষু রক্তবর্ণ।

বিহারী বলিল, "শীঘ্র রাখ।"

বিপিন অবজ্ঞাসূচক হাসি হাসিয়া একবার উন্মুক্ত বাতায়নপথ দিয়া সুলোচনার দিকে চাহিল।

বিহারীও দেখিল। তৎপরেই উভয় বন্ধু আহত ব্যাঘ্রের ন্যায় পরস্পরকে আক্রমণ করিল।

এই মল্লযুদ্ধের বর্ণনা অনাবশ্যক; তবে এই পর্য্যন্ত বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, সাধের বিড়ালটি উভয়ের দেহ চাপা পড়িয়া এবং উভয়ের টানাটানিতে ক্ষত বিক্ষত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল।

রুধিরাক্তকলেবর বিপিন ও বিহারী সারাদিন সেই ঘরে মাতাল অবস্থায় পড়িয়া রহিল।

৬

সুলোচনার যে মূর্চ্ছা হইয়াছিল, তাহা প্রথমে কেহ দেখে নাই। সন্ধ্যার সময় সুলোচনা শয্যায় শুইয়া স্থিরনেত্রে সন্ধ্যাতারকা দেখিতেছে।

বিড়ালের ইহজগৎ ছাড়িবার সহিত, সুলোচনারও সংসারের সঙ্গে যে সম্বন্ধ ছিল, তাহা ঘুচিয়া গিয়াছে।

সুলোচনা কাহাকেও ভালবাসে নাই। সেই মার্জ্জারই তাহার প্রথম ভাল-বাসা, এবং শেষ ভালবাসা। বাস্তবিক, একবারের অধিক ভালবাসা কখনও স্বাভাবিক হইতে পারে না।

সুলোচনার বিড়ালের সহিত তাহার একমাত্র স্বামীর স্মৃতি সন্ধ্যাবায়ু জাগাইয়া তুলিয়াছে। সুলোচনার কোমল হৃদয় পাষাণ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু সে পাষাণে তাহার একমাত্র স্বামীর দেবমূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাহা ইহজন্মে মুছিবার নয়।

সুলোচনা ধীরে ধীরে উঠিয়া মস্তকের কেশগুলি কর্ত্তন করিয়া ফেলিল, কালাপেড়ে শাড়ী ফেলিয়া সাদা শাড়ী পরিধান করিল। কাগজ পত্র, কবিতা, সিঁদুর ও সাজ সজ্জা—সব দূর করিয়া ফেলিয়া দিল।

সুলোচনার মূর্ত্তি স্থির হইয়া আসিল। শ্যামা ঝিকে বলিল, "মৃত বিড়াল-টাকে আন্।"

জনকজননী কত বুঝাইলেন, কিন্তু সুলোচনার জীবন যে গভীর স্তরে পড়িয়া গিয়াছে, সেখানে পার্থিব আশ্বাসবাণী পঁহুছিল না।

কাজেই নবীন বাবু ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী সম্পূর্ণ বিধবার মূর্ত্তি দেখিয়া, কন্যা সহ সেই রাত্রিকালেই দেশে যাত্রা করিলেন। তার পর আর তাঁহাদের কোন সংবাদ পাওয়া গেল না।

রাত্রি দশটার পর বিহারীর নেশা ভঙ্গ হইল। বিহারী দেখিল, বিপিন পড়িয়া আছে। বিহারীর স্মৃতিপথে মল্লযুদ্ধের কথা আসিয়া পড়াতে সে একবার ইতস্ততঃ চাহিয়া ২৩ নং বাটীতে গেল। দেখিল, বাটী জনশূন্য। বিহারী শুনিল যে, নবীন বাবু সপরিবারে চলিয়া গিয়াছেন। বিহারী ফিরিয়া আসিয়া ডাকিল, "বিপিন!"

বিপিন। হুম্—

বিহারী। তাহারা চলিয়া গিয়াছে।

বিপিন। হুম্—

বিহারী সারারাত্রি বসিয়া বিপিনের গাত্র টিপিয়া, ঔষধ খাওয়াইয়া, গোলাপ-জলে মাথা ধৌত করিয়া প্রাতঃকালে দেখিল, বিপিন প্রকৃতিস্থ হইয়াছে।

বাস্তবিক বিপিনের রাত্রি দশটার সময়ই হুঁস হইয়াছিল, কিন্তু বন্ধুর পুরাতন কোমল করের সস্নেহ আভাষ পাইয়া সে আরাম করিয়া পূর্ব্ব-সংস্কারবশতঃ ঘুমাইয়াছিল।

যখন সূর্য্য উঠিতেছিল, তখন বিপিন বলিল, "দেখ বিহারী, পূর্ব্বেই আমা-দিগের একটা ভুল হইয়াছে।"

বিহারী। কি?

বিপিন। ঐ ২৩ নং বাটী খালি থাকিতে দেওয়া উচিত হয় নাই।

বিহারী। আমারও তাহাই মত।

অতঃপর সেই দিনই উভয়ে উঠিয়া ২৩ নং বাটীতে একত্র গেল, এবং ইহাও আশ্চর্য্য বলিতে হইবে যে, উভয়ের খাদ্যাখাদ্যের বিভিন্নতা আর রহিল না; কেন না,—উভয়েই সাবধানে মদ্য, মাংস, নিরামিষ প্রভৃতি সমান অংশে খাইতে লাগিল, এবং উভয়েরই খরচ এক মেসে সমান দুই অংশে বিভক্ত হওয়াতে আর কোনও ক্ষোভের কারণ রহিল না।

উভয়েরই অবস্থা এখন একপ্রকার, অতএব উভয়েই সম্পূর্ণ হরিহরাত্মা।

——*——

গীতায় ঈশ্বরবাদ।

---*---

৬। সাংখ্য ও গীতা।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রবন্ধে গীতার সহিত যথাক্রমে ন্যায়, বৈশেষিক ও মীমাংসা দর্শনের এবং জ্ঞানবাদের সম্বন্ধ আলোচিত হইয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে প্রথমতঃ সাংখ্যদর্শনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া তাহার সহিত গীতার সম্বন্ধের আলোচনা করিব।

সাংখ্যদর্শনের প্রবর্ত্তক মহর্ষি কপিল। তাঁহার শিষ্য আসুরি; আসুরির শিষ্য পঞ্চশিখাচার্য্য। তিনি সাংখ্যদর্শনের বিবৃতি করিয়া বিবিধ গ্রন্থের রচনা করিয়াছিলেন। সে সব গ্রন্থ এখন লুপ্ত হইয়াছে। কেবল পাতঞ্জলদর্শনের ব্যাসভাষ্যে পঞ্চশিখের কতকগুলি বচন উদ্ধৃত দেখা যায়। অধুনা, সাংখ্য শাস্ত্রের যে সকল গ্রন্থ প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে তত্ত্বসমাসই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। কেহ কেহ ইহাকেই কপিল-প্রণীত মূল সাংখ্যদর্শন বিবেচনা করেন *। ইহা, কিন্তু, সমীচীন বোধ হয় না। তত্ত্বসমাসকে দর্শন না বলিয়া দর্শনের সূচীপত্র বা বিষয়তালিকা বলিলে সঙ্গত হয়। এক্ষণে সাংখ্য-প্রবচন-সূত্র নামে যে ৬ অধ্যায়ে বিভক্ত সাংখ্যদর্শন প্রচলিত আছে, তাহা অপেক্ষাকৃত আধুনিক গ্রন্থ মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য, বাচস্পতি মিশ্র (ইনি খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর লোক),—এমন কি, চতুর্দ্দশ শতাব্দীর লেখক মাধবাচার্য্যও এই গ্রন্থ হইতে কোনও সূত্র স্ব স্ব গ্রন্থে উদ্ধৃত করেন নাই। সাংখ্যপ্রবচন-সূত্র তাঁহাদের সময়ে প্রচলিত থাকিলে এইরূপ হইত কি? এই

---

* মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার প্রণীত হিন্দুদর্শন, ২৫৪ পৃষ্ঠা। বিজ্ঞানভিক্ষু এই মতের সমর্থন করিয়াছেন। "নম্বেবমপি তত্ত্বসমাসাখ্যসূত্রৈঃ সহাস্যাঃ ষড়ধ্যায্যাঃ পৌনরুক্ত্যমিতি চেৎ। মৈবং। সংক্ষেপবিস্তররূপেন উভয়োঃপ্যপৌনরুক্ত্যাৎ।" (সাংখ্যপ্রবচন-ভাষ্য, ভূমিকা)। এ সম্বন্ধে ম্যাক্স্‌মুলার লিখিয়াছেন, "I venture to call the 'Tatwasamasa' the oldest record, that has reached us, of the Sankhya Philosophy. * * These Samasa Sutras, it is true, are hardly more than a table of contents."

—*Max Muller's Indian Philosophy. page 318*।

প্রবচনসূত্রের বিজ্ঞানভিক্ষু কৃত এক উপাদেয় ভাষ্য প্রচলিত আছে। সাংখ্য-দর্শনের অনিরুদ্ধ-কৃত সংক্ষিপ্ত ভাষ্যও উল্লেখযোগ্য।

সাংখ্যদর্শন সম্বন্ধে ঈশ্বরকৃষ্ণের সাংখ্যকারিকা অতি প্রামাণিক গ্রন্থ। শঙ্করাচার্য্য শারীরক ভাষ্যে এই গ্রন্থ হইতেই বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। মাধবাচার্য্য তাঁহার সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে এই কারিকারই অনুসরণ করিয়াছেন। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে এই কারিকা চীন ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। শঙ্করাচার্য্যের গুরুর গুরু গৌড়পাদাচার্য্য এই কারিকার ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। এই ভাষ্য অতি প্রামাণিক গ্রন্থ। বাচস্পতি মিশ্রের কৃত সাংখ্য-তত্ত্ব-কৌমুদী এই কারিকারই * উৎকৃষ্ট টীকা। এতদ্ব্যতীত বিজ্ঞানভিক্ষু-কৃত সাংখ্য সার সাংখ্যদর্শন সম্বন্ধে উপাদেয় গ্রন্থ।

অন্যান্য দর্শনের ন্যায় সাংখ্যদর্শনেরও আরম্ভ দুঃখবাদে। জগতে জীবকে ত্রিবিধ দুঃখের অভিঘাত সহিতে হইতেছে। সে দুঃখত্রয় আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক। আধ্যাত্মিক দুঃখ দ্বিবিধ, রোগাদি জন্য শারীরিক দুঃখ, এবং কামক্রোধাদিজন্য মানসিক দুঃখ। মনুষ্য, পশু, বা স্থাবর জনিত দুঃখের নাম আধিভৌতিক দুঃখ। আর যক্ষ, রক্ষঃ প্রভৃতির আক্রমণে যে দুঃখ হয় তাহার নাম আধিদৈবিক দুঃখ। যত দিন শরীর, তত দিন দুঃখের অভিঘাত। অথচ, দুঃখ আমাদের উপাদেয় নহে,—হেয়; অর্থাৎ, আমরা দুঃখ চাহি না, দুঃখের হানি ইচ্ছা করি। এ সম্বন্ধে ঈশ্বরকৃষ্ণ লিখিয়াছেন,—

'তত্র জরা-মরণ-কৃতং দুঃখং প্রাপ্নোতি চেতনঃ পুরুষঃ।
লিঙ্গস্যা-বিনিবৃত্তেস্তস্মাদ্দুঃখং স্বভাবেন॥'—সাংখ্য-কারিকা ৫৫।

'জীব যত দিন শরীর ধারণ করে, তত দিন তাহাকে জরামরণজন্য দুঃখ ভোগ করিতেই হয়; অতএব দুঃখভোগ জীবের স্বভাবসিদ্ধ।' †

সুখ জগতে আদৌ নাই, তাহা নহে। তবে কদাচিৎ কাহারও ভাগ্যে

---

* প্রচলিত সাংখ্যদর্শন অপেক্ষা কারিকা যে প্রাচীনতর, তাহার একটি অকাট্য প্রমাণ এই যে, দর্শনের কয়েকটি সূত্রে কারিকার ছন্দোনিবদ্ধ অংশবিশেষ অবিকল উদ্ধৃত হইয়াছে, দেখা যায়। ইহা সত্ত্বেও বিজ্ঞানভিক্ষু কি করিয়া প্রচলিত সাংখ্যদর্শনকে মহর্ষি কপিলপ্রণীত বলিয়া প্রচার করিয়াছেন, তাহা বুঝা যায় না।

† সমানং জরা-মরণাদিজং দুঃখং। [সাংখ্যসূত্র ৩৫৩]
ঊর্দ্ধাধোগতানাং ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তানাং সর্ব্বেষাম্ এব জরামরণাদিজং দুঃখং সাধারণম্।
—বিজ্ঞানভিক্ষু]।

মিশ্র। সে সুখ আবার অতি অল্প ও দুঃখসংভিন্ন। তাহাও আবার স্থায়ী হয় না। অতএব, সে সুখ দুঃখপক্ষেই ধর্ত্তব্য। * তাই সূত্রকার বলিয়াছেন,—

"কুত্রাপি কোঽপি সুখীতি। তদপি দুঃখশবলম্। ইতি দুঃখপক্ষে নিক্ষিপন্তে বিবেচকাঃ।—সাংখ্য-সূত্র ; ৬।৭,৮।

এই ত্রিবিধ দুঃখের নিবৃত্তি সকলেরই অভিপ্রেত। কিন্তু, সে নিবৃত্তি ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক হওয়া আবশ্যক।

অথ ত্রিবিধদুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরত্যন্তপুরুষার্থঃ।—সাংখ্য-সূত্র ; ১।১।

কিসে এই ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্তনিবৃত্তি হইবে? দেখা যায়, লৌকিক উপায়ে সেই নিবৃত্তি সম্ভবপর নহে। কারণ, ঔষধসেবনে শারীরিক দুঃখের বা ইষ্টসাধনে মানসিক দুঃখের যে নিবৃত্তি ঘটে, তাহা সাময়িকমাত্র; স্থায়ী হয় না। আর, ঐ সকল উপায় অব্যভিচারী উপায় * নহে। অতএব, লৌকিক উপায়ে দুঃখনিবৃত্তি দুরাশামাত্র। দুঃখনিবৃত্তির একটি বৈদিক উপায় প্রচলিত আছে বটে; বেদোক্ত যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানের ফলে, জীব সুখধাম স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইতে পারে। কিন্তু, সে উপায়ও সমীচীন নহে। কারণ, তাহা ত্রিবিধ দোষ-দুষ্ট। কর্ম্মের তারতম্য অনুসারে অর্জ্জিত স্বর্গলোকেরও তারতম্য ঘটে। কেহ উচ্চতর, কেহ নিম্নতর স্বর্গের অধিকারী হয়। তাহাতে পরস্পরের উৎকর্ষ অপকর্ষের ভেদে দুঃখানুভব অপরিহার্য্য। দ্বিতীয় কথা, যজ্ঞসাধনের জন্য যাজ্ঞিককে অবশ্যই জীবহিংসা করিতে হয়। অতএব, হিংসাবহুল যজ্ঞানুষ্ঠানে যেমন পুণ্য আছে, তেমনি পাপের স্পর্শও সুনিশ্চিত। আর সেই পাপের ফলে দুঃখভোগ অনিবার্য্য। কিন্তু, বৈদিক উপায়ের মারাত্মক ত্রুটী এই যে, যজ্ঞের ফলে যে স্বর্গাদির প্রাপ্তি ঘটে, তাহার ভোগ স্থায়ী হয় না। পুণ্যকর্ম্মের ফলভোগ হইলে পর কর্ম্মীর পতন অবশ্যম্ভাবী। অতএব কর্ম্মীকে আবার দুঃখময় সংসারে ফিরিয়া আসিতে

---

* পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, গীতা এ মতের অনুমোদন করেন। ভগবান সংসারকে দুঃখের আলয় ও ক্ষণভঙ্গুর বলিয়া বিশেষিত করিয়াছেন।

"পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্।"

গীতায় অন্যত্র উক্ত হইয়াছে—'

অনিত্যম্ অসুখং লোকং ইমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্।

এই অনিত্য ও অসুখ সংসারে আসিয়া ভগবানকে ভজনা কর।

* unfailing remedy.

হয়। সেই জন্য সাংখ্যাচার্য্যেরা বলেন যে, দুঃখনিবৃত্তির পক্ষে লৌকিক উপায় যেমন যথেষ্ট নহে, বৈদিক উপায়ও তেমনই যথেষ্ট নহে *। তবে দুঃখ-নিবৃত্তির প্রকৃষ্ট উপায় কি? সেই উপায়নির্দ্ধারণের জন্যই সাংখ্য শাস্ত্রের প্রবৃত্তি।

সাংখ্যদর্শনের মতে, দুঃখনিবৃত্তির প্রকৃষ্ট উপায়—জ্ঞান।

"জ্ঞানান্ মুক্তিঃ"—সাংখ্য-সূত্র; ৩।২৩।

কিসের জ্ঞান? প্রকৃতি ও পুরুষের বিবেক, বা পার্থক্য-জ্ঞান †।

"তচ্চ (কৈবল্যম্) সত্ত্বপুরুষান্যতাখ্যাতিনিবন্ধনম্"।—তত্ত্বকৌমুদী; ২১।

ঈশ্বরকৃষ্ণও বলিয়াছেন,—

"তদ্বিপরীতঃশ্রেয়ান্ ব্যক্তাব্যক্তজ্ঞবিজ্ঞানাৎ।"—সাংখ্যকারিকা; ২।

অর্থাৎ, "প্রকৃতি পুরুষের ভেদ সাক্ষাৎকারই শ্রেষ্ঠতর উপায়। উহা ব্যক্ত (বিকৃতি), অব্যক্ত (প্রকৃতি) ও জ্ঞ (পুরুষ)-এর বিশেষ জ্ঞান হইতে উৎপন্ন হয়।"

"এবং তত্ত্বাভ্যাসা ন্নাহস্মি ন মে নাহহমিত্যপরিশেষং।
অবিপর্য্যয়াদ্বিশুদ্ধং কেবলমুৎপদ্যতে জ্ঞানম্॥"—সাংখ্যকারিকা; ৬৪।

---

* দুঃখত্রয়াভিঘাতাৎ জিজ্ঞাসা তদপঘাতকে হেতৌ।
দৃষ্টে সাহপার্থা চেন্নৈকান্তাত্যন্ততোহভাবাৎ॥—সাংখ্যকারিকা; ১।
দৃষ্টবদানুশ্রবিকঃ সহ্যবিশুদ্ধিক্ষয়াতিশয়যুক্তঃ।—ঐ ২।
ন দৃষ্টাৎ তৎসিদ্ধির্নিবৃত্তেঽপ্যনুবৃত্তিদর্শনাৎ॥—সাংখ্যসূত্র। ১।২॥
উৎকর্ষাদপি মোক্ষস্য সর্ব্বোৎকর্ষশ্রুতেঃ॥ ৫॥
অবিশেষশ্চোভয়োঃ॥ ৬॥

† পতঞ্জলি যোগসূত্রে এ কথার অনুমোদন করিয়াছেন। "বিবেকখ্যাতিরবিপ্লবাহানোপায়ঃ।" [সাধনপাদ ২৬]। বিবেকখ্যাতিঃ=সত্ত্বপুরুষান্যতাপ্রত্যয়ঃ; অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুরুষের পার্থক্য-জ্ঞান। এই জ্ঞান চিত্তে বদ্ধমূল হইলে দুঃখনিবৃত্তির উপায় হয়।

গীতাতে ভগবানও এই প্রকৃতি পুরুষের পার্থক্য-জ্ঞানের প্রশংসা করিয়াছেন।

ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানম্ যৎতজ্জ্ঞানম্ মতং মম।

"ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুরুষের যে পার্থক্য জ্ঞান, তাহাই আমার মতে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান।"

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরেবমন্তরং জ্ঞানচক্ষুষা।
ভূতপ্রকৃতিমোক্ষঞ্চ যে বিদুর্যান্তি তে পরম্॥—গীতা; ১৩।৩৫।

"যাঁহারা জ্ঞানচক্ষু দ্বারা ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের ভেদ এবং ভূতসমূহের প্রকৃতি ও মোক্ষ দেখিতে পান, তাঁহারা পরমপদ প্রাপ্ত হয়েন।"

"এইরূপে তত্ত্বের পুনঃপুনঃ চর্চ্চা করিলে সংশয় ও ভ্রম রহিত, বিশুদ্ধ, বিমল, নিঃশেষ জ্ঞান উৎপন্ন হয়; তাহার ফলে, জীব জীবন্মুক্তির অধিকারী হইয়া প্রারব্ধ কর্ম্মের ক্ষয় পর্য্যন্ত দেহ ধারণ করিয়া থাকে।" সে অবস্থায় জীব বুঝিতে পারে যে, আমি কর্ত্তা নই, ভোক্তা নই; আমার কোনও কিছু ব্যাপার নাই। সেই নির্ম্মম, নিরহঙ্কার ব্যক্তির পক্ষে ধর্ম্মাধর্ম্মের বীজভাব নষ্ট হইয়া যায়, অর্থাৎ, তাহারা আর জন্মাদিরূপ ফল উৎপন্ন করিতে সমর্থ হয় না। বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন,—

"ক্লেশসলিলাবসিক্তায়াং হি বুদ্ধিভূমৌ কর্ম্মবীজান্যঙ্কুরং প্রসুবতে তত্ত্বজ্ঞান-নিদাঘনিপীতসকলসলিলায়ামূষরায়াং কুতঃ কর্ম্মবীজানাম্ অঙ্কুরপ্রসবঃ।"

"জলসিক্ত ক্ষেত্রেই বীজ অঙ্কুরিত হয়; প্রখর সূর্য্যকরে যদি সে ক্ষেত্রের সমস্ত জল পরিশুষ্ক হইয়া যায়, তবে সে ঊষরভূমিতে কি আর অঙ্কুরোদ্গম হইতে পারে? অজ্ঞান-সিক্ত বুদ্ধিতেই সঞ্চিত কর্ম্ম ফলোৎপাদনে সক্ষম হয়, কিন্তু যখন তত্ত্বজ্ঞান সমস্ত অবিবেক অপনীত করিয়া চিত্তকে ঊষর করিয়া দেয়, তখন সে ক্ষেত্রে কর্ম্মবীজ অঙ্কুরিত হইবে কিরূপে?" এইরূপ বিবেকীকে লক্ষ্য করিয়া কারিকায় উক্ত হইয়াছে,—

"প্রাপ্তে শরীরভেদে চরিতার্থত্বাৎ প্রধানবিনিবৃত্তৌ।
ঐকান্তিকমাত্যন্তিকমুভয়ং কৈবল্যমাপ্নোতি॥—সাংখ্যকারিকা; ৬৮।

"তাঁহার শরীরের নাশ হইলে প্রকৃতির প্রবৃত্তি নিবৃত্ত হওয়ায়, ঐকান্তিক (অবশ্যম্ভাবী) ও আত্যন্তিক (অবিনাশী) কৈবল্য (দুঃখত্রয়ের নিবৃত্তি) লাভ হয়।" এ অবস্থায়, সুখদুঃখ উভয়ই তিরোহিত হয়।

নোভয়ঞ্চ তত্ত্বাখ্যানে।—সাংখ্যসূত্র; ১।১০৭।

"তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার হইলে সুখ দুঃখ উভয়ই থাকে না।" এইরূপ তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তির সম্বন্ধে গৌড়পাদাচার্য্য এই প্রাচীন বচনটি উদ্ধৃত করিয়াছেন,—

"পঞ্চবিংশতিতত্ত্বজ্ঞো যত্র তত্রাশ্রমে বসেৎ।
জটী মুণ্ডী শিখী বাপি মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥"

"যাঁহার পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের জ্ঞানলাভ হইয়াছে, তিনি যে আশ্রমেই বাস করুন না কেন, তিনি ব্রহ্মচারীই হউন, বা গৃহস্থই হউন, বা আরণ্যকই হউন, তাঁহার মুক্তি সুনিশ্চিত।"

এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব কি কি? বিকারসহিত প্রকৃতি এবং পুরুষ।

"সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ প্রকৃতের্মহান্ মহতোঽহঙ্কারঃ অহঙ্কারাৎ পঞ্চতন্মাত্রাণ্যুভয়মিন্দ্রিয়ং তন্মাত্রেভ্যঃ স্থূলভূতানি পুরুষ ইতি পঞ্চবিংশতির্গণঃ॥"
— সাংখ্যসূত্র ; ১।৬১।

অর্থাৎ, মূল প্রকৃতি, তাহার বিকার মহত্তত্ত্ব, মহতের বিকার অহঙ্কার-তত্ত্ব, অহঙ্কারের বিকার পঞ্চতন্মাত্র ও একাদশ ইন্দ্রিয়, এবং পঞ্চতন্মাত্রের বিকার পঞ্চ মহাভূত, আর পুরুষ,—এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব। তত্ত্বসমাসের ভাষায় বলিতে গেলে, অষ্ট প্রকৃতি (অর্থাৎ, মূল প্রকৃতি, এবং বুদ্ধি, অহঙ্কার ও পঞ্চ-তন্মাত্র, ইহারাও গৌণভাবে প্রকৃতি ; যেহেতু ইন্দ্রিয় ও মহাভূতের উপা-দান।); ষোড়শ বিকার (পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মন, এই একাদশ ইন্দ্রিয় ও ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম, এই পঞ্চ মহাভূত।); আর পুরুষ (ইনি প্রকৃতিও নহেন, বিকৃতিও নহেন।) ঈশ্বরকৃষ্ণ এই কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন,—

"মূলপ্রকৃতিরবিকৃতির্মহদাদ্যাঃ প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ সপ্ত।
ষোড়শকস্তু বিকারো ন প্রকৃতির্ন বিকৃতিঃ পুরুষঃ॥"— সাংখ্যকারিকা ; ৩।

এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা আবশ্যক। প্রথমতঃ, প্রকৃতি কি ? জড়জগতের যে অপরিচ্ছিন্ন, নির্ব্বিশেষ, মূল উপাদান, তাহা-কেই সাংখ্য শাস্ত্রে প্রকৃতি বা প্রধান নামে অভিহিত করা হইয়াছে *। প্রকৃতির আর একটি নাম অব্যক্ত। তাহার কারণ এই যে, সৃষ্টির পূর্ব্বে জগৎ অব্যক্ত (unmanifest) অবস্থায় থাকে। অব্যক্তের ব্যক্তাবস্থার নাম সৃষ্টি। গীতায় ভগবান বলিয়াছেন,—

অব্যক্তাৎ ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে॥— গীতা।

অর্থাৎ, "প্রলয়ের অবসানে, অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে ব্যক্ত জগতের আবির্ভাব হয়, এবং সৃষ্টির অবসানে ব্যক্ত জগতের অব্যক্ত প্রকৃতিতে তিরোভাব হয়।"

---

* Eternal homogeneous matter.

পরিচ্ছিন্নং ন সর্ব্বোপাদানম্।—সাংখ্যসূত্র ; ১।৭৬।

সমস্তের উপাদান প্রধান, পরিচ্ছিন্ন নহে।—বিজ্ঞানভিক্ষু। প্রকৃতেরাদ্যোপাদানতা।—সাংখ্যসূত্র ; ৬।৩২। প্রকৃতিই জগতের আদ্য উপাদান (Primary material)

তত্ত্বসমাসে এই অনুলোমক্রমে আবির্ভাবকে "সঞ্চর" ও বিলোমক্রমে তিরোভাবকে "প্রতিসঞ্চর" বলা হইয়াছে *।

প্রকৃতির একটি নাম "অজা"। তাহার কারণ এই যে, প্রকৃতির পরিণাম হইয়া রূপান্তর হয় মাত্র; প্রকৃতির আদি অন্ত নাই †। কারণ, প্রকৃতি নিত্য সৎ বস্তু। সাংখ্যমতে সতের উৎপত্তিও নাই, বিনাশও নাই। সাংখ্যেরা বলেন,—

"নাসদ্ উৎপদ্যতে ন সদ্ বিনশ্যতি।"

"অসতের উৎপত্তি নাই; সতের বিনাশ নাই।"

গীতা এ মতের অনুমোদন করিয়াছেন—,

"নাসতো বিদ্যতে ভাবঃ নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।"—গীতা।

"অসতের ভাব হয় না; সতের অভাব হয় না।"

"প্রকৃতিপুরুষয়োরন্যৎ সর্ব্বমনিত্যম্।"—সাংখ্যসূত্র; ৫।৭২।

"প্রকৃতিপুরুষই নিত্য, আর সমস্ত অনিত্য।"

বিজ্ঞানভিক্ষু এই কথার সমর্থন করিয়া এই বচনটি উদ্ধৃত করিয়াছেন,—

"অব্যক্তং কারণং যৎ তৎ নিত্যং সদসদাত্মকং।
প্রধানং প্রকৃতিশ্চেতি যদাহুস্তত্ত্বচিন্তকাঃ॥"

"জগতের যে অব্যক্ত কারণ, তাহা নিত্য, তাহা সৎ, অথচ অসৎ (কারণ, তাহা অনাদি ও অনন্ত হইয়াও বিকারশীল); তত্ত্বজ্ঞানীরা তাহাকে প্রধান ও প্রকৃতি আখ্যা প্রদান করেন।" গীতাতে ভগবান এ কথার সমর্থন করিয়াছেন,—

"প্রকৃতিং পুরুষং চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি।
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্॥"—গীতা; ১৩।২০।

* সৃষ্টির ক্রম এইরূপ; প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কারতত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব হইতে পঞ্চতন্মাত্র ও একাদশ ইন্দ্রিয়, এবং পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চমহাভূতের আবির্ভাব হয়। আর প্রলয়ের ক্রম ইহার বিপরীত; প্রথম পঞ্চমহাভূত ও একাদশ ইন্দ্রিয় পঞ্চতন্মাত্রে বিলীন হয়, পরে পঞ্চতন্মাত্র অহঙ্কারতত্ত্বে বিলীন হয়, এবং অহঙ্কারতত্ত্ব মহত্তত্ত্বে ও মহত্তত্ত্ব প্রকৃতিতে বিলীন হয়।

† অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাম্ স্বরূপাঃ।—শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্। প্রকৃতি একা, প্রকৃতি অজ, প্রকৃতি লোহিতশুক্লকৃষ্ণা (ত্রিগুণময়ী); প্রকৃতি তুল্যজাতীয় বিবিধ বিকারের সৃষ্টিকর্ত্রী।

"প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়কেই অনাদি জানিবে; সমস্ত বিকার ও গুণ, প্রকৃতি হইতে সমুদ্ভূত জানিবে।"

এ কথা পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের অনুমোদিত। দার্শনিকপ্রবর হার্বার্ট স্পেন্সার (Herbert Spencer) লিখিয়াছেন, "ম্যাটার-(matter)-এর উৎপত্তিও হয় না, বিনাশও হয় না; কেবল অবস্থান্তর হয় মাত্র *।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞান বহুদিন অবধি বিশ্বাস করিতেন যে, জড় জগৎ ৭০টি মূল ভূতের (elements) সংযোগে ও সংহননে রচিত। এই সকল মূল ভূতের পরমাণুকে তাঁহারা পরস্পর স্বতন্ত্র ও নিত্য মনে করিতেন। কিন্তু বৈজ্ঞানিকের বরাবরই একটা আশা-কল্পনা ছিল যে, এই সমস্ত মূল ভূত এক অদ্বিতীয় উপাদানের, এক চরম ভূতের পরিণামমাত্র। মনীষী সার উইলিয়ম ক্রুক্‌স্ (Sir William Crookes) এই স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত করেন †। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তিনি প্রতিপন্ন করেন যে, মূলভূতসমূহের পরমাণু, বস্তুতঃ স্বতন্ত্র বা নিত্য নহে। তাহারা এক চরম মহাভূতের বিশেষ বিশেষ সঙ্ঘাতজনিত বিকারমাত্র। তিনি এই চরম ভূতের নামকরণ করেন—প্রোটাইল (Protyle)। এই প্রোটাইল ও প্রকৃতির অনেকটা সাদৃশ্য

---

* Matter never either comes into existence or ceases to exist. * * The seeming annihilations of matter turn out on close observation to be only changes of state. It has grown into an axiom of Science, that whatever metamorphoses matter undergoes, its quantity is fixed. * * The annihilation of matter is unthinckable for the same reason that the creation of matter is unthinkable.

Herbert Spencer's First Principles. The indestructibitliy of matter.

† It is the dream of Science that all the recognised chemical elements will one day be found to be modifications of a single material element.

— *World Life page 48.*

Crooke's chemistry admits that the primary constituents of all matters, of all atoms are identical in their nature and issue from one single basis called. 'Protyle'; their difference of form and appearance, in molecules and compound bodies being only the result of a difference in distribution or position.—*Dr. Marque's Scientific corroborations. page 11.*

আছে *। ক্রুক্‌সের মত এখন বৈজ্ঞানিকসমাজে বিশেষ সমাদৃত হইয়াছে। ইংলণ্ডের সর্ব্বপ্রধান বৈজ্ঞানিক লর্ড কেলভিন (Lord Kelvin) এই মতের অনুমোদন করিয়াছেন। বৈজ্ঞানিকশিরোমণি নিকোলা টেস্‌লা (Nikola Tesla) এই মতকে সর্ব্ববাদিসম্মত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এতএব, সমস্ত জড়পদার্থ যে এক অদ্বিতীয়, নির্ব্বিশেষ, চরম উপাদানের বিকারে গঠিত, এ মত এখন বিজ্ঞানের একটি অবিসংবাদিত সত্যে পরিণত হইয়াছে †।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, যে প্রকৃতি গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা; (State of equilibrium) এই গুণত্রয়ের নাম সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। সাংখ্যেরা বলেন যে, যেমন জীবদেহে কফ, বাত ও পিত্ত, এই তিন বিরোধী গুণ সর্ব্বদা সংগ্রাম করিতেছে, সেইরূপ, জগতের মূল উপাদান প্রকৃতিতেও এই তিন বিরোধী গুণ একে অন্যকে পরাভব করিবার জন্য সর্ব্বক্ষণ উদ্‌যুক্ত রহিয়াছে। এই সংগ্রামে কখন সত্ত্ব বিজয়ী হইয়া প্রকাশ, বা সুখ, বা লঘুতা উৎপাদন করিতেছে; কখনও রজঃ প্রবল হইয়া প্রবৃত্তি, বা দুঃখ, বা চাঞ্চল্য উৎপাদন করিতেছে; আবার কখন বা তমঃ উৎকট হইয়া নিয়ম, বা মোহ, বা গুরুত্ব উৎপন্ন করিতেছে। ফলতঃ, এই তিন গুণ প্রকৃতির স্বভাবসিদ্ধ তিনটি বিরোধী প্রবণতা (tendency)। তমঃ=resistance বা inertia; রজঃ=

---

* কিন্তু Protyle ও প্রকৃতি এক পদার্থ নহে। Protyle স্থূল জগতের চরম উপাদান। বিজ্ঞান স্থূল জগতের অধিক আর কিছু মানে না, অতএব বৈজ্ঞানিকের চক্ষে Protyleই প্রকৃতিস্থানীয়। বস্তুতঃ কিন্তু স্থূল জগতের উপর সূক্ষ্মজগৎ, এবং তাহারও উপর কারণজগৎ রহিয়াছে। স্থূল জগতের যাহা Protyle বা চরম উপাদান, সূক্ষ্ম জগতের চরম উপাদানের তুলনায় তাহা মূলভূত নহে; আবার সূক্ষ্ম জগতের যাহা চরম উপাদান, কারণজগতের অতি-সূক্ষ্ম উপাদানের তুলনায় তাহাও মূলভূত নহে। এই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কারণজগতের যাহা চরম উপাদান, তাহার নির্ব্বিশেষ, অব্যাকৃত, অব্যক্ত চরম অবস্থার নাম প্রকৃতি। অতএব Protyleএ ও প্রকৃতিতে অনেক প্রভেদ।

* According to the adopted theory, first clearly formulated by Lord kelvin, all mattar is composed of a primary substance of inconceivable tenuity vaguely designated by the word 'Ether' - * * * All matter then is merely whirling Ether. By being set in movement, Ether becomes matter perceptible to our senses; the movement, arrested the primary substance reverts to its normal state and becomes imperceptible.

activity, এবং সত্ব=harmony। প্রলয়কালে এই তিন গুণ সাম্যাবস্থায় থাকে; অর্থাৎ, তিনটি প্রবণতা সমান বলে বলী হয়; কেহ কাহাকে অভিভব করিয়া উৎকট হইতে পারে না।

সাংখ্যেরা বলেন যে, প্রকৃতির স্বভাবই পরিণাম। প্রকৃতি একক্ষণও পরিণামগ্রস্ত না হইয়া থাকিতে পারে না *। সেই জন্য প্রকৃতির সাম্যাবস্থার স্বতঃই বিচ্যুতি ঘটে। এই পরিণামের জন্য প্রকৃতি কারণান্তরের অপেক্ষা করে না। প্রকৃতির সাম্যাবস্থা বিচ্যুত হইলে তাহার যে প্রথম পরিণাম হয়, তাহার নাম মহত্তত্ব। গীতাতে ইহাকে 'মহদ্‌ব্রহ্ম' বলা হইয়াছে। মহত্তত্বও বিকার প্রাপ্ত না হইয়া থাকিতে পারে না। মহত্তত্বের বিকারের নাম অহঙ্কার-তত্ব। অহঙ্কারতত্বও স্বতঃই পরিণাম প্রাপ্ত হয়। তাহার ফলে, পঞ্চতন্মাত্র বা নির্ব্বিশেষ সূক্ষ্ম পঞ্চ মহাভূতের আবির্ভাব হয়। এই পঞ্চতন্মাত্র যথাক্রমে শব্দতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র, রসতন্মাত্র ও গন্ধতন্মাত্র। তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে একাদশ ইন্দ্রিয়েরও উৎপত্তি হয়।

"প্রকৃতের্ম্মহান্ ততোহহঙ্কারস্তস্মাৎ গণশ্চ ষোড়শকঃ।"—সাংখ্যকারিকা; ২২।

এই সপ্ত তত্বই তন্ত্রোক্ত আদি, অনুপাদক, আকাশ, বায়ু, তেজঃ, অপ্‌ ও ক্ষিতি তত্ব। ইহারা যথাক্রমে জড়ের স্থূল হইতে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অবস্থা। এ বিষয়ে ভাগবত এইরূপ বলিতেছেন,—

"অণ্ডকোষে শরীরেহস্মিন্ সপ্তাবরণসংবৃতে।
বৈরাজঃ পুরুষো যোহসৌ স এব ধারণাশ্রয়ঃ॥"—শ্রীমদ্ভাগবত।

অর্থাৎ, "এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিরাট পুরুষের শরীর। ইহার পর পর ৭টি স্তর আছে। সেই স্তর কয়টি যথাক্রমে ক্ষিতি, অপ্‌, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম, অহঙ্কার ও মহত্তত্ব †।

---

* প্রকৃতি যদি সর্ব্বদাই পরিণামশীল হয়, তবে প্রলয়কালে মহত্তত্ব প্রভৃতির আবির্ভাব হয় না কেন? এ আপত্তির উত্তরে সাংখ্যেরা বলেন যে, প্রকৃতির দ্বিবিধ পরিণাম হইয়া থাকে—সদৃশ পরিণাম ও বিসদৃশ পরিণাম। প্রলয়কালে সদৃশ পরিণাম হয়, অর্থাৎ সত্ব সত্বরূপে, রজ রজোরূপে ও তমঃ তমোরূপে পরিণত হয়। আর সৃষ্টিকালে প্রকৃতির বিসদৃশ পরিণাম হয়। তাহার ফলে, সাম্যাবস্থার বিচ্যুতি হইয়া মহত্তত্ব প্রভৃতির আবির্ভাব হয়।

† আধুনিককালে সাংখ্যেরা মহত্তত্ব অর্থে সমষ্টিবুদ্ধি ও অহঙ্কার অর্থে সমষ্টি অভিমান বুঝেন। ইহা সঙ্গত মনে হয় না। এ সম্বন্ধে অধ্যাপক ম্যাক্স্‌মুলার (Max Muller) সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন; কিন্তু কোনও সমীচীন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই।

সাংখ্যেরা ঈশ্বর স্বীকার করেন না। তত্ত্বসমাসে ও কারিকায় ঈশ্বরের কোন কিছু প্রসঙ্গ নাই। সাংখ্যপ্রবচনসূত্রে স্পষ্টতঃ ঈশ্বরের প্রতিষেধ করা হইয়াছে। প্রকৃতির পরিণামে যে ঈশ্বরের কিছুমাত্র সম্পর্ক আছে, ইহা তাঁহারা অস্বীকার করেন। তাঁহারা বলেন, প্রকৃতি স্বতঃই পরিণত হয়। প্রকৃতি জড় অচেতন হইলেও পুরুষের ভোগ ও মোক্ষ সম্পন্ন করিবার জন্য জগৎ সৃষ্টি করে।

"প্রধানসৃষ্টিঃ পরার্থং স্বতোঽপ্যভোক্তৃত্বাৎ উষ্ট্রকুঙ্কমবহনবৎ॥ ৫৮॥
অচেতনত্বেঽপি ক্ষীরবৎ চেষ্টিতম্ প্রধানস্য॥ ৫৯॥
কর্ম্মবদ্‌দৃষ্টের্বা কালাদেঃ॥ ৬০॥"—সাংখ্যপ্রবচনসূত্র; ৩।

অর্থাৎ, "প্রকৃতি স্বতঃই জগৎ সৃষ্টি করে; কিন্তু সে সৃষ্টি নিজের জন্য নহে—পরের জন্য। উষ্ট্রের কুঙ্কুমবহনের ন্যায়। তাহার উদ্দেশ্য জীবের ভোগ ও মোক্ষসাধন। আপত্তি হইতে পারে যে, অচেতন প্রকৃতি কিরূপে সৃষ্টিকার্য্যে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইবে? তদুত্তরে সাংখ্যেরা বলেন যে, যেমন দুগ্ধ স্বতঃই দধিরূপে পরিণত হয়, অথবা যেমন এক ঋতুর পর আর এক ঋতু স্বতঃই প্রবর্ত্তিত হয়, প্রকৃতির পরিণামও সেইরূপ। এ সম্বন্ধে সাংখ্যকারিকা এইরূপ বলেন,—

"বৎসবিবৃদ্ধিনিমিত্তম্ ক্ষীরস্য যথা প্রবৃত্তিরজ্ঞস্য।
পুরুষবিমোক্ষনিমিত্তং তথা প্রবৃত্তিঃ প্রধানস্য॥—সাংখ্যকারিকা; ৫৭।

অর্থাৎ, বৎসের পুষ্টির নিমিত্ত যেমন অচেতন দুগ্ধের প্রবৃত্তি হয়, সেইরূপ পুরুষের মুক্তির নিমিত্ত অচেতন প্রকৃতির প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। এই কারিকার টীকায় হোরেস্ উইলসন (Horace Wilson) এ সম্বন্ধে সাংখ্যমত এইরূপে বিশদ করিয়াছেন,—প্রকৃতির আরম্ভ স্বতঃসিদ্ধ; তাহার জন্য প্রকৃতি কোন স্বতন্ত্র চেতন কর্ত্তা বা অধিষ্ঠাতার (ঈশ্বর বা ব্রহ্মাদির) অপেক্ষা

Buddhi is genrally taken in its subjective or psychological sense; but it is impossible that this should have been its original meaning in the mind of *Kapila*. * * the *Buddhi* or the *Mahat* must here be a phase in the cosmic growth of the *universe* * * We can hardly help taking this great principle the *Mahat* in a cosmic sense. * * *Ahankara* is in the *Sankhya*, something developed out of primordeal matter, after that matter has passed through *Buddhi* —*Max Muller's Indian Philosophy*, pp 323-27

রাখে না। বাস্তবিক, নিরীশ্বর সাংখ্য শাস্ত্র সৃষ্টি ব্যাপারে কোন বিধাতার হস্তক্ষেপের আবশ্যকতা উপলব্ধি করে না। সে মতে প্রকৃতির প্রবৃত্তি না হইয়া থাকিতেই পারে না। *

মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব ও পঞ্চতন্মাত্রের কিছু পরিচয় দেওয়া হইল; অতঃপর, একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ স্থূল ভূতের কিছু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক।

সাংখ্যেরা বলেন যে, অহঙ্কারতত্ত্বের বিকারে তমোগুণ প্রবল হইলে পঞ্চ-তন্মাত্র, এবং সত্ত্বগুণ প্রবল হইলে একাদশ ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়।

"সাত্ত্বিক একাদশকঃ প্রবর্ত্ততে বৈকৃতাদহঙ্কারাৎ।"—সাংখ্যকারিকা; ২৫।

একাদশ ইন্দ্রিয় কি কি? চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক, এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়; আর হস্ত, পদ, বাক্, পায়ু ও উপস্থ, এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়; এবং মন। মন—উভয়াত্মক; জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়েরই করণ।

পঞ্চতন্মাত্র, (শব্দতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র, রসতন্মাত্র, এবং গন্ধতন্মাত্র) অবিশেষ (homogeneous)। তাহারা যথাক্রমে পঞ্চ স্থূল ভূত, অর্থাৎ, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, অপ্ ও পৃথিবীর উৎপাদন করে। এই সকল স্থূল ভূত অবিশেষ নহে, বিশেষ।

"অবিশেষাদ্ বিশেষারম্ভঃ।

তন্মাত্রাণ্যবিশেষাঃ তেভ্যঃ ভূতানি পঞ্চ পঞ্চভ্যঃ॥"—সাংখ্যকারিকা; ৩৮।

এই পঞ্চ মহাভূত স্থূল বিষয় রূপে ও জীবের শরীররূপে আমাদের উপ-ভোগ্য হয়। ইহাদের মধ্যে কেহ সুখকর, কেহ দুঃখকর, কেহ মোহকর। এই এই অবস্থায় ইহাদিগের পারিভাষিক নাম—শান্ত, ঘোর ও মূঢ়। সাংখ্যেরা বলেন যে, প্রত্যেক বিষয়েই যখন ত্রিগুণের অধিষ্ঠান রহিয়াছে, তখন একই বিষয় অবস্থাভেদে কাহারও প্রতি সুখকর, কাহারও প্রতি দুঃখকর, এবং কাহারও প্রতি মোহকর হইয়া থাকে। দৃষ্টান্তস্থলে তাঁহারা বলিয়া থাকেন

* This (Nature's evolution) is the spontaneous act of Nature. It is not influenced by any external intelligent principle such as the Supreme Being or a subordinate agent as Brahma; it is without (external) cause,

* * The atheistical Sankhya, on the other hand, contends, that there is no occasion for a guiding Providence; but that the activity of Nature for the purpose of accomplishing its end is an intuitive necessity.

The Sankhya karika by Horace H. Wilson M. A. F. R. S.

যে, একই সুন্দরী রমণী প্রিয়জনের সুখের, সপত্নীর দুঃখের, এবং নিরাশ প্রেমিকের মোহের হেতু হইয়া থাকে।

উপরে প্রকৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া চতুর্বিংশতি তত্ত্বের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইল; অতঃপর, পঞ্চবিংশতিতম তত্ত্ব পুরুষের কিছু পরিচয় দেওয়া হইতেছে।

সাংখ্যমতে, প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ই নিত্য, অনাদি ও অপরিচ্ছিন্ন, এবং নিষ্ক্রিয়; উভয়ই স্বতন্ত্র, অলিঙ্গ ও নিরবয়ব *। প্রকৃতি জড়, কিন্তু পুরুষ চেতন; প্রকৃতি পরিণামী, পুরুষ নির্ব্বিকার; প্রকৃতি গুণময়ী, পুরুষ নির্গুণ (গুণাতীত)। প্রকৃতি দৃশ্য, পুরুষ দ্রষ্টা; প্রকৃতি ভোগ্য, পুরুষ ভোক্তা; প্রকৃতি বিষয় (object), পুরুষ বিষয়ী (Subject)। প্রকৃতির গুণের দ্বারাই সমস্ত কর্ম্ম নিষ্পন্ন হয়, পুরুষ অকর্ত্তা—উদাসীন সাক্ষী মাত্র †। পুরুষ কূটস্থ, কেবল (সুখ দুঃখের অতীত, নিত্য মুক্ত) এবং অসঙ্গ ("অসঙ্গোহয়ং পুরুষঃ"—শ্রুতি)। ‡

"নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনং।"

"আত্মা কলাহীন, ক্রিয়াহীন, শান্ত, নিষ্পাপ ও নিরঞ্জন।"

---

* মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি ইহা'র ঠিক বিপরীত; অর্থাৎ, অনিত্য, সাদি, পরিচ্ছিন্ন ও সক্রিয়, এবং সাবয়ব, পরতন্ত্র ও লয়শীল।—সাংখ্যকারিকা ১০ দ্রষ্টব্য।

তত্ত্বসমাস ৩। ২৫ দ্রষ্টব্য।

তত্ত্বসমাসের মতে ক্ষেত্রজ্ঞ ও প্রাণ শব্দ পুরুষের একপর্য্যায়ভুক্ত।

† গীতা এ মতের অনুমোদন করেন।

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহহম্ ইতি মন্যতে॥—ভগবদ্গীতা।

প্রকৃতির গুণের দ্বারাই সমস্ত কর্ম্ম নিষ্পন্ন হয়, কিন্তু অহঙ্কারে মূঢ়চিত্ত ব্যক্তি আত্মাকে কর্ত্তা মনে করে।

প্রকৃত্যৈব চ কর্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্ব্বশঃ।
যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্ত্তারং স পশ্যতি॥—ভগবদ্গীতা; ১৩.৩০।

প্রকৃতিই সমস্ত কর্ম্ম সম্পাদন করে, আত্মা কিন্তু অকর্ত্তা; যিনি এইরূপ দেখিতে পান, তিনিই যথার্থদর্শী।

‡ তস্মাচ্চ বিপর্য্যাসাৎ সিদ্ধং সাক্ষিত্বমস্য পুরুষস্য।
কৈবল্যং মাধ্যস্থ্যং দ্রষ্টৃত্বমকর্ত্তৃভাবশ্চ॥—সাংখ্যকারিকা; ১৯।

প্রকৃতি ও পুরুষ পরস্পর সংযুক্ত থাকে। সেই জন্য পুরুষের গুণ প্রকৃতিতে; এবং প্রকৃতির গুণ পুরুষে উপচরিত হয়। সেই জন্য, বস্তুতঃ অচেতন হইলেও প্রকৃতিকে চেতন বলিয়া মনে হয়, এবং বস্তুতঃ কর্ত্তা না হইলেও পুরুষকে কর্ত্তা বলিয়া মনে হয়।

"তস্মাৎ তৎসংযোগাদচেতনং চেতনাবদিব লিঙ্গং।

গুণকর্ত্তৃত্বে চ তথা কর্ত্তেব ভবত্যুদাসীনঃ॥"—সাংখ্যকারিকা; ২০।

গীতাও বলিয়াছেন,—

"পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।"—ভগবদ্গীতা; ১৩।২২।

"পুরুষ, প্রকৃতিতে অবস্থিত হইয়া, প্রকৃতিসম্ভূত গুণ ভোগ করে।"

প্রকৃতি অচেতন, সুতরাং অন্ধস্থানীয়; পুরুষ অকর্ত্তা, অতএব পঙ্গুস্থানীয়। উভয়ে সংযুক্ত হইয়া একে অন্যের অভাব পূরণ করে। তাহাদের সংযোগের ফলে সৃষ্টি সাধিত হয়। সে সৃষ্টির উদ্দেশ্য পুরুষের ভোগ ও মোক্ষসাধন।

"পুরুষস্য দর্শনার্থং কৈবল্যার্থং তথা প্রধানস্য।

পঙ্গ্বন্ধবৎ উভয়োরপিসংযোগস্তৎকৃতঃ সর্গঃ॥"—সাংখ্যকারিকা; ২১।

যাঁহার তত্ত্বজ্ঞান আয়ত্ত হইয়া এই প্রয়োজন সুসিদ্ধ হইয়াছে, তাঁহার সম্বন্ধে প্রকৃতির সহিত পুরুষ সংযুক্ত থাকিলেও আর সৃষ্টি হয় না। দগ্ধবীজ যেমন অঙ্কুরিত হয় না, জ্ঞানাগ্নিদগ্ধ কর্ম্মাশয়ও সেইরূপ সংসার উৎপন্ন করে না।

"দৃষ্টা ময়েত্যুপেক্ষক একো দৃষ্টাহমিত্যুপরমত্যন্যা।

সতি সংযোগেঽপি তয়োঃ প্রয়োজনং নাস্তি সর্গস্য॥"—সাংখ্যকারিকা; ৬৬।

"প্রকৃতের্দ্বিবিধপ্রয়োজনং শব্দবিষয়োপলব্ধির্গুণপুরুষান্তরোপলব্ধিশ্চ। উভয়ত্রাপি চরিতার্থত্বাৎ সর্গস্য নাস্তি প্রয়োজনং।"—ঐ কারিকা; গৌড়পাদভাষ্য।*

"প্রকৃতির পরিণামের দুই প্রয়োজন; প্রথম ভোগ, দ্বিতীয় প্রকৃতি

---

* বিবিক্তবোধাৎ সৃষ্টিনিবৃত্তিঃ প্রধানস্য সূদবৎ পাকে।—সাংখ্যসূত্র—৩।৬৩।

বিমুক্তবোধাৎ ন সৃষ্টিঃ প্রধানস্য লোকবৎ।—ঐ সূত্র—৬।৪১।

অর্থাৎ, পাক নিষ্পন্ন হইলে যেমন পাচক নিবৃত্ত হয়, সেইরূপ প্রকৃতি পুরুষের পৃথক্ত্ব জ্ঞান হইলে প্রকৃতির সৃষ্টিব্যাপার নিবৃত্তি হয়।

নর্ত্তকীবৎ প্রবৃত্তস্যাপি নিবৃত্তিশ্চারিতার্থ্যাৎ—সাংখ্যসূত্র—৩।৬৯

দোষবোধেঽপি নোপসর্পণম প্রধানস্য কুলবধূবৎ।—ঐ সূত্র—৩।৭০।

পুরুষের ভেদ জ্ঞান। যাহার পক্ষে এই উভয় প্রয়োজনই চরিতার্থ হইয়াছে, তাহার পক্ষে সৃষ্টির আবশ্যকতা কি ?" *

এতদূর পর্য্যন্ত সাংখ্যদর্শনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় উপলক্ষে গীতার সহিত যে যে বিষয়ে সাংখ্যমতের ঐক্য আছে, তাহা প্রদর্শিত হইল। পরবর্ত্তী প্রবন্ধে গীতার সহিত সাংখ্যদর্শনের প্রভেদ ও অনৈক্য প্রদর্শিত হইবে।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

সমুদ্রতীরে।

ভিজিগাপত্তনে যাইব বলিয়া প্রাতে বাটী হইতে রওনা হইলাম। আমার এক জন আত্মীয়া রথের সময় পদব্রজে পুরুষোত্তমদর্শনে গিয়াছিলেন। ছেলেবেলায় তাঁহার নিকট পুরীর পথের গল্প শুনিতে খুব ভাল লাগিত। সুবর্ণরেখা, ব্রাহ্মণী ও বৈতরণী যেন বহুপূর্ব্বপরিচিতা। খড়্গাপুর, দাঁতন, জলেশ্বর প্রভৃতি স্থান দেখিয়া তাঁহাদের পথের চটির কথা ভাবিতেছিলাম। সমস্ত দিন হাঁটিয়া চটি পাইলে রাঁধা বাড়া ভুলিয়া কোন কোন দিন হয় ত তাঁহারা ঘুমাইয়া পড়িতেন। গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের সময় সুবর্ণরেখার কূলে কূলে জল। তীব্র স্রোত হেতু পারাপার বন্ধ হওয়ায় অবিশ্রান্ত বৃষ্টির মধ্যে সুবর্ণরেখার বালুকা-সৈকতে দুই দিন কাটাইতে হইয়াছিল। কষ্টের অবধি ছিল না। ছিন্ন বস্ত্রে শোণিতসিক্ত পদ আবৃত করিয়া চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে তিনি পুরী প্রবেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু যখন সেই মহিলা বলিতেন, জগন্নাথ দেবের শ্রীমূর্ত্তিদর্শনে মুহূর্ত্তেই তাঁহার জীবনের সব দুঃখ দূর হইয়াছিল, তখন তাঁহার চক্ষু উজ্জ্বল

---

* এই মর্ম্মে কারিকা বলিতেছেন ;—

রঙ্গস্য দর্শয়িত্বা নিবর্ত্ততে নর্ত্তকী যথা নৃত্যাৎ।
পুরুষস্য তথাত্মানং প্রকাশ্য নিবর্ত্ততে প্রকৃতিঃ॥—সাংখ্যকারিকা—৫৯।
প্রকৃতেঃ সুকুমারতরং ন কিঞ্চিদস্তীতি মে মতির্ভবতি।
যা দৃষ্টাহস্মীতি পুনর্ন দর্শনমুপৈতি পুরুষস্য॥—ঐ—৬১।

অর্থাৎ, 'নর্ত্তকী যেমন দর্শকদিগকে নৃত্য দেখাইয়া নিবৃত্ত হয় ; প্রকৃতিও সেইরূপ, পুরুষকে আপনার রূপ দেখাইয়া নিবৃত্ত হয়। প্রকৃতির অপেক্ষা অধিক সুকুমার আর কিছুই নাই ; কারণ, পুরুষ তাহাকে একবার দেখিলে আর সে পুরুষের দর্শনপথবর্ত্তিনী হয় না।'

হইয়া উঠিত। হায়, সরল বিশ্বাস! সেই স্বর্গগতা পুণ্যাত্মার নীলাচলপথের অবদানকাহিনী মনে করিতে করিতে পুরীর পথের পাশ দিয়া যাইতেছিলাম।

রূপনারায়ণের সেতু দেখিবার জিনিস বটে। সেতুর নিম্নে জলের পরিসর এখন খুব বেশী ছিল না, কিন্তু শুনিতে পাই, ভরা বর্ষায় স্ফীত জলরাশি বহুদূর পর্য্যন্ত স্থলচিহ্ন বিলুপ্ত করিয়া খরবেগে সমুদ্রাভিমুখে ধাবিত হয়। তখন দূর হইতে সেতুটি পাটল বারিরাশির উপর কনকরেখার ন্যায় দেখা যায়।

মেদিনীপুরের কৃষকদিগের ঘরগুলির একটু বৈচিত্র্য আছে। ঘরগুলি কতকটা আমাদের দেশের মন্দিরের ন্যায়। এক স্তর চালের উপর আর একস্তর ছোট চাল উঠিয়াছে, দুইটির মধ্যে একটু ব্যবধান, বোধ হয় বায়ুপ্রবেশের জন্য। গ্রামগুলির চারি দিকে বাঁধ। এক এক স্থানে বাঁধ ভেদ করিয়া সরল জলপ্রণালী চলিয়া গিয়াছে। অল্পপরিসর খালগুলির উপরে ছোট ছোট মনোরম কাষ্ঠ-সেতু। কোথাও বাঁধের নিম্নে মৃণাল-জাল-জটিল বিল। বিলের জলে পদ্মের পাতাগুলি ঊষানিল-সংস্পর্শে একটু একটু দুলিতেছিল। পদ্ম শুধু আমাদের প্রাচ্য দেশের সম্পত্তি। পদ্মের স্নিগ্ধ কোমল গন্ধে প্রাচ্যজীবন এত স্বপ্নময়; প্রাচ্যদর্শনে মায়ার এত প্রভাব। পদ্ম প্রাচ্যজগতের বর্ণবৈচিত্র্যের ও কোমলতার আদর্শ।

কেতকীকুন্তলা উড়িষ্যাকে এই নূতন দেখিলাম না। সেবার সমুদ্রপথে উৎকলে আসিয়াছিলাম। ভাস্কর শিল্প-সমৃদ্ধা উড়িষ্যা, পথিকজনের চির আনন্দ-দায়িনী। অপরূপশ্রী পাষাণপ্রতিমার সৌন্দর্য্যে উৎকলভূমি চির উজ্জ্বল। কত শত বৎসর পূর্ব্বে হিন্দুদিগের সৌন্দর্য্যলালসার মনোরম কাহিনী উৎকল-বিমানস্তম্ভে খোদিত। সংস্কৃত নাটকে ও পুরাতন ভাস্করশিল্পে প্রাচীন হিন্দু জীবনের অস্ফুট আলোকরশ্মি বিকীরিত।

বারিপদরোড্ ষ্টেশন হইতে পাহাড় আরম্ভ হইয়াছে। কটকের যত নিকটে আসিতেছিলাম, পশ্চিমের এই পর্ব্বতমালা ক্রমে ঘন হইয়া আসিতেছিল। পর্ব্বতস্তরের উপর পর্ব্বতস্তর উঠিয়াছে। এই সকল পর্ব্বতের ভিতর দিয়া পুণ্যতোয়া মহানদী, ব্রাহ্মণী ও বৈতরণী প্রবাহিতা। পর্ব্বতের উপত্যকায় উড়িষ্যার করদরাজ্যসমূহ। সন্ধ্যার কুঙ্কুমরাগ শৃঙ্গ হইতে শৃঙ্গান্তরে নামিতেছিল।

হিউয়েনসান্ ওড্র বা উড়িষ্যাদেশের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এই সময়ে উৎকলে মহাযান-শাখাভুক্ত দশ সহস্র ভিক্ষু পরিপূর্ণ এক শত বৌদ্ধ মঠ

ছিল। বৌদ্ধধর্ম্ম ম্লান হইলে, উৎকল হিন্দুদিগের প্রধান তীর্থ বলিয়া পরিগণিত হয়। উৎকলে চারিটি পুণ্যক্ষেত্র বর্ত্তমান। শঙ্খক্ষেত্র বা পুরী, অর্কক্ষেত্র বা কণারক, বীরজাক্ষেত্র বা যাজপুর ও পদ্মক্ষেত্র বা ভুবনেশ্বর। মহানদী উৎকলের গঙ্গা। প্রবাদ আছে, সুকান্তি নামক ঋষির তপস্যায় তুষ্ট হইয়া জহ্নুতনয়া বিন্ধ্য হইতে নির্গত হইয়া মহানদীরূপে সমুদ্রাভিমুখে ধাবিতা হন।

উড়িষ্যা এক সময় রূপনারায়ণ হইতে গোদাবরী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। গ্রীকদিগের বর্ণিত (Desarene) ডিসারিন প্রদেশ উৎকল। এইখানেই পূর্ব্বে হস্তিদন্ত প্রচুরপরিমাণে মিলিত। কেহ কেহ এই গ্রীক কথা দশার্ণের অপভ্রংশ বলিয়া মনে করেন। কিন্তু মেঘদূতের বিকশিতকেতকীকুসুমে পাণ্ডুবর্ণ ও "পরিণতফলশ্যামজম্বুবনান্ত" দশার্ণ বোধ হয়, উড়িষ্যা নয়। রামগিরি হইতে কৈলাসের পথে যাইতে হইলে উৎকলে আসিবার আবশ্যক কি? বিশেষতঃ রঘুবংশে উড়িষ্যা দেশ উৎকল বলিয়াই উল্লিখিত হইয়াছে। হস্তিসেতু দ্বারা কপিশা নদী পার হইলে উৎকলভূপতিরা রঘুর পথপ্রদর্শক হইয়াছিলেন। রঘু উৎকল হইতে কলিঙ্গাভিমুখে প্রস্থান করেন।

তখন উড়িষ্যার ভূপতিরাও শৌর্য্যে ও বীর্য্যে মহিমান্বিত ছিলেন। পুরীর এক জন নৃপতি কাঞ্চীপুরের রাজতনয়ার অসামান্য সৌন্দর্য্যের কথা শুনিয়া বিবাহের প্রস্তাব করিয়া পাঠান। রাজকুমারী বিদ্রূপ ও গর্ব্বের সহিত এই প্রস্তাবের প্রত্যাখ্যান করেন। উৎকলাধিপতি সসৈন্যে কাঞ্চীপুরে উপস্থিত হইয়া সমরান্তে রাজকুমারীকে বন্দিনী করিয়া লইয়া আসেন। সচিবের গৃহে তাঁহার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হয়, এবং তাঁহার গর্ব্বিত উন্নত শির ধূল্যবলুণ্ঠিত করিবার জন্য ঝাড়ুদারের সহিত বিবাহ দিবার আদেশ হয়। কিন্তু সুন্দর মুখের সর্ব্বত্র জয়। সচিব রাজার আদেশ প্রতিপালন করিলেন না। পুরীর রাজা জগন্নাথের সেবায়েত। দেবতার নিকট মানবজীবনের লঘুত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাইবার জন্য রাজারা আপনাদিগকে জগন্নাথদেবের দাস বলিয়া অভিহিত করেন। বৎসরের একদিন পুরীর রাজা অতি সামান্য দীনহীনবেশে সম্মার্জ্জনীহস্তে মন্দিরসংস্কারের জন্য জগন্নাথের নিকট যুক্তকরে দাঁড়াইয়া থাকেন। যাঁহাদিগের শৌর্য্য আছে, তাঁহারা দেবতার নিকট নত হইতে কুণ্ঠিত হয়েন না। বৎসরের সেই দিনে রাজা পুরীর মন্দিরপ্রাঙ্গনে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বৃদ্ধ সচিব রাজতনয়াকে সঙ্গে লইয়া সেখানে পূর্ব্বেই উপস্থিত হইয়াছিলেন। রাজাকে প্রাঙ্গনে প্রবেশ করিতে দেখিয়া তিনি রাজকুমারীকে রাজার নিকট

লইয়া গেলেন। রাজা মুগ্ধনেত্রে দেখিতেছিলেন। সচিব বলিলেন, "আপনি ইহাকে ঝাড়ুদারের সহিত পরিণীত করিবার আজ্ঞা দিয়াছিলেন;—আজ আপনিই ঝাড়ুদার, এই কন্যাকে আপনার হস্তে সমর্পণ করিলাম। প্রভুর আদেশ সেবকের সর্ব্বথা পালনীয়।" বলা বাহুল্য, সেকালের রাজারা নারীরত্নে কখনই বিশেষ বীতস্পৃহ ছিলেন না।

রেলওয়ে টাইম্‌টেব্‌লে খড়্গপুর ও অন্যান্য ষ্টেশনে টাট্‌কা লুচি ও তরকারী পাওয়া যায় পড়িয়া বিশেষ আশ্বস্ত হইয়াছিলাম, কিন্তু সে চাপাটী ও তরকারী বাঙ্গালীর পক্ষে হজম করা কিছু দুরূহ ব্যাপার। ভবিষ্যতে বর্ণনা পড়িয়া, আশা করি, আমাদের ন্যায় কেহই লুচি-মরীচিকায় লুব্ধ হইবেন না।

সন্ধ্যার পর কেশরী বংশের গৌরব ভুবনেশ্বর নয়নপথে পড়িল। সে দিন কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপৎ-চন্দ্রের প্রথম রশ্মি আসিয়া পথিপার্শ্বে একটি মন্দিরের কৃষ্ণ চূড়ায় পড়িয়াছিল।

প্রায় রাত্রি দশটার সময় কাহপাড়াঘাট ষ্টেশনে আসিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখি, চারি দিক জ্যোৎস্নায় ভাসিয়া যাইতেছে। বাম দিকে বিস্তীর্ণ জলরাশির উপর জ্যোৎস্নালোক। চন্দ্রকিরণমথিত চিল্কা হ্রদের জল ললিত রজতধারার ন্যায়। গাড়ী ছাড়িলে মধ্যে মধ্যে বৃক্ষবিচ্ছেদে সেই জ্যোৎস্নায়াত সিত জলরাশি দেখিতে পাইতেছিলাম। বারকুল ষ্টেশনের নিকট চিল্কার ধার দিয়া রেলের লাইন গিয়াছে। দক্ষিণে কিয়ৎহস্তদূরেই পাহাড়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড় চিল্কার ভিতর হইতে উঠিয়াছে। সুদূরে একটি দ্বীপ দেখা যাইতেছিল। সেই শ্যামল-দ্বীপ-সমন্বিত শুভ্র উর্ম্মিহীন জলরাশি স্বামীকার্য্যখচিত হস্তিদন্তের ন্যায়। চারি দিক নিস্তব্ধ। যেন কোন যাদুকরের মোহিনী মায়ায় জলস্থল অকাতরে ঘুমাইতেছিল। পাহাড়গুলি শুধু প্রহরীর ন্যায় নিঃস্পন্দভাবে দণ্ডায়মান।

চল্লিশ মাইল ব্যাপী চিল্কার জল লোনা। বর্ষাকালে নূতন জল পড়িলে চিল্কার জল মিষ্ট হয়। সেই সময় হ্রদ জলচর পক্ষীতে ভরিয়া যায়; স্থানে স্থানে জল পর্য্যন্ত দেখা যায় না। তখন চিল্কা শিকারীদের স্বর্গ।

ভোর বেলা উঠিয়া পাহাড়ের কোণে একখানা ছোট গ্রাম দেখিতে পাইলাম। গ্রামের পাশ দিয়া পাহাড়ের ধারে ধারে মান্দ্রাজের রাস্তা বাঁকিয়া গিয়াছে। রাস্তার দুই ধারে তাল গাছ। পাহাড়ের গায়ে একটি মন্দির। মন্দিরের শুভ্রচূড়া অনেক দূর হইতে দেখা যাইতেছিল। গ্রামের অধিকাংশ

ঘরগুলি গোল; উপরে তালপাতার চাল; দেখিলে মনে হয়, মানবজীবনের ক্ষণভঙ্গুর অবস্থা মনে করিয়া যেন ঘরগুলি নির্ম্মিত হইয়াছে। এই সমস্ত ঘরের তুলনায় আমাদের দেশের কৃষকদিগের ঘর ইন্দ্রভবন।

বিজয়ন গ্রাম ষ্টেশনে "পাহু" বলিয়া হাঁকিতেছিল। পাহু অর্থে দুধ। আর ভাষা বুঝা যায় না। পাণি বলিলে আর জল মিলে না, "নিলু" বলিয়া ডাকিতে হয়। তেলিগু ভাষার সহিত সংস্কৃতজ ভাষার কোনও সাদৃশ্য নাই, এই কথা অনেক দিন হইতেই শুনিয়া আসিতেছিলাম, কিন্তু এক জন শিক্ষিত তেলিগু ভদ্রলোকের মুখে শুনিলাম, তেলিগুও সংস্কৃতের শাখামাত্র। তবে অনেক অনার্য্য কথা তেলিগুতে স্থান পাইয়াছে। তিনি এখনও এ বিষয়ের অনুসন্ধান করিতেছেন। তেলিগু ভাষায় সন্ধ্যার নাম্ সায়াস্তম্, মাংসের নাম মাংসম্, অন্নের নাম অন্নম্। এই প্রকার দুই একটি পরিচিত কথার সহিত অনেক অপরিচিত কথা দেখিতে পাই। 'অম্মা' অর্থে মা;—অনেক স্ত্রীলোকের নামের শেষে অম্মা যুক্ত থাকে। অম্মা, অম্বা ও উমা বোধ হয় একই কথা।

শুধু ভাষা বিভিন্ন নয়, এ দেশের লোকের আচার ব্যবহারও কিছু নূতন। ষ্টেশনে কয়েকটি বিচিত্রবসনপরিহিতা মদ্রজা দেখিলাম। মস্তকে অবগুণ্ঠন নাই। তাঁহারা বেশ স্বচ্ছন্দে ও স্বাধীনভাবে ইতস্ততঃ বেড়াইতেছিলেন। তাঁহারা আমাদের দেশের স্বাধীনতাপ্রাপ্তা কুমারীদিগের মতন নহেন। এই স্বাধীনতা তাঁহাদের বসনের ন্যায় বেশ মানাইয়াছিল। আমাদের দেশের স্ত্রীস্বাধীনতা যেন কষ্টকল্পিতা কবিতা। ভাব আছে, ভাষা আছে, তবুও যেন মিষ্ট লাগে না। নকলের যে দুর্দ্দশা হইয়া থাকে, আমাদের দেশের স্ত্রী স্বাধীনতারও সেই দুর্দ্দশা। এখানে পথে, সমুদ্রতীরে, দেবতাগৃহে অবগুণ্ঠনবিরহিতা ভদ্রবংশীয়া রমণীদিগকে সচ্ছন্দে নগ্নপদে বিচরণ করিতে দেখিলে খুব স্বাভাবিক বলিয়াই বোধ হয়। বিধবা না হইলে এখানে কোনও হিন্দুরমণী অবগুণ্ঠন গ্রহণ করেন না। শুধু একখানা রঙ্গিন্ কাপড়ে ও কাঁচলীতে যে সৌন্দর্য্য আছে, অপরূপ সেমিজ ও উঁচু-হিল-ওয়ালা জুতায় তাহা পাওয়া দুর্ল্লভ। ভ্রমরকৃষ্ণ চুলের উপর টুপি, হায় কি বিড়ম্বনা!

তেলিগু ভদ্রলোকের বাম প্রকোষ্ঠে স্বর্ণবলয়, কাহারও কর্ণে হীরার ফুল। শিক্ষিত কি অশিক্ষিত প্রায় সকল লোকই নগ্নপদ।

বেলা নয়টার সময় আমাদের গন্তব্যস্থান ওয়ালটেয়ারে পঁহুছিলাম। ওয়ালটেয়ার ভিজিগাপত্তন হইতে তিন মাইল দূরে—ভিজিগাপত্তনের উপনগর বলিলেও হয়।

ওয়ালটেয়ার সহরটি শিলাময় উচ্চভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত। ষ্টেশনের নিকট হইতেই পথ উচ্চে উঠিয়াছে। সমুদ্রের বেলাভূমির নিকট আসিয়া পুনর্ব্বার নীচে নামিতে হয়। এতক্ষণ গ্রীষ্মে ছট্‌ফট্ করিতেছিলাম, সাগরের নিকটবর্ত্তী হইলে সমুদ্রানিলে শরীর স্নিগ্ধ হইল। দূরবর্ত্তী ট্রেনের শব্দের ন্যায় সমুদ্রের অবিরাম কল্লোলধ্বনি শুনিতে পাইতেছিলাম। ক্লবের নিকট আসিতেই মেঘমেদুরিত অম্বরের ন্যায় পূর্ব্ব দিকে ঘননীল ভারত মহাসাগর দেখিতে পাইলাম। আমাদের সঙ্গের এক জন চাকর বলিয়াছিল, "সমুদ্রে বড় শেওলা হইয়াছে। বোধ হয়, জলে স্রোত নাই!" সমুদ্র এতই নীল যে, এই প্রকার ভ্রমে বিস্মিত হইবার কারণ অল্প।

আমি যাঁহাদের সঙ্গে আসিয়াছিলাম, তাঁহাদের বাসা সমুদ্রের অতি সন্নিহিত। গৃহমধ্য হইতে তাল গাছের ভিতর দিয়া সমুদ্রের ফেনিল বারিরাশি দেখিতে পাওয়া যায়। মধ্যে মধ্যে ধীবরদিগের একখানি ক্ষুদ্র পালের নৌকা চলিয়া যাইতে দেখিলে বোধ হয়, যেন একটা বড় ফেনা দুলিতে দুলিতে ভাসিয়া যাইতেছে। যে দিন বহু দূরের উর্ম্মিগুলিও স্ফটিক-শুভ্র ফেনমুকুট পরিয়া রৌদ্রকিরণে ঝক্‌মক্ করিত, সে দিন বুঝা যাইত, সমুদ্রের অগাধ বারিরাশি বাত্যাবিকম্পিত ও চঞ্চল।

প্রভাতে উঠিয়া সমুদ্রের ধারে যাইতাম। ওয়ালটেয়ারের নীচে সমুদ্র-বেলা উপলসঙ্কুল। শিলাখণ্ডের উপর ফেনিল তরঙ্গ ঝাঁপাইয়া পড়ে, এবং সহস্র খণ্ডে বিভক্ত হইয়া ছোট কাল পাথর ও বালির ভিতর দিয়া কুলু কুলু শব্দে পুনর্ব্বার ফিরিয়া যায়। একটু অসাবধান হইলেই সমুদ্রতরঙ্গে অভিষিক্ত হইবার সম্ভাবনা। জল সরিয়া যাইলে কখনও কখনও নানা রঙ্গের ছোট ছোট ঝিনুক বালির উপর পড়িয়া থাকে। বালির মধ্যে দু' একখানি ক্ষুদ্র রঙ্গিন ঝিনুক যেন পুষ্প-পরাগরঞ্জিত কুসুমকেশরের ন্যায়,—মনে হয়, যেন হাতের ভরও সহিবে না।

সমুদ্রের জলে এক এক দিন স্নান করিতে গিয়া বালি মাখিয়া ঘরে ফিরিয়া আসিতাম। প্রাণপণে মাটি ধরিয়া বসিতাম; মাথার উপর দিয়া ঢেউ চলিয়া যাইত। স্কুলের ছেলেদের মতন আমরা তরঙ্গের সহিত ছুটাছুটি করিতাম। কিন্তু এক একবার একটা বড় ঢেউ আসিয়া আমাদিগকে ডুবাইয়া দিত। কখনও বা একটা বড় শিলাখণ্ডের উপর উঠিয়া চারি দিকের সেই কল্লোলময় বারিরাশি দেখিতাম। ফেনিল শুভ্র তরঙ্গ আসিয়া পায়ের কাছে লুটাইয়া

পড়িত। পাথরের গায়ে সবুজ শৈবাল। পাথরের ফাটালের ভিতর ছোট ছোট কাঁকড়া। তাহাদিগকে স্থানচ্যুত করা দুরূহ ব্যাপার।

সমুদ্রের ধার দিয়া ওয়ালটেয়ার হইতে ভিজিগাপত্তনে একটি রাস্তা গিয়াছে। রাস্তার এক ধারে নারিকেল গাছের সারি। নারিকেল গাছের ভিতর দুই একটা ছোট বাড়ী। রাস্তার এক পার্শ্বে ইষ্টকনির্ম্মিত অর্দ্ধচক্রাকার একটি বসিবার স্থান। স্থানটির নাম "স্ক্যাণ্ডাল্ পয়েণ্ট"। বাস্তবিক সন্ধ্যার সময় সমুদ্রের নীল চঞ্চল বারিরাশি দেখিতে দেখিতে দু' চার জন মিলিয়া পর-নিন্দা করিবার বেশ উপযুক্ত স্থান! বোধ হয়, পাঁচ মিনিটে গল্প বেশ জমাট হইয়া আসে। ভাষা বা ভাবের জন্য পরস্পরের মুখ চাওয়াচাই করিতে হয় না। সমুদ্রসৈকত হইতে বালি উড়িয়া মধ্যে মধ্যে রাস্তাটি ঢাকিয়া যায়। সেই জন্য দুই ধারে কেয়াগাছ রোপণ করিবার ব্যবস্থা হইতেছে। ভবিষ্যতে কেয়াগাছের বেড়া ভিত্তির কাজ করিবে।

ভিজিগাপত্তনের বাজারের এক ধারে এক উচ্চ গণ্ডশৈলের উপর তিনটি ধর্ম্মমন্দির,—খৃষ্টানের, মুসলমানের ও হিন্দুর। হিন্দুর মন্দিরটি সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র। ইংরাজ রাজার ন্যায় ইংরাজের গির্জ্জা সগর্ব্বে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ শৃঙ্গে দাঁড়াইয়া আছে। বাজারের মধ্যে দেশীয় খৃষ্টান ও ফিরিঙ্গীদের জন্য আর একটি ছোট গির্জ্জা। গির্জ্জার সম্মুখেই হিন্দুদিগের পাঠাগার। প্রতি রবিবার সন্ধ্যায় এখানে হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা হয়। এক দিন এখানকার হিন্দু কলেজের প্রধান অধ্যাপক শাস্ত্রীর গীতা ও পরজন্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা শুনিয়া-ছিলাম। শ্রোতার মধ্যে অনেকগুলি বৃদ্ধ। সকলেই অতি আগ্রহের সহিত গীতামৃত পান করিতেছিলেন। এখানকার যুবকদিগের মুখেও সেই যৌবন-বার্দ্ধক্যের ছায়া। বৃদ্ধেরা যে বক্তৃতা শুনিতে আসেন, ইহা নূতন বটে বক্তৃতা শ্রবণ করিবার ভারটা আমাদের দেশে যুবকদের উপরই ন্যস্ত। এখানে রাজনৈতিক আন্দোলন অপেক্ষা ধর্ম্মচর্চ্চাই লোকের অধিকতর প্রিয় বলিয়া বোধ হয়। জানকীরামণ্নামক এক জন যুবকের সহিত আমাদের আলাপ হইয়া-ছিল। লোকটি প্রায় ছয় ফিট্ উচ্চ। চেহারাটি বেশ সৌম্য। হাতে সোনার বালা। এই অলঙ্কারের জন্য তাঁহার বাঙ্গালী বন্ধুরা তাঁহাকে খুব বিদ্রূপ করিতেন। তিনি আমাদের দেশের শিক্ষাপ্রণালী জানিবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত। শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বসুর উপর তাঁহার অচলা ভক্তি। আমাদের

মনে একটু আনন্দ হয়। বাহুবলে ক্ষীণ হইলেও আমাদেরই দুই এক জন ভারতবাসীর মনোরাজ্যের উপর আধিপত্য করিতেছেন, ইহা আমাদের পক্ষে গৌরবের কথা।

এখানে দেবতাও অনেক নূতন রকমের। শিবের অনেক অবতারের এখানে পূজা হইয়া থাকে। ভিজিগাপত্তনের বাজারে পার্ব্বতীর এক মূর্ত্তি দেখিলাম। কিন্তু নাম সম্পূর্ণ নূতন। সে রকম মূর্ত্তিও আমাদের দেশে নাই। কাল পাথরের চতুর্ভুজা মূর্ত্তি। কিঞ্চিৎ প্রণামী-প্রদানান্তে আমরা আবীর ও নির্ম্মাল্য দ্বারা অভ্যর্থিত হইয়াছিলাম।

এখানকার প্রায় সকল ভদ্রলোকের পরিধান দেশী বস্ত্র। বিলাতী কাপড়ের জুলুম এখানে খুব কম। মোটা দেশী কাপড় বিলাতী কাপড়ের সঙ্গে সমান দরে পাওয়া যায়। এখন রেল হইয়াছে। বোধ হয়, দেশী কাপড় আর টিঁকিবে না। তবে একমাত্র ভরসা, এ দেশের লোকের স্বদেশভক্তি ও 'বিদেশী ডেভিলে'র উপর ঘৃণা আমাদের অপেক্ষা প্রবল।

বাজারে পাঁউরুটী ও লেমনেড্ সোডার খুব চলন। প্রায় প্রত্যেক গৃহস্থের গৃহে ইজি-চেয়ার। এমন কি, যাহারা অতি সামান্য বেতনভুক, তাহাদের ঘরেও দুই একখানি চেয়ারের অভাব নাই। এক জন প্রবাসী বাঙ্গালী বলিতেন, এই দেশে ইংরাজ আসিয়া Calibanized করিয়াছেন।

এখানে বিশিষ্ট ঘরের মেয়েরা অনেক বয়স পর্য্যন্ত বিদ্যালয়ে যান। রবি বর্ম্মার চিত্রিত মেয়েদের মুখের মতন দুই একখানি মুখ দৃষ্টিপথে পড়ে। এই ধরণের ভারি মুখ আমাদের দেশে বিরল। কলিঙ্গকুমারীদের কোমল অঙ্গ-সৌষ্ঠব ভাস্করের প্রার্থনীয়। গায়ের অলঙ্কার অনেক নূতন রকমের। কাপড়ের একটি অঞ্চল কাছার ন্যায় ঘুরাইয়া দেওয়া। সেই জন্য সম্মুখের কাপড় ঢিলা পায়জামার মতন দেখায়। কোমরে প্রায় সোনার বা রূপার পেটি দিয়া কাপড় বাঁধা। লজ্জানিবারণের জন্য সেমিজের দরকার হয় না। ভিজিগাপত্তন সহরে বারান্দায় বসিয়া একজন বর্ষীয়সী কি তেলিগু বই পড়িতেছেন, চার পাঁচ জন যুবতী তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিয়া একাগ্রমনে পুস্তক-পাঠ শুনিতে ব্যস্ত, এরূপ দৃশ্য দুর্ল্লভ নহে।

ভিজিগাপত্তনের 'ব্যাক-ওয়াটার' বা 'খাড়ি' পার হইলে 'ডল্‌ফিন্‌স্ নোজ্' উঠিবার রাস্তা। তিমি মাছের মাথার ন্যায় একটা পাহাড় সমুদ্রের ভিতর পর্য্যন্ত গিয়াছে; তাহার নাম ডল্‌ফিন্‌স্ নোজ্। সমুদ্রের বীচিমালা গম্ভীর-

গর্জ্জনে অবিরাম পর্ব্বতের সানুদেশে আঘাত করিতেছে। এক একবার বিকশিত কাশকুসুমের ন্যায় খানিকটা ফেন পর্ব্বতগাত্রে রহিয়া যাইতেছে, এবং নিমেষেই বিলীন হইতেছে। পাহাড়ের উপর হইতে সমুদ্রের গর্জ্জন শুনা যায় না। সুদূরে সমুদ্রের নীল তরঙ্গ আকাশের নীল রঙ্গের কোমল তরঙ্গের সহিত মিশিয়া গিয়াছে। সেখানে আকাশে ও সমুদ্রে কোনও পার্থক্য নাই। মেঘচুম্বিত পয়োধি যেন কবির শরীরিণী কল্পনা। মধ্যে মধ্যে সমুদ্রের জলের রঙ্গ পরিবর্ত্তিত হইত। তীরের নিকটে জল কখন কখন মরকতমণিসদৃশ হরিত—তাহার পর দূরের জল ঘন-নীল। ওয়াল্‌টেয়ারের উত্তরে সমুদ্রের একটি কোর (core), তাহার এক পার্শ্বে হনুমৎকা পাহাড়। সেখানে সমুদ্রতরঙ্গের বিক্রম অপেক্ষাকৃত অল্প। এই কোরের ধারে ধীবর-দিগের বাস। ধীবরদিগকে দেখিলে পুরাতনকালের অসুরদিগের কথা মনে হয়। এক এক জনের শারীরিক সৌন্দর্য্য নিঁখুত। রং মসীকৃষ্ণ। কঠিন মাংসপেশী অসীম শক্তির পরিচায়ক। এই প্রকার লোকের সহিত আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা বোধ হয় ভারতবর্ষের আধিপত্য লইয়া সংগ্রাম করিয়াছিলেন। সীমাচল মন্দিরে ও ভুবনেশ্বরে এই অসুর হননের কাহিনী প্রস্তরে খোদিত। জনৈক অশ্বারোহীর অশ্বের পদতলে এক জন অসুর মর্দ্দিত, এই প্রকার প্রস্তর-প্রতিকৃতি পূর্ব্বোক্ত উভয় মন্দিরে দেখা যায়। এখন যে প্রকার শ্বেতকৃষ্ণের সংগ্রাম চলিতেছে, এই প্রকার একটা বহুশতাব্দীব্যাপী তুমুল বিরোধ বহুপূর্ব্বে হিন্দুস্থানে আর্য্য ও অনার্য্যের মধ্যে চলিয়াছিল। এই অসুরদিগের নিধন-কামনায় আমরা দেবতাদিগের নিকট প্রার্থনা করিতাম। সুতরাং শ্বেতাঙ্গেরা আমাদের উপর অত্যাচার করিলে আমাদের বিস্মিত হইবার কারণ নাই। আমরাও এই বেদবিহীন অনার্য্যদিগকে এই প্রকার ঘৃণা করিতাম। আমরা এখন পূর্ব্বের কর্ম্মফল ভোগ করিতেছি মাত্র।

ধীবরদের নৌকা তিন অংশে বিভক্ত,—সমুদ্রে ভাসাইবার সময় খণ্ডত্রয় দড়ি দিয়া বাঁধা হয়। এই নৌকাগুলিকে ডোঙ্গা বলিলেও চলে। পর্ব্বত-প্রমাণ তরঙ্গের উপর এই নৌকায় বসিয়া থাকিতে হইলে বিশেষ অভ্যাস আবশ্যক। কূলের নিকট আসিলে জেলেরা জলে নামিয়া নৌকা টানিয়া বালির উপর লইয়া আসে। তাহার পর বাঁশের ঝোলায় করিয়া চারি পাঁচ জনে নৌকা উচ্চ ভূমিতে উঠাইয়া রাখে। সমুদ্রের মাছও অনেক অদ্ভুত রকমের ও অনেক বর্ণের। এক প্রকার মাছের মুখ অনেকটা মার্জ্জারের

মতন। সামুদ্রিক মৎস্যের গন্ধ অত্যন্ত তীব্র। এক পোয়া রাস্তা হইতে মাছের গন্ধে ধীবরদিগের বাসগৃহের সন্নিকটে আসিয়াছি, বুঝিতে পারা যায়। চাঁদা (pomfrt) ও বাস্তালু (mullet) ভিন্ন অন্য মাছ আমরা খাইতে পারিতাম না। বড় বাস্তালুর স্বাদ অনেকটা আমাদের ইলিস মাছের মতন। সমুদ্রের কাঁকড়া প্রকাণ্ড আকারের—তাহার দাড়া আমাদের দাঁত দিয়া ভাঙ্গিবার সাধ্য নাই—নোড়া দিয়া ভাঙ্গিতে হয়। আমাদের তেলিগু বন্ধুরা বলিতেন, হাঙ্গরের মাংস খাইতে সুস্বাদু। কিন্তু আমরা সে কথায় বড় বিশ্বাসস্থাপন করিতে পারিতাম না।

জেলেদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা একরকম টানা জাল লইয়া হাঁটু জলে গিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। সমুদ্রের ঢেউ জালের উপর দিয়া কখন কখন তাহাদিগকে আকণ্ঠ নিমজ্জিত করিয়া চলিয়া যায়। জালে ছোট ছোট চেলা মাছের মতন মাছ পড়ে। আমরা একদিন মাছ কিনিতে চাহিলে তাহারা হাসিয়াই আকুল হইয়াছিল। আমাদের তেলিগু ভাষা ও অঙ্গভঙ্গীই বোধ হয় তাহাদের হাস্যের কারণ।

ব্রাহ্মণের আধিপত্য এখানে যেন খুব প্রবল বলিয়া বোধ হয় না। বিচার সুধু পানীয় জলে। ব্রাহ্মণ ও বণিক ব্যতীত কুক্কুটমাংস প্রায় সকল হিন্দুরই আহার্য্য।

আমরা বিজয়নগ্রামের রাস্তা দিয়া মধ্যে মধ্যে বাইকে (দ্বিচক্রযানে) করিয়া বেড়াইতে যাইতাম। রাস্তাটি অনেক দূর পর্য্যন্ত পাহাড়ের মধ্য দিয়া গিয়াছে। সন্ধ্যার সময় পথে লোকজনের বেশী সমাগম থাকিত না। সুধু স্থানে স্থানে ক্ষীণকলেবরা উপলব্যথিতগতি পর্ব্বতনির্ঝরিণীর ঝির ঝির শব্দ শুনা যাইত। দুই পার্শ্বে অভ্রভেদী পাহাড়ের দৃশ্যে মনে একটু আতঙ্কেরও সঞ্চার হইত। একদিন প্রত্যাবর্ত্তনের সময় তৃষ্ণায় আমাদের ছাতি ফাটিয়া যাইতেছিল। একটি কূপের ধারে জন কয়েক স্ত্রীলোক তালপাতার ঠোঙ্গা করিয়া জল তুলিতেছিল। আমরা ইঙ্গিতে জানাইলাম, আমরা বড় তৃষ্ণাতুর। যুবতীরা সসম্ভ্রমে সরিয়া দাঁড়াইল—বৃদ্ধারা ভ্রুকুটিভঙ্গে চাহিল। তাহারা ভাবিতেছিল, আমরা বোধ হয় খ্রীষ্টান। একটি ছোট মেয়ে কিন্তু তাড়াতাড়ি আসিয়া আমাদিগের যুক্তকরে জল ঢালিয়া দিল। হঠাৎ তাহার পৃষ্ঠে সজোরে চাপড় পড়ায়, সে বেচারীর হস্ত হইতে তালপাতার ঠোঙ্গাটি মাটিতে পড়িয়া গেল। বালিকার চক্ষু দুটি জলে ভরিয়া আসিল। আমরা ত নিতান্ত অপ্রতিভ।

এ বিষয়ে বরং আমাদের বঙ্গাঙ্গনারা বেশী উদার। মনে হয়, আমাদের দেশে মানুষের উপর দয়া বর্ণাশ্রম-নিয়মের কঠিন পাশ হইতে একটু একটু মুক্ত হইতেছে।

এক জন বিশিষ্ট তেলিগু ভদ্রলোকের সহধর্ম্মিণীর শ্রাদ্ধ উপলক্ষে আমাদের বাসার সম্মুখে সমুদ্রের ধারে একটা বাড়ীতে অনেক ব্রাহ্মণের সমাগম হইয়াছিল। শুনিলাম, প্রত্যেক বাটীতে গিয়া নিমন্ত্রণ করিবার দরকার হয় না—দুই এক জন বিশিষ্ট ব্রাহ্মণকে বলিয়া আসিলেই হইল। ব্রাহ্মণও আসিয়াছিলেন, অনেক জাতীয়। কাহাকেও কাহাকেও দেখিয়া তাঁহাদের ব্রাহ্মণত্বে সন্দেহ জন্মিতেছিল। পত্তন হইতে ব্রাহ্মণকন্যারা আসিয়া পাক কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ভোজনান্তে ব্রাহ্মণদের আহারীয় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় শুনিলাম, অন্ন, পপ্পু (দাল) দুই রকমের তরকারী ও বড়া প্রস্তুত হইয়াছিল। সহরে যে এত স্বল্পব্যয়ে ব্রাহ্মণভোজন সম্পন্ন হয়, তাহা জানিতাম না। দুই এক জন ব্রাহ্মণকে দেখিয়া বোধ হইতেছিল, জীবনের ভারটা তাহাদের কাছে অত্যন্ত লঘু। মধ্যে মধ্যে এই রকম দুই চারিটা নিমন্ত্রণ ও কিঞ্চিৎ ভোজন-দক্ষিণা মিলিলে এই দুস্তর ভবসাগর গোষ্পদের ন্যায় পার হওয়া যায়। এক জন আমাদিগকে রাস্তায় দাঁড়াইয়া দু চারিটা গান শুনাইয়া দিল। ব্রাহ্মণেরা অনেকেই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামানুজ সম্প্রদায়ভুক্ত। তাঁহারা ব্রহ্মের সগুণ মূর্ত্তি বিষ্ণুর উপাসক। শৈবের সংখ্যাও কম নহে। দেশের নামকরণ তিনটি প্রধান শিবলিঙ্গ হইতে হইয়াছে। তৈলঙ্গ অর্থে ত্রিলিঙ্গ।

কিন্তু "চারুপানি" না হইলে অঙ্গহানি হয়। নাম শুনিয়া ভাবিতেছিলাম, "চারুপানি" বোধ হয় কোন রকম শীতল সুন্দর পানীয় হইবে। কিন্তু তিন্তিড়ীমিশ্রিত জলের নাম চারুপানি শুনিয়া আমরা অত্যন্ত হতাশ হইয়া পড়িলাম। কাণা ছেলের নাম পদ্মলোচন! কাঁচকলা, তেঁতুল ও ঝাল, তরকারীর প্রধান উপকরণ। তেলিগু ভদ্রলোকেরা তরকারী পছন্দ করেন না। আমাদের তরকারী বড় মিষ্ট।

এক জন প্রবাসী বাঙ্গালী সুহৃদের নিকট সীমাচল তীর্থের কথা শুনিলাম। সীমাচল ওয়ালটেয়ার হইতে সাত মাইল দূরে। পথে প্রায়ই চড়াই উৎরাই। একদিন প্রভাতে আমি ও অ—বাবু একখানি ব্যাণ্ডি ভাড়া করিয়া সীমাচল অভিমুখে যাত্রা করিলাম। ব্যাণ্ডি অর্থে গরুর গাড়ী। কিন্তু

অনেকটা স্কুলে যাইবার ওমনিবাসের মত। ঘোড়ায় টানিলে এই গাড়ীকেই ঝট্‌কা বলে। একটা ডেক্‌চিতে খিচুড়ি রাঁধিবার সমস্ত উপকরণ মিশাইয়া আমাদের সঙ্গে লইলাম। সুধু অগ্নিতাপসংযোগ মাত্র বাকি রহিল।

পথে আনারস ও পাঁউরুটী কিনিলাম। আমার সঙ্গীতপ্রিয় সুহৃদ গান ধরিলেন। কিন্তু গাড়ীর ঝাঁকানিতে এক একবার প্রাণান্ত হইতেছিল। এখানে মাখা তামাক মেলে না। তামাকপাতা-জড়ান একপ্রকার চুরুট পয়সায় সাতটা আটটা পাওয়া যায়। ধূমপানের তৃষ্ণা তাহাতেই মিটান যাইতেছিল।

পথের ধারে পাহাড়ের কোলে ছোট ছোট ক্ষেত। ক্ষেত্রে ধান্যের সম্পর্ক নাই। মৃত্তিকা কঙ্করময়। চিনা ও বাজরার চাষই অধিক। এক রকম মেটে আলুর চাষ প্রায় সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। আলুর সাধারণ নাম "দামপানু"। গোল আলুর নাম "বাঙ্গালি-দামপানু"। বোধ হয়, বাঙ্গালীরাই এই আলু এ দেশে প্রথম প্রচলিত করেন।

ভাদ্র মাসেও অনেক আম্রের গাছে মুকুল। চূতাঙ্কুর বার মাসই দেখিতে পাওয়া যায়। পথের ধারে দুই এক স্থানে বনমল্লিকার ঝাড়। নববিকশিত কুসুমে পল্লীবীথি আমোদিত।

বেলা দ্বিপ্রহরের সময় আমরা সীমাচলে উপস্থিত হইলাম। সীমাচলের মন্দির প্রায় ছয় শত হস্ত উচ্চে পর্ব্বতের উপর। প্রায় বারো শত সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উপরে উঠিতে হয়। প্রস্তরনির্ম্মিত প্রশস্ত সোপানশ্রেণী দেখিয়া আমাদের শ্রম সার্থক হইয়াছে ভাবিলাম। দশ বারটি সিঁড়ির পর এক একটি চাতাল। চাতালের পার্শ্বে বৃক্ষশ্রেণী। উপরে উঠিতে উঠিতে ক্লান্তিবোধ হইলে চাতালে বসিয়া বিশ্রাম করা যায়। উপরের চাতাল হইতে সমুদ্রবেলা-বলয়িত পর্ব্বত-শ্রেণী দৃষ্টিপথে পড়ে। কিয়দ্দূর উপরে উঠিতেই জলের ঝর ঝর শব্দ শুনিতে পাইলাম। প্রথম তোরণের নিকট শিলাতলপ্রতিঘাতহেতু ঝরণার পতন-ফেনিল জলকণা শিলা হইতে শিলান্তরে পড়িয়া লৌহ-পাইপের ভিতর দিয়া নীচে আসিতেছিল। মন্দিরে উঠিতে চাতালের পাশে আরও কয়েকটি ঝরণা। ঝরণার মুখে কোন স্থানে প্রস্তরনির্ম্মিত সর্পমুখ, কোন স্থানে ব্যাঘ্রমুখ শিল্প-চাতুর্য্যের পরিচয় দিতেছিল। নিকটস্থ ভিত্তির কুলুঙ্গীতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিন্দু দেব-দেবার প্রতিকৃতি।

মন্দিরপ্রাকারের বাহিরে পাদুকা পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইয়াছিল।

বন্ধুবর তাহাতে নিতান্ত অসম্মত, কিন্তু উপায় নাই। আমার দেশী নাগরা, সুতরাং আমি একপ্রকার নিশ্চিন্ত—কিন্তু বন্ধুবর নিজের পঞ্চমুদ্রা মূল্যের বিনামার ভাবী বিরহে ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন। এক জন খোঁড়া ভিক্ষুকের জিম্মায় আমাদের জুতা রাখিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। সুহৃদ্বরের জুতার ভাবনায় কিছুই ভাল লাগিতেছিল না! আমরা একবার কলিকাতার নিকট এক বরযাত্রায় গিয়াছিলাম। উপরে বরযাত্রীদিগের আহারের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। নীচের বারান্দায় আমরা পাদুকা পরিত্যাগ করিয়া উপরে গিয়াছিলাম। আহারান্তে প্রত্যাবর্ত্তনের সময় এক জন বৃদ্ধ বরযাত্রী ভুলিয়াই হউক বা ইচ্ছা করিয়াই হউক, এক জোড়া নূতন চটিজুতা পায়ে দিতেছিলেন। যাঁহার জুতা, তিনি বারান্দায় জুতা রাখিয়া নিম্নে প্রাঙ্গনে ভোজন করিতেছিলেন। জুতা জোড়াটি অন্তর্হিত হয় দেখিয়া তিনি খাইতে খাইতে তাড়াতাড়ি বৃদ্ধের পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, "দোহাই মহাশয়! ব্রহ্মহত্যা করিবেন না। জুতা জোড়াটি সবে কাল কিনিয়াছি, শোকটা বড়ই লাগিতেছে।" আমরাও ছেলেবেলায় যাত্রা শুনিতে গিয়া হৃতপাদুক হইয়া বাটী ফিরিবার সময় তিরস্কারের ভয়ে অসহ্য মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করিতাম। সেই সমস্ত কথা মনে করিয়া সুহৃদ্বরের উদ্বেগে আশ্চর্য্য হই নাই। বন্ধুবর অবশেষে তোয়ালের ভিতর করিয়া জুতা জোড়াটি মন্দিরের ভিতর আনয়ন করিয়া সুস্থ হইলেন।

আমরা ব্রাহ্মণ পরিচয় দিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। বঙ্গদেশ ব্যতীত শিখাহীন ব্রাহ্মণ ভারতের অন্যত্র বোধ হয় বিরল। মন্দিরের মেজে কষ্টি পাথরের। মধ্যে মন্দির ও চতুর্দ্দিকে বারান্দা। তখন নরসিংহদেবের ভোগ হইতেছিল। উজ্জ্বল, পরিচ্ছন্ন, কষ্টি পাথরের উপর স্তূপাকার ভোগ ঢালা হইয়াছে। অন্য পাত্রের আর আবশ্যক হয় নাই। এই মন্দিরে প্রতিপালিত কয়েকটি বালক সুললিত স্বরে গান করিতেছিল। সঙ্গীত তেলিগু ভাষায় রচিত, সুতরাং তাহার মর্ম্মগ্রহণ করিতে পারিলাম না। মন্দিরটি এখন বিজয়নগ্রামাধিপতির। মন্দিরে একটি সংস্কৃত বিদ্যালয় ও অনাথনিবাস আছে। ব্যাকরণ শাস্ত্রের অধ্যাপকের সহিত ভাঙ্গা সংস্কৃতে কিছুক্ষণ আলাপ করিয়াছিলাম। তিনি আমার সংস্কৃত শুনিয়া বোধ হয় অবাক্ হইয়া গিয়াছিলেন। অনেক ইংলণ্ডপ্রবাসী ভারতবর্ষীয় যুবক পণ্ডিতবর মোক্ষমূলরের সহিত দেখা করিতে গিয়া তাঁহাদের অদ্ভুত সংস্কৃত ভাষার ও প্রাচ্যদেশবিরুদ্ধ অসামাজিক ব্যবহারের পরিচয় দিয়া আসিয়াছেন।

এ ক্ষেত্রে আমাদের দায়ে পড়িয়া সংস্কৃতে কথা কহিতে হইতেছিল। যে পদ ব্যবহার করিব, দুই এক মিনিট পূর্ব্বে তাহা অনেক কষ্টে মনে মনে রচনা করিতেছিলাম। সুতরাং অধ্যাপকের অনেক কথা মনোযোগ দিয়া শুনিবার অবসর ছিল না। কিন্তু যখন ব্রাহ্মণ শব্দ কি করিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে, এই প্রশ্ন উত্থিত হইল, আমি তখন রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিলাম। শুনিলাম, মন্দিরটি মহারাজ পুরুরবা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছে। সীমাচলখণ্ড নামক একখানি তেলিগু পুস্তকে মন্দিরের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। কথাটা বিশ্বাস হইল না। মন্দিরের চূড়ার নিম্নে দিব্য এক বুদ্ধমূর্ত্তি। সম্ভবতঃ বৌদ্ধ মন্দির হিন্দুমন্দিরে পরিণত হইয়াছে। প্রাচীন কালের ব্রাহ্মণদিগের সত্য-প্রিয়তার অনেক নিদর্শন পাওয়া যায়। কিন্তু অন্ততঃ যখন বৌদ্ধমন্দিরগুলি ব্রাহ্মণেরা আত্মসাৎ করিতেছিলেন, তখন বোধ হয় তাঁহারা কঠোর সত্য-প্রিয়তার আদর্শ ছিলেন না। ভোগের সময় জন কয়েক লোক মশাল জ্বালিয়া দাঁড়াইয়াছিল, জন কয়েক লম্বা পিত্তলের বাঁশী বাজাইতেছিল। পুরোহিত দেবতার আরতি করিতেছিলেন। যাত্রীরা যুক্তকরে দাঁড়াইয়াছিল। ধূপ দীপের গন্ধে মন্দির আমোদিত। মন্দির-প্রকোষ্ঠের সম্মুখে এক বৃহৎ ঘৃতপূর্ণ প্রস্তরপ্রদীপ জ্বলিতেছিল। এই দৃশ্যে মধ্যযুগের বেশ একটা চিত্র বর্ত্তমান। মনে হইতেছে, ভূটানের কোন বৌদ্ধমন্দিরে আরতির এই রকম একটা বর্ণনা পড়িয়াছি। কিন্তু ভোগ হইতেছিল অন্য দেবীমূর্ত্তির সম্মুখে। আমাদের আসল নরসিংহ দেবের দর্শনসৌভাগ্য ঘটে নাই। বৎসরের মধ্যে এক দিন নরসিংহ দেবের মূর্ত্তি যাত্রীরা দেখিতে পায়। সেই দিন নরসিংহ দেবের পঞ্চ নখর দিয়া বারিধারা নিঃসৃত হয়। ব্যাপারটা কি, ভাল বুঝা গেল না। আসল দেবমূর্ত্তির পরিবর্ত্তে দুই পয়সা দর্শনী দিয়া এক নকল নরসিংহ দেখিলাম। হিরণ্যকশিপুর মুণ্ড ছিল না। একটি মুণ্ড যোড়া দিয়া দেবতাকে সম্পূর্ণ করা হইল। হেন্‌রী হায়নে ভগ্ন মর্ম্মরপ্রতিমার গলায় প্রেমমাল্য পরাইয়াছিলেন; কিন্তু আমরা কবিও নহি, ভক্তও নহি, সুতরাং আমাদিগের ভক্তিস্রোত সেই ভগ্ন দেবমূর্ত্তির দিকে কিছুতেই প্রবাহিত হইল না। মন্দিরগাত্রে সেকালের দৈনিক জীবনের অনেক ছবি খোদিত। অশ্লীল মূর্ত্তিরও অভাব ছিল না। অনেক মূর্ত্তি মুসলমান কর্ত্তৃক অঙ্গহীন হইয়াছে। পবিত্র মন্দিরগাত্রে অশ্লীল মূর্ত্তি খোদিত হইবার কারণ কিছুই বুঝা যায় না। কথিত আছে, এক জন বৌদ্ধরাণী নিজের চরিত্রহীনতার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ মধ্যভারতে অনেক

বৌদ্ধবিমান-গাত্রে অশ্লীল মূর্ত্তি খোদিত করাইয়াছিলেন। কিন্তু ইহা কিম্বদন্তী মাত্র। কেহ কেহ বলেন, মন্দিরের ভিতর পবিত্র, বাহিরে জগতের যাহা কিছু অপবিত্র ও কুৎসিত। বহির্জগতের ও দেবমূর্ত্তিশোভিত পবিত্র মন্দিরগর্ভের পার্থক্য প্রদর্শনই এই সমস্ত ভাস্কর্য্যের উদ্দেশ্য। ভক্ত বাহিরের অপবিত্রতা বাহিরে রাখিয়া ভক্তিপূতহৃদয়ে মন্দিরে প্রবেশ করেন। এই কারণও বিশেষ শ্রদ্ধেয় বলিয়া মনে হয় না। মন্দিরের বারান্দার স্তম্ভে অপূর্ব্ব কারুকার্য্য। বারান্দার ছাতের নিম্নভাগ চিত্রিত ছিল। কিন্তু এখন প্রায় তাহা মুছিয়া গিয়াছে। এক স্থানে বিষ্ণুর বারিধিবক্ষে অনন্ত নাগের বিস্তৃত ফণার নিম্নে শয়নের এক ছবি বর্ত্তমান। নয়নের অপ্রীতিকর এই আধুনিক ছবিটি একালের হিন্দুদের সৌন্দর্য্যদৃষ্টির অভাবের পরিচায়ক।

ভোগের গন্ধ মনোরম। কিন্তু সুহৃদ্বরের প্রসাদভক্ষণে আদৌ রুচি হইল না। সুহৃদ্বর রন্ধনে ব্যাপৃত হইলেন। আমি সেই অবসরে গ্রামটি প্রদক্ষিণ করিয়া আসিলাম। গ্রামের অধিকাংশ অধিবাসীই নরসিংহ দেবের পাণ্ডা। পাহাড়ের উপর সমতলক্ষেত্রে গ্রামটি স্থাপিত। গ্রামের আরও ঊর্দ্ধে আর একটি ইষ্টকনির্ম্মিত রাম সীতার মন্দির। সেখানেও বেশ একটি মনোরম ঝরণা। মৃত্তিকা অত্যন্ত সজল। এত উচ্চ ভূমির উপরও কদলীর অভাব নাই। একপ্রকার রক্তাভ কদলী ও আনারসের জন্য সীমাচল বিখ্যাত। পাহাড়ের গায়ে আনারসের ক্ষেত। কোনও স্থানে ঝরণার ধারে শিলাতলে কলসী রাখিয়া কুমারীরা হাস্যপরিহাসে মগ্ন। ঝরণার জলের শব্দের সহিত যুবতীদের হাস্যের তরল তরঙ্গ মিশিতেছিল। এক গৃহস্থের বাড়ীর সম্মুখে সেতার বাজাইয়া লক্ষ্ণৌ ঠুংরিতে এক জন ভিক্ষুক গান গাহিতেছিল। পরিচিত সুর শুনিয়া সেখানে দাঁড়াইলাম। গানের শেষে এক জন বিজয়নগ্রাম কবির ভণিতা। বিজয়নগ্রাম তেলিগু সাহিত্যজগতের কেন্দ্রস্থল।

সীমাচল হইতে ফিরিবার কয়েক দিন পরেই বঙ্গদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। প্রর্ত্ত্যাবর্ত্তনের দিন ওয়ালটেয়ার ষ্টেশনে যাইবার পথে ক্লবের নিকট আসিয়া কল্লোলময় জলধির স্নিগ্ধ শ্যামকান্তি শেষবার অতৃপ্তনয়নে দেখিয়া লইলাম। অদূরে সূর্য্যকরোজ্জ্বল তরঙ্গ গভীর নিনাদে শিলাখণ্ডের উপর পড়িয়া সহস্র খণ্ডে ভাঙ্গিয়া যাইতেছিল।

শ্রীনলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায়।

শাহজাহান বাদশাহ।

জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর প্রাক্কালে শাহজাহান দক্ষিণাপথে অবস্থান করিতেছিলেন, এবং রাজমহিষী নূরজাহান শাহজাহানের পরিবর্ত্তে আপনার হস্তক্রীড়ণক শাহরিয়ারকে সিংহাসনপ্রদানের উদ্যোগ করিতেছিলেন। কিন্তু তাঁহার সমস্ত যত্ন শারদীয় প্রভাতের মেঘগর্জ্জনের ন্যায় নিষ্ফল হইল। তদীয় ভ্রাতা আসফ খাঁ জাহাঙ্গীরের জীবদ্দশায় উত্তরাধিকারিনির্ব্বাচনে তাঁহার প্রধান অবলম্বন ছিলেন। কিন্তু বাদশাহের মৃত্যুর পর তিনি নূরজাহানকে অম্লানবদনে পরিত্যাগ করিয়া শাহজাহানকে রাজ্যভার গ্রহণ করিবার জন্য রাজধানীতে আহ্বান করিলেন। শাহজাহানের দক্ষিণাপথ পরিত্যাগ করিয়া রাজধানীতে উপনীত হইতে কতিপয় সপ্তাহ অতিবাহিত হইবে। এই সময়ে রাজসিংহাসন শূন্য থাকিলে অন্তর্বিপ্লব উপস্থিত হইতে পারে, এই আশঙ্কা করিয়া, আসফ খাঁ মৃত খসরুর পুত্র দাওয়ার বক্সকে সম্রাট বলিয়া ঘোষণাপ্রচার করিলেন। তাহার পর শাহজাহান আগ্রার নিকটবর্ত্তী হইলে দাওয়ার বক্স নিহত হইলেন, এবং শাহজাহান সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। (১)

---

(১) শাহজাহানের সিংহাসনারোহণের পূর্ব্বেই নূরজাহান আসফ খাঁর হস্তে বন্দিনী হইয়াছিলেন। ইহার পর তাঁহার জীবনের অবশিষ্টাংশ কিরূপ ভাবে অতিবাহিত হইয়াছিল, তাহা আমরা নিম্নে লিপিবদ্ধ করিতেছি। ১৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দে নূরজাহান পরলোকে গমন করেন। শাহজাহান তাঁহার ভরণপোষণের জন্য রাজকোষ হইতে বার্ষিক পঁচিশ লক্ষ টাকা বৃত্তি প্রদান করিতেন। জাহাঙ্গীরের সঙ্গে সঙ্গেই তদীয় অঙ্কলক্ষ্মীর সমস্ত ক্ষমতা বিলুপ্ত হইয়াছিল। এই মহীয়সী মহিলা অত্যন্ত তেজস্বিনী ও গর্ব্বিতা ছিলেন বলিয়া ইহার পর আর কখনও রাজনৈতিক বিষয়ে বাক্যব্যয় করেন নাই। অধ্যয়ন, নির্জ্জনবাস ও আরামেই তাঁহার সমস্ত সময় অতিবাহিত হইত। এই নির্জ্জনবাসকালে তাঁহার চরিত্র নির্ম্মল ছিল, তাহাতে কলঙ্কের ছায়ামাত্রও স্পর্শ করিতে পারে নাই। এই সময় ধর্ম্মবলই তাঁহার একমাত্র সম্বল ছিল। বৈধব্যদশা উপস্থিত হইবার পর তিনি বহুমূল্য পরিচ্ছদ ও রত্নাভরণাদির পরিবর্ত্তে শুভ্রবস্ত্র পরিধান এবং মৎস্য মাংস পরিত্যাগ করিয়া হিন্দু বিধবার ন্যায় জীবনযাপন করেন। তাঁহার নির্দ্দেশমত তদীয় মৃতদেহ জাহাঙ্গীর বাদশাহের সমাধির পার্শ্বে সমাহিত হইয়াছিল।

আসফ খাঁ আপনার সমস্ত ঐহিক উন্নতির মূল কারণ নূরজাহানকে কেন পরিত্যাগ করিয়াছিলেন? শাহজাহান আসফ খাঁর লাবণ্যময়ী কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এই কন্যারত্নের নাম আরজমন্দ বানু। ইহাদের পরিণয়কাহিনী বিচিত্র রসে ও প্রেমসৌরভে পরিপূর্ণ। আরজমন্দ বানু শাহজাহানের সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে এক জন বিশিষ্ট আমীরের ধর্ম্মপত্নী ছিলেন। মোগলদিগের আমলে নওরোজ উপলক্ষে বিশাল রাজপুরীতে সৌন্দর্য্যলীলাময়ী ললনাদিগের বাজার বসিত। ইহার নাম খোস্‌রোজ, অর্থাৎ আনন্দের দিন। একবার এই রূপের হাটে রূপসীকুলরাজ্ঞী আরজমন্দ বানু উপস্থিত হইয়াছিলেন। শাহাজাহান এখানেই আরজমন্দ বানুর প্রথম সন্দর্শন লাভ করেন। তখন রূপের হাটের ভগ্নদশা। রূপমুগ্ধ শাহ-জাহান কিছু কিনিবার ছলে তাঁহার বিপণীর নিকট উপনীত হন। এক খণ্ড মিছরী ব্যতীত আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। রাজকুমার বহু অর্থের বিনি-ময়ে এই মিছরীখণ্ড ক্রয় করেন, সঙ্গে সঙ্গে অর্থ অপেক্ষাও মহার্ঘ আপনার হৃদয় সেই অনিন্দ্যকান্তি কামিনীর চরণতলে সমর্পণ করেন। ইহার পর শাহজাহানের প্রগাঢ় অনুরাগের কাহিনী প্রকাশিত হইয়া পড়িলে বানুর স্বামী রাজকুমারের অভীষ্টসিদ্ধির পথে প্রতিবন্ধক না হইয়া, পত্নীকে পরিত্যাগ করেন। অতঃপর শাহজাহান তাঁহাকে ধর্ম্মপত্নীরূপে গ্রহণ করিলেন। বানু বেগম কমনীয় গুণরাজিতেও গরীয়সী ছিলেন। বানু কেবলমাত্র প্রেমসম্পদেই শাহজাহানকে ভাগ্যবান করেন নাই, তিনিই তাঁহার ললাটে রাজটীকা দীপ্ত করিবার মুখ্য কারণ। শাহজাহান রাজসিংহাসনে আসীন হইয়া তাঁহাকে মমতাজ জেমানী, অর্থাৎ 'তৎকালের গৌরব' এই উপাধিতে ভূষিত করেন। কিন্তু দীর্ঘকাল তাঁহার অদৃষ্টে এই সুখভোগ ঘটে নাই। শাহজাহানের সিংহাসনারোহণের দ্বিতীয় বর্ষে বানু ইহলোক হইতে অপসৃত হন।

প্রিয়তমা মহিষীর অকালমৃত্যুতে শাহজাহান অতিশয় শোকাকুল হইয়া-ছিলেন, এবং যাবজ্জীবন তাঁহার পবিত্র স্মৃতির পূজা করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রিয়াবিরহবিধুর শাহজাহান কখনও রাজকার্য্যে উদাসীন, বিলাসবিমুখ, অথবা আড়ম্বরবিতৃষ্ণ হন নাই।

মোগল বাদশাহগণ রাজ্যাভিষেকোৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন করিতেন। এই উপলক্ষে বাদশাহগণ প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতেন। বাদশাহগণ মহার্ঘ দ্রব্য-

ভাণ্ডের সহিত 'তৌল' হইতেন। তাহার পর সেই দ্রব্যরাশি আমীর ওমরাহগণের মধ্যে বিতরিত হইত। শাহজাহান সমারোহের নানাবিধ অভিনব উপায় উদ্ভাবিত করিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী বাদশাহগণের উৎসব ক্রিয়া নিষ্প্রভ করিয়াছিলেন। তিনি পূর্ব্বপ্রথামত মহার্ঘ দ্রব্যভাণ্ডের সহিত 'তৌল' হন, তদ্ব্যতীত মণিমুক্তা-পূর্ণ ভাণ্ড মস্তকোপরি সঞ্চালন করিয়া সম্মুখবর্ত্তী দর্শকগণকে প্রদান করেন। ইতিহাসবেত্তা কাফি খাঁ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, এই উৎসব উপলক্ষে মণিমুক্তা, অশ্ব, হস্তী, অস্ত্র ও বস্ত্র কিনিতে শাহজাহানের এক কোটী ষাট লক্ষ মুদ্রা ব্যয়িত হইয়াছিল।

শাহজাহানের জন্মোৎসবও মহাসমারোহে সম্পাদিত হইত। মণিরক নামক এক জন উদাসীন শাহজাহানের জন্মোৎসবের যে বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন, আমরা তাহা এ স্থলে উদ্ধৃত করিতেছি।—ঊষা-সমাগমে দুর্গপ্রাকার হইতে শত কামান যুগপৎ গর্জ্জন করিয়া বাদশাহের জন্মদিনের ঘোষণা করিত। তাহার পর হইতেই সমারোহের আরম্ভ। গৃহে গৃহে আনন্দকোলাহল, সুনির্ম্মিত প্রশস্ত রাজপথে নাগরিকগণের সুদৃশ্য বসনভূষণের শোভা, নগরের সর্ব্বত্র প্রমোদতরঙ্গ। কমনীয়কান্তি নর্ত্তকীর লাস্যলীলা ও বিচিত্র কৌতুক-রঙ্গে শীত ঋতুর (শাহজাহান ১৫৯২ খৃষ্টাব্দের ৬ই জানুয়ারী তারিখে জন্ম-গ্রহণ করেন,) স্বল্পায়ু দিবার অবসান হইত। অপরাহ্ণে বাদশাহ রাজকুমার ও আমীর ওমরাহগণে পরিবৃত হইয়া মাতৃদর্শনে গমন করিতেন। তথা হইতে রাজপ্রাসাদে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া শাহজাহান সমস্ত সভাসদকে মহাসমারোহে ভোজসভায় সম্মিলিত করিতেন। তাহার পর বাদশাহ শোভা ও সম্পদের আধার একটি সুসজ্জিত কক্ষে গমন করিয়া রৌপ্য, মণি-মুক্তা-সংবলিত স্বর্ণ, মহার্ঘ ওষধি, দুষ্প্রাপ্য মশলা, স্বর্ণ-রৌপ্য-খচিত বসন ও সুস্বাদু মিষ্টান্ন দ্বারা ক্রমান্বয়ে চারি বার 'তৌল' হইতেন। 'তৌল' ক্রিয়া সম্পন্ন হইলে বাদশাহ সমবেত দরিদ্রগণকে সেই দ্রব্যরাশি দান করিতেন।

কেবলমাত্র শূন্যগর্ভ বাহ্যাড়ম্বরেই শাহজাহানের শাসনকাল অতিবাহিত হয় নাই। বস্তুতঃ তাঁহার সময়েই মোগলসাম্রাজ্য উন্নতির চরমসীমায় উপনীত হইয়াছিল। আকবর শাহ প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষ অধিকৃত করিয়া সাম্রাজ্যের শাসন-সংরক্ষণের সুবন্দোবস্ত করেন। তিনি রাজস্বসংগ্রহের সুব্যবস্থা ও শাসন-বিধি প্রবর্ত্তিত করিয়া সুশাসনের সূত্রপাত করেন। শাহজাহানের অধ্যবসায়ে আকবরের প্রবর্ত্তিত ব্যবস্থা পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়। অন্তর্বিগ্রহ শাহজাহানের রাজ্য-

কালে ছিল না; সমগ্র সাম্রাজ্যে অখণ্ড শান্তি সংস্থাপিত হইয়াছিল; তাহাতে কৃষি ও বাণিজ্যের উন্নতি হয়; দেশ সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠে।

বাদশাহ বিলাসপটু ও আরামপ্রিয় ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি কখনও রাজকার্য্যের পর্য্যালোচনায় ঔদাসীন্য প্রকাশ করেন নাই; শাসন কার্য্যের শৃঙ্খলাবিধানে সর্ব্বদা অবহিত থাকিতেন। তিনি রাজকর্ম্মচারিনিয়োগকালে প্রতিভাশালী কার্য্যদক্ষ প্রতিষ্ঠাপন্ন ব্যক্তিদিগকে মনোনীত করিতেন। এ জন্য তাঁহার রাজত্বকালে শাসনবন্ধন কখনও শিথিল হয় নাই। পরন্তু তাঁহার যত্নে ও চেষ্টায় অভিনব সুবন্দোবস্ত প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ, দক্ষিণাপথের জরিপের বিষয় উল্লেখ করা যাইতে পারে। মোগল রাজত্বের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক কাফি খাঁ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, আকবর দেশ-বিজয়ে ও সুব্যবস্থার প্রতিষ্ঠায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন; কিন্তু শাসন কার্য্যের শৃঙ্খলাস্থাপনে, আয়-ব্যয়ের সামঞ্জস্যবিধানে ও রাজকার্য্যের সুচারু পরিচালনে ভারতবর্ষের কোনও নরপতিই শাহজাহানের সমকক্ষ ছিলেন না।

সুপ্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী ট্যাভারনিয়ার শাহজাহানের শাসনাধীন ভারতবর্ষের সমস্ত তত্ত্ব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরিজ্ঞাত হইয়াছিলেন। তিনি লিখিয়া গিয়াছেন যে, শাহজাহান অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিতেন। এই বিদেশী ভ্রমণকারীও বাদশাহের শাসনসম্বন্ধীয় দৃঢ়তার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, শাহজাহানের সুশাসনে চোর দস্যুর ভয় ও রাজপুরুষগণের অত্যাচার বহুলপরিমাণে নিবারিত হইয়াছিল, এবং প্রকৃতিপুঞ্জের সুখ ও সমৃদ্ধির অবধি ছিল না।

এই সুশাসনের ফলে রাজস্ব প্রচুরপরিমাণে বর্দ্ধিত ও রাজকোষ পূর্ণ হইয়াছিল। পরিপূর্ণ রাজকোষই রাজ্যের প্রধান শক্তি। শাহজাহান এইরূপ শক্তিশালী ছিলেন। তাঁহার সময়ে রাজকোষে বিপুল অর্থরাশি সঞ্চিত হইয়াছিল। কিন্তু বাদশাহ মুক্তহস্তে এমন অজস্র ব্যয় করিতেন যে, তাঁহার মৃত্যুকালে রাজকোষে নগদ ছয় কোটী মুদ্রাও সঞ্চিত ছিল না। দেশে অখণ্ড শান্তি বিরাজিত ছিল। সেই সময়ে বলদৃপ্ত স্বাতন্ত্র্যকামী নরপতিগণ অকারণে দিল্লীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতেন না; এবং বিদ্রোহ অশান্তিও রাজ্য হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার রাজত্বের প্রথমভাগে দক্ষিণাপথে যুদ্ধ চলিতেছিল। শাহজাহান ভারতের সীমান্তেও দীর্ঘকালব্যাপী সমরে লিপ্ত ছিলেন। আড়ম্বরপ্রিয় বাদশাহ রাজধানীর সৌন্দর্য্যবর্দ্ধন ও শিল্পের উৎ-

কর্ম্মসাধনে অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন। এই দুই কারণে রাজভাণ্ডারের বিপুল অর্থ অজস্র ব্যয়িত হইয়াছিল।

শাহজাহানের রাজত্বকালে দক্ষিণাপথে তিনটি স্বাধীন মোসলেম রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল;—আমেদনগর,বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা। আকবর শাহ দক্ষিণাপথ-বিজয়ে প্রবৃত্ত হইয়া আমেদনগর রাজ্য ভারতবর্ষের মানচিত্র হইতে মুছিয়া ফেলিবার সঙ্কল্প করেন। বিজাপুরের অধীশ্বরী চাঁদ সুলতানার লোকাতীত শৌর্য্যবীর্য্যে মোগল সৈন্য পরাভূত হইয়া রাজ্যের কিয়দংশ গ্রহণপূর্ব্বক সন্ধি-স্থাপন করিতে বাধ্য হয়। আকবর শাহের পর জাহাঙ্গীর আমেদনগরের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করেন। কিন্তু শত্রুসেনাপতি মালিক আম্বারের প্রতিকূলাচরণে তাঁহাকে বিফলপ্রযত্ন হইতে হয়। শাহজাহানের রাজত্বের প্রারম্ভে মালিক আম্বার কালগ্রাসে পতিত হন। বিজাপুরাধিপতি ইব্রাহিম আদিল শাহ প্রবলপ্রতাপে রাজ্যশাসন করিতেছিলেন। তিনি সুদৃশ্য প্রাসাদাবলীর নির্ম্মাণ করিয়া রাজধানী সুশোভিত করিয়াছিলেন। সুদৃশ্য প্রাসাদমালার নির্ম্মাতা বলিয়া তিনি ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র বিখ্যাত ছিলেন। মালিক আম্বারও মৃত্যুকালে উত্তরাধিকারীকে পরিপূর্ণ রাজভাণ্ডার ও পরাক্রমশালী দুই লক্ষ সেনা অর্পণ করিয়া লোকান্তরিত হন। এই সময় গোলকুণ্ডা রাজ্যের উন্নতির মধ্যাহ্ন। গোলকুণ্ডাধিপতি রাজ্যের আভ্যন্তরীণ বলবৃদ্ধি ও প্রকৃতিপুঞ্জের অমিত সমৃদ্ধি লইয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন না; পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহেও আপনার বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিবার অভিলাষী ছিলেন।

যুদ্ধানুরাগী শাহজাহান এই সমৃদ্ধিশালী রাজ্যত্রয় জয় করিবার সঙ্কল্প করিয়া তাহার আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময়ে একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনা সংঘটিত হইল, এবং তাহার ফলে শাহজাহান অচিরে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহার রাজত্বের প্রথমবর্ষেই খাঁজাহান লোদী নামক এক জন বিশিষ্ট সেনাপতি বিদ্রোহী হইয়া আমেদনগরের অধিপতির সহিত মিলিত হন। এই কারণে আমেদনগরের সহিত মোগলের যুদ্ধ উপস্থিত হইল। বাদশাহ স্বয়ং সৈন্যপরিচালনের ভার গ্রহণ করিয়া দক্ষিণাপথে গমন করিলেন, এবং তাঁহার সাহস ও বীরত্বে আট বৎসরের সাধনার পর আমেদনগর রাজ্য মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল। আমেদনগর বিধ্বস্ত হইলে বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার অধিপতিদ্বয়ও ভীত হইয়া বশ্যতাস্বীকার ও রাজকর প্রদান করিতে স্বীকৃত হইলেন। বাহমনীরাজ্যের ভগ্নাবশেষ

দুর্ভেদ্য উপরাজ্যগুলি আংশিক বা পূর্ণভাবে বশ্যতা স্বীকার করায় মোগলের ভারতবিজয় সুসম্পূর্ণ হইল। কাবুল হইতে উড়িষ্যা এবং হিমালয় হইতে বেরার ও আমেদনগর পর্য্যন্ত সমস্ত ভারতভূমি মোগলের সিংহাসনতলে লুণ্ঠিত হইল।

আভ্যন্তরীণ বিগ্রহ নিবারিত হইবার অব্যবহিত পরেই সীমান্তপ্রদেশে সমরানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। বাবর বাদশাহ কাবুল রাজ্যের অধিকারী ছিলেন। তদীয় বংশধর দিল্লীর সম্রাটগণের আধিপত্যও উত্তরাধিকারক্রমে তথায় সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। "কিন্তু কাবুলের উত্তরে বাল্ক ও বাদক্ষণ এবং পশ্চিমে কান্দাহার দিল্লীশ্বরদিগের হস্ত হইতে স্খলিত হইল। বিশেষতঃ, বাল্ক বহুকাল হইতে মোগল সাম্রাজ্যের বহির্ভূত ছিল। শাহজাহান বাল্ক বিজয়ের জন্য রাজপুত-রাজ জগৎসিংহকে প্রেরণ করিলেন। এই অভিযানে রাজপুতগণ অসাধারণ সাহস ও কষ্টসহিষ্ণুতা প্রদর্শিত করিয়াছিলেন। রাজপুতগণ হিন্দুকুশ পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া তুষারপূর্ণ দেশে অমিতবিক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিল। জগৎসিংহ সৈন্যগণকে উৎসাহিত করিবার জন্য আবশ্যকমত স্বহস্তে কোদালি ধরিয়া মৃত্তিকাখনন করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। অবশেষে সম্রাট্ স্বয়ং কাবুলে আসিলেন, এবং তাঁহার সন্তান মুরাদ বাল্ক জয় করিলেন। কিন্তু অচিরে উজবেগগণ পুনরায় বাল্ক আক্রমণ করিল। এবার সম্রাটের আর এক পুত্র যুদ্ধের ভারপ্রাপ্ত হইয়া বাল্ক রক্ষা করিতে লাগিলেন; কিন্তু যুদ্ধের গতি দেখিয়া, এবং সেই প্রদেশ অধিকদিন অধীনে রাখা অসম্ভব বিবেচনা করিয়া, অবশেষে শাহজাহান সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া সন্ধিস্থাপন করিলেন; বাল্ক ও বাদক্ষণ বিজিত হইল না।

"জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে কান্দাহার প্রদেশ পারস্য-রাজের হস্তে পতিত হইয়াছিল। এখন শাহজাহানের রাজত্বকালে দিল্লীশ্বরের হস্তে পুনঃপতিত হইল। কিন্তু পারস্য-রাজ অচিরে আবার এই স্থান জয় করিলেন। তাহার পর আওরঙ্গজেব দুইবার ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দারা একবার এই স্থান উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু কাহারও চেষ্টা সফল হয় নাই। কান্দাহার দিল্লীশ্বরগণের হস্ত হইতে চিরকালের জন্য স্খলিত হইল।" *

এই দীর্ঘকালব্যাপী সমরাগ্নির ইন্ধনসংগ্রহ করিতে মোগল রাজভাণ্ডারের অসংখ্য অর্থের অপচয় হয়। কিন্তু এতদপেক্ষা বিপুল অর্থরাশি বিচিত্র

হর্ম্যরাশির গঠনে, কৃষিকার্য্যের সুবিধার্থ খাল-খননে ও রাজোপকরণ-নির্ম্মাণে ব্যয়িত হইয়াছিল।

শাহজাহান বাদশাহের আমলে ভারতবর্ষে স্থাপত্যকার্য্য উৎকর্ষের চরম-সীমায় উপনীত হইয়াছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। শাহজাহানের প্রিয়তমা মহিষী অকালে কালগ্রাসে পতিত হইলে, তিনি তাঁহার চিহ্নস্বরূপ শ্বেত-মর্ম্মরের অপূর্ব্ব স্বপ্ন, অলোকসামান্য তাজমহল নির্ম্মিত করেন। প্রিয়তমা মহিষীর স্মরণচিহ্ন জগতে অতুল্য শিল্পসৌন্দর্য্যময় করিবার জন্য তিনি চেষ্টার ক্রটী করেন নাই। বস্তুতঃ, তাজমহল-নির্ম্মাণকালে বাদশাহের চক্ষে স্বর্ণমুষ্টি ও ধূলিমুষ্টিতে কোনও প্রভেদ ছিল না। তাজমহল রত্নাদিতে ভূষিত করিবার অভিপ্রায়ে শাহজাহান বিপুল অর্থব্যয় করিয়া, বোগদাদ, আরব, সিংহল ও মিশর প্রভৃতি দূরদেশ হইতে মহার্ঘ প্রস্তররাশি আনয়ন করিয়াছিলেন। তাজের নির্ম্মাণকার্য্যে প্রত্যহ বাইশ সহস্র শ্রমজীবী নিরত থাকিত। দশ বৎসরে (১৬২৮—৩৮) তাজ সম্পূর্ণ হয়। শাহজাহান প্রিয়-তমা মহিষীর এই অপূর্ব্ব সমাধিমন্দিরের নির্ম্মাণে কিঞ্চিদধিক চারি কোটী মুদ্রা ব্যয় করেন। শ্লীমেন সাহেব সস্ত্রীক তাজ দর্শন করিয়া তৎসম্বন্ধে পত্নীর মত জিজ্ঞাসা করেন। তদুত্তরে তিনি বলেন, "তাজের সৌন্দর্য্যের বর্ণনা করা অসাধ্য ব্যাপার। এরূপ একটি সমাধিমন্দিরলাভের আশায় আমি অম্লানবদনে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে পারি।"

আকবর শাহ আগ্রাতে দুর্গ ও রাজধানীর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। শাহজাহান আগ্রা নগরী অত্যধিক উষ্ণ বোধ হওয়াতে পুনরায় দিল্লীতে রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়া নূতন দুর্গ ও প্রাসাদ প্রস্তুত করেন। ইহার পূর্ব্বে বাদশাহগণ দিল্লীতে আগমন করিয়া ইন্দ্রপ্রস্থের 'দীনপাল' নামক প্রাসাদে বাস করিতেন। কিন্তু সে প্রাসাদ জাঁকজমকপ্রিয় শাহজাহানের মনঃপূত হইত না। ১৬৩৮ খৃষ্টাব্দে অভিনব প্রাসাদের ভিত্তিপত্তন হয়, এবং ইহার দশ বৎসর পরে বাদশাহ নবনির্ম্মিত রাজপ্রাসাদের বিখ্যাত দেওয়ান-খাসে প্রথম দরবার করেন। এই নূতন রাজপ্রাসাদ শোভা ও সম্পদের আধার ও বিচিত্র স্থাপত্যসৌন্দর্য্যে সমুদ্ভাসিত। শাহজাহানের সমসাময়িক ইতিহাসবেত্তা এনায়েত খাঁ লিখিয়াছেন, "সর্ব্বজ্ঞ বাদশাহের মনে আপনার মহান্ হৃদয়ের লালসাতৃপ্তির উপযোগী * * *

স্থান-নির্ব্বাচনের কল্পনা উদিত হয়। (বহু অনুসন্ধানের পর বাদশাহ দিল্লীর উপকণ্ঠে ও সেলিমগড়ের মধ্যপথে স্থান নির্ব্বাচন করেন।) * * * পরিশ্রমপটু শ্রমজীবিগণ ভিত্তি খনন করিতে আরম্ভ করে, এবং ১০৪৯ হিজিরী অব্দের মহরম চাঁদের নবম দিনে রজনীযোগে এই সুন্দর হর্ম্ম্য-রাজির প্রথম প্রস্তরখণ্ড প্রোথিত হয়। সাম্রাজ্যের প্রত্যেক অংশের শিল্পিগণ, কারুনিপুণ ভাস্কর, রাজমিস্ত্রী ও সূত্রধর, সকলেই অবশ্যপ্রতিপাল্য রাজাদেশে সম্মিলিত হয়। এতদ্ব্যতীত বহুসংখ্যক শ্রমজীবী কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। ষাট লক্ষ টাকা ব্যয়ে, বাদশাহের সিংহাসনারোহণের দ্বাবিংশতম বর্ষে রবিউলআওয়াল চাঁদের ২৪শে তারিখে, এই হর্ম্ম্যরাজির নির্ম্মাণ সমাপ্ত হয়।

সৌন্দর্য্যপিপাসু শাহজাহান দিল্লী ও আগ্রার সৌন্দর্য্যবর্দ্ধনের জন্য তিনটি সুদৃশ্য ও সুশোভন মসজিদ্ নির্ম্মিত করেন। আগ্রার জুম্মা মস্‌জিদের নির্ম্মাণ কার্য্য ১৬৫০ খৃষ্টাব্দে সমাপ্ত হয়। তাহার পর আগ্রায় মতি মস্‌জিদ্ নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই উভয় উপাসনা-গৃহই বিচিত্র কারুকার্য্যে খচিত। মসজিদ-নির্ম্মাণে রাজকোষের বিপুল অর্থরাশি ব্যয়িত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত দিল্লী নগরী শোভিত করিবার জন্য বাদশাহ জুম্মা মসজিদ গঠন করেন। এই সুরম্য অট্টালিকা সম্বন্ধে সৌন্দর্য্যগ্রাহী কার্ত্তসন যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা আমরা এখানে উদ্ধৃত করিলাম;—"অট্টালিকাটি সমুচ্চ ভিত্তির উপর সংস্থাপিত; ইহার তোরণত্রয়, সম্মুখভাগ ও গম্বুজ-সমূহের এরূপ মনোরম সামঞ্জস্য বিধান করিয়া গঠন কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে যে, সমস্ত অট্টালিকা বৈচিত্র্য ও পারিপাট্যে পরিপূর্ণ।"

শাহজাহান প্রজাহিতৈষী শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তিনি প্রজার হিতকল্পে বিবিধ সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। কৃষিকার্য্যের উন্নতির জন্য খাল-খনন এবং দিল্লীবাসিগণকে নির্ম্মল পানীয় জল প্রদান, এই দুই অনুষ্ঠানই শাহজাহানের কীর্ত্তি। রাবি নদ হইতে সুবৃহৎ খাল খনিত হইয়াছিল। বাদশাহ-নামা নামক ঐতিহাসিক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে, শাহজাহান স্বয়ং এই কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিবার জন্য লাহোরে গমন করিয়াছিলেন। খিন্যারা-বাদ হইতে দিল্লী পর্য্যন্ত আর একটি খাল খনিত হয়। এই খালের জলে কৃষিকার্য্যের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। শাহজাহানের যত্নে ও চেষ্টায় হিমালয়ের পাদদেশ হইতে এক দিকে হিসার ও অন্য দিকে দোয়াবের মধ্যস্থল পর্য্যন্ত বিস্তৃত সমগ্র ভূমি সজলা হইয়াছিল; ইহাতে বিশাল ভূখণ্ড ফলশস্যে

পূর্ণ হয়; লক্ষ লক্ষ নর নারী দুর্ভিক্ষের করাল কবল হইতে পরিত্রাণ লাভ করে।

ভারতীয় মোসলমান রাজন্যকুলে শাহজাহানের স্থায় আর কোনও নরপতিই ঐশ্বর্য্যশালী ছিলেন না। তাঁহার সহচরবৃন্দের, তাঁহার কর্ম্মচারিবর্গের, তাঁহার দরবারের ব্যয় অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়াছিল। তিনি দরবার-কক্ষের সৌন্দর্য্যবর্দ্ধনের জন্ম মহার্হ মণিমুক্তায় বিভূষিত ময়ূর-সিংহাসন নির্ম্মাণ করেন। শাহজাহানের সমসাময়িক আবদুল হামিদ লাহোরী লিখিয়াছেন,—"কালক্রমে বহুসংখ্যক মহার্ঘ রত্ন রাজভাণ্ডারে সঞ্চিত হইয়াছিল; ইহার প্রত্যেকখানি সূর্য্যদেবের কটিবন্ধনী সুশোভিত করিবার, অথবা ভিনস দেবীর কর্ণাভরণের উপযুক্ত। সম্রাটের সিংহাসনারোহণের পরে তাঁহার মনে উদিত হয় যে, এই সকল দুষ্প্রাপ্য মণি মুক্তায় কেবলমাত্র একটি কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারে; সে কার্য্য সাম্রাজ্যের সিংহাসনের সৌন্দর্য্যবর্দ্ধন! * * * এই জন্ম রাজভাণ্ডারে যে সকল মণি মুক্তা সঞ্চিত ছিল, তদ্ব্যতীত আরও দুইকোটী টাকা মূল্যের বিভিন্নশ্রেণীর রত্ন সংগ্রহ করিবার জন্ম বাদশাহ আদেশ করেন। (তাহার পর) পাঁচ হাজার মিস্কল ওজনের ও আটষট্টি হাজার টাকা মূল্যের উৎকৃষ্ট মণি মুক্তা সহ এই সকল রত্ন স্বর্ণকার বিভাগের অধ্যক্ষ বিবাদল খাঁকে প্রদান করিবার আদেশ প্রদত্ত হয়। এতদ্ব্যতীত তাঁহাকে চৌদ্দ লক্ষ টাকা মূল্যের এক লক্ষ তোলা (দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার মিস্কল) বিশুদ্ধ স্বর্ণ প্রদান করা হয়। সিংহাসনখানি দৈর্ঘ্যে তিন গজ, প্রস্থে আড়াই গজ ও উচ্চতায় পাঁচ গজ। চন্দ্রাতপের বহির্ভাগে মীনার (enamel) কাজ করিয়া তাহার মধ্যে মধ্যে রত্ন বিন্যস্ত করিয়া ও অন্তর্ভাগ পদ্মরাগ মণি প্রভৃতি মহার্ঘ রত্ন দ্বারা ঘনভাবে অলঙ্কৃত করিয়া, সিংহাসনখানি মরকতবিনির্ম্মিত দ্বাদশটি স্তম্ভের উপর সংস্থাপিত হইয়াছিল। প্রত্যেক স্তম্ভের উপর দুইটি করিয়া রত্নবিভূষিত ময়ূর, এবং দুইটি ময়ূরের মধ্যস্থলে এক একটি পদ্মরাগমণি, হীরা, মরকত ও মুক্তায় পরিশোভিত বৃক্ষ বিরাজিত। সিংহাসনে আরোহণের জন্য মণিমুক্তাখচিত তিনটি সোপান। এই সিংহাসনের নির্ম্মাণ কার্য্যে সাত বৎসর অতিবাহিত হইয়াছিল, এবং এক কোটী মুদ্রা ব্যয়িত (মজুরী?) হইয়াছিল। সিংহাসনের গদী নির্ম্মাণ করিবার জন্য মণি মুক্তায় অলঙ্কৃত এগারখানি তক্তা ব্যবহৃত হইয়াছিল; তাহার মধ্যস্থানীয় তক্তাখানি বাদশাহের উপবেশনের নিমিত্ত স্থাপিত। উহার গঠনে দশ লক্ষ টাকা ব্যয়িত

হইয়াছিল। ইরাণের অধিপতি শাহ আব্বাস জাহাঙ্গীরকে এক লক্ষ মুদ্রা মূল্যের একখানি পদ্মরাগ মণি উপহার দিয়াছিলেন; তাহাও এই মধ্যস্থলীয় তক্তায় বিন্যস্ত হইয়াছিল। শাহজাহান দক্ষিণাপথ-বিজয় সম্পন্ন করিলে, জাহাঙ্গীর তাঁহাকে এই মণি প্রদান করিয়া পুরস্কৃত করেন। ইহার পৃষ্ঠে তৈমুর, মীর শাহরুখ ও মীরজা উলুগ বেগের নাম খোদিত আছে। কাল-ক্রমে ইহা শাহ আব্বাসের হস্তগত হইলে, তিনিও তাহাতে আপনার নাম অঙ্কিত করেন। জাহাঙ্গীর এই মণিখণ্ড প্রাপ্ত হইয়া পূর্ব্বোক্ত নামসমূহের নিম্নে স্বীয় পিতার ও নিজের নাম সংযুক্ত করিয়াছিলেন। এক্ষণে বর্ত্তমান বাদশাহের নামও ইহাতে অঙ্কিত হইয়াছে।"

এত অপরিমিত ব্যয় সত্ত্বেও শাহজাহান কখনও অর্থের জন্য প্রজাপীড়ন করেন নাই, অথবা রাজকোষের দৈন্যদশা উপস্থিত হয় নাই। এই জন্যই বাদশাহের কার্য্যের সমর্থন করা যাইতে পারে। (১) শাহজাহান বিপুল ব্যয়-

(১) মৃত আমীর ওমরাহগণের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা মোগল বাদশাহগণের চিরন্তন প্রথা। আকবর বাদশাহ আমীর ওমরাহের পরিত্যক্ত সম্পত্তি গ্রহণে পরাঙ্মুখ ছিলেন। কিন্তু শাহজাহানের তাহাতে অরুচি ছিল না। এ সম্বন্ধে দুইটি কৌতুকাবহ ঘটনার বিবরণ আমরা এ স্থলে লিপিবদ্ধ করিতেছি। লেইকনাম খাঁ নামক এক জন বিশিষ্ট রাজপুরুষ বিপুল ধনের অধিকারী ছিলেন। তাঁহার মৃত্যু আসন্ন হইলে তিনি গোপনে এই ধনরাশি দরিদ্র-দিগকে বিতরণ করেন, এবং তাহার পর বহুসংখ্যক ছিন্ন পাদুকা, পুরাতন লৌহ, হাড় ও শততালিবিশিষ্ট বস্ত্র দ্বারা ধনভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া রাখেন। তাঁহার মৃত্যুর পর বাদশাহ অর্থ-লাভাশায় উৎসুকহৃদয়ে এই ধনভাণ্ডার উদ্‌ঘাটন করিয়া একান্ত অপ্রতিভ হন। এক জন ধনাঢ্য হিন্দু বণিকের মৃত্যুর পর তদীয় বিলাসপরায়ণ উচ্ছৃঙ্খল পুত্র ধনরাশি হস্তগত করিতে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু তাহার প্রকৃতি একান্ত উচ্ছৃঙ্খল ছিল বলিয়া তদীয় মাতা তাহাতে বাধা প্রদান করিয়া নিজে সমস্ত ধন অধিকার করেন। এ জন্য বণিকপুত্র নিজের মাতার বিরুদ্ধে রাজদ্বারে অভিযোগ উপস্থিত করে। পরলোকগত বণিক অনেক সময় রাজকার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন। বাদশাহ এই ঘটনার বিষয় অবগত হইয়া বিধবা বণিকপত্নীকে রাজদরবারে আহ্বান করিয়া সঞ্চিত ধনের একার্দ্ধ রাজকোষে অর্পণ করিবার আদেশ দেন। তদুত্তরে বিধবা বলেন, "আমার পুত্র তাহার পিতার ধনের দাবী করিতে পারে; অভিযোগ-কারী আমাদের পুত্র, কাজেই উত্তরাধিকারী। আমি দীনভাবে জিজ্ঞাসা করি, আমার পর-লোকগত স্বামীর সহিত জাঁহাপনার কি সম্পর্ক ছিল যে, জাঁহাপনা তাঁহার পরিত্যক্ত ধনের অর্দ্ধাংশ দাবী করিতেছেন?" বাদশাহ তাঁহার এই রহস্যপূর্ণ সরল বাক্যে প্রীতিলাভ করিয়া উচ্চহাস্য করিয়া উঠেন, এবং তাঁহার ধনরাশির একার্দ্ধ বাজেয়াপ্ত করিবার আদেশের প্রত্যাহার করেন।

সাধ্য কার্য্য-সমূহ এরূপ শৃঙ্খলাসহকারে সম্পন্ন করিয়াছিলেন যে, আমেদনগর-বিজয়ের, কান্দাহার অভিযানের, বাল্ক যুদ্ধের, অট্টালিকারাজি-নির্ম্মাণের, রাজকার্য্যের ও দুই লক্ষ নিয়মিত অশ্বারোহী সৈন্যের ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়াও, তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে কিঞ্চিন্ন্যূন নগদ ছয় কোটী টাকা রাজকোষে সঞ্চিত রাখিয়া যান। এতদ্ব্যতীত রাশি রাশি মণি মুক্তা, স্বর্ণ, রৌপ্য রাজভাণ্ডারে সঞ্চিত ছিল। বর্ণিয়ার সঞ্চিত মণি মুক্তা স্বর্ণ ও রৌপ্যরাশির মূল্যের পরিমাণ ছয় কোটী মুদ্রা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু কাফি খাঁর মতে, সঞ্চিত সম্পত্তির পরিমাণ চব্বিশ কোটী মুদ্রার ন্যূন ছিল না। কাফি খাঁর নির্দ্দেশ অতিরঞ্জিত নহে, এরূপ বিবেচনা করিবার অনেক কারণ বিদ্যমান।

শাহজাহানের রাজত্বকালে কেবল যে রাজভাণ্ডার স্ফীত, আগ্রা দিল্লী বিচিত্র সৌধমালায় সুশোভিত ও দরবারের জাঁকজমক বর্দ্ধিত হইয়াছিল, তাহা নহে। প্রকৃতিপুঞ্জের সুখ সমৃদ্ধিও বহুলপরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছিল। ম্যাণ্ডিস্লো আগ্রা নগরীকে আয়তনে ইস্পাহানের দ্বিগুণ বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি আগ্রা নগরীর সুপ্রশস্ত রাজপথ, সুদৃশ্য পণ্যবীথিকা, অসংখ্য স্নানাগার ও পান্থশালার প্রভৃত প্রশংসায় আপনার গ্রন্থ পূর্ণ করিয়াছেন। মোগল শাসনকালে বহুসংখ্যক বিদেশী ভ্রমণকারী এ দেশে আগমন করিয়াছিলেন; তাঁহারা সকলেই একবাক্যে সমৃদ্ধিপূর্ণ নগরমালার ও অমিতফলশস্যপূর্ণ দেশের বর্ণনা করিয়াছেন। ম্যাণ্ডিস্লোর বিবরণ হইতে গুজরাটের সমৃদ্ধির বিবরণ, গাঁরিক ও ব্রুটনের প্রবন্ধ হইতে বঙ্গ-বিহারের ধন ধান্যের কথা ও ট্যাভারনিয়ারের ভ্রমণকাহিনী হইতে সমগ্র দেশের ঐশ্বর্য্যের কাহিনী জানা যাইতে পারে।

বর্ত্তমান ভারতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকগণের বর্ণিত সমৃদ্ধির বৃত্তান্ত অতিরঞ্জিত বলিয়া সন্দেহ জন্মিতে পারে। কিন্তু পরিত্যক্ত নগরমালার ভগ্নাবশেষ, হর্ম্ম্যরাজির ও জলপ্রণালীর চিহ্ন আজ পর্য্যন্ত নানা স্থানের জঙ্গলে দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত আধুনিক রাজপথের পার্শ্বে প্রাচীন পথের অবশেষ, কূপ ও পান্থশালার চিহ্ন পথিকের দৃষ্টিপথে পতিত হইয়া থাকে। এই সকল ভগ্নাবশেষ মোগল শাসনকালের ঐশ্বর্য্যের পরিচায়ক, তাহাতে সন্দেহ নাই। (১)

---

(১) আমরা শাহজাহান বাদশাহের রাজত্বের যে বর্ণনা করিলাম, তাহাতে পাঠকগণ মনে করিবেন না যে, তাঁহার আমলে প্রকৃতিপুঞ্জের সুখশান্তি সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ ছিল। তখনও রাজস্ব-

স্বচ্ছল রাজকোষ, শান্তিপূর্ণ দেশ, সমৃদ্ধ প্রজা লইয়াও শাহজাহান পূর্ণ সুখশান্তি উপভোগ করিতে পারেন নাই। বাদশাহের চারি পুত্র ও দুই কন্যা ছিল। পুত্র,—দারা, সুজা, আওরঙ্গজেব ও মুরাদ; কন্যা,—জাহানারা ও রোশেনারা। ১৬৩৩ খ্রীষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথমে রাজকুমারগণ রাজনৈতিক কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েন।

কিশোরবয়স্ক আওরঙ্গজেব আপনার বয়সের তুলনায় প্রখর বুদ্ধিমত্তা ও অসাধারণ সাহসের পরিচয় প্রদান করিয়া বাদশাহের একান্ত প্রিয়পাত্র হন। স্নেহশীল বাদশাহ কখনও কোন রাজকুমারকে উপেক্ষা করেন নাই। তথাপি অপর রাজকুমারত্রয় আওরঙ্গজেবের প্রতিপত্তিদর্শনে ঈর্ষ্যান্বিত হন। বিশেষতঃ, মদগর্ব্বিত উচ্ছৃঙ্খল সুজার পক্ষে পিতার এই পক্ষপাত অসহ্য হইয়াছিল। এ জন্য তিনি রাজ-দরবার হইতে দূরে থাকিবার অভিলাষ প্রকাশ করেন। তদনুসারে বাদশাহ তাঁহাকে পাঁচহাজারী মনসব প্রদান করিয়া দক্ষিণাপথের শাসনকর্ত্তৃপদে নিযুক্ত করেন। দ্বিতীয় রাজকুমার সুজা রাজসম্মান লাভ করাতে জ্যেষ্ঠ পুত্র দারা আপনাকে অপমানিত মনে করেন। বাদশাহ তাঁহার ক্ষুব্ধ চিত্ত শান্ত করিবার অভিপ্রায়ে বলেন, "দারা, রাজকুমারগণের মধ্যে তুমিই সর্ব্বাপেক্ষা আমার হৃদয়ের অধিকতর নিকটবর্ত্তী; এ জন্য তোমাকে সন্নিধানে রাখিয়াছি।" কিন্তু দারা বাদশাহের বাক্যে শান্ত না হওয়াতে তিনি তাঁহাকে ছয়হাজারী মনসব প্রদান করেন। সৌভ্রাত্র বহুকাল পূর্ব্বে তৈমুর-বংশীয় রাজকুমারগণের হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইয়াছিল। শাহজাহানের পুত্রগণও পরস্পরকে ঘৃণা করিতেন। রাজকুমারগণের মনোমালিন্যনিবন্ধন রাজসংসারে অশান্তির অবধি ছিল না। বাদশাহ ভ্রাতৃবর্গের মনোমালিন্যের মূলোচ্ছেদ করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহাদিগকে কার্য্যভার প্রদান করিয়া দূরদেশে প্রেরণ করেন। সুজা বঙ্গদেশের, আওরঙ্গজেব দক্ষিণাপথের ও মুরাদ গুজ-

---

নিবন্ধন বিচার-ব্যভিচারও সংঘটিত হইত। ইউরোপীয় ভ্রমণকারিগণের সাক্ষ্যে জানা যায় যে, শুল্কগ্রাহী কর্ম্মচারিগণ অত্যাচার করিয়া অর্থশোষণ করিত। ইঁহারা প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা-দিগের খামখেয়ালির বৃত্তান্তও লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ভারতবর্ষের অনেক স্থান জঙ্গলে আবৃত ছিল। এই সকল স্থানে চোর ডাকাত নির্ব্বিঘ্নে অবস্থান করিত। কখন কখন রাজপুরুষ অথবা সামন্তগণ বিদ্রোহী হওয়ায় দেশমধ্যে অশান্তি বিস্তৃত হইয়া পড়িত। কিন্তু এ সকল সত্ত্বেও শাহজাহানের শাসনসময়ে দেশ শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধিশালী ছিল, এবং তাঁহার

রাটের শাসন-কর্ত্তার পদলাভ করেন। দারা সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ও সিংহাসনের উত্তরাধিকারী বলিয়া রাজসন্নিধানেই থাকেন।

কিন্তু এই ব্যবস্থায় সুফল ফলিল না। রাজকুমারগণ সকলেই কার্য্যপটু ও শৌর্য্যবীর্য্যশালী ছিলেন। তাঁহারা ধনধান্যপূর্ণ প্রদেশসমূহের শাসনকর্ত্তার পদে অভিষিক্ত হইয়া ধনবলে ও জনবলে পরাক্রমশালী হইয়া উঠিলেন, এবং পিতার মৃত্যুর পর রাজসিংহাসন অধিকার করিবার উপায়-উদ্ভাবনে নিরত হইলেন। তাঁহাদের অবিশ্রান্ত চক্রান্তের ফলে রাজপুরুষগণ বাদশাহের জীবদ্দশাতেই এক এক পক্ষ অবলম্বন করেন। বাদশাহের মৃত্যুর পর রাজসিংহাসনাভিলাষী রাজকুমারগণের সংঘর্ষণ আরম্ভ হইবে, এবং তাহার ফলে মোগল সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া পড়িবে, এই আশঙ্কায় বাদশাহের হৃদয়ে অশান্তির সীমা ছিল না।

এই প্রকার মানসিক অশান্তির সময় ১৬৫৭ খৃষ্টাব্দে বাদশাহ সহসা পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া শয্যাগত হইলেন। শাহজাহানের বার্দ্ধক্যকালে জ্যেষ্ঠপুত্র দারা শেকোর হস্তে অধিকাংশ রাজকার্য্যের ভার পতিত হইয়াছিল। বার্ণিয়ার লিখিয়াছেন, "শাহজাহান দারাকে আদেশ প্রচার করিবার ও রাজসিংহাসনের নিম্নে ওমরাহ শ্রেণীর মধ্যে সিংহাসন পাতিয়া উপবিষ্ট হইবার অনুমতি প্রদান করিয়াছিলেন; অতএব বোধ হইত, যেন প্রায় সমানক্ষমতাপন্ন দুই জন রাজা শাসনকার্য্য নির্ব্বাহিত করিতেছেন।" কাত্রু লিখিয়াছেন,—"তাঁহার (শাহজাহানের) জ্যেষ্ঠপুত্রের রাজ্যশাসন বিষয়ে অপ্রতিহত ক্ষমতা ছিল। তিনি যদৃচ্ছাক্রমে হস্তীর ক্রীড়ার জন্য আদেশ প্রচার করিতে পারিতেন; এ ক্ষমতা-পরিচালনের অধিকার কেবলমাত্র বাদশাহগণেরই ছিল।" শাহজাহান রোগাক্রান্ত হইলে দারা প্রতিনিধিপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া রাজকার্য্য-নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। এই সময় জনরব প্রচারিত হইল যে, শাহজাহান ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। দারা শেকো পিতার জ্যেষ্ঠপুত্র ও একান্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। এই জন্য প্রজাপুঞ্জ তাঁহাকেই মোগল সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী বলিয়া নির্দ্দেশ করিত, এবং তিনি নিজেও মনে মনে আপনাকে ভাবী সম্রাট জ্ঞান করিতেন। কিন্তু অপর রাজকুমারগণও তক্ত-তাউসে অধিরোহণ করিবার আশায় জলাঞ্জলি দেন নাই। শাহজাহান পীড়িত হইবার পূর্ব্ব হইতেই তাঁহারা তদুপযোগী আয়োজনে প্রবৃত্ত ছিলেন। পিতার মৃত্যুসংবাদ

লোলুপ ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের ন্যায় রাজধানীর অভিমুখে ধাবিত হইলেন। তাঁহারা পথিমধ্যে অবগত হইলেন যে, বাদশাহ জীবিত আছেন। তথাপি তাঁহারা রাজধানীর অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

রাজকুমারত্রয়ের মধ্যে সুজাই সর্ব্বাপেক্ষা অগ্রবর্ত্তী হইয়াছিলেন। এ জন্য দারা শেকো সর্ব্বাগ্রে তাঁহার গতিরোধে প্রবৃত্ত হইলেন। বারাণসীর সন্নিকটে উভয় সৈন্যে সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। সুজা রাজসৈন্যের আক্রমণ সহ্য করিতে না পারিয়া রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিলেন।

সুজা পরাস্ত হইলে রাজসৈন্য আওরঙ্গজেব ও মুরাদ বক্সকে শিক্ষা দিবার জন্য ধাবিত হইল। আওরঙ্গজেব দেখিলেন যে, রাজসৈন্য পরাজিত করিতে পারিলেও তাঁহার পথ নিষ্কণ্টক হইবে না। মুরাদ বক্স তাঁহার প্রবল প্রতিদ্বন্দী, এবং সুজা রাজসৈন্যের পরাক্রমে নিস্তেজ ও হীনবল হইলেও, পুনরায় শক্তিসঞ্চয় করিয়া ভাগ্যপরীক্ষায় সচেষ্ট। এই জন্য আওরঙ্গজেব নিজের প্রকৃত মনোভাব গুপ্ত রাখিয়া কৌশলে মুরাদকে হস্তগত করিয়া তাঁহার সাহায্যে রাজসিংহাসন অধিকার করিবার মানস করিলেন। এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য তিনি মুরাদকে বলিয়া পাঠাইলেন, "আমি রাজত্বের প্রয়াসী নহি। বিধর্ম্মী দারা ও ব্যসনরত সুজা সিংহাসনে আরোহণ করিতে না পারিলেই আমার মনস্কামনা সিদ্ধ হয়। একমাত্র তুমিই সিংহাসনে বসিবার যোগ্য। আমার ইচ্ছা, তোমাকে সাহায্য করি। তুমি সিংহাসনে আরোহণ করিলেই আমি ফকিরী গ্রহণ করিব। ভাই! তোমার সহিত সম্মিলিত হইবার অনুমতি দাও।" মুরাদ বক্স আওরঙ্গজেবের ছলনায় প্রতারিত হইয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন, এবং উভয় ভ্রাতা একত্র আগ্রার সন্নিধানে উপনীত হইয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে পরাজিত ও বৃদ্ধ পিতাকে অবরুদ্ধ করিয়া, রাজধানী অধিকার করিলেন। দারা শেকো শত্রুহস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিবার আশায় সিন্ধুপ্রদেশে পলায়ন করিলেন।

আওরঙ্গজেব ও মুরাদ বক্স দারার অনুসরণ করিয়া মথুরায় উপনীত হইলেন। সরলহৃদয় মুরাদ শৌর্য্য বীর্য্যে অলঙ্কৃত ছিলেন। তিনি আন্তরিক সাধুতা ও সত্যানুরাগ নিবন্ধন মহাত্মা সাদির উপদেশবাক্যে অবহেলা করিয়াছিলেন। (১) আওরঙ্গজেবের তোষামোদবাক্যে ও মহার্ঘ উপঢৌকনে প্রলুব্ধ ও মুগ্ধ হইয়া তিনি তাঁহাকে বিশ্বাস করিয়াছিলেন। মথুরায় উপনীত

হইয়া তিনি এই সরল ব্যবহারের পুরস্কার প্রাপ্ত হইলেন। এই স্থানে আওরঙ্গজেব বিশ্বাসঘাতকতার একশেষ প্রদর্শনপূর্ব্বক মুরাদকে বন্দী করিয়া স্বয়ং রাজমুকুট ধারণ করিলেন। রাজকুমারের পদদ্বয় রৌপ্যশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইল। আওরঙ্গজেব তাঁহাকে গোয়ালিয়রের দুর্গে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিবার জন্য হস্তিপৃষ্ঠে সেলিমগড়ের অভিমুখে প্রেরণ করিলেন। সেলিমগড়ের পথে প্রেরিত হস্তী ব্যতীত আর তিনটি সুসজ্জিত হস্তী অন্য তিন দিকে প্রেরিত হইল। রাজকুমারের পক্ষপাতী সৈন্যগণ পথিমধ্যে আওরঙ্গজেবের সৈন্যদিগকে আক্রমণ করিয়া তাঁহার উদ্ধারসাধন করিতে পারে, এই আশঙ্কায় আওরঙ্গজেব এইরূপ সতর্ক হইয়াছিলেন।

ইহার অব্যবহিত পরেই সুজা পুনরায় বলসঞ্চয় করিয়া রাজধানীর সমীপবর্ত্তী হইলেন। আওরঙ্গজেব দারার অনুসরণ পরিত্যাগ করিয়া সুজাকে বিদূরিত করিবার জন্য ধাবিত হইলেন। উভয় সৈন্য সম্মুখীন হইলে তুমুল যুদ্ধ আরব্ধ হইল। বহুক্ষণব্যাপী অবিশ্রান্ত যুদ্ধের পর বিজয়লক্ষ্মী মহম্মদ সুজার প্রতি কৃপাকটাক্ষ নিক্ষেপ করিলেন। আওরঙ্গজেব যুদ্ধে পরাজয় অনিবার্য্য দেখিয়া, বঞ্চনাবলে জয়লাভ করিবার কল্পনা করিলেন। তাঁহার কৌশলে সুজার দক্ষিণবাহুস্বরূপ আলীবর্দ্দী খাঁ প্রলুব্ধ হইয়া সুজাকে হস্তিপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া অশ্বে আরোহণ করিবার পরামর্শ দিলেন। সুজা আলীবর্দ্দীর মন্ত্রণাক্রমে হস্তিপৃষ্ঠ হইতে অবতীর্ণ হইয়া অশ্বে আরোহণ করিলেন। আওরঙ্গজেব এই সংবাদ অবগত হইয়া জয়বাদ্যবাদনের আদেশ দিলেন। সুজার সৈন্যগণ শত্রুসৈন্যের জয়ধ্বনি শ্রবণ করিয়া ও সুজাকে হস্তিপৃষ্ঠে না দেখিয়া মনে করিল যে, তাহাদের প্রভু সুজা নিহত হইয়াছেন, এবং আওরঙ্গজেব জয়লাভ করিয়াছেন। তখন তাহারা রণক্ষেত্রে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়া, যে যে দিকে পারিল, পলায়ন করিল। সুজার পরাজয় এরূপ গুরুতর হইল যে, তাঁহার পুনরভ্যুত্থানের ক্ষমতা বিলুপ্ত হইয়া গেল। (১) তদবধি এই প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে যে, "সুজা জিৎ বাজী আপনা হাতে হারা।"

সুজা সমূলে বিনষ্ট, দারা সিন্ধুপ্রদেশে নির্ব্বাসিতপ্রায়, মুরাদ গোয়ালিয়ারের অন্ধকার কারাগারে বন্দী, তথাপি আওরঙ্গজেব আপনাকে নিরাপদ মনে না

(১) সুজা আওরঙ্গজেবের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া বঙ্গদেশে উপনীত হন। তথায় তিনি পুনরায় বলসংগ্রহের চেষ্টা করেন ; তাহাতে ব্যর্থকাম হইয়া আরাকাণ-রাজের আশ্রয় গ্রহণ করেন ; কিন্তু নিষ্ঠুর আরাকাণ-রাজের আদেশে সপরিবারে নৃশংসভাবে নিহত হন।

করিয়া পুনর্ব্বার দারার অনুসরণ করিলেন। দারাও শক্তিসঞ্চয় করিয়া আওরঙ্গজেবের সম্মুখীন হইলেন। কিন্তু তিনি পুনর্ব্বার পরাজিত হইয়া বেগম, শাহজাদী ও কতিপয় অনুচরের সহিত আহমদাবাদের অভিমুখে পলায়ন করিলেন।

এই সময় দারার কষ্টের একশেষ হইয়াছিল। পথিমধ্যে কৃতঘ্ন অনুচরগণ তাঁহার ধনসামগ্রী লুণ্ঠন ও শাহজাদীগণের গাত্রাভরণ অপহরণ করিল। মোগল সাম্রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারী দারা নিরাপদ হইবার আশায় দুর্বিষহ পথকষ্ট তুচ্ছ করিয়া আহম্মদাবাদে উপনীত হইলেন। কিন্তু তত্রত্য মুসলমান শাসনকর্ত্তা আওরঙ্গজেবের ভয়ে ভীত হইয়া তাঁহাকে আশ্রয়প্রদান করিলেন না। এই সংবাদ দারার নিকট পঁহুছিলে মহিলাগণের আর্ত্তনাদে পাষাণও বিগলিত হইল। দারা একান্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। তিনি পরিত্রাণের আশায় সামান্য পদস্থ সৈনিকের সহিতও পরামর্শ করিতে লাগিলেন; কিন্তু কেহই কোন সদুপায়ের উদ্ভাবন করিতে পারিল না। দারা নিরুপায় হইয়া তদ্দেশীয় দস্যুদলের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তাহাদের যত্নে তিনি গুজরাটে উত্তীর্ণ হইয়া কচ্ছদেশের প্রান্তভাগে উপনীত হইলেন, এবং তথা হইতে স্থানীয় জমীদারের আশ্রয় ভিক্ষা করিলেন। কিন্তু কচ্ছের জমীদার পূর্ব্বোপকার বিস্মৃত হইয়া তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিতে কুণ্ঠিত হইল না। এই স্থান হইতে দারা বাষ্পাকুললোচনে বিদায় গ্রহণ করিলেন। ইহার পর তিনি বাত্যাতাড়িত বৃক্ষপত্রের ন্যায় নানা স্থানে ঘূর্ণিত হইতে লাগিলেন; কিন্তু কোথাও আশ্রয় পাইলেন না। অবশেষে তিনি ধান্দরের অধিপতি মালিক জিওয়ানের (১) নিকট উপনীত হইলেন। মালিক জিওয়ান তাঁহাকে সাদরে ও সসম্মানে আশ্রয়প্রদান করিল; কিন্তু গোপনে তাঁহাকে আওরঙ্গজেবের হস্তে সমর্পণ করিয়া রাজানুগ্রহলাভের চেষ্টা করিতে লাগিল। মালিকের আশ্রয় গ্রহণ করিবার কয়েক দিন পরেই দারার মহিষী অনাহার ও পথের কষ্টে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। দারা মহিষীকে লাহোরে সমাহিত করিবার জন্য অধিকাংশ অনুচরবর্গকে মৃতদেহ সহ তথায় প্রেরণ করিয়া, স্বয়ং মালিকের দরবারে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

এই সুযোগে মালিক তাঁহাকে শত্রুহস্তে সমর্পণ করিবার মনন করিল।

(১) ঐতিহাসিক এল্‌ফিন্‌ষ্টন্ এই ব্যক্তিকে জুনের অধিপতি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা মুন্তাখবুল-লুবাব নামক গ্রন্থের অনুসরণ করিলাম।

দারা নিদ্রিত ছিলেন। এমন সময় মালিক তাঁহাকে ও তদীয় কনিষ্ঠ কুমার সেপের শেকোকে বন্দী করিবার জন্য অনুচরগণ সহ কক্ষাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। মালিক সেপের শোকোকে ধৃত করিতে উদ্যত হইলে, তিনি বিপুল সাহসে আত্মরক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন, এবং তীর ও ধনু গ্রহণ করিয়া তিন জন অনুচরকে ভূশায়ী করিলেন। সেপের শেকো একে বালক, তাহাতে শত্রুগণ সংখ্যায় অধিক; সুতরাং তিনি অচিরে পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলেন; মালিক তাঁহাকে 'পিছমোড়া' করিয়া বন্ধন করিল। এই গোলযোগে দারা জাগ্রত হইয়া উঠিলেন; দেখিলেন, যে আশ্রয়দাতা, সেই ঘোর বিশ্বাসঘাতকতায় প্রবৃত্ত! তিনি মর্ম্মান্তিক ক্ষোভে ও দুঃখে অভিভূত হইয়া বলিলেন, "কৃতঘ্ন! শীঘ্র তোমার আরব্ধ কার্য্য সম্পন্ন কর। আমরা আওরঙ্গজেবের দুরকাঙ্ক্ষা-পরিতৃপ্তির জন্য প্রাণবিসর্জ্জন করিতেছি; কিন্তু মনে রাখিও, তোমার জীবনদান ব্যতীত (২) আর কোনও পাপে আমি ইহলোক হইতে অপসৃত হইবার যোগ্য নহি। আরও মনে রাখিও, কেহ কখনও কোন রাজকুমারকে 'পিছমোড়া' করিয়া বাঁধে নাই।" মালিক দারার বাক্যে বিচলিত হইয়া সেপের শেকোর বন্ধনমোচন করিয়া দিল, এবং তাঁহাদের পাহারার জন্য অনুচরবর্গকে নিযুক্ত রাখিল। ইহার পর মালিক তাঁহাদের ধন রত্ন অপহরণ করিয়া তাঁহাদিগকে শত্রুহস্তে সমর্পণ করিল।

মোগল সাম্রাজ্যের ভাবী অধিকারী বন্দিবেশে দিল্লীতে আনীত হইলেন; অতি সামান্য জীর্ণবস্ত্র পরিধান করাইয়া তাঁহাকে প্রকাশ্য রাজপথে পরিভ্রমণ করান হইল। নগরবাসিগণ দারার দুর্দ্দশা দেখিয়া উত্তেজিত হইয়া উঠিল। স্ত্রীপুরুষনির্ব্বিশেষে সকলে শোকাকুল হইল। তাহাদের কাতরধ্বনিতে রাজ-পথ মুখরিত হইতে লাগিল। আওরঙ্গজেবের ইঙ্গিতে মৌলবীগণ গুপ্তসভায় সমবেত হইয়া দরাকে বিধর্ম্মী স্থির করিয়া তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন।

দারা কারাগারে রাজকুমার সেপের শেকোর সহিত অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রচারিত হইবার পর রাজানুচরগণ তাঁহার নিকট হইতে রাজকুমারকে বলপূর্ব্বক লইয়া গেল। তিনি এই ঘটনায় মৃত্যু আসন্ন বুঝিতে পারিয়া, শেষ মুহূর্ত্তের জন্য প্রস্তুত হইলেন। খৃষ্টধর্ম্মযাজকগণ তাঁহাকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য চেষ্টিত ছিলেন। মৃত্যুর প্রাক্কালে

(২) একবার শাহাজাহান কোনও দুষ্কার্য্যের প্রতিফলস্বরূপ মালিকের প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন; কিন্তু দারার অনুরোধে তাহাকে মার্জ্জনা করিয়া অব্যাহতি প্রদান করেন।

খ্রীষ্টধর্ম্মে তাঁহার অনুরাগ জন্মিল। তিনি এক জন খৃষ্টধর্ম্মযাজককে কারাকক্ষে আনয়ন করিবার অনুমতি চাহিলেন। কিন্তু এ অনুমতি পাইলেন না। এই দুর্দ্দশার সময় তিনি ঈশ্বরের করুণালাভের প্রয়াসী হইলেন। দারা একাধিকবার বলিয়াছিলেন, "মহম্মদ আমাকে বিনাশ করিয়াছেন, যীশু আমাকে রক্ষা করিবেন।" এই সময়ে নাজির নামক এক দুরাত্মা দারাকে বিনাশ করিবার অভিপ্রায়ে কারাকক্ষে প্রবেশ করিল। মূহুর্ত্তমধ্যে সমস্ত শেষ হইয়া গেল। দারার ছিন্ন মস্তক আওরঙ্গজেবের নিকট নীত হইল। আওরঙ্গজেব, যথার্থই দারার মস্তক কি না, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, এবং তাহার পর সেই শির কারারুদ্ধ পিতার নিকট উপহারস্বরূপ প্রেরণ করিলেন। (১)

আওরঙ্গজেবের ভ্রাতৃগণের মধ্যে একমাত্র মুরাদবক্স অবশিষ্ট রহিলেন। তিনিও গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দী ছিলেন। এই স্থানে সরস্থন বাই নাম্নী প্রিয়তমা উপপত্নী তাঁহার একমাত্র সঙ্গিনী ছিল। প্রস্তরময় কঠিন কারাগারে তাঁহার দিন দীর্ঘনিশ্বাসে ও অশ্রুজলে অতিবাহিত হইতেছিল। কতিপয় অনুরক্ত মোগলের উদ্যোগে মুরাদ রজ্জুনির্ম্মিত সোপানের সাহায্যে কারাগার হইতে পলায়ন করিবার বন্দোবস্ত করিলেন; কিন্তু তাঁহার প্রিয়তমা উপপত্নী একাকিনী কারাগারমধ্যে অবস্থান করিতে অস্বীকৃত হইয়া কাতরোক্তি করিতে লাগিল। তাহার চীৎকারে প্রহরিগণ জাগরিত হইয়া উঠিল; মুরাদ আর পলায়ন করিতে পারিলেন না। এই ঘটনা আওরঙ্গজেবের শ্রুতিগোচর হইলে তিনি মুরাদকে পৃথিবী হইতে অপসৃত করিয়া সম্পূর্ণরূপে নিষ্কণ্টক হইবার সঙ্কল্প করিলেন। রাজবিপ্লবের সূত্রপাতকালে মুরাদ গুজরাটের শাসনকর্ত্তার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তৎকালে তিনি এক জন রাজপুরুষকে বধ করিয়াছিলেন। আওরঙ্গজেবের জনৈক প্রসাদাকাঙ্ক্ষী অনুচর তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করিল। বিচারাভিনয়ের পর মুরাদের অপরাধ সপ্রমাণ হওয়াতে আওরঙ্গজেব তাঁহাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিলেন।

শাহজাহান অবরুদ্ধাবস্থায় সাত বৎসর জীবিত ছিলেন। এই সময় ফরাসী

---

(১) বার্ণিয়ার লিখিয়াছেন,—আওরঙ্গজেব ছিন্নমস্তক-পরীক্ষান্তে বলেন,—"Ah (Ai) Bed bakt! A wretched one! let this shocking sight no more offend my eyes, but take away the head, and let it be buried in Humayon's

পরিব্রাজক বার্ণিয়ার মোগল রাজধানীতে উপস্থিত ছিলেন। তিনি আওরঙ্গজেবের পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনিও বলেন যে, আওরঙ্গজেব সযত্নে অবরুদ্ধ পিতার পরিচর্য্যা করিতেন, তাঁহার তৎকালীন ব্যবহার যথার্থই সম্মানব্যঞ্জক ও প্রীতিপূর্ণ বোধ হইত। তিনি প্রত্যেক বিষয়ে পিতার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। এক স্বাধীনতা ব্যতীত আওরঙ্গজেবের পক্ষে পিতাকে অদেয় আর কিছুই ছিল না। তাঁহারা ক্রমশঃ পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, এবং পিতা পুত্রের সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। এই অবস্থাতেও শাহজাহানের ভোগলালসার হ্রাস হয় নাই। তিনি সর্ব্বদা বিলাসতরঙ্গে আন্দোলিত হইতেন। আবার কখনও কখনও তাঁহার ধর্ম্মপিপাসা উপস্থিত হইত,—তখন মোল্লাগণকে কোরাণ পাঠ করিবার আদেশ দিতেন।

শাহজাহানের বন্দিদশায় তদীয় প্রিয়তমা কন্যা জাহানারাই তাঁহার জীবনের আলোকস্বরূপিণী ছিলেন। ভক্তিমতী কন্যার প্রীতিপূর্ণ সেবা শুশ্রূষাই তাঁহার সান্ত্বনার হেতু হইয়াছিল। বার্ণিয়ার জাহানারাকে অনিন্দ্যসুন্দরী, বুদ্ধিমতী ও পিতৃস্নেহপরায়ণা বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। বাদশাহ তাঁহাকে আদর করিয়া "পাদশাহ বেগম" উপাধি প্রদান করেন। কি গৃহস্থালীর তত্ত্বাবধান, কি রাজনৈতিক মন্ত্রণা, সকল বিষয়েই শাহজাহান তাঁহার উপর নির্ভর করিতেন। জাহানারাও পিতার একান্ত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী ছিলেন। আওরঙ্গজেবের চক্রান্তে বাদশাহ কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলে তিনিও স্বেচ্ছায় কারাবাসিনী হইয়াছিলেন। তাঁহার ভক্তিস্নিগ্ধ সেবাশুশ্রূষায় শাহজাহানের কারাক্লেশ যে বহুলপরিমাণে উপশমিত হইয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

"জাহানারা পিতার মৃত্যুর পরও দীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন। জাহানারার শেষ জীবন সম্ভবতঃ দিল্লীতে অতিবাহিত হইয়াছিল পুরাতন দিল্লী হইতে নূতন দিল্লীতে আসিতে পথে একটি প্রকাণ্ড সমাধিস্থান দেখিতে পাওয়া যায়। * * * তাহারই পার্শ্বে মরি! মরি! কি হৃদয়গ্রাহী দৃশ্য! যখন মোগল-কুলের কংস আওরঙ্গজেব আপন পিতা শাহজাহানকে বন্দী করিলেন, তাঁহার কন্যা জাহানারা চিরকৌমার্য্য ব্রত অবলম্বন করিয়া পিতার সেবার জন্য তাঁহার সঙ্গে কারাবাসিনী হন। তাঁহার একটি ক্ষুদ্র মর্ম্মর-কবর; মধ্যস্থান শ্যামল দুর্ব্বাদলে শোভিত। কবরের শীর্ষদেশে একটি শ্বেত মর্ম্মরফলকে তাঁহার নিজের রচিত একটি কবিতা লিখিত রহিয়াছে,—

বহুমূল্য আভরণে করিও না সুসজ্জিত
কবর আমার।
তৃণ শ্রেষ্ঠ আবরণ দীন-আত্মা জাহানারা
সম্রাট্-কন্যার।" *

শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত।

সহযোগী সাহিত্য।

মার্কিণ দৃষ্টিতে কাউণ্ট টলষ্টি।

এলবার্ট হাব্বাউ "কস্‌মোপলিটান" নামক পত্রে রুসিয়ার লোক-বিশ্রুত ঔপন্যাসিক কাউণ্ট টলষ্টি সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। লেখক বলেন, টলষ্টির 'রেসরেক্সন' নামক উপন্যাসখানি অধুনা নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া লণ্ডন, পারিস ও নিউইয়র্ক নগরের নাট্যশালাসমূহে অভিনীত হইতেছে; সুতরাং টলষ্টির প্রসঙ্গ এ সময়ে অনেকের বিশেষ চিত্তাকর্ষক হইবে। মিঃ হাব্বাউ কাউণ্ট ও তাঁহার সহধর্ম্মিণীর জীবনগত বৈষম্যচিত্রণে বহু সময় ব্যয়িত করিয়াছেন। প্রসঙ্গতঃ তিনি একটি সমারোহসম্পন্ন ভোজের বর্ণনা করিয়াছেন। এই ভোজগৃহে জনৈক মার্কিণ অতিথি উপস্থিত হইয়াছিলেন। ভোজের বর্ণনাকালে লেখক বলিয়াছেন,—ভোজ-টেবিলের পাদদেশে চর্ম্ম-সারসনে নিবদ্ধকটি সামান্য কৃষকবেশী কে এ ব্যক্তি বসিয়া আছেন? ইঁহাকে দেখিয়া ত মনোমধ্যে বিরক্তিরই সঞ্চার হইতেছে, ইঁহার কৃষকোচিত সুলভ নীল পরিচ্ছদ, প্রগল্‌ভতাব্যঞ্জক মুখাবয়ব, বৃহৎ আস্যবিবর, লোমবহুল ভ্রূযুগ, অসংস্কৃত কেশভার, লৌহধূসর দীর্ঘ শ্মশ্রু ও আতাম্র মুখমণ্ডল সমবেত ভদ্র-মণ্ডলীমধ্যে একান্ত বিসদৃশ দেখাইতেছে। কিন্তু ইঁহার দিকে একটু অগ্রসর হও দেখি, দেখিবে, তাঁহার সহানুভূতিপ্রদীপ্ত নয়নের স্নিগ্ধ দৃষ্টিপাতে মৃদু গম্ভীর কণ্ঠের সাদরসম্ভাষণে তোমার সে পূর্ব্ব বিরক্তিভাব অপনীত হইয়াছে। যেই তিনি বৃহৎ ও কঠিন করতলে তোমার করতল গ্রহণ করিবেন, অমনই তোমার বোধ হইবে, তুমি যেন এক মরুপ্রদেশবর্ত্তী বৃহৎ পর্ব্বতের ছায়াতলে

সমাগত হইয়াছ। সম্ভাষণার্থ তুমি যে সুচারু বচননিচয় অবচয়ন করিয়া রাখিয়াছিলে,তাহাও তোমার স্মৃতিপথ হইতে অন্তহিত হইয়াছে, তুমি একেবারে নির্ব্বাক্ হইয়া পড়িয়াছ।

এই বিচিত্র মূর্ত্তির বামভাগে একটি যুবতী বসিয়া আছেন। তাঁহার মুখাবয়বে তাদৃশ কোন সৌন্দর্য্যসৌষ্ঠব লক্ষিত হয় না। তাঁহার আপাদকণ্ঠ ধূসর ফ্লানেল পরিচ্ছদে আবৃত, অঙ্গ আভরণাদির সম্পর্কশূন্য। তীক্ষ্ণদৃষ্টি পরিব্রাজক দেখিবামাত্র বুঝিতে পারেন, ইনি কখন করাবরণ ব্যবহার করেন না। "আমার কন্যা" এই সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক কৃষকবেশী আগন্তককে আপনার দক্ষিণদিকস্থ আসন দেখাইয়া দিলেন। যখন সমাগত অতিথিবর্গ বিবিধ উপাদেয় খাদ্য ভোজন করিতেছিলেন, সে সময় টলষ্টি ও তাঁহার কন্যা আহারার্থ কোন দ্রব্যই গ্রহণ করিলেন না। প্রথমবার মাংস আনীত হইবার পর এক জন পরিচারিকা কক্ষের পার্শ্বদ্বার দিয়া গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইল, এবং উভয়ের সম্মুখে রেকাবে সজ্জিত সামান্য খাদ্যদ্রব্য রাখিয়া গেল। তাঁহারা রুটী ও তাহার আনুষঙ্গিক ব্যঞ্জনাদি ব্যতীত মদ্য, কাফি কি অন্য দ্রব্য স্পর্শ করিলেন না।

মিঃ হাব্বাউ টলষ্টির কার্য্যগৃহের এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন;—কক্ষটি চতুষ্কোণ, বৃহৎ, এবং নিম্নছাদবিশিষ্ট। প্রাচীরগাত্রে শ্রেণীবদ্ধ কাষ্ঠাধারে পুস্তকসমূহ সুসজ্জিত রহিয়াছে। গৃহের মধ্যস্থলে একটি সুদীর্ঘ টেবিল সংস্থাপিত, তদুপরি পুস্তক কাগজ মসীপাত্র প্রভৃতি এরূপ বিশৃঙ্খলভাবে বিক্ষিপ্ত ছিল যে, দেখিলেই বোধ হয় গৃহটি এক জন অশ্রান্ত কর্ম্মীর কর্ম্মনিলয়। গৃহের এক প্রান্তে একটি শয্যা, গৃহপতি এই শয্যায় শয়ন করেন। শয্যার পাদদেশে পাদুকাসংস্কারোপযোগী অস্ত্রাদি সজ্জিত দেখিলে, গৃহের এই প্রান্তটি কোন চর্ম্মকারের বিপণির এক পার্শ্ব বলিয়া বোধ হয়।

লেখক বিশেষ সহানুভূতি প্রকাশ পূর্ব্বক এইরূপে প্রবন্ধের উপসংহার করিয়াছেন,—সমগ্র ভূমণ্ডলে না হউক, বিপুল রুস সাম্রাজ্যে কাউণ্ট টলষ্টির মতামত বহুজনসমাদৃত ও সুদূরব্যাপী হইয়া পড়িয়াছে। তিনি গ্রীক খৃষ্ট-সম্প্রদায়ের ধর্ম্মমতসমূহের অসারতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তাঁহারই আন্দোলন-প্রভাবে রুসসম্রাট অণুমাত্র ইচ্ছা না করিলেও জনসাধারণ ও রুস গবর্মেণ্টের বিরোধভঞ্জন বিষয়ে মধ্যস্থতা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তাঁহারই চেষ্টায় সমরব্যাপার অনেকের চক্ষে নিতান্ত বীভৎস কাণ্ড বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।

বিপ্লববাদী নিহিলিষ্ট সম্প্রদায় শতশতবর্ষব্যাপী চেষ্টায় যে কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারে নাই, তিনি ধীরভাবে নিজ উদ্ভাবিত উপায়ে তাহা সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ধর্ম্মযাজকেরা তাঁহাকে বিধর্ম্মী বলিয়া তাঁহাকে সমাজচ্যুত করিয়াছে, এবং এই প্রবীণ বয়সেও তাঁহার প্রতি দারুণ অভিশাপ-বর্ষণেও ক্ষান্ত নহে। কিন্তু টলষ্টি অন্য এক ধর্ম্মাধিকরণের বিচারের প্রতীক্ষা করিয়া আছেন।

সম্প্রতি মস্কৌ নগরে দুই ব্যক্তি প্রচলিত ধর্ম্মমতের প্রতিকূল পুস্তকাদির প্রচার অপরাধে অভিযুক্ত হইয়াছিল। বিচারে ইহারা সাইবীরিয়ায় নির্ব্বাসিত ও তত্রত্য খনির কার্য্যে নিযুক্ত হইবার দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। এই সংবাদ টলষ্টির কর্ণগোচর হইবামাত্র তিনি স্বয়ং বিচারালয়ে উপনীত হইয়া বলিলেন, "আমি এই পুস্তিকার রচনা করিয়াছি, এবং আমিই ইহার প্রচার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি। বন্দীদিগের শৃঙ্খল উন্মোচন করিয়া আমাকে ঐ শৃঙ্খলে আবদ্ধ কর; যদি প্রয়োজন হয়, আমিই সাইবীরিয়ায় গমন করিব।"

বিচারক বন্দীদিগকে অব্যাহতি প্রদান করিলেন, এবং টলষ্টিকে বিচার-গৃহ পরিত্যাগ করিতে আদেশ দিয়া বলিলেন,—"যদি প্রয়োজন হয়, আপনাকে বিচারালয়ে নিজ কার্য্যের সন্তোষজনক উত্তর প্রদান করিতে হইবে।"

কেহই টলষ্টিকে স্পর্শ করিতে সাহস করে না। কারণ, দেশের অধিকাংশ লোকই তাঁহার পক্ষপাতী। যাহারা জীবনে কাহারও ভালবাসা প্রাপ্ত হয় নাই, মানবের প্রীতি যাহাদিগের পক্ষে একান্ত আবশ্যক, এরূপ ভাগ্যবিড়ম্বিত প্রীতিবঞ্চিত মন্দভাগ্যদিগকে ভালবাসাই টলষ্টির জীবনের একমাত্র কামনা ও প্রার্থনা।

ভিক্টর হুগোর প্রাণের কামনা ছিল:—"আলো, আরও আলো!"

লিও টলষ্টির প্রাণের কামনা:—"প্রেম, আরও প্রেম।

হুগোর প্রেমকাহিনী।

"রিভিউ ডি প্যারিস" নামক পত্রে জুলিয়েট দ্রো সম্বন্ধে একটি অতি-মনোজ্ঞ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। এই রমণী অর্দ্ধশতাব্দীর অধিককাল সুপ্রসিদ্ধ লেখক হুগোর প্রিয়তমা বান্ধবী ছিলেন। তাঁহাদিগের এই প্রীতি কিরূপ প্রগাঢ়তাপ্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহা কেহই অবগত নহে। বোধ করি, ভাবী কালেও কেহ তাহা জানিতে পারিবেন না। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দের

যে মাসে কবিবর যখন জুলিয়েটের সমভিব্যাহারে তাঁহার জয়নগর ফৌজাঙ্গে নামক স্থানে অবস্থিত করিতেছিলেন, ঐ সময় তিনি বন্ধুবর্গ ও সহধর্ম্মিণীর নিকট লিখিত লিপিসমূহে উক্ত ক্ষুদ্র ও সুন্দর নগরের বিস্ময়োদ্দীপক বিচিত্র বর্ণনা সন্নিবেশিত করিয়াছেন।

সৌহৃদ্যের সেই প্রথম অবস্থাতেও জুলিয়েট এই মহাকবির জীবনে প্রভূত-পরিমাণে আত্মপ্রভাববিস্তার করিয়াছিলেন। যে মঠে অবস্থিতি করিয়া জুলিয়েট শিক্ষাপ্রাপ্ত হন, তৎসংক্রান্ত বহুবিধ হৃদয়গ্রাহী বিবরণ অবলম্বন পূর্ব্বক হুগো "Les Miserables" নামক উপন্যাস গ্রন্থে বিচিত্র বর্ণনৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছেন। যখন হুগোর সহিত জুলিয়েটের প্রথম সাক্ষাৎকার ঘটে, সে সময় তিনি কোনও নাট্যশালায় অভিনেত্রীর কার্য্যে নিযুক্ত, তাঁহার নবযৌবন-প্রফুল্ল দেহ লাবণ্যে উছলিতেছে। তরুণী অভিনেত্রীরা তখনকার দিনে ফরাসী দেশেও "মন্দভাগিনী" নামে অভিহিত হইত। সুতরাং হুগো এই সুন্দরীকে সমাজমধ্যে অপেক্ষাকৃত গৌরবাবহ পদে সংস্থাপিত করিবার সংকল্প করিলেন।

পরবর্ত্তী পঞ্চাশদ্বর্ষকাল তাঁহাদিগের মধ্যে প্রায় অবিশ্রান্তভাবে প্রাত্যহিক পত্র-ব্যবহার চলিয়াছিল। সেই অপূর্ব্ব ও সাহিত্যের হিসাবে বহুমূল্য পত্রাবলী জুলিয়েটের ভ্রাতুষ্পুত্রের সম্পত্তি হইয়াছে। শুনা যায়, তিনি নাকি উক্ত পত্রনিচয় ফরাসী জাতীয় পুস্তকাগারে প্রদান করিবেন। অবসর পাইলেই হুগো প্রভাতে ও প্রদোষে জুলিয়েটের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। দিবসের অবশিষ্ট সময় উভয়ে উভয়ের নিকট লিপিপ্রেরণ করিয়া অতিবাহিত করিতেন। "রিভিউ" পত্রে তাঁহাদিগের অপূর্ব্ব ও মনোজ্ঞ লিপির কয়েকখানি নমুনা প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ষের পর বর্ষ অতীত হইবার পর অবশেষে দুর্দ্দিন আসিয়া উপস্থিত হইল। হুগো সপরিবারে স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইলেন। জুলিয়েটও তাঁহার নির্ব্বাসনসহচরী হইলেন। তখন ম্যাডাম হুগো বিষাদখিন্ন-হৃদয়ে পতির বিংশ বর্ষের বান্ধবী জুলিয়েটকে সখীত্বে বরণ করিলেন। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে হুগোর পত্নীবিয়োগ ঘটিলে সকলেই মনে করিয়াছিল যে, তিনি এইবার জুলিয়েটের পাণিগ্রহণ করিবেন। ইদানীং জুলিয়েট জনসাধারণের নিকট ভদ্রমহিলাযোগ্য সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। প্রকৃতপ্রস্তাবে যেরূপ ঘটিয়া থাকে, এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইল। জুলিয়েটের সহিত হুগোর পূর্ব্ব সম্বন্ধের অণুমাত্র বৈলক্ষণ্য ঘটিল না। যাহারা আপনাদিগকে সর্ব্বজ্ঞ মনে করে,

প্রকৃতপক্ষে তাহারা কিছুই অবগত নহে। হুগোর কন্যাগণের মৃত্যু হইলে জুলিয়েট হুগোর অভিভাবিকা ও গৃহকর্ত্রীরূপে তাঁহার সহিত এক গৃহে অবস্থিতি করিতে সম্মত হইলেন। তাঁহাদিগের জীবনে পূর্ব্ববৎ অপূর্ব্ব কাব্যবৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। বহুকাল একত্রবাসের পর হুগো জুলিয়েটকে লিখিয়াছিলেন,—"প্রতি রাত্রি শয্যায় প্রবেশের পূর্ব্বে আমি ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, যত দিন আমি বাঁচিয়া থাকি, ভগবান যেন তোমাকেও তত দিন জীবিত রাখেন, এবং অন্তিমেও উভয়ে এক সঙ্গে প্রাণত্যাগ করিয়া স্বর্গধামে চিরমিলনে সম্মিলিত হইতে পারি।" হুগোর এই প্রার্থনা পূর্ণ হয় নাই। ম্যাডাম দ্রৌ দারুণ হৃদ্রোগে আক্রান্ত হন, কিন্তু তিনি বহু যত্নে এই রোগের কথা তাঁহার লোকবিখ্যাত বন্ধুর নিকট গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার লোকান্তরপ্রাপ্তি ঘটে। ইহার অত্যল্পকাল পরে হুগো তৎপ্রণীত এক পুস্তকে নিম্নোদ্ধৃত কথা কয়েকটি লিখিয়াছিলেন। ঐ পুস্তকখানিকে তাঁহার সাংবৎসরিক বহি বলিতেন। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে এই পুস্তকখানি প্রথম উদ্ঘাটিত হয়। ইহাতে লিখিত ছিলঃ— "প্রেম—এই কথাটি অতি বড় কথা। ঈশ্বর বিশ্বের প্রতি এই কথার প্রয়োগ করিয়াছেন, আবার বিশ্ব ভগবানের নিকট এই কথা পুনঃপ্রেরণ করিয়াছে। হে আমার হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবি! আমি তোমায় ভালবাসি। এস, 'তোমায় ভালবাসি', এই স্বর্গীয় বাণী উচ্চারণ করিয়া, আমাদিগের সম্মিলিত জীবনের পঞ্চাশৎ বর্ষ আরম্ভ করি।"

ঔপন্যাসিকের আত্মকথা।

লোকান্তরিতা সুবিখ্যাত লেখিকা এড্না লায়েলের স্বলিখিত মনোজ্ঞ শৈশব-কাহিনী "স্যনডে ম্যাগাজিন" পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। এ প্রবন্ধে তাঁহার চরিত্রগঠন সম্বন্ধে অনেকগুলি হৃদয়গ্রাহী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিবরণ সন্নিবেশিত হইয়াছে। লেখিকা বলেন ;—নয় বৎসর বয়সে আমার হৃদয়ে গ্রন্থরচনার বাসনা সমুদিত হয়। ইতোমধ্যে আমার ভাবিগ্রন্থপ্রণয়নোপযোগিনী শিক্ষা আরব্ধ হইয়াছিল। সৌভাগ্যক্রমে আমার ধাত্রী মধুরপ্রকৃতি ছিলেন। তাঁহার বিপুল ও বহুবিষয়-ব্যাপিনী সহানুভূতি আমার পক্ষে অশেষ কল্যাণের কারণ হইয়াছিল। মমতামধুরহৃদয়া ধাত্রীর দৃষ্ট ও শ্রুতপূর্ব্ব ঘটনানিচয়ের বর্ণনা বিষয়ে প্রগাঢ়

আগ্রহবশতঃ আমি তাঁহার নিকট বিবিধ জ্ঞাতব্য বিষয় শিক্ষা করিয়াছিলাম।

এতদ্ভিন্ন পরিবারমধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ বলিয়া অনেক সময় আমি মাতা পিতা ও অগ্রজগণের গ্রন্থপাঠ, বিবিধ বিষয়ে বাদপ্রতিবাদ প্রভৃতি শ্রবণ করিতে পাইতাম। তজ্জন্য শীঘ্রই সাংসারিক নানা বিষয়ে আমি অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলাম।

লেখিকা শৈশবকালে যে সকল লোকবিশ্রুত কর্ম্মবীর ও জ্ঞানবীরদিগের প্রতি শ্রদ্ধাশালিনী ছিলেন, তন্মধ্যে প্রথমে মিঃ ফসেট ও পরে অলিভার ক্রমওয়েল তাঁহার চিত্ত অধিকার করিয়াছিলেন। স্থানান্তরে লেখিকা বলিতেছেন, রাজনীতি কর্ম্মকঠোর সংসারের বাস্তব ব্যাপারে পূর্ণ, কিন্তু পিতা আমাদিগকে এই বিষয়ের আলোচনায় উৎসাহপ্রদান করিতেন বলিয়া রাজনীতিচর্চ্চাও আমাদিগের নিকট প্রীতিকর হইয়া উঠিয়াছিল। মিঃ ফসেট প্রথমে আমার নিকট আদর্শ রাজনীতিক রূপে প্রতিভাত হন। ব্রাইটনের প্রতিনিধিরূপে যখন তিনি সদস্য নির্ব্বাচিত হন, তৎকালে জন-সমাজে যে প্রকার উৎসাহ ও উত্তেজনা পরিলক্ষিত হইয়াছিল, অদ্যাপি তাহা আমার বিলক্ষণ স্মরণ আছে। বোধ করি, তাঁহার অন্ধতাও কিয়ৎপরিমাণে আমাকে তাঁহার পক্ষপাতিনী করিয়াছিল। দর্শনশক্তির দুর্ব্বলতাবশতঃ আমি স্বয়ং বহু ক্লেশ ভোগ করিয়াছিলাম, সুতরাং অন্ধাবস্থায় জীবনযাপন কিরূপ যন্ত্রণার ব্যাপার, তাঁহাও আমার অবিদিত ছিল না। জননীর মুখে শুনিয়াছি, মিঃ ফসেট এক প্রীতি-ভোজে চক্ষুষ্মানের ন্যায় আচরণ করিয়া বিলক্ষণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। অন্ধতানিবন্ধন নিজ জীবন ব্যাপারে যাহাতে কোনরূপ বিঘ্ন উপস্থিত না হয়, তদ্বিষয়ে ফসেট মহোদয় বিশেষ অবহিত ছিলেন।

শৈশবের যে সুযোগ শিক্ষা ও সাহায্য প্রভৃতি উত্তরকালে গ্রন্থপ্রণয়নে আমাকে সমধিক শক্তিসম্পন্ন করিয়াছিল, তন্মধ্যে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য; প্রথম, প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারদিগের উৎকৃষ্ট গ্রন্থপাঠ ও শ্রবণ। আমার পিতা পুস্তক-পাঠে বিশেষ উৎসাহসম্পন্ন ছিলেন। তিনি যখন "ওয়েভার্লি নভেল" সমূহ পাঠ করিতেন, তখন আমার হৃদয়ে যেরূপ আনন্দের সঞ্চার হইত, বোধ করি, তেমন আর কিছুতেই হয় নাই। জেন অষ্টিনের রসভাবমধুর উপন্যাসনিচয়ের রসাস্বাদন নবমবর্ষীয়া বালিকার সম্পূর্ণ ক্ষমতাবহির্ভূত। সত্য কথা বলিতে কি, সে সময় উক্ত উপন্যাসাবলি আমার নিতান্ত নীরস বোধ হইয়াছিল।

গীতায় ঈশ্বরবাদ।

৭। সাংখ্য ও গীতা।

পূর্ব্ব প্রবন্ধে সাংখ্যদর্শনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় উপলক্ষে গীতার সহিত সাংখ্য মতের যে যে বিষয়ে ঐকমত্য আছে, তাহার উল্লেখ করিয়াছি। বর্ত্তমান প্রবন্ধে গীতার সহিত সাংখ্যের প্রভেদ ও অনৈক্য প্রদর্শিত হইবে।

প্রচলিত সাংখ্যমতে প্রকৃতি এক, কিন্তু পুরুষ বহু; অথচ প্রত্যেক পুরুষই বিশ্বব্যাপী।*

জন্মাদিব্যবস্থাতঃ পুরুষবহুত্বম্।—সাংখ্যসূত্র; ১।১৪৯।

পুরুষবহুত্বম্ ব্যবস্থাতঃ।—ঐ; ৬।৪৫।

'বহুপুরুষ স্বীকার না করিলে জন্মাদির ব্যবস্থা হয় না।'

জননমরণকরণানাং প্রতিনিয়মাদ্‌অযুগপৎ।

প্রবৃত্তেশ্চ পুরুষবহুত্বম্ সিদ্ধং ত্রৈগুণ্যবিপর্য্যয়াচ্চৈব॥—সাংখ্যকারিকা; ১৮।

'সকল জীবের এক সঙ্গে জন্ম, মৃত্যু বা ইন্দ্রিয়ের বিকলতা হয় না; সকলের এককালে প্রবৃত্তি দৃষ্ট হয় না; কোন পুরুষে এক গুণ প্রবল, অপরে অন্য গুণ প্রবল। অতএব, পুরুষ বহু।'

গৌড়পাদও এই মতাবলম্বী। অন্ততঃ উক্ত কারিকার ভাষ্যে পুরুষের বহুত্ব মতের প্রতিবাদ করেন নাই। কিন্তু একাদশ কারিকার ভাষ্যে

---

* এ মতের অযৌক্তিকতা প্রতিপাদন করিবার জন্য অধ্যাপক ম্যাক্‌স্‌মুলার (Maxmuller) লিখিয়াছেন, "If the *Purusha* was menat as absolute, as eternal, immortal and unconditioned, it ought to have been clear to *Kapila*, that the plurality of such a *Purusha*, would involve its being limited, determined or conditioned and would render the character of it self-contradictory. * * * Many *Purushas* from a metaphysical point of view, necessitate the admission of one *Purusha*. * * * Because if the Purushas were supposed to be many, they would not be *Purushas* and being *Purusha*, they would by necessity, cease to be many.—*Maxmuller's Indian Philosophy*. page 325.

পুরুষ যে এক, ইহা স্পষ্টতঃ উল্লেখ করিয়াছেন। "অনেকং ব্যক্তম্ একমব্যক্তম্ তথা পুমানপ্যেকঃ"—ব্যক্ত (বিকৃতি) বহু, কিন্তু অব্যক্ত (প্রকৃতি) এক, এবং পুরুষও এক। প্রাচীনকালে সম্ভবতঃ এই মতই প্রচলিত ছিল। কারণ, সাংখ্যেরা যে শ্রুতিকে সাংখ্য শাস্ত্রের ভিত্তি বলিয়া স্বীকার করেন, তাহাতে পুরুষের একত্ব স্পষ্টতঃ বিজ্ঞাপিত হইয়াছে।

অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং
বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ।
অজোহ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে
জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ॥—শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ।

'প্রকৃতি অজা (নিত্যা), একা (অদ্বিতীয়া), লোহিতশুক্লকৃষ্ণা (ত্রিগুণময়ী), নানা বিকারের জননী; পুরুষ অজ (নিত্য), এক (অদ্বিতীয়)। পুরুষ, ভোগের জন্য এই প্রকৃতিকে আলিঙ্গন করেন; পরে ভোগ শেষ হইলে ইহাকে পরিত্যাগ করিয়া স্বতন্ত্র থাকেন।'

গীতা পুরুষের বহুত্ব স্বীকার করেন না। গীতা বলেন যে, যেমন একমাত্র সূর্য্য সমস্ত লোক প্রকাশিত করে, সেইরূপ একমাত্র পুরুষ সমস্ত ক্ষেত্র (প্রকৃতি) প্রকাশিত করেন।

যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ।
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত॥—ভগবদ্‌গীতা; ১৩।৩৪।

ক্ষেত্রী = ক্ষেত্রজ্ঞ = পুরুষ।

গীতার মতে ভগবানই ক্ষেত্রজ্ঞরূপে সমস্ত ক্ষেত্রে বিরাজিত আছেন। তিনি এক বই বহু হইবেন কিরূপে?

ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত।

ভগবান্ বলিতেছেন, 'সমস্ত ক্ষেত্রেই আমাকেই ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিবে।' তিনি সর্ব্বব্যাপী, অপরিচ্ছিন্ন ও অবিভক্ত; অথচ উপাধিভেদে তাঁহাকে বিভক্ত বলিয়া—বহু বলিয়া মনে হয়।

অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্।—গীতা; ১৩।১৬।

'তিনি অবিভক্ত হইয়াও, ভূতসমূহে বিভক্তের ন্যায় অবস্থান করিতেছেন'। শাস্ত্রে অন্যত্রও উক্ত হইয়াছে,—

একং বহুধা নিহিতম্ গুহায়াং।

'তিনি এক, অথচ গুহাভেদে বহু হইয়া অবস্থিত।' গীতা অন্যত্র আত্মার পরিচয়স্থলে এইরূপ বলিয়াছেন,—

অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্ত্তুমর্হতি॥ ১৭।
ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচি-
ন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥ ২০।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ। ২৪।
অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে॥—গীতা; ২য় অধ্যায়, ২৫।

'যিনি সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া আছেন, সেই পরমাত্মার বিনাশ নাই; সেই অব্যয় বস্তুকে কে বিনাশ করিতে পারে?'

'তাঁহার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই; তাঁহার ক্ষয় নাই, বৃদ্ধি নাই। তিনি অনাদি, তিনি নিত্য, তিনি চিরন্তন, তিনি পুরাণ। শরীরের নাশে তাঁহার নাশ হয় না।'

'তিনি অনন্ত, সর্ব্বগত, স্থির, অচল, সনাতন, অব্যক্ত, অচিন্ত্য, এবং নির্ব্বিকার।'

এই বাক্যে গীতা, সাংখ্যেরা যে পুরুষকে ষড়্ভাববিকারবর্জ্জিত * বলিয়া উল্লেখ করেন, সে মতের অনুমোদন করিলেন। অধিকন্তু, জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার, সাংখ্যোক্ত পুরুষের সহিত পুরুষোত্তমের অভেদেরও নির্দ্দেশ করিলেন।

অন্যত্র, গীতাতে এ বিষয়ের স্পষ্ট উপদেশ আছে।

অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ।
সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ॥

ভগবান অর্জ্জুনকে বলিতেছেন যে, সকলের বুদ্ধিতে আমি আত্মারূপে বিরাজিত রহিয়াছি, সকলের হৃদয়েতে আমি অধিষ্ঠিত আছি।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, সাংখ্যমতে প্রকৃতির স্বভাবই পরিণাম। অর্থাৎ, প্রকৃতির গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থার (equilibrium) স্বতঃই বিচ্যুতি ঘটে। অতএব প্রকৃতির বিকারের জন্য কারণান্তরের অপেক্ষা করিতে হয় না।

---

* সাংখ্যেরা বলেন, পুরুষ ষড়্ভাববিকারবর্জ্জিত। এই ছয় বিকার কি কি? "জায়তে, অস্তি, পরিণমতে, বিবর্দ্ধতে, অপক্ষীয়তে, বিনশ্যতি"—জন্ম, স্থিতি, পরিণাম, বৃদ্ধি, ক্ষয় ও বিনাশ। সাংখ্যমতে পুরুষকে এই ছয় বিকারের কোন বিকারই স্পর্শ করিতে পারে না।

গীতা এ মতের অনুমোদন করেন না। গীতা বলেন যে, প্রকৃতির যে পরিণাম হয়, তাহা পুরুষের অধিষ্ঠান জন্য।

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্ততে॥—গীতা; ৯।১০।

'ভগবানের অধিষ্ঠানবশতঃই প্রকৃতি এই চরাচর বিশ্ব প্রসব করে। আর সেই নিমিত্তই জগতের পরিণাম (বিকার) সংঘটিত হয়।'

যাবৎ সঞ্জায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমং।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাৎ তদ্বিদ্ধি ভরতর্ষভ॥—গীতা।

'জগতে স্থাবর জঙ্গম যে কিছু বস্তু আছে, সে সমস্তই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ এই উভয়ের সংযোগজনিত জানিবে।'

মম যোনির্মহদ্‌ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভ্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত॥*
সর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা॥—গীতা; ১৪—৩।৪।

ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন যে, 'প্রকৃতিতে আমি যে গর্ভ্তাধান করি, তাহারই ফলে সমস্ত ভূত উৎপন্ন হয়। জগতে যে কিছু মূর্ত্তি উৎপন্ন হয়, প্রকৃতি তাহার যোনি (মাতৃস্থানীয়া) এবং ভগবান্ তাহার বীজপ্রদ পিতা।'

মহদ্‌ব্রহ্ম = অচেতনা প্রকৃতি।

গর্ভ্ভ = চেতনা প্রকৃতি (পুরুষ)।

ভগবান্ মনুও বলিয়াছেন,—

অপ এব সসর্জ্জাদৌ তাসু বীজম্ অবাকিরৎ।—মনুসংহিতা।

'ভগবান সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিয়া প্রথমতঃ আপ্ (প্রকৃতি) সৃষ্টি করিলেন, এবং তাহাতে বীজের আধান করিলেন।'

উপনিষদেও বলা হইয়াছে যে, জগৎ সৃষ্টি করিয়া ভগবান তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইলেন।

তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ।—তৈত্তিরীয় উপনিষদ্।
অনেন জীবেন আত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি।

'ভগবান্ জীবরূপে জগতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপের বিকার সিদ্ধ করিলেন।'

---

* রামানুজ এই শ্লোকের ভাষ্যে লিখিয়াছেন,—"ইতস্ত্বন্যাম্ প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাং, জীবভূতাম্" ইতি চেতনপুঞ্জরূপা যা প্রকৃতিঃ নির্দ্দিষ্টা সেহ সকল প্রাণিবীজতয়া গর্ভ্তশব্দেন উচ্যতে। তস্মিন্নচেতনে যোনিভূতে মহতি ব্রহ্মণি চেতনপুঞ্জরূপং গর্ভ্তং দধামি।

সেই জন্য গীতাতে ভগবান বলিয়াছেন যে, অব্যক্ত সূক্ষ্ম মূর্ত্তিতে আমি সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া আছি।

প্রকৃতির পরিণাম যে পুরুষের অধিষ্ঠান জন্য, তাহা ভাগবতেও স্পষ্ট উপদিষ্ট দেখা যায়।

কালাৎ গুণব্যতিকরঃ পরিণামঃ স্বভাবতঃ।
কর্ম্মণো জন্ম মহতঃ পুরুষাধিষ্ঠিতাদ্ অভূৎ।—ভাগবত ; ২।৫।২২।

অর্থাৎ, সৃষ্টির পক্ষে তিনটি কারণ ;—কাল, কর্ম্ম ও প্রকৃতি। প্রলয়ের নির্দ্দিষ্ট সময় অতীত হইলে, পূর্ব্বকল্পের অভুক্ত কর্ম্মের ভোগের জন্য প্রকৃতির পরিণাম হয়। সে পরিণামের কারণ পুরুষের অধিষ্ঠান।

জাতক্ষোভাদ্ ভগবতো মহান্ আসীৎ গুণত্রয়াৎ।—ভাগবত ; ৩।২০।১২।

ভগবান্ হইতে প্রকৃতির ক্ষোভ উৎপন্ন হইলে মহানের প্রাদুর্ভাব হয়। সম্ভবতঃ ইহাই প্রাচীন সাংখ্য মত।* সিদ্ধান্তশিরোমণি গ্রন্থে এই মতের অনুসরণ করা হইয়াছে।

সাংখ্যাদিযোগশাস্ত্রেষু শ্রুতিপুরাণেষু চাদি সর্গে যথোদিতং তদত্রোচ্যতে। তত্র প্রকৃতি-র্নামাব্যক্তমব্যাকৃতং গুণসাম্যং কারণম্ ইত্যাদয়ঃ প্রকৃতেঃ পর্য্যায়াঃ। তস্যাঃ প্রকৃতেরন্তর্ভগবান্ সর্ব্বব্যাপকঃ পুরুষোঽস্তি।—সিদ্ধান্তশিরোমণি ; গোলাধ্যায় ; ভুবনকোশ।

'অর্থাৎ সাংখ্যাদি যোগশাস্ত্রে এবং শ্রুতিপুরাণ প্রভৃতিতে আদি সৃষ্টির প্রকার যেরূপে উক্ত হইয়াছে, তাহা লিখিত হইতেছে। প্রকৃতিই মূল কারণ ; অব্যক্ত, অব্যাকৃত, গুণসাম্য প্রভৃতি প্রকৃতির নামান্তর। সেই প্রকৃতির অভ্যন্তরে ভগবান্ সর্ব্বব্যাপী পুরুষ অধিষ্ঠান করেন। তাহারই ফলে সৃষ্টি হয়।'

প্রকৃতির পরিণাম যে স্বভাবসিদ্ধ নহে, তাহা যুক্তি দ্বারাও প্রমাণিত হইতে পারে। প্রকৃতি জগতের নির্ব্বিশেষ উপাদান (homogeneous root matter)। যাহা নির্ব্বিশেষ (homogeneous) তাহার যে সাম্যাবস্থা, সে সাম্যাবস্থা ভঙ্গুর (unstable equilibrium)। ভঙ্গুর সাম্যাবস্থা বলিলে ইহাই

* অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার (Max Muller) তাঁহার হিন্দুদর্শন গ্রন্থে তত্ত্বসমাসের যে সারসংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতে এ কথার সমর্থন হয়।

"From the *Abyakta* undeveloped *Prakriti*, when superintended by the high and omnipresent P*urusa* (spirit), *Buddhi* arises ; and this of 8 kinds."

Max Muller's Philosophy—pages 345, 346.

এই high and omnipresent পুরুষ সর্ব্বব্যাপী পুরুষোত্তম ভগবান্ ভিন্ন আর কে হইতে পারেন ?

বুঝায় যে, সে অবস্থায় শক্তিসমূহের সামঞ্জস্য থাকে। কিন্তু যদি বাহিরের কোন শক্তি (সে শক্তি যতই সামান্য হউক না কেন) তাহার মধ্যে আপতিত হয়, তবেই সে সাম্যাবস্থার বিচ্যুতি ঘটে, এবং সেই নির্ব্বিশেষ উপাদান পরিণামোন্মুখ হইয়া বিকারগ্রস্ত হয়। এবং তাহার ফলে ক্রমশঃ অবিশেষ হইতে বিশেষের আরম্ভ হয় (অবিশেষাৎ বিশেষারম্ভঃ) ; এবং সেই বিশেষভাবের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে থাকে, এবং বিশেষ পর পর সবিশেষে পরিণত হয়। এ সম্বন্ধে হার্বার্ট স্পেন্সার (Herbert Spencer) যাহা বলিয়াছেন, তাহা আমাদের প্রণিধানযোগ্য।

The condition of homogeneity is a condition of unstable equilibrium. The phrase unstable equilibrium is one used in mechanics to express a balance of forces of such kind that the interference of any further force, however minute, will destroy the arrangement previously subsisting and bring about a totally different arrangement.

It is clear that not only the homogeneous must lapse into the non-homogeneous but that the more homogeneous must tend ever to become less homogeneous.—*Herbert Spencer's First Principles : the instability of the Homogeneous pages* 358 *and* 386.

এই যে অতিরিক্ত শক্তি (further force), যাহার আগমন ভিন্ন নির্ব্বিশেষ সবিশেষে পরিণত হইতে পারে না, সে শক্তি কোথা হইতে আইসে? গীতা বলিতেছেন, ঈশ্বর হইতে।

যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী।

'ভগবান হইতেই পুরাণী প্রবৃত্তি প্রসৃত হয়'।*

---

* এ সম্বন্ধে শ্রীমতী অ্যানি বেসেণ্ট তাঁহার 'Esoteric Christianity' গ্রন্থে এইরূপ লিখিয়াছেন (২৬১ পৃষ্ঠা)—

When the three qualities are in equilibrium there is the one, the virgin matter, unproductive; when the power of the Highest overshadows Her and the breath of the spirit comes upon Her, the qualities are thrown out of equilibrium and she becomes the Divine Mother of the worlds.

সাংখ্যেরা ঈশ্বর অঙ্গীকার করেন না। সাংখ্যশাস্ত্র নিরীশ্বর শাস্ত্র। তত্ত্ব-সমাস অথবা কারিকায় ঈশ্বরের কোনই প্রসঙ্গ নাই। প্রবচনসূত্রে ঈশ্বর স্বীকৃত হন নাই; পরন্তু, প্রত্যাখ্যাত হইয়াছেন। সেই জন্য পাতঞ্জলদর্শন হইতে (যে দর্শনে ঈশ্বর অঙ্গীকৃত হইয়াছেন) কাপিল দর্শনকে পৃথক করিয়া ইহাকে নিরীশ্বর সাংখ্য এবং যোগদর্শনকে সেশ্বর সাংখ্য বলা হয়। বিজ্ঞান-ভিক্ষু বলেন যে, সূত্রকার "অভ্যুপগমবাদ" অবলম্বন করিয়া ঈশ্বরের প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। অর্থাৎ, যদিই বা তর্কস্থলে স্বীকার করা যায় যে, ঈশ্বর সিদ্ধ হইলেন না, তাহাতেও মুক্তির কোনও বাধা হইতে পারে না। বাচস্পতি মিশ্র এ কথা স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে সাংখ্য নিরীশ্বর-বাদী। মাধবাচার্য্যও "সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে" বাচস্পতি মিশ্রের মতের অনুমোদন করিয়াছেন।* এ সম্বন্ধে সাংখ্যসূত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে সন্দেহমাত্র থাকে না।

ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ। [১।৯২]।
মুক্তবদ্ধয়োরন্যতরভাবাৎ ন তৎসিদ্ধিঃ। [ঐ ১।৯৩]
উভয়থাপ্যসৎকরত্বম্। [ঐ ১।৯৪]
প্রমাণাভাবান্নতৎসিদ্ধিঃ। [ঐ ৫।১০]
অহঙ্কার কর্ত্রধীনা কার্য্যসিদ্ধিঃ। [ঐ ৫।১১]
নেশ্বরাধীনা প্রমাণাভাবাৎ। [ঐ ৬।৬৪]

অর্থাৎ, ঈশ্বরকে সিদ্ধ করিবার কোন প্রমাণ নাই। ঈশ্বর জগতের সৃষ্টি-কর্ত্তা হইতে পারেন না। কারণ, তাঁহার কোনরূপ ক্রিয়া বা ব্যাপার নাই।

* মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার স্বকৃত হিন্দুদর্শনে এই মতেরই পোষকতা করিয়াছেন। হিন্দুদর্শন—২৫৪ পৃষ্ঠা।

ম্যাক্‌সমূলার, কিন্তু, বিজ্ঞানভিক্ষুর মতের অনুসরণ করিয়াছেন।

It is true that the Samkhya Philosophy was accused of atheism, but that atheism was very different from what we mean by it. It was the negation of the necessity of admitting an active or limited personal god.

Indian Philosophy—page 365.

Nor does he enter on any arguments to disprove the existence of one only God. He simply says—and in that respect he does not differ much from Kant that there are no logical proofs to establish that existence, but neither does he offer any such proofs for denying it.

Max-Muller, Indian Philosophy—page 397.

আর জগৎসৃষ্টির প্রতি তাঁহার প্রবৃত্তিই বা হইবে কিরূপে? যদি তাঁহাকে বদ্ধ বল, তবেই তাঁহার প্রবৃত্তি সম্ভবপর হয়, কিন্তু বদ্ধ হইলে তিনি সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারেন না। অতএব এ বিষয়ে তাঁহার অক্ষমতা আসিয়া পড়ে। আর যদি তাঁহাকে মুক্ত বল, তবেই ত তিনি পরিপূর্ণ, আপ্তকাম হইলেন; তাঁহার কোনই প্রয়োজন—কিছুরই অপেক্ষা থাকিতে পারে না। তিনি কেন সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন? যদি বল, পরদুঃখপ্রহরণের জন্যই তাঁহার প্রবৃত্তি, তাহাও সঙ্গত নহে। তিনি যদি করুণাময়, তবে দুঃখের সৃষ্টি করিলেন কেন? জীবকৃত কর্ম্মের বৈচিত্র্য-অনুসারে বিচিত্র প্রাণিসমূহের সৃষ্টি করিয়াছেন—এ কথাও সঙ্গত নহে। কারণ, কর্ম্ম ত অচেতন; চেতনের অধিষ্ঠান ভিন্ন কর্ম্ম কিরূপে ফল জন্মাইতে পারে? ইত্যাদি।*

এই সকল দুর্ব্বল ও অসার যুক্তির অবতারণা করিয়া সাংখ্যেরা ঈশ্বরের প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। এ সকল যুক্তি অবশ্য তাঁহাদের নিকট সমীচীন বোধ হইয়াছে। অপরে কিন্তু, ইহার সারবত্তা কতটা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন, সে বিষয়ে সন্দেহের যথেষ্ট কারণ আছে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, গীতা ঈশ্বরবাদে সমুজ্জ্বল। ঈশ্বরকে প্রত্যাখ্যান করিয়া গীতা একপদও অগ্রসর হইতে পারেন না। সাংখ্যশাস্ত্রে কৈবল্য-লাভের যে উপায় উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহার সহিত ঈশ্বরের কিছুমাত্র সম্পর্ক নাই। ঈশ্বর ত নাই-ই; যদি বা থাকিতেন, তাহা হইলেও সাংখ্যদর্শনের উদ্ভাবিত প্রণালীর অনুসরণ করিবার জন্য তাঁহার সহিত জীবের কোনও রূপ সম্বন্ধস্থাপনের প্রয়োজন হইত না।† কারণ, সাংখ্যদর্শনোক্ত পঞ্চবিংশতি

* সাংখ্যেরা নিত্য-ঈশ্বরের প্রত্যাখ্যান করিয়া জন্য-ঈশ্বর স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, যে জীব পূর্ব্বকল্পে প্রকৃতি লয়প্রাপ্ত হন, তিনিই পরবর্ত্তী কল্পে সর্ব্ববিৎ, সর্ব্বকর্ত্তা আদি পুরুষরূপে আবির্ভূত হন। এইরূপ জন্য-ঈশ্বর প্রমাণসিদ্ধ।

ঈদৃশেশ্বরসিদ্ধিঃ সিদ্ধা। স হি সর্ব্ববিৎ সর্ব্বকর্ত্তা। [সাংখ্যসূত্র—৩।৫৬।৫৭]

তাঁহারা বলেন, বেদে যে ঈশ্বরপ্রতিপাদক শ্রুতিসমূহ দৃষ্ট হয়, তাহাতে এইরূপ মুক্তপুরুষেরই (জন্য-ঈশ্বরেরই) প্রশংসা বা উপাসনা উপদিষ্ট হইয়াছে।

মুক্তাত্মনঃ প্রশংসা উপাসা সিদ্ধস্য বা। [সাংখ্যসূত্র—১।৯৫]

† এ সম্বন্ধে Max Muller এইরূপ লিখিয়াছেন,—

There is a place in his system for any number of subordinate Devas, but there is none for God, whether as the creator or as the ruler of all things. There is no direct denial of such a being, no out spoken atheism in that sense, but there is simply no place left for him in the system of the world, as elaborated by the old Philosopher.—*Indian Philosophy Atheism of Kopila* page—397.

তত্ত্বের (ঈশ্বর যাহার অন্তর্ভূত নহেন) প্রকৃষ্ট জ্ঞান অর্জন করিতে পারিলেই জীব অত্যন্ত দুঃখের অধিকার ছাড়াইয়া কৈবল্য লাভ করিবে। ইহাই সাংখ্য-প্রদর্শিত মুক্তিপথ। বলা বহুল্য, গীতার অনুমোদিত পথ ইহা হইতে স্বতন্ত্র। ঈশ্বরকে লক্ষ্য করিয়া, তাঁহার ভাবে ভাবিত হইয়া, সে পথে পর্য্যটন করিতে হয়।

সাংখ্যমতে প্রকৃতি ও পুরুষ বিশ্বের চরম দ্বৈত (ultimate duality)। প্রকৃতি জড়—জগতের অমূল মূল, * এবং পুরুষ জড়ের বিপরীত চেতন। এই প্রকৃতি পুরুষের মহা দ্বৈতে সাংখ্য শাস্ত্রের পর্য্যবসান। এই উভয়ের সমন্বয়ে (synthesis) যে চরম একত্বে উপনীত হওয়া যায়, সাংখ্যদর্শনে তাহার আভাস নাই। গীতা, কিন্তু, সে চরম একত্বের সুস্পষ্ট উপদেশ দিয়াছেন। গীতার মতে সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি ও পুরুষ, ভগবানের দুইটি বিভাব (aspect) মাত্র। গীতা বলেন, ভগবানের দুই প্রকৃতি ; অপরা ও পরা। অপরা প্রকৃতি = সাংখ্যোক্ত প্রধান, এবং পরা প্রকৃতি = সাংখ্যোক্ত পুরুষ। ইহারা গীতার মতে চরম তত্ত্ব নহে ; কিন্তু ভগবানের বিলাসমাত্র।

অমূল মূল—rootless root. সমানপ্রকৃতেদ্ব য়োঃ। [১।৬৯ সূত্র]

ভূমিরাপোহনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেবচ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥

এতদ্‌যোনীনি ভূতানি সর্ব্বাণীত্যুপধারয়।
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা॥

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব॥ [গীতা ৭।৪—৭]

ভগবান্ বলিতেছেন, 'আমার দুই প্রকৃতি, অপরা ও পরা। অপরা প্রকৃতি, ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এই আট প্রকারে বিভক্ত। আর পরা প্রকৃতি জীবভূতা, যাহা এই জগৎ ধারণ করিয়া রহিয়াছে। জগতে যে কিছু পদার্থ আছে, সে সমুদায়ই এই উভয় প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন। সমস্ত জগতের আমা হইতে উৎপত্তি এবং আমাতেই নিবৃত্তি। আমিই চরম তত্ত্ব, আমার পরে আর কিছুই নাই। সূত্রে মণিগণ যেমন গ্রথিত থাকে, তেমনি আমাতে এই বিশ্ব গ্রথিত রহিয়াছে।'

* মূলে মূলাভাবাৎ অমূলং মূলং। [সাংখ্যসূত্র ১।৬৭]

অর্থাৎ গীতার মতে ভগবানই চরম তত্ত্ব; প্রকৃতি পুরুষ চরম নহে। জড়বর্গের উপাদান তাঁহার অপরা প্রকৃতি, এবং জীবরূপী পুরুষ তাঁহার পরা প্রকৃতি। আধুনিক সাংখ্যেরা পুরুষ অর্থে কেবল human soul বুঝেন। গীতা যাহাকে পরা প্রকৃতি বা ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়াছেন, যাহা জগৎ ধারণ করিয়া আছে, human Soul তাহার ভগ্নাংশমাত্র। ভগবান ক্ষেত্রজ্ঞরূপে চরাচর সমস্ত বিশ্বে অনুস্যূত রহিয়াছেন। হার্বার্ট স্পেন্সার যে ভাবে বিশ্বব্যাপী পাওয়ারের (power) পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, গীতোক্ত পরা প্রকৃতির যেন তিনি কতকটা আভাষ পাইয়াছিলেন।* অন্যত্র গীতা এই অপরা প্রকৃতি ও পরা প্রকৃতিকে ক্ষর পুরুষ ও অক্ষর পুরুষ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ক্ষর পুরুষ = প্রধান, এবং অক্ষর পুরুষ = ক্ষেত্রজ্ঞ। এবং ভগবানকে ক্ষরের অতীত ও অক্ষরের উত্তম পরমাত্মা পুরুষোত্তম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে॥
উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ॥
যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ॥ [গীতা ১৫।১৬।১৮]

"ক্ষর ও অক্ষর এই দুইটি পুরুষ লোকে প্রসিদ্ধ আছে। তন্মধ্যে সমস্ত ভূত ক্ষর পুরুষ এবং কূটস্থ অক্ষর পুরুষ। ইহা ভিন্ন আর এক জন উত্তম পুরুষ আছেন, যিনি পরমাত্মা। সেই অব্যয় ঈশ্বর ত্রিলোকমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সমস্ত ধারণ করিতেছেন। যেহেতু তিনি ক্ষরের অতীত, এবং অক্ষরেরও উত্তম, সেই জন্য তিনি লোকে ও বেদে পুরুষোত্তম বলিয়া খ্যাত।" অতএব গীতার মতে প্রকৃতি ও পুরুষ চরম তত্ত্ব নহে।

* The Power which manifests itself in Consciousness is but a differently conditioned form of the power which manifests itself beyond consciousness.

—H. Spencer's Ecclesiastical Institutions, page 838.

The power which manifests throughout the universe distinguished as material is the same power which in ourselves wells up under the form of consciousness.—*Ibid* page 839.

অন্যান্য শাস্ত্রও এই মতের সমর্থন করিয়াছেন। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে ভগবান্‌কে "প্রধান ক্ষেত্রজ্ঞ পতি" এই বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে। ভাগবত তাঁহাকে "প্রধান পুরুষেশ্বরঃ" বলিয়াছেন। বিষ্ণুপুরাণে দেখিতে পাই যে, প্রহ্লাদ ভগবান্‌কে স্তুতি করিয়া বলিতেছেন, "যতঃ প্রধানপুরুষৌ" যাঁহা হইতে প্রধান ও পুরুষের আবির্ভাব হয়।

স্কন্দপুরাণে উক্ত হইয়াছে যে, ভগবানের সৃষ্টির ইচ্ছা হইলে তাঁহার প্রকৃতি পরা ও অপরা রূপে বিভিন্না হন।

যা পরা পরসংভিন্না প্রকৃতিস্তে সিসৃক্ষয়া।—উৎকলখণ্ড ২।২৯।

বিষ্ণুপুরাণের ষষ্ঠ অংশে পরাশর বলিতেছেন,—

একঃ শুদ্ধঃ ক্ষরো নিত্যঃ সর্ব্বব্যাপী পুরাতনঃ।
সোঽপ্যংশঃ সর্ব্বভূতস্য মৈত্রেয়ঃ পরমাত্মনঃ॥
প্রকৃতির্যা ময়া খ্যাতা ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপিণী।
পুরুষশ্চাপ্যুভাবেতৌ লীয়েতে পরমাত্মনি॥ ৬।৪।৩৫, ৩৮।

পুরুষ এক * শুদ্ধ, অক্ষর, নিত্য ও সর্ব্বব্যাপী; তিনি সর্ব্বভূতময় পরমাত্মার অংশ। আমি তোমাকে যে ব্যক্ত ও অব্যক্ত স্বরূপা প্রকৃতির কথা বলিয়াছি, সেই প্রকৃতি ও এই পুরুষ উভয়ই পরমাত্মাতে বিলীন হন।

অতএব দেখা গেল যে, প্রকৃতি ও পুরুষ চরম দ্বৈত নহে। এ উভয় পরমাত্মারই বিভাবমাত্র।

শ্রুতিও এই উপদেশের সমর্থন করিতেছেন,—

ক্ষরং প্রধানং অমৃতাক্ষরং হরঃ
ক্ষরাত্মনৌ ঈষতে দেব একঃ।—শ্বেতাশ্বতর।

'ক্ষরই প্রধান, অক্ষর অমৃত; যে অদ্বিতীয় দেব, ক্ষর ও আত্মার প্রভু, তিনিই ভগবান্ হর।'

এই প্রকৃতি পুরুষকে শাস্ত্র নানাস্থানে নানা সংজ্ঞায় পরিচিত করিয়াছেন। কোথাও ইহাদিগের নাম দিয়াছেন ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ; কোথাও বলিয়াছেন মূল প্রকৃতি ও প্রত্যগাত্মা, কোথাও বলিয়াছেন অন্ন ও অন্নাদ; কোথাও বলিয়াছেন স্বধা ও প্রযতি; কোথাও বলিয়াছেন রয়ি ও প্রাণ; আবার কোথাও অপ্ ও মাতরিশ্বা। কিন্তু যেখানেই যে ভাবে উল্লেখ করুন, শাস্ত্র কোথাও এ দোঁহাকে চরম তত্ত্ব বলিয়া প্রকাশ করেন নাই।

---

* পুরুষ যে বহু নন, এক—বিষ্ণুপুরাণও ঐ মতের অনুমোদন করিতেছেন।

প্রজাকামো বৈ প্রজাপতিঃ।

*　*　*　*

সমিথুনমুৎপাদয়তে * * রয়িঞ্চ প্রাণঞ্চেতি। এতৌ মে বহুধা প্রজা করিষ্যত ইতি।

—প্রশ্ন ১।৪।

প্রজাপতি প্রজাকামনা করিয়া রয়ি ও প্রাণ এই যুগ্ম উৎপাদন করিলেন। ইহারাই আমার নিমিত্ত বহুবিধ প্রজা উৎপন্ন করিবে।

তস্মিন্ অপো মাতরিশ্বা দধাতি।—ঈশ ; ৪।

'মাতরিশ্বা (প্রাণ), ভগবানে অপ্ নিহিত করেন।' অপ্=কারণার্ণব=অব্যক্ত প্রকৃতি। মাতরিশ্বা=প্রাণ=পুরুষ। প্রলয়ে প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ই ভগবানে বিলীন হয়।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, এ সম্বন্ধে গীতার মতই সর্ব্বশাস্ত্রের অনুমোদিত।

এত দূরে সাংখ্যদর্শনের সহিত গীতার সম্বন্ধ-বিচার সমাপ্ত হইল। বারান্তরে আমরা পাতঞ্জলদর্শনের সহিত গীতার সম্বন্ধের আলোচনা করিব।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

বগুড়া জেলা।

কলিকাতা হইতে রেলপথে দারজিলিং যাইতে হইলে রাণী ভবানীর রাজধানী নাটোর ছাড়িয়া যাত্রীকে কোন এক অচেনা রাণীর প্রতিষ্ঠাপিত 'রাণীনগর' নামক গ্রামে আসিতে হয়। তাহার পরই রাণী ভবানীর জন্মস্থান ছাতিম-গ্রামের সন্নিকটে সুলতানপুর ষ্টেশন। যাত্রী তথায় উপস্থিত হইয়া যদি জিজ্ঞাসা করেন,—এ কোন জেলা ?—শুনিবেন, বগুড়া।

বাঙ্গালা দেশের মধ্যে বগুড়াই অবয়বে ক্ষুদ্রতম জেলা। ইহার আয়তন ১৪৫২ বর্গ মাইল, লোকসংখ্যা ৮১৭৪৯৪। তন্মধ্যে ৬৬১১৮০ হিন্দু, ১৫৪২৯৬ মুসলমান, এবং ২০৯৮ অন্যান্যধর্ম্মাক্রান্ত বলিয়া ১৮৯১ সালের লোকগণনায় নির্ণীত হইয়াছে। অর্থাৎ, সমগ্র লোকের মধ্যে প্রায় শতকরা ৮০ জন লোক ·মান। এরূপ মুসলমানপ্রধান দেশও বাঙ্গালার মধ্যে দ্বিতীয় নাই।

মুসলমানদের মধ্যে কেবল ৩০২০ ব্যক্তি পাঠান, এবং ১৯৫০ ব্যক্তি সৈয়দ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। অবশিষ্ট ১৪৯৩২৬ ব্যক্তির মধ্যে অধিকাংশ আপনাদিগকে শেখ বলিয়া পরিচয় দেয়। এই শেখদের মধ্যে অধিকাংশই আপনাদিগকে 'নস্য' বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে।

বগুড়ায় মুসলমানগণের মাতৃভাষা বাঙ্গালা—ইঁহারা সুবিস্তৃত বাঙ্গালী-জাতিরই এক অংশ। ইঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই একদা হিন্দু ছিলেন;—অল্প দিন হইল, মুসলমান হইয়াছেন।

মুসলমান হইবার পূর্ব্বে ইঁহারা কোন জাতীয় হিন্দু ছিলেন, তাহা এক্ষণে কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া বলা যাইতে পারে।

বগুড়ায় বর্ত্তমান বাঙ্গালী হিন্দুজাতীয় অধিবাসীদের মধ্যে যে যে জাতির লোকসংখ্যা এক সহস্রের অধিক, তাহাদের তালিকা এই :—

(ক)

১।	কৈবর্ত্ত, জালিয়া ও মালো	২৫৭৩৩
২।	কোঁচ	২৩৬৮৫
৩।	নমশূদ্র বা চাঁড়াল	১০১৮৩
৪।	ভুঞ্জীমালী বা মেহেতর	৭৭৮১
৫।	চামার, মুচী ও মাটিয়াল	৭০৪৫

(খ)

১।	নাপিত	৫২২১
২।	রাজপুত	৪৬১৮
৩।	ব্রাহ্মণ	৪৩৯১
৪।	কায়স্থ	৩৮২৯
৫।	কুম্ভকার	৪০১২
৬।	গোয়ালা	২৭৫৫
৭।	শুঁড়ী	২০৮৬
৮।	তেলী ও কলু	১৯৭০
৯।	তাঁতি	১৯৫৩
১০।	কামার	১৮৩২
১১।	সূত্রধর	১৬৬৯
১২।	ময়রা	১২৪৬

১৩।	বণিক বা বেণে	...	...	১১৭৫
১৪।	পাটনী	...	...	১১৫০
১৫।	বাগ্‌দী	...	...	১১১৯

(গ)

১।	বৈষ্ণব	...	...	১১৩০৩
২।	যোগী	...	...	৫০৩৮

হিন্দুগণকে একটি জাতি না বলিয়া একটি জাতিচক্র বলাই অপেক্ষাকৃত সঙ্গত। এই জাতিচক্রের এক অংশ ব্যবসায় বা বৃত্তি অনুসারে, আর এক অংশ কুলানুসারে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত। ইহা ভিন্ন তৃতীয় এক অংশ বর্ণসঙ্করসম্ভূত, তাহাও কতকগুলি অবান্তর শাখায় বিভক্ত।

উপরের তালিকায় (গ) বিভাগের বৈষ্ণব ও যোগীরা হিন্দুসমাজের বর্ণ-সঙ্কর বা জাতিশূন্য জাতির উদাহরণ।

বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবকালে সকল জাতীয় লোকই যোগী হইতে পারিত, এবং আধুনিক হিন্দুধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবকালে সকল জাতীয় লোকই বৈষ্ণব হইতে পারে। সুতরাং যোগী ও বৈষ্ণবদের আকর চিনিবার উপায় নাই।

এক বাগ্‌দী ভিন্ন (খ) বিভাগের সমুদয় জাতিই বৃত্তিমূলক জাতি। ইহাদের সকলেরই কৃষি ব্যতীত এক একটি নিরূপিত বৃত্তি আছে, এবং তাঁতি ও পাটনী ভিন্ন ইহাদের অধিকাংশই আর্য্যকুলসম্ভূত। হিন্দুসমাজে আর্য্য ও অনার্য্যবংশীয় ব্যক্তিগণকে চিনিয়া লইবার একটি প্রশস্ত উপায় জলাচরণ। ব্রাহ্মণেরা যে জাতির হস্তে জলগ্রহণ করেন না, তাঁহারা সকলেই অনার্য্যবংশীয়। অনার্য্য বাগ্‌দীগণ বগুড়া জেলাতে অতি অল্প দিন হইল নীল চাষের সময় কুঠি-য়ালগণ কর্ত্তৃক গঙ্গার দক্ষিণ পার হইতে কুঠীতে কার্য্য করিবার জন্য আনীত হইয়াছে।

ঐতিহাসিক সময়ের পূর্ব্বে বাঙ্গালা দেশে যে সমস্ত লোক বাস করিতেন, তাঁহারা কয়েকটি বিভিন্ন কুলে বিভক্ত ছিলেন, দেখা যায়। বাগ্‌দীকুল রাঢ়দেশের উচ্চ ভূমিতে বসবাস করিতেন, এবং তথায় তাঁহারা আপনাদের আধিপত্য স্থাপিত করিয়াছিলেন। ঐতিহাসিক সময়েও বিষ্ণুপুরে তাঁহাদের এক বিখ্যাত রাজবংশ বিদ্যমান ছিল।

রাঢ় ও উড়িষ্যার মধ্যবর্ত্তী জলপ্লাবিত নিম্নভূমিতে রূপনারায়ণ নদের উভয় তীরে কেবট বা কেওট নামক একটি বিখ্যাত কুল আপনাদের আধিপত্য

স্থাপিত করেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা এই 'কেবট'-গণকে 'কে' জলে-'বর্ত্তন্তে' বলিয়া কৈবর্ত্ত নামে ভূষিত করিয়াছেন। ঐতিহাসিক সময়েও কেবট-কুলের এক রাজবংশ তমলুকে, আর এক রাজবংশ ময়নাগড়ে, বিদ্যমান ছিল।

মিথিলার পূর্ব্বাংশে মহানন্দা নদীর অপর পারে অতি প্রাচীনকালে পুঁড়া নামে এক কুল আপনাদের রাজত্ববিস্তার করিয়াছিলেন। যেমন কেবটগণ ভট্টাচার্য্য-ভাষায় কৈবর্ত্ত হইয়া দাড়াইয়াছেন, তেমনই পুঁড়াগণ 'পুণ্ড্র' হইয়াছেন। এই পুঁড়াগণ এক সময়ে তাঁহাদের প্রাচীন রাজধানী পাঁড়ুয়া হইতে মহানন্দা ও ভাগীরথীর পূর্ব্বতীরে সমুদ্রকূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিলেন। সমুদ্রের নিকট ইঁহাদের স্থানীয় নাম 'পোদ'। এই পুঁড়া ও পোদগণের আর এক প্রধান শাখা মহানন্দা ও গঙ্গার সঙ্গমস্থানে বসবাস করিতেন। ইঁহাদের নাম চাঁদলা ছিল, এবং ইঁহাদের দেশ অদ্যাপি চাঁদলাই পরগণা বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। চাঁদলারা গঙ্গা বা পদ্মার উভয় কূলে সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিলেন। ভট্টাচার্য্য-ভাষায় চাঁদলাগণ 'চণ্ডাল' হইয়া দাঁড়াইয়াছেন, কিন্তু চাঁদলারা চণ্ডাল এই হেয় নাম অদ্যাপি অঙ্গীকার করেন নাই। তাঁহারা চণ্ডাল হইয়া যাইবার ভয়ে আপনাদের জাতীয় চাঁদলা নাম পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া 'নমশূদ্র' নাম ধারণ করিয়াছেন।

কোঁচ-কুল হিমালয় পর্ব্বতের সন্নিহিত স্থান হইতে উত্তর-বঙ্গে প্রবিষ্ট হইয়া আপনাদের উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন। অদ্যাপি তাঁহাদের এক রাজবংশ কোচবিহারে বিদ্যমান।

উপরের তালিকায় (ক) বিভাগে যে পাঁচটি জাতির নাম উল্লিখিত হইয়াছে, তন্মধ্যে ভূঞ্ঞীমালী ও চামারেরা বৃত্তিমূলক অনার্য্যজাতি। তদ্ভিন্ন অপর তিনটি, অর্থাৎ কৈবর্ত্ত, কোঁচ ও চাঁড়ালেরা তিন বিখ্যাত আদিমকুল হইতে সমুৎপন্ন। অদ্যাপি বগুড়াবাসী হিন্দুগণের মধ্যে এই তিন জাতির সংখ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। সুতরাং বগুড়া জেলায় একদা যে এই তিন কুলের লোকই সমধিকপরিমাণে বসবাস করিতেন, তাহা অনুমান করা যাইতে পারে।

ক্ষত্রিয় রাজগণের রাজত্বকালে, এক্ষণে ইংরেজের আমলে হিন্দু মুসলমান সকলেই যেমন 'নেটীব' বা ভূমিজ বলিয়া হেয়, তেমনই তখনকার কোঁচ, কেবট ও চাঁদলাগণ অন্ত্যজ বলিয়া হেয় ছিলেন। ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদের জলস্পর্শ করিতেন না; সুতরাং তাঁহারাও গর্ব্বিত ব্রাহ্মণগণের ধর্ম্মের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন

পূর্ব্বক সিদ্ধার্থ গৌতমের প্রচারিত সার্ব্বজনীন শীলধর্ম্মেরই সমধিক পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। প্রাচীন বগুড়ায় ব্রাহ্মণ অপেক্ষা যোগীদেরই মর্য্যাদা অধিক ছিল, এবং নিজ বগুড়া নগর এক্ষণে যথায় অবস্থিত, তাহার সন্নিকটে করতোয়া ও নাগর নদীর মধ্যবর্ত্তী ভূভাগ শীলবর্ষ নামে বিখ্যাত হইয়াছিল। এক্ষণে সেই প্রাচীন 'শীলবর্ষ' প্রদেশ পরগণে 'শেলবর্ষ' নাম ধারণ করিয়াছে।

'শেলবর্ষ' বা শীলবর্ষের মধ্যে বহুতর স্থানে প্রাচীন বৌদ্ধস্তূপের ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি বিদ্যমান আছে।

চাঁদলা, কেবট বা কোঁচগণের আদিম ভাষা কি ছিল, তাহা এক্ষণে জানিবার কোন উপায় নাই। কিন্তু ইঁহারা কোন সময়ে বাঙ্গালা ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিতে আরম্ভ করেন, তাহাও স্পষ্ট জানা যায় না। যে সকল আর্য্যবংশীয় লোক বাঙ্গালায় আগমন করেন, তাঁহাদের অধিকাংশেরই ভাষা নিকটবর্ত্তী মগধ বা মিথিলা দেশেরই প্রাকৃত ভাষা ছিল, অনুমান করা যাইতে পারে। মৈথিলী ও মাগধী প্রাকৃত ভাষা মিশ্রিত হইয়া বাঙ্গালায় পরিণত হইয়াছে। বৌদ্ধ যোগীরা পালী ভাষাতেই একদা ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতেন, বোধ হয়। বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইলে চাঁদলা, কোঁচ ও কেবটগণ বাঙ্গালা কহিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, অনুমান হয়। অন্ততঃ ঐ সময়েই বাঙ্গালা ভাষার একাধিপত্য সংস্থাপিত হইয়াছিল, মনে হয়।

বৌদ্ধপন্থী পালবংশীয় রাজগণ বহুদিন অর্থাৎ দুই শতাব্দীরও ঊর্দ্ধকাল ব্যাপিয়া এ প্রদেশে রাজত্ব করেন। শাণ্ডিল্যগোত্রীয় এক ব্রাহ্মণ-পরিবার উত্তরোত্তর কয়েক জন পাল রাজার অমাত্যপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। বগুড়া জেলার উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে মঙ্গলবাড়ী হাটের সন্নিকটে তাঁহাদের বাসস্থান ছিল, এবং তাঁহাদেরই বংশে 'মাতঃ শৈলসুতা' ইত্যাদি গঙ্গাস্তবের রচয়িতা গুরবমিশ্র প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। এই বংশের লোক আপনাদের বংশাবলী ও কীর্ত্তি ঘোষণা করিয়া একটি প্রস্তরস্তম্ভ স্থাপিত করিয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। ইংরাজীতে ইহা "বাদাল পিলার", এবং দেশীয় পণ্ডিতগণের মধ্যে 'গরুড়স্তম্ভ' নামে বিখ্যাত। কিন্তু দেশীয় লোকে ইহাকে 'ভীমের পান্টী' বলে। তাহাদের বিবেচনায়, এই বিশাল প্রস্তরস্তম্ভ ভীমের গো-তাড়ন দণ্ড (পান্টী) ছিল।

ফলতঃ, মহাভারতের আধিপত্য আমাদের দেশের লোকের মনে এতই বেশী যে, কোন একটা অদ্ভুত ব্যাপারের ব্যাখ্যার আবশ্যক হইলেই আমরা মহা-

ভারতের শরণাপন্ন হই। বগুড়ার উত্তরে বহুদূরব্যাপী একটি 'জাঙ্গাল' বা উচ্চ মৃন্ময় বপ্র আছে। কোন্ সময়ে কাহা কর্ত্তৃক এই জাঙ্গাল নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা লোকে ভুলিয়া গিয়াছে। সুতরাং এক্ষণে ইহা 'ভীমের জাঙ্গাল' নামে খ্যাত।

ভীমসেন যে একদা এ দেশে আপন বিক্রম প্রকাশ করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে প্রতিবাদ করিলে স্থানীয় অনেক লোকে বিস্ময়াপন্ন হয়েন। তাঁহাদের স্থির সিদ্ধান্ত এই যে, বগুড়াই প্রাচীন মৎস্য দেশ। এই দেশে বিরাট রাজা বাস করিতেন; কেন না, বগুড়ার উত্তরে এক্ষণে রঙ্গপুরের মধ্যে 'বিরাট' নামে একটি গ্রাম আছে;—আর কেবল তাহাই নয়,—বিরাটের কিয়দ্দূর দক্ষিণে বগুড়ারই মধ্যে 'কীচক' নামে আরও একটি স্থান আছে। বিরাট ও 'কীচক' নামে দুইটি গ্রামের নামকরণ কিরূপে হইল, তাহার নিশ্চয় করা কঠিন,—কিন্তু কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণকে বলা বাহুল্য যে, মহাভারতের মৎস্য দেশ রাজপুতানার অন্তর্গত জয়পুর অঞ্চলে বিদ্যমান ছিল। ভীম যে পাণ্টী হাতে করিয়া মঙ্গলবাড়ীর জঙ্গলে গরু চরাইতেন, বোধ করি মহাভারতেও এ কথা নাই!

বর্ত্তমান সময়ে বগুড়া জেলা প্রধানতঃ দুই অংশে বিভক্ত। এক অংশ করতোয়া নদীর পূর্ব্বে, অপর অংশ করতোয়া নদীর পশ্চিমে। পশ্চিমের মৃত্তিকা কঠিন ও লোহিতবর্ণ; ইহা স্থানীয় ভাষায় 'খিরার' বলিয়া উল্লিখিত। পূর্ব্বের মৃত্তিকা কোথাও বালুকাযুক্ত কর্দ্দমময় ও কৃষ্ণবর্ণ; ইহা স্থানীয় ভাষায় 'পলি' বলিয়া উল্লিখিত। পশ্চিম অংশ প্রাচীন 'বরেন্দ্র' বিভাগের অন্তর্গত। মহানন্দা ও করতোয়ার মধ্যবর্ত্তী উক্ত জনপদ পূর্ব্বকালে বরেন্দ্রভূমি বলিয়া বিখ্যাত ছিল।

বখ্তিয়ার খিলিজীর বাঙ্গালা দেশ আক্রমণের পূর্ব্বে বগুড়া অঞ্চলের লিখিত ইতিহাস কিছুই পাওয়া যায় না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। উল্লিখিত গরুড়স্তম্ভ-লিপিতে এই পর্য্যন্ত জানা যায় যে, একদা পালবংশীয় রাজারা এ দেশে রাজত্ব করিতেন, এবং তাঁহাদের সভাসদ্ এক ব্রাহ্মণপরিবারের ব্যক্তিরা এ দেশে অতিশয় গণ্যমান্য হইয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন স্কন্দপুরাণে করতোয়া-মাহাত্ম্যের বিবরণ কিঞ্চিৎ লিখিত আছে। ঐ বিবরণে 'মহাস্থান' নামক তীর্থের কথা কিছু লিখিত আছে মাত্র;—তাহাও এরূপ আকারে লিখিত যে, প্রকৃত ইতিহাস তাহা হইতে সংগ্রহ করা দুষ্কর।

'মহাস্থান' আধুনিক নাম। এবং ইহা একটি অপভ্রংশ শব্দ। ইহা একদা 'মহাস্নান তীর্থ' বলিয়া কথিত হইত; এক্ষণে মোটা লোকের জিহ্বায় 'মহাস্থান' হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

এই মহাস্নানতীর্থের স্কন্দপুরাণীয় নাম 'শীলদ্বীপ'। শীলদ্বীপের ঘাটে 'পৌষ-নারায়ণী' নামক শুভক্ষণে স্নান করিলে অদ্যাপি বিস্তর পুণ্য হয়। পৌষ-নারায়ণী সকল বৎসর সংঘটিত হয় না। অনেক বৎসরের পর এক এক বার যখন 'পৌষ-নারায়ণী' যোগ হয়, তখন সহস্র সহস্র হিন্দু নানা দেশ হইতে অদ্যাপি শীলদ্বীপের ঘাটে স্নান করিতে আইসে। অজ্ঞ লোকে শীলদ্বীপের ঘাট না বলিয়া এক্ষণে শিলাদেবীর ঘাট বলিয়া থাকে।

স্থানীয় মুসলমানগণের মধ্যে প্রবাদ এইরূপ যে, পরশুরাম নামে এক ক্ষত্রিয় নরপতি মহাস্থান গড়ে রাজত্ব করিতেন। তাঁহার সময়ে শাহ সুলতান নামক এক মুসলমান ফকীর বাল্‌খ্‌ বোখারা অঞ্চল হইতে একাকী আগমন করেন, এবং আপন অলৌকিক শক্তি প্রকাশ করিয়া পরশুরাম ও তাঁহার ক্ষত্রিয় সেনাগণকে নিহত করিয়া তাঁহার দুর্গ ও রাজ্য অধিকার করিয়া লয়েন, এবং শিলা দেবী নামে তাঁহার এক কন্যাকে আপন মহিষী করিবার উদ্যোগ করেন। শিলা দেবী প্রথমে শাহ সুলতানকে এইরূপ প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ করেন যে, মহাস্থান তীর্থে হিন্দুগণকে স্নান করিতে তিনি কদাচ নিষেধ করিবেন না, এবং পরে আপন হস্তের কঙ্কণের আঘাতে শাহ সুলতানকে হত্যা করিয়া নদীতে ঝাঁপ দিয়া প্রাণত্যাগ ও সতীত্বরক্ষা করেন। তদবধি এই ঘাট শিলাদেবীর ঘাট বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে। কিরূপে শব্দ হইতে তাহার ব্যাখ্যাচ্ছলে উপাখ্যানের সৃষ্টি হয়, শিলাদেবীর ঘাট তাহার একটি সুন্দর উদাহরণ।

স্কন্দপুরাণের লিখন অনুসারে পরশুরাম এই তীর্থে স্নান করিয়া পাপমুক্ত হইয়াছিলেন। তীর্থের পাণ্ডারা যাত্রীদিগকে পরশুরামের মুক্তির স্থান দেখাইয়া অর্থোপার্জ্জন করিতেন। তাই উপাখ্যানের মধ্যে পরশুরামও আসিয়া জুটিয়াছেন, সন্দেহ নাই।

বিচক্ষণ দর্শকেরা অদ্যাপি শীলদ্বীপের সন্নিকটে একটি বৌদ্ধস্তূপ বিদ্যমান রহিয়াছে, দেখিতে পান। স্থানীয় লোকেরা অদ্যাপি মহাস্থান গড়ের তিন স্থানে তিন 'মুনি' থাকার কথা বলে। মহাস্থান পর্য্যবেক্ষণ করিলে স্পষ্টই দেখা যায় যে, ইহা করতোয়া নদীতীরে একটি অতিশয় উচ্চ স্থান ছিল। করতোয়ার এক শাখা এই স্থানকে প্রদক্ষিণ করায় ইহা দ্বীপ নামে বিখ্যাত হয়। এই

দ্বীপে বৌদ্ধমুনিগণ কয়েকটি স্তূপ ইত্যাদি নির্ম্মাণ করিয়া বসবাস করিলে ইহা এক তীর্থে পরিণত হয়। শীলবর্দ্ধের দ্বীপের তীর্থ বলিয়া ইহা শীলদ্বীপ নামে বিখ্যাত হয়।

পাল নরপতিগণ নির্ব্বংশ হইলে বিজয় সেন নামে সেনবংশীয় রাজা বাঙ্গালা দেশ অধিকার করেন। ইনি বিখ্যাত বল্লাল সেনের পিতা। পালেরা যেমন নিরপেক্ষ বৌদ্ধ ছিলেন, অর্থাৎ বৌদ্ধ থাকিয়াও ব্রাহ্মণের সমাদর করিতে ক্রটি করিতেন না, বিজয় সেন তেমনই এক জন গোঁড়া শৈব ছিলেন। সেনবংশের রাজত্বকালেই বাঙ্গালা দেশে আধুনিক হিন্দুধর্ম্মের অভ্যুত্থানের প্রারম্ভ ঘটে। এই সময়ে বৌদ্ধমঠে শিবস্থাপনা হইবার সূত্রপাত হয়। এবং তদনুসারে বহুসংখ্যক শিবলিঙ্গ আসিয়া শীলদ্বীপে ভগবান বুদ্ধদেবের স্থান অধিকার করে। বৌদ্ধতীর্থ ক্রমে একটি হিন্দু শৈবতীর্থে পরিণত হয়।

বল্লাল সেনের পুত্র লক্ষ্মণ সেনকে নবদ্বীপ হইতে তাড়াইয়া দিয়া বখ্‌তিয়ার খিলজী গৌড় নগরের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। ঐ রাজধানী লুণ্ঠন করিয়া তিনি দেখিলেন যে, উত্তর-বঙ্গে তাঁহার সহিত যুদ্ধে সম্মুখীন হইতে পারে, এরূপ আর দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই। সমুদায় উত্তর-বঙ্গই মুহূর্ত্তমধ্যে তাঁহার শাসনাধীন হইয়া পড়িল। দেশের লোক অতিশয় নিরীহ, রাজার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা ইহাদের স্বভাব বা অভ্যাস নহে। এক রাজা হয়—এক রাজা যায়,—তাহারা বসিয়া দেখে। পাল গেল—সেন গেল—পাঠান আসিল ; পালের পর যেমন সেনকে—তেমনই সেনের পর পাঠানকে তাহারা রাজকর দিতে কোন প্রকার আপত্তি করিল না। এইরূপ শান্তশীল প্রজাগণকে রক্ষা করাই রাজধর্ম্ম। বখ্‌তিয়ার সেই রাজধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে অগ্রসর হইলেন।

ঐ সময়ে, এবং তাহারও পূর্ব্ব হইতে বঙ্গের নিরীহ কৃষকগণ উত্তর হইতে এক দল ও দক্ষিণ হইতে এক দল দস্যু জাতির অত্যাচারে প্রপীড়িত হইত। উত্তরের দস্যুরা ভোট অঞ্চল হইতে আসিত বলিয়া ভুটিয়া বা ভোট নামে বিখ্যাত হইয়াছিল ; এবং দক্ষিণের দস্যুরা মগের মুলুক হইতে আসিত ও তাহাদিগকে দেশের লোক চট্ট বলিত। অদ্যাপি তাহাদের দেশ চট্টগ্রাম নামে খ্যাত। ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা এই দুই দস্যুদলকেই 'চট্টভট্ট'-জাতীয় বলিয়া তাম্রফলক সকলে উল্লেখ করিতেন। চট্টগণ জলপথে নৌকা বাহিয়া আসিত। শায়েস্তা খাঁর পুর্ব্বে মুসলমানেরা তাহাদিগের শাসন করিতে সমর্থ হন নাই। কিন্তু ভোট বা ভট্টেরা স্থলপথে উত্তরবঙ্গে প্রবেশ করিয়া গ্রাম ও নগর লুণ্ঠন করিত।

বখ্‌তিয়ার খিলজী এই ভটুগণের দমন করিবার জন্য তাহাদের দেশও অধিকার করিতে দৃঢ়সংকল্প হইলেন। উত্তরবঙ্গ তৎকালেও পৌণ্ড্রবর্দ্ধন রাজ্য বলিয়া খ্যাত হইয়াছিল। পশ্চিমে মহানন্দা নদীর তীরে ইহার প্রাচীন রাজধানী পুণ্ড্র বা পাঁড়ুয়া নগর, এবং পূর্ব্বে করতোয়ার অপর পারে বর্দ্ধনকোট নামক এক প্রধান দুর্গ ছিল। কোট শব্দের অর্থই দুর্গ। পুণ্ড্রের ন্যায় বর্দ্ধনকোটও এক্ষণে ভগ্নাবশেষময় সামান্য পল্লীতে পরিণত হইয়াছে।

এই বর্দ্ধনকোট দুর্গ সম্ভবতঃ ভটুগণের প্রবেশরোধের জন্যই নির্ম্মিত হইয়াছিল। যে দাওকোপা বা কোনই নদী এক্ষণে বগুড়া ও রঙ্গপুরের পূর্ব্বসীমায় প্রবাহিত, উহা বখ্‌তিয়ারের সময়ে বর্দ্ধনকোটের নিম্নেই বর্ত্তমান ছিল; এখন পূর্ব্ব দিকে অনেক দূর সরিয়া গিয়াছে। তৎকালে মুসলমান ইতিহাস-লেখকগণের লিপির অনুসরণ করিয়া Stewart সাহেব ঐ নদীর নাম 'রঙ্গমটী' বলিয়া লিখিয়াছেন। উহা 'রঙ্গমতী' কি 'রাঙ্গা মাটী' বলিয়া পড়িতে হইবে, তাহা আমি এ পর্য্যন্ত অবধারণ করিতে পারি নাই। ফলতঃ, আসামের এক স্থান রাঙ্গামাটী নামে প্রসিদ্ধ। তদনুসারে উহা রাঙ্গামাটীর নদী হইতে পারে। অথবা, যদি 'রঙ্গমতী'ই প্রকৃত নাম হয়, তবে ঐ রঙ্গমতীই এখনকার বগুড়া জেলাস্থিত বাঙ্গালী নদীতে পরিণত হওয়া বিচিত্র নহে। ফলতঃ, ইহা অনুমানমাত্র।

বখ্‌তিয়ার খিলজি গৌড়ে অধিক দিন বিশ্রাম না করিয়া পূর্ব্বাভিমুখে বর্দ্ধনকোটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তৎকালে কোঁচ ও মেচ বংশীয় লোকই এ দেশে অধিকপরিমাণে বাস করিত। মেচবংশীয় এক জন প্রধানকে বখ্‌তিয়ার মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন, এবং তাহাকে 'আলি' নাম প্রদান করেন। আলি মেচ্‌ বর্দ্ধনকোটে আগমনকালে বখ্‌তিয়ারের পথদর্শক হইয়া আসিয়াছিল।

বখ্‌তিয়ার দেখিলেন, বর্দ্ধনকোটের নিম্নে গঙ্গার তিন গুণ প্রশস্ত এক নদী প্রবহমানা রহিয়াছে। তাহার অপর পারেই কামরূপ রাজ্য। তাহাতে স্পষ্টই অনুমান হয়, বগুড়া জেলা নদীনির্ম্মিত। এখানকার পলীমহলের প্রায় অধিকাংশ তৎকালের কামরূপ রাজ্যের অন্তর্গত ছিল।

বখ্‌তিয়ার কিরূপে ঐ বিস্তীর্ণ নদীর কূলে কূলে উত্তরাভিমুখে বহু দূর অগ্রসর হইয়া কামরূপ রাজ্যের মধ্য দিয়া ভোট দেশে প্রবিষ্ট হয়েন, এবং তথায় যুদ্ধে নিহত হয়েন, তাহা এ স্থলে উল্লেখ করা অনাবশ্যক। তবে তাঁহার সময় হইতে

আলি মেচের ন্যায় বহুসংখ্যক কোচ ও মেচ যে মুসলমান হইতে লাগিল, ইহাই বগুড়ার ইতিহাস বুঝিবার পক্ষে প্রয়োজনীয় কথা। কালক্রমে মুসলমানেরা করতোয়া নদীতীরে মহাস্থানগড়ের ১৫ ক্রোশ মাত্র উত্তরে ঘোঁড়াঘাটে দুর্গ ও সেনা-নিবাস নির্ম্মাণ করেন। মহাস্থানেও ঐরূপে একটি মুসলমান দুর্গ গঠিত হয়। মুসলমানদের পূর্ব্বে মহাস্থানে কোন দুর্গ ছিল না।

শাহ সুলতান নামে কোন ফকীর মহাস্থান তীর্থে আসিয়া হিন্দুদের দেবমূর্ত্তি সকল ভগ্ন করিয়া তথায় মসজীদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কথিত আছে, শাহ সুলতান অনেক হিন্দুকে মুসলমান করিয়াছিলেন।

ফলতঃ, বগুড়া জেলা উত্তরবঙ্গে মুসলমানগণের একটি সীমান্ত প্রদেশ ছিল। ভোট ও কামরূপ রাজ্যের লোক এ দেশে প্রবিষ্ট হইয়া উপদ্রব করিতে না পারে, তজ্জন্য এই সীমান্ত প্রদেশে সেনানায়কেরা জায়গীরদারস্বরূপে উপনিবিষ্ট হয়েন। তাঁহাদের ও তাঁহাদের অনুচরগণের হস্তে অনেক হিন্দুর জাতিনাশ ঘটে। আফ্‌গান সৈনিকেরা স্বদেশ হইতে পত্নী সমভিব্যাহারে এ দেশে আইসে নাই। এ দেশীয় রমণীগণের গর্ভেই তাহারা সন্তান উৎপাদন করিয়া মুসলমান প্রজা বর্দ্ধিত করিতে আরম্ভ করে। সঙ্গে সঙ্গে দেশের লোকও মুসলমান হইতে আরম্ভ করে। উচ্চশ্রেণীর হিন্দুরা, যাহাদের বৃত্তি কৃষিকার্য্য ছিল না,—তাহারা অনেকেই পলায়ন করে, কিন্তু সাধারণ কেবট, চাঁদলা, কোঁচ, মেচ প্রভৃতি প্রজাগণ, কৃষিকার্য্যই যাহাদের প্রধান উপজীবিকা, তাহারা ভূমি ছাড়িয়া দেশান্তরে যাইতে পারে নাই।*

---

* আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে স্বর্গীয় বটব্যাল মহাশয় প্রবন্ধটি সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই।—সাহিত্য-সম্পাদক।

আলমগীর বাদশাহ।

আওরঙ্গজেব বৃদ্ধ পিতাকে বন্দী করিয়া ও ভ্রাতৃ-রক্তে স্নাত হইয়া ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে হিন্দুস্থানের সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। যে সাম্রাজ্য করতলগত করিবার জন্য আওরঙ্গজেব পাপে দ্বিধাশূন্য হইয়াছিলেন, এবং যাহার গৌরববৃদ্ধি ও স্থায়িত্বের কামনায় আজীবন অক্লান্তভাবে সাধনা করিয়াছিলেন, তাঁহার রাজত্বের শেষভাগেই সেই সাম্রাজ্য পতনোন্মুখ হইল।

আকবরের অনন্যসাধারণ উদারতাগুণে সকলেই মন্ত্রমুগ্ধ হইয়াছিল। তিনি হিন্দু মোসলমানকে এক সূত্রে গ্রথিত করিয়া মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। আওরঙ্গজেব পূর্ব্বপুরুষের অনুসৃত উদারনীতি পরিত্যাগ করিয়া সংকীর্ণ নীতির অনুবর্ত্তী হইলেন; সুতরাং হিন্দুগণ আর মোগল-সাম্রাজ্যের হিতাকাঙ্ক্ষী রহিলেন না।

আওরঙ্গজেব তক্তাউসে অধিরোহণ করিবার জন্য কোনরূপ পাপানুষ্ঠানে কুণ্ঠিত হন নাই। এই জন্য তিনি বিশিষ্ট মোসলমানসমাজের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। আওরঙ্গজেব তাঁহাদের প্রীতি ও শ্রদ্ধা লাভ করিবার জন্য হিন্দুদিগকে বলপূর্ব্বক এসলামধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে কৃতসংকল্প হন। যদি কেহ রাজাজ্ঞা প্রতিপালন করিতে অস্বীকৃত হইয়া এসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ না করিত, তাহা হইলে বাদশাহ গুরুদণ্ডের বিধান করিতেন; কখনও কখনও অবাধ্য প্রজার রক্তে তরবারি রঞ্জিত হইত। তাঁহার ব্যবহারে বোধ হইত, যেন তিনি প্রকৃতিপুঞ্জের রক্তপ্রবাহে স্বীয় পারিবারিক কলঙ্ক-কালিমা বিধৌত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

কেহ কেহ রাজানুগ্রহলাভের প্রলোভনে এসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিত; কিন্তু হিন্দু জনসাধারণ স্বধর্ম্মবিসর্জ্জনে স্বীকৃত হয় নাই। তাহারা এসলাম ধর্ম্মের বিভীষিকা হইতে পরিত্রাণলাভ করিবার জন্য ধর্ম্ম-প্রচারকদিগকে নিহত করিতে লাগিল। ধর্ম্মার্থ জীবনবিসর্জ্জন করিয়া ইহকালে প্রতিষ্ঠা ও পরকালে স্বর্গলাভ করিবার কামনা জনসাধারণের হৃদয়ে বলবতী হইয়া উঠিল। এমন কি, এক বৃদ্ধা রমণীর নেতৃত্বে বহুসংখ্যক হিন্দু সশস্ত্র হইয়া আগ্রা হইতে দিল্লীর অভিমুখে অভিযান করিয়াছিল। ইহাদিগকে দমন করিবার জন্য স্বয়ং

আওরঙ্গজেব রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। হায়! হিন্দুর সে দিন কোথায় গেল! সে শৌর্য্য-বীর্য্যের উজ্জ্বল রবি কোন্ অন্ধতমসময় সাগর-নীরে অস্তমিত হইল! হিন্দু সাধারণকে এসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য অত্যাচারের বিরাম ছিল না। ইহার ফলে কৃষকশ্রেণী শস্যক্ষেত্র হইতে বিদায় গ্রহণ করিল; শিল্পিগণ স্ব স্ব ব্যবসায় ছাড়িয়া দিল। সুতরাং প্রাদেশিক রাজস্বের হ্রাস হইল। প্রাদেশিক শাসকগণ তাহা বাদশাহের কর্ণগোচর করিলেন। বাদশাহ রাজস্বের ক্ষতিপূরণ ও কৌশলে হিন্দু-সাধারণকে এসলাম ধর্ম্মের পক্ষপাতী করিবার জন্য জিজিয়া কর প্রচলিত করিলেন। এই জিজিয়ার অত্যাচারে দরিদ্র হিন্দুর দুর্দ্দশার সীমা ছিল না। করের হার এত উচ্চ ছিল যে, নিম্নশ্রেণীস্থ প্রজাবর্গের নিকট হইতেই পূর্ব্ব রাজস্বের একার্দ্ধ সংগৃহীত হইত। কিন্তু নিতান্ত নিঃস্ব হিন্দু প্রজাও এই গুরুতর করভার হইতে রক্ষা-লাভের প্রলোভনে স্বধর্ম্মে জলাঞ্জলি দেয় নাই। *

মোগল সাম্রাজ্যের অধিকাংশ মোসলমান রাজকর্ম্মচারী শিয়া-মতাবলম্বী ছিলেন। এই সকল রাজকর্ম্মচারী মোগল-সাম্রাজ্যের মঙ্গলকামনায় প্রাণকে তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন, সর্ব্বান্তঃকরণে সাম্রাজ্যের উন্নতিকামনায় নিরত থাকি-তেন, প্রভুর কার্য্য নিষ্পন্ন হইলেই চরিতার্থ হইতেন, আপনাদের উন্নতি মোগল সাম্রাজ্যের উন্নতির সহিত অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ বলিয়া মনে করিতেন। আওরঙ্গজেব সুন্নি-মতাবলম্বী ছিলেন; সুন্নি-সমাজে প্রতিপত্তি ও খ্যাতিলাভ করিবার আশায় তিনি এই স্বজাতীয় বিশ্বস্ত কর্ম্মচারিগণকে প্রীতির চক্ষে দেখিতেন না, বরং তাঁহাদিগকে ভ্রান্ত বিশ্বাসী বলিয়া হিন্দুর ন্যায় ঘৃণা করি-করিতেন। আওরঙ্গজেব অত্যন্ত কপট ও সন্দিগ্ধ ছিলেন, কাহাকেও বিশ্বাস করিতেন না। তাঁহার ঘৃণাপূর্ণ সন্দিগ্ধ ব্যবহারে বিশ্বস্ত মোসলমান রাজপুরুষ-গণও বিরক্ত হইয়াছিলেন। † এই সকল কারণে তাঁহারা আর মোগল-

---

* আওরঙ্গজেবের হিন্দুবিদ্বেষ কিরূপ ভয়ঙ্কর ছিল, তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা আর একটি আদেশের উল্লেখ করিতেছি। সুবিখ্যাত ইতিহাসবেত্তা কাফি খাঁ লিখিয়াছেন যে, বাদশাহের আদেশে হিন্দুদিগের ডুলিতে অথবা আরব অশ্বে আরোহণ নিষিদ্ধ হইয়াছিল।

† শাহজাহানের রাজত্বকালে আওরঙ্গজেব দক্ষিণাপথের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তৎকালে মীর জুম্লা নামক এক জন কোটীপতি ও প্রতিপত্তিশালী সেনাপতি তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। মীর জুম্লা ক্রমশঃ আওরঙ্গজেবের দক্ষিণবাহুস্বরূপ হইয়া উঠিলেন। আওরঙ্গজেবের কূট বুদ্ধির সহিত যদি মীর জুম্লার ধনবল ও বাহুবল সম্মিলিত না হইত, তাহা হইলে তিনি দিল্লীর রাজ-সিংহাসন অধিকার করিতে পারিতেন কি না, নিঃসন্দেহে বলা যায় না। আওরঙ্গজেব সিংহাসনে

সাম্রাজ্যের হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন না। কিন্তু আওরঙ্গজেবের অসাধারণ ক্ষমতার ও প্রতাপে সকলেই সন্ত্রস্ত ছিলেন, সুতরাং কোন রাজপুরুষই তাঁহার বিরুদ্ধাচরণে সাহসী হন নাই। এই জন্যই তাঁহাদের মনোভাব বাদশাহের জীবদ্দশায় প্রকাশিত হয় নাই। কিন্তু ইহার ফলে মোগল সাম্রাজ্যের প্রভূত ক্ষতি হইয়াছিল। কারণ, অসন্তুষ্ট কর্ম্মচারীকে কোন কার্য্যে নিযুক্ত করিলে তাহা সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না। এতদ্ব্যতীত তিনি এক জন কর্ম্মচারীকে কোন বিষয়ের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেন না। সন্দিগ্ধচিত্ত বাদশাহ এক জন রাজপুরুষকে কোনও কার্য্যের ভার দিতেন; সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সহকারী স্বরূপ আর এক জন কর্ম্মচারীকে নিযুক্ত করিতেন। ইহাতে রাজপুরুষগণের দায়িত্ব দ্বিধা বিভক্ত হইয়া পড়িত, কেহই কর্ত্তব্যপালনে তাদৃশ মনোযোগী হইতেন না। এই সকল কারণে আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে বিবিধ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছিল।

আওরঙ্গজেব শাসনসংক্রান্ত বিষয়ে আকবরের প্রবর্ত্তিত পন্থার অনুসরণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু পরধর্ম্মবিদ্বেষবশে তিনি একটা গুরুতর পরিবর্ত্তন করেন। আওরঙ্গজেবের রাজ্যলাভের পূর্ব্বে মোগল সাম্রাজ্যে হিন্দু সেনাপতিগণ সৈন্যপরিচালন করিতেন; হিন্দু শাসনকর্ত্তৃগণ দেশশাসন করিতেন; যে সকল সেরেস্তার কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিতে হইলে শিক্ষিত লোকের আবশ্যক হইত, তাহা একমাত্র হিন্দুরই একচেটিয়া ছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সে সময়ে রাজপুত সেনাই মোগলবাহিনীর প্রাণ ছিল। কিন্তু পরধর্ম্মবিদ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া আওরঙ্গজেব হিন্দুদিগকে পদচ্যুত করিবার আদেশ দিয়াছিলেন। * কার্য্যপটু হিন্দু কর্ম্মচারিগণ পদচ্যুত হইলেন, তাঁহাদের পরিবর্ত্তে অর্দ্ধশিক্ষিত নিকৃষ্ট শ্রেণীর মোসলমানগণ উচ্চপদে অভিষিক্ত হইতে লাগিলেন। ইহার ফল বিষময় হইল। আওরঙ্গজেব নিজে এসলাম ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুশাসনমতে ন্যায়বিচারে ও প্রজাপালনে পরাঙ্মুখ ছিলেন না।

অধিরোহণ করিয়া মীর জুম্লাকে বাঙ্গালার সুবাদারের পদে নিযুক্ত করেন। মীর জুম্লা বঙ্গদেশে রোগাক্রান্ত ও মৃত্যুমুখে পতিত হন। আওরঙ্গজেব তাদৃশ শুভাকাঙ্ক্ষী বীরপুরুষের মৃত্যুতে বিন্দুমাত্রও দুঃখিত হন নাই, বরং এক জন ক্ষমতাশালী উচ্চাভিলাষী বীরপুরুষের তিরোভাব দেখিয়া, অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। বাদশাহ রাজপুরুষগণের সহিত কি প্রকার ব্যবহার করিতেন, এই ঘটনা হইতেই তাহা অনুমিত হইতে পারে।

* "The Hindu writers have been entirely excluded from holding public offices"—*Mir-at-i-Alam.*

কিন্তু নব-নিযুক্ত অকর্ম্মণ্য ও অশিক্ষিত মোসলমান কর্ম্মচারিগণের সে দিকে দৃষ্টি ছিল না। তাহাদের অত্যাচারে ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রদেশ অচিরে হাহাকারে পূর্ণ হইয়া উঠিল।

আর এক কারণেও এই অত্যাচার ও অর্থশোষণের মাত্রা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। আওরঙ্গজেব কাহাকেও বিশ্বাস করিতেন না। রাজপুরুষগণ দীর্ঘকাল এক স্থানে অবস্থান করিলে তাঁহারা অত্যন্ত প্রতিপত্তিশালী হইয়া উঠিবেন, এই আশঙ্কায় বাদশাহ তাঁহাদিগকে অধিক দিন এক প্রদেশে থাকিতে দিতেন না। এই জন্য রাজপুরুষগণ যেখানে গমন করিতেন, সেখানে তাঁহারা প্রবাসীর ন্যায় বাস করিতেন; আপনাদের শাসনাধীন প্রদেশের প্রকৃত হিতকামনার বশবর্ত্তী হইয়া কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন না। শাসনাধীন প্রদেশ পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে কোনও প্রকারে অর্থসঞ্চয় করাই তাঁহাদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। সুতরাং অত্যাচারের স্রোত প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। দূরবর্ত্তী প্রদেশসমূহের শাসকবর্গের যথেচ্ছাচার-দমনের কোনও উপায় ছিল না। প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাদিগের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত হইলে স্বয়ং আওরঙ্গজেব তাহার বিচার করিতেন। কিন্তু বাদশাহের দরবারে উপস্থিত হওয়া সকলের সাধ্যায়ত্ত ছিল না। প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তারাও যাহাতে আপনাদের অত্যাচারকাহিনী বাদশাহের কর্ণগোচর না হয়, সে বিষয়ে বিলক্ষণ অবহিত ছিলেন। সুতরাং অন্যায় অত্যাচারের একশেষ হইতে লাগিল। আকবর বাদশাহের সু-শাসনগুণে জনসাধারণ মোগল-শাসনের অনুরক্ত হইয়াছিল; কিন্তু আওরঙ্গজেব বাদশাহের শাসনচক্রে পিষ্ট হইয়া তাহারা আর মোগল-শাসনের পক্ষপাতী রহিল না।

পক্ষান্তরে বাদশাহের সঙ্কীর্ণ নীতির ফলে অর্দ্ধশতাব্দীব্যাপী যে সমরানল প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল, তাহার ইন্ধনসংগ্রহ করিতেই রাজকোষ শূন্য হইয়া গেল। আওরঙ্গজেবের বীরত্ব, রণকৌশল, শ্রমশীলতা, কার্য্যদক্ষতা, সর্ব্বতোভাবে প্রশংসনীয়, সন্দেহ নাই। তিনি বৃদ্ধ বয়সেও যুবার ন্যায় পরিশ্রম করিতেন; স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া সৈন্য পরিচালন করিতেন; রাজ্যশাসন-সম্পর্কীয় প্রত্যেক কার্য্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে স্বয়ং পর্য্যবেক্ষণ করিতেন; এমন কি, তাঁহার অনুমতি ব্যতীত কাবুলের ন্যায় দূরবর্ত্তী স্থানেও এক জন সামান্য কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিবার কাহারও অধিকার ছিল না। কিন্তু তাঁহার আদৌ দূরদর্শিতা ছিল না; তিনি যে সংকীর্ণ নীতির অনুসরণ করিতেছিলেন, অচি-

রেই তাহার বিষময় ফল ফলিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু তথাপি তিনি স্ব-প্রবর্ত্তিত কু-নীতি পরিত্যাগ করিলেন না। তাঁহার অবিবেকিতায় মোগল-সাম্রাজ্যের ভিত্তিমূল বিচলিত হইয়া উঠিল। আওরঙ্গজেব প্রতিভাশালী বিচক্ষণ শাসনকর্ত্তা বলিয়া ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র খ্যাত ছিলেন; আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা তাঁহার নামে কম্পিত হইত। কেবল এই কারণেই তাঁহার শাসনকালে মোগল-সাম্রাজ্য ভূলুণ্ঠিত হয় নাই। কিন্তু বাদশাহের মৃত্যুর পরে তাঁহার প্রতাপ, প্রভাব ও প্রতিভা অস্তমিত হয়, এবং এক জন দুর্ব্বলচিত্ত অকর্ম্মণ্য সম্রাট দিল্লীর সিংহাসনে উপবেশন করেন। তখন শিথিলমূল মহীরুহের ন্যায় বলহীন মোগল সাম্রাজ্য সামান্য ঝঞ্ঝায় চূর্ণ বিচূর্ণ ও ধূলিসাৎ হইয়া যায়।

আওরঙ্গজেব সিংহাসনে আরোহণ করিয়া দেখিলেন যে, দক্ষিণাপথের পার্ব্বত্য প্রদেশে মহারাষ্ট্রতিলক * শিবাজী ধীরে ধীরে শক্তিসঞ্চয় ও স্বাধীন হিন্দুরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিতেছেন। আওরঙ্গজেব প্রথমে তাঁহাকে 'পার্ব্বত্য মূষিক' বলিয়া উপহাস করিতেন। কিন্তু যখন শিবাজী ক্রমশঃ প্রবল হইয়া মোগল সাম্রাজ্যের কিয়দংশ আত্মসাৎ করিলেন, তখন আওরঙ্গজেব তাঁহাকে অঙ্কুরেই বিনাশ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। ১৬৬২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি শায়েস্তা খাঁকে শিবাজীর বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। মহারাষ্ট্র যুদ্ধ সূচিত হইল। কখনও শিবাজী যুদ্ধে জয়লাভ করিতেন, কখনও বা বিজয়শ্রী মোগলের অঙ্কশায়িনী হইতেন। কিন্তু আওরঙ্গজেব কখনও শিবাজীকে দমন করিতে পারেন নাই। এই ভাবে ১৬৭১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত যুদ্ধ চলিল। এই অব্দে বাদশাহ মহাবত খাঁকে সৈনাপত্যে বরণ করিয়া শিবাজীর বিরুদ্ধে চল্লিশ সহস্র মোগল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। ইহার পূর্ব্বে শিবাজী কখনও সম্মুখযুদ্ধে অগ্রসর হন নাই। এইবার তিনি প্রকাশ্যভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া আত্মবল-পরীক্ষার সঙ্কল্প করিলেন। মোগল-সৈন্যের সহিত শিবাজীর তুমুল যুদ্ধ আরব্ধ হইল। মোগল সৈন্য সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হইল; বহুসংখ্যক মোগল সেনা ও বাইশ জন সৈন্যাধ্যক্ষ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণবিসর্জ্জন করিলেন।

---

* দক্ষিণাপথের যে অংশ মহারাষ্ট্র দেশ নামে পরিচিত, তাহার উত্তরে সুরাট ও সাতপুরা পর্ব্বত, পশ্চিমে আরব সমুদ্র, দক্ষিণে কর্ণাট প্রদেশ, পূর্ব্বে বরদা নদী। এই বিস্তৃত ভূমির পরিমাণ ১০,২০০০ বর্গ মাইল। এই দেশের একাংশ বিজাপুরের অধীন, এবং অপরাংশ আহমদনগর রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। কিন্তু শাহজাহান বাদশাহ আহমদ নগর রাজ্যের ধ্বংস করেন। শিবাজীর অভ্যুদয়কালে মহারাষ্ট্র ভূমির একাংশ বিজাপুর রাজ্যের অধীন, এবং অপরাংশ মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

এই সময়ে অকস্মাৎ আফগান রাজ্যে বিদ্রোহাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। অগত্যা আওরঙ্গজেব শিবাজীর সহিত যুদ্ধে বিরত হইলেন। খাইবার ও ইউসফজাই জাতি বিদ্রোহ-পতাকা উড্ডীন করিয়া মোগল সেনাপতিকে পরাজিত ও গিরিসঙ্কটবাসী মোগল সেনাদিগকে নিহত করিল। দুই বৎসর যুদ্ধের পর বিদ্রোহিগণ আংশিক বশ্যতা স্বীকার করিল। আওরঙ্গজেবও প্রফুল্লচিত্তে সন্ধির প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

আফগানভূমিতে শান্তি সংস্থাপিত হইতে না হইতেই আর এক বিপদ উপস্থিত হইল। সত্যনামী নামক অস্ত্রধারী হিন্দুধর্ম্মসম্প্রদায় এই সময় নারনৌলে বাস করিতেছিল। এক জন শান্তিরক্ষকের উৎপীড়নে এই ধর্ম্ম-সম্প্রদায় ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। পার্শ্ববর্ত্তী অসন্তুষ্ট জমীদারগণ তাহাদের সহিত মিলিত হইলেন। সুতরাং সমগ্র আগ্রা ও আজমীর প্রদেশে অশান্তির সীমা রহিল না। কিন্তু বাদশাহ অনায়াসে এই বিদ্রোহের দমন করিয়া রাজ্যে শান্তি সংস্থাপিত করিলেন। সত্যনামী সম্প্রদায়ের বিদ্রোহ সামান্য ঘটনা বটে, কিন্তু এই ঘটনা হইতে বিষময় ফল উৎপন্ন হইল।

আওরঙ্গজেব বাদশাহের হিন্দু-বিদ্বেষ অত্যন্ত প্রবল ছিল। আওরঙ্গজেব এসলাম ধর্ম্মের গোঁড়া বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত ছিলেন। কিন্তু তাঁহার গোঁড়ামি আন্তরিক ছিল না,—রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে তিনি অনেক সময় গোঁড়ামি প্রকাশ করিতেন। আওরঙ্গজেব আজন্ম বিলাসে পরিবর্দ্ধিত হইয়াও যৌবনের প্রারম্ভে সাংসারিক বিষয়ে অত্যন্ত অনাসক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন।

আওরঙ্গজেব যখন সপ্তদশবর্ষবয়স্ক তরুণ যুবক, তখন শাহজাহান তাঁহাকে শাসনকর্ত্তার পদে বরণ করিয়া দক্ষিণাপথে প্রেরণ করেন। কিন্তু তিনি শাসন-কার্য্যে মনোনিবেশ না করিয়া সর্ব্বদা ধর্ম্মালোচনায় মগ্ন থাকিতেন। এবং বহুমূল্য রাজোচিত বসন ভূষণ পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বদাই পবিত্রতার আচ্ছাদন-স্বরূপ শুভ্র বেশ পরিধান করিতেন। তিনি চল্লিশ বৎসর বয়সে সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া ফকিরী গ্রহণ করিবার বাসনা প্রকাশ করেন। তাহার পর আওরঙ্গজেব পশ্চিমঘাট পর্ব্বতমালার বিজন প্রদেশে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া সংসারত্যাগী ফকীরের ন্যায় জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। শাহ-জাহান আওরঙ্গজেবের সংসারবিতৃষ্ণার বিষয় অবগত হইয়া এত দূর বিরক্ত হইয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া তাঁহার বৃত্তি রহিত করেন, এবং তাহাতেও পরিতৃপ্ত না হইয়া তাঁহার জায়গীর বাজেয়াপ্ত করিয়া তাঁহার

পদমর্য্যাদার লাঘব করেন। আওরঙ্গজেব বিলাসে বিতৃষ্ণ হইয়া বৈরাগ্যের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন; বৈরাগ্যও মোহন দৃশ্য উন্মুক্ত করিয়া তাঁহাকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়াছিল। কিন্তু অনাসক্ত ত্যাগী ফকীরের ন্যায় জীবনযাপন করিতে করিতে বৈরাগ্যের শান্তি ও মাধুর্য্য অন্তর্হিত হইয়া গেল! আওরঙ্গজেব এক বৎসর নির্জ্জন কুটীরে বাস করিয়া পুনর্ব্বার সংসারে ফিরিয়া আসিলেন; তাঁহার বৈরাগ্যের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল; সন্ন্যাসী যুবক রাজনীতিক্ষেত্রে পুনঃপ্রবিষ্ট হইয়া সৈন্যপরিচালনের ভার গ্রহণ করিলেন! বিলাস-বিরক্ত বীতস্পৃহ পুত্রকে পুনর্ব্বার সংসারে ফিরিতে দেখিয়া শাহজাহান প্রফুল্লচিত্তে তাঁহাকে বাল্‌খ দেশের শাসনার্থ প্রেরণ করিলেন। এই সময় হইতে আওরঙ্গজেব পুনঃপুনঃ দুঃসাধ্য কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য নিযুক্ত হইতেন। ইহার পর হইতে আওরঙ্গজেব কার্য্যের আবর্ত্তে বারংবার ঘূর্ণ্যমান হন। শাসনক্ষমতার আস্বাদ পাইয়া তিনি ক্ষমতালোলুপ হইলেন, এবং দিল্লীর ঐশ্বর্য্য দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ে দুরাকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিল।

অবশেষে আওরঙ্গজেবের ধর্ম্মবিশ্বাস তাঁহার অভীষ্টসিদ্ধির যন্ত্ররূপে পরিণত হইল। যখন আওরঙ্গজেবের চরিত্র এই ভাবে গঠিত হইল, তখন শাহজাহান তাঁহাকে পুনর্ব্বার দক্ষিণাপথের শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত করিলেন। এই সময়েই তিনি এক জন কূটবুদ্ধি রাজনীতিবিশারদ বলিয়া সর্ব্বত্র খ্যাতিলাভ করেন। ধর্ম্মের আচ্ছাদনে আত্মগোপন করিয়া তিনি গোপনে পিতৃ-সিংহাসন অধিকার করিবার জন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইলেন। ইহার পর হইতে তিনি প্রত্যেক অসদনুষ্ঠানেই ধর্ম্মবিশ্বাসের আবরণ দিতেন। শাহজাহান রোগ-শয্যায় শয়ান হইলে তিনি পিতৃ-সিংহাসন অধিকার করিবার জন্য দক্ষিণাপথ হইতে যাত্রা করিবার সময় সমবেত সৈন্যদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, "ঈশ্বর সাক্ষী, আমি ধর্ম্মরক্ষা করিবার জন্য এই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেছি।" আওরঙ্গজেব সিংহাসনে আরোহণ করিয়া নিষ্কণ্টক হইবার জন্য যখন ভ্রাতৃরক্তে হস্ত কলঙ্কিত করিয়াছিলেন, তখনও তিনি ধর্ম্মের ভান পরিত্যাগ করেন নাই। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার হত্যার পর আওরঙ্গজেব তদীয় বিধবা মহিষীর অপরূপ রূপ-লাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া কোরাণের বচন উদ্ধৃত করিয়া সপ্রমাণ করেন যে, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বিধবা মহিষীকে বিবাহ না করিলে প্রত্যবায়ভাগী হইতে হয়! এই প্রকারে প্রত্যেক অসদনুষ্ঠানেই তিনি নিজের ধর্ম্মবিশ্বাস যন্ত্ররূপে ব্যবহার করিতেন।

আওরঙ্গজেব এসলাম ধর্ম্মের গোঁড়া বলিয়া পরিচিত ছিলেন। মনুষ্য কোন ধর্ম্মের গোঁড়া হইলে পরধর্ম্মবিদ্বেষ তাহার পক্ষে স্বাভাবিক হইয়া উঠে। প্রথমে আওরঙ্গজেবের এসলাম ধর্ম্মের গোঁড়ামি আন্তরিক ছিল না; সুতরাং পরধর্ম্মবিদ্বেষের মূলও তাঁহার প্রকৃতিগত ছিল না। তিনি রাজনৈতিক-উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়াই পরধর্ম্মে বিদ্বেষ-প্রকাশ আবশ্যক বলিয়া মনে করিতেন। ভ্রাতৃরক্তপাত ও বৃদ্ধ পিতাকে অবরুদ্ধ করিয়া তিনি বিশিষ্ট মোসলমান-সমাজে কিয়ৎপরিমাণে ঘৃণিত হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহাদের প্রীতিভাজন হইবার আশায় রাজত্বের প্রারম্ভ হইতেই পরধর্ম্মে বিদ্বেষ প্রকাশ করিয়া হিন্দু ও শিয়াদিগের দলনে প্রবৃত্ত হন। কারণ, পরধর্ম্মে বিদ্বেষপ্রকাশই মোসলমান সমাজে প্রতিষ্ঠালাভের প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া পরিগণিত ছিল। কোনও বিষয়ে পুনঃপুনঃ লিপ্ত হইলে তাহা অবশেষে প্রকৃতিগত হইয়া উঠে। এ জন্য বাদশাহের পরধর্ম্মবিদ্বেষও শেষে আন্তরিক ও অকৃত্রিম হইয়া পড়ে। যাহা হউক, যদিও তিনি রাজনৈতিক কারণেই প্রথমে পরধর্ম্ম-দলনে প্রবৃত্ত হন, তথাপি আবার রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই তাঁহার রাজত্বের প্রথম ভাগে হিন্দুগণ তাদৃশ প্রবলভাবে উৎপীড়িত হন নাই।

প্রথমে আওরঙ্গজেব মোসলমানদের সহিত রাজপুত বীরদিগকেও রাজকার্য্যসাধনে নিযুক্ত করিতেন। এই সময়ে অম্বরাধিপতি রাজা জয়সিংহ ও যোধপুরাধিপতি রাজা যশোবন্ত সিংহ মোগল সাম্রাজ্যের স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন। হিন্দুদিগকে প্রবলভাবে উৎপীড়িত করিলে তাদৃশ ক্ষমতাশালী সেনাপতিযুগল বিরক্ত হইবেন, এই আশঙ্কায় আওরঙ্গজেব পূর্ণমাত্রায় হিন্দুবিদ্বেষের পরিচয় দিতেন না। কিন্তু হিন্দুকুলতিলক শিবাজীকে দমন করিতে না পারায় তাঁহার হিন্দুবিদ্বেষানল প্রধূমিত হইতেছিল;—সত্যনামীর বিদ্রোহপবনে সেই অগ্নি সন্ধুক্ষিত হইয়া উঠিল। ইহার পূর্ব্বেই বাদশাহের কূট কৌশলে জয়সিংহ পৃথিবী হইতে অপসারিত হইয়াছিলেন।* সুতরাং বাদশাহ যখন হিন্দুর প্রতি ঘোরতর অত্যাচার আরম্ভ করিলেন, তখন রাজা যশোবন্ত সিংহ ভিন্ন হিন্দুর আর কোনও রক্ষক ছিল না। যশোবন্ত সিংহ এই সময়ে রাজকার্য্যের অনুরোধে কাবুলে ছিলেন। হিন্দুর দুর্ভাগ্যক্রমে তথায় রাজার লোকান্তর ঘটিল। সুতরাং বাদশাহ নিষ্কণ্টক হইলেন। এইবার আওরঙ্গজেব মনের

* "Jay Sing died at Brampore * * and seems to have been poisoned by the procurement of Aurangzeb."—*Orme's Historical fragments.*

সাথে হিন্দুদিগকে নিপীড়িত করিবার বিবিধ উপায়ের উদ্ভাবন করিলেন। তিনি মোসলমানদিগকে শুল্ক হইতে অব্যাহতি দিলেন। এইরূপে হিন্দু মোসলমানের মধ্যে বৈষম্য প্রতিষ্ঠিত হইল। ইহাতে মোসলমানগণ হৃষ্ট হইলেন বটে, কিন্তু বাদশাহের রাজস্ব অনেক কমিয়া গেল। বিজ্ঞ ও বহুদর্শী কর্ম্মচারীদিগের পরামর্শে বাদশাহ নিয়ম করিলেন,—হিন্দুদিগকে শতকরা পাঁচ টাকা ও মোসলমানদিগকে শতকরা আড়াই টাকা শুল্ক দিতে হইবে।

তাহার পর বাদশাহের আদেশে হিন্দুদের রাজকার্য্যে নিয়োগ নিষিদ্ধ হইল; প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাদিগের উপর এই মর্ম্মে আদেশ প্রচারিত হইল। যে সকল হিন্দুকর্ম্মচারী রাজসেবায় জীবনের উৎকৃষ্ট ভাগ অতিবাহিত করিয়াছিলেন, এবং যাঁহাদের যত্নে ও চেষ্টায় শাসনযন্ত্র সুশৃঙ্খলরূপে পরিচালিত হইতেছিল, তাঁহারা বিনা দোষে পদচ্যুত হইলেন। হিন্দুর অসন্তোষের অবধি রহিল না; পক্ষান্তরে, রাজ্যের শাসনযন্ত্রও বিকল হইয়া পড়িল।

আওরঙ্গজেব ঘৃণ্য জিজিয়া কর পুনঃপ্রবর্ত্তিত করিয়া হিন্দু প্রজাদিগকে অত্যন্ত উত্যক্ত করিলেন। ধর্ম্মবিদ্বেষের ফলেই জিজিয়ার সৃষ্টি হইয়াছিল। মোসলমান শাসনের অধীনে যত প্রকার অত্যাচারের অনুষ্ঠান হইত, তন্মধ্যে হিন্দুগণ জিজিয়াকেই সর্ব্বাপেক্ষা তীব্র ও অসহ্য মনে করিতেন। জিজিয়া প্রবর্ত্তিত হইবার পর একদিন আওরঙ্গজেব হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া উপাসনার্থ মসজিদে গমন করিতেছিলেন। এমন সময় পঞ্চাশ সহস্র হিন্দু অশ্রুপূর্ণ-লোচনে কাতরকণ্ঠে জিজিয়া কর রহিত করিবার জন্য বাদশাহের নিকট প্রার্থনা করিল; বাদশাহ তাহাদের কাতর প্রার্থনায় কর্ণপাত করিলেন না। তাঁহার সঙ্গীয় হস্তী ও অশ্ব কর্তৃক বিমর্দ্দিত হইয়া বহুসংখ্যক হিন্দু প্রাণত্যাগ করিল। তাঁহার হিন্দুবিদ্বেষ জিজিয়ার পুনঃপ্রবর্ত্তনেই পর্য্যবসিত হয় নাই। তিনি অসংখ্য দেবালয় মসজিদে পরিণত করিলেন; দেবদেবীর মূর্ত্তি চূর্ণ করিয়া মসজিদের সোপানাবলী প্রস্তুত করিলেন। হিন্দুর পুণ্য দেবক্ষেত্র বারাণসীর দেবশ্রেষ্ঠ বিশ্বেশ্বরের মন্দির ভূলুণ্ঠিত হইল, এবং তাহার স্থলে মোসলমানের মসজিদ বিরাজ করিতে লাগিল। মুসলমান মৌলবীগণ হিন্দুদিগকে এসলাম-ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য এক হস্তে কোরাণ ও অপর হস্তে তরবারি লইয়া হিন্দুরক্তে পৃথিবী অনুরঞ্জিত করিতে লাগিল। *

---

*আওরঙ্গজেব কেন দেবদেবীর মূর্ত্তি চূর্ণ ও দেবালয় ভগ্ন করিবার আদেশ দিয়াছিলেন, এক জন ঐতিহাসিক তাহার কৌতুকাবহ কারণের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন

আওরঙ্গজেবের প্রবল উৎপীড়নে প্রত্যেক প্রদেশে অসন্তোষের বীজ উপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু এক রাজপুত ভিন্ন আর কোনও জাতিই আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হন নাই।

রাজা যশোবন্ত সিংহ কাবুলে লোকান্তরিত হইলে, তদীয় বিধবা মহিষী ও পুত্রদ্বয় স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিন্তু মতিচ্ছন্ন আওরঙ্গজেব দিল্লীতে তাঁহাদের শিবির অবরুদ্ধ করিলেন। যশোবন্ত সিংহের প্রভুভক্ত কার্য্যাধ্যক্ষ দুর্গাদাসের অনন্যসাধারণ বীরত্বে যশোবন্তের মহিষী ও রাজকুমারদ্বয় বাদশাহের কবল হইতে পরিত্রাণ পাইলেন। *

যে, এই সময়ে হিন্দুগণ মোসলমানদিগকে হিন্দুশাস্ত্র শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিয়াছিল। আওরঙ্গজেব ইহাতেই উত্তেজিত হইয়া এই আদেশ প্রদান করিলেন। আওরঙ্গজেবের আদেশে দেবদেবীর মূর্ত্তি ও মন্দিরসমূহের কিরূপ দশা হইয়াছিল, তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা এক জন মুসলমান ঐতিহাসিকের গ্রন্থ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

" All the Worshipping places of the infidels and the great temples of these infamous people have been thrown down and destroyed in a manner which excites astonishment at the successful completion of so difficult a task. His Majesty personally teaches the sacred kalima to many infidels with success and invests them with khelats and other favours."—*Mir-at-i-Alam.*

* এই বিষয়ে আওরঙ্গজেবকে নির্দ্দোষ প্রতিপন্ন করিবার জন্য সুবিখ্যাত ইতিহাস-লেখক কাফি লিখিয়া গিয়াছেন,—

"Without waiting for permission from Aurengzeb, and without even obtaining a pass from the subadar of the province they set off towards the Capital. When they reached the ferry of Attock they were unable to produce any pass, so the commander of the boats refused to let them proceed. They then attacked him, killed and wounded some of his men, and by force made good their way over the river and went onwards towards Dehli. There was an oldstanding grievance in the Emperor's heart respecting Raja Jaswant's tribute, which was aggravated by there presmuptuous proceedings of the Rajputs. He ordered the Kotwal to surround the camp of the Rajputs, and keep guards over them." এই বর্ণনা সত্য বোধ হয় না। যশোবন্তের বিধবা মহিষী তেজস্বিনী বীরনারী ছিলেন। তিনি কিরূপ শৌর্য্যশালিনী ছিলেন, তাহার প্রমাণস্বরূপ আমরা একটিমাত্র ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। যশোবন্ত সিংহ একবার রণক্ষেত্রে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেন। এই ঘটনায় যশোবন্ত-মহিষী এত উত্তেজিত হইয়াছিলেন যে, তিনি স্বামীকে স্বীয় কক্ষে প্রবেশ করিতে দেন নাই। আওরঙ্গজেব তাঁহাকে দিল্লীতে বন্দিনী করিলে তিনি যে কৌশলে পরিত্রাণলাভ করেন, তাহাও তাঁহার

রাজপুতানা বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল; তন্মধ্যে সম্মানে ও বীরত্বে মিবার ও মাড়োয়ার তখন অগ্রগণ্য। মাড়োয়ারের অধিপতি যশোবন্ত সিংহ স্বাধীনতায় জলাঞ্জলি দিয়া মোসলমান বাদশাহের দাসত্বস্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু মিবারাধিপতি কখনও মোসলমান বাদশাহের আদেশে অবনতমস্তক হন নাই; তাঁহাদের পদগৌরব তখনও অক্ষুণ্ণ ছিল। * মিবারের অধিপতির উপাধি রাণা রাজাধিরাজ ছিল। আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে রাজসিংহ মিবারের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। আওরঙ্গজেব তাঁহাকে জিজিয়া কর প্রদান করিবার আদেশ প্রদান করেন। মোগলের নামে রাজমুদ্রা প্রচলিত করিলে, রাজ্যমধ্যে গো-হত্যার অনুমতি প্রদান করিলে, হিন্দুর দেবালয় ভগ্ন করিয়া তাহার স্থলে মসজিদ নির্ম্মাণ করিলে, মোসলমান শাস্ত্রানুসারে বিচার-কার্য্য নির্ব্বাহ করিলে, রাজসিংহ ও তদীয় প্রজাবর্গ জিজিয়া হইতে অব্যাহতি-লাভ করিবেন, বাদশাহের এইরূপ আদেশ ছিল। রাণা রাজসিংহ আওরঙ্গ-জেবের এই অনুচিত প্রস্তাবে মর্ম্মাহত হইয়া নির্ভীকচিত্তে তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন, এবং সমগ্র হিন্দুজাতির পক্ষ হইতে বাদশাহকে এইরূপ অপকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে নিষেধ করিয়া ওজস্বিনী ভাষায় তাঁহাকে একখানি পত্র লিখিলেন। রাণা রাজসিংহ এই অনুরোধ করিয়াই নিরস্ত রহিলেন না;

প্রখর উদ্ভাবনী শক্তির পরিচায়ক। রাণীর অনুচরগণ কার্য্যব্যপদেশে বাদশাহের অনুমতিক্রমে স্বদেশে ফিরিয়া যায়। রাজপুত্রদ্বয়ের সমবয়স্ক দুই জন বালক রাজ-ভূষণে ভূষিত হইল। এবং কয়েক জন সঙ্গিনী রাজপুত-রমণী রাণীর বেশ পরিধান করিয়া শিবিরে অবস্থান করিতে লাগিল। এই ভণ্ডবেশধারীদিগকে শিবিরে রাখিয়া রাণী প্রহরিগণের চক্ষে ধূলিনিক্ষেপ করিয়া রাজপুত্রদ্বয় ও কতিপয় বিশ্বস্ত অনুচর সমভিব্যাহারে রাজপুতানায় পলায়ন করিলেন। তাঁহাদের পলায়নবার্ত্তা প্রচারিত হইলে পাঁচ সহস্র মোগল সৈন্য তাঁহাদের অনুসরণ করিয়াছিল; কিন্তু কার্য্যাধ্যক্ষ দুর্গাদাস অমিতপরাক্রমে মোগল সৈন্যদিগকে একটি গিরি-সঙ্কটে অবরুদ্ধ করিলেন; ইত্যবকাশে যশোবন্তের মহিষী নিরাপদ স্থানে উপস্থিত হইলেন। আওরঙ্গজেব পূর্ণমাত্রায় হিন্দুদিগকে নিগৃহীত করিলে এই বীর-রমণী বাদশাহের অভীষ্টসিদ্ধির পথে অন্তরায় হইতে পারেন, এই আশঙ্কায় তিনি তাঁহাকে করায়ত্ত করিবার জন্য এইরূপ অসদুপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন।

* "The Mogul had often endeavoured to subject them to amenable vassalage, but had never been able to obtain their acquiescence to more than ceremonious acknowledgment, and rated subsidies of troops."—*Orme's Historical fragments.*

আওরঙ্গজেব কখনও আপনার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিবেন না, ইহা বুঝিতে পারিয়া, তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন। এই সময় যশোবন্তের বিধবা মহিষী বাদশাহের হস্তে নিগৃহীত হইলেন। রাজসিংহ অগ্রসর হইয়া রাণী ও রাজপুত্রদ্বয়ের পক্ষ অবলম্বন করিলেন।

মিবারাধিপতি জিজিয়া দিতে অস্বীকৃত হইয়াছেন, এবং যশোবন্তের বিধবা মহিষীকে আশ্রয় প্রদান করিয়াছেন, এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া আওরঙ্গজেব ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন, এবং সমগ্র রাজপুত-ভূমি বিধ্বস্ত করিবার সঙ্কল্প করিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি কাবুল, দক্ষিণাপথ ও বঙ্গদেশ হইতে শাহজাদাদিগকে সসৈন্যে আহ্বান করিলেন। তাঁহাদের আসিয়া পঁহুছিবার পূর্ব্বেই তিনি মিবারের বিরুদ্ধে অভিযান করিলেন। তাঁহার আগমনবার্ত্তা প্রচারিত হইলে রাজসিংহ হিন্দু রাজন্যবর্গকে স্বদেশের ও স্বধর্ম্মের গৌরব-রক্ষার্থ আপনার পতাকামূলে আহ্বান করিলেন।

আওরঙ্গজেব রাজস্থান আক্রমণ করিলেন। বাদশাহ-সৈন্য রাজপুতানায় প্রবেশ করিবামাত্র যুদ্ধনীতিবিশারদ রাজসিংহ সমতল ভূমি পরিত্যাগ করিয়া পার্ব্বত্য প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। মোগল সৈন্য অমানুষিক পরিশ্রমে অগ্রসর হইতে লাগিল। কিন্তু তাহারা রাজপুতানার পথ ঘাট চিনিত না। সুতরাং বাদশাহ অচিরাৎ সসৈন্যে একটি পর্ব্বতের রন্ধ্রপথে প্রবেশ করিলেন। রাজপুতগণ শত্রু-সৈন্যের এইরূপ অবস্থা অবলোকন করিয়া রন্ধ্রপথের সম্মুখ-ভাগে প্রকাণ্ড বৃক্ষ সকল সংস্থাপিত করিয়া তাহাদের নির্গমের পথ রুদ্ধ করিয়া দিলেন। তাহাদের পথ পরিষ্কৃত করিবার সমস্ত শ্রম ও যত্ন রাজপুত-বীরগণের চেষ্টায় ব্যর্থ হইয়া গেল। *

(উদিপুরী নাম্নী আওরঙ্গজেবের খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিনী প্রিয়তমা মহিষী তাঁহার সঙ্গিনী ছিলেন। তিনি শত্রুহস্তে পতিত হইয়া রাজসিংহের নিকট আনীতা হইলেন। রাণা তাঁহাকে সাদরে ও সসম্মানে গ্রহণ করিলেন। আওরঙ্গজেব পর্ব্বতরন্ধ্রে সসৈন্যে দুই দিন অবরুদ্ধ থাকিয়া কষ্টের একশেষ ভোগ করিলেন। মোগলসৈন্য খাদ্যাভাবে ক্লিষ্ট হইতে লাগিল। রাজসিংহ দয়াপরবশ হইয়া পর্ব্বতাশ্রয়ী রাজপুত সৈন্যকে স্বস্থান পরিত্যাগ করিতে আদেশ দিলেন। মোগল সৈন্য নির্গমের পথ পরিষ্কৃত করিয়া পর্ব্বতরন্ধ্র হইতে বহির্গত হইল। বাদশাহ নিরাপদ হইবামাত্র রাণা তদীয় মহিষীকে রক্ষী সৈন্য সহ প্রত্যর্পণ করিলেন। *

* Orme's Historical Fragments.

বাদশাহ মানবের সুকোমল বৃত্তিসমূহের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতেন না। স্বার্থ-প্রণোদিত হইয়াই লোকে প্রত্যেক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, ইহাই তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। সুতরাং তিনি বিবেচনা করিলেন, তাঁহার ক্রোধানল হইতে পরিত্রাণলাভ করিবার জন্যই রাজসিংহ এইরূপ সদাশয়তা ও ধৈর্য্য প্রদর্শন করিয়াছেন। সুতরাং আওরঙ্গজেব যুদ্ধ পরিত্যাগ করিলেন না! কিন্তু রাজপুতের অতুল বীরত্বে ও কৌশলে তিনি পুনর্ব্বার পার্ব্বত্যপথে অবরুদ্ধ হইলেন। ইহার অব্যবহিত পরেই তদীয় পুত্র আজীম ও আকবর সসৈন্যে উপনীত হইলেন। আওরঙ্গজেব বৃদ্ধ বয়সে এইরূপ রণক্লেশ সহ্য করিতে না পারিয়া পুত্রদ্বয়ের হস্তে মিবার-বিজয়ের ভার সমর্পণ করিয়া রাজপুতভূমি পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু মোগলসৈন্য দীর্ঘকালেও রাজপুতদিগকে পরাজিত করিতে পারিল না। রাজসিংহের অসাধারণ বীরত্ব ও স্বদেশহিতৈষণায় সমগ্র ভারত মুগ্ধ হইল। রাজসিংহের অবদান মৃতপ্রায় ভারত এখনও বিস্মৃত হয় নাই ;—কখনও হইবে কি ? যাহা হউক, তাঁহার বীরত্বে ও কৌশলে মোগল-সৈন্য পুনঃপুনঃ পরাজিত হইল। কয়েক বৎসর যুদ্ধের পর আওরঙ্গজেব বাধ্য হইয়া রাজসিংহের মনোমত সন্ধি করিলেন।

ইহার পরেই রাজকুমার অকস্মাৎ রাজপুতগণের সহিত মিলিত ও বিদ্রোহী হইয়া সত্তর সহস্র সৈন্যের সহিত পিতার মস্তক হইতে রাজ-মুকুট কাড়িয়া লইবার জন্য যাত্রা করিলেন। এই সময় বাদশাহ অল্পসংখ্যক সৈন্য সহ শিবিরে অবস্থান করিতেছিলেন। এই সংবাদে তিনি অত্যন্ত ভীত হইলেন। শাহ-জাহানের শোচনীয় পরিণাম তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হইল। দুরাকাঙ্ক্ষ পুত্র রাজ্যলাভলালসা চরিতার্থ করিবার জন্য তাঁহাকেও শাহজাহানের দশা-গ্রস্ত করিতে পারে, এই চিন্তায় বাদশাহ আকুল হইলেন। কিন্তু তিনি হতবুদ্ধি না হইয়া পুত্রের বিষদন্ত ভগ্ন করিবার অভিপ্রায়ে কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তিনি পুত্রকে লিখিলেন, "আমি তোমার কার্য্যকৌশলে অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি ; তুমি রাজপুতদিগকে প্রলুব্ধ করিয়া ধ্বংস করিবার জন্য যে উপায় অবলম্বন করিয়াছ, তাহা উৎকৃষ্ট।" বাদশাহের চক্রান্তে এই পত্র রাজপুত অধিনায়কগণের হস্তে পতিত হইল। সুতরাং রাজপুতগণ সন্দিগ্ধ হইয়া আকবরকে পরিত্যাগ করিলেন। আকবর নিরুপায় হইয়া পাঁচ শত সৈন্য সহ মহারাষ্ট্রীয়দিগের শরণাপন্ন হইলেন। তথা হইতে তিনি পারস্য দেশে গমন করেন। পারস্যেই তাঁহার জীবনের অবশিষ্টভাগ অতিবাহিত হয়।

উদয়পুরাধিপতি রাণার সহিত সন্ধি স্থাপিত হইল বটে, কিন্তু তাহাতেই রাজপুত-যুদ্ধের অবসান হইল না। তখনও পশ্চিমাঞ্চলের রাজপুত বীরগণ অস্ত্র পরিত্যাগ করেন নাই। বাদশাহ অতিকষ্টে তাঁহাদিগকে দমন করিলেন। দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধের পর আওরঙ্গজেব রাজপুতানায় শান্তিসংস্থাপন করিতে সমর্থ হইলেন বটে, কিন্তু দীর্ঘকাল সে শান্তি ভোগ করিতে পারিলেন না। এই সময়েই রাজপুতবীরগণ মোগল সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন। রাজপুত সেনাপতিগণ এক শতাব্দী ব্যাপিয়া মোগল সাম্রাজ্যের প্রধান সহায় ছিলেন। আওরঙ্গজেবের সঙ্কীর্ণ নীতির ফলে তাঁহারা মোগল সাম্রাজ্যের সকল প্রকার সংস্রব পরিত্যাগ করিলেন।

যে সময় আওরঙ্গজেব আফগানভূমির বিদ্রোহদমন ও রাজস্থানের অগ্নি-নির্ব্বাণে ব্যাপৃত ছিলেন, সেই সময় শিবাজী ধীরে ধীরে সমৃদ্ধিশালী হিন্দু-রাজ্যের সংগঠন সমাপ্ত করেন। জীবনের উদ্দেশ্য পূর্ণ করিয়া শিবাজী ১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দে অমরলোকে যাত্রা করিলেন। শিবাজীর তিরোভাবের পর তাঁহার পুত্র শম্ভুজী পিতৃসিংহাসন অধিকার করিলেন। এই সময় মহারাষ্ট্র-রাজ্যে গৃহবিচ্ছেদ উপস্থিত হইল; তাহার ফলে মহারাষ্ট্রশক্তি কিয়ৎকালের জন্য হীনবল ও নিস্তেজ হইয়া পড়িল। *

দক্ষিণাপথের গোলকুণ্ডা ও বিজাপুরের নরপতিগণ শাহজাহান বাদশাহের সময়ে আংশিকভাবে দিল্লীর বশ্যতাস্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু আওরঙ্গজেব তাহাতে সন্তুষ্ট ছিলেন না; এই রাজ্যদ্বয় সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করিবার অভি-

---

* শিবাজীর দেহত্যাগের পর তাঁহার শক্তি ও ক্ষমতা সম্বন্ধে আওরঙ্গজেব যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন, আমরা তাহা উদ্ধৃত করিতেছি। "শিবাজী এক জন বিচক্ষণ সেনাপতি ছিলেন। আমি যে সময় ভারতবর্ষের প্রাচীন রাজ্যসমূহ ধ্বংস করিবার চেষ্টা করিতেছিলাম, সে সময় কেবল একমাত্র শিবাজীই একটি নূতন রাজ্য-সংগঠনের চেষ্টায় সাহসী হইয়াছিলেন। আমি তাঁহার বিরুদ্ধে উনিশ বৎসর সৈন্য প্রেরণ করিয়াছি; তথাপি তাঁহার রাজ্য সর্ব্বদাই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে।" ইতিহাসবেত্তা কাফি খাঁ শিবাজীকে 'নবাবের কুক্কুর' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। সেই কাফি যদি শিবাজীর কোনও প্রশংসা করিয়া থাকেন, তবে তাহার প্রত্যেক বর্ণ যে সত্য, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ হইতে পারে না। কাফি খাঁ লিখিয়াছেন,—"Sivaji had always striven to maintain the honour of the people in his territories. He persevered in a course of rebellion in plundering caravans and troubling mankind, but he entirely abstained other disgraceful acts, and was careful to maintain the honour of women and children of Mahammadans when they fell

লাভে তিনি কয়েকবার সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন ; কিন্তু এক দিকে শিবাজী ও অন্য দিকে রাজপুতদিগের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকায় তিনি এ বিষয়ে অবহিত হইবার অবকাশ পান নাই। এক্ষণে শিবাজীর স্বর্গারোহণে মহারাষ্ট্র হীনবল হইল, এবং রাজস্থানের সমরানল নির্ব্বাপিত হইল, সুতরাং নিশ্চিন্ত হইয়া আওরঙ্গজেব সমগ্র শক্তি দক্ষিণাপথের রাজ্যদ্বয়ের বিরুদ্ধে নিয়োগ করিলেন।

১৬৮৩ খৃষ্টাব্দে স্বয়ং আওরঙ্গজেব দক্ষিণাপথে যাত্রা করিলেন। এমন যুদ্ধায়োজন পূর্ব্বে আর কেহ দেখে নাই। ভারতবর্ষের সকল প্রদেশ হইতে উৎকৃষ্ট অশ্বারোহী সৈন্য সংগৃহীত হইল ; ইহাদিগের সাহায্যের জন্য অসংখ্য সুশিক্ষিত পদাতিক সজ্জিত হইল ; বহুসংখ্যক কামান প্রস্তুত ও তোপখানার তত্ত্বাবধানের জন্য ইউরোপীয়গণ নিযুক্ত হইল। বাদশাহ আরঙ্গাবাদে উপনীত হইয়া শিবিরসংস্থাপন করিলেন।

প্রথমতঃ, মহারাষ্ট্র রাজ্য জয় করিবার জন্য আওরঙ্গজেব চল্লিশ সহস্র অশ্বারোহী প্রেরণ করিলেন। কিন্তু মহারাষ্ট্রীয় সেনা কখনও সম্মুখযুদ্ধ করিত না। মোগল সৈন্য মহারাষ্ট্র রাজ্যে প্রবিষ্ট হইবামাত্র তাহারা পর্ব্বতোপরি আশ্রয় গ্রহণ করিল ; চারি দিকের পথ ঘাট রুদ্ধ করিয়া দিল। মোগলশিবিরে খাদ্যাভাব উপস্থিত হইল। মোগল সেনাপতি কতিপয় অশ্বারোহী সেনা সহ পলায়ন করিয়া আওরঙ্গজেবের নিকট উপস্থিত হইলেন।

আওরঙ্গজেব আরঙ্গাবাদ পরিত্যাগ করিয়া সোলাপুরে গমন করিলেন। তথায় শিবিরসংস্থাপন করিয়া স্বীয় পুত্র আজিমকে বিজাপুর রাজ্য বিজয় করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। বিজাপুরের অধিপতি শত্রুসৈন্য বিধ্বস্ত করিবার জন্য বিপুল আয়োজন করিয়াছিলেন। মোগলগণ বিজাপুর সেনার কৌশলে সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় পতিত হইল। এই সুযোগে শম্ভুজী মোগল-সাম্রাজ্যভুক্ত গুজরাট প্রদেশ লুণ্ঠন করিলেন। মোগল সেনাপতিগণ বিজাপুরা-ধিপতিকে পরাস্ত করিতে না পারিয়া ফিরিয়া আসিলেন। আওরঙ্গজেব বিজাপুর রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া সমগ্র সৈন্য সহ গোলকুণ্ডা রাজ্য আক্রমণ করিলেন ; শম্ভুজী মোগলের অধিকৃত প্রদেশ লুণ্ঠন করিলেও কিছু বলিলেন না। এই সময় মদনপন্থ নামক জনৈক ব্রাহ্মণ-সন্তান গোলকুণ্ডার মন্ত্রিপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি মোগলের গতিরোধের জন্য বিপুল আয়োজন করিয়াছিলেন। কিন্তু গোলকুণ্ডার সেনাপতি ইব্রাহিম খাঁর সহিত মদন-

পক্ষের মনোমালিন্য ছিল। ঈর্ষ্যায় অন্ধ হইয়া সেনাপতি ইব্রাহিম খাঁ বিশ্বাস-ঘাতকতা করিয়া মোগলের সহিত মিলিত হইলেন। গোলকুণ্ডাধিপতি অনন্যোপায় হইয়া ক্ষতিপূরণস্বরূপ দুই কোটী মুদ্রা দিতে স্বীকৃত হইয়া আওরঙ্গজেবের সহিত সন্ধিসংস্থাপন করিলেন।

অতঃপর আওরঙ্গজেব বিজাপুর আক্রমণে প্রবৃত্ত হইলেন। বিজাপুর রাজ্যের রাজধানী অবরুদ্ধ হইল। এইবার বিজাপুর রাজ্য বিলুপ্ত হইল।

বিজাপুর রাজ্যের ধ্বংস করিয়া বাদশাহ পুনর্ব্বার গোলকুণ্ডার দিকে দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিলেন। গোলকুণ্ডাধিপতির সহিত আওরঙ্গজেব সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। তথাপি তিনি পুনর্ব্বার গোলকুণ্ডা আক্রমণ করিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হইলেন না। গোলকুণ্ডার অধিপতি আবুহোসেন আওরঙ্গজেবকে শান্ত করিবার জন্য অন্তঃপুরবাসিনী মহিলাদের অলঙ্কাভরণ পর্য্যন্ত তাঁহাকে প্রদান করিলেন। কিন্তু নির্ম্মম আওরঙ্গজেব তাহাতেও বিচলিত হইলেন না। আবুহোসেন মুসলমান হইয়াও ব্রাহ্মণকে মন্ত্রিপদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, এবং বিধর্ম্মী মহারাষ্ট্রাধিপতির সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, * এই অপরাধে আওরঙ্গজেব তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিলেন। আবুহোসেন বিপুল-বিক্রমে যুদ্ধ করিলেন, কিন্তু স্বরাজ্য রক্ষা করিতে পারিলেন না।

এত কাল পরে বাদশাহের বহুকালের সাধ মিটিল; ১৬৮৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার বহুকালের আশা সফল হইল। কিন্তু এই পররাজ্যহরণের চেষ্টাতেই মোগল সাম্রাজ্যের সমস্ত শক্তি ও সমগ্র বল প্রায় নিঃশেষিত হইয়া গেল। গোলকুণ্ডা রাজ্য বিনষ্ট হইবার পরই মোগল সাম্রাজ্য পতনোন্মুখ হইল। বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা রাজ্যের সুশাসনগুণে দক্ষিণাপথ শান্তিপূর্ণ ছিল। এই দুই রাজ্যের বিলোপের সহিত সে সুশাসনপদ্ধতিও অন্তর্হিত হইল। পক্ষান্তরে আওরঙ্গ-জেব দক্ষিণাপথের শান্তিরক্ষার জন্য কোনও নূতন শাসনপ্রণালীও প্রবর্ত্তিত করিলেন না। সন্দিগ্ধচিত্ত বাদশাহ কাহাকেও বিশ্বাস করিতেন না। এই জন্য তিনি কোনও সেনাপতিকেই উপযুক্ত সেনা সহ দক্ষিণাপথের শাসনভার অর্পণ করিতে পারিলেন না। বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার অধিপতিগণ রাজ্যরক্ষা ও শাসনসৌকর্য্যের জন্য সর্ব্বদা দুই লক্ষ সৈন্য রক্ষা করিতেন। কিন্তু এই রাজ্যদ্বয় বিধ্বস্ত হইলে মোগল অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবার

* বাদশাহের গতিরোধ জন্য সাহায্য পাইবার আশায় আবুহোসেন মহারাষ্ট্রীয়গণের সহিত সন্ধিসংস্থাপন করিয়াছিলেন।

জন্য কেবলমাত্র ৩৪০০০ হাজার সৈন্য নিযুক্ত হইয়াছিল। কর্ম্মচ্যুত সৈন্যগণ অসন্তুষ্ট সেনানায়কগণের অধীনে দলবদ্ধ হইল; অনেকে মহারাষ্ট্র নায়কগণের সহিত যোগদান করিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্তগণ প্রধান হইয়াছিলেন। তাঁহারা সুযোগ পাইলেই বিদ্রোহী হইতেন। আওরঙ্গজেব সর্ব্বদা যুদ্ধব্যাপারেই ব্যাপৃত থাকিতেন, এবং তজ্জন্য স্থির হইয়া অধিক দিন এক স্থানে অবস্থান করিতে পারিতেন না। এই কারণে সাম্রাজ্যের শাসন-প্রণালী অত্যন্ত শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল; শাসনকর্ত্তারা অত্যাচার করিলে তাহার প্রতিবিধানের কোনও ব্যবস্থা বা উপায় ছিল না; সুতরাং সমগ্র সাম্রাজ্যে অত্যাচারের স্রোত অপ্রতিহতভাবে প্রবাহিত হইতে লাগিল। জিজিয়া সংগ্রহে অত্যাচারের চূড়ান্ত হইতেছিল। জিজিয়া-সংগ্রাহকগণের অত্যাচারে ও কঠোর ব্যবহারে হিন্দু জনসাধারণ উত্তেজিত হইয়া উঠিল। বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা মোগলসাম্রাজ্যভুক্ত হইলে দক্ষিণাপথের শাসনযন্ত্র বিকল হইয়াছিল; ষড়যন্ত্রের বিরাম ছিল না; সমগ্র দেশ বিদ্রোহবহ্নিতে ভস্মীভূত হইতেছিল। বাদশাহ এই বহ্নি নির্ব্বাপিত করিতে পারিলেন না, অধিকন্তু উহার সংস্পর্শে তাঁহার সমস্ত ক্ষমতা দগ্ধ হইয়া গেল।

দক্ষিণাপথের স্বাধীন মোসলমান রাজ্যদ্বয় বিলুপ্ত করিয়াই আওরঙ্গজেব নিবৃত্ত হইলেন না। এই রাজ্যদ্বয়ের অধিকারেই তাঁহার সমস্ত শক্তি ও বল প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছিল; যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, তাহা মহারাষ্ট্র-শক্তির বিজয়ে নিয়োজিত হইল। সম্রাট মহারাষ্ট্রীয়দিগের দমনের জন্য একাদিক্রমে বিংশতি বৎসর নিযুক্ত থাকিয়া বৃদ্ধ বয়সেও কষ্টসহিষ্ণুতা ও রণ-কৌশলের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

মহারাষ্ট্র দেশ দুরতিক্রম নদী ও দুরারোহ পর্ব্বতমালায় সমাবৃত। এই সকল প্রাকৃতিক অন্তরায়ের বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া এক জন সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাসবেত্তা নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, মহারাষ্ট্র দেশের ন্যায় সুরক্ষিত ও সুদৃঢ় দেশ সম্ভবতঃ পৃথিবীর কুত্রাপি নাই। * ঈদৃশ দুর্জ্জয় দেশে অভিযান-কালে আওরঙ্গজেব পুনঃপুনঃ বিপজ্জালে জড়িত হইয়াছিলেন। ঘটনাক্রমে তাঁহাকে কখনও কখনও এমন স্থানে শিবিরসংস্থাপন করিতে হইত যে, তিনি সসৈন্যে খাদ্যাভাবে অনাহারে কালযাপন করিতে বাধ্য হইতেন। মহারাষ্ট্র-দেশে গ্রীষ্মঋতু অগ্নিসদৃশ; এই সময় জলকষ্টে মোগল সৈন্য অত্যন্ত কাতর

* "In a military point of view there is probably no stronger country in the world."—*Grant Duff.*

হইত; তদ্ব্যতীত একাধিকবার দুর্ভিক্ষ ও মহামারী উপস্থিত হওয়ায় তাহাদের কষ্টের একশেষ হইয়াছিল। একে মোগল সৈন্যের কষ্টের অবধি ছিল না, তদুপরি শত্রুর গুপ্ত আক্রমণে তাহাদের দুর্দ্দশা শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়াছিল। এত বিপদেও আওরঙ্গজেব অটল ছিলেন। কিন্তু দীর্ঘকাল যুদ্ধব্যাপারে লিপ্ত থাকায় মোগল সাম্রাজ্যের সমস্ত শক্তি ও বল নিঃশেষিত হইয়া গেল। আওরঙ্গজেব মোগল সাম্রাজ্য এইরূপ বিপন্ন করিয়াও মহারাষ্ট্রশক্তির ধ্বংস করিতে পারিলেন না। অনেক দুর্গ আওরঙ্গজেবের হস্তগত হইল, অনেক যুদ্ধে মহারাষ্ট্রীয়গণ পরাস্ত হইল। কিন্তু এই যুদ্ধ শেষ হইল না। মহারাষ্ট্রীয়দিগের অশ্বারোহী ক্ষিপ্রগামী, তাহাদিগের কোন একটা রাজধানীতে সমগ্র বল স্থাপিত ছিল না; শিবাজীর মৃত্যুর পর কোনও এক জনের হস্তে সমস্ত ক্ষমতা ন্যস্ত ছিল না; সুতরাং এক স্থানে পরাস্ত হইলে অন্য স্থানে জড় হইত, একটা দুর্গ হারাইলে অন্য একটিতে যাইত, এক জন বন্দী হইলে আর দশ জনে যুদ্ধ করিত। সম্মুখে যুদ্ধ না করিয়া চারি দিকে মোগলদিগের দেশলুণ্ঠন ও সর্ব্বদা আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে যৎপরোনাস্তি ক্লেশ প্রদান করিত। বিংশতিবৎসরব্যাপী বহুসংখ্যক যুদ্ধেও এরূপ জাতির ক্ষমতা চূর্ণ করিতে না পারিয়া, শ্রান্ত, পীড়িত, বার্দ্ধক্যক্লিষ্ট আওরঙ্গজেব" * দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন।

অবসন্নচিত্ত আওরঙ্গজেব দেখিলেন যে, ভ্রাতৃরক্তে পৃথিবী কলঙ্কিত করিয়া যে জগৎপ্রথিত সাম্রাজ্য পিতার হস্ত হইতে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা পতনোন্মুখ। রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া একাদিক্রমে দীর্ঘকাল দক্ষিণাপথে অবস্থান করাতে সাম্রাজ্যের উত্তরভাগে আওরঙ্গজেবের শাসনবন্ধন শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি নিজে প্রত্যেক কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেন, তথাপি সাম্রাজ্যের নানা স্থানে নানাবিধ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছিল। সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র শক্তিশালী ব্যক্তিগণ মোগলের ক্ষমতাস্পর্দ্ধী হইয়া উঠিতেছিল। রাজপুতগণ প্রকাশ্যভাবে আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধাচরণ ও মোগল সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত করিবার কল্পনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল। আগ্রার অদূরে জাঠগণ শক্তিসঞ্চয় করিতেছিল। শিখ জাতি ধীরে ধীরে অভ্যুত্থিত হইতেছিল। সে সময়ে শিখগণ মুলতানে বিলক্ষণ প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। সমগ্র দক্ষিণাপথ মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছিল। মহারাষ্ট্রীয়গণ দক্ষিণাপথের অধিকাংশ নগর লুণ্ঠিত করিয়াছিল, গ্রামসমূহ অগ্নিসংযোগে ভস্মীভূত করিয়াছিল, তাহাদের

* শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্তের ইতিহাস হইতে উদ্ধৃত।

পদমর্দ্দনে শস্যক্ষেত্র তৃণশূন্য হইয়া গিয়াছিল। দুর্ব্বল ও উচ্ছৃঙ্খল মোগলসৈন্য চতুর্দ্দিক হইতে বাদশাহকে প্রাপ্য বেতনের জন্য উত্যক্ত করিতেছিল। রাজকোষ শূন্য, অর্থাগমের পথ রুদ্ধ; সুতরাং সৈন্যগণের প্রাপ্য বেতন পরিশোধের কোনও উপায় ছিল না।* মোগল সাম্রাজ্যের এই দুর্দ্দশা অবলোকন করিয়া মহারাষ্ট্রীয়গণ এত দূর সাহসী হইয়াছিলেন যে, তাঁহারা মোগল সৈন্যের চারি পার্শ্ব লুণ্ঠন, ও বাদশাহকে প্রকাশ্যভাবে উপহাস করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই।

আওরঙ্গজেব দেখিলেন, এক দিকে বিশাল মোগল সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, অপর দিকে মৃত্যু তাঁহাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। মৃত্যুবিভীষিকায় ভগ্নহৃদয় আওরঙ্গজেব ব্যাকুল হইলেন; তিনি প্রিয়তম পুত্র কামবক্সকে লিখিলেন, "প্রাণাধিক, আমি চিরবিদায় গ্রহণ করিতেছি, আমার সঙ্গে কেহ যাইবে না। তুমি নিরুপায় হইবে ভাবিয়া আমি শোকাকুল হইতেছি। কিন্তু তাহাতে কি ফলোদয় হইবে? আমি যত যন্ত্রণা দিয়াছি, যত পাপানুষ্ঠান করিয়াছি, যত অসৎ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহার প্রত্যেকটির ফল আমাকে ভোগ করিতে হইবে। আমি পৃথিবীতে কিছু লইয়া আসি নাই, কিন্তু দুর্ব্বহ পাপের ভার মাথায় লইয়া যাইতেছি। আমি যে দিকে দৃষ্টিপাত করি, সেই দিকেই কেবলমাত্র ঈশ্বরকে বর্ত্তমান দেখিতেছি। আমি মহা পাপিষ্ঠ, জানি না, পরলোকে আমি কত যন্ত্রণা ভোগ করিব। মোসলমানদিগকে বধ করিও না, এবং আমার মস্তকে সে কলঙ্কের ভার পতিত হইতে দিও না। আমি তোমাকে ও তোমার পুত্রগণকে ঈশ্বরের হস্তে সমর্পণ করিলাম। যাত্রাকালে তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি। আমি এখনও বড় বেদনা পাইতেছি। তোমার পীড়িতা মাতা উদিপুরী বেগম † সানন্দে আমার সহিত মৃত্যুকে আলিঙ্গন

* "The army was for a long time very regularly paid. Zemilli Carreri, in 1695, says the troops were paid punctually every two months, and would not bear any irregularity. He (Aurang Zeb) says on one occasion to Zulfikar Khan, that he is stunned with clamour of these infernal footsoldiers who are croaking like crows, in an invaded rookery. In another letter he reminds him of the wants of the exchequre and presses him for hidden treasures and to hunt out any that may have fallen into the hands of individual." সৈন্যগণ কত দূর অশিষ্ট হইয়াছিল, এবং অর্থসংগ্রহের জন্য বাদশাহ কিরূপ ব্যতিব্যস্ত ও নিম্নগামী হইয়াছিলেন, তাহা প্রদর্শন করিবার জন্যই আমরা পূর্ব্বোক্ত কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিয়াছি।

† বাদশাহ জীবনে একমাত্র উদিপুরীকে ভালবাসিয়াছিলেন। উদিপুরী জর্জ্জিয়া-নিবাসিনী খ্রীষ্টানবালিকা। দারা শেকো তাঁহাকে দাসব্যবসায়িগণের নিকট হইতে ক্রয় করিয়া

করিবেন। শান্তি!" আওরঙ্গজেবকে দীর্ঘকাল এই মানসিক অশান্তি ভোগ করিতে হয় নাই। ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণাপথের আহ্‌মদনগরে মোগল বাদশাহ প্রাণপরিত্যাগ করিলেন।

আওরঙ্গজেব জগৎপ্রথিত সম্রাট। তিনি বুদ্ধিমান, কার্য্যপটু ও পরিশ্রমী ছিলেন। (১) জেমেলী কারেরী নামক এক জন পরিব্রাজক যে সময় আওরঙ্গজেবের দরবারে উপনীত হইয়াছিলেন, তখন তিনি অশীতিপর বৃদ্ধ। এই বিদেশীর বর্ণনায় জানা যায়, এই বৃদ্ধ বয়সেও সম্রাট শুভ্র বস্ত্র পরিধান করিয়া, ওমরাহগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া, রাজকার্য্যের আলোচনা করিতেন। তিনি উপাধানে পৃষ্ঠদেশ রক্ষা করিয়া উপবিষ্ট হইয়া বিনা চশমার আবেদন-পত্র পাঠ করিতেন, এবং নিজ হস্তে উহাতে মন্তব্য লিখিয়া দিতেন। তৎকালে তাঁহার আনন্দব্যঞ্জক সহাস্য মুখ দেখিলে বোধ হইত, যেন তিনি অক্লান্তভাবে রাজকার্য্যের পরিদর্শন করিতেছেন। নব্বই বৎসর বয়সে আওরঙ্গজেব কাল-গ্রাসে পতিত হন। ইতিহাসবেত্তা কাফি খাঁ বলেন, তখনও তাঁহার পঞ্চেন্দ্রিয় সতেজ ছিল, কেবলমাত্র শ্রবণশক্তি কিঞ্চিৎ হ্রাস পাইয়াছিল, কিন্তু অন্যে তাহা উপলব্ধি করিতে পারিত না।

মোগল বাদশাহগণ সকলেই অল্লাধিক বিলাসপটু, মদিরাসক্ত ও বাহ্যাড়ম্বর-প্রিয় ছিলেন। আকবর বাদশাহের দুই পুত্র অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে অকালে কালগ্রাসে পতিত হন। জাহাঙ্গীর বাদশাহও প্রসিদ্ধ মদ্যপ ছিলেন। জাহা-ঙ্গীর বাদশাহের পুত্র শাহজাহান অত্যন্ত বিলাসপরায়ণ ছিলেন; তিনি বৃদ্ধবয়সে কারারুদ্ধ অবস্থায় জীবনযাপন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন; কিন্তু এ অবস্থাতেও তাঁহার ভোগবিলাসের নিবৃত্তি হয় নাই। নৃত্যলীলা ও সিরাজী মদিরার

(১) আওরঙ্গজেব রাজকার্য্যনির্ব্বাহের জন্য অবিশ্রান্তভাবে গুরুতর পরিশ্রম করিতেন। তাদৃশ গুরুতর পরিশ্রমে স্বাস্থ্যভঙ্গ হইবে আশঙ্কা করিয়া, এক বার এক জন বিশিষ্ট ওমরাহ তাঁহাকে পরিশ্রমের পরিমাণ লঘু করিবার জন্য উপদেশচ্ছলে অনুরোধ করিয়াছিলেন। তদুত্তরে আওরঙ্গজেব বলেন, "কোন বিপদ উপস্থিত হইলে প্রজার রক্ষার জন্য রাজার প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করা কর্ত্তব্য। আমাদের শ্রেষ্ঠ কবি সাদি যথার্থই নির্দ্দেশ করিয়াছেন, 'রাজত্ব পরিত্যাগ কর, অথবা নির্দ্ধারণ কর যে, তোমরা ব্যতীত আর কেহ রাজ্য শাসন করিবে না।' যদি তুমি আমার প্রীতিভাজন হইতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে তোমাকে আপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম উত্তমরূপে সম্পন্ন করিতে হইবে। স্বভাবতঃই আমরা আরামপ্রিয়; আমাদের এরূপ মন্ত্রণাদাতার আবশ্যক নাই। আমাদের মহিষীগণও আমাদিগকে বিশ্রাম ও বিলাসের কুসুমাবৃত পথে ভ্রমণ করিবার বিষয়ে সাহায্য করিতে পারে।"

অত্যুগ্র সৌরভে কারাগারেও বৃদ্ধ শাহজাহান উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিতেন। রাজ-সংসারের দৃষ্টান্তে মোগল আমীর ওমরাহগণও ভোগবিলাসী হইয়াছিলেন। যে সকল মোগল বীর ভারতবর্ষে আগমন করিয়া ভারতবিজয় সম্পন্ন করিয়া-ছিলেন, তাঁহারা অত্যন্ত কষ্টসহিষ্ণু ও পরাক্রমশালী ছিলেন। কিন্তু আওরঙ্গ-জেব যে সময় পিতৃ-সিংহাসন অধিকার করিবার আয়োজনে প্রবৃত্ত হন, তখন যাঁহারা মোগলদরবারের শোভাবর্দ্ধন করিতেন, তাঁহারা ব্যসনাসক্ত পারিষদে পরিণত হইয়াছিলেন। বাবরের অভিযানকালে সম্মুখে কোনও নদী পড়িলে তিনি সন্তরণ করিয়া নদী উত্তীর্ণ হইতেন। কিন্তু শাহজাহানের পারিষদগণ মহার্ঘ মখমলনির্ম্মিত সুদৃশ্য পরিচ্ছদ পরিধান করিতেন, এবং শিবিকাযোগে রণক্ষেত্রে গমন করিতেন। (১)

(রাজসংসারের বিলাসে বর্দ্ধিত হইয়াও আওরঙ্গজেব ভোগলালসা সংযত করিয়াছিলেন। তিনি কখনও মদিরা স্পর্শ করেন নাই। তিনি সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া মোগল-দরবারে বিলাস-স্রোতের প্রতিরোধে প্রবৃত্ত হন। এ জন্য তিনি ওমরাহবর্গের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। যদিও তিনি এ বিষয়ে সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হন নাই, তথাপি তাঁহার যত্নে ও চেষ্টায় বিলাসতরঙ্গ কিয়ৎপরিমাণে মন্দীভূত হইয়াছিল।) (২)

(১) তৈমুরলঙ্গের স্বরচিত জীবনবৃত্তে লিপিবদ্ধ আছে যে, তিনি ভারতবর্ষ আক্রমণ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে তদীয় সভাসদ্‌গণের মধ্যে কেহ কেহ কেহ আপত্তি করিয়া বলিয়াছিলেন,—"By the favour of Almighty God we may conquer India, but if we establish ourselves permanently therein, our race will degenerate, and our children will become like the nation of those regions and in a few generations their strength and valour will diminish,"

তৈমুরের সভাসদ্‌বর্গের এই ভবিষ্যৎবাণী সফল হইয়াছিল।

(২) আওরঙ্গজেব ধর্ম্মবিরুদ্ধ বলিয়া সুকুমার বিদ্যার চর্চ্চা রহিত করিবার অনুজ্ঞা প্রচারিত করিয়াছিলেন। ইহাতে গায়ক, অভিনেতা ও নর্ত্তকী সম্প্রদায় যেরূপ প্রণালীতে আপনাদের প্রতিকূল মত প্রকাশ করিয়াছিল, তাহা কৌতুকাবহ। মোগল বাদশাহগণ প্রত্যহ প্রাতঃকালে রাজপ্রাসাদের গবাক্ষে উপস্থিত হইয়া প্রকৃতিপুঞ্জকে দর্শন দিতেন। একদা আওরঙ্গজেব তথায় উপনীত হইয়া দেখিতে পাইলেন যে, কতকগুলি লোক সাড়ম্বরে সাধারণ সমাধিক্ষেত্রের অভিমুখে গমন করিতেছে। কাহার সমাধির জন্য এত সমারোহ, তাহা জ্ঞাত হইবার জন্য বাদশাহ দূত প্রেরণ করিলেন। প্রেরিত দূত ফিরিয়া আসিয়া নিবেদন করিল যে, সংগীতের মৃত্যু হইয়াছে, এবং তাহাকে সমাহিত করিবার জন্য সংগীতের ভৃত্যগণ সসমারোহে সমাধিক্ষেত্রে গমন করিতেছে। বাদশাহ প্রত্যুত্তরে বলেন, "ইহা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। কিন্তু তাহাকে গভীর মৃত্তিকায় প্রোথিত করিতে বলিয়া দাও, যেন সমাধি হইতে কোনও শব্দ কখনও আমার কর্ণে না পঁহুছে।"

আওরঙ্গজেব বাহ্যিক আচার ব্যবহারে কখনও এসলাম ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুশাসন উল্লঙ্ঘন করেন নাই। এসলাম ধর্ম্মের গোঁড়া বলিয়া পরিচিত হইবার জন্য যাহা কিছু করণীয়, তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাহার প্রতিপালন করিতেন। এসলামশাস্ত্রানুমোদিত প্রণালীতে তিনি প্রতি বৎসর কিঞ্চিন্ন্যূন সার্দ্ধ এক লক্ষ মুদ্রা দরিদ্রদিগকে দান করিতেন। শুক্রবার, অন্যান্য পবিত্র তিথি ও রমজানে বাদশাহ উপবাস করিতেন। রমজানে প্রত্যহ রাত্রিকালে কোরাণপাঠে ও সাধুপুরুষগণের সংসর্গে অর্দ্ধ রাত্রি যাপন করিবার নিয়ম ছিল। তিনি মক্কা-যাত্রিগণের সুবিধার জন্য নানাবিধ সুবন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি কখনও নিষিদ্ধ মাংস ভক্ষণ করেন নাই। তিনি গীতবাদ্যের বিরোধী ছিলেন; কোনও গীতবাদ্য-ব্যবসায়ী আপন ব্যবসায় পরিত্যাগ করিলে তাহার জীবিকা-নির্ব্বাহের উপায় করিয়া দিতেন। বাদশাহ নির্দ্দিষ্ট সময়ে নমাজ পড়িতেন, কোনও কারণে তাহার ব্যতিক্রম হইত না। এমন কি, যুদ্ধক্ষেত্রে যখন তিনি পঙ্গপালের ন্যায় শত্রুসৈন্যে পরিবেষ্টিত, তখনও উপাসনার সময় উপস্থিত হইবা-মাত্র নিজের প্রাণ তুচ্ছ করিয়া প্রশান্তচিত্তে নমাজ পড়িতেন। মহম্মদের অনুশাসন অনুসারে কোনও বাণিজ্যে লিপ্ত থাকিবার অভিপ্রায়ে আওরঙ্গ-জেব স্বহস্তে টুপি প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিতেন। কথিত আছে, তিনি ইহার বিক্রয়লব্ধ অর্থ হইতে কেবলমাত্র ৪।৷০ টাকা ব্যয় করিয়া নিজের অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে বলিয়া গিয়াছিলেন।

আওরঙ্গজেব বিদ্রোহোন্মুখ সেনাপতি ও পুত্রগণের দমনে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তিনি নানাপ্রকার কৌশল অবলম্বন করিয়া বিদ্রোহীদিগকে শান্ত করিতেন। আমরা উদাহরণস্বরূপ কাফি খাঁর বর্ণিত একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। সম্রাটের অন্যতম পুত্র আজিম স্বাধীনতাভিলাষী হইয়াছেন শুনিয়া, আওরঙ্গজেব তাঁহাকে দরবারে আহ্বান করিলেন। শাহজাদা আজিম ভীতিবিহ্বল হইয়া রাজাদেশপালনে বিলম্ব করেন। আওরঙ্গজেব মৃগয়া-ব্যপদেশে কেবলমাত্র কতিপয় অনুচর সহ বহির্গত হইয়া বিদ্রোহোন্মুখ পুত্রকে সাক্ষাৎ করিবার জন্য আহ্বান করেন। তদনুসারে আজিম নির্দ্দিষ্ট মিলনস্থানের অভিমুখে যাত্রা করেন। আওরঙ্গজেব পূর্ব্বেই তথায় উপস্থিত হইয়া চতুর্দ্দিক রণনিপুণ যোদ্ধা দ্বারা পরিবেষ্টিত করিয়া রাখেন। আজিম মিলন-স্থানের নিকটবর্ত্তী হইলে, সম্রাটের কৌশলে তাঁহার অনুচরসংখ্যার ক্রমশঃ হ্রাস হইল। সম্রাটের শিবিরসম্মুখে উপনীত হইবার প্রাক্কালে তিন জন মাত্র অনুচর অবশিষ্ট ছিল।

আজিম অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইলে কেহ অশ্ব রক্ষা করিবার জন্ত অগ্রসর হইল না, সুতরাং তিনি দুই জন অনুচরকে তথায় নিযুক্ত রাখিয়া, এক জন মাত্র অনুচর সহ শিবিরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। আওরঙ্গজেবের দর্শনলাভের পুর্ব্বেই আজিম ও তাঁহার একমাত্র অনুচর অস্ত্রপরিত্যাগে বাধ্য হইলেন। আজিম ভীতিবিহ্বলচিত্তে পিতৃসমীপে উপস্থিত হইলে বাদশাহ তাঁহাকে সস্নেহে আলিঙ্গন করিলেন। আওরঙ্গজেব শিকারে বহির্গত হইবার জন্ত বন্দুক হস্তে প্রস্তুত ছিলেন; তিনি পুত্রের হস্তে বন্দুক দিয়া তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তথায় বংশপরম্পরাগত একখানি অদ্ভুত তরবারি কোষোন্মুক্ত করিয়া পুত্রের হস্তে দিয়া গ্রীষ্মাধিক্যের ভান করিয়া গাত্রবস্ত্র উন্মোচন করিয়া পুত্রকে নিরস্ত্র দেহ প্রদর্শন করিলেন। তাহার পর বাদশাহ পুত্রকে মহার্ঘ উপঢৌকনরাশি প্রদান করিয়া বিদায় দিলেন। এই ঘটনার পর হইতে আজিম বাদশাহের পত্র পাইলেই ভয়ে বিবর্ণ হইয়া কম্পিতহস্তে পাঠ করিতেন, এবং যতক্ষণ পত্রপাঠ সমাপ্ত না হইত, ততক্ষণ তিনি স্থির হইতে পারিতেন না।

আওরঙ্গজেব নানাবিধ রাজগুণে ভূষিত ছিলেন। কিন্তু তিনি যে বিশাল সাম্রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহারই রাজত্বকালে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। ইহার একমাত্র কারণ, তিনি অত্যন্ত আত্মপরায়ণ, স্বার্থান্ধ, প্রজাপীড়ক ও কপট শাসনকর্ত্তা ছিলেন। কিন্তু কাফি খাঁ আওরঙ্গজেবের সমস্ত বিফলতার অন্ত কারণের নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন; আমরা তাহা পাঠকগণকে উপহার দিয়া বিদায় গ্রহণ করিতেছি;—"তৈমুরবংশীয় নরপতিকুলে, এমন কি, দিল্লীর সমস্ত সুলতানের মধ্যে একমাত্র সেকেন্দর লোদী ব্যতীত আর কেহই ঈশ্বরনিষ্ঠা, বিলাসবিমুখতা ও ন্যায়পরতার জন্ত আওরঙ্গজেবের ন্যায় প্রসিদ্ধ ছিলেন না। সাহস, কষ্টসহিষ্ণুতা ও বিজ্ঞতায় কোনও নরপতিই তাঁহার সমকক্ষ ছিলেন না। কিন্তু শাস্ত্রের অনুশাসন-প্রতিপালনে প্রবল অনুরাগ নিবন্ধন তিনি শাস্তিপ্রদানে বিরত থাকিতেন। শাস্তি প্রদান না করিয়া রাজ্যশাসন করা যায় না। ঈর্ষ্যাবশে আমীর ওমরাহগণের মধ্যে বিবাদ বিসংবাদ উপস্থিত হইয়াছিল। এই কারণে তাঁহার কার্য্যকল্পনায় কোনও ফলোদয় হয় নাই। তাঁহার অনুষ্ঠিত প্রত্যেক কার্য্যের সম্পাদনে দীর্ঘকাল অতিবাহিত হইত, এবং অনুষ্ঠিত কার্য্যের উদ্দেশ্য বিফল হইয়া যাইত।"

শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত।

কন্যা।

"মা, গরীবকে দুটো পয়সা দেবে?"

"মলো যা, সেই অলক্ষ্মী মেয়েটা আবার এসেছে গা! এখনি' ঘটিটে বাটিটে চুরি করে' নিয়ে পালাবে। ওলো মাতি! খিড়্‌কীর দোর বন্ধ করে দে।—দূর হ! দূর হ!"

গৃহিণীর আজ্ঞা পাইয়া দাসী মাতঙ্গিনী খিড়্‌কীদ্বার রুদ্ধ করিতে গেল।

ছিন্নবস্ত্রা দুঃখিনী বালিকা তখনও দাঁড়াইয়া আছে। অবসর বুঝিয়া মিত্রমহাশয়দিগের হুমো বিড়াল রন্ধনশালা হইতে একটা আধপোয়া ওজনের গোটা ভাজা চিংড়ী মুখে করিয়া গলিপথ পার হইয়া গেল।

ক্ষুধাতুরা বালিকা সতৃষ্ণনয়নে তাহা দেখিল।

মাতঙ্গিনী। তুই আবার এসেছিস্?

বালিকা। তোমরা বড়লোক, একবার কেন, দশবার ভিক্ষা দিলেও কিছু আসে যায় না; আর যারা ছোট গৃহস্থ, তাদের নিজেরই কুলায় না, তাহাদের পক্ষে দুটো পয়সা বড় কম নয়—

মাতঙ্গিনী। তোকে গিন্নী দেখ্‌তে পারে না।

বালিকা। কেন? আমি ত সতীন নই, আমি যে তাঁর দুঃখিনী কন্যা—আমার বাবা যদি অন্ধ না হতেন, তা হ'লে আমি ত আর দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে অসিতাম না।

মাতঙ্গিনী। কি জানি মা—তোর চ'খে কি আছে, তোকে তাঁরা দেখ্‌তে পারেন না। দাঁড়া, আমার ঘরে চারটি মুড়কী আছে—

বালিকা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মধ্যাহ্নগগনে সূর্য্য প্রখর কিরণ বর্ষণ করিতেছিল। বিড়াল, কুকুর, কাক, শকুনি, সকলেই উদরপূর্ত্তি করিয়া বৃক্ষের সুশীতল ছায়ায় বিশ্রাম করিতেছিল। মিত্রমহাশয়দিগের বৃহৎ অট্টালিকার উচ্ছিষ্ট বাসনের স্তূপ লইয়া গদা চাকর সম্মুখস্থ পুষ্করিণীর বাঁধা ঘাটে সযত্নে রাখিয়া তামাকু খাইতে গেল।

বালিকা একখানি দুইখানি বাসন উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিল, তাহাতে শাকের কণামাত্রও নাই।

অদূরে মিত্রগৃহিণী বেণী দুলাইয়া উচ্চস্বরে ডাকিলেন, "গদা!"

গদার সাড়াশব্দ নাই। গৃহিণী ছুটিয়া বাঁধাঘাটে আসিলেন।

গৃহিণী। তুই এখনও দূর হ'সনি? বাসন চুরি কচ্ছিস্? দাঁড়া, তোকে ঝাঁটা পেটা কর্‌ব।

বালিকার স্তিমিত অবসন্ন নয়ন প্রজ্বলিত হইল; "আমি চুরি করি না।"

গৃহিণী। ও— তুই বড় সতী, না?—তাই রাখালের দিকে কাল্ ডাইনীর মতন চেয়ে ছিলি?—

রাখাল গৃহিণীর দেবর। মিত্রমহাশয়ের বিপুল সম্পত্তির অর্দ্ধেকের অংশীদার। রাখাল বাবুর অপাত্রে দানশীলতা মিত্রগৃহিণীর পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল।

বালিকা। মা, চার্‌টি খেতে দিতে এত কুণ্ঠিত কেন? এই দেখ, তোমাদের বিড়াল ছয় পয়সার মাছ খাইয়া গেল, আমাকে কি দুটো পয়সা দিতে পার না?

মিত্রগৃহিণীর হৃদয়ে যে দয়া নাই, তাহা নহে; তিনি বলিলেন,—

"যদি কানা খোঁড়া হতিস্, তবে না হয় দিতাম, তোর সোমত্ত বয়েস, একটা কাঙ্গালী দেখে বিয়ে কর্ না, সে খেটে খুটে তোকে খাওয়াবে। কিন্তু শেষ কথা বলি, আবার যদি এ দিকে আসিস, তবে তাঁকে ব'লে তোর কুঁড়ে ঘর ভেঙ্গে আমাদের জমিদারী থেকে তাড়াইয়া দিব।"

বালিকার চক্ষে জল আসিল। তাহার অক্ষম অন্ধ পিতাকে মনে পড়িল। বোধ হয় মিত্রগৃহিণীরও মনে পড়িল, অন্ধ যাদব একদিন প্রাণপণে তাঁহার শ্বশুরের উপকার করিয়াছিল। তিনি অঞ্চল হইতে দুইটি পয়সা ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন।

সে পয়সা সেইখানে পড়িয়া রহিল। বালিকা চলিয়া গেল। যখন মাতঙ্গিনী মুড়কী লইয়া ফিরিয়া আসিল, তখন দেখিল, ভিখারিণী সেখানে নাই। মনে মনে ভাবিল, "মেয়েটার গুমর কম নয়।"

২

মিত্র-গৃহিণীর শ্রীযুক্ত রামধন মিত্রের সহিত শুভ পরিণয়ে আবদ্ধ হইবার অব্যবহিত পরেই মিত্রসংসারোদ্যানে নূতন ফুল ফুটিয়াছিল। অবিবাহিত জীবনের ছয়টা সুর ছাড়িয়া রামধন বাবু এখন কেবল কড়িমধ্যমেই কালযাপন করিতেন।

সন্ধ্যাকালে রামধন বাবু জমিদারী-কাছারী হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া স্বভাবতঃই মনে করিলেন, গৃহিণী কোনও নূতন সংবাদ দিবেন। তাহাই হইল।

গৃহিণী। তুমি সেই অন্ধ যাদবের মেয়েটাকে দেখেছ?

রামধন। কৈ মনে পড়ে না।

গৃহিণী। ওটা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। আমি শুনেছি, তুমি প্রায় তাহার সঙ্গে কথা কহিতে।

রামধন। ওঃ, মনে পড়েছে, সেই কদাকার রোগা মেয়েটা—

গৃহিণী। চালাকী কর কেন? কায়েতের ঘরে অমন সুন্দরী ক'টা মেয়ে দেখেছ?

রামধন। কৈ, তাহা ত মনে পড়ে না।

গৃহিণী। ঐ মেয়েটা রাখালের সর্ব্বনাশ কর্‌বে। সে ভিক্ষার ছল করে আসে, কিন্তু আমার বোধ হয় তার দৃষ্টিটা কেমন কেমন—

রামধন। ওঃ! কি ভয়ানক! এখন উপায় কি?

গৃহিণী। যদি রাখালকে বাঁচাতে চাও, আর অর্দ্ধেক বিষয়টা জলাঞ্জলি না দিতে চাও, তবে এই বেলা যাদবের ঘর তুলে দাও।

রামধন। দেখ, ভগবান বলেছেন যে, দরিদ্রের ভরণপোষণ করিবে।

গৃহিণী। ভগবান আরও বলেছেন যে, কর্ম্ম কর, ফলের দিকে তাকিও না। এ কর্ম্মটি কর্ত্তেই হবে।

রামধন। এর ফল ভাল হবে না কিন্তু—

গৃহিণী। সে কথায় তোমার কাজ কি?—আমি বল্‌ছি—হবে।

রামধন। তবে তাহাই হউক।

তখনই স্বধর্ম্মপ্রতিপালনতৎপর গোমস্তা ভজহরি মালিকের আজ্ঞা পাইয়া অন্ধ যাদবকে তাহার পর্ণকুটীর হইতে তাড়াইয়া দিল।

অন্ধ পিতাকে তাহার কন্যা কাঁদিতে দেখিয়া বলিল, "বাবা, তোমার কি এই কুঁড়ে ঘরের উপর মায়া জন্মেছে?"

যাদব। মা, তুই আর এই কুঁড়ে ঘর ছাড়া আমার আর মায়ার কি আছে?

কন্যা। বাবা, তারই মধ্যে একটার মায়া ছাড়—সব মায়াটুকু আমাকে দাও।

সেই প্রবল শীতবায়ুবিতাড়িত অমানিশায় অন্ধ পিতা ও আদরের কন্যা ধীরে ধীরে গ্রাম ও লোকালয় পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

প্রায় দুই ক্রোশ দূরে গিয়া বালিকা দাঁড়াইল।

অন্ধ। এ কোথায় মা?

বালিকা। মালতীর বাড়ী।

অন্ধ। কোন মালতী মা?

বালিকা। মধুমালতী। সেই যে পূজার সময় আমাদের কাপড় দিয়াছিল। বড় সুন্দর মেয়ে; যখন ক্ষুধার জ্বালা পাই নাই, তখন এই নদীর তীরে মালতী ও আমি খেলা করিতাম। মালতীকে ডাকি?

অন্ধ। এত রাত্রিতে সে যে ঘুমাইয়া আছে।

বালিকা। সে ঘুমায় না।

অন্ধ। কেন মা?

বালিকা। তার বাবার বড় ব্যারাম। সে সারারাত্রি শিয়রে বসিয়া থাকে।

তখন বালিকা ডাকিল, "মালতী!"

একটি ক্ষুদ্র বর্ত্তিকা লইয়া কে বাতায়নপথে উঁকি মারিল।

"কে ও?"

বালিকা। মালতী! একবার এসে দেখ না।

মালতী ছুটিয়া আসিল।

"কে ও—গৌরী?"—ও কে? তোর বাবা?—আমাদের ঘরে আয় না—"

মালতীর পিতা রুগ্নশয্যায় শয়ান। ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মালতী ও কে?—"

মালতী। বাবা, আমার সেই সখী গৌরী, আমাদের ঘরে এসেছে।

৩

যুবক রাখালচন্দ্র মিত্র কেবল জমীদার নহে, লেখা পড়া জানে। যখন সে শুনিল যে, অগ্রজ রামধন যাদবকে উৎখাত করিয়াছেন, তখন দুঃখ ও ক্রোধে মিশ্রিত গোটাকতক ঘন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল যে, কল্যই বিষয়বণ্টনের একটা দরখাস্ত দিয়া ফেলিবে।

পরদিন যখন দরখাস্তের খসড়া প্রস্তুত হইল, উভয় সরিকের গোমস্তা ভজহরি বড়কর্ত্তার নিকট প্রভুভক্তি প্রকাশ পূর্ব্বক খসড়ার আগাগোড়া বর্ণনা করিল।

ভজহরি। উভয় সরিকের একমত না হইয়া এরূপ উৎখাত করা 'আইন-বিরুদ্ধ এবং নীতিবিরুদ্ধ।'

রামধন। ডাক্, রাখালকে ডাক্।

ভজহরি রাখালকে ডাকিতে যাইবার পর মিত্রগৃহিণী পর্দ্দার অন্তরাল হইতে মিত্রজাকে বলিলেন,

"দেখ্‌লে? রাখালকে ঐ মেয়েটা যাদু করেছে, না হ'লে তোমাকে উপেক্ষা ক'রে আদালতে দরখাস্ত দিতে যায়?"

রামধন। আচ্ছা, আমিও দেখ্‌ব।

রাখাল আসিলে অগ্রজ রামধন মিত্র একটা অসাময়িক বক্তৃতা দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন যে, একটা দরিদ্র বালিকার উপর এরূপ বিষম অনুগ্রহ-প্রদর্শন বংশের কলঙ্ক বই আর কিছুই নহে। লোকে ইহাতে কাণাঘুষা করিতে পারে, এবং তাহাই করিতেছে।

প্রত্যুত্তরে রাখাল বুঝাইতে চেষ্টা করিল যে, দরিদ্রের উপর অত্যাচার সমধিক কলঙ্কের কারণ, এবং সে বালিকাটিকে ভালবাসে।

রামধন। তবে তোমার মতলবটা কি?

রাখাল। মতলব আবার কি?

রামধন। ভালবাসাটার অর্থ?

রাখাল। অভিধান খুলিয়া দেখুন।

রামধন। তুমি কি মনে কর যে, বংশের মুখে কালি দিয়া একটা পথের ভিখারিণীকে বিবাহ করিবে?

রাখাল। যদি তাহাই হয়?

রামধন। তোমার বুদ্ধিলোপ হইয়াছে; তোমার এবং আমার এক স্থানে বাস অসম্ভব।

রাখাল। আমিও তাহাই মনে করিয়াছিলাম।

রাখাল চলিয়া গেল।

গোমস্তা ভজহরি গৃহবিবাদের সূত্রপাত দেখিয়া কিছু ত্রস্ত হইল।

ভজ। ছোট বাবু! এ ত সামান্য কথা, কিছু টাকা দিলেই যাদব আপনার পায়ে গৌরীকে বিলাইয়া দিবে। আর, গৌরীই বা কি সুন্দরী—

রাখাল। তুমি গণ্ডমূর্খ এবং পাষণ্ড। টাকার ভিখারী হইলে গৌরী পথের কাঙ্গালিনী হইত না। তুমি মানবচরিত্রের উচ্চভাগ কিছুই বুঝ নাই।

ভজ। আমরা লেখাপড়া শিখি নাই, উচ্চভাগ কি করিয়া বুঝিব? তবে প্রথম ভাগটা যত দূর জানি—

রাখাল। তাহাতে তোমার গলাটি টিপিয়া বাহির করিয়া দিতে ইচ্ছা করে।

ভজ। ছোট বাবু! রাগ করিবেন না—আমি ত চাকর, যাহা আজ্ঞা করিবেন, তাহাই করিব।

রাখাল। তবে তুমি ও মাতি উভয়ে গিয়া যাদবের সন্ধান লও।

উভয়েরই নিকট যাদবের আশ্রয়স্থান অবিদিত ছিল না।

ভজ। তাঁহারা হারাণ বসুর গোয়ালঘরে আছে। এখান হইতে দুই ক্রোশ দূর।

রাখাল ভাবিল, এখনই ছুটিয়া যাই। কিন্তু এরূপ চঞ্চলতা প্রকাশ করিলে লোকালয়ে দুর্নাম রটিতে পারে, তাহাতে গৌরীর চরিত্রে কলঙ্ক আরোপিত হওয়াও বিচিত্র নয়।

আবার সকলেই জানে, হারাণ বসুর কন্যা মালতীর সহিত রাখালের বিবাহের একটা প্রস্তাব কর্তৃপক্ষগণ প্রায় বৎসরাবধি উত্থাপিত করিতেছেন। সুতরাং সেখানে যাওয়াটা রাখালের পক্ষে কেমন কেমন বোধ হইল।

সারারাত্রি উপবাসী থাকিয়া রাখাল প্রত্যূষে নদীতে স্নান করিতে গেল। কানাই মাঝি পান্‌সীখানিতে জলসেচন করিতেছিল।

রাখাল। কানাই, বেড়গ্রাম এখান হইতে কত দূর?

কানাই। আজ্ঞে, জলপথে তিন ক্রোশ।

রাখাল। আমি সেখানে স্নান করিতে যাইব। তুই তোর ঘর হইতে কিছু মোটা চাউল ও আলু লইয়া আয়, নৌকার উপর রাঁধিয়া খাইব।

৪

মালতী রূপে ভরা, স্বাস্থ্যে ভরা, পবিত্রতায় এবং স্নেহেও ভরা। বেশ মোটা সোটা গোলাল তের বৎসরের মেয়ে, শীতল নিশ্বাস, স্থির সলজ্জ সকরুণ দৃষ্টি। মালতীর মা নাই। পিতা হারাণ বসু পক্ষাঘাতগ্রস্ত।

হারাণ বসুর পিতা বেড়গ্রাম পরগণার ষোল আনা মালিক ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠপুত্র রঞ্জন বসু বার আনার মালিক হন, এবং হারাণ চারি আনা অংশ মাত্র পান। রঞ্জন বাবুর দানশীলতা রোগ ছিল, তাই চারি আনা রামধন মিত্রের পিতাকে বিক্রয় করিয়া নীলাচলে ও জগন্নাথধামে অন্নছত্র প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি উড়িষ্যাতেই থাকিতেন। তাঁহার পুত্র কলত্র নাই। শুনা গিয়াছিল, তিনি গৃহিণীর অনুমতি হইলেই দত্তকপুত্র গ্রহণ করিবেন। তাঁহার জমিদারীর আয় দুই লক্ষ টাকা।

কনিষ্ঠ হারাণ বিষয় আশয়ের আয় তুলার ও পাটের ব্যবসায়ে নিযুক্ত করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। হারাণের বয়স প্রায় সাঁইত্রিশ বৎসর। প্রাণসমা পত্নীর বিয়োগাবধি ভগ্ন দেহ ও মন লইয়া এবং মালতীর মুখের দিকে চাহিয়া জীর্ণাবশিষ্ট জমীদারীর তত্ত্বাবধান করিতেন। সকলেই তাঁহাকে দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিতে পরামর্শ দিয়াছিল। হারাণ বাবু অতি সুপুরুষ ও মিষ্টভাষী ছিলেন। "হইতেছে" "হইবে" বলিয়া চারি পাঁচ বৎসর কাটিয়া গেল। অবশেষে একদিন হঠাৎ তাঁহার দক্ষিণ হস্ত অবশ হইয়া গেল।

অগ্রজ রঞ্জন বসু এই নিদারুণ সংবাদ পাইয়া দুই জন ভাল ডাক্তার ও গৃহিণীকে কনিষ্ঠের তত্ত্বাবধানে উড়িষ্যা হইতে পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহাদিগের বেড়গ্রামে পঁহুছিতে এক মাস লাগিল। বহু পরীক্ষার পর স্থিরীকৃত হইল যে, জীবনের কোনও আশঙ্কা নাই, এবং ঔষধেও কিছু হইবে না। কেবল ঈশ্বরের করুণা ও অপরিশ্রান্ত শুশ্রূষা আবশ্যক।

রঞ্জন-গৃহিণী দেবর হারাণকে কনিষ্ঠ ভ্রাতা অপেক্ষাও ভালবাসিতেন। অনেক কাঁদিলেন,—"ছোট ঠাকুর, তোমার এ অবস্থা দেখিতে পারি না—কিন্তু কি করিব, সকলই অদৃষ্ট এবং উনিও দিনরাত্রি হরিধ্যানে মগ্ন।"

মালতী। জ্যাঠাইমা! তুমি এইখানেই থাক না।

কিন্তু জ্যাঠাইমার পক্ষে তাহা অসম্ভব।—কেন না, জমীদারীর আয়ব্যয়ের হিসাব তিনিই রাখিতেন, এবং তিনি রাঁধিয়া না দিলে বড় কর্ত্তার দুই দিনেই

মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। তৃতীয়তঃ, জ্যাঠাইমার নিজেরই হৃদ্‌রোগ ছিল, এবং মধ্যে মধ্যে বোধ হইত, প্রাণ বাহির হইয়া যাইবে।

এইরূপে সকলকে তর্কে পরাস্ত করিয়া অবশেষে তিনি মালতীর বিবাহের প্রস্তাব করিয়া বসিলেন। বড় মামা, ছোট পিসেমহাশয়, ভট্টাচার্য্য মহাশয়, সকলেরই মতে স্থির হইল যে, রাখাল মিত্রই মালতীর উপযুক্ত পাত্র।

ষোল আনার সর্ব্বজনপূজিতা কর্ত্রীঠাকুরাণী তখনই রাখালকে তলব করিয়া তাহাকে মিষ্টালাপে ও মিষ্টান্নে তুষ্ট করিলেন।

"তুমি ত মেয়ে দেখেছ, যদি বিবাহ হয় ত তোমার ভাগ্যি।"

এ প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বের ঘটনা। রাখাল বলিয়াছিল, "তা ত নিশ্চয়।"

মালতীর রক্তিমাভ কপোলে পছন্দের লক্ষণ পাইয়া রঞ্জন-গৃহিণী দুই সহস্র টাকার মুক্তার মালা তাহার কণ্ঠে পরাইয়া উড়িষ্যায় চলিয়া গেলেন।

মালতী সেই মুক্তার মালা সময় পাইলেই বসিয়া কাটিত, এবং একটি দুইটি করিয়া বেড়গ্রামের যত গৃহস্থ ও দরিদ্রের বৌ ঝি ছিল, সকলের নাকের নোলক গড়াইয়া দিত। কাজেই মালতী তাহাদের রাণী। সকলেই রাখাল রাজার অভ্যুত্থানের জন্য উৎকণ্ঠিত ছিল। সকলেই বলিত, "এ মেয়ে ঠিক তার মায়ের মত, এ ঘরে কি আর সৎমা আসে?"

৫

তবে সাত বৎসরের কন্যা মালতী জননীর অন্তিমকালের আশীর্ব্বাদপূর্ণ মুখচ্ছবি ভুলে নাই। পিতার সাত বৎসর পূর্ব্বেকার ভগ্নহৃদয়ের ব্যথা ও সংসারে উদাসীনতা বালিকার কোমল হৃদয়ে প্রতিফলিত হইয়াছিল।

বালিকার স্মৃতিপথে তার স্নেহময়ী মাতার মলিন বসন, আভরণবিহীন দরিদ্রসেবায় নিযুক্ত কোমল বাহুযুগল স্বর্গের ছবির ন্যায় নিয়তই খেলা করিত। তাই কাঙ্গালিনী গৌরীকে দেখিয়া তাহার হৃদয় আকৃষ্ট হইয়াছিল।

গৌরী মালতী অপেক্ষা দুই বৎসরের বড়। কিন্তু গৌরী বালিকা হইলেও তাহার জীবনে দুঃখ ও দারিদ্র্যের কঠিন রেখাগুলি মুছাইয়া দিবার কেহই ছিল না। গৌরীর দুঃখের মধ্য দিয়া জ্ঞানালোক ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

মালতী গৌরীর মধ্যে মাতার সাদৃশ্য দেখিত। আজ অনেকদিনের পর আবার গৌরীকে পাইয়া মাতার স্মৃতি পুনরুজ্জীবিত হইল।

গৌরী। মালতী, তুমি আর খেলা কর না?

মালতী বলিল, "না।"

গৌরী। তোমার চখে কালিমা পড়িয়াছে।

মালতী বলিল, "বাবার রাত্রিকালে বড় যন্ত্রণা হয়।" মালতী কাঁদিল।

গৌরীও কাঁদিল। "আমি গরীবের মেয়ে, আমি সেবা করিলে তোমার বাবা কুণ্ঠিত হইবেন না ত?"

মালতী তাহার পিতৃভক্তির পবিত্র দৃষ্টিতে দেখিল যে, এক জনের স্থানে দুই জন সেবাদাসী হইলে আর আনন্দের স্থান থাকে না।

কাজেই পাঁচ টাকা মাহিয়ানা বরাদ্দ করিয়া দাসী গৌরীকে হারাণ বসুর বৃদ্ধা পিসী অন্দরমহলে বদ্ধ করিলেন।

গ্রামের অনেক প্রৌঢ়া নদীর তীরে জুটিয়া হারাণচন্দ্রের মৃতা সহধর্ম্মিণীর মুখের সহিত গৌরীর মুখের সাদৃশ্য বিচার করিতে বসিয়া গেল।

কিন্তু হারাণচন্দ্র নিজে গৌরীকে দেখিয়া সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিস্মিত হইলেন।

"তুমি কি জাত গা?"

গৌরী। আমি কায়স্থ।

হারাণ। তোমার পিতার নাম কি?

গৌরী। যাদবচন্দ্র দাস।

হারাণ। অন্ধ যাদব? সে ত বৈদ্য।

গৌরী। আমরা কায়স্থ।

হারাণের সন্দেহ হইল। তিনি নিশ্চয় জানিতেন, যাদব পূর্ব্বাঞ্চলের বৈদ্য। হারাণ প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিলেন। গৌরীর দুঃখময় জীবনের কথা শুনিয়া তিনি স্তম্ভিত হইলেন।

হারাণ। তুমি অন্য কোনখানে দাসীবৃত্তি করিয়াছিলে?

গৌরী। না। বাবা ভিক্ষা পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়া আমাকে দাসী হইতে দেন নাই।

হারাণ। তোমরা পূর্ব্বে কোথায় ছিলে।

গৌরী। আগ্রা অঞ্চলে?

হারাণ। তখন তুমি কত বড়?

গৌরী। পাঁচ বৎসরের।

হারাণচন্দ্রের স্মৃতিপথে কি যেন উদিত হইল। তিনি উঠিতে গেলেন, কিন্তু দক্ষিণাঙ্গ অবশ বলিয়া উঠিতে পারিলেন না। তাঁহার চক্ষে জল আসিল। গৌরীরও পরদুঃখকাতরতাবশতঃ চক্ষু বাষ্পাক্রান্ত হইল।

হারাণচন্দ্র লজ্জিত হইয়া বলিলেন,—

"আমি শরীরের জন্য কাতর হই নাই; আমার স্ত্রীর গহনার বাক্সর মধ্যে একখানা পত্র আছে, মালতীকে আসিয়া বাহির করিয়া দিতে বল। আমার কোনও পূর্ব্বকথা স্মরণ হইতেছে।"

গৌরী চলিয়া গেল। মালতী মার পুরাতন বাক্স হইতে ততোধিক পুরাতন একখানা কাগজ বাহির করিয়া পিতার হস্তে দিল।

হারাণচন্দ্র অনেকবার তাহা পাঠ করিলেন। সেটা তাঁহার স্ত্রীর হস্তলিপি—"প্রিয়তম! একটা আশ্চর্য্য কথা শুনিলাম। আমার জেঠা মহাশয় বলেন যে, আমার পিতা, মাতা ও কনিষ্ঠা ভগ্নীকে যখন প্লেগ-হাঁসপাতালে লইয়া যায়, তখন বুড়ীকে (কনিষ্ঠা ভগ্নীকে) প্লেগের টীকা দেওয়া হয়। যদিও আমরা শুনিয়াছিলাম যে, সকলেরই হাঁসপাতালে মৃত্যু হয়, কিন্তু কেহ কেহ বলে, আমার কনিষ্ঠা ভগ্নী বাঁচিয়াছিল, এবং তাহাকে হাঁসপাতাল হইতে একটি বৃদ্ধ আগ্রায় লইয়া গিয়াছিল। কাণপুর, ২রা বৈশাখ—তোমারই দাসী—"

৬

হারাণচন্দ্রের শ্বশুরালয়ের কেহই বাঁচিয়া নাই। হারাণচন্দ্রের স্ত্রীও কাণপুরে জেঠা মহাশয়কে দেখিতে গিয়া অকালে জ্বরাক্রান্ত হইয়া কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিলেন।

রাত্রিকালে অন্ধ যাদবের সহিত হারাণচন্দ্রের অনেকক্ষণ কি কথা হইল।

প্রত্যূষে সকলে আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল, হারাণচন্দ্র দুই বৎসর পরে শয্যায় উঠিয়া বসিয়াছেন।

মালতী গৌরীর মুখচুম্বন করিল। "তুমি আমার মার মত, তুমি দেবী, তোমার সেবায় আজ বাবার প্রসন্ন মুখ দেখিতে পাইয়াছি। আজ তিনি উঠিয়া বসিয়াছেন।"

গৌরী। মালতী, ঈশ্বর করুণার সাগর, আমরা তাঁর করুণার কি বুঝি ছাই। চল্, ঘাটের দিকে যাই।

তখন দুই জন দৌড়িয়া ঘাটের দিকে গেল।

ঠিক সেই সময়ে রাখালচন্দ্রের পান্সী ঘাটে আসিয়া লাগিল।

মালতী রাখালকে দেখিতে পাইয়াছিল। সে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া অদূরে বৃক্ষরাজির অন্তরালে লুকাইল।

গৌরী মালতীকে দেখিতে না পাইয়া ক্রমে নদীর তীরে গেল। কানাই মাঝি গৌরীকে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি এখানে কবে?"

গৌরী হঠাৎ রাখালকে দেখিয়া চিত্রপুত্তলিকার মত নিঃস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

রাখালচন্দ্র নদীতটে আসিল।

রাখাল ডাকিল, "গৌরী!"

গৌরী। কেন?

রাখাল। দাদা তোমাদের উপর অত্যন্ত অত্যাচার করিয়াছেন। আমি তাহার সমুচিত প্রতিশোধ লইব মনে করিয়াছি।

গৌরী। কেন?

রাখাল। গৌরী, তোমাকে এত দিন একটা কথা বলিব মনে করিয়াছিলাম। তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতে সঙ্কুচিত হইতেছি। তুমি কিছু মনে করিবে না ত?

গৌরী। না।

রাখাল। তোমার বিবাহ করিতে সাধ যায় না?

গৌরী। আমি দুঃখিনী, আমার বিবাহের কথায় আপনার কাজ কি?

রাখাল। আমি যদি তোমার একটা বিবাহের যোগাড় করিয়া দি? তাহার সম্পূর্ণ ব্যয়ভার আমি গ্রহণ করিব।

গৌরী। আমাকে কে বিবাহ করিবে?

রাখাল। যদি কেহ না করে, তবে আমিই করিব।

গৌরী চমকিয়া উঠিল। গৌরীর নয়নকোণে আবার সেই জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিল। গৌরী বলিল, "আপনি কি পাগল হইয়াছেন, না, আমার সহিত উপহাস করিতেছেন?"

রাখাল গৌরীর হাত ধরিতে গেল। গৌরী কিছু দূরে গিয়া বলিল,

"আমি ভিখারিণী বলিয়া অপমান করিবেন না; আমার সহিত বিবাহের যে কথা বলিলেন, তাহা অন্য কাহাকেও বলিবেন না; লোকে আপনাকে যথার্থই উন্মত্ত বলিবে। আপনার নিকট আমি ঋণী, দুঃখে দারিদ্র্যে যখন অনেক কষ্ট পাইয়াছি, তখন আপনার দয়ার গুণে নিঃসহায় পিতা মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইয়াছেন। তাই কৃতজ্ঞতাভরে একটি কথা আজ বলিতেছি। আমি আপনার যোগ্যা নই। একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া দেখুন। সংসারে যদি কেহ আপনার যোগ্য হয়, তবে সে মালতী। মালতী রাণী হউক, আপনি রাজা হউন। সকলে নয়ন ভরিয়া দেখুক। দুঃখীর হৃদয়ে বল আসুক।"

রাখাল। গৌরী, তোমাকে ভালবাসিয়াছিলাম—

গৌরী। ওটা ভ্রম। হয় ত দুঃখীর প্রতি স্নেহ ও আপনার অসীম করুণাকেই আপনি ভালবাসা বলিতেছেন।

রাখাল নৌকায় ফিরিয়া গেল। কি ভাবিতে লাগিল। স্বচ্ছ স্রোতস্বতী নবীন সূর্য্যের কিরণসম্পাতে আনন্দে ঝলসিতেছিল। রাখাল তাহার পানে চাহিয়া অনেক কল্পনার ছবি দেখিতে লাগিল। নৌকা চলিয়া গেল।

মালতী বৃক্ষান্তরাল হইতে আসিয়া গৌরীকে বাহুযুগলে বদ্ধ করিল। গৌরী অন্যমনস্ক হইয়া বনস্থলীর দিকে চাহিয়া রহিল।

এইরূপে আধ ঘণ্টা কাটিয়া গেল।

মালতী বলিল, "গৌরী, তুমি আমার যেন কে হও!"

এমন সময় কে যেন বলিয়া উঠিল, "গৌরী তোর মাসী।"

উভয়ে চাহিয়া দেখিল, হারাণচন্দ্র!

৭

হারাণচন্দ্র বলিলেন, "গৌরী! আমি আজ উঠিয়া বেড়াইতে পারিয়াছি। ইহা হইতেও এ দুঃখময় জীবনে আর একটি আনন্দের কথা আছে। তুমি আমার চিরদুঃখিনী উমার কনিষ্ঠা ভগ্নী। উমার সহিত আমার বিবাহ হইয়া অবধি সে কখনও সুখী হয় নাই। সে যদি আজ বাঁচিয়া থাকিত, তবে সুখী হইত। তাহাই মনে করিয়া আমার আনন্দ।"

গৌরীও কাঁদিল, মালতীও কাঁদিল, এবং মালতী গৌরীকে আরও দৃঢ়ভাবে জড়াইয়া ধরিল। রাখাল আবার বলিলেন,

"আমি মালতীর বিবাহ সম্বন্ধে এত দিন অমনোযোগী ছিলাম; কেন না, মালতীর বিবাহে আনন্দ করিবার কেহই ছিল না। আজ সে আনন্দ করিবার অধিকার তোমার হইয়াছে। দেখ গৌরী! আমার শ্বশুর মহাশয়—অর্থাৎ তোমার পিতা একটা বিষয় বেনামী খরিদ করিয়া যান, তাহার আয় বাৎসরিক দশ সহস্র টাকা। তাহার দলীলপত্র মৃত্যুকালে কাণপুর প্লেগ হাঁসপাতালে অন্ধ যাদবকে দিয়া যান। যাদব সে দলীলপত্র পাঠ করিবার পূর্ব্বেই অন্ধ হইয়া যায়, এবং এতদিন একখণ্ড পুরাতন বস্ত্রে সেগুলি বাঁধিয়া রাখে। তাহারই মধ্যে আর একখণ্ড উইল পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে জানিতে পারিলাম যে, যদি তুমি বাঁচিয়া থাক, তবে তুমিই সমগ্র সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী।

"যাঁহার নামে বিষয় খরিদ করা হয়, তিনিও আমার অনেক সন্ধান করিয়া স্বয়ং বেড়গ্রামে উপস্থিত হইয়াছেন। তিনি সেই বিষয় হইতে এত দিনে এক লক্ষ টাকা জমাইয়াছেন, এবং আমিই ন্যায়সঙ্গত উত্তরাধিকারী মনে ভাবিয়া আমাকে বিষয়টি অর্পণ করিয়া কাশীধামে যাইবেন মনঃস্থ করিয়াছেন। তিনি বড়লোক।

"এইমাত্র রাখালচন্দ্রও আসিয়াছিল। সে মালতীকে চাহিয়াছে। আমারও সম্পূর্ণ মত, কিন্তু রাখালের সহিত ধূমধাম করিয়া বিবাহ দিব, সে সংস্থান আমার নাই। তুমিই গৌরীর মাতৃস্থানীয়া। তোমার প্রাপ্য লক্ষ টাকা ব্যয় করিলে আজ বেড়গ্রামের দরিদ্র প্রজার দারিদ্র্য ঘুচিয়া যায়।

"তোমার কি মত?"

গৌরী কিছু না বলিয়া মালতীর মুখচুম্বন করিল। গৌরীর নয়নকোণে এত দিন যে অগ্নি জ্বলিত, তাহা মধুর হইয়া আসিল। গৌরীর মুখে হাসি দেখা দিল। গৌরী ছিন্ন মলিন বসনখানি লইয়া মালতীর চক্ষু মুছাইয়া দিল।

গৌরী বলিল, "আমার আবার বিষয় কি? মালতীরই সব। মালতীই আমার অন্নদাত্রী, আমার প্রাণের রক্ষয়িত্রী। আপনি ঐ বিষয় লইয়া একটা অনাথনিবাস করুন। আপনার হৃদয় উচ্চ, কল্পনাও উচ্চ, আপনি যখন দুঃখীর দুঃখে কাতর, তখন আমার এই মিনতি রাখিবেন।"

হারাণ। মালতীর ভাবী স্বামী ধনী জমীদার, এবং আমার অগ্রজও দত্তকপুত্র না লইয়া বিষয় আশয়ের প্রায় সমস্তই মালতীকে দিয়াছেন। এই-

মাত্র তাঁহার পত্র পাইয়াছি। এত সুখেও আমি মালতী-হারা হইয়া অধিক কাল বাঁচিব না। তোমরা শীঘ্র এস।"

হারাণচন্দ্র চলিয়া গেলেন।

মালতী গৌরীর বুকে মুখ লুকাইল।

মালতী বলিল, "মা! একটা কথা শুন্‌বি?

গৌরী। শুনিব।

মালতী। প্রতিজ্ঞা কর, আমার গা ছুঁইয়া।

গৌরী। করিলাম।

মালতী। তুমি আমার মা হও।

গৌরী। তাহা ত হইয়াছি।

মালতী। সে মা তুমি অনেক দিন—আমি তা বলি নাই, তুমি ঘর-সংসারের মা হও—বাবাকে বিবাহ কর, তাঁকে দেখিও, সেবা করিও। আমি না থাকিলে কে করিবে?"

৮

রাখালচন্দ্র একদৌড়ে বাড়ী গেল। শ্রীযুক্ত রামধন মিত্র সুন্দরী গৃহিণীর সহিত রাখালের দরখাস্ত সম্বন্ধে ঘোর তর্কবিতর্ক করিতেছিলেন, এবং ভজহরি তাহাতে টিপ্পনী কাটিতেছিল।

এমন সময়ে রাখাল অন্দরে প্রবেশ করিয়া উভয়ের পদধূলি গ্রহণ করিল।

গৃহিণী বলিলেন, "তুমি কত রঙ্গই জান!"

রাখাল বুঝাইল যে, তাহার মালতীকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা। মালতী রাজন বসুর দুই লক্ষ টাকার জমীদারী পাইয়াছে।

গৃহিণী চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন, "দেখ্‌লে, ছোটঠাকুরপোর কি বুদ্ধি নাই? কেবল সেই ডাইনী মেয়েটা যাদু করেছিল।"

রাখালচন্দ্র কিঞ্চিৎ পূর্ব্বকথা পাড়িয়া গৌরীর ইতিহাসটা সকলকে বুঝাইয়া দিল।

কর্ত্তা ও গৃহিণী উভয়েই এবং বিশেষ ভজহরি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় চাহিয়া রহিলেন।

গৃহিণীকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া রাখালচন্দ্র বলিল, "বৌদিদি, একটা কথা আছে। আপনার হাতের ও গলার মাপ্ দিতে হইবে। আজ আমি কলিকাতায় যাইব।"

গৃহিণী। যাও, যাও, আর তামাসা করিও না; তোমাদের এ আরব্য-উপন্যাসের কিছু বুঝি না বাপু!" এই বলিয়া হাতখানা বাড়াইয়া দিলেন। ভজহরি চলিয়া গেল।

রাখাল। আপনি হ্যামিল্টনের বাড়ীর সেই যে বিশ হাজার টাকার ডায়মনের চিক দেখিয়াছিলেন, সেটা পছন্দ হয় কি?

গৃহিণী। যা হয় একটা কর বাপু, আমার সংসারের উপর বড় বিরাগ জন্মিয়াছে।

শ্রীযুক্ত রামধন মিত্র আলবোলা টানিয়া লইয়া পৃষ্ঠদেশের অতিদুর্গম স্থানে বাম করতলের পশ্চাৎভাগ দ্বারা "সৈন্ধবাদি" তৈল মাখিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বলিলেন, "আমার পিঠে বড় বেদনা হইয়াছে। তোমরা সব ছেলেমানুষ, কর্ম্মভোগ বোঝ না। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম যে, ভগবান দরিদ্রের ভরণ পোষণ করেন।"

গৃহিণী। "আর আমিও বলিয়াছিলাম যে, কর্ম্মফলের অধিকারী আমরা নই। সেদিন যদি গৌরীকে ঝাঁটাপেটা না করিতাম, তবে কি আর সে আজ দশহাজার টাকার জমীদারী পাইত?"

এই বলিয়া মিত্রগৃহিণী সদর্পে চলিয়া গেলেন।

কিছু দিনের মধ্যেই বেড়গ্রামে দুইটা বড় বড় বিবাহ হইল। অনেক দরিদ্র পেট ভরিয়া খাইল। একটা অনাথ-আশ্রম স্থাপিত হইল; অনেক বিড়াল কুকুর কাক শকুনি দেশ বিদেশ হইতে আসিল।

মালতী রাখালরাজাকে লইয়া রাণী হইয়াছে। গৌরী মলিন বসন ছাড়ে নাই। হারাণচন্দ্র গৌরীকে পাইয়াও উমাকে ভুলেন নাই; তাঁহাদের সুখ দুঃখের কথা কেবল উমাকে লইয়া।

সহযোগী সাহিত্য।

ত্রিলোকনাথ।

"জর্ণ্যাল অফ্ দি এসিয়াটিক্ সোসাইটী অফ্ বেঙ্গল" নামক সুপ্রথিত সাময়িক পত্রে J. Ph. Vogel লিখিত "ত্রিলোকনাথ" শীর্ষক যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, আমরা নিম্নে তাহার অনুবাদ প্রদান করিলাম। লেখক বলেন,—

গ্রীষ্মকালে যখন কাঙ্গরা জেলার নানা স্থান পরিভ্রমণ করি, ঐ সময়ে আমি পুরাতত্ত্বসংক্রান্ত কতিপয় তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলাম। বোধ করি, মৎসংগৃহীত তথ্যনিচয়, বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের শিব, এই উভয় দেবতার সম্বন্ধনির্দ্ধারণকল্পে আবশ্যক হইতে পারে।

প্রধানতঃ, মূর্ত্তিগত সাদৃশ্যের উপর নির্ভর করিয়া কেহ কেহ অবলোকিতে-শ্বরকে পৌরাণিক ব্রহ্মার বৌদ্ধ প্রতিরূপ প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু এই দেবযুগল উক্ত ধর্ম্মদ্বয়ের পৌরাণিক গ্রন্থে যে স্থান অধিকার করিয়া আছেন, তাহার সম্যক্ আলোচনা করিলে এইরূপ নির্দ্দেশ কিছুতেই সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না। মূলতঃ, বোধিসত্ত্ব বিষয়বিমুখ সন্ন্যাসি-চিত্তের অপরিণত সৃষ্টি—বৌদ্ধ মহায়ন সম্প্রদায়ের মধ্যে অবলোকিতেশ্বরকে উচ্চ স্থান প্রদান করিবার জন্য তাঁহার আকৃতি ও প্রকৃতি ব্রহ্মার সদৃশ বর্ণিত না হইয়া বহুজনার্চ্চিত শিবের অনুরূপ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কারণ, ব্রহ্মা সত্ত্বগুণের আধার, তাঁহার নির্লিপ্তভাব জনসাধারণের চিত্ত স্পর্শ করিতে পারে না। সম্প্রতি এম্. এ. ফাউচার মহোদয়, অবলোকিতেশ্বর ও শিব, এই উভয় মূর্ত্তির সাদৃশ্য প্রতিপন্ন করিয়াছেন। বোধ করি, ত্রিলোকনাথ-সংক্রান্ত নিম্নলিখিত বিবরণ তাঁহার মতের অনুকূল ও পরিপোষক।

চন্দ্র ও ভাগা এই নদীযুগলের সম্মিলনস্থলের প্রায় বত্রিশ মাইল নিম্নভাগে চন্দ্রভাগার বামতীরে ত্রিলোকনাথ নামে তীর্থ আছে। পশ্চিম-হিমালয়-প্রদেশস্থ তীর্থসমূহের মধ্যে এই তীর্থ অতি প্রসিদ্ধ। ভৌগোলিক ব্যবস্থানুসারে তীর্থটি পাটান বা লাহুল প্রদেশের অন্তর্গত হইলেও, স্থানিটি এক্ষণে কাম্বা রাজ্যের অধিকারভুক্ত রহিয়াছে। ত্রিলোকনাথ অত্যন্ত দুর্গম বলিয়া এই তীর্থ-দর্শন পরম পুণ্যাবহ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। বোখারা-গমনকালে মূর ক্রফ্ট যখন লাহুলে উপনীত হন, ঐ সময়ে পথিমধ্যে তাঁহার সহিত দুই জন

অনশনক্লশ সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎকার ঘটে। ইহাদের এক জন ছাপরা ও অপর ব্যক্তি উজ্জয়িনী হইতে ত্রিলোকনাথ তীর্থে গমন করিতেছিল।

মধ্য এসিয়ার বাণিজ্যবর্ত্ম নির্ম্মিত হইবার পর হইতে এই তীর্থক্ষেত্রে যাত্রিসমাগম অধিক হইতেছে। কুলু অঞ্চলে ভ্রমণ করিলে অনেক সময় সাধু সন্ন্যাসীর দর্শনলাভ ঘটে। এই সন্ন্যাসীরা পার্ব্বতী-উপত্যকাস্থিত মণিকরণ নামক স্থানে উষ্ণউৎস-পরিদর্শন এবং রতাং গিরিসঙ্কট অতিক্রম পূর্ব্বক এই পরম পবিত্র তীর্থদর্শনমানসে ভাগা ও চন্দ্রভাগার 'বনরাজিনীলা' তটভূমিতে অবতীর্ণ হন। ১৭ই অগষ্ট যখন আমি এই প্রদেশে উপস্থিত হই, তখন ঐ স্থানে বার্ষিক মেলার অধিবেশন হইয়াছিল। স্থানীয় দেবমূর্ত্তি লাহুল, লাদাক্ ও বাম্‌হিরের বৌদ্ধ এবং কাম্বা, কুলু ও অন্যান্য নানা স্থানের হিন্দুগণ কর্ত্তৃক যে তুল্যরূপে অর্চ্চিত হইয়া থাকেন, তাহা আমি এই সুযোগে জানিতে পারিয়াছিলাম। সমাগত তীর্থযাত্রীদিগের আকৃতি ও বেশবৈচিত্র্য মানবতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের আলোচ্য বিষয়। এই তীর্থযাত্রীদিগের ভক্তিপ্রকাশপ্রণালী অতি বিচিত্র। ইহারা নৃত্য ও সুরাপান দ্বারা দেবভক্তি প্রকাশ করিয়া থাকে। যে দেবতার আকর্ষণপ্রভাবে বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন ধর্ম্মাশ্রিত ভক্তবৃন্দ এই দুরধিগম্য ও সুদূরবর্ত্তী মন্দিরতলে সমবেত হয়, তাঁহার স্বরূপ জানিবার জন্য মনোমধ্যে স্বতঃই কৌতূহলের সঞ্চার হইয়া থাকে।

কাইলং-স্থিত মোরেভিয়ান্ মিশনের পরলোকগত রেভারেণ্ড মিষ্টার হাইড্ বলিয়াছেন, চন্দ্রভাগার উপত্যকাস্থিত ত্রিলোকনাথ ও বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর এক ও অভিন্ন। দেবমূর্ত্তি সম্যক্ পরীক্ষা করিলে তাঁহার উক্তির যাথার্থ্যও সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম হয়। চরণযুগলের অবস্থান দেখিবামাত্র প্রতিমাকে বোধিসত্ত্ব মূর্ত্তি বলিয়া ধারণা জন্মে। এই মূর্ত্তির দক্ষিণপদ সঙ্কুচিত, এবং বামপদ প্রসারিত রহিয়াছে। ছয় হস্তে নিম্নলিখিত মুদ্রা ও লক্ষণনিচয় বর্ত্তমান আছে। দক্ষিণ ভাগে,—প্রথম হস্তে অভয়, দ্বিতীয় হস্তে অক্ষমালা, তৃতীয় হস্তে বরমুদ্রা; এবং বামভাগে,—প্রথম হস্তে ত্রিশূল, দ্বিতীয় (ক্রোড়বিন্যস্ত) হস্তে সর্প ও তৃতীয় হস্তে মঙ্গলকলস রহিয়াছে। মিষ্টার ফাউচারের আলোচিত নেপালী ক্ষুদ্র মূর্ত্তিসমূহের সহিত পূর্ব্বোক্ত মূর্ত্তির তুলনা করিলে বাহুসমূহের সংখ্যা, সন্নিবেশপ্রণালী ও মুদ্রাদি বিষয়ে প্রতিমায় বহু অসাধারণত্ব পরিলক্ষিত হয়। বিশেষতঃ, পদ্মের অভাবদর্শনে মূর্ত্তিটি অবলোকিতেশ্বরের প্রতিমা কি না, তদ্বিষয়ে সংশয় জন্মে। কিন্তু উক্ত গ্রন্থকার

লিখিয়াছেন, প্রতিমার বাহুসমূহের কোন নিরূপিত সংখ্যা নাই। এবং ষট্‌-বাহু অবলোকিত-মূর্ত্তিও একেবারে দুর্লভদর্শন নহে। তদ্ভিন্ন, বরমুদ্রা বোধিসত্ত্ব মূর্ত্তির একটি প্রধান লক্ষণ। মিষ্টার কাউচারের আলোচিত মূর্ত্তিসমূহের মধ্যে একটি প্রতিমাতে সর্পও পরিদৃষ্ট হইয়াছিল। সে যাহা হউক, ত্রিলোকনাথ মূর্ত্তির মুকুটোপরি পদ্মাসনস্থ যে ধ্যানী বুদ্ধ অমিতাভ মূর্ত্তি পরিলক্ষিত হয়, উহা দ্বারাই সকল সন্দেহের নিরাকরণ হইতে পারে। এই বোধিসত্ত্ব মূর্ত্তি শ্বেতমর্ম্মরনির্ম্মিত। লাহুল প্রদেশে অনেক বর্ণানুলিপ্ত ক্ষুদ্র মর্ম্মরমূর্ত্তি দেখা যায় বটে, কিন্তু কুলু অঞ্চলের অপর কুত্রাপি এরূপ মর্ম্মরপ্রতিমা দৃষ্টিগোচর হয় না।

বোধিসত্ত্বের মধ্যমাকৃতি শিখরমন্দির স্থানীয় অধিবাসীরা পাণ্ডবগণের প্রতিষ্ঠিত বলিয়া প্রকাশ করে। ইহা নিতান্ত কৌতুকাবহ ব্যাপার, সন্দেহ নাই! এ অঞ্চলের প্রত্যেক পুরাতন দেবমন্দির সম্বন্ধে এইরূপ জনপ্রবাদ শুনিতে পাওয়া যায়। ফলতঃ, ইহাতে এইমাত্র বুঝা যায় যে, এই মন্দির-সমূহ অতি প্রাচীন, এবং ইহাদিগের ইতিবৃত্ত সাধারণের অপরিজ্ঞাত। মন্দির-সমূহের মধ্যে জ্বালামুখীর মন্দিরকে লোকে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া অনুমান করে; কিন্তু এ ক্ষেত্রে ধর্ম্মরাজ ও তাঁহার অনুজগণ মন্দিরের সংস্কারকর্ত্তা বলিয়াই কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। ত্রিলোকনাথের মন্দির একটি আয়তাকৃতি অট্টালিকার (নাটমন্দির?) সহিত সংলগ্ন। উহার ছাদ ক্রমনিম্ন ও দারুনির্ম্মিত। শীর্ষদেশে স্বর্ণাভ চূড়াসমূহ শোভা পাইতেছে। কুলু উপত্যকা-স্থিত বিষ্ণুমন্দিরসংলগ্ন অট্টালিকাটিও ইহার অনুরূপ।

লাহুল প্রদেশের যে অংশ পাটান নামে পরিচিত, ঐ অঞ্চলে হিন্দু ধর্ম্ম ও লামা মতবাদ এতদুভয়ের মধ্যে ধর্ম্মগত সংমিশ্রণ অতি ধীরে ধীরে সাধিত হইয়াছে। কিন্তু কুলু অঞ্চলে এরূপ ব্যাপার আদৌ নয়নগোচর হয় না। এই স্থলে নগাধিরাজ হিমালয় অতি পরিস্ফুটভাবে উভয় ধর্ম্মের বিস্তৃতিসীমা নির্দ্দেশ করিতেছে। যে কেহ রোটাং গিরি সঙ্কট অতিক্রম করিয়াছেন, তিনি কাংড়া ও বিয়া উপত্যকার মধ্যবর্ত্তী স্থানের জলবায়ু, প্রাকৃতিক দৃশ্য ও অধিবাসিবর্গের বৈষম্যদর্শনে বিস্মিত হইয়াছেন, সন্দেহ নাই।

অনেকে বলিয়া থাকেন, এবং স্থানীয় ইউরোপীয় অধিবাসিবর্গেরও এইরূপ বিশ্বাস যে, এক সময়ে কুলু প্রদেশে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাব ছিল। এতদঞ্চলের ভূতপূর্ব্ব শাসনকর্ত্তা কাপ্তেন হারকোর্ট উক্ত প্রদেশে সম্বন্ধে যে

সারগর্ভ পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহাতেও এইরূপ উল্লেখ দেখা যায়। মন্দিরোপরি সন্নিবেশিত বৌদ্ধচক্র, পক্ষী, সর্প প্রভৃতি প্রাণীর প্রতিকৃতি ও রজ্জুউৎসব প্রভৃতির অস্তিত্বই তাঁহার এইরূপ বিশ্বাসের মূল। প্রথমটি সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, স্থানীয় অনেক লোকেই উহাকে চন্দ্র বা সূর্য্য বলিয়া নির্দ্দেশ করে। তদ্ভিন্ন পদ্মের সহিত উহার যেরূপ সাদৃশ্য লক্ষিত হয়, অন্য কোনও বস্তুর সহিত উহার সেরূপ আকারগত সাম্য পরিদৃষ্ট হয় না। আর ইহাকে চক্র বলিয়া মানিয়া লইলেও স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, চক্রও সম্পূর্ণরূপে বৌদ্ধধর্ম্মের নিদর্শন নহে। গিরিশিখরবিলম্বিত রজ্জু অবলম্বন পূর্ব্বক নিম্ন ভাগে অবতরণ করিয়া লোকে যে প্রকার উৎসবের অনুষ্ঠান করে, শতদ্রুর তীরবর্ত্তী নির্ম্মন্দ নামক স্থানেও ঐরূপ উৎসব সম্পাদিত হইয়া থাকে। এই স্থানটি রাজনীতিক উদ্দেশ্যসাধনমানসে কুলু প্রদেশের অন্তর্নিবিষ্ট করা হইলেও, ভৌগোলিক বিভাগানুসারে উহা কুলু উপত্যকার অন্তর্গত নহে। কাপ্তেন হারকোর্ট বলিয়াছেন, মেজর মণ্টোগোমরির জনৈক পণ্ডিত লাসার বহির্ভাগস্থিত পোটালা দুর্গেও ঐরূপ উৎসব দেখিয়াছিলেন। কিন্তু কেবল এই জন্যই ইহাকে বৌদ্ধ উৎসব বলিয়া অভিহিত করা সঙ্গত নহে। অত্যন্ত উদারভাবে দেখিলেও উৎসবটিকে লামা-মতানুগত অনুষ্ঠান বলা যাইতে পারে। কিন্তু আমরা ইহাকে অনার্য্য জাতির উপাসনা-প্রণালীর অংশমাত্র বিবেচনা করি। ইহাকে কোনক্রমেই মহায়ন প্রণালীর বৌদ্ধধর্ম্মের অতিসূক্ষ্ম বার্নিসের উপাদান বলা চলে না। হিমালয়ের অন্যান্য যে সকল প্রদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের অস্তিত্ব নাই, সেরূপ স্থলেও রজ্জুউৎসব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। গাড়োয়ালের রাজধানী শ্রীনগরে মিষ্টার মুর ক্রফ্‌ট এই উৎসব দর্শন করিয়াছিলেন।

আমার বিবেচনায়, এই উৎসবকে প্রাচীন কালের নরবলির অস্তিত্বজ্ঞাপক বলাই সঙ্গত। পূর্ব্বকালে কুলু ও লাহুল প্রদেশে নরবলি প্রচলিত ছিল। সর্ব্বজনবিদিত জনপ্রবাদেও উহার উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে এই অদ্ভুত উৎসবের সময় দেবোদ্দেশে উৎসর্গীকৃত লোকটির প্রাণ সংহার করা হয় না বটে, কিন্তু তাহাকে যেরূপ সঙ্কটসঙ্কুল কার্য্যে নিয়োজিত করা হয়, তাহাতে তাহার প্রাণনাশ ঘটা সম্পূর্ণ সম্ভবপর। এই নিয়মে দেবসমীপে বলি উপস্থিত করা হইলে, দেবতা নিজের অভিরুচি অনুসারে বলির গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করিয়া থাকেন। ১৮৫৬ খ্রীঃ অব্দে উৎসৃষ্ট লোকটির মৃত্যু হয়। শুনা যায়, তদবধি এই প্রথা নিষিদ্ধ হইয়াছে। অতি সামান্য ভাবে এই উৎসব

অদ্যাপি অনুষ্ঠিত হইতেছে। কিন্তু ইহাতে এক্ষণে আর লোকের জীবনের কোন আশঙ্কা নাই। আমার সিদ্ধান্ত সত্য হইলে এই প্রথাকে আদিম উদ্দেশ্য-পরিভ্রষ্ট ধর্ম্মোৎসবের এক বিচিত্র উদাহরণ বলা যাইতে পারে।

এই উৎসব-প্রসঙ্গের আলোচনায় আমি প্রকৃত বিষয়ের বহু দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। কারণ, প্রায় দুই মাস কাল কুল্লুতে অবস্থান করিলেও তথায় বৌদ্ধ ধর্ম্মের অস্তিত্বজ্ঞাপক কোন প্রকার স্তূপ, প্রতিমা, বা শিলালিপি আমার দৃষ্টি-গোচর হয় নাই। কেবল খিলাতের বিয়াস্ নামক স্থানে ত্রিলোকনাথ নামে পরিচিত এক অবলোকিতমূর্ত্তি দর্শন করিয়াছি।

মণিকরণ, বশিষ্ঠ ও খিলাত,—কুল্লু উপত্যকার এই তিন স্থানে উষ্ণপ্রস্রবণ আছে। উক্ত স্থানত্রয়ে জনসাধারণে দেবপূজা করিয়া থাকে। মণিকরণই কুল্লু উপত্যকার প্রধান তীর্থ স্থান। পূর্ব্বকালে এই তীর্থ শৈবসম্প্রদায়ের নিকট সর্ব্বপ্রধান পুণ্যক্ষেত্র বলিয়া পরিগণিত ছিল। এক্ষণে ঐ স্থান বিষ্ণু-ভক্তির কেন্দ্রস্বরূপ হইয়াছে। ঋষি বশিষ্ঠের নামানুসারে বশিষ্ঠতীর্থের নামকরণ হইয়াছে। রামচন্দ্রের গুরুরূপে বশিষ্ঠ এই স্থানে অর্চ্চিত হইয়া থাকেন। এই তীর্থে তাঁহার একখানি পাষাণময় চক্র আছে। খিলাতে পল্লীসুলভ একটা সামান্য মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। এই মন্দিরে কপিল মুনির পূজা হইয়া থাকে। একদা বশিষ্ঠদেব মণিকরণ তীর্থের পবিত্র সলিল আহরণ করিয়া স্বীয় আশ্রমে গমন করিতেছিলেন। পথিমধ্যে তিনি কপিল মুনিকে উল্লঙ্ঘন করেন। ঐ সময় মুনিবর ক্ষণকালের জন্য তপস্যা হইতে নিবৃত্ত হইয়া বশিষ্ঠের নিকট হইতে কয়েক বিন্দু তীর্থবারি বলপূর্ব্বক গ্রহণ করেন। ঐ সকল বারিবিন্দু হইতে খিলাতের উষ্ণ উৎসের উদ্ভব হয়।

বশিষ্ঠমূর্ত্তি অষ্টধাতুনির্ম্মিত। সুতরাং বিষয়টি বেশ প্রণিধানযোগ্য। কারণ, কুল্লু উপত্যকায় আমি যে সমস্ত ধাতুমূর্ত্তি দর্শন করিয়াছি, তৎসমুদয় বৈষ্ণবদিগের দ্বারা পূজিত হইয়া থাকে। এই মূর্ত্তিসমূহ অপেক্ষাকৃত আধুনিক। বোধ করি, কুল্লু রাজারা সপ্তদশ শতাব্দীতে মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

কপিল মুনির মন্দিরে রামচন্দ্র, সীতা, চতুর্ভুজ, রাধা ও হনুমান প্রভৃতি অষ্টধাতুনির্ম্মিত মূর্ত্তিনিচয় বিদ্যমান। এই সকল মূর্ত্তি ব্যতীত মন্দির-মধ্যে একটি প্রস্তরমূর্ত্তি পরিলক্ষিত হয়। মূর্ত্তিটি অতি প্রাচীন, এবং কাল-প্রভাবে উহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে। এই মূর্ত্তি ষড়ভুজ। কিন্তু

হস্তের মুদ্রাদি এক্ষণে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কেবল দক্ষিণ দিকে দ্বিতীয় হস্তে বরমুদ্রা স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হয়। বাম দিকের একখানি হস্তে যষ্টিবৎ কোনও দ্রব্য রহিয়াছে, উহা ত্রিশূল, অথবা সর্প, এতদুভয়ের যে কোনটি হইতে পারে। মূর্ত্তির আসন লাহুল-স্থিত অবলোকিত মূর্ত্তির সম্পূর্ণ অনুরূপ। এতদ্ব্যতীত, প্রতিমার শীর্ষদেশে ধ্যানমুদ্রারূপে একটি মূর্ত্তি বিদ্যমান আছে। শীর্ষস্থ মূর্ত্তি এ পর্য্যন্ত পূজারী মহাশয়েরা লক্ষ্য করেন নাই। কিন্তু মূর্ত্তিটি তাঁহাদিগকে দেখাইবামাত্র তাঁহারা বলিলেন, উহা লক্ষ্মীর মূর্ত্তি! মূর্ত্তিটি পূজারীদিগের নিকট ত্রিলোকনাথ নামেই পরিচিত হইয়া আসিতেছে। লাহুলে যে দেবমূর্ত্তির পূজা হয়, তাহার সহিত এই মূর্ত্তির যে কোনও পার্থক্য নাই, তাহাও উহাঁরা স্বীকার করিলেন। সম্ভবতঃ, পূর্ব্বকালে থিলাতে অবলোকিতেশ্বর প্রধান দেবতারূপে অর্চ্চিত হইতেন। কিন্তু উত্তরকালে ব্রাহ্মণ কপিলের মূর্ত্তি উহাকে অধিকারভ্রষ্ট করিয়া আত্মপ্রাধান্য লাভ করে। বোধ করি, এই জন্য কপিলমন্দিরে অবলোকিত মূর্ত্তি সামান্যবিগ্রহরূপে এখনও স্থান পাইয়া আসিতেছে। উভয় ক্ষেত্রেই দেবমূর্ত্তির উপাদান কোনও দূরদেশ হইতে সংগৃহীত হয় নাই। স্থানীয় উপকরণেই প্রতিমার নির্ম্মাণ কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছিল।

চন্দ্রভাগাতীরবর্ত্তী ত্রিলোকনাথ তীর্থে ও বিয়াস্ নদীর তটস্থিত মণ্ডি নামক পার্ব্বত্য রাজ্যের অন্তর্গত রাওয়ালসার নামক প্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্রেও হিন্দুধর্ম্ম ও লামা মতবাদের বিচিত্র মিশ্রণ পরিদৃষ্ট হয়। অধিবাসীরা সকলেই হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী হইলেও, এই স্থানে পদ্মসম্ভবের মূর্ত্তি নয়নগোচর হয়। পদ্মসম্ভব তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবর্ত্তন করেন। আপনাদিগের গানপা এই স্থানে আছে বলিয়া যে কেবল লামারা এই মূর্ত্তির পূজা করে, তাহা নহে। ব্রাহ্মণেরাও লোমশ ঋষি বলিয়া এই মূর্ত্তির পূজা করিয়া থাকেন। তত্রত্য ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে মূর্ত্তিসংক্রান্ত মাহাত্ম্যগ্রন্থ প্রচলিত আছে। উক্ত গ্রন্থে মূর্ত্তিসংক্রান্ত কিংবদন্তীসমূহের ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মানুমোদিত বিবরণ সন্নিবেশিত হইয়াছে। মণ্ডি সহরেও আমরা আবার ত্রিলোকনাথ নাম শুনিতে পাই। এখানে ত্রিলোকনাথ নামের অর্থ শিব। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের সহিত সংস্রব আছে বলিয়াই আমাদিগকে এ কথার উল্লেখ করিতে হইল। কুলু প্রদেশে বৈষ্ণবধর্ম্ম জনসাধারণের অবলম্বিত ধর্ম্ম না হইলেও উহা রাজবংশীয়দিগের ধর্ম্ম। স্থানীয় রাজগণ খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে এই ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া-

ছিলেন। সুতরাং কুলু অঞ্চল হইতে মণ্ডিতে উপনীত হইয়া তথায় শৈব ধর্ম্মের প্রবল আধিপত্য দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। মণ্ডিতে লিঙ্গমূর্ত্তি শিবের পূজা হইয়া থাকে। তদ্ব্যতীত ঐ স্থানে বহুসংখ্যক শিবপঞ্চবক্ত্র বা পঞ্চানন মূর্ত্তি দৃষ্টিগোচর হয়। বহুশীর্ষ মূর্ত্তির মুখগুলি যেরূপ শ্রেণীবদ্ধভাবে সজ্জিত থাকে, এই মূর্ত্তিসমূহের মুখসন্নিবেশপ্রণালী সেরূপ নহে। প্রতিমা-সমূহ এরূপ ভাবে নির্ম্মিত যে, চতুর্থ বদন মূর্ত্তির পশ্চাৎভাগে ও পঞ্চম মুখ মূর্ত্তির শিখরদেশে স্থাপিত হইয়াছে। সম্মুখ দিক হইতে দর্শন করিলে মূর্ত্তির তিনটিমাত্র মুখ দৃষ্টিগোচর হয়। স্থানীয় পুরোহিত বলেন, মহাদেবের পঞ্চমুখ পঞ্চধ্যানের নিদর্শনাত্মক। মুখের সংখ্যানুসারে শিবপঞ্চবক্ত্র মূর্ত্তিতে সর্ব্বত্রই দশ বাহুর সমাবেশ লক্ষিত হইয়া থাকে। মূর্ত্তিনিচয়ের হস্তবিন্যস্ত মুদ্রাসমূহ সকল মূর্ত্তিতেই এক প্রকার, এবং তাহাদিগের স্বরূপ-নিরূপণ অনায়াসসাধ্য নহে। মণ্ডি নগরে তিনটি বিভিন্ন মূর্ত্তিতে মুদ্রাসমূহের এইরূপ সন্নিবেশ দেখা যায়,—

১। দক্ষিণ		বাম।	
প্রথম বাহু	খড়্গ	প্রথম বাহু	ত্রিশূল
২য় ”	সর্প	২য় ,,	গদা
৩য় ”	অঙ্কুশ	৩য় ,,	ঘণ্টা বা কলস
৪র্থ ”	বর	৪র্থ ,,	ভগ্ন
৫ম ”	ভগ্ন	৫ম ,,	শক্তি অর্থাৎ পার্ব্বতী
২। ”	ত্রিশূল	প্রথম ,,	চক্র
২য় ”	শূন্য	২য় ,,	ডমরু
৩য় ”	শঙ্খ	৩য় ,,	বাদন
৪র্থ ”	অক্ষমালা	৪র্থ ,,	কলস ও শক্তি
৫ম ”	?	৫ম ,,	সর্প
৩। ”	ত্রিশূল	প্রথম ,,	ডমরু
২য় ”	অভয়	২য় ,,	চক্র
৩য় ”	দীপ (?)	৩য় ,,	সর্প
৪র্থ ”	অক্ষমালা	৪র্থ ,,	সর্প
৫ম। ”	বাদন	৫ম ,,	কলস ও শক্তি

দেবতা প্রায় সর্ব্বত্রই নিজবাহন নন্দ নামক বৃষের পৃষ্ঠে সমাসীন। পার্ব্বতী-বাহন সিংহ বিপরীত দিকে মুখ ফিরাইয়া তাঁহার পশ্চাৎভাগে দণ্ডায়মান।

শিবপঞ্চবক্ত্র মুদ্রাসমূহ যে কিয়ৎপরিমাণে ত্রিলোকনাথ অবলোকিতেশ্বর মূর্ত্তির অনুরূপ, তাহা বোধ করি, কাহারও দৃষ্টি অতিক্রম করিবে না। সর্প, শূল ও কলস সকল মূর্ত্তিতেই সাধারণভাবে বর্ত্তমান আছে। প্রথমবর্ণিত মূর্ত্তির পঞ্চম দক্ষিণ হস্তে যে অক্ষমালা ছিল বলিয়া অনুমান করা যাইতেছে, অন্যান্য মূর্ত্তিতেও উহা বিদ্যমান রহিয়াছে। মূর্ত্তিত্রয়ে বর ও অভয়মুদ্রা পরিলক্ষিত হয় বটে, তবে সকল মূর্ত্তিতে উহা যথাযথভাবে সন্নিবেশিত হয় নাই। শিবত্বের নিদর্শন অক্ষমালা ও কলস মূর্ত্তিসমূহে বিদ্যমান থাকাতেই ব্রহ্মা ও অবলোকিতেশ্বর মূর্ত্তির সহিত উহাদের সাদৃশ্য আছে বলিয়া যে সকল যুক্তির অবতারণা হইয়াছে, তৎসমুদয়ের সারবত্তা অনেক-পরিমাণে হ্রাস প্রাপ্ত হয়। বিয়াস নদীর দক্ষিণতীরবর্ত্তী মন্দিরসমূহে প্রতিষ্ঠিত শিবপঞ্চবক্ত্র মূর্ত্তি ত্রিলোকনাথ নামে পূজিত হইয়া থাকে।

বিয়াস উপত্যকা হইতে নিজ কাঙ্গরা অঞ্চলে গমন করিলে ত্রিলোকনাথ (ত্রিলোকপুর) নামক একটি গ্রাম ও তীর্থ কোট্‌লার দুই মাইল পূর্ব্ব দিকে দেখিতে পাওয়া যায়। স্থানীয় মন্দিরটি ইষ্টকাদিনির্ম্মিত দেবালয় নহে। উহা স্বভাবরচিত একটি গুহা মাত্র। আকরিকদ্রব্যবহুল জল ছাদ হইতে নিঃসৃত হইয়া গুহার প্রান্তদেশে দুইটি বৃহৎ শিলালিঙ্গ (Stalacties of Stalagmites) উৎপন্ন হইয়াছে। শিলালিঙ্গ দুইটি মধ্যপথে পরস্পর সম্মিলিত হওয়াতে স্তম্ভযুগলবৎ প্রতীয়মান হইতেছে। গুহার ছাদ ও তলদেশ রাশি রাশি শিলালিঙ্গে সমাচ্ছন্ন। এই অসংখ্য শম্ভুলিঙ্গ ব্যতীত গুহার মধ্যস্থলে শ্বেতমর্ম্মরনির্ম্মিত একটি লিঙ্গ স্থাপিত আছে। ইহাই গুহার সর্ব্বপ্রধান দেবতা। ইঁহার নাম পঞ্চবক্ত্র। এই লিঙ্গকে শেষোক্ত মূর্ত্তি ও লিঙ্গ, এতদুভয়ের সংযোগসূত্র বলা যাইতে পারে।

এই প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই যে, চন্দ্রভাগা উপত্যকা ও মধ্য হিমালয়ের দক্ষিণস্থ বিয়াস্ উপত্যকা প্রদেশে বোধিসত্ত্ব পঞ্চবক্ত্র অথবা লিঙ্গরূপী অলোকিতেশ্বর ত্রিলোকনাথ নামে পরিচিত। এবং বিয়াস নদীর নীর-বিধৌত নিম্নতর উপত্যকা প্রদেশে পঞ্চবক্ত্র অথবা লিঙ্গরূপী শিবমূর্ত্তি ত্রিলোকনাথ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। মুদ্রাদি বিষয়ে অবলোকিত মূর্ত্তির সহিত ইহার বিশেষ সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

নিবেদন।

আমারি জীবন-বীণে তোমার রাগিণী
বাজে যেন ঝঙ্কারিয়া নব তান তুলি';
প্রেমের পবিত্র পাশে অয়ি সোহাগিনী!
আমারে বাঁধিয়া রাখো আপনারে ভুলি';
আমার প্রাণের কুঞ্জে হৃদি-পদ্মাসনে
এস দেবী, এস মোর মঙ্গলদায়িনী।
তোমার নয়নালোকে সহস্র কিরণে
কর তুমি উদ্ভাসিত মরম-কাহিনী।
ঘুচে যাক্ সঙ্কীর্ণতা, রূঢ় ব্যবধান;
মুছে যাক্ অভাগার মরম-আঁধার;
যত দ্বৈধ যত বাধা হোক্ অবসান;
ধ্রুব হয়ে ধরা দাও বাঞ্ছিত আমার!
ক্ষুদ্র এ হৃদয় হোক্ উন্নত মহান্,
তোমারি চরণে ঢালি শুভ্র অর্ঘ্যভার!

শ্রীসতীশচন্দ্র বসু।

দুর্গা-বিজয়।

সংস্কৃত চণ্ডীর কতগুলি প্রাচীন অনুবাদ-গ্রন্থ আছে, অদ্যাপি তাহা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। কেন না, প্রাচীন সাহিত্য-বিষয়ক অনুসন্ধান এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। শীর্ষোক্ত গ্রন্থখানিকে চণ্ডীর অন্যতম অনুবাদ বলা যাইতে পারে। গ্রন্থকার এ কথা কোথাও স্বীকার করেন নাই বটে, কিন্তু গ্রন্থের রচনাপ্রণালী দেখিলে ইহাকে তদনুবাদ বা তদবলম্বনে রচিত গ্রন্থ না বলিয়া থাকা যায় না। সেকালের অনুবাদ একরূপ নূতন সৃষ্টি-মাত্র। বলা বাহুল্য, প্রাচীন সাহিত্যের বিরাট কলেবর কেবল সংস্কৃত গ্রন্থাদির উক্তরূপ অনুবাদেই প্রায় পরিপূর্ণ। নূতন পথের পথিক হইবার সকলেরই অধিকার আছে, এই কথাটি সেকালের অধিকাংশ মস্তিষ্কে স্থান পায় নাই। তাহা হইলে, প্রাচীন সাহিত্যের মূর্ত্তি ভিন্নরূপে প্রতিভাত হইত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

দুর্গা-বিজয় প্রাচীন গ্রন্থ। আকারে নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে। ৬০ পত্রে গ্রন্থ পরিসমাপ্ত। সমগ্র গ্রন্থে আনুমানিক ১৫০০ পদ আছে। এই কাব্যে প্রাচীন সাহিত্য-সুলভ রাগ রাগিণী ব্যবহৃত হয় নাই কেন, তাহা ঠিক বলা যায় না। তবে বোধ হয়, গ্রন্থের প্রতিপাদ্য দুর্গা-চরিত-বর্ণন; তাহা ত একরূপ যুদ্ধ-বিগ্রহের বর্ণনায় পরিপূর্ণ। বিবিধ রসের অবতারণা করিতে না পারিলে রসোদ্দীপক রাগ রাগিণীর ব্যবহার করিবার অবকাশ হয় না। একমাত্র রসাশ্রয় করিয়াও ঐরূপ নিপুণতা প্রদর্শিত হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহা যেমন তেমন শিল্পীর সাধ্য নহে। আমাদের এই গ্রন্থের কবি সেরূপ উচ্চ শ্রেণীর শিল্পী ছিলেন না; সুতরাং তিনি কেবল পয়ার ও লাচারি নামক ছন্দেই কাব্যরচনা করিয়াছেন।

সমালোচ্য কাব্যের রচয়িতার নাম সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ গোলযোগ দেখা যাইতেছে। পুঁথিতে যেমন লেখা আছে, তাহাতে কবিকে 'বন-দুর্ল্লভ' বা 'বল-দুর্ল্লভ', এই উভয় নামেই অভিহিত করা চলে। প্রাচীন পুঁথিতে 'ন' ও 'ল'-এর পার্থক্য সকল স্থলে সহজে ধরা যায় না। বিশেষতঃ উক্ত

উভয় নামেরই কোনও সদর্থকল্পনা সহজ নহে। কেহ কেহ কবির নাম 'বনদুর্ল্লভ' বলিতে চাহেন ; কিন্তু গ্রন্থের সমস্ত ভণিতিগুলির আলোচনা করিয়া আমাদের মনে হইতেছে, তাঁহার নাম 'বলদুর্ল্লভ', 'বনদুর্ল্লভ' নহে। বোধ হয়, 'বল' শব্দটি নামাংশ নহে ; তাঁহার গোত্রের উপাধি। এই অনুমান যদি প্রকৃত হয়, তাহা হইলে কবির নামটি 'দুর্ল্লভ ('রাম' কি অপর কোনও শব্দকে মধ্যবর্ত্তী ধরিতে হইবে) 'বল' হইতে পারে।

কবির নাম লইয়াই যখন এত গোল, তখন তাঁহার অপর কোনও পরিচয় দিবার প্রয়াস সম্পূর্ণ নিষ্ফল, তাহা বলা বাহুল্যমাত্র। তবে গ্রন্থের মধ্যে এমন কতকগুলি শব্দের প্রয়োগ আছে, যাহা দ্বারা আমরা কবিকে সহজেই চট্টগ্রামবাসী (অন্ততঃ পূর্ব্ববঙ্গবাসী) বলিয়া স্থির করিতে পারি। পরে শব্দগুলির উল্লেখ করিব। ভারতের কোনও প্রাচীন তত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া হতভাগ্য লেখকদিগকে প্রায়ই অন্ধকারে বিচরণ করিতে হয়। সুতরাং কালে আমাদের উক্ত অনুমান 'বাস্তবে' কি 'অলীকে' পরিণত হইবে, তাহা কে বলিতে পারে ?

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই গ্রন্থখানি প্রাচীন ; কিন্তু কতদিনের পুরাতন, সন তারিখ দিয়া তাহা বলিবার উপায় নাই। গ্রন্থে কোথাও ইহার রচনার আরম্ভ বা সমাপ্তি-কাল প্রদত্ত হয় নাই। প্রতিলিপিখানি ৫০ বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী। সুতরাং কালনিরূপণেও আমাদিগকে অনুমানের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইতেছে। জাঅস্তি, গাঅস্তি, করসি, করন্ত প্রভৃতি ক্রিয়াপদ ও পাষণ্ডি, অথান্তর, যোহর, তোহর প্রভৃতি পদগুলির প্রয়োগ দেখিলে ইহার প্রাচীনতা সম্বন্ধে কেহই সন্দিগ্ধ হইবেন না। এইরূপ প্রয়োগ বঙ্গসাহিত্যের মধ্যযুগেই সাধারণ ছিল ; তারপরও যে ছিল না, তাহা নহে। তবে তখন হইতে বঙ্গভাষা ক্রমশঃ মার্জ্জিত ও রূপান্তরিত হইয়া আসিতেছিল। এই কারণে আমরা এই গ্রন্থখানিকে খুব প্রাচীন বলিয়াই মনে করি—সেই প্রাচীনত্বের সীমা অন্ততঃ দেড় শত বৎসরের ন্যূন বলিয়া বোধ হয় না। ভাষার প্রাচীনত্বের অন্যান্য প্রমাণ পরে প্রদর্শিত হইবে।

গ্রন্থ-বর্ণিত বিষয় সম্বন্ধে হিন্দু পাঠকগণকে নূতন কিছু বলিবার নাই। দুর্গা তাঁহাদের সকলেরই আরাধ্যা দেবী ; তাঁহার চরিত্রাদি বোধ করি হিন্দুর অবিদিত নাই। সৃষ্টির পর গৌরীর জন্মে গ্রন্থের আরম্ভ, এবং

অধ্যায়ে বিভক্ত করা যাইতে পারে। ইহার প্রত্যেক ঘটনাই বিশদরূপে ও বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

কবি বল-দুর্ল্লভ সুশিক্ষিত ছিলেন, সন্দেহ নাই। তাঁহার রচনা সর্ব্বত্রই সরল ও অনাড়ম্বর। সেকালের রচনা-পদ্ধতি ভিন্নরূপ; সুতরাং অনেকের নিকট তাঁহার গ্রন্থের সকল স্থান হৃদ্য ও আবশ্যক বোধ না হইতে পারে। * * * নিজের কাণা ছেলেকেও লোকে পদ্মলোচন মনে করে; অতএব এই কাব্যও সকলের রুচিকর না হউক, ইহা যে স্বধর্ম্মানুরাগী হিন্দুর বিশেষ প্রীতিকর হইবে, সে বিষয়ে সংশয় নাই। সমগ্র পুঁথিখানি আমরা "বঙ্গীয়-সাহিত্যপরিষদের "প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থাবলী"তে প্রকাশিত করিব, স্থির করিয়াছি।

ভাষার নমুনাস্বরূপ নিম্নে কিয়দংশ যথেচ্ছক্রমে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম; তাহা হইতে দুর্গা-বিজয়ের ভাষার পরিচয় পাওয়া যাইবে।—

মাএর নিকটে গৌরী খেলে রঙ্গসারি।
দৈত্যের চরিত্র জন্ম জানিলেন্ত গৌরী॥
দেখিলেন্ত দৈত্য আইসে পুরীর ভিতর।
আনলে পতঙ্গ পড়ে লোভের অন্তর॥
কটাক্ষ নআনে দেবী দেখে দৈত্যবল।
এক দিষ্টে চাহে দেবী হাসে খল খল॥
অতি ক্রোধ হৈআ দেবী সাজে রণ ভেশ (বেশ)।
রক্ত বস্ত্র পৈরে দেবী চাচরে বান্ধে কেশ॥
কিরীটি কুণ্ডল পৈরে মণি মুক্তাহার।
কেয়ুর কঙ্কণ পৈরে নানা অলঙ্কার॥
কটিতে কিঙ্কিণী শোভে চরণে নেপুর।
শব্দ শুনি ভয়ে পলাএ দৈত্য মহাসুর॥
খর্গ চর্ম্ম নাগপাশ ধনুক কুঠার।
ত্রিশূল অঙ্কুশ শর চক্র তিখ্ন (তীক্ষ্ণ) ধার॥
মহা শেল বজ্র গদা কালান্তক যম।
ত্রিভঙ্গ ললিত অঙ্গ সূর্য্য কোটি সম॥ ইত্যাদি

বলিতে ভুলিয়াছি, এই গ্রন্থে যতিভঙ্গাদি দোষ বড়ই অল্প। কবি যে

এই গ্রন্থের প্রাচীনত্বের প্রমাণস্বরূপ নিম্নে কয়েকটি অপ্রচলিত প্রয়োগের দৃষ্টান্ত সঙ্কলিত হইল।—

পাষণ্ডি—বাম, প্রতিকূল।

বাহুবলে শাসিলেন পৃথিবীমণ্ডল।
বিধাতা পাষণ্ডি হৈলে হরে বুদ্ধিবল॥

ভজ জন (=ভজে জন ?)—আশ্রিত জন; যে জন ভজিত।

পাত্রে হরিল রাজ্য দৈবের লিখন।
ভজ জন শ্রেষ্ঠ হৈল মুই আইলুম্ বন॥

রূপস—সুন্দর।

দেআল প্রাচীর করে দেখিতে রূপস।

উদ্ধমিয়া—উদ্ধারিয়া বা নাড়িয়া।

বাহু উদ্ধমিয়া বোলে হরের গোচর।

উর্দ্ধমশে—(?)

দিতি গর্ভে জন্ম দুই মুনির ঔরসে।
চণ্ড মুণ্ড নামে দৈত্য মহা উর্দ্ধমশে॥

অর্থ-সহিত নিম্নে কতকগুলি শব্দের উল্লেখমাত্র করিলাম। তাহাদের সহিত পাঠকগণ এখন সুপরিচিত,—সুতরাং দৃষ্টান্ত দিয়া প্রবন্ধ-কলেবর বর্দ্ধিত করিলাম না।

উপসন—উপস্থিত। আক্ষেমা—আক্ষেপ। অথান্তর—বিপদ্। কাকর—বিকল। লেঙ্গুর—লেজ। কাল—লাফ। সমসর—সমান। বেসাতি—ধন। চতুরা—চট্টগ্রামে 'বাহিরবাড়ী'কে 'চতুরা' বা 'ডেহরি' বলা হয়। কাকালি—কটিদেশ। বানা—পতাকা। লড়—দৌড়।

(ক) সপ্তমী বিভক্তির চিহ্ন যোগ না করিয়া প্রয়োগ; যথা,—

(১) দারা পুত্রে না দে অর্থ করিবারে বএ (ব্যয়)।
অপমান ভাবি বৈশ্য জাঅন্তি বন এ॥

(২) মৈষাসুর মহারাজা ভুবন দুর্জ্জয়।
তাহার সমান আর নাহি জগতএ॥

(খ) দ্বিতীয়া বিভক্তিতেও উক্তরূপ প্রয়োগ; যথা,—

(গ) সপ্তমী বিভক্তির চিহ্নের আদৌ অপ্রয়োগ; যথা,—

জিনিলে সুন্দরী পাইমু হেমন্ত পুরী হু।

(ঘ) করন্তি, যায়ন্তি প্রভৃতি ক্রিয়া-প্রয়োগ; যথা,—

(১) অঙ্কুশে হানিআ দৈত্য পেলাঅন্তি দূরে।

(২) চতুর্দ্দিগে দেবগণে গাঅন্তি কল্যাণ।

(৩) বেদান্ত জয়ন্তি মাএ (মায়)।

এ সকল ভিন্ন করন্ত, বোলেন্ত, নাশিমু, করিমু, করিলুন, করসি প্রভৃতি ক্রিয়া প্রায় সর্ব্বত্রই প্রযুক্ত হইয়াছে।

আমার, মোর, তোর, আমাদের প্রভৃতি সর্ব্বনাম পদগুলি যথাক্রমে আহ্মার, মোহর, তোহর, আহ্মারার রূপে ব্যবহৃত। বোধ হয়, 'মোহর' এবং 'তোহর' এই দুটি পদ যতির অনুরোধে সম্প্রসারণার্থই উক্তরূপে পরিণত হইয়াছে। এতদর্থে বর্ণ-বিশেষের সংযোগ আমরা অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থেও পাইয়াছি; যেমন, আউট—মাট; আউগে—আগে; আওয়াস—আবাস ইত্যাদি। শেষোক্ত পদে 'ব'-এর উচ্চারণ অবশ্য পালি ভাষার অনুযায়ী হইয়াছে।

প্রাচীন লিপিকরদিগের বর্ণ-বিন্যাস-প্রক্রিয়া কিরূপ অদ্ভুত, প্রাচীন-সাহিত্যানুশীলনকারিগণ তাহা বিলক্ষণ অবগত আছেন। 'এহলোক' (ইহলোক) শব্দকে এখন কেহ 'অেহলোক' রূপে লিখিলে হস্তিমূর্খ বলিয়া আমরা তাহাকে কতই উপহাস করিব! অথচ সেকালে এইরূপ বিপর্য্যয় একরূপ সাধারণ ছিল। তখন 'উ' বা 'উ'কার এবং 'র'ফলার কার্য্য অনেক স্থলেই কেবল 'ব'ফলা দিয়াই নিষ্পন্ন হইত। এই কথা মনে না থাকায়, অথবা এই পার্থক্য বুঝিতে না পারিয়া, সেকালের মূর্খ নকলনবিশ-গণ 'ব'ফলাকেও উকারে পরিণত করিয়া ফেলিয়াছেন! দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা 'তুরিত' ও 'তুরমান' শব্দদ্বয়ের উল্লেখ করিতেছি। শব্দগুলি অধিকাংশ পুঁথিতেই 'ত্বরিত' 'ত্বরমান' রূপে লিখিত আছে, আমাদের এইরূপ বিশ্বাস। উক্তবিধ নকল-কারকেরাই যেন শব্দগুলিকে 'তুরিত' ও 'তুরমান' করিল; কিন্তু আমাদের কোন কোন প্রাচীন গ্রন্থোদ্ধারকর্ত্তা যেখানে ঐ শব্দগুলি স্পষ্ট 'ত্বরিত' ও 'ত্বরমান' রূপে লিখিত আছে, সেখানেও কেন 'তুরিত' ও 'তুরমান লিখিলেন? ইঁহাদের কল্যাণে শব্দগুলির উচ্চারণও এখন

মৌলিকতার দাবী করিয়া বসিয়া আছে; কাহার সাধ্য তাহাদিগকে আর স্থানচ্যুত করে? অক্ষর-বিপর্য্যয় হেতু আরও কতকগুলি শব্দের এরূপ দশা ঘটিয়াছে; * কিন্তু বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহাদের প্রসঙ্গ অনাবশ্যক।

ফল কথা, ভাষায় যাঁহাদের অধিকার আছে, তাঁহাদের পক্ষে উক্ত 'উ' ও 'ব' ফলা ইত্যাদির বিভিন্নতা বুঝিতে তিলমাত্রও কষ্ট হয় না।

শ্রীআবদুল করিম।

গুজরাটে মারাঠা অধিকার।

ফতে সিং গায়কবাড় ১৭৭৮—১৭৮৯।

মাণাজী গায়কবাড় ১৭৮৯—১৭৯৩।

গোবিন্দ রাও গায়কবাড় (দ্বিতীয় বার) ১৭৯৩—১৮০০।

ফতে সিং গায়কবাড়ের সনন্দপ্রাপ্তির অতি অল্পদিন পরে ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দের ৩০ মার্চ্চ পেশোয়া ও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মধ্যে যুদ্ধ বিঘোষিত হইল।

---

* অন্যের কথা দূরে থাকুক, আমাদের 'প্রাচীন বাঙ্গালা-সাহিত্যে'র ইতিহাস-কার মাননীয় দীনেশ বাবুও এই ভ্রমের হস্ত অতিক্রম করিতে পারেন নাই। বিজ্ঞবর মিঃ গ্রিয়ার্সন সাহেবের মত গ্রহণ করিতে গিয়া, তিনি আমাদের চট্টগ্রামবাসী 'গাভুরালী' (বা গাবুরালী) শব্দকে 'গাভুরাণী' রূপে প্রচারিত করিয়া ভাষায় উহাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়াছেন। আমরা সপ্রমাণ করিতে পারিব, প্রাচীন পুঁথিতে অনেক স্থলে আকৃতি দেখিয়া 'ল' ও 'ন' এর পার্থক্য বুঝা কঠিন। লেখকের দোষে 'ন' সহজেই 'ল' হইতে পারে, ইহা কে না স্বীকার করিবেন? উক্ত শব্দটি 'মাণিকচন্দ্রের' গানের যে পদে আছে, তাহা এই;—"বান্ধিলাম বাঙ্গালা ঘর নাই পাড় (পড়ে) কালী। এমন বয়সে ছাড়ি যাও আমায় বৃথা গাভুরালী।" দৃষ্টিমাত্রই শব্দটিকে 'গাভুরালী বলা যায়; কিন্তু তাহা বুঝিতে গেলে অযথা বাগাড়ম্বর করা চলে কৈ? ইংরেজের কথা যে আমাদের বেদবাক্য। শব্দটি আমাদেরই ব্যবহৃত হইলেও, আমাদের কথা শুনে কে? তথাপি কর্ত্তব্যের অনুরোধে আমরা উক্ত শব্দ সম্বন্ধে ৮ম বর্ষের 'পূর্ণিমার' ৫ম—৬ষ্ঠ সংখ্যায় এবং ১৩০৯ সালের ৩০শে শ্রাবণের 'এডুকেশন গেজেটে' আমাদের বক্তব্য

এই যুদ্ধে বোম্বাই গভর্ণর হরণ্‌বি গায়কবাড়ের সহায়তা-গ্রহণের জন্য ব্যগ্র হইলেন। কারণ তিনি জানিতেন, সমুদ্রপথে বৃটীশ সৈন্যগণের পশ্চিম-ভারত-সীমায় অবতরণের পক্ষে গায়কবাড়ের রাজ্যসীমা বিশেষ অনুকূল হইবে; অথচ পশ্চিম-ভারত ও দক্ষিণাপথের মধ্যে এমন উচ্চ গিরি-শ্রেণী নাই, যাহা ইংরেজ সৈন্যগণের রণযাত্রার পক্ষে বিঘ্ন জন্মাইতে পারে। তদনুসারে গভর্ণর হরণ্‌বি ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জুন কলিকাতার গভর্মেণ্টকে জ্ঞাত করিলেন যে, "এই জন্য গুজরাটে পেশোয়ার অধিকার বিলুপ্ত করিয়া, মাহী নদীর উত্তর হইতে গুজরাটের সমস্ত ভূখণ্ড ফতে সিংএর রাজ্যসীমাভুক্ত করা হউক, এবং তাপ্তী নদীর দক্ষিণসীমাস্থ সমস্ত ভূভাগ ইংরেজ গভর্মেণ্টের করতলগত হউক।" মনে মনে এইরূপ লঙ্কা ভাগ করিয়া গভর্ণর সাহেব যে রিপোর্ট প্রেরণ করিলেন, কলিকাতা গভর্মেণ্টের নিকট তাহা বিশেষ যুক্তি-সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইল। তদনুসারে ঐ সালের শেষভাগে (১৫ ডিসেম্বর) কর্ণেল গডার্ড তাঁহার অধীন বঙ্গীয় ফৌজ সঙ্গে লইয়া বোম্বাই সৈন্যদলের সহিত যোগদান করিলেন, এবং সসৈন্যে দ্রুতবেগে দাভয়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তৎকালে দুই সহস্র পেশোয়া সৈন্য দাভয়ে অপেক্ষা করিতেছিল। গডার্ড তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া দাভয় অধিকার করিলেন; তাহার পর একবারে বরদায় আসিয়া পঁহুছিলেন। ফতে সিং ইতঃপূর্ব্বে নানা ফড়নবিশের নিকট হইতে পুনঃপুনঃ পত্র পাইয়াছিলেন যে, তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে স্থায়ী মিত্রতা-স্থাপন একান্ত আবশ্যক। এই প্রস্তাব ফতে সিংহের অনভিপ্রেত ছিল না, কিন্তু দ্বার-সমাগত বৃটীশ-কেশরীর হুঙ্কার শ্রবণ করিয়া তাঁহার সে অভিপ্রায়-সিদ্ধির পক্ষে যথেষ্ট ব্যাঘাত উপস্থিত হইল। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দের ২৬এ জানুয়ারি তিনি ইংরেজদিগের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন; এই সন্ধি কান্দিলার সন্ধি নামে খ্যাত। গায়কবাড় রাজ্যের ইতিহাসে এই সন্ধি সবিশেষ প্রসিদ্ধ; কারণ, প্রকৃতপ্রস্তাবে ইংরেজের সহিত গায়কবাড়ের ইহা একটি প্রধান সন্ধি, এবং উভয় রাজার মধ্যে ভবিষ্যৎ আত্মীয়তা-বন্ধনের ইহাই মূল।

এই সন্ধিতে স্থিরীকৃত হইল যে, ফতে সিং রাও স্বাধীন হইলেন, তাঁহাকে আর পেশোয়ার বশ্যতা স্বীকার করিতে হইবে না, এবং পেশোয়াকে কোন প্রকার রাজকর দান করিতেও হইবে না। গুজরাটের যে রাজস্ব

তিনি তাহা সেইরূপই গ্রহণ করিতে থাকিবেন। কেবল তিনি পেশোয়াকে গুজরাটের যে রাজস্বাংশ প্রদান করিতেন, অতঃপর তাহা ইংরেজ কোম্পানী বাহাদুরকে প্রদান করিতে হইবে। তাহার পর যাহাতে উভয়ের রাজস্ব নির্ব্বিবাদে স্ব স্ব গৃহে সমাগত হয়, এবং অংশ লইয়া কোন প্রকার মনোমালিন্য ঘটিতে না পারে, এই জন্য পরে অধিকারসীমার একটা বাটোয়ারার প্রস্তাবও এই সন্ধিপত্রে থাকিল। এতদ্ভিন্ন এই সন্ধির সর্ত্তানুসারে ফতেসিং রাও ইংরাজের বন্ধুরূপে পরিগণিত হইলেন। এই বন্ধুতার নিদর্শন-স্বরূপ তিনি যুদ্ধকালে ইংরাজকে তিন হাজার, এবং আবশ্যক হইলে তদপেক্ষাও অধিকসংখ্যক অশ্বারোহী সৈন্য দিয়া সাহায্য করিবেন। আর ফতেসিং সিনর এবং কতিপয় গ্রাম ব্রোচ পরগণার সামিল করিয়া দিবেন; এবং আহম্মদনগর অধিকারভুক্ত হইলেই ফতেসিং কোম্পানীর জন্য ব্রোচ পরগণায় আরও কতিপয় গ্রাম সংযুক্ত করিবেন—ইত্যাদি। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দের ১৫ই ফেব্রুয়ারী আহম্মদনগর অধিকারপূর্ব্বক ইংরাজ তাহা ফতেসিংকে প্রদান করিলেন; ফতেসিংও সন্ধির সর্ত্তানুসারে কতকগুলি গ্রাম ইংরেজদের হস্তে সমর্পণ করিলেন।

আহম্মদনগর অধিকারের দুই সপ্তাহের মধ্যে (২৯এ ফেব্রুয়ারি) পেশোয়ার বন্ধু সিন্ধিয়া ও হোলকার উভয়ের সম্মিলিত সৈন্যের সহিত নর্ম্মদা পার হইলেন, এবং ৭ই মার্চ্চ দাভয়ের সন্নিকটে শিবিরসংস্থাপন করিলেন। 'Oriental Memoirs' নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থের প্রণেতা মিঃ ফর্বস শত্রু-সৈন্যের হস্ত হইতে দাভয় নগর বিশেষ সতর্কতা ও নৈপুণ্যের সহিত রক্ষা করিতে লাগিলেন, এবং এই অবসরে গডার্ড শত্রু সৈন্যের সম্মুখীন হইবার জন্য মাহি নদী অতিক্রমপূর্ব্বক বাসদ নামক স্থানে যাত্রা করিলেন। ৮ই মার্চ্চ তিনি বরোদায় উপস্থিত হইলেন; শত্রু-সৈন্য তখন দাভয়ের কিঞ্চিৎ দক্ষিণে তেনতালাব নামক স্থানে আসিয়া পঁহুছিয়াছিল। সিন্ধিয়া সন্ধির ছলনায় যুদ্ধ স্থগিত রাখিবার ইচ্ছা করিলেন; কারণ, তাঁহার মনে হইয়াছিল, অন্ততঃ গোবিন্দ রাওর সহিত যোগ দিতে পারিলেও তিনি অপেক্ষাকৃত প্রবল হইতে পারিবেন। ফতেসিংকেও তিনি স্বপক্ষে লইবার জন্য চেষ্টার ত্রুটী করেন নাই, কিন্তু ফতেসিং ইংরেজের বন্ধুত্ব হইতে বিচলিত হইলেন না।

এদিকে সিন্ধিয়া কয়েক দিন ধরিয়া পাওয়াগড় নামক গিরি-দুর্গে তাঁহার দ্রব্যরাজি সংরক্ষিত করিলেন, এবং তাহার পর পাওয়াগড়ের নিম্নে

২৭এ মার্চ্চ ইংরেজ সৈন্য ছয় মাইল দূরে আসিয়া ছাউনি করিল, এবং ৪ঠা এপ্রিল গডার্ড সিন্ধিয়ার শিবির রাত্রিযোগে আক্রমণ করিলেন, কিন্তু সাহেবের এ আক্রমণ আশানুরূপ ফলপ্রদ হইল না। কারণ, প্রহরিগণ বিশেষ সতর্ক ছিল। রাত্রির মধ্যেই সিন্ধিয়ার সৈন্যদল ছাউনি কয়েক মাইল দূরে লইয়া গেল। ১৯এ এপ্রিল গডার্ড পুনর্ব্বার সিন্ধিয়া সৈন্য আক্রমণ করিলেন, কিন্তু সে আক্রমণও ব্যর্থ হইল। এ পর্য্যন্ত ফতেসিং রাও বরোদা নগর সংরক্ষণে ব্যস্ত ছিলেন, তাঁহার সহযোগিবর্গ সৈন্যের সাহায্য প্রার্থনা করিলে তিনি অবিলম্বে তাঁহার ভ্রাতা মানাজীর অধিনায়কত্বে পাঁচ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য প্রেরণ করিলেন। কিন্তু এই সকল সৈন্য সহায়তায় ইংরেজগণ আর সিন্ধিয়াকে আক্রমণ করিবার অবসর পাইলেন না, কারণ, ভারত গবর্মেণ্টের এই সময় আশঙ্কা হইয়াছিল যে, হয় ত হয়দার আলী ও নিজাম প্রধান মারাঠা শক্তিপুঞ্জের সহিত সম্মিলিত হইয়া অচিরে ভারত হইতে নবপ্রতিষ্ঠিত বৃটীশ রাজ্য উৎসারিত করিবার চেষ্টা করিবেন, সুতরাং ভারত গবর্মেণ্টের চেষ্টা ও যত্নে যুদ্ধ বন্ধ হইয়া গেল, আবার এক সন্ধি স্থাপিত হইল।

এই নূতন সন্ধির নাম 'সালবাই' সন্ধি। ১৭৮২ খৃষ্টাব্দের ১৭ই মে এই সন্ধি সংঘটিত হয়। এই সন্ধির সর্ত্ত অনুসারে গায়কবাড় এই যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে যে সকল রাজ্যে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাহাতে তাঁহার অক্ষুণ্ণ অধিকার বর্ত্তমান থাকিল। গায়কবাড়ের নিকট যে রাজস্ব বাকি ছিল, তাহা আর দাওয়া করা হইল না, আহম্মদাবাদ বৃটীশ গবর্মেণ্টকে ছাড়িয়া দিতে হইল। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ৩১এ অক্টোবর হইতে আহম্মদাবাদ বৃটীশ শাসনভুক্ত হইয়াছে।

প্রকৃতপ্রস্তাবে গায়কবাড়ের রাজ্যসীমায় পেশোয়া ও ইংরেজের মধ্যে যে দুই যুদ্ধ হয়, তাহাতে গায়কবাড়ের বিশেষ সংস্রব ছিল না। কিন্তু নব সন্ধিতে তাঁহার বিলক্ষণ ক্ষতিই হইল। আহম্মদাবাদ গেল, ব্রোচ গেল—ব্রোচের যে রাজস্ব তিনি পাইতেছিলেন, বৃটীশ গবর্মেণ্টের মনোরক্ষার জন্য তাহা সিন্ধিয়াকে ছাড়িয়া দিতে হইল, তদ্ভিন্ন বিস্তর অর্থব্যয়ে তাঁহার ধনভাণ্ডার একেবারে শূন্য হইয়া পড়িল। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দের ২০এ ডিসেম্বর ফতেসিং গায়কবাড়ের মৃত্যু হইল। তদীয় প্রাসাদের দ্বিতীয় তল হইতে পদস্খলনে পতনই তাঁহার মৃত্যুর কারণ। তাঁহার শেষ কয়েক বৎসর রাজ্যশাসনের মধ্যে শৃঙ্খলা ও শাসনানৈপুণ্যের অভাব লক্ষিত হয়, এবং রাজ্যের ব্যয়ভার এত অধিক ও অনাবশ্যকরূপে বর্দ্ধিত হয় যে, অতঃপর তাহা হ্রাস করিবার জন্য পরবর্ত্তী গায়ক-

বাড়গণকে বিশেষ চেষ্টা করিতে হইয়াছিল। ফতেসিংরাও সাহসী, উৎসাহশীল, তীক্ষবুদ্ধি ও তেজস্বী নরপতি ছিলেন। কিন্তু "Oriental memoirs" নামক গ্রন্থের প্রণেতা মিঃ ফরবস পশ্চিমভারতের মেকলে; তিনি এই তেজস্বী স্বাধীনপ্রকৃতিসম্পন্ন নরপতিকে অতি কৃষ্ণবর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন। কারণ কি বলা যায় না। বোধ হয়, ইহা সহানুভূতির অভাব, তাহার উপর জাতীয় শৌর্য্য বীর্য্য সাহেবনন্দনদিগের বিশেষ প্রীতিকর নয়। ফরবস সাহেবের এ ত্রুটী যে শুধু আমরাই লক্ষ্য করিতেছি, তাহা নহে। বর্ত্তমান মহারাজার সুযোগ্য শিক্ষক মিঃ এলিয়টই লিখিয়াছেন,—Mr. Forbes, who in his Oriental Memoirs seldom has a good word for a maratha makes out Fateh Sing to have been a suspicious tyrant. (Bombay Gazeteer, Guzerat. pp. 198. footnote)—মিঃ এলিয়ট বোম্বে অঞ্চলের উপরওয়ালা মহলের অপ্রিয় হইয়াছিলেন!

ফতেসিংরাও গায়কবাড়ের মৃত্যুর পর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মানাজি তৎপদে প্রতিষ্ঠিত হন। এই সময় গোবিন্দ রাও পুণার সন্নিকটে দার নামক গ্রামে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করিতেছিলেন। ভ্রাতার মৃত্যুতে তিনি আর একবার সিংহাসন দখলের চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইলেন না। তাঁহার কৃতকার্য্য না হইবার প্রধান কারণ এই যে, তখন তিনি নিতান্ত নিঃস্বভাবে কালযাপন করিতেছিলেন। এ দিকে মানাজীরাও পৈতৃক গদী ও উত্তরাধিকারিত্ব লাভ করিবার জন্য পেশোয়াকে ৩৩ লক্ষ ১৩ হাজার টাকা নজর দান করিলেন, এবং ফতেসিং রাওর রাজস্ব বাকি বাবদ ৩৬ লক্ষ টাকা প্রদানের অঙ্গীকার করিলেন।

কিন্তু গোবিন্দ রাও নিশ্চিন্ত ছিলেন না। তিনি সিন্ধিয়ার নিকট সহায়তা প্রার্থনা করিলেন। মহাজীরাও সিন্ধিয়া গায়কবাড়ের গৃহবিচ্ছেদে হস্তক্ষেপ করিবার এই সুযোগ পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। কাজেই পুণা দরবারের সহিত সিন্ধিয়ার বিরোধ ঘনীভূত হইয়া উঠিল। কিন্তু ইহাতে কোন যুদ্ধ সংঘটিত হইবার অবসর হয় নাই। তথাপি একদিনের জন্যও বিবাদের বিরাম ছিল না। অবশেষে উভয় পক্ষ ইংরেজ গবর্মেণ্টকে সালিশ মানিলেন। বোম্বে গবর্মেণ্ট মধ্যস্থতা করিতে অস্বীকৃত হইলেন। কিছু দিন পরে সিন্ধিয়াও বিরক্ত হইয়া গোবিন্দ রাওর পক্ষ পরিত্যাগ করিলেন।

১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের ১লা অগষ্ট মানাজী গায়কবাড়ের মৃত্যু হইলে গোবিন্দ

রাও আর একবার প্রাণপণে গায়কবাড়ী লাভের চেষ্টা করিলেন। পুণা দরবার দেখিল, কিছু টাকা উপায়ের ইহা একটি উত্তম সুযোগ। সুতরাং পেশোয়া গোবিন্দ রাওকে আদেশ প্রদান করিলেন যে, তিনি যদি মানাজী রাওর আমলের বাকী রাজস্ব বিশ লক্ষ টাকা, সনন্দলাভের নজর ৫৬ লক্ষ ৩৮ হাজার ১ টাকা, এবং দুই বৎসরের (১৭৯১—৯৩) রাজকর ১৪ লক্ষ ৫৪ হাজার টাকা অবিলম্বে পুণা রাজদরবারে আমানত করিতে পারেন, তাহা হইলেই তাঁহাকে দক্ষিণাবর্ত্ত ত্যাগ করিতে দেওয়া হইবে। কিন্তু ইহাতেই তিনি অব্যাহতি পাইবেন না। বরোদায় উপস্থিত হইয়া রাজপ্রাসাদে যত কিছু মণি মুক্তা হীরকাদি ও বহুমূল্য বস্ত্র সংরক্ষিত আছে, সমস্ত পেশোয়ার নিকট উপহার পাঠাইতে হইবে। তিনটি হাতী, পাঁচটি অশ্ব দিতে হইবে। তাপ্তি নদীর দক্ষিণে গায়কবাড়ের যে কিছু ভূসম্পত্তি আছে, তাহাও বিনা প্রতিবাদে ছাড়িতে হইবে। বস্তুতঃ, নানা ফড়নবিশ গায়কবাড় পরিবারের যথাসর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু ইংরাজ গবর্মেণ্ট হস্তক্ষেপ করায় পেশোয়ার মন্ত্রীর দুরাশা পূর্ণ হইল না। ইংরাজ গবর্মেণ্ট অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত পেশোয়াকে জ্ঞাপন করিলেন যে, সালবাইএর সন্ধি অনুসারে পেশোয়া গায়কবাড়ের উপর এই সকল দাবী করিতে পারেন না।

যাহা হউক, এই সকল বিঘ্ন বিপত্তির অবসানে গোবিন্দ রাও ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের ১৯এ ডিসেম্বর 'সেনা খাসখেল' পদবী লাভ করিয়া বরোদা যাত্রা করিলেন। কিন্তু তখনও তাঁহার সমস্ত বিবাদের অবসান হয় নাই। বরোদার সন্নিকটে আসিয়া তাঁহাকে আর এক প্রবল বিপক্ষের সহিত সংগ্রাম করিতে হইল।—এ ব্যক্তি আর কেহ নহে, তাঁহারই উপপত্নী গজরা বাইর গর্ভজাত পুত্র কাণোজী; উপপত্নী হইলেও গজরা বাই রাজকন্যা, ধরমপুর নামক ক্ষুদ্র রাজপুত রাজ্যের অধিপতির তনয়া; সুতরাং তাহার পৃষ্ঠবলের অভাব ছিল না। গজরাবাই রাজমাতা হইবার প্রলোভনে নানা উপায়ে কাণোজীকে সাহায্য করিতে লাগিল। সিন্ধিয়ার ব্রোচস্থ প্রতিনিধিও তাহাকে সাহায্য করিয়াছিল। নানা দিক হইতে সাহায্য পাইয়া কাণোজী দুই সহস্র আরব ও ছয় শত পাঠান অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া বরোদা নগর পূর্ব্ব হইতেই দখল করিয়া বসিয়াছিল।—যাহা হউক, তাহাকে শাসন করিতে গোবিন্দ রাওর বিলম্ব হইল না। পাঠান ও আরব সৈন্যেরা কাণোজীর প্রভুত্বে বিরক্ত হইয়া সহজেই বিশ্বাসঘাতকতা করিল;

কারাগারে বাস করিতে হয় নাই। সে স্ত্রীলোকের পরিচ্ছদ পরিধান পূর্ব্বক এক দিন কৌশলক্রমে কারাগার হইতে পলায়ন করিল, এবং পার্ব্বত্য প্রদেশে গিয়া ভীলদিগের সহিত সম্মিলিত হইল।

কাণোজীর সহায়তা পাইয়া দুর্ব্বৃত্ত ভীলগণ সাংখেড়া, বাহাদুরপুর প্রভৃতি বরোদার সন্নিকটবর্ত্তী স্থান সকল লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করিল। অবশেষে কাণোজী কাড়ীর জায়গীরদার খাণ্ডি রাওর পুত্র মলহর রাওর সহিত সম্মিলিত হইয়া দেশমধ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত করিল। ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে খাণ্ডিরাওর মৃত্যু হইয়াছিল। তাহার মৃত্যুর পর মলহর রাও পৈতৃক জায়গীর লাভ করিয়াছিলেন। তিনি গোবিন্দ রাওকে গায়কবাড়ের গদী লাভ করিতে দেখিয়া মনে মনে স্থির করিলেন যে, তাঁহার পিতা খাণ্ডিরাও যখন গোবিন্দ রাওকে তাঁহার বিপৎকালে সাহায্য করিয়াছিলেন, তখন তিনি তাঁহার জায়গীরের বার্ষিক 'পেশকশ' এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা রেহাই পাইবার অধিকারী।—গোবিন্দ রাও হয় ত এ টাকার জন্য মলহর রাওর প্রতি কিছু পীড়াপীড়ি করিতেন না, কিন্তু মলহর রাও গায়কবাড়ের প্রতি সমুচিত সৌজন্য ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন না করায়, তিনি বিরক্ত হইয়া বাকি টাকার জন্য পুনঃপুনঃ তলব দিতে লাগিলেন। এই সমস্ত কাড়ী জায়গীরের বার্ষিক উপস্বত্ব প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ টাকায় পরিণত হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন কপাটভঞ্জ ও দেওগাঁর আয় বার্ষিক এক লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা ছিল।

মলহর রাও যখন দেখিলেন, গোবিন্দ রাও কিছুতেই তাঁহার প্রাপ্য টাকা না লইয়া ছাড়িবেন না, তখন তিনি কাণোজীর সহিত মিলিয়া বরোদা রাজ্যের নানাবিধ ক্ষতি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বস্তুতঃ মলহর রাও ও কাণোজীর অত্যাচারে বরোদা রাজ্যের প্রজাসাধারণ ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। এমন কি, কাড়ীর সন্নিকট হইতে ইহারা গায়কবাড় সৈন্যগণকে তিনবার বিতাড়িত করিয়া দিয়াছিলেন। অবশেষে গোবিন্দ রাও শত্রুদমনের উপায় না দেখিয়া কাণোজী ও মলহর রাওর মধ্যে বন্ধুবিচ্ছেদ ঘটাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কার্য্যসিদ্ধি হইতেও বিলম্ব হইল না।

জায়গীরদার মলহর রাও একদিন একখানি পত্র কুড়াইয়া পাইলেন। পত্রখানি কাণোজীর হাতের লেখা বলিয়া তাঁহার বোধ হইল। তাহার্তে লেখা ছিল যে, কাণোজী মলহর রাওর বিশ্বাসভাজন হইতে সম্পূর্ণ সক্ষম হইয়াছে; মলহর

হর রাও এই পত্র পাঠ করিয়া অত্যন্ত বিচলিত হইলেন। এ পত্র যে সম্পূর্ণ জাল, তাহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য কাণোজী বিশেষ চেষ্টা করিলেও মলহর রাওর সন্দেহ বিদূরিত হইল না। তিনি কাণোজীর বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিফল-দানের জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন; কাণোজী তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া সাতপুরা পাহাড়ে পলায়ন করিল। কিন্তু গায়কবাড় তাহাকে কারাবদ্ধ না করিয়া আর নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। তাহাকে স্তোকবাক্যে ভুলাইয়া আনিয়া বন্দী করিলেন। ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে মলহররাও গায়কবাড়ের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন। তদনুসারে তাঁহাকে সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকা জরিমানা ও এক লক্ষ পনের হাজার টাকা বার্ষিক পেশকশ দিতে হইল। মলহররাও অতঃপর অনেকদিন পর্য্যন্ত গায়কবাড়ের অনুগত ছিলেন। এমন কি, যখন গয়কবাড়ের সহিত নানা ফড়নবিশের সহযোগী আবা সেলুকারের বিরোধ উপস্থিত হয়, তখন তিনি গায়কবাড়ের যথেষ্ট সাহায্যও করিয়াছিলেন।

১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে গায়কবাড় গোবিন্দরাও কাম্বে জয় করিবার উদ্যোগ করেন। কিন্তু বৃটীশ গবর্মেণ্টের অনুরোধে তাঁহাকে সে চেষ্টা পরিত্যাগ করিতে হয়। ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দের ১১ই মার্চ্চ কারডালা ক্ষেত্রে নিজাম সৈন্যের সহিত গায়কবাড় সৈন্যের এক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে নিজামী সৈন্যগণ সম্পূর্ণ পরাভূত হইয়া পলায়ন করে।

আমরা এখন গোবিন্দরাও গায়কবাড়ের রাজত্বকালের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশ করিব।

আমরা উপরে আবা সেলুকারের নাম উল্লেখ করিয়াছি। ইনি বাজিরাও পেশোয়ার মনোনীত আহম্মদাবাদ পত্তনী মহলের সুবা (কালেক্টর) চিমাজি-পন্থের প্রতিনিধি ছিলেন। আবা সেলুকার নানা ফড়নবিশের লোক। বাজী-রাওর সহিত তাঁহার (ফড়নবিশের) বিবাদ উপস্থিত হইলে, পেশোয়া গোবিন্দ রাওকে অনুরোধ করেন, যেন তিনি অবিলম্বে আহম্মদাবাদের পত্তনী তালুক দখল করিয়া আবা সেলুকারকে আহম্মদাবাদ হইতে বিদূরিত করিয়া দেন। পেশোয়ার অনুরোধপত্র পাইবামাত্র গায়কবাড় পেতলাদ নামক স্থানে (আহ-ম্মদাবাদের সন্নিকটে) উপস্থিত হইলেন। আবার সহিত গোবিন্দ রাওর কোন শত্রুতা ছিল না। তিনি পেশোয়াকে অনুরোধ করিলেন যে, যদি আবা দশ লক্ষ টাকা প্রদান করিতে সম্মত হয়, তাহা হইলে তাহাকে আর আহম্মদাবাদ হইতে

টানি; এ প্রস্তাব তিনি যুক্তিসঙ্গত জ্ঞান করিলেন। কিন্তু আবার ঐ টাকা দিবার সামর্থ্য ছিল না। তখন গোবিন্দ রাওর সুবিখ্যাত প্রভু (বঙ্গদেশীয় কায়স্থের সমশ্রেণীর জাতি) মন্ত্রী রাওজি আপ্পাজি এই টাকা প্রদান করিবার জন্য প্রতিভূ হইলেন। আবার সহিত বন্দোবস্ত হইল যে, তিনি প্রত্যুপকারস্বরূপ আপ্পাজীর ভ্রাতাকে পেতলাদের জায়গীর প্রদান করিবেন। রাওজী আপ্পাজীর এই ভ্রাতার নাম বাবাজী রাও; তিনি গায়কবাড়ের সেনানায়ক ছিলেন।

এ স্থানে প্রসঙ্গক্রমে এ কথা বলা আবশ্যক যে, রাওজি আপ্পাজি, বাবাজী এবং তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র সীতারাম ভবিষ্যৎকালে বরোদা রাজ্যের ইতিহাসে অতি প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। গোবিন্দ রাওর সহিত ইঁহারা দক্ষিণাপথ হইতে বরোদা রাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হন। গোবিন্দরাও নির্ব্বাসন হইতে মুক্তি পাইবার পর অনেকেই তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছিলেন। ইঁহাদের দুই চারি জনের বংশধরগণ এখনও বরোদা রাজ্যে অতি উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত আছেন। গোবিন্দ রাও গদী লাভ করিবার পর ফতেসিং ও মানাজীর অনেক বিশ্বস্ত ভৃত্য বিতাড়িত হইয়াছিল। কারণ, তাহারা পূর্ব্বে গোবিন্দ রাওর পক্ষসমর্থন করে নাই।

যাহা হউক, আপ্পাজি আবা সেলুকারের প্রতিভূ হইলেও কিছু দিনের মধ্যে টাকা আদায় লইয়া বিবাদ উপস্থিত হইল; এবং সেলুকারের নিকট দশ লক্ষ টাকা আদায় করা আপ্পাজির পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠিল। আপ্পাজী তখন গায়কবাড়ের নিকট অভিযোগ উপস্থিত করিলেন। সেলুকার গোবিন্দরাওর সহিত সর্ব্বপ্রকার বাধ্যবাধকতা ছিন্ন করিয়া গায়কবাড়ের রাজ্য আক্রমণ করিলেন। বরোদার রাজ্যসীমার মধ্যে অনেক সম্ভ্রান্ত গোঁসাইর বাস। ইঁহারা এক এক জন খুব ধনাঢ্য। আবা সেলুকার এই সকল গোঁসাইদিগকে আক্রমণপূর্ব্বক তাঁহাদের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লইলেন। গোবিন্দরাও ক্রুদ্ধ হইয়া আবা সেলুকারকে আদেশ প্রদান করিলেন যে, তিনি যেন অবিলম্বে এই সকল লুণ্ঠিত অর্থ প্রত্যর্পণ করেন; নতুবা তাঁহার মঙ্গল নাই। আবা সেলুকার গোবিন্দরাওর নিকট মঙ্গলের আশা করিতেন না, তিনি গায়কবাড়ের আদেশ অগ্রাহ্য করিলেন। অগত্যা অবিলম্বে ঘোর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। এই যুদ্ধে গায়কবাড়ের সেনাপতি

রাও আবার সৈন্যদলকে পরাভূত করিয়া দিলেন; আর একটি যুদ্ধেও আবা সেলুকার পরাস্ত হইলেন।

ইতোমধ্যে (১৮০০ খৃষ্টাব্দে) নানা ফড়নবিশের মৃত্যু হইল। এই সময় গোবিন্দরাও আবা সেলুকারের দুর্ব্যবহারের কথা পেশোয়ার গোচর করিলেন, পেশোয়া ফড়নবিশকে ভয় করিতেন; তাঁহার মৃত্যুর পর পেশোয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন; তিনি গোবিন্দরাওকে আদেশ দিলেন,—'কণ্টক বিনাশ কর।' চারি মাস কাল যুদ্ধের পর আবা সেলুকারের আরব সৈন্যগণ বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক গোবিন্দ রাওর হস্তে তাঁহাকে সমর্পণ করিলেন। আবা সেলুকার কারারুদ্ধ হইলেন।

এই বিবাদ এই প্রকারে শেষ হইলে পুণা দরবার গোবিন্দ রাওর প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে এক সনন্দ দান করিলেন। এই সনন্দে আহম্মদাবাদের পত্তনী মহলের রাজস্ব পাঁচ লক্ষ টাকা তাঁহার উপপত্নীগর্ভজাত প্রিয় পুত্র ভগবন্তরাওকে পাঁচ বৎসরের মেয়াদে মঞ্জুর করা হইল। কিন্তু কথা থাকিল, প্রথম দুই বৎসরের রাজস্ব সিদ্ধিয়া পাইবেন। রাজস্বের পরিমাণ পাঁচ লক্ষ মুদ্রা হইলেও, কোন বৎসরই সাড়ে তিন লক্ষ টাকার অধিক আদায় হয় নাই। ১৮০০ খৃষ্টাব্দের ১৯এ সেপ্টেম্বর গোবিন্দ রাওর মৃত্যু হওয়ায় রাজ্যের মধ্যে আবার নানাপ্রকার বিশৃঙ্খলার সূত্রপাত হইল।

ভেনিস্‌দেশীয় বণিক।

"ভেনিস্‌দেশীয় বণিক" সেক্ষপীয়রের একখানি শ্রেষ্ঠ নাটক বলিয়া পরিগণিত। অনেক সমালোচক এই নাটকখানির বিস্তর স্তুতিবাদ করিয়াছেন। কেহ কেহ ইহার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাও করিয়াছেন। সেক্ষপীয়র বাঁচিয়া থাকিলে না জানি কতই আনন্দিত হইতেন! *

প্রশংসার পরিমাণ অপরিসীম। সুতরাং আমার লেখনী হইতে প্রশংসা উদ্‌গিরিত না হইলেও নাটকখানির অমরত্ব অক্ষুণ্ণ থাকিবে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। আমি ত্রুটী দেখাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, এ কথা শুনিলে অনেকে হয় ত আমাকে উন্মত্ত বিবেচনা করিবেন। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর স্বাধীনতার জন্য

কাব্যের সমালোচনা নিতান্ত ধৃষ্টতার পরিচয় বলিয়া পরিগণিত না হইতেও পারে।

নাটকের নাম "ভেনিস্‌দেশীয় বণিক"। নায়ক এণ্টোনিও সেই বণিক। রোম্যান্‌-জাতি-সুলভ যাবতীয় সদ্‌গুণের আধার এই এণ্টোনিওর ব্যাসানিও নামক এক অকর্ম্মণ্য ব্যক্তি প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তম বন্ধু ছিলেন। ঐ বন্ধুটি আপনার যথাসর্ব্বস্ব বদ্‌খেয়ালিতে উড়াইয়া দিয়া মনে মনে স্থির করিলেন যে, বেল্‌মণ্টদেশীয়া পিতৃ-মাতৃহীনা ধনশালিনী এক যুবতীর পাণিগ্রহণ করিয়া আপনার অবস্থার উন্নতিসাধন করিবেন। কিন্তু উত্তমরূপ সাজসজ্জা ও ধুমধাম ব্যতীত কিরূপে ঐ নারীর পাণিপ্রার্থনা করিতে যাইবেন, এই এক বিষম সমস্যা উপস্থিত হইল। তিনি বন্ধু এণ্টোনিওর নিকট সকল কথা খুলিয়া বলিলেন, এবং তিন হাজার ডকাট্‌ ধার চাহিলেন। তিন হাজার ডকাট্‌ কত টাকা, ঠিক জানি না; কিছু বেশীই হইবে; কারণ, "ভেনিস্‌দেশীয় বণিকের" তহবিলে তত টাকার সংকুলন হইল না। তখন দুই বন্ধুতে মিলিয়া এণ্টোনিওর চিরশত্রু ইহুদী শাইলকের শরণাপন্ন হইলেন, এবং বন্ধুর জন্য এণ্টোনিও তিন হাজার ডকাট্‌ কর্জ্জ লইলেন। দলিলে লেখা হইল যে, যদি নির্দ্দিষ্ট দিনের মধ্যে এণ্টোনিও ঐ টাকা পরিশোধ না করেন, তাহা হইলে শাইলক তাঁহার বক্ষঃস্থল হইতে আধ সের মাংস কাটিয়া লইবে।

ব্যাসানিও টাকা পাইয়া খুব সমারোহে বেল্‌মণ্ট যাত্রা করিলেন, এবং সৌভাগ্যক্রমে ধনিদুহিতা পোর্ষিয়ার পাণিগ্রহণে কৃতকার্য্য হইলেন। কিন্তু বিধাতা বড় সাধে বাদ সাধিলেন; উৎসবের মধ্যে ব্যাসানিও এণ্টোনিওর পত্র পাইলেন যে, তাঁহার বাণিজ্যপোত সকল নষ্ট হইয়া যাওয়ায় তিনি সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন, এবং শাইলক তাঁহাকে রাজদ্বারে অভিযুক্ত করিয়াছে।

তখন ব্যাসানিও পোর্ষিয়ার নিকট সকল কথা খুলিয়া বলিলেন, এবং ঋণের বহু গুণ অর্থ লইয়া এণ্টোনিওর নিকট উপস্থিত হইলেন। শাইলক অর্থ লইতে অস্বীকৃত হইল, এবং এণ্টোনিওর আধ সের মাংসের জন্য লোলুপ হইল। ইতি-মধ্যে পোর্ষিয়া এক উকীল সাজিয়া গিয়া বলিল যে, দলীল অনুসারে শাইলক আধ সের মাংস লইতে পারে, কিন্তু এক ফোঁটা রক্ত কিংবা একগাছি লোম যদি লয়, তবে এক জন খ্রীষ্টানকে হত্যা করিবার অপরাধে তাহার প্রাণদণ্ড হইবে। এইরূপে এণ্টোনিও পোর্ষিয়ার বুদ্ধিকৌশলে বাঁচিয়া গেলেন, এবং ব্যাসানিওর সহিত পোর্ষিয়ার বাটীতে গিয়া যথোচিত সমাদৃত হইলেন।

মূল গল্পটি এই। ইহার মধ্যে একটি অবান্তর ঘটনা ঘটিয়াছিল। শাইলকের কন্যা জেসিকা এণ্টোনিওর অপর এক বন্ধু লোরেঞ্জোর প্রেমে আকৃষ্টা হইয়া পিতার বিস্তর অর্থ হরণ করিয়া তাহার সহিত পলায়ন করে, এবং কৃপণ শাইলক কন্যা ও অর্থের শোকে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়ে।

গল্পটি অবশ্য সকলেই জানেন, তথাপি আলোচনার সুবিধার জন্য সংক্ষেপে বলিতে হইল। এক্ষণে দেখা যাউক যে, নায়ক এণ্টোনিওর চরিত্রের অঙ্কনে সেক্ষপীয়র কত দূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন। বণিকের উচিত কোনও গুণ তাঁহাতে লক্ষিত হয় না। তাঁহার কার্য্যগুলি সমস্তই এরূপ ভাবের যে, দেখিলেই মনে হয়, যেন বণিক পিতার মৃত্যুর পর তিনি অল্পদিনমাত্র পৈতৃক বিষয় ও ব্যবসায়ের উত্তরাধিকারী হইয়াছেন। তাঁহার নায়কোচিত গুণ কি আছে?—তিনি দানবীর; আপনার প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া তিনি এক বন্ধুর উপকার করিলেন। কিন্তু এমন সর্ব্বগুণসম্পন্ন দানবীর এণ্টোনিও কি কোন পাঠকের হৃদয় অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছেন?

আমার বিশ্বাস যে, কোন পাঠকই ইহার সদুত্তর দিতে পারিবেন না। সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে, এণ্টোনিও কাহারও হৃদয়ে স্থান পান নাই। ইহার কারণ কি?—সহানুভূতি-আকর্ষণে যাহা যাহা আবশ্যক, সে সমস্ত বিষয় উপস্থিত থাকিতেও এণ্টোনিও সম্বন্ধে পাঠকের মন কেন উদাসীন থাকে? তাঁহার মাংসকর্ত্তনের জন্য যখন তাঁহার বক্ষঃ উদ্‌ঘাটিত হইল, শাইলক্ যখন শাণিত ছুরিকা উত্তোলন করিল, তখনও পাঠকের মন অবিকৃত; কিংবা সাধারণতঃ একটা হত্যাকাণ্ড দেখিতে যে অনিচ্ছা, তাহার অতিরিক্ত কোন ভাব পাঠকের মনে উদিত হয় না। সে ব্যক্তি এণ্টোনিও না হইয়া আর কেহ হইলেও, পাঠকের মনে ঠিক্ সেই ভাবেরই উদয় হইত।

ইহার কারণ এই যে, সেক্ষপীয়র এণ্টোনিওকে হৃদয়বিশিষ্ট মানুষ করিয়া আঁকিতে পারেন নাই। তিনি যেন একটি কাষ্ঠপুত্তলিকাকে নানা বর্ণে চিত্রিত করিয়া, এবং তাহার অশেষ গুণের বর্ণনা করিয়া, পাঠকের সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছেন। পাঠক প্রতারিত হন নাই, এবং এই প্রাণহীন পুত্তলিকাটিকে মানুষ বলিয়া মনে করেন নাই। এণ্টোনিওর চরিত্রে বালকোচিত অনভিজ্ঞতা ও তাহার মুখে প্রবীণোচিত সুসংযত বাক্যাবলী আরোপিত হইয়াছে, কিন্তু যৌবনস্বভাবসুলভ কোনও ভাবের আভাসমাত্র তাহার চরিত্রে স্থান পায় নাই।

একাকী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। কতকগুলি নিষ্কর্ম্মা বন্ধু ব্যতীত সংসারে যে তাঁহার আর কেহ ছিল, তাহার কোনও উল্লেখ নাই। বিশেষতঃ, স্ত্রীজাতির কোন সংস্রব না থাকায় তাঁহার জীবন একবারে মরুভূমির ন্যায় প্রতীয়মান হয়। নারীজাতির সংস্রব ব্যতীত নরচরিত্র আদৌ পরিস্ফুট হয় না, এবং তৎপ্রতি কাহারও সহানুভূতির উদ্রেক হয় না। নরহৃদয়বিৎ অদ্বিতীয় লেখক সেক্ষপীয়রের পক্ষে এ ত্রুটী নিতান্ত অমার্জ্জনীয় হইয়াছে। মাতা, ভগ্নী, বা প্রণয়িনী, কেহই এই এণ্টোনিওর জীবনকে উর্ব্বর করেন নাই, কোনও মধুরভাবে তাহার হৃদয়-তন্ত্রী ঝঙ্কৃত হয় নাই। মিত্রের প্রতি অনুচিত সদয়তা, ও শত্রুর প্রতি অতিরিক্ত নির্দ্দয়তা, এই দুইটি ভাবে এণ্টোনিও অনুপ্রাণিত; এতদ্‌ভিন্ন আর কোনও মধুময় ভাব তাঁহার হৃদয়ে নাই। তাঁহার বন্ধু ব্যাসানিও এক জন অপাত্র, সুতরাং তাহাকে প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া উপকৃত করিতে যাওয়া পাঠকের আদৌ মনঃপূত হয় না; এবং শাইলককে হাটের মধ্যে কুকুর বলা ও তাহার গায়ে থুতু দেওয়া, গোঁড়া খ্রীষ্টানের পক্ষে খুব বাহাদুরীর কার্য্য হইলেও, সহৃদয় পাঠকের নিকট তাহা অত্যন্ত গর্হিত বলিয়াই মনে হয়। অতএব, যে দুইটি কার্য্যের জন্য তিনি প্রশংসা পাইবার দাবী করেন, সে দুইটিই পাঠকের সহানুভূতি-আকর্ষণে অসমর্থ। ইহা ব্যতীত, এণ্টোনিওর পরিচয় দিবার আর কি আছে? তাঁহার যে জীবনসংশয় উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা উল্লিখিত দুইটি অবিমৃষ্যকারিতার ফলমাত্র। ইহার জন্য তিনি স্বয়ং দায়ী। উক্ত দুইটি কার্য্য কেহ তাঁহাকে বলপূর্ব্বক করায় নাই। নৈতিক নিয়মের বিপরীত কার্য্য করিতে যাওয়াতেই তাঁহার বিপদ ঘটিয়াছিল।

এখন পাঠক ভাবিয়া দেখুন যে, এণ্টোনিওর চিত্র কিরূপে পরিস্ফুট হইতে পারিত, কিন্তু চিত্রকরের দোষে হয় নাই। যদি এণ্টোনিও পৃথিবীতে কাহাকেও প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন, তাহা হইলে তাঁহার বিপদে সম্পদে, প্রত্যেক বিষয়ে, পাঠকের মন তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত, এবং তিনি যথার্থই নায়ক বলিয়া পরিচয় দিবার যোগ্য হইতেন। যদি তাঁহার জননী বর্ত্তমান থাকিতেন, আমরা বিপৎকালে তাঁহার মুখের দিকে চাহিতাম, এবং সেই সঙ্গে পুত্রশোকাতুরা প্রৌঢ়া বা প্রবীণার গলদশ্রু লোচনযুগলও আমাদিগের হৃদয় ব্যথিত করিত। যদি তাঁহার ভগ্নী, পত্নী, বা অন্য কোন আত্মীয়া থাকিতেন, তাহা হইলেও তাঁহাদিগের জন্য আমাদিগের হৃদয় কাঁদিয়া

এণ্টোনিওর জীবনে ভাবের ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি কিছুই নাই। পাঠক একবার মনে করুন দেখি যে, যখন এণ্টোনিও শাইলকের ভবনে ঋণগ্রহণ করিতে গিয়াছেন, তখন দেখিলেন যে, অৰ্দ্ধমুক্ত দ্বারে দুইটি করুণ নয়ন তাঁহার প্রতি অনিমেষভাবে চাহিয়া আছে; হঠাৎ চারি চক্ষু সম্মিলিত হইল, এবং কি এক অজ্ঞাতপূর্ব্ব প্রেমমোহে এণ্টোনিওর জীবন আচ্ছন্ন হইয়া গেল। মনে করুন, সেই অন্তরালবর্ত্তিনী অসিতাপাঙ্গী শাইলক-দুহিতা জেসিকা। লোরেঞ্জো জেসিকাকে লাভ করাতে নাটকের বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন ঘটিল না, একটা অবান্তর ঘটনামাত্র ঘটিল। কিন্তু এণ্টোনিওর সহিত জেসি-কার প্রণয় সংঘটিত হইলে, এই নাটকখানির উপাখ্যানভাগ কত দূর সুন্দর হইত, এবং নাট্যকার আপন অলৌকিক ক্ষমতাপ্রভাবে নাটকখানিকে কত উপাদেয় করিতে পারিতেন।

অথবা মনে করুন, এণ্টোনিও যখন রূপগুণযৌবনসম্পন্না ধনশালিনী পোর্ষিয়ার গৃহে উপস্থিত হইলেন, তখন তাহাকে দেখিয়াই তিনি প্রেমে আত্ম-হারা হইলেন, এবং তাঁহার সমস্ত জীবনপ্রবাহ আর এক পথে ধাবিত হইল। তাঁহার পরম বন্ধু ব্যাসানিওর স্ত্রী, সুতরাং তাঁহার পক্ষে এরূপ চিন্তাকে মনো-মধ্যে স্থান দেওয়াও উচিত নহে,—এইরূপ একটা প্রবীণোচিত ভাব এণ্টো-নিও-চরিত্রকে একবারে স্বাদবিবর্জ্জিত করিয়া ফেলিয়াছে। নানাপ্রকার ভাবের খেলা দেখাইবার জন্যই নাটক, তাহা দেখাইতে না পারিলে, নাটক ও পুত্তলিকার নৃত্যে প্রভেদ কি? আশা করি, পাঠক এখন বুঝিতে পারিয়াছেন যে, এণ্টোনিও-চরিত্র আঁকিতে গিয়া সেক্ষপীয়র কোনও কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই; এবং নাটকখানির উৎকর্ষসাধনের যে সকল সুযোগ ছিল, তাহা উপেক্ষা করিয়া, তিনি পায়সে চিনি দিতে ভুলিয়া গিয়াছেন।

অপর পক্ষে দেখুন, "ভেনিস্‌দেশীয় বণিক" এই শব্দগুলি উচ্চারিত হইবা-মাত্র কাহার মূর্ত্তি সর্ব্বাগ্রে স্মৃতিপথে উদিত হয়? সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে, শাইলকের নৃসিংহমূর্ত্তি। কেন? যাহাকে কবি এত দুরাচার করিয়া আঁকিলেন, সেই শাইলক কেন পাঠকের হৃদয়-সিংহাসনে রাজবেশে আসীন হইল? তাহার কারণ, শাইলকের অভ্যন্তরে মনুষ্য-হৃদয় আছে। মৃতদার শাইলক, দুহিতা জেসিকার উপর আপনার যথাসর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়া-ছিল; জেসিকা তাহার নয়নের মণি; তাহার মরুময় জীবনে জেসিকার

দিগের ভাল করিয়া আলাপ হয় নাই, কিন্তু এই নগণ্য ব্যক্তিও জেসিকার প্রণয়ী হওয়ায়, তাহার সহিতও আমাদিগের একটা আত্মীয়তা জন্মিয়া গেল। কেবল এণ্টোনিও একাকী আপন ভ্রান্ত কর্ত্তব্যনিষ্ঠাকে আশ্রয় করিয়া এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিলেন; কাহারও হৃদয়ে তাঁহার প্রবেশাধিকার রহিল না। অথচ ইনি একখানি শ্রেষ্ঠ নাটকের নায়ক।

শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য।

সহযোগী সাহিত্য।

কোহ্লানী উপকথা।

"এসিয়াটিক সোসাইটীর জর্ণ্যাল" নামক পত্রিকায়, সিভিলিয়ান সি. এইচ্. বম্পাস কর্ত্তৃক সংগৃহীত "কোহ্লানী উপকথা" শীর্ষক কতকগুলি বিস্মৃত-প্রায় সুন্দর চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে। ছোটনাগপুরে সিংভূম জেলার পশ্চিমার্দ্ধ ভাগ কোহ্লান নামে পরিচিত। হস্ বা লারকাহস্ জাতি এই প্রদেশের অধিবাসী। ইহারা মুণ্ডা জাতির একটি শাখা মাত্র। যে কোল্ জাতি হইতে সাঁওতাল জাতির উৎপত্তি, মুণ্ডারাও সেই কোল্-বংশ-সম্ভূত।

সাঁওতাল মিশনের প্রচারক রেভারেণ্ড এ. ক্যাম্বেল সাঁওতাল জাতির প্রচলিত উপকথা-সমূহের সংগ্রহ করিয়া একখানি পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। বক্ষ্যমাণ কোহ্লান কাহিনীর সহিত সাঁওতাল উপকথার বহুল সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। কিন্তু রেভারেণ্ড লালবিহারী দে প্রণীত "Folk-tales of Bengal"এর কাহিনীগুলির সহিত কোহ্লানী উপকথার কিছুমাত্র সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয় না। এই উভয় উপকথার মধ্যে কেবল একটি ঘটনায় কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য দেখা যায় মাত্র। উভয় গল্পে নায়ক নায়িকার প্রণয় ও মিলন নদীর জলে দীর্ঘকেশ ভাসিয়া আসিতে দেখিয়া সংঘটিত হইয়াছিল। বঙ্গীয় উপকথায় নায়িকার কেশই জলে ভাসিয়া আসিয়াছিল, এবং তদ্দৃষ্টে নায়কের হৃদয়ে প্রেমের উদয় হইয়াছিল; কিন্তু কোহ্লান কাহিনীতে ঠিক তাহার বিপরীত। এ ক্ষেত্রে নায়কের দীর্ঘকেশ জলে ভাসিয়া আসিতে দেখিয়াই রাজকন্যার হৃদয়ে প্রণয় জন্মে।

বক্ষ্যমাণ কাহিনীগুলিকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। কতক-

গুলি গল্পের নায়ক অরণ্যচর পশু, পক্ষী, সর্প ইত্যাদি। আর কতকগুলি রাজা, পুরোহিত ও বিভিন্ন হিন্দুধর্ম্মাবলম্বীর সামাজিক ও ঘর-সংসারের কথায় পূর্ণ। কাহিনীগুলি চিত্তাকর্ষক; কিন্তু হস্ জাতির অতীত জীবনের ঐতিহাসিক সত্যের কোন প্রকার তথ্য এই কাহিনীর মধ্যে আবিষ্কৃত হইতে পারে বলিয়া বোধ হয় না।

শ্রীযুক্ত বম্পাস্ অতি সহজ ভাষায় কাহিনীগুলি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আমরাও তাঁহার অনুসরণ করিলাম।

নদীর সাপ।

এক গেরস্তর বউ দূরগ্রামে বেড়াইতে গিয়াছিল। বাড়ী ফিরিবার সময় পথে একটা নদী পড়্‌ল। পার হ'তে গিয়ে সে দেখ্‌লে, নদীতে জল অনেক, এবং স্রোতও বড় প্রবল। সে চারি দিকে চেয়ে দেখ্‌লে, কিন্তু একখানা নৌকা বা পার হবার অন্য কোন উপায় দেখ্‌তে পেলে না। তখন সন্ধ্যা হয়ে আস্‌ছে, কেমন করে বাড়ী পঁহুছিবে, এই চিন্তায় সে ব্যাকুল হ'য়ে পড়্‌ল।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাব্‌ছে, এমন সময় নদীর মাঝখান থেকে একটা বড় সাপ বেরিয়ে এল। সাপ গেরস্তর বউকে ডেকে বল্‌লে, "আমি যদি তোমায় নদী পার করে দিতে পারি, তা হলে তুমি আমায় কি দেবে?" সে বল্‌লে, "সাপ, সঙ্গে ত আমার কিছুই নেই, কি দেব বল?" সাপ বল্‌লে, আমায় কিছু না দিলে তোমায় পার করে দিতে পারি না।" গেরস্তর বউ তখন গর্ভবতী ছিল। আর কোন উপায় না দেখে সে শপথ করে বল্‌লে যে, তার গর্ভে যে সন্তান আছে, যদি মেয়ে হয়, তবে সাপের সঙ্গে তার বিয়ে দেবে। আর যদি ছেলে হয়, তবে বড় হলে সে সাপের 'জুড়ি' বা নাম পাতান বন্ধু হবে। গেরস্তর বউ দিব্যি ক'রে এই কথা স্বীকার কর্‌লে পর সাপ তাকে পিঠে করে নদীর অপর পারে পৌঁছে দিলে। গেরস্তর বউ বাড়ী ফিরে গেল। কিছু দিন পরে তার একটি মেয়ে হ'ল। বৎসরের পর বৎসর চ'লে যায়, কিন্তু গেরস্তর বউ সাপ ও নিজের প্রতিজ্ঞার কথা সব ভুলে গেল। একদিন সে নদীতে জল আন্‌তে গেছে, এমন সময় সেই সাপটা নদী থেকে উঠে তাকে বল্‌লে, "কই, তোমার মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে দেবে বলেছিলে, সে মেয়ে কই?" এই কথা শুনে গেরস্তর বউয়ের সব মনে পড়্‌ল। সে বাড়ী ফিরে এসেই তার মেয়েকে

ধরে নিয়ে অম্‌নি জলের মধ্যে চলে গেল। সেইখানে সাপের সঙ্গে থাক্‌তে লাগ্‌ল। কিছু দিনের মধ্যে তার চারটি সাপ ছেলে জন্মগ্রহণ কর্‌লে।

অনেক দিন পরে মেয়েটির বাড়ীর কথা, বাপ মার কথা মনে পড়্‌ল। সে তার মাকে দেখ্‌বার জন্য বাড়ী গেল। মেয়েটির ভাইরা বাড়ী এসে হারাণ বোন্‌কে দেখে ভারি আশ্চর্য্য হয়ে গেল। তারা বল্‌লে, "বোনটি, আমরা ভেবেছিলাম, তুমি জলে ডুবে গেছ।" সে বল্‌লে, "না ভাই, আমি ডুবি নাই। আমার বিয়ে হয়েছে, ছেলে পিলেও হয়েছে।" ভাইরা জিজ্ঞাসা কর্‌লে, "আমাদের ভগ্নীপতি কোথায়?" বোন্ বল্‌লে, "নদীর ধারে গিয়ে ডাক্‌লে, তাকে দেখ্‌তে পাবে।" এই কথা শুনে তারা সাপকে গিয়ে ডাক্‌লে। সাপ নদী থেকে উঠে শালাদের সঙ্গে শ্বশুরবাড়ী গেল। তারা খুব আদর যত্ন ক'রে সাপকে খাওয়ালে, সেই সঙ্গে এক পিপে ধেনো মদও পান কর্‌তে দিলে। মদ খেয়ে সাপটার ভারি ঘুম্ পেতে লাগ্‌ল। সে কুণ্ডলী পাকিয়ে বেশ আরাম করে ঘুমুতে লাগ্‌ল। মেয়েটির ভাইগুলির ভগ্নীপতি সাপটাকে মোটেই পছন্দ হয় নি। তারা ঘুমন্ত অবস্থায় সাপটাকে কুড়ুল দিয়ে কেটে ফেল্‌লে। বোনটি সেই অবধি বাপের বাড়ীতেই থাক্‌ল।

বাঘের পো।

এক বনে এক বাঘিনী ও এক গরু থাক্‌ত। তাদের উভয়ের বড় বন্ধুত্ব ছিল। তখনকার দিনে বাঘে মাংস খেত না। ঘাস পাতা, শাক সবজী খেয়ে থাক্‌ত। বাঘিনীর দুটি ছেলে ছিল। তারা দিন দিন বড় হতে লাগ্‌ল। এক দিন বাঘিনী ও গরু জল পান করবার জন্য এক ঝরণার ধারে গেল। বাঘিনীটা একটু নেমে জল খেতে গেল, গরুটা ঝরণার মুখে দাঁড়িয়ে জল পান কর্‌তে লাগ্‌ল। জল পান করবার সময় গরুর পা লেগে জল ঘোলা হয়ে গেল। বাঘিনী সেই জল পান ক'রে মনে মনে ভাবলে, যার পা লেগে জল এত মিষ্টি, তার মাংস না জানি আরও কত মধুর। ঝরণা থেকে বাড়ী ফিরিবার সময় বাঘিনী গরুর ঘাড় মট্‌কে রক্ত মাংস সব খেয়ে ফেল্‌লে। কেবল হাড়গুলো পড়ে রইল। বাঘিনীর ছেলেরা গরুর কথা তাদের মাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে। বাঘিনী বল্‌লে, আমি জানি না, গরু কোথায় গেছে। বোধ হয়, তাদের ফেলে রেখে সে আর কোনও জায়গায় চলে গেছে। বাঘের পোরা বেড়াতে বেড়াতে

কি ঘটেছে। দুই ভায়ে পরামর্শ করলে, তাদের মা যখন বন্ধুর ঘাড় এমনি করে মট্কাতে পারে, তখন একদিন তাদেরও ত মেরে ফেল্‌তে পারে। এই ভেবে, বাঘিনী একদিন ঘুমুচ্ছে, সেই সময় তারা কুড়ুল কোপা করে তাকে মেরে ফেলে অন্য দেশে চলে গেল। ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে এক গ্রামে পৌঁছে তারা শুন্‌লে, একটা বাঘ এসে সেই দেশের বিস্তর গরু মানুষ মেরে ফেল্‌ছে। রাজা ঘোষণা ক'রে দিয়েছেন যে, সেই বাঘটাকে মারতে পারবে, তাকে অর্দ্ধেক রাজত্ব ও তাঁর মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেবেন। বাঘের পোরা বাঘ মারার কৌশল বেশ জান্‌ত। তারা সেই উপায়ে বাঘটাকে মেরে রাজার কাছে গিয়ে পুরস্কার চাইলে। রাজা অর্দ্ধেক রাজত্ব ছেড়ে দিলেন, আর বড় ভায়ের সঙ্গে রাজকন্যার বিয়ে দিলেন। তারা বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করতে লাগল।

বাঘের বিয়ে।

এক দেশে এক রাজা ছিলেন। তাঁর এক ছেলে, আর অনেকগুলি মেয়ে ছিল। এক দিন রাজা বনের মধ্যে ঘাস কাট্‌তে গেছেন। কাট্‌তে কাট্‌তে এত ঘাস কেটে ফেলেছেন যে, বয়ে নিয়ে আসা তাঁর অসাধ্য। কি কর্‌বেন তিনি ভাবছেন, এমন সময় এক বাঘ সেখানে এসে উপস্থিত। বাঘ বল্‌লে, "রাজা, আমি যদি তোমার ঘাসের বোঝা বাড়ী পৌঁছে দিতে পারি, তা হলে তুমি আমায় কি দেবে?" রাজা বল্‌লেন, "তুমি কি চাও?" বাঘ বল্‌লে, "তোমার এক মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে হবে।" রাজা ভাবলেন, তাঁর অনেকগুলি মেয়ে, এক জনের সঙ্গে বাঘের বিয়ে দেওয়ায় আপত্তি কি? রাজা সম্মত হলে বাঘ ঘাসের বোঝা পিঠে ক'রে নিয়ে রাজার বাড়ী পৌঁছে দিলে। রাজা দেখ্‌লেন, প্রকাশ্যে বাঘের সঙ্গে রাজকন্যার বিয়ে দেওয়া বড় লজ্জার কথা। তিনি বাঘকে কূপের ধারে অপেক্ষা করতে বলে দিলেন। এ দিকে এক মেয়েকে সেই কূয়া থেকে জল আন্‌বার জন্য রাজা পাঠিয়ে দিলেন। রাজকন্যা যেমন কূয়ার ধারে এসেছেন, বাঘ অম্‌নি তাঁকে ধরে নিয়ে পালিয়ে গেল। এ দিকে রাজার ছেলে তার সেই বোন্‌কে না দেখতে পেয়ে খুঁজ্‌তে বেরিয়ে গেল। খুঁজতে খুঁজতে বনের মধ্যে এক গুহার ভেতর দেখলে যে, বাঘটা তার বোন্‌কে মেরে মাংস খাচ্ছে। রাজপুত্র দৌড়ে গিয়ে রাজাকে জানালে।

পরদিন বাঘটা সাহসে ভর ক'রে রাজবাড়ীতে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এল।

বিষয়, আমার স্ত্রী মারা গেছে। এখন তোমার আর একটি মেয়ে আমায় দাও।" * রাজা বল্‌লেন যে, এ বিষয়ে তিনি খানিক ভেবে দেখবেন। রাজা বাঘকে রাজ-বাড়ীতে থাকবার জন্য নিমন্ত্রণ কর্‌লেন। বাঘকে বেশ একটা নরম বিছানা দেওয়া হল। বাঘ নরম বিছানায় শুয়ে তখনই ঘুমিয়ে পড়ল। রাত্রিবেলা রাজপুত্র একটা বড় কড়ায় ক'রে খানিকটা জল গরম করলেন। বাঘ যখন বেশ ঘুমুচ্ছে, রাজার ছেলে সেই অবসরে বাঘের গায়ে সেই ফুটন্ত জল কড়া সুদ্ধ ঢেলে দিলে। বাঘ মহাশয় আর উঠলেন না, সেইখানেই পঞ্চত্ব পেলেন।

শৃগাল ও প্রতিবেশী।

এক শেয়াল একটা ছাগলছানা মেরে গ্রাম থেকে একটু দূরে এক গাছ-তলায় বসে বেশ আরাম ক'রে খাচ্ছিল। কাকের স্বভাব; পরের জিনিস দেখে চেঁচামেচি করে। এক দল কাক গাছের উপর থেকে মহা গোলমাল আরম্ভ ক'রে দিলে। অনেক কাকের ডাক শুনে গ্রামের লোকেরা ব্যাপার কি দেখ্‌বার জন্য গাছতলায় এল। ব্যাপার দেখে তারা শেয়ালটাকে রীতিমত ধন-ঞ্জয় দিয়ে তাড়িয়ে দিলে। তার সাধের মাংস সেইখানেই পড়ে রইল। এই ঘটনায় কাকগুলার উপর শেয়ালটা হাড়ে হাড়ে চটে গেল। এবং কেমন করে সে এর প্রতিশোধ নেবে, তার উপায় ও সুযোগ খুঁজে বেড়াতে লাগল।

কিছু দিন পরে সেই দেশে ভারি ঝড় বৃষ্টি আরম্ভ হল। দুর্য্যোগ ভয়ানক, ঝড়ে গাছ পালা ভেঙ্গে পড়তে লাগল, বৃষ্টির ঝাপটাও ভয়ঙ্কর। পশু পক্ষী থাক-বার জায়গার অভাবে ডুবে মরবার উপক্রম হলো। শেয়ালটা সময় বুঝে কাক-দের কষ্টে মহা দুঃখের ভাব দেখিয়ে তাদের নিজের গহ্বরে ডেকে নিয়ে গেল। সেখান থেকে পালাবার কোন পথ ছিল না। শেয়ালটা তখন এক এক ক'রে কাকগুলোকে মেরে ফেললে। কেবল নীলকণ্ঠ নামে একটা কাককে পর দিন খাবে বলে লেজে বেঁধে রেখে দিলে। কাকটা পালাবার উপায় না দেখে শেয়ালের লেজে ঠোকরাতে লাগল। ঠুক্‌রে ঠুক্‌রে লেজটা ফুলে ঢোল হল। বাঁধনটা খুলে গেল। কাকটাও উড়ে পালিয়ে গেল।

---

* হস্ জাতির ধারণা এইরূপই। স্ত্রী ক্রয় করিবার পর নির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত একটা জামিন থাকে। যদি উক্ত সময়ের পূর্ব্বেই স্ত্রীবিয়োগ হয়, তবে স্ত্রীর সহোদরা বা সম্পর্কীয়া অন্য

শেয়াল ফুলো লেজ নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে পথে এক কুমোরকে দেখতে পেলে। কুমোর হাঁড়ি কুঁড়ি মাথায় ক'রে বাজারে বেচতে যাচ্ছিল। শেয়াল মহাগম্ভীর ভাবে তাকে বল্লে যে, সে রাজার বাড়ীর সেপাই, তাকে একটা ভাঁড় দিতে হবে। কুমোর প্রথমে রাজী হল না, শেষে শেয়ালের রকম সকম দেখে ভয় পেয়ে একটা ভাঁড় দিয়ে চলে গেল। শেয়াল সেই ভাঁড়ের মধ্যে ফুলো লেজ টিপে পুঁয রক্ত বার করলে। তার পর ভাঁড়ের মুখে পাতা চাপা দিয়ে রাখলে। পথে যেতে যেতে সে দেখলে, একটি রাখালের ছেলে কতকগুলি পাঁঠা নিয়ে যাচ্ছে। তাকে ডেকে শেয়াল বললে যে, তার বাপ এক ভাঁড় ঘীর বদলে একটা পাঁঠা শেয়ালকে দেবে, এই রকম বন্দোবস্ত হয়েছে। ছেলেটা ভাবলে, হবেও বা। সুতরাং তার কথায় বিশ্বাস করে একটা পাঁঠা দিয়ে পুঁয-রক্ত-ভরা ভাঁড়টা নিয়ে চলে গেল। শেয়াল পাঁঠাটা নিয়ে মহানন্দে বাড়ী ফিরে গেল। তার প্রতিবেশীদের এই পাঁঠা দেখে ভারি ঈর্ষা হল। সে পাঁঠাটিকে বাসায় রেখে বাইরে গেছে, এই সুযোগে সকলে পাঁঠাটাকে মেরে সব মাংস খেয়ে ফেললে; তার পর চামড়ার মধ্যে ইট পাট্‌কেল পুরে পাঁঠার মতন সাজিয়ে রেখে দিলে। শেয়াল বাসায় এসে প্রতিবেশীদের কীর্ত্তি দেখলে। কিছু না বলে সে ছাগলের চামড়াখানা এক মুচির কাছে নিয়ে গেল। চামড়া দিয়ে একটা ঢাক তৈরি করে শেয়াল এক গভীর নদীর তীরে বসে দমাদম্ বাজাতে আরম্ভ করে দিলে। বাজনা শুনে প্রতিবেশী শেয়ালেরা তার চারি দিকে ঘিরে দাঁড়াল। এমন মধুর স্বর তারা আর কখনো শোনে নি। আশ্চর্য্য হয়ে তারা জিজ্ঞাসা করলে, এমন সুন্দর ঢাক সে কোথায় পেলে। শেয়াল বললে, নদীর তলায় এমন অনেক ঢাক আছে। গলায় এক এক খানা পাথর বেঁধে নদীতে ঝাঁপ দিলে সকলেই ঢাক পেতে পারে। অন্যান্য শেয়ালেরা ঢাকের লোভে তাড়াতাড়ি এক এক খানা পাথর গলায় বেঁধে জলে লাফিয়ে পড়ল; ডুবে গেল। এই উপায়ে শেয়াল তার শত্রুদের শত্রুতার প্রতিশোধ নিলে।

শৃগাল ও ব্যাঘ্র।

এক বনে এক বাঘ ও বাঘিনী তাদের দুটি ছানা নিয়ে বাস করতো। প্রতিদিন তারা ছানা দুটিকে বাসায় রেখে বনের মধ্যে শিকার করতে যেত। নিকটেই একটা শেয়াল থাকতো। দিন কাল এমন পড়েছিল যে, শেয়ালটা

কাছে এসে দেখ্‌তে পেলে, ছানা ছটি অনেকটা হরিণের মাংস খাচ্ছে। শেয়াল মহাগম্ভীর মূর্ত্তি ধরে তাদের ধমক দিয়ে বল্‌লে, "তোরা এত মাংস কোথায় পেলি বল? আমি রাজার সেপাই, তিনি আমায় হরিণের মাংস আন্‌বার জন্য বলে দেছেন; সারা রাজ্যি খুঁজে এক টুক্‌রা মাংস পেলেম্ না, আর তোরা এত মাংস খাচ্ছিস্? এখুনি মাংস আমায় দে, নইলে জোর করে কেড়ে নেব, আর রাজার কাছে তোদের নামে নালিশ কর্‌বো।" বাঘের ছানা ছটি শেয়ালের কথায় বড় ভয় পেলে। কি করে, তখনি তাকে মাংস দিলে। ভারি খুসী হয়ে শেয়াল মাংস নিয়ে গিয়ে পেট ভরে খেলে। পর দিন সে সেই রকম সময়ে এসে বাঘের ছানাদের ভয় দেখিয়ে আবার মাংস নিয়ে গেল। এই উপায়ে রোজ রোজ ছানাদের ঠকিয়ে তাদের খাবার সে খেতে লাগ্‌লো। বাচ্চাগুলি না খেতে পেয়ে দিন দিন রোগা হয়ে যেতে লাগ্‌লো। বাঘ ছেলে-দের দশা দেখে মনে মনে ভাব্‌লে, এর কারণটা কি, দেখ্‌তে হবে। একদিন শিকারে না গিয়ে সে ঝোপের মধ্যে চুপ করে বসে রইল। শেয়ালটাও অন্ত দিনের মত ছানাদের ঠকিয়ে মাংস নিতে এল। মাংস নিয়ে সে যখন চলে যাচ্ছে, বাঘটা তখন সব ব্যাপার বুঝে ভারি রেগে গেল। শেয়ালটাকে মেরে ফেলবার জন্ম সে তাড়া কর্‌লে। প্রাণের ভয়ে শেয়াল চোঁচা দৌড় দিলে। বাঘও পেছনে পেছনে তাড়া কর্‌তে লাগ্‌লো। দুটো পাহাড়ের মাঝে একটা সঙ্কীর্ণ পথ ছিল, শেয়ালটা তার ভেতর দিয়ে অনায়াসে অপর পারে গেল। বাঘটাও যেমন তার মধ্যে ঢুক্‌ল, অম্‌নি আট্‌কা পড়ে গেল। কিছুতেই আর বেরুতে পার্‌লে না। শেষে না খেতে পেয়ে সেইখানেই মরে রইল।

এ দিকে শেয়াল বাঘের বাসায় এসে বাঘিনীকে বল্‌লে, রাজার সেপাইয়ের সঙ্গে ঝগড়া করেছিল বলে রাজা বাঘকে গারদে আটক করে রেখেছেন। এই খবর শুনে বাঘিনী ও বাঘের ছেলেরা ভারি কাঁদ্‌লে। না খেতে পেয়ে মারা যাবে, এই ভয়ে তারা আরও আকুল হয়ে পড়্‌লো। শেয়াল তাদের অভয় দিয়ে বল্‌লে যে, সে যত দিন সঙ্গে থাক্‌বে, তত দিন তাদের কোন ভয় নেই। তার পর কথা ঠিক হ'ল, বাঘিনী ও তার বাচ্চারা বনের জন্তু তাড়িয়ে আন্‌বে, আর শেয়াল তাদের শিকার কর্‌বে। প্রথমে শেয়াল ত মহা আস্ফালন করে নিলে যে, সে অনেক জন্তু মেরে ফেল্‌বে। কিন্তু শিকারের সময় যখন তার পাশ দিয়ে একটা হরিণ পালিয়ে গেল, আর সে তার কিছুই কর্‌তে পার্‌লে না,

ভান করে শুয়ে রৈল। বাঘিনী ও ছানারা ফিরে এসে শেয়ালের অসুখ দেখে বড় দুঃখিত হল। শিকার করতে পারেনি বলে তারা তাকে কিছু বললে না। পর দিন বাঘিনী একটা মস্ত হরিণ শিকার করলে। শেয়াল বললে, মাংস দেবতার কাছে উৎসর্গ না করে খাওয়া হবে না। তারা তাতেই রাজী হল। বাঘেরা দূরে সরে গেল, শেয়াল পূজার ভান করে টুকরো টুকরো মাংসগুলো নিজে খেয়ে নিলে। তার পর তাদের ডেকে সব মাংস দিলে। তখন থেকে রোজ রোজ এই রকম হতে লাগলো, সুতরাং শেয়ালের আহারের আর কোন কষ্ট রইল না।

বুনো মহিষ।

এক দেশে এক দরিদ্র ছিল। সে এমন গরীব যে, তার জায়গা, জমী, কি লাঙ্গল বলদ কিছুই ছিল না। কেবল এক জোড়া পাঁঠা ছিল। সে মনে মনে ভাবলে, এই পাঁঠা দিয়ে অল্প একটু জমী চাষ করবে। জমী ত চষা হ'ল; কিন্তু বীজধান সে পায় কোথায়? কেউ যে তাকে ধান ধার দেবে, সে আশা নাই। ভেবে চিন্তে সে পাড়াপড়শীর কাছ থেকে খানিকটা তুঁষ চেয়ে আনলে। সেই তুঁষ সে মাটীতে ছড়িয়ে দিলে। আশ্চর্য্যের বিষয়, কিছু দিনের মধ্যে সেই তুঁষ থেকে ভারি তেজাল ধানগাছ জন্মাল। দুঃখী লোকটা রোজ তার ধানগাছগুলি দেখতে যেত। দিন দিন গাছ বড় হতে লাগল, আর ধানে ক্রমশঃ পাক ধরতে লাগল। দেখে তার ভারি আহ্লাদ হল। একদিন সে সকালবেলা মাঠে গিয়ে দেখে, রাত্রে বুনো মহিষের দল এসে তার সব ধান নষ্ট করে গেছে। দুঃখে কষ্টে তার চখে জল এল। অন্য কোন উপায় না দেখে মহিষদের খুরের দাগ ধরে সে বনে চলে গেল। শীঘ্রই খুরের দাগ ধরে একটা বড় খোলা জায়গায় এসে পড়ল। মহিষরা রাত্রে সেখানে ঘুমায়। জায়গাটা ভারি অপরিষ্কার। কতকগুলা গাছের ডাল ভেঙ্গে নিয়ে সে জায়গাটা ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করলে। সন্ধ্যার সময় মহিষদের ফিরে আসবার শব্দ শুনে সে একটা গাছের কোটরে লুকিয়ে রইল। মহিষেরা ফিরে এসে দেখে, কে তাদের শোবার জায়গা ঝাঁট পাট করে রেখেছে। দেখে তারা ভারি আশ্চর্য্য হয়ে গেল। পরদিন তারা চরতে গেলে লোকটা কোটর থেকে বেরিয়ে এসে আবার জায়গাটা পরিষ্কার করে রাখলে। মহিষেরা রাত্রে ফিরে এসে জায়গা আবার ঝাঁট দেওয়া দেখে ভারি খুসী হল। তারা ঠিক করলে,

মহিষকে চৌকি দেবার জন্য রেখে গেল। রোদের তেজ বাড়ল। সেই অবসরে লোকটা জায়গাটা ঝাঁট দিয়ে আবার কোটরে লুকিয়ে রইল। মহিষরা সেদিনও কোন সন্ধান পেলে না। পরদিন তারা একটা অন্ধ মহিষকে চৌকি দিতে রেখে গেল।

অন্ধ মহিষের শ্রবণশক্তি ভারি প্রখর ছিল। সে শব্দ শুনে বুঝলে, একটা লোক কোটর থেকে বেরিয়ে জায়গা পরিষ্কার করে আবার কোটরে লুকিয়ে রৈল। যখন মহিষরা বাসায় ফিরে এল, তখন সে কোটরের কথা তাদের বলে দিলে। মহিষরা মানুষটাকে বেরিয়ে আস্‌তে বল্‌লে। সে বেরিয়ে এলে তারা প্রস্তাব করলে যে, লোকটা রোজ তাদের শোবার জায়গা পরিষ্কার করে রাখ্‌বে, আর তারা তার ভরণপোষণ করবে। পর দিন মহিষের দল এক জায়গায় লুকিয়ে রইল। সেই পথ দিয়ে এক দল সওদাগর বাণিজ্য করতে যাচ্ছিল। মহিষেরা তাদের তাড়া কর্‌লে। প্রাণের ভয়ে জিনিসপত্র ফেলে তারা পালিয়ে গেল। মহিষেরা তখন শিংএ করে সেই সব জিনিস পত্র এনে লোকটাকে দিলে। এই রকম করে তারা মাঝে মাঝে তাকে নানা রকম দরকারী জিনিসপত্র এনে দিত। একদিন মহিষেরা তাকে এক জোড়া শিং দিয়ে বল্‌লে যে, যদি কোন বিপদ হয়, শিংএ ফুঁ দিলেই, যেখানেই থাকুক না কেন, তারা তাকে সাহায্য করতে ছুটে আস্‌বে। একদিন সে তীরে শিংজোড়া রেখে স্নান করতে জলে নেমেছে, এমন সময় কতকগুলা কাক শিংজোড়াটি নিয়ে উড়ে পালাল। এ কথা সে আর মহিষদের জানালে না।

একদিন নদীতে স্নান করে উঠে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে তার মাথা থেকে এক গাছা লম্বা চুল উঠে এল। অনেক দিন ক্ষেউরি হয় নি বলে তার চুলগুলি হাঁটু পর্য্যন্ত লম্বা হয়েছিল। একটা লোয়া ফুলের মধ্যে চুলগাছি জড়িয়ে রেখে ফুলটা সে নদীতে ফেলে দিলে। ফুলটা ভাস্‌তে ভাস্‌তে চলে গেল। সেই নদীতে এক রাজকন্যা স্নান কর্‌ছিল। ফুলটা দেখে সে তুলে নিলে। তার মধ্যে একগাছা চুল দেখ্‌তে পেয়ে সে তার বাপের কাছে গিয়ে বল্‌লে, যার মাথায় এত বড় চুল, তাকে ছাড়া আর কাকেও সে বিয়ে করবে না। মেয়ের এই পণ শুনে রাজা নদীর চার দিকে চর পাঠিয়ে দিলেন। এক জন চর খুঁজতে খুঁজতে মহিষদের বাসায় লোকটাকে দেখ্‌তে পেয়ে তাকে রাজার কাছে নিয়ে এল। খুব জাঁক্ করে তার তখনি রাজকন্যার সঙ্গে বিয়ে হল।

রাজার জামাই মহাসুখে কাল কাটাতে লাগ্‌ল। একদিন সে রাজবাড়ীর উঠানে দাঁড়িয়ে আছে, এমন সময় এক জোড়া শিং তার পায়ের কাছে পড়ে গেল। সে কুড়িয়ে নিয়ে দেখে তার হারাণ শিং। শিং জোড়া হাতে নিয়ে সে গর্ব্ব করে বল্‌লে, যদি শিংএ সে একবার ফুঁ দেয়, তা হলে হাজার হাজার বুনো মহিষ এসে তখনি রাজ্য নষ্ট করে ফেল্‌বে। নিকটে যারা দাঁড়িয়েছিল, তারা এই আজগুবি কথা শুনে সবাই হেসে উঠ্‌ল। সে তাতে ভারি চটে গিয়ে খুব জোরে শিংএ ফুঁ দিলে। আর কোথা যাবে! চারি দিক থেকে ভয়ানক শব্দ হতে লাগ্‌ল। রাজ্যের লোক সভয়ে দেখ্‌লে, হাজার হাজার বুনো-মহিষ ঝড়ের মত ছুটে আস্‌ছে। রাজার জামাই আগে ভাগে দৌড়ে গিয়ে তাদের বুঝিয়ে বল্‌লে যে, তার কোন বিপদ হয় নাই। মহিষেরা তার কথা শুনে তখন শান্ত হল। রাজভাণ্ডারে যত শস্য ছিল, তাদের খেতে দেওয়া হল। তখন সন্তুষ্ট হয়ে তারা বনে চলে গেল। যাবার সময় এক জোড়া মহিষ রেখে গেল। সেই মহিষ থেকেই এখনকার পোষা মহিষদের উৎপত্তি।

কৃতজ্ঞ গাভী।

এক দেশে দুই ভাই ছিল। তারা বড় গরীব। কখনো ভিক্ষা করে, কখনো চাষাদের ধানের মোট বয়ে যা পেত, তাইতে কোন রকমে দিনপাত করত। এক দিন মোট বইতে যাবার সময় তারা দেখ্‌লে, এক নদীর তীরে পাঁকের মধ্যে একটা গরু পড়ে গেছে। সে কিছুতেই উঠ্‌তে পারছে না। ছোট ভাই তাই দেখে গরুটাকে তোলবার প্রস্তাব করলে। বড় ভাই তাতে রাজী হল না। সে বল্‌লে যে, তা হলে লোকে তাদের চোর বলে ধরবে। ছোট ভাই কিছুতেই ভয় পেলে না। অবশেষে ছোট ভাইয়ের কথা মত দু জনে গরু-টাকে টেনে তুল্‌লে। গরুটা সঙ্গে সঙ্গে তাদের বাড়ী গেল। কিছু দিন পরে তার একটা গাই বাছুর হল। এই রকমে কিছু দিন থাক্‌তে থাক্‌তে গরুর বংশ বৃদ্ধি হয়ে তাদের অনেক দুধ হতে লাগ্‌ল। সেই সব দুধ ঘী বিক্রি করে ক্রমে দুই ভায়ের অবস্থা ফিরে গেল। বড় ভাই বিয়ে করে বউ ঘরে নিয়ে এল। সে আর কোথাও যেত না, বউ নিয়ে ঘরে থাক্‌ত। আর ছোট ভাই বনে গিয়ে গরু ছাগল চরাত। বড় ভায়ের ছেলে তার কাকার জন্য রোজ দুপুর বেলা বনে ভাত বয়ে নিয়ে যেত।

নানারকম মিঠাই মোণ্ডা খেতে দিত। ভাইপোকে তার কাকা মাঝে মাঝে সেই সব মিঠাই মোণ্ডা থেকে কিছু কিছু খেতে দিত। কিন্তু তাকে বারণ করে দিয়েছিল, যেন সে মেঠাই বাড়ী নিয়ে না যায়, বা তার মা বাপকে না বলে। ছেলেটা এক দিন কাপড়ের মধ্যে লুকিয়ে কতকগুলি মেঠাই বাড়ী নিয়ে গিয়ে তার মাকে দেখালে। তার মা তেমনতর মিঠাই জন্মে কখনো চখে দেখে নি, সে ভাব্‌লে, তার দেওর বুঝি ছেলেটাকে মেরে ফেল্‌বার জন্ত এই সব বিষাক্ত মেঠাই খেতে দিয়েছে। এই ভেবে ছেলের হাত থেকে মেঠাই কেড়ে নিয়ে সে ফেলে দিলে। পরদিন সে দেওরের ভাত নিজেই নিয়ে গেল। খাওয়া দাওয়া হলে সে দেওরের মাথা কোলের উপর রেখে তার মাথার উকুন বেছে দিতে লাগ্‌ল। কোমল স্পর্শে সে ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে পড়ল। সে যখন অকাতরে ঘুমুচ্ছে, তখন তার ভাজ কাপড়ের ভেতর থেকে একখানা ধারাল ছুরি বার করে তার মাথাটা কেটে ফেল্‌লে। ধড় ও মাথা সেখানেই পড়ে রইল। সে বাড়ী ফিরে গেল। গরুটা সব দেখ্‌ছিল। সে শিং দিয়ে মুণ্ডুটা এনে যেই ধড়ের সঙ্গে মিলিয়ে দিলে, অমনি লোকটা বেঁচে উঠ্‌ল। গরু তাকে সব কথা বল্‌লে। সব শুনে সে গরু বাছুর নিয়ে দূরে আর এক বনে চলে গেল।

রোজ রোজ তার অনেক দুধ হত। সে গরুকে জিজ্ঞাসা করলে, এত দুধ সে কি করবে? গরু একটা বাব্‌লা গাছের গোড়ায় একটা গর্ত্ত দেখিয়ে দিলে। সে গরুর কথামত রোজ রোজ সেই গর্ত্তে দুধ ঢাল্‌তে লাগল্। এক দিন সে দুধ ঢাল্‌ছে, এমন সময় সেই গর্ত্ত থেকে একটা সাপ বেরিয়ে এল। সাপটা তাকে ধন্যবাদ দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, সে রোজ রোজ দুধ দিয়ে তার প্রাণ বাঁচিয়েছে, এখন সে কি বর চায়? গরুর কথামত সে সাপকে তার সমস্ত দুধ ফিরিয়ে দিতে বল্‌লে। সাপ সমস্ত দুধ উগরে দিয়ে নিজে মরে গেল। সেই দুধের সঙ্গে বিষ ছিল। বিষ গায়ে লেগে তার রং ভারি উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌ল। তাকে দেখ্‌লে ঠিক আগুনের মূর্ত্তি বলে ভ্রম হত।

এই ঘটনার পর এক দিন লোকটা নদীতে স্নান কর্‌তে গেল। তার মাথায় খুব বড় বড় চুল হয়েছিল। একগাছা চুল ছিঁড়ে ফেলে সে নদীর স্রোতে ভাসিয়ে দিলে। সেই দেশের রাজকন্তা নদীতে স্নান কর্‌বার সময় সেই চুল-গাছি পেলে। সেই চুল দেখে সে পণ কর্‌লে, যার মাথায় এত বড় চুল, তাকে ছাড়া সে আর কাকেও বিয়ে কর্‌বে না। রাজা মেয়ের এই পণ শুনে এক

জায়গায় এসে উপস্থিত। ব্রাহ্মণের চেহারা ভারি রোগা ছিল, এত রোগা যে, তার হাড়গুলো সব গোণা যায়। ব্রাহ্মণ, লোকটার সেই রকম উজ্জল রং দেখে অবাক্ হয়ে গেল। সে তাকে জানালে যে, এক রাজকন্তা তাকে বিয়ে কর্‌তে চায়। সে ব্রাহ্মণকে দিন কয়েক সেইখানে থাক্‌বার জন্ত নিমন্ত্রণ করলে। সেও থেকে গেল। দুধ ঘী খেয়ে ব্রাহ্মণের চেহারা ফিরে গেল, খুব মোটা সোটা হল। গরুর উপদেশ মত এক দিন সাপের গর্ত্তের মধ্যে গিয়ে লোকটি সেখানে অনেক সোনারূপা দেখ্‌তে পেলে। একটা ঝোড়ায় করে সে সেই সব সোনা রূপা নিয়ে এসে ব্রাহ্মণকে দিলে। বলে দিলে, "তুমি যাও, কয়েক দিন পরে আমি রাজকন্তাকে বিয়ে করতে যাব, এ কথা রাজাকে বলো।" রাজা ব্রাহ্মণের চেহারা দেখে খুব খুসী হলেন। সোনা রূপা দেখে ভাব্‌লেন, তাঁর ভাবী জামাই না জানি কত বড় লোক।

তার পর এক দিন সে সেই গরুটার পিঠে চড়ে রাজার মেয়েকে বিয়ে কর্‌তে চল্‌ল। রাজধানীর নিকটে এসে সকাল বেলা ঘুম ভেঙ্গে উঠে সে দেখ্‌লে, হাতী, ঘোড়া, পাল্কী, বেহারা, লোক, লস্কর, সেপাই শান্ত্রীতে মাঠ ভরে গেছে। এ সব গরুর মায়ায় হচ্ছিল, সে ত তা জান্‌ত না। তখন সে হাতীর পিঠে চড়ে খুব বাজি বাজনা করে বিয়ে কর্‌তে গেল। বিয়ের পর রাজকন্তাকে নিয়ে বাড়ী ফির্‌ল। রাজধানীর বাইরে আসবামাত্র ভোজবাজীর ছায়ার মত, সেই সব হাতী, ঘোড়া, পাল্কী, বেহারা লোক জন কোথায় যেন উড়ে গেল। রাজকন্তা দেখ্‌লে, সেই বুড় গরুটি ছাড়া স্বামীর আর কিছুই নেই। দেখে তার বড় দুঃখ হল; কিন্তু বাপের বাড়ী ফিরে যেতে তার লজ্জা কর্‌তে লাগ্‌ল। তখন স্বামীর সঙ্গে বনে গিয়ে সে তার গরু বাছুর চরানর সাহায্য কর্‌তে লাগ্‌ল।

এক দিন সকালে উঠে দু জনে দেখ্‌লে, রাতারাতি সেই বনের মধ্যে এক প্রকাণ্ড রাজ-অট্টালিকা তৈরি হয়েছে। বাড়ীর মধ্যে কত রকম আস্‌বাব। ঝাড়, লণ্ঠন, খাট, পালঙ, নানা রকম জিনিসে ভরা। কামধেনু এই শেষ উপহার দিয়ে মরে গেল।

সে তখন সেই বনের রাজা হল। রাজা হয়ে ঘোষণা করে দিলে, যে সেই বনে এসে বাস কর্‌বে, সে তাকে এক টাকা করে দেবে। টাকার লোভে অনেক লোক এসে সেখানে বসতি কর্‌তে লাগ্‌ল। সেই সঙ্গে তার ভাই

দেশের রাজা দেখে তাদের মনে বড় ভয় হল। কিন্তু রাজা তাদের সকল অপরাধ মার্জ্জনা করে, তাদের ঘর বাড়ী, জায়গা জমী করে দিলেন। সকলে মিলে সুখে ঘরসংসার কর্‌তে লাগ্‌লে।

বিল্ববতী রাজকন্যা।

এক দেশে সাত ভাই ছিল। তাদের ছোটটির নাম লীতা। বড় ছ' ভায়ের বিয়ে হয়েছিল, কিন্তু লীতা বিয়ে কর্‌তে কিছুতেই রাজী ছিল না। জিজ্ঞাসা কর্‌লে সে বল্‌ত, বেলবতী রাজকন্যা ছাড়া সে আর কাকেও বিয়ে কর্‌বে না। তার ভাজেরা এই কথা নিয়ে তাকে ভারি ঠাট্টা তামাসা কর্‌ত। ঠাট্টা তামাসার চোটে এক দিন সে কাকেও না বলে রাজকন্যার সন্ধানে চলে গেল। ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে এক বনের মধ্যে সে এক মুনিকে দেখ্‌তে পেলে। লীতা বেলবতী রাজকন্যার কথা তাঁকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে। তিনি বলে দিলেন, সেখান থেকে এক দিনের পথ গেলে সে আর এক মুনিকে দেখ্‌তে পাবে। তিনি সব খবর বল্‌তে পার্‌বেন। লীতা এক দিনের পথ হেঁটে গিয়ে আর এক মুনিকে দেখ্‌তে পেলে। তিনি তখন সমাধিস্থ হয়েছিলেন। তিন মাস ধরে সে তাঁর অপেক্ষায় সেখানে থাক্‌ল। ধ্যান ভাঙ্গ্‌লে সে বেলবতী রাজকন্যার কথা জান্‌তে চাইলে। মুনি বলে দিলেন, সেখান থেকে আরও তিন দিনের পথ গেলে আর এক মুনিকে সে দেখ্‌তে পাবে, তিনি বেলবতী রাজকন্যার সব খবর জানেন। লীতা সেই মুনির কাছে পৌছে দেখ্‌লে, তিনি তখন ধ্যানে বসেছেন। ছ' মাস পরে ধ্যান ভাঙ্গবে। তত দিন সে অপেক্ষা করে রইল। মুনির ধ্যান ভেঙ্গে গেলে সে তাঁকে রাজকন্যার কথা জিজ্ঞাসা কর্‌লে। মুনি ভারি খুসী হয়ে বল্‌লেন যে, বেলবতী রাজকন্যা, একটা বেলগাছে বড় বেল ফলের মধ্যে বদ্ধ হয়ে আছেন। রাক্ষসেরা সে গাছ চৌকি দেয়। যদি সে গিয়ে সব প্রথমে সেই বড় ফলটি ধর্‌তে পারে, তা' হলে তার কোন বিপদ হবে না। আর রাজকন্যাকেও পাওয়া যাবে। কিন্তু অন্য কোন বেল ছুঁলেই রাক্ষসেরা তাকে মেরে ফেল্‌বে। লীতা সব কথা মনে করে রাখ্‌লে। তখন মুনি মন্ত্রবলে তাকে 'বিতি' পাখীতে পরিণত করে যে দিকে যেতে হবে বলে দিলেন। লীতা উড়ে উড়ে সেই গাছের কাছে এল। চারি দিকে রাক্ষসদের দেখে তার ভারি ভয় হ'ল। সে তাড়াতাড়ি একটা বেলে ঠোকর মার্‌লে।

নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে লীতাকে ফিরে আসতে না দেখে মুনি ভাব্‌লেন, নিশ্চয়ই লীতার কোন বিপদ হয়েছে। তখন তিনি একটা কাককে খবর কি জান্‌তে পাঠিয়ে দিলেন। কাক ফিরে এসে বল্‌লে যে, সে লীতাকে দেখ্‌তে পেলে না। কেবল একটা বেলে ঠোকর মারার দাগ রয়েছে! রাক্ষসেরা লীতাকে খেয়ে যে হাড় গোড় ফেলে দিয়েছে, তাই আনবার জন্য তখন মুনি কাকটাকে আবার পাঠিয়ে দিলেন। কাক হাড়গুলো নিয়ে এল। তখন তিনি লীতাকে মন্ত্রবলে আবার বাঁচিয়ে ফেল্‌লেন। মুনি লীতাকে খুব তিরস্কার করে বলে দিলেন, যদি সে সত্যই বেলবতী রাজকন্যাকে পেতে চায়, তবে যেন বড় বেলটা নিয়ে আসে। এবার তিনি লীতাকে একটি ছোট শুক পাখীর আকার দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন। লীতা এবার সর্ব্বাপেক্ষা বড় বেলটি নিয়ে উড়ে পালাতে লাগ্‌ল। রাক্ষসেরা দেখ্‌তে পেয়ে তাকে তাড়া করলে। মুনি শুক পাখীকে মাছির মত ছোট করে দিলেন। রাক্ষসেরা তাকে আর দেখ্‌তে না পেয়ে শেষে হাল ছেড়ে দিলে। তারা চলে গেলে লীতা নিজের মূর্ত্তি ধরে মুনির কাছে গেল। মুনি বল্‌লেন, বেলের মধ্যে রাজকন্যা আছেন। একটা কুয়ার ধারে গিয়ে খুব আস্তে আস্তে বেলটাকে ভাঙ্গলে সে রাজকন্যাকে দেখ্‌তে পাবে। লীতা রাজকন্যা পাবার জন্য ভারি ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল, মুনির উপদেশ ভুলে গিয়ে সে খুব জোরে বেলটাকে ভেঙ্গে ফেল্‌লে। তাতে এই হল যে, রাজকন্যার রূপের জ্যোতি সহ্য করতে না পেরে লীতা তখনি মরে গেল। রাজকন্যা যখন দেখ্‌লেন, তাঁর প্রণয়পাত্র তাঁরি জন্য মরে গেছে, তখন লীতার মৃতদেহ কোলে করে নিয়ে তিনি কাঁদতে লাগ্‌লেন। তিনি বসে বসে কাঁদছেন, এমন সময় এক কামারের মেয়ে সেখানে এসে জিজ্ঞাসা করলে, "কেন কাঁদছ গা?" রাজকন্যা বল্‌লেন, "আমার স্বামী মারা গেছেন, তুমি যদি ঐ কুয়া থেকে কিছু জল এনে দাও, তা হলে এঁকে আমি বাঁচাতে পারি।" কামারের মেয়ের মনে একটা কুমতলব হল। সে বল্‌লে, "জল আমি হাতে পাব না।" রাজকন্যা বল্‌লেন, "তবে তুমি মড়া কোলে করে বসে থাক, আমি জল নিয়ে আসি।" সে তাতেও রাজি হল না, বল্‌লে, "হাঁ, তুমি আমার কোলে মড়া দিয়ে নিজে পালিয়ে যাবার মতলব করছ। তার পর আমি বিপদে পড়ি আর কি!" রাজকন্যা বল্‌লেন, "তোমার যদি বিশ্বাস না হয়, তবে আমার কাপড় চোপড় গয়না গাঁটি তোমার কাছে রেখে যাচ্ছি।" এই বলে তাঁর হীরার গয়না ও রেশমের পোষাক রেখে জল আনতে [illegible]

গেলেন। কামারের মেয়ে লুকিয়ে তাঁর পেছনে পেছনে গেল। রাজকন্যা নীচু হয়ে জল তুল্‌ছেন, এমন সময় সে ধাক্কা মেরে তাঁকে কূয়ার মধ্যে ফেলে দিলে। রাজকন্যা ডুবে মারা গেলেন। কামারের মেয়ে সেই কূয়া থেকে জল তুলে লীতার মুখে দিলে। জলের গুণে লীতা তখনি বেঁচে উঠ্‌ল। কামারের মেয়ে রাজকন্যার কাপড় ও গয়না পরেছিল, লীতা তাকেই বেলবতী রাজকন্যা ভেবে বাড়ী নিয়ে এল। তখন দু জনের সেখানে বিয়ে হল।

একদিন লীতা ও তার ভায়েরা বনে শিকার করতে গেল। লীতার ভারি পিপাসা পেলে। যে কূয়ার ধারে সে বেল ভেঙ্গেছিল, ঠিক সেই কূয়াটা সে দেখ্‌তে পেলে। জল নিতে গিয়ে সে দেখ্‌লে, একটা সুন্দর ফুল জলে ভাস্‌ছে। সে ফুলটা নিয়ে বাড়ীতে এসে স্ত্রীকে দিলে। তার স্ত্রী ফুলটা দেখে ভারি অসন্তুষ্ট হল, আর তখনি টুক্‌রা টুক্‌রা করে ছিঁড়ে ফেলে দিলে। লীতার তাতে বড় কষ্টবোধ হল। একদিন লীতা দেখ্‌লে, ছেঁড়া ফুলের পাতাগুলো যেখানে পড়েছিল, সেখানে একটা বেল গাছ হয়েছে। বেলের চারাটি নিয়ে সে বাগানে পুতে রাখ্‌লে। লীতা একদিন সহিসকে তার ঘোড়াটাকে আন্‌তে বল্‌লে। ঘোড়া লাগাম ছিঁড়ে সেই বাগানের মধ্যে ছুটে পালাল। বেলতলা দিয়ে ছুটে যাবার সময় একটা বেল ঘোড়ার জীনের উপর পড়ে, সেখানেই আট্‌কে রইল। সহিস ঘোড়াটাকে ধর্‌বার সময় বেল ফলটা দেখে, বাড়ী নিয়ে গেল। বেলটা ভাঙ্গা হলে সহিস তার মধ্যে একটি সুন্দর মেয়ে দেখ্‌তে পেলে। সে মেয়েটিকে নিজের বাড়ীতে রেখে লালন পালন কর্‌তে লাগ্‌ল। এই সময়ে সেই কামারের মেয়ে লীতার স্ত্রীর ভারি অসুখ হল। বেলবতী রাজকন্যাকে হারাবে, এই ভাবনায় লীতা বড় কাতর হয়ে পড়লো। কামারের মেয়ে তার স্বামীকে বল্‌লে, সহিসের ঘরে যে মেয়েটা আছে, সে তাকে যাদু করেছে। মেয়েটি না মর্‌লে সে বাঁচবে না। এই কথা শুনে লীতা চার জন ঘাসীকে হুকুম দিলে, বনে নিয়ে গিয়ে মেয়েটাকে যেন কেটে ফেলা হয়। তারা তাই কর্‌লে। মেয়েটি মর্‌বার সময় বল্‌লে যে, তার হাত-পাগুলি যেন তার সমাধির চার পাশে পুতে দেওয়া হয়। ঘাসীরা তার অনুরোধ রেখেছিল। মেয়েটির মৃত্যুর পর কামারের মেয়ে বেঁচে উঠ্‌ল।

আরো কিছু দিন পরে লীতা একা একদিন বনে শিকার কর্‌তে গেল। রাত্রি হলে যেখানে মেয়েটিকে মারা হয়েছিল, সেইখানে সে এসে পড়ল। লীতা

দেখ্‌তে পেলে না। কেবল দুটি পাখী সেখানে বসেছিল। একটা বিছানায় লীতা শুয়ে পড়ল। পাখী দুটি তার কাছে বসে বেলবতী রাজকন্যার গল্প করতে লাগল। একটা পাখী বল্‌লে, লীতা কেমন করে বেলবতী রাজকন্যাকে উদ্ধার করে, কামারের মেয়ে তাকে কেমন করে কূয়ার মধ্যে ফেলে দেয়, তার পর কেমন করে সে এখন লীতার স্ত্রী পরিচয় দিয়ে আছে। লীতা শুয়ে শুয়ে সব শুনে পাখীদের কাছে জিজ্ঞাসা করলে, আসল বেলবতী রাজকন্যাকে সে কি করে পাবে? পাখীরা বললে, বছরে একবার রাজকন্যা এই বাড়ীতে বেড়াতে আসেন। রাজকন্যার আসবার তখন আর ছ' মাস বাকী আছে। লীতা ছ' মাস দরজার পাশে লুকিয়ে রইল। একদিন রাত্রে রাজকন্যা এলেন। লীতা তাঁর হাত ধরলে। রাজকন্যা হাত ছাড়িয়ে পালিয়ে গেলেন। লীতার বুক যেন ভেঙ্গে গেল। কিন্তু পাখীরা তাকে আশা দিলে। আরও এক বৎসর লীতা অপেক্ষা করে রইল। রাজকন্যা নির্দ্দিষ্ট দিনে সেই বাড়ীতে বেড়াতে এলেন। লীতা তাড়াতাড়ি করলে না। রাজকন্যা যখন বিছানায় শুয়েছেন, সেই সময়ে লীতা তাঁকে অধিকার করলে। উভয়ের বিয়ে হয়ে গেল। খুব সুখে তাঁরা ঘর সংসার করতে লাগ্‌লেন। সেই দুষ্ট কামারের মেয়েকে লীতা মেরে ফেল্‌লে।

পিঠের গাছ।

এক দেশে এক রাখালের ছেলে আর তার মা ছিল। রাখালের ছেলে সমস্ত দিন ছাগল গরু চরাত। তার মা রোজ সকালে তার সঙ্গে দুখানা করে পিঠে দিতেন। একখানার নাম "ক্ষিধে পিঠে", আর একখানার নাম "বোঝাই পিঠে।" প্রথমখানা খেলে সব ক্ষিধে দূর হয়; "বোঝাই পিঠে" খেলে পেট দমসম হয়ে আসে, মোটে ক্ষিধে পায় না। একদিন রাখাল পিঠে দুখানা সব খেতে পারলে না। বাকিটুকু সে একটা পাহাড়ের উপর রেখে দিলে। পর দিন গরু চরাতে গিয়ে সে দেখ্‌লে, যেখানে সে পিঠেটুকু ফেলে গিয়েছিল, সেখানে একটা মস্ত গাছ হয়েছে। কিন্তু ফলের বদলে গাছে কেবল পিঠে ঝুল্‌ছে! দেখে তার ভারি আশ্চর্য্য বোধ হল। সেই দিন থেকে সে তার মার কাছে পিঠে চাইত না, গাছের পিঠে ফলই পেড়ে খেত।

একদিন সে গাছে বসে পিঠে খাচ্ছে, এমন সময় এক বুড়ী একটা থলে কাঁধে করে সেই গাছতলায় এল। রাখালকে দেখে সে বল্‌লে, "আমি বড়

দুঃখী বাবা, একখানা পিঠে আমায় দাও ।" সে বুড়ীটা মানুষ নয় । সে একটা রাক্ষসী । রাখাল তা জানত না । বুড়ীর কষ্ট দেখে তার দয়া হল । একখানা পিঠে পেড়ে সে বুড়ীকে দিতে গেল । বুড়ী বল্‌লে, "ফেলে দিও না বাবা, মাটীতে যদি পড়ে যায়—ধূল লাগ্‌বে ।" রাখাল বল্‌লে, "তবে তুমি কাপড় পাত, আমি তার উপর ফেলে দেব ।" বুড়ী তাতেও রাজী হল না ; সে বল্‌লে "বুড় মানুষ বাবা, চখে ভাল দেখ্‌তে পাই না, তুমি নেমে এসে দাও ত হয় ।" রাখাল তখন একখানা পিঠে নিয়ে গাছ থেকে নেমে এল । যেই সে মাটীতে পা দিয়েছে, রাক্ষসী অমনি তাকে ধরে ঝুলির মধ্যে পুরে বাড়ী চল্‌ল ।

এত বড় বোঝা বয়ে বুড়ী হাঁপিয়ে গিয়েছিল, আর ভারি পিপাসাও পেয়েছিল । সে পথের ধারে বোঝাটা রেখে সাম্‌নের নদীতে জল খেতে গেল । একটা লোক তখন সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিল । রাখালের চীৎকার শুনে সে থলের মুখ খুলে দিলে । রাখাল তখন থলেটার ভেতর পাথরের নুড়ি পুরে মুখ আগের মত বন্ধ করে রেখে ছুটে বাড়ী পালিয়ে গেল । এ দিকে রাক্ষসী জল খেয়ে এসে থলে নিয়ে বাড়ী গেল । বুড়ীর এক মেয়ে ছিল । বুড়ী তাকে ডেকে বল্‌লে, "আজ ভারি ভাল খাবার এনেছি, থলেটা খুলে দেখ্‌ ।" মেয়ে যখন থলেটা খুলে দেখ্‌লে কেবল পাথরের নুড়ি, তখন মার উপর তার ভারি রাগ হল । সে বুড়ীকে খুব গালাগালি দিলে । বুড়ী আর কি করে, মেয়েকে বুঝিয়ে বল্‌লে, রাস্তার মাঝে ছেলেটা কেমন করে পালিয়ে গেছে । পর দিন বুড়ীটা আবার সেই গাছতলায় গেল । সেদিনও সেই রকম কৌশলে সে রাখালকে আবার থলের মধ্যে পুরে সোজাসুজি বাড়ী চলে এল । মেয়ের কাছে থলেটা রেখে সে আগুন ও কাঠ আন্‌তে চলে গেল । মেয়েটা ছাড়া সেখানে আর কেউ নাই দেখে রাখাল তাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে, "আচ্ছা, আমায় কেমন করে তোমরা মার্‌বে ?" সে বল্‌লে, "তোর মাথাটা ঢেঁকিতে কুটে মার্‌বো ।" রাখাল যেন কিছুই বুঝতে পার্‌লে না, বল্‌লে, "সে আবার কি ?" মেয়েটা তাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেবার জন্য নিজের মাথাটা ঢেঁকির গর্ত্তে রাখ্‌লে । রাখাল ঢেঁকিটা পা দিয়ে উঁচু করে রেখেছিল, যেই রাক্ষসীর মেয়ে গর্ত্তে মাথা রেখেছে, অম্‌নি সেও পা তুলে নিলে । মেয়েটার মাথা ভেঙ্গে গুঁড় হয়ে গেল । রাখাল তার কাপড় চোপড় খুলে নিয়ে নিজে মেয়েমানুষের মত পর্‌লে । তার পর মেয়েটাকে ছুলে, কুটে, ঠিক ঠাক্ করে রাঁধ্‌লে । বুড়ী

পোষাক দেখে সে রাখালকে নিজের মেয়েই মনে করেছিল। তার মনে কোন সন্দেহই হয় নি। মাংস রান্না হলে বুড়ী পেট ভরে মেয়ের মাংস খেলে। খেয়ে দেয়ে সে পড়ে ঘুমুতে লাগ্‌ল, রাখাল সেই অবসরে একখানা মস্ত পাথর বুড়ীর মাথায় মার্‌লে। তাতেই রাক্ষসীটা মারা পড়ল। তার যে সব টাকা কড়ি ছিল, রাখাল সব নিয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে কাল কাটাতে লাগ্‌ল। *

'সাবুই' ঘাসের জন্মকথা।

এক দেশে ছ' ভাই ও এক বোন্ ছিল। ছ'টি ভাই বনে শিকার করতে যেত, আর তাদের বোন্ ঘরসংসারের সব কাজ ও রান্না বান্না করত।

একদিন তার ভায়েরা শিকার করতে গেছে। সে ভাত রাঁধতে রাঁধতে কিছু শাক্ সব্‌জি তুলে আন্‌তে গেল। শাক তুলবার সময় তার হাতের একটা আঙ্গুল কেটে গিয়ে ক' ফোঁটা রক্ত তার উপর পড়ল। সেই রক্তসুদ্ধ শাক-পাতা রান্না হল। ভাত খাবার সময় তরকারিটা ভায়েদের মুখে বড় ভাল লাগ্‌ল। তারা জিজ্ঞাসা করলে, "বোন্! আজকের তরকারি এত ভাল হলো কি করে?" বোন্ বল্‌লে যে, তার হাতের আঙ্গুল কেটে গিয়ে দু' চার ফোঁটা রক্ত হাঁড়ীতে পড়েছিল, হয় ত তাতেই এমন তার হয়েছে। তখন ভায়েরা ভাব্‌লে, যার দু' চার ফোঁটা রক্তে তরকারি এত মিষ্টি লাগে, তার মাংস না না জানি আরও কত মধুর। এই ভেবে তারা বোন্‌কে মেরে মাংস রেঁধে খাবে, পরামর্শ করলে। কেবল ছোট ভাই লীতা বোনের জন্য ভারি দুঃখিত হল। কিন্তু সাহস করে দাদাদের কথার প্রতিবাদ করতে পারলে না। পর দিন শিকার থেকে এসে ভায়েরা বোন্‌কে একটা সাতরঙ্গা ফুল দিলে। ফুল পেয়ে সে ভারি খুসী হল। দাদাদের জিজ্ঞাসা করলে, এমন সুন্দর ফুল কোথায় পাওয়া যায়, এবং আরো আছে কি না। তারা বল্‌লে, সে যদি তাদের সঙ্গে যায়, তা হলে ফুলের গাছ তারা দেখিয়ে দেবে। সেই গাছে এমন ঢের ফুল আছে। সে যত ইচ্ছা ফুল তুল্‌তে পারবে। পরদিন সকালে মেয়েটি তার

* আমাদের বঙ্গদেশে এইরূপ একটি গল্প প্রচলিত আছে। এই উভয় গল্পের সাদৃশ্য বড় ঘনিষ্ঠ। প্রভেদ এই, কোলেদের রাখাল বালক বুড়ীর প্রাণ সংহার করিয়া তাহার সম্পত্তি অধিকার করিয়াছিল। বঙ্গীয় রাখাল নদী সাঁতরাইয়া পলায়ন করিয়াছিল। স্বর্গীয় রেভারেণ্ড লালবিহারী দে বঙ্গীয় সমুদয় উপকথা সংগ্রহ করিয়া যান নাই, যেগুলি তাঁহার জানা ছিল, সেইগুলিমাত্র তাঁহার পুস্তকে সন্নিবিষ্ট করিয়া গিয়াছেন।

দাদাদের সঙ্গে বনে গেল। সাতরঙ্গা ফুলের গাছ দেখে ফুল পাড়বার জন্য সে গাছে উঠল। যখন সে উপরের ডালে উঠেছে, তখন তার দাদারা তাকে লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়তে লাগল। কিন্তু তাদের কারো তীর তার গায়ে লাগল না। তখন বড় পাঁচ ভাই ছোট ভাই লীতাকে তীর ছুঁড়তে বল্‌লে। সে প্রথমে রাজী হল না। কিন্তু বাধ্য হয়ে শেষে তীর ছুঁড়লে। প্রথম বাণ খেয়েই মেয়েটি মারা গেল।

তারা বোনের শরীরটা কেটে কুটে রাঁধবার মত করে নিলে। যখন সব প্রায় তৈরি, তখন লীতাকে তারা রাঁধবার জল আনতে পাঠিয়ে দিলে। কূয়ার ধারে বসে সে বোনের শোকে অধীর হয়ে কাঁদ্‌তে লাগ্‌ল। সে বসে বসে কাঁদছে, এমন সময় একটা মস্ত ব্যাঙ্গ জলের উপর ভেসে উঠল। সে তাকে জিজ্ঞাসা করলে, "তুমি কাঁদছ কেন?" লীতা বল্‌লে, "দাদাদের ভয়ে বাধ্য হয়ে আমার বোন্‌কে মেরে ফেলেছি, এখন তার মাংস রেঁধে খাওয়া হবে, এই দুঃখে কাঁদছি।" ব্যাঙ্গ তাকে আশ্বাস দিয়ে বল্‌লে, "কেঁদ না, এখন এই 'রুহু' মাছটা নিয়ে গিয়ে রাঁধগে।" লীতা মস্ত "রুহু" মাছটা নিয়ে এল। দাদারা তাকে মাংস রাঁধতে বল্‌লে। লীতা বোনের কোটা মাংস লুকিয়ে রেখে "রুহু" মাছটা কুটে রাঁধলে। তার দাদারা বোনের মাংস ভেবে "রুহু" মাছ খেলে। খেয়ে দেয়ে আবার সবাই শিকারে গেল। লীতা বল্‌লে যে, সে তার তীর আনতে ভুলে গেছে। এই বলে, যেখানে তার বোনের শরীর রেখে এসেছিল, সেখানে ফিরে গেল। মৃতদেহ মাটীতে পুঁতে রেখে, সে তার কাছেই একখানা কুঁড়ে তুল্‌লে। তার পর রোজ বোনের সমাধির উপর উপুড় হয়ে কাঁদতে কাঁদতে দিন কাটাতে লাগ্‌ল। কিছু দিন পরে সে দেখ্‌লে, তার বোন বেঁচে উঠে মাটীর ভেতর থেকে বেরিয়ে এল। লীতার আহ্লাদের সীমা রইল না। দু' জনে তখন সেই বনে বেশ সুখে থাক্‌তে লাগ্‌ল।

এক রাজা একদিন শিকার করতে এসে মেয়েটিকে দেখ্‌তে পেলেন। দেখেই তিনি তাকে ভালবেসে ফেল্‌লেন। রাজ্যে নিয়ে গিয়ে মেয়েটিকে পাটরাণী কর্‌লেন, আর লীতাকে অর্দ্ধেক রাজত্বের শাসনভার দিলেন।

এই বিবাহ চিরস্মরণীয় রাখবার জন্ত রাজা একটা দীঘি কাটাবেন স্থির করলেন। দেশ বিদেশ থেকে অনেক লোক এই দীঘি কাটবার জন্ত এল। সেই সঙ্গে লীতার পাঁচ ভাইও এল। তাদের তখন ভারি দুর্দ্দশা। দাদাদের দেখে বোন্‌টি তাদের সব অপরাধ ক্ষমা কর্‌লে। আর তাদের জন্তে কাপড়

চোপড় নানারকম খাবার জিনিস পাঠিয়ে দিলে। কিন্তু ভায়েদের মনে এত লজ্জা, এত অনুতাপ হল যে, তারা মাটীতে বসে কেবল হাত চাপড়াতে লাগ্‌ল। এই রকম খানিকক্ষণ করতে করতে হঠাৎ খানিকটা মাটি ফাঁক হয়ে তাদের গ্রাস করে ফেল্‌লে। কেবল তাদের মাথার চুলগুলি বেরিয়ে রইল। সেই চুল থেকে পৃথিবীর সব "সাবুই" ঘাসের উৎপত্তি।

বিশ্বাসঘাতিনী ভগিনী।

এক দেশে এক চাষার একটি ছেলে ও একটি মেয়ে ছিল। চাষা মাঠে চাষ কর্‌তে যেত, আর তার ছেলে মেয়ে বাপের খাবার দাবার সেখানে বয়ে নিয়ে যেত। এক দিন চাষা চাষ করবার সময় তার পাশে একটা বর্ষা পুঁতে রেখে দিলে। সে চাষ করছে, এমন সময় একটা বাঘ সেখানে এল। বাঘটা তার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়্‌বার সুযোগ খুঁজতে লাগ্‌ল। কিন্তু সে যে দিক্ থেকে লাফাতে যায়, সেই দিকেই বর্ষার ফলাটা মুখ নীচু করে আছে দেখ্‌তে পায়। বাঘটা কোন রকমে চাষার ঘাড়ে লাফ্ মার্‌তে না পেরে নিকটের একটা ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে রইল। চাষার ছেলে মেয়ে তাদের বাপের খাবার নিয়ে আসছিল। আস্‌তে আস্‌তে ধানক্ষেতে একটা চড়াই পাখী দেখে ছেলেটা তার গুল্‌তি বাঁশ দিয়ে পাখীটাকে মারবার জন্য একটা ভাঁটা ছুড়্‌লে। ভাঁটাটা পাখীর গায়ে না লেগে বাঘটার একটা চোখের মধ্যে বিঁধে গেল। সে তখনি মারা পড়্‌ল। মেয়েটি তাই দেখে তার ভাইকে বল্‌লে, "দাদা! বাবা আমাদের বাঘের হাতে দেবার জন্য এখানে আস্‌তে বলেছিলেন। আমরা যেই খাবার নিয়ে আস্‌ব, আর বাঘটা আমাদের মেরে ফেল্‌বে, এই তাঁর মতলব ছিল। এই বলে তার বোন পরামর্শ দিলে, এমন বাপের হাত থেকে বাঁচবার একমাত্র উপায় আছে, বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া। তার ভাই রাজী হল। তখন ছেলেটি বাঘের চোখ্ থেকে ভাঁটাটা বের করে নিলে, চোখ দুটোও তুলে সঙ্গে করে নিলে। তার পর দৌড়ে দৌড়ে তারা সেখান থেকে পালিয়ে গেল।

কিছু দূর গিয়ে তারা দুটো বাঘ দেখ্‌তে পেলে। চাষার ছেলে বাঘের চোখ্ দুটো তাদের সাম্‌নে ফেলে দিলে। তারা অমনি সেখানে পড়ে মরে গেল। কিন্তু তাদের এক জনের শরীর থেকে একটা খরগোস, আর এক জনের শরীর থেকে দুটো কুকুর বেরিয়ে এল। তারা তাদের সঙ্গে সঙ্গে আস্‌তে লাগ্‌ল। গভীর বনের মধ্যে ঢুকে তারা একখানা কুঁড়ে বেঁধে দুই ভাই

খোনে সেই তিনটা পশু নিয়ে সুখে বাস করতে লাগ্‌ল। এক দিন খরগোস তার মনিবকে বল্‌লে, "আমায় একটা সড়কি তৈরি করে দাও।" চাষার ছেলে এক কামারের দোকানে গিয়ে একটা সড়কি গড়িয়ে আন্‌লে। পথে আস্‌তে আস্‌তে তারা একটা রাক্ষসকে দেখ্‌তে পেলে। রাক্ষসটা তাদের খাবার জন্য হাঁ করে ছুটে এল। কিন্তু খরগোসটা সেই সড়কীটা নিয়ে তার মুখের চার ধারে এত দ্রুত লাফাতে ঝাঁপাতে লাগ্‌ল যে, রাক্ষসটা 'ভ্যাবাচেকা' খেয়ে গেল। শেষে অন্য উপায় না দেখে সে চাষার ছেলের কাছে ঘাট স্বীকার করলে। আরও স্বীকার করলে, সে আজীবন তার বিশ্বাসী চাকর হয়ে থাকবে। এই রাক্ষসটার সাহায্যে তারা অনেক জন্তু শিকার করত। ছেলেটা কুকুর ও খরগোসকে নিয়ে শিকার তাড়িয়ে আনত। রাক্ষস তাদের মুখে করে ধরে ফেলত। এক দিন তারা একটা বানর ধর্‌লে; কিন্তু তাকে না মেরে তাদের দলে ভর্ত্তি করে নিলে। বানর একটা প্রকাণ্ড চাক নিয়ে এক ঝাঁক মৌমাছি ধরে রাখ্‌লে।

এক দিন সবাই শিকার কর্‌তে গেছে, এমন সময় এক রাজা মৃগয়া করতে এসে মেয়েটিকে একলা দেখ্‌তে পেলেন। তাকে দেখেই রাজার হৃদয়ে প্রেম জন্মে গেল। তিনি মেয়েটির কাছে বিয়ের কথা পাড়্‌লেন। মেয়েটি বল্‌লে যে, কোন আপত্তি নাই; কিন্তু তার এক ভাই আছে, সে কিছুতেই রাজী হবে না। তখন পরামর্শ হল, ভাইটিকে না মেরে ফেল্‌লে কিছু হবে না। কিন্তু মেয়েটি বল্‌লে যে, তার দাদার যে সব অনুচর আছে, তাতে রাজা তাকে কিছুতেই মারতে পার্‌বেন না। রাজা তাকে চেষ্টা করে দেখ্‌তে বল্‌লেন। বোন্ শেষে স্বীকার কর্‌লে, সে একবার চেষ্টা করে দেখ্‌বে। ভাই রোজ রোজ বাড়ী এসে দেখে, তার বোন্ ভারি বিমর্ষ ও দিন দিন যেন শুকিয়ে যাচ্ছে। সে তাকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে। বোন্ বল্‌লে যে, কোন একটা হ্রদে এক রকম ফুল আছে, সেই ফুল না আন্‌তে পারলে সে বাঁচবে না। এই হ্রদ মস্ত মস্ত মাছে ও বিষাক্ত সাপে পূর্ণ ছিল। চাষার ছেলে সব জেনে শুনেও ভয় পেলে না, সে হ্রদের মাঝখান থেকে সেই ফুল তুলে আন্‌বার জন্য সাঁতার দিয়ে চল্‌ল। হ্রদের মাঝামাঝি যাবার আগেই একটা প্রকাণ্ড মাছ তাকে গিলে ফেল্‌লে। রাক্ষস দূর থেকে এই সব দেখে হ্রদের জল সব শুষে ফেল্‌লে। তার পর মাছটাকে ধরে ফুলগুলো তুলে আন্‌লে। মাছটাকে সবাই

নিলে। তার পর রাক্ষস সব জলটা উগ্‌রে ফেল্‌লে। হ্রদ যেমন ছিল, আবার তেমনি হল। এ দিকে রাজা ভাব্‌লেন, ছেলেটি নিশ্চয় মারা গেছে। এই ভেবে তার বোন্‌কে নিয়ে পালিয়ে গেলেন। চাষার ছেলে ফিরে এসে তার বোন্‌কে না দেখ্‌তে পেয়ে কুকুর, খরগোস, রাক্ষস ও বানর প্রভৃতিকে নিয়ে রাজার রাজ্য আক্রমণ কর্‌লে। বানর তার ঢাকের ঢাকুনি খুলে দিলে। মৌমাছিরা রাজার সৈন্য আক্রমণ কর্‌লে। ভয়ে সেনারা পালিয়ে গেল। রাজা দেখ্‌লেন, সন্ধি করা ছাড়া উপায় নাই। তখন তিনি অর্দ্ধেক রাজত্ব ও তাঁর এক মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ে দিয়ে বিবাদ মিটিয়ে ফেল্‌লেন। রাক্ষস, কুকুর, বাঁদর, খরগোস ও মৌমাছিরা তখন বনে চলে গেল। চাষার ছেলে মহাসুখে বাস কর্‌তে লাগ্‌ল।

নিষ্ঠুর ভ্রাতৃজায়া।

এক দেশে ছয় ভাই ও এক বোন্ ছিল। ভায়েদের বিয়ে হয়েছিল। বৌগুলি তাদের ননদটিকে দু চক্ষে দেখ্‌তে পারত না। একদিন ভায়েরা দূর দেশে বাণিজ্য কর্‌তে গেল। সুযোগ পেয়ে ভাজেরা মেয়েটির উপর ভারি অত্যাচার কর্‌তে লাগ্‌ল। তারা একদিন ননদকে ডেকে বল্‌লে, "তুই যদি আমাদের হুকুম মত কাজ না করিস্, তা হলে আমরা তোকে মেরে ফেল্‌ব।" মেয়েটি ভয়ে স্বীকার কর্‌লে, তারা যা বল্‌বে, সে তাই কর্‌বে। তখন ভাজেরা বল্‌লে, "যা, ঐ কুয়া থেকে এই কল্‌সী করে জল তুলে নিয়ে আয়।" কলসীটার তলায় একটা মস্ত ফুটো ছিল। মেয়েটি কলসীটা নিয়ে কুয়ার ধারে বসে বসে কাঁদ্‌তে লাগ্‌ল। তার কান্না শুনে একটা বড় বেঙ জল থেকে উঠে বল্‌লে, "তুমি কাঁদ্‌ছ কেন ?" সে বল্‌লে, "আমার সময় হয়ে এসেছে, তাই কাঁদছি। এই ফুটো কলসী করে জল তুলে নিয়ে যেতে না পার্‌লে ভাজেরা আমায় মেরে ফেল্‌বে বলেছে।" বেঙ বল্‌লে, "তার জন্য ভাবনা কি ? তুমি কেঁদ না, আমি উপায় করে দিচ্ছি। ফুটোর মুখে আমি বসে থাক্‌ব, তা হলে আর জল পড়বে না।" বেঙ তখন কলসীর মধ্যে গিয়ে ফুটোর মুখে বস্‌ল। মেয়েটি জল নিয়ে বাড়ী ফিরে গেল। ভাজেরা তাকে জল নিয়ে আস্‌তে দেখে মনে মনে ভারি রেগে গেল। কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বল্‌তে পার্‌লে না। তখন তারা তাকে আর একটা কঠিন কাজ করতে বল্‌লে। বনের ভিতর থেকে কাঠ

তাকে মেরে ফেল্‌বে। মেয়েটি কি করে; বনের মধ্যে গিয়ে কাঠ কুড়িয়ে জমা করলে; কিন্তু বয়ে আন্‌বে কেমন করে? কোন উপায় না দেখ্‌তে পেয়ে সে মাটীতে বসে বসে কাঁদতে লাগ্‌ল। একটা মস্ত সাপ গর্ত্তের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলে, "তুমি কাঁদছে কেন?" মেয়েটি তাকে সব কথা বল্‌লে। সাপ বল্‌লে, "তোমার ভয় নেই, কেঁদ না। আমি বোঝার চারি দিকে জড়িয়ে থাকি, তা হলে তুমি কাঠের বোঝা নিয়ে যেতে পারবে।" তখন মেয়েটি সেই প্রকাণ্ড কাঠের বোঝা মাথায় করে নিয়ে বাড়ী গেল। এ কৌশলটাও ব্যর্থ হয়ে গেল দেখে ভাজেরা তাকে আরও একটা শক্ত কাজ দিয়ে বল্‌লে, "কাল্‌কে কড়াই ক্ষেতে যত কড়াই ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, আজ সন্ধ্যার মধ্যে সব কুড়িয়ে আন্‌তে হবে।" মেয়েটি একটা ধামা নিয়ে মাঠে গেল। কড়াই কুড়ুতে কুড়ুতে সে দেখ্‌লে, এত কড়াই সন্ধ্যার মধ্যে খুঁটে তোলা তার পক্ষে একেবারে অসম্ভব। সে মাটীতে বসে বসে কাঁদতে লাগ্‌ল। সে কাঁদছে, এমন সময় এক ঝাঁক পায়রা সেখানে উড়ে এসে তার কান্নার কারণ জান্‌তে চাইলে। মেয়েটি সব কথা খুলে বল্‌লে। তখন তারা বল্‌লে, "এ ত খুব সহজ কাজ। তুমি কেঁদ না।" এই বলে তারা মাঠময় ছড়িয়ে পড়ল। অল্প সময়ের মধ্যে তারা কড়াই খুঁটে খুঁটে মেয়েটির ধামা বোঝাই করে দিলে। সব কড়াই নিয়ে তখন সে বাড়ী ফিরে গেল। ভাজেরা তাকে ধামা-ভরা কড়াই নিয়ে আস্‌তে দেখে রাগে জ্বলে গেল। কিন্তু বাইরে রাগ না দেখিয়ে তারা ননদের হাতে একটা ঘটী দিয়ে বল্‌লে, "এই ঘটী ভরে ভালুকের দুধ বনের ভিতর থেকে আন্‌তে হবে।" মেয়েটি কি করে, ঘটীটা হাতে করে নিয়ে বনের মধ্যে গিয়ে কাঁদতে লাগ্‌ল। একটা ভালুকী সেইখান দিয়ে যাচ্ছিল। মেয়েটিকে কাঁদ্‌তে দেখে সে তার কাছে গিয়ে বল্‌লে, "তুমি কাঁদ্‌ছ কেন গা?" মেয়েটি তার ভাজেদের সব কথা তাকে খুলে বল্‌লে। ভালুকীর মনে বড় দয়া হল। সে বল্‌লে, "ভয় নেই, তোমার যত ইচ্ছা দুধ দুয়ে নাও।" ননদকে এবারেও নিরাপদে ফিরে আস্‌তে দেখে ভাজেরা পরামর্শ করলে, আর কৌশল করা হবে না। একেবারে মেরে ফেল্‌তে হবে। একদিন তারা ননদকে সঙ্গে করে নিয়ে বনের মধ্যে গেল। একট গাছ দেখিয়ে দিয়ে বল্‌লে, "এই গাছে উঠে আমাদের ফল পেড়ে দিতে হবে।" গাছটা খুব বড়। নীচে উঠবার মত কোন ডাল পালা ছিল না।

উপর উঠ্‌ল। ভাজেরা সেই সব গোঁজা তুলে নিয়ে তাকে একা রেখে বাড়ী চলে গেল। তারা ভাব্‌লে, অত বড় গাছ থেকে ননদ নাম্‌তে পার্‌বে না; এইবার না খেতে পেয়ে সে নিশ্চয় মরে যাবে। ক্রমে রাত হয়ে এল। মেয়েটি চুপ করে গাছের উপর বসে রইল। কে তাকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার কর্‌বে? ঘটনাক্রমে সেই দিন ছয় ভাই ব্যবসা বাণিজ্য করে দেশে ফিরে আস্‌ছিল। বনের মধ্যে অন্ধকারে পথ না দেখ্‌তে পেয়ে রাতটা তারা গাছতলাতেই কাটাবে ভাব্‌লে। যে গাছের উপর তাদের বোন্‌ বসেছিল, তারা সেই গাছের তলাতেই শুয়ে পড়ল। মেয়েটি ভাব্‌লে, এরা বুঝি ডাকাত। তার মনে বড় ভয় হয়েছিল, তাই সে চুপ করে রইল। কিন্তু দুঃখে কষ্টে তার দুই চোখ জলে ভরে গেল। এক ফোঁটা গরম জল এক ভায়ের মুখের উপর পড়্‌ল। জেগে উঠে সে উপরের দিকে চাইলে। তখনি সে তার বোন্‌কে চিন্‌তে পার্‌লে। সকলে মিলে বোন্‌কে নামিয়ে আন্‌লে। তার কাছে সব কথা শুনে তাদের ভারি রাগ হল। বাড়ী গিয়েই তারা সব বৌকে মেরে ফেল্‌লে।

ভাল রাণী।

এক রাজা বিয়ে করে বৌ নিয়ে বাড়ী যাচ্ছিলেন। তখন গ্রীষ্মকাল; পথটাও অনেক। লোক জন সকলেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। একটা বনের কাছে এসে রাজা ও তাঁর লোক জন পাল্কী নামিয়ে রেখে নিকটের নদীতে জল পান কর্‌তে গেলেন। রাণী একা সেই পাল্কীর মধ্যে বসে রইলেন। এমন সময় সেখানে একটা ভালুকী এসে উপস্থিত। সে তাঁকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে, "তুমি কে? কোথায় যাচ্ছ?" সব কথা শুনে ভালুকী মনে মনে ভাব্‌লে, রাণী হয়ে কি সুখ, একবার দেখ্‌তে হবে। এই ভেবে সে রাণীকে ভয় দেখিয়ে বল্‌লে, "যদি ভাল চাও ত আস্তে আস্তে তোমার গয়না গাঁটী কাপড় চোপড় আমায় দিয়ে পাল্কী থেকে নেমে বনের মধ্যে চলে যাও, নইলে মেরে ফেল্‌ব।" রাণী কি করেন, ভয়ে ভয়ে তাঁর বিয়ের পোষাক ও গয়না গাঁটী খুলে রেখে বনের মধ্যে চলে গেলেন। ভালুকী রাণীর পোষাক পরে পাল্কীর মধ্যে গিয়ে বসে রইল। এ দিকে লোকজন ফিরে এসে পাল্কী নিয়ে আবার যাত্রা কর্‌লে; তাদের মনে কোন সন্দেহই হল না। রাজাও কিছু জান্‌তে পার্‌লেন না। রাজ্যে ফিরে গিয়ে

যেতে রাজার একখানা কাপড় ও একগাছা লাঠি কুড়িয়ে পেলেন। রাজা যাবার সময় সেগুলি ফেলে গিয়েছিলেন। রাণী সেই লাঠি ও কাপড়খানা নিয়ে পথ চল্‌তে লাগ্‌লেন। রাজবাড়ীর নিকটেই এক "ঘাসী" স্ত্রীলোক ছিল। তার মেয়ে রাজবাড়ীতে ফুল যোগাত। একদিন একটা ফুলের মালা বেচবার সময় সে রাজাকে জানালে যে, আসল রাণী তার বাড়ীতে আছেন। রাজা ত এই কথা শুনে অবাক! তখনি ব্যাপার কি দেখ্‌বার জন্য ঘাসীর বাড়ী গেলেন। কাপড় ও লাঠি দেখে রাজা রাণীকে চিন্‌তে পার্‌লেন। রাণী পণ কর্‌লেন, ভালুকী যত দিন বেঁচে থাক্‌বে, তত দিন তিনি কখনই রাজবাড়ীতে যাবেন না। রাজা নিজের লোকজনদের ডেকে সব বল্‌লেন। রাজবাড়ীতে খবর গেল, হঠাৎ রাজার মৃত্যু হয়েছে। রাজার লোকজন রাজবাড়ীতে একটা মস্ত খানা খুঁড়ে তার উপর চিতা সাজালে। ভালুকীর কাছে খবর গেল যে, রাজার মুখাগ্নি তাকেই কর্‌তে হবে। ভালুকী চিতার কাছে এসে কর্ম্মচারীদের কথামত রাণীর পোষাক খুলে ফেল্‌লে। তার পর উপদেশমত যেই হাঁটু পেতে বসে চিতাকে প্রণাম কর্‌বে, অমনি সকলে জোর করে তাকে অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে ঠেলে ফেলে দিলে। ভালুকী পুড়ে মরে গেল। রাজাও আসল রাণীকে নিয়ে রাজবাড়ীতে এলেন। এই ঘটনার পর থেকে ভালুক মানুষ দেখ্‌লেই আক্রমণ করে থাকে।

শেয়াল ও চিল।

এক শেয়াল ও এক চিল পরামর্শ করলে, তারা যা উপায় করবে, দু জনে ভাগযোগ করে তাই খাবে। তারা এক গ্রামে রটিয়ে দিলে যে, এক রাজা সেই গ্রাম লুট করবার জন্য সৈন্য সামন্ত নিয়ে আসছেন। পরদিন সকালবেলা শেয়াল একটা শূন্য কলসী যোগাড় করে গ্রামের মধ্যে গেল। সেখানে গিয়ে সে খুব জোরে কলসী বাজাতে লাগল, আর চিলটা চারি দিকে উড়ে উড়ে চীৎকার করতে আরম্ভ করলে। গ্রামের লোকেরা ভাব্‌লে, রাজার সেপাই শান্ত্রী বুঝি আস্‌ছে। তখন প্রাণের ভয়ে তারা ঘর বাড়ী ফেলে বনের মধ্যে পালিয়ে গেল। শেয়াল ও চিল পরম আনন্দে যার বাড়ী যা ভাল জিনিস পেলে, খেয়ে বেড়াতে লাগ্‌ল। একটা বুড়ী পালাতে পারে নাই। সে তার বাড়ীর মধ্যে লুকিয়ে ছিল।

ও চিল সব জিনিস খেয়ে বেড়াচ্ছে। তখন সে চুপি চুপি ঘর থেকে বেরিয়ে বনের মধ্যে গিয়ে সকলকে এ কথা জানালে। গ্রামবাসীরা ফিরে এসে চারি দিক ঘেরাও করলে। শেয়াল আর পালাবার পথ পেলে না, সে ধরা পড়ল। গ্রামবাসীরা লাঠি ঠেঙ্গা নিয়ে তাকে বেদম প্রহার করলে। কিন্তু শেয়ালটা অত মার খেয়েও চুপ করে রইল, যেন তার কিছুই হয়নি। খানিক পরে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে সে বিদ্রূপস্বরে বললে, "মারে আমার কিছুই হবে না। ওতে আমি মরব না।" তারা বললে, "তবে কিসে মরবি বল্?" শেয়াল বললে, "যদি পুড়িয়ে মারতে পারিস, তবে মরতে পারি।" তাই শুনে তারা পুরাণ কাপড় তেলে ভিজিয়ে তার লেজে বেশ করে জড়িয়ে দিয়ে তাতে আগুন ধরিয়ে দিলে। শেয়ালটা অমনি এক লাফে একখানা চালা-ঘরের উপর উঠে পড়ল। ঘরখানা জ্বলে উঠল। ক্রমে চারি দিকে আগুন ছড়িয়ে পড়ল। দেখতে দেখতে সমস্ত গ্রামটা পুড়ে ছাই হয়ে গেল। তার পর শেয়ালটা একটা পুকুরে ঝাঁপিয়ে পড়ে লেজের আগুন নিভিয়ে ফেললে। ভাল করে লক্ষ্য করলে সকলে দেখতে পাবে, এখনকার সব শেয়ালের লেজের আগায় পোড়ার দাগ আছে।

বারণ রাজার পুত্র।

এক দেশে এক রাজা ছিলেন। তিনি প্রত্যহ একটা পুকুরে নেমে স্নান করতেন। সেই পুকুরে একটা মস্ত মাছ ছিল। রাজা মুখ ধুয়ে থুতু জলে ফেলতেন, মাছটা তাই খেত। ক্রমে মাছের পেটে তাই থেকে দুটি মানুষ ছেলে জন্মগ্রহণ করলে। ছেলে দুটি ডাগর ডোগর হয়ে, পুকুরের কাছে গ্রামের অন্যান্য ছেলেদের সঙ্গে খেলা করত। একদিন একটা লোক তাদের দু ভাইকে মেরে ধ'রে তাড়িয়ে দিলে। বলে দিলে, যাদের বাপের নাম ঠিক নাই, তারা ভদ্রলোকের ছেলেদের সঙ্গে কোন্ সাহসে খেলা করে? এই কথা শুনে ছেলে দুটির মনে বড় কষ্ট হল। তারা মাছকে জিজ্ঞাসা করলে, "সত্যই কি আমাদের বাপ নাই?" মাছ বললে, "বাছারা! তোদের তিনি জন্মদাতা, তাঁর নাম বারণ রাজা।" ছেলে দুটি মনে মনে ঠিক করলে, তারা বাপের সন্ধানে যাবে। কিছু দিন ঘুরতে ঘুরতে একটা লোককে দেখতে পেয়ে তারা তাকে বারণ রাজার কথা জিজ্ঞাসা করলে।

ছেলে।" লোকটা বারণ রাজার শত্রু। সে তাই শুনে ছেলে দুটিকে মেরে ফেল্‌লে। যেখানে তাদের মৃতদেহ পড়েছিল, কিছু দিন পরে সেখানে দুটি বাঁশ-ঝাড় জন্মাল। দুটি বাঁশ যখন খুব বড় হয়েছে, তখন এক যোগী সেই পথ দিয়ে যাবার সময় সে দুটি কেটে নিলেন। সেই বাঁশ দুটিতে সুন্দর বাঁশী তৈরী হল। তিনি যখন বাঁশী দুটি বাজাতেন, তখন ভিতর থেকে এমন মধুর শব্দ বেরুত যে, যে শুন্‌ত, সেই মুগ্ধ হয়ে যেত। যোগীর নাম ক্রমে চারি দিকে ছড়িয়ে পড়ল। যোগী একদিন ভ্রমণ কর্‌তে কর্‌তে বারণ রাজার রাজ্যে এসে পড়লেন। রাজা তাঁকে কাছে ডেকে পাঠালেন। যোগী বাঁশী দুটি নিয়ে রাজবাড়ীতে গেলেন। বাঁশী দুটি যেই রাজার কাছে নিয়ে গেছেন, অমনি তার ভিতর থেকে দুটি ছেলে বেরিয়ে এল। তাদের কাহিনী শুন্‌বামাত্র রাজা তাদের নিজের ছেলে বলে চিন্‌তে পারলেন। তখন যোগীকে রীতিমত পুরস্কার দিয়ে রাজা তাঁকে বিদায় করে দিলেন।

কুম্ভকার-পুত্র।

এক কুমোরের স্ত্রী সন্তানসম্ভবা হয়েছিল। তারা বড় গরীব। স্বামী স্ত্রীতে পরামর্শ করলে, যদি ছেলে হয়, তবে তারা তাকে পরিত্যাগ কর্‌বে। আর যদি মেয়ে হয়, তবে লালনপালন কর্‌বে। কিন্তু কুমোরের স্ত্রী একটি ছেলেই প্রসব কর্‌লে। তখন কুমোর ছেলেকে নিয়ে বনে ফেলে দিয়ে এল। একটা বাঘ ছেলেটিকে দেখ্‌তে পেয়ে বাঘিনীর কাছে নিয়ে গেল। তাদের ছানা সেই সময় মরে গিয়েছিল, সুতরাং বাঘ ও বাঘিনী ছেলেটিকে নিজের ছানার মত লালনপালন করতে লাগ্‌ল। ক্রমে ছেলেটি ভাল খেয়ে দেয়ে খুব বলিষ্ঠ ও বড় হতে লাগ্‌ল। একদিন বাঘ এক কামারের দোকানে গিয়ে ছেলের জন্ত তীর ধনুক তৈরি করে আন্‌লে। সে সেই তীর ধনুক নিয়ে শিকার করত। ক্রমে তার যৌবনকাল দেখে বাঘ তার বিয়ের জন্য ভারি ব্যস্ত হয়ে পড়্‌ল। একদিন সে এক রাজার দেশে গেল। সেই দেশের রাজকন্তা দীঘিতে স্নান করতে আস্‌ছিল, বাঘ অমনি তাকে মুখে করে নিয়ে বনে এল। সেখানে কুমোরের ছেলের সঙ্গে রাজকন্তার বিয়ে হল। স্বামী পেয়ে রাজকন্যা খুব সুখী হলেন; কিন্তু দিন রাত বাঘের সঙ্গ তাঁর সহ্য হল না। রোজ তিনি স্বামীকে পালিয়ে যাবার জন্ত বল্‌তেন। একদিন কুমোরের ছেলে রাজী হল। বাঘ ও বাঘিনী যখন দূরে গেছে, সেই অবসরে স্বামী ও স্ত্রী পালিয়ে গেল। রাজবাড়ীর

মধ্যে প্রবেশ করলেন। কুমোরের ছেলে দীঘি দেখে স্নান করতে নাম্‌ল। এক ধোপা সেখানে কাপড় কাচ্‌ছিল। সে ভাবলে, এ লোকটা বুঝি চোর। এই ভেবে সে কুমোরের ছেলেকে মেরে জলের মধ্যে ফেলে দিলে। এ দিকে রাজকন্যা ফিরে এসে স্বামীকে দেখ্‌তে পেলেন না। কেবল দীঘির ধারে তার তীর ধনুক পড়েছিল। চারি দিকে সন্ধান হতে লাগল। জাল ফেলে দীঘিটাও খোঁজা হল; কিন্তু রাজকন্যা তাঁর স্বামীর কোন সন্ধান পেলেন না।

কিছু দিন পরে এক ঘাসীর মেয়ে সেই দীঘিতে চিংড়ি মাছ ধরতে ধরতে একটা বড় মাছ পেলে। সে মহানন্দে মাছ নিয়ে বাড়ী গেল। মাছ কুট্‌তে কুট্‌তে সে দেখ্‌তে পেলে, মাছের পেটের মধ্যে একটি সুন্দর টুক্‌টুকে ছেলে! সে ছেলেটিকে মানুষ করবে, ঠিক করলে। একটা চুবড়ীতে ছেলেটিকে রেখে সে সেই চুবড়ীটা নিজের কাপড়ের নীচে রাখ্‌লে। ক্রমে প্রকাশ হল, তার শীঘ্র সন্তান হবে। তার পর একদিন সে সকলকে বল্‌লে, তার একটি ছেলে হয়েছে। ছেলেটি শীঘ্র শীঘ্র এত বেড়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল যে, সকলে আশ্চর্য্য হয়ে গেল।

এ দিকে রাজা পুনরায় তাঁর মেয়ের বিয়ে দেবার চেষ্টা কর্‌তে লাগ্‌লেন। কিন্তু রাজকন্যা প্রচার করে দিলেন, যে সেই লোহার ধনুকে গুণ দিতে পার্‌বে, তিনি তাকেই বিয়ে কর্‌বেন। অনেকে সেই কথা শুনে বিয়ের জন্য এল; কিন্তু কেউ সে ধনুক নোয়াতে পার্‌লে না। অবশেষে একদিন ঘাসীর ছেলে এসে অবলীলাক্রমে সেই ধনুকে তীর দিয়ে ছুঁড়লে। রাজকন্যা তখন তাঁর প্রকৃত স্বামীকে পেয়ে সুখে কাল কাটাতে লাগ্‌লেন।

অদ্ভুত রাখাল।

এক রাজার সাত মেয়ে ছিল। সাতটি রাজকন্যা প্রত্যহ স্নান কর্‌বার সময় পুকুরপাড়ের একটা গর্ত্তের ভিতর গায়ের ময়লা রেখে দিতেন। সেই গর্ত্তের ভিতর থেকে একটা গাছ জন্মাল। বড় রাজকন্যা এই ঘোষণা করে দিলেন যে, ঐ গাছটির জন্মকথা যে বলতে পার্‌বে, তিনি তাকে বিয়ে কর্‌বেন। দেশ বিদেশ থেকে অনেক লোক এল, কিন্তু কেউ আসল কথা বল্‌তে পার্‌লে না। রাজা মেয়ের বিয়ের জন্য ভারি চিন্তিত হয়ে পড়্‌লেন। রাজ্যের প্রত্যেক লোককে তিনি এই প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য অনুরোধ কর্‌লেন। অবশেষে

সেই দীঘির পাড়ে গরু চরাত, এবং প্রায়ই রাজকন্যাদের স্নান কর্‌তে দেখ্‌তে পেত। গাছের জন্ম-রহস্য সে জান্‌ত। প্রশ্নের ঠিক উত্তর যখন সে দিলে, তখন রাজকন্যা বাধ্য হয়ে তাকে বিয়ে কর্‌লেন। বিয়ের পর রাজকন্যা স্বামীর সঙ্গে তার কুঁড়ে ঘরে গিয়ে বাস কর্‌তে লাগ্‌লেন।

সমস্ত দিন রাখাল পীড়ার যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ কর্‌ত। কিন্তু রাত হলে সে দিব্য উজ্জ্বল দেহ ধারণ করে তার কদাকার খোলসের বাইরে আস্‌ত। এই সুন্দর রূপ ধারণ করে সে রাজবাড়ীর সাম্‌নের মাঠে চাঁদের আলোতে নাচ গান কর্‌ত। এক দিন রাজকন্যার দাসী দেখ্‌লে, তার মনিব ঐরূপ বেশে ক্রীড়া কৌতুক ক'রে আবার সেই জীর্ণ খোলসের মধ্যে প্রবেশ কর্‌লে। সে রাজকন্যাকে সব কথা বল্‌লে। রাজার মেয়ে রাত্রে চৌকি দেবেন, ঠিক কর্‌লেন। পর দিন রাত্রে রাখাল যখন দিব্য সুন্দর রূপ ধ'রে কদাকার বিশ্রী খোলসটা মাটীতে রেখে বাইরে চলে গেল, রাজকন্যা তখন সেই খোলসটা আগুনের মধ্যে ফেলে দিলেন। তাঁর স্বামী তৎক্ষণাৎ ছুটে ঘরের মধ্যে ঢ়ুকে বল্‌লে যে, তার গা জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে। ততক্ষণ খোলসটা পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল, সুতরাং রাখালের দেহ সেই রকম উজ্জ্বল ও সুন্দর থাক্‌ল। রাজকন্যা তখন স্বামীর সর্ব্বাঙ্গে তেল মালিশ করে দিলেন। রাখালের আর জ্বালা যন্ত্রণা রইল না। রাজকন্যা এমন সুপুরুষ স্বামী পেয়ে সুখে ঘরকন্না করতে লাগ্‌লেন। রাখাল দিনের বেলা কোথাও যেত না, কেবল রাত্রিকালে ঘরের বাইরে আস্‌ত। কারণ, তার সে উজ্জ্বল বর্ণ সাধারণ লোকের চোখ্ ঝল্‌সে দিত।

ক্রমে রাষ্ট হল যে, রাজকন্যার ঘরে এক জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ আছে। কথাটা রাজার কানেও গেল। তিনি খবর জানবার জন্য এক চর পাঠিয়ে দিলেন। দূত যেমন রাখালের দিকে চেয়েছে, অমনি তার দুটি চক্ষু অন্ধ হয়ে গেল। সে পাগলের মত ছুটে রাজার কাছে গেল। রাজা আরো দু তিন জন লোককে ক্রমে ক্রমে পাঠালেন। তাদের সবারই এক দশা হল। রাজা তখন নিজে দেখ্‌তে গেলেন। জামাইয়ের সেই উজ্জ্বল রূপ দেখে রাজা মূর্চ্ছিত হয়ে মাটীতে পড়ে গেলেন। শ্বশুরের অবস্থা দেখে জামাই ছুটে এসে তাঁর মূর্চ্ছা ভাঙ্গালে। এই ঘটনার পর থেকে রাখালের উজ্জ্বল বর্ণ অনেকটা ম্লান হয়ে গেল। রাজা তাকে রাজ্যের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী স্থির

পত্র।

[ফরাসী কবি কপ্পে হইতে।]

তোমারে যে ভালবাসি,
তোমা ভালবাসি প্রিয়ে !
তোমারে গড়িলা বিধি
বাঁকা ভুরু, মাজা সরু—
সত্য বটে প্রথমেতে
কিন্তু এবে তোমারেই
আকাশ-কুসুম-সম
এইমাত্র চাহি, তুমি
অনুভব কর তুমি
কি গভীর, কি পবিত্র,
এত দিন ছাড়াছাড়ি,
তোমারে রেখেছি হৃদে
জানি তব মন ভাল,
তাহাই যথেষ্ট মোর,
তোমার ব্যভারে যদি
এ হৃদি প্রস্তুত আছে
এ তীব্র প্রণয়ি-প্রেমে
সহিব গো অকাতরে
দুর্ব্বল জানি গো আমি—
তাই আমি নাহি ভাবি
কিন্তু জানি এইটুকু
নির্দ্দয় নির্ম্মম ভাব
এইমাত্র করি আশা
একটু বাসিবে ভাল

নহে সে গো আদর্শের ভাবে,
—সে শুধু তোমারি অনুরাগে।
যেমনটি তাই আমি চাই ;
—কি তাহে, যদি বা নাহি পাই।
রূপ-মোহে হইনু আকৃষ্ট,
—তোমারেই লাগে মোর মিষ্ট।
নাহি আমি চাহি অসম্ভব ;
বোঝো মোর প্রেমের গৌরব ;
—মনে মোর এইমাত্র আশা—
কি অনন্ত মোর ভালবাসা।
তবু দেখ প্রণয়েরি জয় ;
অবিকৃত অটুট অক্ষয়।
নাহি তাহে ছলনার স্পর্শ ;
কে চাহে গো নিখুঁত আদর্শ ?
প্রাণে কভু পাই গো বেদনা,
করিবারে সতত মার্জ্জনা।
আছে সৌম্য সখার বাৎসল্য ;
হৃদে যদি বিদ্ধ হয় শল্য।
এ মরতে মানব মানবী,
তোমারে গো আদর্শের ছবি।
—তব অতি কোমল পরাণ,
তাহে কভু নাহি পাবে স্থান।
—প্রিয়ে, আমি বলি তা' প্রকাশি'—
—আমি যে গো এত ভালবাসি।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

প্রত্যাগত।

১

প্রবল পরাক্রান্ত সিদ্ধেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ক্রোধানল প্রজ্বলিত হইলে অনেকটা আসে যায়। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সোনাপুরের জমীদার, এবং জমীদারীর আয়তন বৃহৎ।

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় জীবনের মধ্যাহ্নে ও অপরাহ্নে প্রায় চারি বৎসর ধরিয়া চারিটি বিবাহ করিয়াছিলেন। তাহারই ফলে একটি পুত্র ও একটি কন্যা সন্তান লাভ করেন। দুঃখের বিষয়, তাহাদিগের জননীবর্গের মধ্যে কেহই বাঁচিয়া ছিল না; থাকিলেও বিশেষ কিছু আসিত যাইত না।

পুত্র মহেশচন্দ্র কলিকাতায় বি. এ. ক্লাসে জ্ঞান উপার্জ্জন করিতেছিলেন। তাঁহার বয়স বিশ বৎসর। সোহাগিনী কন্যা গোলাপ দশ বৎসরের। দুই বৎসর পূর্ব্বে প্রজা হরিনাথ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র বিজয়কে গৃহজামাতার পদে বরণ করিবেন মনঃস্থ করিয়া সিদ্ধেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অনেকটা চুপ করিয়া বসিয়া ছিলেন। বিজয়ের বয়স বাইশ, এবং সে সুশীল, সুন্দর, সচ্চরিত্র ও শান্ত। বিজয় বি. এ. পাশ করিয়া ওকালতি পড়িতেছিল। বিজয় অপেক্ষা ভাল পাত্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের শীঘ্র পাওয়া অসম্ভব; বিশেষতঃ, গোলাপকে কোন জমীদারের ঘরে দিয়া গৃহ অন্ধকার করিবার ইচ্ছা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মোটেই ছিল না।

বিজয়ের পিতা হরিনাথ অতি দরিদ্র। দুই বিঘা জমী ও মাসিক দুই টাকা বৃত্তির সাহায্যে কায়ক্লেশে কোনও প্রকারে বিজয়ের কলেজের খরচ সংগ্রহ করিতেন। বিজয়ের কনিষ্ঠ মাধব নয় বৎসরের। তাহারও স্কুলের পঞ্চম শ্রেণী অধিকার করিবার সময় হইয়া আসিয়াছিল। সুতরাং বিজয়ের গোলাপের সহিত বিবাহ হইলে মুখোপাধ্যায়-সংসারের দারিদ্র্য ঘুচিয়া যাইত।

কিন্তু বিধাতার নির্ব্বন্ধ সরল রেখার দিকে যায় না। বিজয় ঘরজামাতা হইতে স্বীকৃত হইল না। :বিজয়ের পিতা বিজয়ের পত্র পাইয়া অনেকটা চিন্তাকুল হইলেন, এবং এ সম্বন্ধে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে কিছুই বলিলেন না।

বিজয়ের মাতা অনেক করিয়া স্বামীকে বুঝাইলেন। "একবার বিজয়

গোলাপ সুন্দরী। অতএব, বিজয়ের মাতার বিশ্বাস, সুন্দরী মেয়ে দেখিলেই বিজয় ভুলিয়া যাইবে।

কিন্তু একালের ছেলেরা নানা রূপে অবতীর্ণ হয়। কেহ নৃসিংহ, কেহ বামন, এবং কেহ কেহ বুদ্ধ-রূপে। বিজয় স্বাধীনচেতা যুবক। সে ভ্রুকুটী-কুটিল-আঁখিযুক্ত একটা গোলাকার বদনের কল্পনা করিয়া এবং সিদ্ধেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবজ্ঞা ও উপেক্ষায় পূর্ণ লম্বা লম্বা চড়া কথা স্মরণ করিয়া এ বিবাহে কিছুতেই রাজি হইল না।

কাজেই বিজয়ের সহিত একটি দরিদ্র গৃহস্থের কন্যা কনকের বিবাহ হইল।

শুভদৃষ্টির সময় কনক মনে করিয়াছিল, বিজয়কে একবার দেখিয়া লইবে; কিন্তু ভয়ে তা' পারিল না। বাসরঘরেও কথাবার্ত্তা, মুখ দেখাদেখি কিছুই ভাল করিয়া হইল না। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ভয়ে বর কন্যা সোনাপুরে গেলই না।

কাজেই নিশিশেষে একবার কুরঙ্গের মত সভয়ে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া কনকলতা স্বামীর পদতলে একটা অঙ্গুরী রাখিয়া প্রস্থান করিল।

কনকের মাতা মরিবার সময় সেই অঙ্গুরীয় কন্যাকে স্মরণচিহ্নস্বরূপ দিয়া যান। কনকের পিতাও নাই। কনক মামার বাড়ীতে থাকে।

বিজয় বুঝিতে পারিল না যে, কনক পিতৃমাতৃবিয়োগজনিত শোক ও স্নেহ স্মৃতির ভার আজ স্বামীর পদতলে সঁপিয়া দিতে চাহিয়াছিল। সে কিছু আশ্চর্য্য হইয়া অঙ্গুরী তুলিয়া লইল, এবং পরদিন কলেজে চলিয়া গেল।

মুখোপাধ্যায় সস্ত্রীক সভয়ে সোনাপুরে প্রত্যাগমন করিলেন।

কিন্তু বিবাহের ন্যায় একটা বৃহৎ ব্যাপার কখনই লুক্কায়িত থাকে না।

সিদ্ধেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রাতঃকালে শুনিলেন যে, হরিনাথ মুখুর্য্যে সপরিবারে কলিকাতায় গিয়া বিজয়ের বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া আসিয়াছেন।

ইহাই ক্রোধানল উদ্দীপ্ত হইবার কারণ।

বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথমে অন্ধকার দেখিলেন, এবং আত্ম-সংবরণ করিয়া চতুর্দ্দিক ক্রমে ধূম্রবর্ণ, পাটলবর্ণ ও রক্তবর্ণ দেখিলেন।

জমিদারী-কাছারীতে বন্দ্যোপাধ্যায় বসিয়া আছেন, এমন সময় বৃদ্ধ হরিনাথ অভিবাদন করিয়া নিকটে আসিলেন।

সিদ্ধেশ্বর। তোমার ছেলের বিবাহ হইয়া গিয়াছে না?

হরিনাথ। আজ্ঞে হাঁ—সে আমাকে বড় একটা (শুষ্ককণ্ঠে) জিজ্ঞাসা করে নাই—একালের ছেলে—

সিদ্ধেশ্বর। সব হতভাগা,—বয়াটে। আচ্ছা, তুমি কি চাও?

হরিনাথ। আমার জমীর খাজানা আমি এখন দিতে অক্ষম।

সিদ্ধেশ্বর। তোমার খাজানা দ্বিগুণ বৃদ্ধি করা হইয়াছে, এবং দুই টাকা বৃত্তিও অদ্য হইতে বন্ধ হইয়া গেল। পরে অন্যান্য উপায় অবলম্বন করা যাইবে—

ইহা বলিয়াই ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্রের ন্যায় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় গণেশ সিংহ দরোয়ানের দ্বারা হরিনাথের গলা ধরিয়া সোনাপুর কাছারী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। বৃদ্ধ হরিনাথ মধুসূদনের নাম স্মরণ পূর্ব্বক কুটীরে গিয়া কাঁদিল।

তৎপরেই কিছু দিনের মধ্যে মহাসমারোহে নিকটবর্ত্তী চল্লিশবৎসরবয়স্ক যুবক এক জন ধনাঢ্য কুলীন জমীদারের সহিত গোলাপের বিবাহ হইয়া গেল।

বিজয় কলিকাতা হইতে এই অপমানের কথা শুনিল। ক্ষোভে দুঃখে তৎক্ষণাৎ একটা চাকরীর চেষ্টা করিল; কিন্তু কৃতকার্য্য হইল না। বিজয় পিতাকে পত্র লিখিল, "আমার পড়ার খরচ দিতে হইবে না। আমি উড়িষ্যায় চলিলাম; সেখানে চাকুরী জুটিবে। আপনি কিছু দিন চুপ করিয়া থাকুন। আমি এ অপমানের প্রতিশোধ লইব।"

২

উল্লিখিত ঘটনার পাঁচ বৎসর পরে সোনাপুরের নবীন জমীদার যুবক মহেশচন্দ্র শ্রীক্ষেত্রধাম হইতে বাটী প্রত্যাগমন করিতেছিলেন।

সঙ্গে বিধবা ভগ্নী গোলাপ ও দূরসম্পর্কীয় কতকগুলি প্রৌঢ় স্ত্রীলোক।

মান্দ্রাজ মেলে অসম্ভব ভিড়। মহেশচন্দ্র ভগ্নীকে লইয়া প্রথম শ্রেণীতে উঠিলেন।

এক জন কটাচক্ষু সাহেব উভয়কে উঠিতে দেখিয়া প্রথমে কিছু বিরক্ত হইয়াছিল; অবশেষে গোলাপের রূপ দেখিয়া বিস্মিত হইয়া একটু গোঁফে তা দিয়া লইল।

অনতিদূরে একটি যুবক সংবাদপত্র পাঠ করিতেছিলেন। তিনি ষ্টেশনে পঁহুছিবার পূর্ব্বেই সাহেব পূর্ব্ব স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া, যেখানে গোলাপ ছিল,

তখন দ্বিপ্রহর রাত্রি। সাহেবের হাবভাব কটাক্ষ প্রভৃতি দেখিয়া ভ্রাতা ভগ্নী উভয়েই ভয় পাইয়াছিলেন। ক্রমে সিনি ষ্টেশনে পঁহুছিলে মহেশচন্দ্র মনে মনে ভাবিলেন, গোলাপকে স্ত্রীলোকের কামরায় দিলে ভাল হয়। তিনি মুখ বাড়াইয়া এ দিক ও দিক চাহিতে লাগিলেন।

অবসর বুঝিয়া সাহেব গোলাপের দিকে আরও ঘেঁসিয়া গেল। গোলাপ ভয় পাইলেও চীৎকার করিতে সাহস পাইল না। সাহেব মনে মনে ভাবিল, বিশেষ ভয়ের কারণ নাই। ক্রমে গোলাপের হাত ধরিল।

গোলাপ অস্ফুটস্বরে একবার ভ্রাতাকে ডাকিল। তখন গাড়ী ছাড়িয়া দিয়াছে। মহেশচন্দ্র ফিরিয়া চাহিলেন।

মহেশচন্দ্র সাহেবকে বলিলেন, "তুমি ও দিকে যাও।" সাহেব গেল না। কেবল কটমট করিয়া চাহিয়া রহিল। ক্রমে একটা গোলযোগ হইল। সাহেব মহেশকে ঘুসি মারিল। মহেশ পড়িয়া গেলেন।

অপরিচিত যুবক এতক্ষণ একমনে কি ভাবিতেছিলেন। ব্যাঘ্রাক্রান্ত হরিণীর ন্যায় গোলাপ সভয়ে যুবককে জড়াইয়া ধরিল।

সাহেব যুবককে ঠেলিয়া ফেলিতে গেল। কিন্তু পারিল না। ধীর লক্ষ্য করিয়া সেই অপরিচিত যুবক সাহেবকে দুইটা ঘুসি মারিল।

সাহেবের নাসিকা ও কপাল ফাটিয়া রক্ত বাহির হইল।

সাহেব বুঝিতে পারিল, যুবকের স্নায়ু ও মাংসপেশী অসাধারণ বলিষ্ঠ। সে পরাস্ত হইয়া পূর্ব্বস্থানে চলিয়া গেল।

যুবক ধীরে ধীরে মহেশচন্দ্রকে তুলিল। পোর্টম্যাণ্টো হইতে কিঞ্চিৎ "আর্ণিকা লোশন" লইয়া জলে মিশ্রিত করিয়া মহেশের মাথায় জলপটি দিল, এবং গোলাপকে বলিল, "তুমি বাতাস কর।"

মহেশচন্দ্র চাহিয়া দেখিলেন, গোলাপ কাঁদিতেছে। মহেশ বলিল, "ভয় নাই, আমি ভাল আছি।"

অপরিচিত যুবক আবার সংবাদপত্রখানি লইয়া উপরিস্থিত গ্যাস-লাইটের সাহায্যে পাঠ করিতে লাগিল।

গোলাপ ষোড়শী। গোলাপ বিধবা। যুবক একবার চাহিয়া গোলাপের অপরিসীম সৌন্দর্য্য দেখিল। আবার মহেশের দিকে চাহিল। যুবক বলিল, "আপনাদের ফার্ষ্ট ক্লাসে আসা উচিত হয় নাই।"

লৌহবর্ত্ম-প্রবাহিত প্রবল বাত্যা গবাক্ষপথে প্রবিষ্ট হইয়া যুবকের কুঞ্চিত

কেশদাম লইয়া খেলা করিতেছিল। সূর্য্যতাপক্লিষ্ট কোমল নয়নের বিমর্ষ জ্যোতি সুদূর অন্ধকারে আরোপিত করিয়া যুবক শীতল সন্ধ্যাবায়ুর সহিত জীবনের কোনও অজ্ঞাত আশার কল্পনা করিতেছিল।

গোলাপ লুকাইয়া সে মুখের দিকে অনেকবার চাহিল. কিন্তু যুবকের দৃষ্টি ক্রমে অন্ধকার ছাড়িয়া আকাশের তারকার দিকে গেল। সেখান হইতে ফিরিল না।

যুবক সারারাত্রি জাগিয়া রহিল। সকালে সাহেব খড়্গপুর ষ্টেশনে নামিয়া পুলিস সাহেব ও ষ্টেশনমাষ্টারের সহিত কি একটা পরামর্শ করিল।

উভয়ে মাথা নাড়িয়া বলিল, "উহুঁ!—ফৌজদারী হইতে পারে না। বিধু বাবু এক জন মান্যগণ্য সম্ভ্রান্ত লোক। অনায়াসে বিশ লক্ষ টাকা খরচ করিতে পারেন। বিশেষতঃ এ প্রদেশের ম্যাজিষ্ট্রেট ও কমিশনরগণ উঁহাকে যথেষ্ট মান্য করিয়া থাকেন।"

সাহেব নিরুপায় হইয়া কিছু অধিক মাত্রায় মদ্যপান করিয়া খড়্গপুরেই থাকিয়া গেল।

বেলা নয়টার সময় মহেশচন্দ্র কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন।

যুবক জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি ভাল আছেন?"

মহেশ। হাঁ; আপনার নাম?

যুবক। বিধুভূষণ মুখোপাধ্যায়। আমি কণ্ট্রাক্টরী করি।

মহেশ। কোথায় যাইবেন?

যুবক। সোনাপুর।

মহেশ। কেন?

যুবক। সেখানে রেশমের ঠিকা লইয়াছি।

মহেশ। আমিই সোনাপুরের জমীদার।

যুবক। তবে আমার পত্র পান নাই?

মহেশ। না; পিতার মৃত্যুর পর বিধবা ভগ্নীকে লইয়া জগন্নাথধামে আসিয়াছিলাম।

যুবক। ইনিই আপনার বিধবা ভগ্নী?

গোলাপ মাথায় কাপড় টানিয়া দূরে গেল। যুবক কি ভাবিতে লাগিল

মহেশ। সোনাপুরে আপনি কখনও গিয়াছেন?

যুবক। না।

মহেশ। কোথায় থাকিবেন ?

যুবক। জানি না।

মহেশ। আমরা উভয়ে আপনার কৃত উপকারের জন্য কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ। আপনি আমাদের বাড়ীতে থাকিবেন চলুন। রেশমের জন্যে ভাবিবেন না। আমি সস্তা দরে আপনাকে ঠিকা দিব।

যুবক হাসিয়া বলিলেন, "আমি সস্তা দরে চাহি না। আপনি যে উপকারের কথা বলিতেছেন, তাহার কোনও মূল্যই নাই। সামান্য পশুগণও দলবদ্ধ হইয়া পরস্পরের সাহায্য করিয়া থাকে।"

তাহার পর সকলে সোনাপুরে গেল।

৩

পাঁচ বৎসর গিয়াছে। কনক বিবাহের পর বিজয়কে আর দেখে নাই। বিজয় পত্র লিখিত। কনক পত্রগুলি পড়িয়া একটা ভাঙ্গা বাক্সের মধ্যে রাখিয়া দিত। সেই ভাঙ্গা বাক্সের মধ্যে কনকের দুইখানি গহনা ও সেই পত্রগুলি সম্বল ছিল। বিজয় ছোটনাগপুরে সরগুজার মহারাজের নিকট চাকুরী পাইয়াছে। কনক বিজয়ের পত্রে তাহাই জানিত। মাসে মাসে বিজয় বৃদ্ধ পিতাকে কুড়িটা টাকা পাঠাইয়া দিত। কনক বড় হইয়াছে। কনকের সৌন্দর্য্য ফুটিয়াছে। কনক আর বালিকা নহে। অতএব বিজয়ের পিতা কনককে সোনাপুরে লইয়া আসিয়াছেন। কনক গৃহকার্য্য করে, এবং সময় পাইলে বিজয়ের বড় আশার কলেজের পুস্তকগুলিতে বিজয়ের নাম লেখে, এবং তাহারই নীচে নিজের নাম লিখিয়া মুছিয়া ফেলে।

বিজয়ের কনিষ্ঠ মাধব এখন এণ্ট্রেন্স পাশ করিয়াছে। কাজেই কলিকাতায় যাইতে হইবে। বিজয়ের মাতা একদিন বৃদ্ধ হরিনাথকে চুপি চুপি বলিলেন,—

"বৌকে ছোটনাগপুরে পাঠাইয়া দিয়া আমাদের কলিকাতায় গেলে কেমন হয় ?"

হরিনাথ। বিজয়ের পত্র পাইয়াছি। প্রসিদ্ধ কণ্ট্রাক্টর বিধুবাবু বিজয়কে এক শত টাকা মাসে দিয়া তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটারী করিয়াছেন। বিজয়ের মুনিব শীঘ্রই এ দেশে আসিবেন। তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া যাহা হয় করিব। এখন বৌকে এ সব কথা কিছু বলিও না।

অতএব যাওয়া স্থগিত হইল। মাধব কলিকাতায় চলিয়া গেল।

বিজয়ের আগমনবার্ত্তা সোনাপুরে প্রচারিত হইল। কিন্তু

মুখোপাধ্যায় শুনিলেন যে, বিধুবাবু সোনাপুরের জমীদার-বাটীতে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছেন, তখন তাঁহার একটা দুর্ভাবনা উপস্থিত হইল। তাঁহার পক্ষে সেখানে যাইয়া বিধুবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করা অসম্ভব।

সিদ্ধেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর ও গোলাপের বৈধব্য ঘটিবার পর হরিনাথের পূর্ব্ব অপমানের কঠোর স্মৃতি অনেকটা ক্ষীণভাব ধারণ করিয়াছিল; তথাপি তিনি ভাবিলেন, সেখানে তাঁহার যাওয়াটা উচিত নহে।

তখন সোনাপুরের বাগানবাটীতে সুললিত কণ্ঠে পিয়ানোর সহিত বিধুভূষণ বেহাগ গাহিতেছিলেন। মহেশচন্দ্র মধ্যে মধ্যে বাহবা দিয়া তাল রাখিতেছিলেন।

অদূরে দ্বিতীয় অট্টালিকায় মন্ত্রমুগ্ধা গোলাপ তাহাই শুনিতেছিল।

ধীরে ধীরে পার্শ্বের কামরা হইতে মহেশচন্দ্র মদিরা লইয়া আসিলেন।

মহেশ। বিধু, তুমি একটু খাও।

বিধুভূষণ কি ভাবিল, এবং বলিল, "আচ্ছা দাও।"

বিধুভূষণ মদ খাইল। মহেশচন্দ্র তাহা অপেক্ষা বেশী খাইলেন।

মহেশ। তোমার বিবাহ হইয়াছে?

বিধু। না।

মহেশ ভাবিল, সেটা মন্দ নয়।

মহেশ। দেখ, একটা কথা বলিব।

বিধু। কি?

মহেশ। এ বনে একটা ফুল আছে।

বিধু। কলঙ্কিনী?

মহেশ। না। আমি এইবার দেখিয়াছি মাত্র। শুনিতে পাই, সাধ্বী। আমাদেরই এক জন ব্রাহ্মণ প্রজার পুত্রবধূ। তার স্বামী বিদেশে।

বিধু। মন্দ কি।

মহেশ। কিছু শক্ত। স্ত্রী-চরিত্র আমি বড় অধ্যয়ন করি নাই।

বিধু। তাহার নাম কি?

মহেশ। কনকলতা।

বিধু। বেশ নাম।

৪

তৎপরদিবস বিকালে কনকলতা স্বামীর পত্র পাইল। বিজয় লিখিয়াছিল, "কনক! আমি ভাল আছি—আমি যাহার নিকট চাকুরী করি, তিনি সোনা-

পুরে গিয়াছেন। বাবা যেন তাঁহার সহিত দেখা করেন। তাঁহাকে আদর যত্ন করিবে। আমি এক রকম আছি।”

পত্র পাইয়া কনকের মুখ মলিন হইয়া গেল। কনক ভাবিয়াছিল, বিজয় শীঘ্র আসিবে। কনক নিকটস্থ পুষ্করিণীর পাড়ে বসিয়া সেই পত্র দুই তিনবার পাঠ করিল।

অদূরে সারি সারি আম্রবৃক্ষের অন্তরালে লুক্কায়িত মহেশচন্দ্র বিধুভূষণকে কনকের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেখাইল, “ঐ!”

বিধুভূষণ সতৃষ্ণনয়নে কনকের দিকে দৃষ্টিপাত করিল। কনক বিজয়ের পত্রে তাহার প্রদত্ত অঙ্গুরীর ছাপটুকু অশ্রুসিক্ত কোমল অঙ্গুলি দিয়া মুছিতেছিল।

বিধুভূষণ মহেশচন্দ্রের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি কতবার দেখিয়াছ?”

মহেশ। এই তিন বার।

বিধু। এখানেই?

মহেশ। হাঁ।

বিধু। এই বাগানে প্রত্যহ আসে?

মহেশ। বোধ হয়।

বিধু। আচ্ছা, কনক তোমাকে দেখিয়াছে?

মহেশ। দেখিয়াছে। আমি দুই তিন বার অনেক উপায়ে তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলাম। এমন কি, রাইমণি একদিন কনককে আমার পরিচয় দিয়াছিল।

রাইমণি মহেশচন্দ্রের দাসী।

বিধু। তবে অনেক দুর অগ্রসর?

মহেশচন্দ্র। জানি না। ভাবভঙ্গীতে কোন আশা পাই নাই।

বিধু। তোমার পোড়া কপাল।

ইহা বলিয়া বিধু মহেশচন্দ্রের মুখে সিগারেট জ্বালিয়া দিল।

বিধু। কল্য বিকালে একটা কুলকিনারা করিও। আমি গাছের আড়ালে থাকিব।

উভয়ে বাগান পার হইয়া উদ্যানবাটীতে গেল। তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়াছে। সেখানে মহেশ মদ খাইল। বিধু খাইল না। সে কনকের কথা ভাবিতেছিল।

রাত্রি দশটার সময় উভয়ে মহেশচন্দ্রের বাটীতে খাইতে গেল। মহেশচন্দ্র বলিলেন, "বিধু, আজ এখানেই শুইয়া থাক, এখন দুই একটা গৎ বাজাও।"

উভয়ে দ্বিতল গৃহে গেল।

মহেশ মদের নেশায় বিভোর হইয়া ঘুমাইয়া পড়িল। বিধুভূষণের পক্ষে নিশীথিনীর নিস্তব্ধতা কষ্টকর হইয়া উঠিল। সে দ্বিতল গৃহের বারান্দায় গিয়া পূর্ণিমার আকাশ দেখিতে লাগিল।

সেই বারান্দা হইতে হরিনাথ মুখোপাধ্যায়ের গৃহ দেখা যায়। বিধু তাহারই দিকে একমনে চাহিয়া রহিল। বোধ হইল, যেন নির্জ্জনে বাতায়ন-পার্শ্বে কনক একাকিনী বসিয়া পত্র লিখিতেছে।

এমন সময় ছায়ার ন্যায় কেহ আসিয়া বিধুভূষণের গলায় একটি বেল ফুলের মালা পরাইয়া দিল।

বিধুভূষণ চমকিয়া উঠিল। দেখিল, চন্দ্রালোকে গোলাপ দাঁড়াইয়া!

গোলাপ কাঁপিতেছিল। সেই রেলপথের ঘটনার দিন হইতে গোলাপ বিধুভূষণের সম্মুখে আসিতে লজ্জা করিত না।

কিন্তু সময় অসময়ের তারতম্যে অনেক আসে যায়।

বিধুভূষণ অন্য কোন কথা না পাইয়া বলিল, "গোলাপ, তোমার আবার বিবাহ করিতে সাধ যায়?"

গোলাপের পদতলস্থ দ্বিতলের ছাত কুম্ভকারের চক্রের ন্যায় ঘুরিতে লাগিল। সে স্থির হইয়া দাঁড়াইতে না পারিয়া একটা থাম জড়াইয়া ধরিল।

বিধুভূষণ উঠিল না। বিধুভূষণ বলিল, "গোলাপ! রমণী-জীবন যেমন মধুর, তেমনই কণ্টকময়। রমণীর অবলম্বন ও ইষ্টদেবতাই স্বামী। যাহার স্বামী নাই, অথচ তোমার ন্যায় চঞ্চল যৌবন, তাহার বিবাহ করা উচিত। তুমি যাহাতে সুখী হও, আমি তাহারই চেষ্টা করিব। তোমার মালা তোমার ভাবী স্বামীর গলদেশে শোভা পাইবে; এই লও।" অর্দ্ধমূর্চ্ছিতা গোলাপকে সেইখানে রাখিয়া বিধুভূষণ চলিয়া গেল।

৫

তালবৃক্ষের ছায়াতলে দাঁড়াইয়া কনক আলুথালু কেশগুলি বাঁধিতেছিল, এমন সময় মহেশচন্দ্রের কুকুর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সদ্যোজাত গোবৎসের পশ্চাদ্ধাবমান হইয়া তাহাকে কনকের পদতলে আনিয়া ফেলিল।

বেলা গিয়াছে। কনক জল আনিতে গিয়াছিল। নিকটে কেহই নাই।

কনক ভয় পাইয়া কাঁদিয়া ফেলিল। সম্পূর্ণ অবগুণ্ঠনমুক্ত সেই সুন্দর মুখ উদ্যানের চারি দিক আলোকিত করিল।

মহেশচন্দ্র সুযোগ পাইয়া নিকটে দৌড়িয়া আসিল। কনকলতা অবাক হইয়া মহেশচন্দ্রের দিকে চাহিল।

মহেশচন্দ্র বিধুভূষণের নিকট শিক্ষা পাইয়াছিল, অতএব হঠাৎ একটা কোন বিশেষ পথ অবলম্বন না করিয়া কুকুরকে আদর করিতে লাগিল।

মহেশচন্দ্র। কনক, তুমি ভয় পাইয়াছ?

কনক নতমুখে ধীরে ধীরে বলিল, "পথ ছাড়িয়া দিন।"

মহেশচন্দ্র। কোথায়? জল আনিতে যাইবে?

কনক। আমি বাড়ী যাইব।

মহেশচন্দ্র বুঝিল, কনক ভয় পাইয়াছে; কেন না, কলসী ফেলিয়া হঠাৎ বাটী যাইবার ইচ্ছা ভয়ের চিহ্ন বই আর কিছুই নহে।

মহেশচন্দ্র। কনক, আমার কোন দোষ হইয়াছে কি?

কনক। না।

মহেশচন্দ্র। তবে তুমি যাইবে কেন?

ইহা বলিয়া মহেশচন্দ্র গোবৎসের কোমল পুচ্ছে হাত বুলাইতে লাগিল। কনক মুখ তুলিল না। নতমুখী কনক আবার বলিল, "এখানে আপনার থাকা ভাল দেখায় না। আপনি জমীদার, আমরা গরীব প্রজা।"

মহেশচন্দ্র। আমি ত আর প্রজার উপর অত্যাচার করিতে আসি নাই। মনে কর, যদি কোনও প্রজার তোমার মত সুন্দর মুখ হয়, তবে রাজার কর্ত্তব্য কি?

কনক। দূরে থাকা। আমি অসহায়া দীন দুঃখী, আমি আবার বলিতেছি, আপনি আমাকে যাইতে দিন।

মহেশ। কনক! তুমি অবশ্যই যাইবে, যাও;—তবে একবার ভাবিয়া দেখ। যদি তুমি অবিবাহিতা হইতে, তবে আজ তোমাকে বিবাহ করিয়া সাধ মিটাইতাম। কিন্তু তুমি পরের স্ত্রী। আমি পাগল হইয়াছি, তাই পাগলের মত ব্যবহার করিতেছি। আমি কোন ছার? তোমাকে দেবতা দেখিলে পাগল হইয়া যায়। আমার পাগলামী মার্জ্জনা করিবে। এ ঐশ্বর্য্য সকলই তোমার—তুমি দুঃখিনী কিসে?—ইহা বলিয়াই মহেশচন্দ্র কনকের সম্মুখে নতজানু হইয়া তাহার হাত ধরিতে গেল।

কনক সরিয়া গেল। কনক মহেশচন্দ্রের কথা শুনিতেছিল। কনক পূর্ব্বে কাহারও নিকটে সেরূপ কথা শুনে নাই। সুতরাং হঠাৎ না পলাইয়া কথাগুলি শুনিল। কেমন নূতন বোধ হইতে লাগিল। যেমন ফণিনী মন্ত্র-মুগ্ধার ন্যায় বংশীরব শুনিয়া থাকে, কনকের তাহাই হইল।

মহেশ কনকের হাত ধরিলেন। হঠাৎ যুবকপুরুষের সংস্পর্শে প্রথমে কনকের দেহ কাঁপিয়া উঠিল, পরে ফণিনীর ন্যায় মাথা তুলিয়া কনক বলিল, "তুমি এখান হইতে দূর হও।"

মহেশচন্দ্র তখন সম্পূর্ণ আত্মহারা। দৌড়িয়া কনককে আবার ধরিতে গেল—কনক তখন দশ হাত দূরে। একলম্ফে মহেশচন্দ্র কনকের অঞ্চল ধরিল।

কনক কাতরস্বরে ডাকিল, "ও গো আমাকে বাঁচাও!"

তখন কে হঠাৎ মহেশচন্দ্রের পৃষ্ঠদেশ লক্ষ্য করিয়া সজোরে কশাঘাত করিল। মহেশচন্দ্র মদ খাইয়াছিল, কিছু বুঝিতে না পারিয়া ভয়ে পলাইয়া বাগান পার হইয়া গেল।

কনক সেখানে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল।

৬

বিধুভূষণ মহেশচন্দ্রকে চাবুক দ্বারা উত্তম মধ্যম দান করিয়া কনকের মুখে জলসেচন করিল।

কনক নতদৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল, এক জন অপরিচিত যুবক অদূরে নিস্পন্দ-ভাবে দাঁড়াইয়া আছে। বিধুভূষণ ক্রমে আরও দূরে গিয়া দাঁড়াইল।

বিধু। তোমার ভয় নাই; সে চলিয়া গিয়াছে, এবং আমাকেও ভয় নাই। আমি সম্প্রতি উড়িষ্যা হইতে এখানে আসিয়াছি। তোমার স্বামী আমার এক জন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী।

কনক বুঝিতে পারিল, উনিই বিধু বাবু। কনকের ইচ্ছা হইল, চাহিয়া দেখে; কিন্তু ভয়ে পারিল না।

কনক বলিল, "ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন।"

বিধু। ঈশ্বর তোমার স্বামীর মঙ্গল করিবেন।

কনকের হৃদয়ে অলক্ষ্যে একটা কোমল তরঙ্গ আসিয়া আঘাত করিল। তাহা কি পূর্ব্বস্মৃতি?

কনকের পুনর্ব্বার ইচ্ছা হইল, চাহিয়া দেখে; কিন্তু চক্ষু উঠিল না।

বিধুভূষণের নয়নে বিষাদের ছায়া ঘুচিয়া আনন্দরশ্মি নৃত্য করিতেছিল।

বিধু। তুমি আমাকে দেখিয়া লজ্জা করিও না। তোমার স্বামী আমার অধীনস্থ হইলেও আমি তাহাকে বড় ভালবাসি। কেন ভালবাসি, জান? সে অতি সৎচরিত্র—আর—আর সে তোমাকে বড় ভালবাসে। এই পাঁচ বৎসর ধরিয়া—বিজনে বিদেশে পিতা মাতা ও দুঃখিনী স্ত্রীর মুখ স্মরণ করিয়া অধ্যবসায়ের সহিত আশার সেবা করিয়াছে। বিজয় না থাকিলে আমি আজ বিশ লক্ষ টাকার সম্পত্তি করিতে পারিতাম না।

সেই করুণাভরা অর্দ্ধরুদ্ধ কোমল স্বর কনকের কর্ণে স্বর্গীয় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। কনক হাঁটু গাড়িয়া বসিল, এবং অঞ্চল গলায় ধারণ করিয়া বিধুভূষণকে নমস্কার করিল।

বিধুভূষণ হাসিতে গেল, কিন্তু কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হইয়া আসিল। তখন সন্ধ্যার আঁধারের সহিত কনকের দুঃখের জীবন মিশ্রিত হইয়া বিধুভূষণের হৃদয়ের কোন অজ্ঞাত প্রদেশ হইতে আশ্বাসবাণী লইয়া আসিল।

বিধু। কনকলতা! তোমার ন্যায় সাধ্বী স্নেহময়ী স্ত্রী যাহার, সে স্বামী দরিদ্র হইলেও রাজা। তুমি চাহিয়া দেখ। আমাকে দেখিয়া লজ্জা করিও না, আমি তোমার স্বামীর প্রভু, অতএব তোমারও গুরু।

সেই দুঃখবিজড়িত অভয়বাণী সন্ধ্যার সমীরের মধুর হিল্লোলে হেলিয়া দুলিয়া কনকলতার নিকট অপূর্ব্ব বলিয়া বোধ হইল।

কনক চাহিয়া দেখিল, সম্মুখে দেবতা।

বিধু। আমার সম্পত্তি বিজয়েরই, এবং বিজয়ের পিতা মাতার।

কনক দেখিল, সন্ন্যাসীর ন্যায় সংসারের দুঃখময় ক্ষেত্র হইতে ঊর্দ্ধে নয়ন আরোপিত করিয়া যুবক সন্ধ্যাতারকার দিকে চাহিয়া আছে।

কনক একদৃষ্টে সে মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। ভয় হইল। কেন? কনক দেখিল, যুবকের কণ্ঠে হীরকমণ্ডিত সুবর্ণহারের মধ্যে তাহার প্রদত্ত অঙ্গুরীয় জ্বলিতেছে।

কনক কাঁপিতে লাগিল।

কনক ভাবিল, আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। কনকের নয়ন নিমীলিত হইয়া আসিল।

যুবক নিকটে আসিল। কনক দেখিল, সেই চিরদিন-স্মৃতিপটে-অঙ্কিত

বিজয় ডাকিল, "কনক !"

কনক বলিল, "আর কত ছলনা করিবে? আর কত যাতনা দিবে !"

তখন পাঁচ বৎসরের রুদ্ধ হৃদয়ের আশা নিরাশা সুখ দুঃখ স্বামীর করস্পর্শে মুছিয়া গেল। কনক ধীরে ধীরে ডাকিল, "নাথ! প্রভু!—"

তাহার পর সেই নীরব সন্ধ্যায় বাপীতটে দুইটি হৃদয় একত্র মিশিয়া কোথায় গেল, তাহা কেহ জানিতে পারিল না।

সমাপন।

বল তুমি সুধা-মুখে বল আর বার
"ভালবাসি"—এই দুটি কথা ;
নব ছন্দে মোর কানে,
এ চিরতৃষিত প্রাণে,
সে কথাটি তব গানে
ধ্বনিবে মধুর ;
দুটি কথা সুধা-মুখে বল আর বার,
ঘুচাও গো হৃদয়ের ব্যথা।

একবার ভেবে দেখ এ অন্তর মাঝে
বহি আমি কত ভালবাসা ;
নিশিদিন কত ছলে
তোমার এ কুঞ্জতলে
আসিয়া, নয়নজলে
ফিরে ফিরে যাই ;
মনে তুমি ভেবে দেখ এ মরম-মাঝে
কি অতৃপ্ত আকুল পিয়াসা !

সেই স্বর্গ-সুধা মোর, সাধনার ধন,

হে মোহিনী ! সে রতনে,
সরল সহজ মনে
দাও মোরে, সযতনে
হৃদয়েতে রাখি ;
মুক্তি তাই, সুধা মোর, সাধনার ধন,
সেই মোর নিকষিত হেম ।
যে দিন শ্রাবণ-রাতে স্বপনের পুরে
চিনি তো'রে জন্মান্তর-সাথী,
সেই হ'তে এ জীবনে,
হৃদয়-কমলাসনে,
বসায়েছি সঙ্গোপনে
তোমারে কল্যাণি !
জেনেছি শ্রাবণ-রাতে স্বপনের পুরে
তুমি মোর জন্মান্তর-সাথী ।
হা ধরণী ! হায় প্রেম ! স্বপ্ন-বল তারে ?
মিথ্যা সে কি—সে মহাসুন্দর ?
হৃদয়ের অন্তঃপুরে,
চিরদিন কাছে দূরে,
ললিত বিশদ সুরে
মুখরিত সদা
জন্মান্তের যে কাহিনী—স্বপ্ন বল তারে ?
অলীক সে সত্য মনোহর ?
ভুলেছি কি, সুধামুখী যত মৌন সন্ধ্যা
ধ্যান-মগ্ন আমার সকাশে,
সোনার প্রতিমাখানি
তোমারে সাজায়ে আনি,'
মোর করে তব পাণি
দিয়াছে বাঁধিয়া ?
তাও স্বপ্ন, সুধামুখী যত মৌন সন্ধ্যা

সেই রূপ; সেই রঙ্গভরা মিষ্টবাণী
সেই সুধা-পরশ-বন্ধন,
করে চাপি' করতল
বিদায়ের আঁখিজল,
সে চুম্বন সুকোমল—
স্বপ্ন সে ত নয়।
বল বল রঙ্গভরা সেই মিষ্ট বাণী
পরাণের ঘুচাও ক্রন্দন।

আজ এই বসন্তের পূর্ণিমার রাতে
সেই কুঞ্জে দাঁড়ায়ে সুন্দরি!
তোমারে নূতন করি'
আবার লইব বরি,'
নিয়ে যাব হাতে ধরি'
বাসনার তীরে;
"ভালবাসি" এ বসন্তে এ পূর্ণিমা রাতে
শেষবার বল গো সুন্দরি!

বল তুমি সুধা-মুখে বল আর বার
"ভালবাসি"—অমিয় বচন;
স্বপ্ন নয় সত্য নয়,
বিরহ মিলন নয়,
কেবল সঙ্গীতময়
সাধের নির্ব্বাণ!
"ভালবাসি"—সুধামুখি!—বারেক আবার,
তার পরে, সুন্দর মরণ!

শ্রীমন্মথনাথ সেন।

দ্রষ্টব্য।

ভ্রমক্রমে ৬৪৬ পৃষ্ঠার পর ৬৪৭ না হইয়া ৬৪৯ পত্রাঙ্ক মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে।
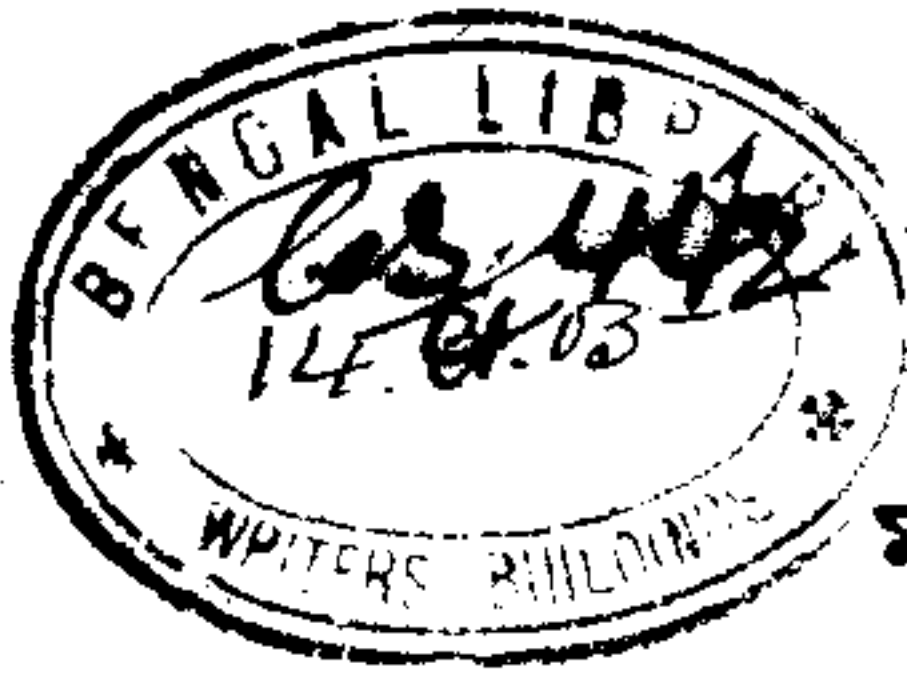
মহাবীরচরিত।

বীর-বিচার।

মানবসমাজে বীর নানাবিধ। অলৌকিকশক্তিসম্পন্ন মানব, কার্য্যে সেই অলৌকিক শক্তির পরিচয় দিয়াই, বীর বলিয়া পরিচিত হন। যিনি অসাধারণ দয়াশক্তির পরিচয় দিয়া জগতে ধন্য হন, তিনি দয়াবীর। আমাদের মহাপুরাণ পুরাণে অনেক দয়াবীর দেখিতে পাওয়া যায়। উশীনররাজপুত্র মহারাজ শিবি আদর্শ দয়াবীর বলিয়া পরিচিত। ইংলণ্ডে হাওয়ার্ড, রমিলি, কোলষ্টন প্রভৃতি মহাপুরুষেরা দয়ার অবতার হইয়া সংসারে পূজ্য হইয়া গিয়াছেন। যাঁহাদের দানশক্তি দেখিয়া জগৎকে বিস্মিত হইয়া থাকিতে হয়, তাঁহারাই দানবীর। সূর্য্যবংশাবতংশ মহারাজ হরিশ্চন্দ্র, রঘু প্রভৃতি দানশীল নরপতিগণের দানশক্তি জগতে অতুলনীয়। মহারাজ রঘু বিশ্বজিৎ যজ্ঞে নিজের সমস্ত ভাণ্ডার শূন্য করিয়া, অবারিত দানে কপর্দ্দকশূন্য হইয়া, মৃন্ডাণ্ডে জলপান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। অলৌকিক দানশক্তির গুণে অঙ্গরাজ কর্ণ "দাতা কর্ণ" বলিয়া চির-পূজিত। এখন আমেরিকার স্কচ্‌বংশধর কার্ণেজী অলৌকিক অসীম অনন্যসাধারণ দানশক্তির পরিচয় দিয়া জগৎকে বিস্ময়-বিহ্বল করিতেছেন; আপনাকে কর্ণাদির আসনে বসাইবার অধিকারী হইয়া, অধুনাতন কালের অদ্বিতীয় দানবীর বলিয়া পরিচিত হইতেছেন। বুদ্ধ, নানক, চৈতন্য, খৃষ্ট, লুথার প্রভৃতি ধর্ম্মাবতার মহাপুরুষেরা অসাধারণ ধর্ম্মবীর; অলৌকিক, অদৃষ্টপূর্ব্ব ধর্ম্মানুরাগের কল্যাণে, ইঁহারা ভগবানের অংশীভূত বলিয়া পরিচিত। সংসারে যিনি সমাজহিতকর অলৌকিক কর্ম্মের কল্যাণে প্রসিদ্ধ হন, তিনি কর্ম্মবীর। কর্ম্মবীর নানারূপ। দয়াবীর, দানবীর, ধর্ম্মবীর, সকলেই কর্ম্মবীর। কিন্তু কর্ম্মবীর-পর্য্যায়ে যে যুদ্ধবীরই মানবসমাজকে অধিক মুগ্ধ করিয়া থাকেন, ইহা মানবসমাজের প্রকৃতিগত বৈলক্ষণ্যেরই পরিচায়ক। কেবল মানবসমাজে কেন, সমগ্র জীবসমাজেই যুদ্ধবীরের সম্মান দেখিতে পাওয়া যায়। মানবসমাজে মহাবীর মহাযোধের যেরূপ মান, জীবসমাজে মহাবীর সিংহ ব্যাঘ্রাদিরও সেইরূপ মান;—সিংহ ব্যাঘ্রাদিও যুদ্ধবীর বলিয়া পরিচিত। কিন্তু মানবসমাজের

এই যুদ্ধবীরেরও—এই সমরশূরেরও—পর্য্যায়ভেদ দেখিতে পাওয়া যায়; সকল যুদ্ধবীরকে একাসনে বসাইতে পারা যায় না।

যুদ্ধবীর।

জগতে যুদ্ধবীরের সংখ্যা হয় না। দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, মানব, কোন সমাজেই যুদ্ধবীরের অভাব দেখিতে পাওয়া যায় না। পৌরাণিক, অপৌরাণিক যুদ্ধবীর আমাদের আর্য্যসমাজে অসংখ্য। পৃথিবীর য়িহুদী, খৃষ্টান, অখৃষ্টান, মুসলমান, অমুসলমান, সকল সমাজেই বীর, মহাবীর দেখা গিয়াছে। খৃষ্টান, মুসলমান সমাজে এখনও দেখা যাইতেছে। অসভ্য বর্ব্বর-সমাজেও বীর মহাবীরের অভাব ছিল না; এখনও অভাব নাই।

যিনি অসাধারণ শৌর্য্য, বীর্য্য এবং সাহস ও সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়া প্রকাশ্যভাবে বহু মানবের সংহার করিতে পারেন, অনেক মানবকে পদানত করিতে পারেন; সাধারণতঃ সামাজিক অভিধানে, তিনিই যুদ্ধবীর বলিয়া অভিহিত। যিনি এইরূপ কার্য্যে অসাধারণতা ও অলৌকিকতার পরিচয় দেন, তিনিই যুদ্ধের মহাবীর। কিন্তু এইরূপ বীর মহাবীরদিগের ভিতরও পর্য্যায়ভেদ আছে। জ্ঞানবানের বিচারে সকল বীর সমান নহেন, সকল মহাবীরও সমান নহেন। যুদ্ধের মহাবীরদিগকে—সমরক্ষেত্রের অসাধারণ কর্ম্মবীরদিগকে—আমরাও পর্য্যায়ভেদে, ভিন্ন ভিন্ন আসনে বসাইতেছি; কর্ম্মভেদে আসনভেদ করিতেছি।

উত্তমবীর।

যাঁহারা স্বদেশের—স্বকীয় জন্মভূমির—স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য, পুরুষপরম্পরাগত স্বকীয় ধর্ম্মের রক্ষার্থ, সজাতীয় সোদরকল্প মানবের দাসত্ব-বন্ধন ছিন্ন করিবার জন্য, কিংবা তাহাকে ভবিষ্যৎ দাসত্ব-বন্ধন হইতে মুক্ত করিবার জন্য, যুদ্ধ করিতে বাধ্য হন; উৎপীড়ক উচ্ছেদক শত্রুকে কিছুতেই শান্ত ক্ষান্ত করিতে না পারিয়া, তাহাকে অগত্যা বলপূর্ব্বক বাধা দেন; এইরূপ বাধা দিতে গিয়া যিনি পরিশেষে শত্রুক্ষয় করিতেই বাধ্য হন; তিনিই শ্রেষ্ঠ যুদ্ধবীর; তিনিই আমাদের উত্তমবীর। এরূপ উত্তমবীরের সংখ্যাও, অতীত ও বর্ত্তমান বীর-পর্য্যায়ে নিতান্ত অল্প নহে। কিন্তু যাঁহারা অভীষ্টসিদ্ধি করিয়া, স্বদেশের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, সজাতীয় মানবের হিত-সাধন

করিতে পারিয়াছেন, তাঁহাদের সংখ্যা অধিক নহে। যাঁহারা অভীষ্টসিদ্ধি করিতে পারেন নাই, অথচ কর্ম্মগুণে ধন্য হইয়া উত্তমবীর বলিয়া পরিচিত হইয়া রহিয়াছেন, তাঁহাদের সংখ্যাও নিতান্ত কম নহে।

আমাদের ভারতে সফলকর্ম্মা উত্তমবীরের সংখ্যা বড় অল্প। এলেক্জন্দর ও তাঁহার উত্তরাধিকারী গ্রীক বীরদিগের অভিযান, আক্রমণ ও গ্রীসাধিকার হইতে স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমির রক্ষা করিতে গিয়া, ভারতের প্রায় সকল বীর মহাবীরকেই শেষে প্রাণ দিতে হইয়াছিল। এক মগধেশ্বর চন্দ্রগুপ্ত ব্যতীত আর কেহই গ্রীকের অনধিকারপ্রবেশে বাধা দিতে পারেন নাই। কিন্তু সকলেই উত্তমবীর; যাঁহারা কৃতকার্য্য না হইয়া গতাসু হইয়াছিলেন, তাঁহারাও উত্তমবীর, তাঁহারা অত্যুত্তমবীর। মুসলমানদিগের আক্রমণে ও অনধিকার-প্রবেশে ও উৎপীড়নে বাধা দিতে গিয়া, ভারতের সকল উত্তমবীরকেই হত-জীবন হইতে হইয়াছিল। রাজপুতজাতির ইতিহাস এরূপ সাত শত উত্তমবীরে পরিশোভিত। চিতোরের রাজা প্রতাপসিংহ রাজপুতজাতীয় বীরমালার মধ্যমণি, উত্তমবীর-পর্য্যায়ে উন্নতাসন। বঙ্গের প্রতাপ—যশোহরের মহারাজ প্রতাপাদিত্যও মহাবীর-পর্য্যায়ে শ্রেষ্ঠ আসন লইয়া আছেন। তিনিই বঙ্গীয় গগনের প্রকৃত প্রতাপাদিত্য; আদিত্য কোন্ কালে অস্তমিত হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার গৌরবরশ্মি কোন কালে অস্তমিত হইবে না।

গ্রীস দেশের বাল্মীকি—মহাকবি হোমর—নিজের ইলীয়দ-মহাকাব্যে অনেক মহাবীরকে অবতীর্ণ করিয়া গিয়াছেন, গ্রীসের একিলিস ও এগামেম্‌ননকেও উচ্চ আসন দিয়াছেন। সীতাহারী রাবণকে সবংশে নিধন করিয়া, আমাদের রামায়ণের রাম লক্ষ্মণ যেরূপ মহাবীর বলিয়া পুজিত, হেলেন-হারী প্যারিসকে সবংশে নষ্ট করিয়া সেইরূপ এগামেম্‌নন ও একিলিস মহাবীর বলিয়া পুজিত। কিন্তু রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ যেরূপ স্বীয় পৈতৃক রাজ্যের স্বাধীনতা এবং পৈতৃক বংশের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য প্রাণ দিয়া প্রকৃত উত্তমবীর নামের অধিকারী হইয়াছেন, পাপমতি পিতার জন্য ধর্ম্মপ্রাণ ইন্দ্রজিৎ যেরূপ আত্মোৎসর্গের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া উত্তমবীর-পর্য্যায়ে অত্যুত্তম আসনে বসিয়া রহিয়াছেন; ট্রয়ের পুণ্যমতি ধর্ম্মপ্রাণ হেক্টরও সেইরূপ পাপমতি ভ্রাতা প্যারিসের জন্য অতুলনীয় আত্মোৎসর্গের পরিচয় দিয়া, উত্তমমহাবীরের শ্রেষ্ঠ সোপানে অধিষ্ঠান করিতেছেন। মহাকবি হোমর গ্রীক বীরদিগকে উত্তমাসনে বসাইতে পারেন নাই; কিন্তু

পরে গ্রীসের ইপামিননদাস ও পিলপিদাস—মেরাথন ও থার্মপলি ক্ষেত্রে—পারসীক অক্ষৌহিণীর গতিরোধ করিয়া, উত্তম মহাবীর-পর্য্যায়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়া রহিয়াছেন। রোমক রাজ্যে এরূপ উত্তমবীরের দর্শন পাওয়া যায় না। ফরাসী-বিপ্লবের সময়ে ইউরোপের অনেকে উত্তমবীর-পর্য্যায়ে উঠিবার মত কার্য্য করিয়াছিলেন, পরেও স্বদেশকে তুরস্কের হস্ত হইতে মুক্ত করিবার জন্য গ্রীসের অনেকে উত্তমবীরতার পরিচয় দিয়াছেন। ইতালীর গ্যারিবল্‌ডি, ম্যাট্‌সিনি, কাবূর প্রভৃতিও জন্মভূমি ইতালীর মুক্তি-সাধন করিয়া উত্তম মহাবীর-পর্য্যায়ে পরিভুক্ত হইয়াছেন। ইঁহারা সফলকর্ম্মা বলিয়াই মহাবীর; কিন্তু হঙ্গরীর কসথ বিফলকর্ম্মা; তিনি স্বদেশকে অস্ত্রিয়ার দাসত্ব হইতে মুক্ত করিতে পারেন নাই। পোলণ্ডের অনেক মহাবীরও রুষের প্রতিষ্ঠিত দারুণ দাসত্ব হইতে স্বজাতীয়গণকে এবং পরাধীনতা হইতে স্বদেশকে মুক্ত করিতে গিয়া, বিফলকর্ম্মা হইয়াও, উত্তমবীরসম্প্রদায়ে বিরাজ করিতেছেন; মরিয়াও অমর হইয়া রহিয়াছেন।

উত্তম মহাবীর আমেরিকার ইতিহাসে অনেক দেখিতে পাইবে। মহাবীর ওয়াশিংটনের সহযোগী ও সহচরদিগের ভিতরে শত শত উত্তমবীর বিদ্যমান; উত্তম মহাবীরেরও অভাব নাই। আমেরিকার বর্ব্বর আদিম অধিবাসীদিগের ভিতরও উত্তমবীরের অভাব নাই। কলম্বসীয় কল্পের প্রথম যুগে আমেরিকার পেরুপতি আতাহুয়াল্পা, স্পেনীয় সেনাপতি পিজারোর অনধিকারপ্রবেশে ও নিষ্ঠুরতায় বাধা দিতে আসিয়া, সবংশে নষ্ট হইয়াছিলেন; মেক্‌সিকোপতি মণ্টেজুমাও স্পেনীয় সেনাপতি কর্ত্তেশের হস্ত হইতে স্বদেশকে রক্ষা করিতে আসিয়া সবংশে বিধ্বস্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তথাপি আতাহুয়াল্পা ও মণ্টেজুমা উত্তমমহাবীর বলিয়া পরিচিত হইয়া রহিয়াছেন। ফলতঃ, সফলকর্ম্মা উত্তমবীর মহাবীরের সংখ্যা কম হইলেও, এ মর্ত্ত্যধামে উত্তমবীর মহাবীরের সংখ্যা নিতান্ত কম নহে।

মধ্যম মহাবীর।

যাঁহারা স্বদেশে থাকিয়াই, স্বদেশের ও স্বজাতির স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা পাইয়াছেন, তাঁহারাই উত্তমমহাবীর। যাঁহারা স্বদেশের ও স্বজাতির স্বাধীনতারক্ষাব্যপদেশেই শত্রুরাজ্যে যাইতে বাধ্য হইয়াছেন; শত্রুর দেশে গিয়া শত্রুর সংহার করিতে বাধ্য হইয়াছেন; ফলতঃ

যাঁহারা স্বদেশ ব্যতীত অন্য দেশে জলে স্থলে শত্রুসংহার করিয়াছেন; তাঁহারা মধ্যম বীর। কার্থেজগ্রাসোদ্যত রোমকে কিছুতেই বাধা দিতে না পারিয়া, কার্থেজের মহাবীর হেনিবল, স্বদেশ ছাড়িয়া, রোমরাজ্যে অভিযান করিয়াছিলেন; রোমক বীরদিগকে কার্থেজগ্রাসে অশক্ত অসমর্থ করিবার জন্যই, তিনি রোমে থাকিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। পিতা হেমিল্কার স্বদেশে থাকিয়া রোমের অনধিকারপ্রবেশে বাধা দিয়াছিলেন। তিনি প্রকৃত উত্তম মহাবীর। পুত্র হেনিবল যদি স্বদেশে থাকিয়া মহাবীরতার পরিচয় দিতেন, তাহা হইলে তিনিও উত্তম মহাবীর বলিয়া পরিচিত হইতেন। মহাবীর পর্য্যায়ে তিনি অদ্বিতীয়; কিন্তু তিনি উত্তম মহাবীর নহেন। ইংলণ্ডের অদ্বিতীয় মহাবীর ওয়েলিংটনও, এই জন্য অদ্বিতীয় উত্তম মহাবীর নহেন; তিনিও ত হেনিবলের মত স্বদেশ ছাড়িয়া ভিন্ন দেশে আসিয়া শত্রুসংহার করিয়াছিলেন। ওয়েলিংটনকে আমরা ইংলণ্ডের হেনিবল বলিয়া মনে করিয়া থাকি। এরূপ অনেক মধ্যম মহাবীর সকল দেশে সকল যুগে দেখা দিয়াছেন, এখনও দেখা দিতেছেন। কিন্তু তৃতীয় পর্য্যায়েই—অনুত্তম পর্য্যায়েই মহাবীরের সংখ্যা বড় অধিক।

অনুত্তম মহাবীর।

সংসারে অনুত্তমেরই আধিক্য, অনুত্তম মহাবীরেরও আধিক্য। যাঁহারা স্বদেশের নষ্টগৌরবের উদ্ধারব্যপদেশে, পরদেশে অভিযান, আক্রমণ এবং যুদ্ধবিগ্রহ করেন, তাঁহারা উত্তম বা মধ্যম পর্য্যায়ে পরিগণিত হইতে পারেন না। যাঁহারা বাণিজ্যবিস্তারের জন্য রাজ্যবিস্তার করেন; রাজ্যবিস্তারের জন্য পরকীয় রাজ্যের হরণ করেন; রাজ্যহরণ নিবন্ধন পরের সহিত যুদ্ধ করেন; তাঁহারা উত্তম মধ্যমের ত্রিসীমায় উঠিতে পারেন না; তাঁহারা কেবল অনুত্তম নহেন—বস্তুতঃ তাঁহারা অধম। কিন্তু অধুনাতন যুদ্ধে এই অধম পর্য্যায়ের বীর মহাবীরের সংখ্যাই অধিক। নবযুগে ইঁহারাই মহাবীর। এইরূপ বীর মহাবীর চারি দিকে। কিন্তু এরূপ মহাবীরদিগের আমরা বিশেষ করিয়া পরিচয় দিতে অপ্রস্তুত। আর সর্ব্বপরিচিতগণের পরিচয়ই বা দিতে হইবে কেন? যাঁহারা স্বকীয় কর্ম্মবিপাকে সকলের স্বতঃপরিচিত, তাঁহাদের ত আর পরিচয় দিতে হয় না। নামজাদা জাহিরকে ত আর জাহির

মহাবীর ডিওয়েট।

ডিওয়েট, ডিলারে, দুই বোথা, ক্রঞ্জী, ওয়েসেল্স, অলিভীয়ার, ডিভি-লায়ার্স, হার্টজোগ, জেকব্স, ফেরীরা, ক্রোনম্যান, ক্রুৎজিঙ্গার প্রভৃতি যত বুরসেনাপতিই যে উত্তম মহাবীরের আসনে বসিয়াছেন; বৃদ্ধবীর জুবেয়ার যে উত্তমাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াই স্বর্গধামে যাত্রা করিয়াছেন; প্রেসিডেণ্ট ক্রুগার ও ষ্টীন যে সৈনাপত্য না করিয়াও উত্তম মহাবীর বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন; তাহা এখন পৃথিবীর সর্ব্বত্রই সর্ব্ববাদিসম্মত। যাঁহারা বৃটিশ-বংশে জন্মিয়াও বুররাজ্যের অধিবাসী; বৃটিশবংশধর হইয়াও আপনাদিগকে বুর বলিয়া মনে করেন; পূর্ব্বপুরুষদিগের জন্মভূমিকে একেবারে ভুলিয়া, আপনাদের জন্মভূমি জননী বুরভূমিকে স্বর্গাদপি গরীয়সী বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদিগের ভিতরও অনেক বীর মহাবীর উত্তমাসনে বসিয়াছিলেন। কেহ কেহ এখনও উত্তমাসনে বসিয়া রহিয়াছেন। মার্কিণ স্বাধীনতার যুদ্ধে যেরূপ বৃটিশবংশধর বীর মহাবীরেরা, আপনাদের জন্মভূমি জননী মার্কিণভূমির জন্য প্রাণ দিতে সংকল্প করিয়া উত্তমবীরাসনে বসিয়াছিলেন, স্বাধীনতার বুরযুদ্ধেও সেইরূপ বহু বৃটিশবংশধর উত্তমাসনে বসিয়া ধন্য হইয়াছিলেন; এখনও অনেকে ধন্য হইতেছেন। এইরূপ উত্তম মহাবীরদিগের ভিতর মহাবীর কর্ণেল ফ্রিঙ মারিয়াও অমর হইয়াছেন; চিরদিন উত্তমাসনে অধিষ্ঠিত থাকিবেন। বুরযুদ্ধে সকল বুরযোধই বীরাসনের অধিকারী হইয়াছিলেন, অনেকেই মহাবীরের আসন পাইয়াছিলেন, প্রায় সকলেই উত্তম বীরাসনের যোগ্য হইয়াছিলেন। ডিওয়েট, ডিলারে, বোথা প্রভৃতি অনেকেই উত্তম মহাবীর বলিয়া জগতে প্রথিত হইয়াছেন; চিরদিন প্রথিত হইয়া থাকিবেন।

আমরা কিন্তু ডিওয়েটকেই প্রধানতম, উচ্চতম এবং উত্তমতম মহাবীরাসনে বসাইয়া থাকি। মার্কিণ মহাযুদ্ধের উত্তম মহাবীর জর্জ্জ ওয়াশিংটন যে আসন পাইয়াছেন, বুর মহাযুদ্ধের উত্তম মহাবীর ক্রিশ্চান ডিওয়েটকেও সেই আসন দিয়া রাখিয়াছি। সমগ্র জগৎ যাঁহাকে এইরূপ শ্রেষ্ঠ আসন দিয়াছেন, আমরাই বা তাঁহাকে না দিব কি বলিয়া? ওয়াশিংটনের সকল গুণ ডিওয়েটে দেখিতে পাওয়া যায়। জন্মভূমি মার্কিণক্ষেত্রের জন্য ওয়াশিংটন অকাতরে প্রাণ দিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন; জন্মভূমি বুরক্ষেত্রের জন্য

সমস্ত মার্কিণকে সহোদর বলিয়া মনে করিতেন, ডিওয়েটও সমস্ত বুরকে সহোদর বলিয়া মনে করেন। ওয়াশিংটনের হৃদয়মন মস্তিষ্কদেহ সমস্ত জন্মভূমির হিতে ন্যস্ত হইয়াছিল; ডিওয়েটেরও সমস্ত জন্মভূমির হিতে ন্যস্ত। ওয়াশিংটন সকল কার্য্যে সকল যুদ্ধে—জয় পরাজয়ে—কেবল জন্মভূমিকে সম্মুখে রাখিয়াছিলেন, জন্মভূমির স্বাধীনতাকেই হৃদয় মস্তিষ্কের একমাত্র লক্ষ্য করিয়া রাখিয়াছিলেন; ডিওয়েটও, সকল কার্য্যে, সকল যুদ্ধে—সকল জয় পরাজয়ে—জন্মভূমিকেই সম্মুখে রাখিয়াছিলেন; জন্মভূমির স্বাধীনতাই তাঁহার একমাত্র চিন্তনীয় হইয়াছিল। অসাধ্যসাধনশক্তি ওয়াশিংটনে যেরূপ প্রস্ফুটিত ও পরিপোষিত হইয়াছিল, ডিওয়েটেও সেইরূপ হইয়াছে। দুই মহাবীরই অদ্বিতীয় অদ্ভুতকর্ম্মা; দুই মহাবীরই অসাধ্যসাধনে অদ্বিতীয়তার পরিচয় দিয়াছেন। স্বীয় জন্মভূমির হিতের জন্য, স্বজাতীয় সহোদরদিগের—যত মার্কিণভ্রাতার—স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া, ওয়াশিংটন্ যেরূপ ক্ষিপ্রপদে সৈনাপত্যপথে অগ্রসর হইয়াছিলেন; ডিওয়েটও স্বীয় জন্মভূমির হিতের জন্য—যত বুরজাতীয় সহোদরের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া, ক্ষিপ্রপদে সৈন্যপত্যপথে অগ্রসর হন। অল্প দিবসের মধ্যেই দুই জনে, সমান প্রতিপত্তিলাভ করিয়া, সমগ্র জগতের নেত্রপথে অবস্থিতি করেন।

কিন্তু অনেক বিষয়ে—অনেক অবস্থায়—অনেকগুণে সাম্য থাকিলেও, ওয়াশিংটন ও ডিওয়েটে দুই বিষয়ে বৈষম্য বিলক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রধান বৈষম্য ভাগ্যে! ওয়াশিংটনের ভাগ্য প্রসন্ন হইয়াছিল, তিনি স্বীয় মনস্কামনা পূর্ণ করিতে পারিয়াছিলেন; তিনি জন্মভূমির উদ্ধার করিয়া, স্বজাতীয় মার্কিণ সহোদরদিগের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। ডিওয়েটের ভাগ্য প্রসন্ন হয় নাই। তিনি স্বীয় জন্মভূমির উদ্ধার করিতে পান নাই, স্বজাতীয় বুর-ভ্রাতৃদিগের স্বাধীনতাও তিনি অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারেন নাই। ভাগ্যে এইরূপ বিপরীত বৈষম্য; অবস্থায়ও বৈষম্যের অভাব নাই। জর্জ্জ ওয়াশিংটন, বাল্য অতিবাহিত হইতে না হইতে, স্বীয় প্রদেশের মিলিশিয়া-সৈন্যে যোগ দিয়া, যুদ্ধবিদ্যা শিখিয়াছিলেন; নবযৌবনেই দুর্দ্ধর্ষ আদিমদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার অবসর পাইয়াছিলেন; স্বাধীনতার যুদ্ধমুখে তিনি সমর-বিদ্যাকে সহচরী করিয়া কার্য্যারম্ভ করিয়াছিলেন। ডিওয়েটের অবস্থায়

বন্দুক ধরিয়াছিলেন। বিষম যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়া যুদ্ধ শিখিয়াছিলেন; হঠাৎ মহাসাগরে নিমগ্ন হইয়া সাঁতার শিখিয়াছিলেন। জর্জ্জ ওয়াশিংটন সেনানী হইয়া, স্বাধীনতার যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; ডিওয়েট সামান্য সৈনিকরূপে দশ বিশ হাজারের এক জন হইয়া, স্বাধীনতার মহাসমরে ঝাঁপ দিয়াছিলেন। মার্কিণ স্বাধীনতার যুদ্ধেও অনেক মার্কিণ মহাবীর, পূর্ব্বতন শিক্ষা বিনাও, সৈনাপত্য-কৌশলের পরিচয় দিয়াছিলেন বটে; কিন্তু জর্জ্জ ওয়াশিংটনকে সেরূপ সৈনাপত্য করিতে হয় নাই, তিনি পূর্ব্বতন শিক্ষার সাহায্য লইতে পারিয়াছিলেন। বুয়যুদ্ধের মহাবীর ডিলারে, বোথা প্রভৃতি অনেকে ওয়াশিংটনের ন্যায় পূর্ব্বতন শিক্ষার সাহায্য লাভ করিয়াছিলেন; কিন্তু ডিওয়েটের ভাগ্যে এ সুবিধা ঘটে নাই। তিনি কোনরূপ শিক্ষা চক্ষে না দেখিয়াই, যুদ্ধরঙ্গক্ষেত্রে অভিনয় করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং ডিওয়েটের গৌরব অধিক। জর্জ্জ ওয়াশিংটনের চরম উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছিল; মার্কিণ স্বাধীনতার যুদ্ধে তিনি বিজয়ী হইয়াছিলেন; তাঁহার জন্মভূমির স্বাধীনতা সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তাই তিনি জগতে অদ্বিতীয় মহাবীর বলিয়া পরিচিত হইয়া রহিয়াছেন—চিরদিন থাকিবেন। ডিওয়েটের চরম উদ্দেশ্য যদি পূর্ণ হইত, তিনি যদি জন্মভূমি ও স্বজাতীয় সোদরবৃন্দের পূর্ব্বস্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিতেন, তাহা হইলে, জর্জ্জ ওয়াশিংটন অপেক্ষা উচ্চতর ও উত্তমতর মহাবীরাসনে বসিয়া, অদ্বিতীয় হইয়া থাকিতেন। স্বাধীনতা-যুদ্ধের সফলতা বিফলতায় এত প্রভেদ!

প্রথম পর্ব্ব।

রণক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়াই, সামান্য সৈনিক ডিওয়েট কিরূপ অসামান্য সমরশক্তির পরিচয় দিতে আরম্ভ করেন, কিরূপ দ্রুতপদে সৈনাপত্যপথে অগ্রসর হন, কিরূপ বিদ্যুদ্গমনে উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপানে উত্থান করিতে থাকেন, তাহা তাঁহার সামরিকজীবনের প্রথম অংশেই প্রতিভাত হইয়াছে, মহাবীরচরিতের প্রথম পর্ব্বেই তাহা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। অতএব, সংক্ষেপে এই প্রথম পর্ব্বের আভাস দিয়া, আমরা সহৃদয় পাঠককে চিন্তা চর্চ্চা তুলনা সিদ্ধান্তের অবসর দিব। মহাবীরচরিতের এই উপক্রমণিকাভাগে কেবল ইঙ্গিত করিয়া যাইব। পাঠক শ্রবণ করুন।

যাত্রার সংকল্প হয়; ট্রান্সভাল ও অরেঞ্জের সমস্ত সমর্থ পুরুষই স্বদেশের স্বাধীনতা-রক্ষার্থ আহূত হন। ষোড়শবর্ষের বালক হইতে ষষ্টিবর্ষের বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সকল পুরুষকে অস্ত্রধারণে বাধ্য হইতে হয়; যুদ্ধ বিষয়ে একান্ত অশিক্ষিত অনভিজ্ঞ ডিওয়েটকেও সামান্যসৈনিকরূপে বুর-পল্টনে প্রবেশ করিতে হয়। ডিওয়েট "যুদ্ধের তিন বৎসর" নামক স্বকীয় গ্রন্থে নিজের কথা নিজে লিখিয়াছেন; ওলন্দাজ ভাষায় লিখিত এই গ্রন্থ নানা ভাষায় অনুবাদিত এবং প্রচারিত হইয়াছে; গ্রন্থ ইংরেজের ইংরেজী ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে, ইংলণ্ডের ইংরেজী প্রেসে মুদ্রিত হইয়াছে। ওয়েষ্টমিনিষ্টারের কনষ্টেবল-কোম্পানি পুস্তকের প্রচার করিয়াছেন। জগতের সর্ব্বত্রই পুস্তকের আদর হইয়াছে। ডিওয়েটের সামরিক জীবনচরিত জগতের সর্ব্বত্র সাদরে গৃহীত ও পঠিত হইয়াছে; বিলাতেও গ্রন্থের অত্যন্ত আদর হইয়াছে। সেই গ্রন্থ আমরা পাইয়াছি, তাহার যৎকিঞ্চিৎ আভাসও দিতে বাধ্য হইতেছি। সংক্ষিপ্ত বিবরণেও আমরা ডিওয়েটকেই বক্তার আসনে বসাইতেছি; তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহারই সংক্ষিপ্তসার, তাঁহারই মুখে ন্যস্ত হইতেছে। ভাষা তাঁহার না হইলেও, বিষয় তাঁহার, ঘটনা তাঁহার, ভাব তাঁহার; অতএব, ডিওয়েটই বক্তা। তিনি বলিতেছেন; "১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের ১১ই অক্টোবর, আমি সামান্য সৈনিকরূপে আমাদের অরেঞ্জ রাজ্যের বুরপল্টনে যোগ দিলাম। সামান্য সৈনিকরূপে যোগ দিয়াও, আমি এক রেজিমেণ্টের সহকারিসেনাপতি হইলাম; ১১ই সহকারিসেনাপতি হইয়া, আমি ১২ই অক্টোবর ৬০০ বুর যোধের পরিচালনে নিযুক্ত হইলাম। আমাদের নেটাল-যাত্রার আয়োজন হইল। তখন পল্টনের সমস্ত বুয়র সৈন্যই অশিক্ষিত, অনভিজ্ঞ, আনকোরা, নূতন আহেলামামলা। আমি সেনানী শিক্ষিত নহি, আমার সৈন্যগণও অশিক্ষিত। অথচ এইরূপ সৈন্য লইয়া এইরূপ সেনানীকে অগত্যা যুদ্ধযাত্রা করিতে হইল। কিন্তু 'কর্ম্মণা বাধ্যতে বুদ্ধিঃ', সকল সৈনিক সেনানীরই দিনদিন শিক্ষা হইতে লাগিল। পূর্ব্বে যেখানে সৈনিকসুলভ বাধ্যতা বশ্যতা ছিল না, সেখানে বাধ্যতা বশ্যতা হইতে লাগিল। সকল সৈনিকই দিন দিন সৈন্যযোগ্য আদব কায়দা শিখিতে লাগিল। অবস্থায় পড়িলে, মানুষ দিনদিনই নবীনরূপে গঠিত হইয়া থাকে; পৃথিবীতে এ পক্ষে দৃষ্টান্ত বিরল নহে, কিন্তু সময়োচিত এবং অবসরমত আদব কায়দায় অভ্যস্ত হইলেও, বুর সৈন্য অন্য সৈন্যের মত আদব কায়দায় অভ্যস্ত হইল না।

স্বাধীনতানুরাগই এ পক্ষে হেতু। যেরূপটি চাহি, সেরূপটি আমি কখনও পাই নাই। এই জন্য প্রথম প্রথম আমাকে নূতন সৈন্য লইয়া বড় কষ্ট পাইতে হইল। আবার, অশিক্ষিত সৈন্যেরও সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য হইয়াছিল। ফলতঃ, সৈন্যসংগ্রহের জন্যও আমাদিগকে কষ্ট পাইতে হইয়াছিল।

নেটালপ্রান্তে।

"যাহাই হউক, আমরা যাত্রা করিলাম। ২৪শে অক্টোবর—নেটালপ্রান্তে—রীটফন্টীন বা মোডরস্প্রুট নামক স্থানে, আমাদিগকে প্রথম আসর লইতে হইল। এই যুদ্ধে ইংরেজপক্ষে পল্টন ও কামান অনেক ছিল। জেনেরল ইউল ইংরেজসেনার পরিচালন করিয়াছিলেন। তিন বেটারি কামান তাঁহার সহায় ছিল। ইংরেজপক্ষের প্রভূত পল্টনে তিন বেটারিতে রহিল ১৮টা কামান, আর আমাদের সামান্য পল্টনে রহিল একটিমাত্র কামান; ও দিকে অষ্টাদশ, এ দিকে এক। কামানে যেরূপ তারতম্য, পল্টনেও সেইরূপ। তথাপি সেই যুদ্ধে যে আমাদের পরাজয় হইল না, ইহা কেবল ভগবানের কৃপা; আর বুর-হৃদয়ের অপরিমেয় স্বাধীনতাপ্রেমই ইহার প্রধান কারণ। এই রীটফন্টীনের যুদ্ধাবসানেই আমি মহাবীর ক্রঞ্জীর প্রথম দর্শন পাই। যুদ্ধাবসানে তিনি নিজেই আমার সহিত ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে পরামর্শ করিতে আসিলেন। চতুঃষষ্টিবর্ষীয় যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ জেনেরল ক্রঞ্জী আসিয়া আমার সহিত পরামর্শ করিলেন; এক সপ্তাহের যোদ্ধা, সহসাসেনানীপদস্থ, সৈনিক ডিওয়েটের সহিত বৃদ্ধ সেনাপতি ক্রঞ্জী বিশ্বাস সহকারে কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা করিলেন! এই যুদ্ধের পরেই ট্রান্সভালের প্রধান সেনাপতি বৃদ্ধ জুবেয়ার সমগ্র সৈন্যের ভার লইয়া প্রধানতম সেনাপতি হইলেন। এই যুদ্ধের পরেই তিনি সসৈন্যে নেটাল-রাজধানী লেডীস্মিথের দিকে যাত্রা করিবার ব্যবস্থা করিলেন। যাত্রার বন্দোবস্তে অনেক সময় অতিবাহিত হইল। প্রায় এক মাস আমার ভাগ্যে আর তেমন ঘটনা ঘটিল না। অনন্তর ৩০শে নভেম্বর, নিকল্‌সন্‌-নেক নামক স্থানে বুর আর বৃটিশে আর এক যুদ্ধ ঘটিয়া গেল। এ যুদ্ধে বৃটিশসৈন্যকে একেবারেই ধ্বস্ত বিধ্বস্ত হইতে হইল। ১৮৮১ অব্দের যুদ্ধে বৃটীশসৈন্য মাজুবা ক্ষেত্রে ট্রান্সভালের বুরদিগের হস্তে যেরূপ ধ্বস্ত বিধ্বস্ত হইয়াছিল, এবারও এই নিকল্‌সন্‌-নেকে সেইরূপ হইল। এই জন্যই আমাদের

সমাজে এখনও 'লিটিল্ মাজুবা'—ছোট মাজুবা বলিয়াই পরিচিত। যুদ্ধে ইংরেজ পক্ষে ছিল প্রভূত পল্টন। আমাদের ছিল আড়াই শতের অধিক নহে। এ যুদ্ধে ইংরেজ পক্ষে প্রথমে বিলক্ষণ ত্রুটি হইয়াছিল। প্রথম আক্রমণের পর বৃটিশসৈন্য শ্বেত পতাকা দেখাইয়া আমাদিগকে যুদ্ধে বিরত হইতে ইঙ্গিত করিয়াছিল; আমরাও প্রচলিত প্রথা অনুসারে যুদ্ধে বিরত হইয়া, ইংরেজ শিবিরের দিকে, শান্তভাবে অগ্রসর হইতেছিলাম। এমন সময় বৃটিশসৈন্যের গুলিবৃষ্টি আসিয়া আমাদিগকে বিব্রত করিয়া দিল। আমার বুর সৈনিকেরাও বিরক্তি-ক্রোধে অধিকতর উত্তেজিত হইয়া অধিকতর শৌর্য্যসহকারে যুদ্ধ করিল। তখন বৃটিশ চমূ বিপন্ন হইয়া আবার শ্বেত পতাকা দেখাইল। এবার যুদ্ধের অবসান হইল, আমরাও সম্পূর্ণরূপে বিজয়লাভ করিলাম। এই আমার দ্বিতীয় যুদ্ধ এবং দ্বিতীয় জয়। কিন্তু এই যুদ্ধেই আমি বৃটিশ সৈনিকদিগকে প্রথম বন্দী করিলাম। জয়ে দ্বিতীয় হইলেও বন্দি-গ্রহণে এই যুদ্ধই প্রথম। যুদ্ধাবসানে দেখিলাম, ৮১৭ জন বৃটিশ সৈনিক সেনানীকে বন্দী হইতে হইয়াছে। দেখিলাম, যুদ্ধক্ষেত্রে হতাহত পড়িয়া রহিয়াছে ২০৩ জন বৃটিশ যোধ। বুঝিলাম, শিবিরে নীত হইয়াছে আরও অনেক। দেখিলাম, আমাদের পক্ষে চারি জন মাত্র হত এবং পাঁচ জন মাত্র আহত হইয়াছে। এই যুদ্ধেই প্রথমে ইংরেজের দুইটি মেক্সিম্ ও দুইটি পাহাড়ী কামান আমাদের হস্তগত হয়। পরে অশ্বতরবাহিত অনেক কামান আমাদের হাতে পড়ে। সহস্রাধিক লীমিটফোর্ড বন্দুকও আমাদের হস্তগত হয়।

"যুদ্ধ চলিয়াছিল বেলা ৯টা হইতে ২টা পর্য্যন্ত। যুদ্ধাবসানে আহত বৃটিশ-সৈনিকদিগের সেবা শুশ্রূষায় আমাদের অনেক সময় অতিবাহিত হইয়াছিল। এম্বুলেন্স বা সৈনিকবহনের শিবিকাদি আমাদের ছিল না। সুতরাং আমি ইংরেজ সেনাপতি সার জর্জ্জ হোয়াইটকে পত্র লিখিতে বাধ্য হইলাম। কিন্তু বৃটিশ পক্ষের শিবিকাদি সে দিন আসিল না, পর দিন আসিয়া উপস্থিত হইল। এই যুদ্ধের পরেই আমাকে নেটালের দিক ছাড়িয়া, অরেঞ্জের দিকে প্রত্যা-বৃত্ত হইতে হইল; আমাকে আমাদের রাজধানী বুলুমফন্টীনের দিকে যাত্রা করিতে হইল। নেটাল-প্রান্তের দুই যুদ্ধেই আমি সার রেডভার্স বুলারের সৈনাপত্য কৌশল দেখিয়া বড়ই তুষ্ট হইলাম। প্রভৃত নেটাল-সেনার প্রধান

আমি বিস্মিত হইয়াছি। আমি কিন্তু তাঁহার মত যোগ্যতা আর কোন বৃটিশ সেনানায়কেই এ পর্য্যন্ত দেখিতে পাই নাই।

"ত্রান্সভালের বুর-সেনা লইয়া, বড়সেনাপতি বৃদ্ধ জুবেয়ার নেটালের দিকে রহিলেন; আমার দলবল লইয়া, আমি অরেঞ্জের দিকেই প্রত্যাবৃত্ত হইলাম, এবং প্রথমে বুলুম্-ফন্‌টীনেই অবিস্থিতি করিতে লাগিলাম। এই-খানে ৯ই ডিসেম্বর আমি আমাদের প্রেসিডেণ্ট ষ্টীন কর্ত্তৃক জেনেরল-পদে অভিষিক্ত হইলাম। ১১ই অক্টোবর সামান্যসৈনিকরূপে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া, ১৩ই ডিসেম্বর জেনেরেল-পদে নিযুক্ত হইলাম। সুতরাং, এই অভিষেক-সংবাদ পাইয়া, আমি একেবারে বিস্মিত হইলাম; আমার অসম্মতির কথা প্রেসিডেণ্টকেও জানাইলাম। কিন্তু তিনি কোন কথা শুনিলেন না। আমাকে অগত্যা অরেঞ্জ সেনার জেনেরল হইতে হইল। বস্তুতঃ, এরূপ পদোন্নতির জন্য আমি এক দিনও অভিলাষ করি নাই। আমার ইচ্ছা ছিল, সৈনিক-পদেই বরাবর থাকিব; সৈনিক-পদে থাকিয়াই, জন্মভূমির জন্য দেহ প্রাণ ন্যস্ত করিব। জেনেরল হইয়া যখন আমাকে ক্ষুদ্র পণ্টন ছাড়িতে হইল, তখন আমার নেত্রযুগল হইতে অশ্রুপাত হইতে লাগিল। অধীনস্থ সৈনিকদিগকে আমি সহোদর বলিয়া মনে করিতাম, তাহারাও আমাকে বড় ভালবাসিত। আমি সকলকেই সহযোগী বলিয়া মনে করিতাম, প্রাধান্য দেখাইবার বাসনা আমার মনে কোন দিন স্থান পায় নাই। বিদায়কালে আমার হৃদয় যেরূপ আবেগে পূর্ণ হইল, আমার সকল সৈনিকের হৃদয়ও সেইরূপ আবেগে পূর্ণ হইল। ১৪টি অতিবিশ্বস্ত সৈনিক কিছুতেই আমাকে ছাড়িল না, তাহারা আমার সহিত যাত্রা করিল।"

এই গুণেই ডিওয়েট অত্যল্পকালে অত্যুচ্চপদে উঠিতে পারিয়াছিলেন। এইরূপ আশ্রিত-বাৎসল্য মানুষকে বড় করিয়া দেয়। মহাবীর নেপোলীয়নও এরূপ আশ্রিত-বাৎসল্য-গুণে অত বড় হইয়াছিলেন। তিনি অধীনস্থ সামান্য সৈনিকদিগকেও নিরতিশয় স্নেহ-নেত্রে দেখিতেন; তাহাদের দুঃখে দুঃখিত হইতেন, তাহাদের সুখে সন্তুষ্ট হইতেন। সৈনিকদিগকে কষ্ট দিয়া, নেপো-লীয়ন কখনও নিজে সুখভোগ করিতেন না। যখন সৈনিকদিগকে মাঠে ময়দানে—অনাবৃত স্থানে—ভূমিশয্যায় পড়িয়া থাকিতে হইত, তখন নেপো-লীয়নও সেই মাঠে ময়দানে—অনাবৃত ক্ষেত্রে—ভূমিশয্যায় পড়িয়া থাকিতেন।

ফেলিয়াছিলেন ; তাই ত তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে অসাধ্যসাধন করিতেন। ডিওয়েটও যে এই গুণে অদ্ভুতকর্ম্মা হইয়াছিলেন, তাহা জগতের সকলেই দেখিতে পাইয়াছেন। কিন্তু এখন পাঠক ডিওয়েটের কথা আবার ডিওয়েটের মুখেই শুনিতে থাকুন। তিনি বলিয়াছেন,—

"আমি অরেঞ্জ-সেনার জেনেরল হইলাম বটে, কিন্তু মেগার্সফণ্টীনে উপস্থিত হইয়া যখন দেখিলাম, প্রবীণ মহাবীর

জেনেরল ক্রঞ্জী

আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, তখন আমি আগ্রহসহকারে তাঁহার সহকারিতা করিতেই বদ্ধপরিকর হইলাম। কেবল যে অরেঞ্জের বুর-সেনা আমাদের হস্তে পরিচালিত হইল, এরূপ নহে; ক্রঞ্জীর সেনায় ট্রান্সভালের বুরও অনেক ছিল। আমাদিগকে উভয় রাজ্যের বুর লইয়াই সমর-রঙ্গে প্রবিষ্ট হইতে হইল। মেগার্সফণ্টীনের যুদ্ধসজ্জায় আমাদিগকে ১৫ মাইল স্থান ব্যাপিয়া লইতে হইল। এই ১৫ মাইল দীর্ঘ সমরক্ষেত্রের নানা স্থানে আমাকেই সৈন্য সাজাইয়া রাখিতে হইল; প্রত্যহ আমাকে এই বিস্তীর্ণ সৈন্যক্ষেত্র নিজের চক্ষে দেখিবার ব্যবস্থা করিতে হইল। সুতরাং পরিদর্শন কার্য্য বড় সহজ হইল না। সম্মুখেই বৃহতী বৃটিশ চমূও সজ্জিত হইয়া রহিল। বৃটিশ চমূর বিরাট কামান-মালা হইতে দিবারাত্র গোলা আসিতে লাগিল। আমি গণিয়া দেখিলাম, প্রত্যহ বৃটিশ কামানের ৮৩৬টা গোলা আসিয়া আমাদিগকে লক্ষ্য করিতেছে। আমাকে এই গোলাবৃষ্টির ভিতর দিয়া ক্রমাগত পরিদর্শন-কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইল।

"এই মেগার্সফণ্টীন ক্ষেত্রেই জেনেরল ক্রঞ্জীর সহিত, আমাদের যান অভিযান সৈন্যসজ্জা ও যুদ্ধরীতি সম্বন্ধে মতভেদ হইতে লাগিল। আমার একটা পরামর্শও ক্রঞ্জীর গ্রাহ্য হইল না। জেনেরল ক্রঞ্জীর প্রতি আমার অপেক্ষা অধিক ভক্তি আর কোন লোকের নাই, তাঁহার মত মহাবীর মহা-যোদ্ধা রণপণ্ডিতও আমি আর দ্বিতীয় দেখি নাই। কিন্তু এক দোষেই সব নষ্ট হইয়াছে, ক্রঞ্জীর মত আত্ম-প্রত্যয়ী একগুঁয়ে লোক আর দেখিতে পাই না। তিনি নিজে যাহা বুঝেন, তাহাই অভ্রান্ত বলিয়া মনে করেন; পরের পরামর্শে কর্ণপাত করিতেও তাঁহার প্রবৃত্তি হয় না। এই দোষে তিনি নিজের মাথা নিজে খাইয়াছেন; এই দোষেই তিনি আমাদেরও সর্ব্বনাশ করিয়াছেন।

অনতিবিলম্বেই তিনি যে পার্দেবর্গে সসৈন্যে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হন, তাহা এই দোষের জন্য। তিনি সসৈন্যে আত্মসমর্পণ করিলেন বলিয়াই যে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে বুর-স্বাধীনতাকেও অধঃপাতে যাইতে হইল, তাহা আমি তৎকালেই দেখিতে পাইলাম; পরে সমগ্র জগৎ দেখিতে পাইল। ক্রঞ্জী আমার একান্ত ভক্তিপ্রীতিভাজন, কিন্তু আমাদের জন্মভূমি আমার অধিকতর ভক্তি-প্রীতিভাজন। বুর-স্বাধীনতার প্রতি আমার যত ভক্তি, আর কাহারও প্রতি আমার তত ভক্তি নাই। এই জন্যই ক্রঞ্জীর কথায় আমাকে এত কথা কহিতে হইল; গুণবান্ ক্রঞ্জীর দোষের কথাও আমাকে এই জন্য বলিতে হইল। এ দিকে ক্রঞ্জীর সহিত আমার এইরূপ মতভেদ হইল, ও দিকে বৃটিশ সেনাপতি রবার্টস্ ও তাঁহার সহযোগী সহকারীরা, প্রভূত সৈন্য লইয়া, আমার অরেঞ্জ রাজ্যে আসিতে লাগিলেন। আমি দেখিলাম, ইংরেজ-সেনাপতি জেনেরল ফ্রেঞ্চ, প্রভূত সৈন্য লইয়া, অগ্রসর হইয়াছেন। কাজেই আমি আর স্থির থাকিতে পারিলাম না। তখন আমার হাতে ছিল ৩৫০টি মাত্র বুর সৈন্য। আমি ক্রঞ্জীর কাছে আর কিঞ্চিৎ সৈন্য চাহিলাম, জিদ করিয়া ধরিলাম। কিন্তু তিনি কিছুতেই আমার প্রার্থনায় সম্মত হইলেন না। কাজেই আমাকে সেই যৎকিঞ্চিৎ সৈন্য এবং দুইটিমাত্র কামান লইয়া, ১১ই ফেব্রুয়ারি জেনেরল ফ্রেঞ্চের দিকে যাত্রা করিতে হইল।

"সেই যৎকিঞ্চিৎ সৈন্যই ভিন্ন ভিন্ন ভাগে বিভক্ত করিয়া এবং ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সজ্জিত করিয়া, আমি ৩৬টি অশ্বারূঢ় সৈন্য লইয়া, ফ্রেঞ্চের হাজার পল্টন ও দুইটা কামানের বিরুদ্ধে অভিযান করিলাম। বৃটিশ গোলার বৃষ্টি আমাদের মাথার উপর দিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল। একেবারেই সহসা বৃটিশ সেনার বুকের উপর গিয়া পড়িলাম, তাই বৃটিশ কামানের গোলা আমাদিগকে ডিঙ্গাইয়া আমাদের মাথার উপর দিয়া যাইতে লাগিল; তাই গোলা-বৃষ্টি আমাদিগের বড় কিছু করিতে পারিল না। ইত্যবসরে আমার অবশিষ্ট সৈন্যও মহাবেগে আসিয়া পড়িল, ক্ষণকাল উভয় পক্ষের গুলি-বর্ষণে যুদ্ধক্ষেত্রে যেন করকাবৃষ্টি হইতে লাগিল। জয়লক্ষ্মী এ যুদ্ধেও আমাকে আলিঙ্গন করিলেন; আমাদের জয় হইল। ফ্রেঞ্চের বৃটিশ সৈন্য আর অগ্রসর হইতে পারিল না; আমরাও আমাদের অনাবৃত অশিবির শিবিরে প্রত্যাবৃত্ত হইলাম। পরদিন সূর্য্যোদয় হইতে না হইতে দেখিলাম, ফ্রেঞ্চ সসৈন্যে প্রস্থান

"ফ্রেঞ্চের প্রস্থান হইতে না হইতেই কিন্তু রবার্টসের আগমন-সংবাদ আসিয়া আমার কর্ণে উপস্থিত হইল। চার-ভাগ্য আমাদের বরাবরই প্রসন্ন ছিল; ইংরেজপক্ষের সকল সংবাদ আমরা যেরূপ শীঘ্র পাইতাম, আমাদের পক্ষের কোন সংবাদ ইংরেজসেনাপতিরা সেরূপ পাইতেন না। জেনেরল রবার্টস যে সৈনাপত্য কৌশলের পরাকাষ্ঠা দেখাইবেন, তাহা আমি প্রথম হইতেই বুঝিয়াছিলাম। তিনি যখন আমাদিগকে বঞ্চিত করিবার জন্য, এক পথে যাত্রা করিবার ঘোষণা করিয়া, অন্য পথে যাত্রা করিলেন, তখন আমি প্রথমেই তাহা দেখিতে পাইলাম। তিনি যে, এই ছলে, পার্দেবর্গে গিয়া ক্রঞ্জী ও তাঁহার সমস্ত সৈন্যকে ঘিরিয়া ফেলিবেন, তাহাও আমি পূর্ব্বাহ্নে দেখিতে পাইলাম।

"দেখিয়াই, আমি সময়োচিত প্রতিকারে মন দিলাম। ৪৫০ জন মাত্র বুরসৈন্য লইয়াই, আমি জেনেরল রবার্টসের পথ, অন্ততঃ কিঞ্চিৎ কালের জন্য, আটকাইবার বন্দোবস্ত করিলাম। ৪৫০ জন সৈন্যের ৩৫০টিকে আমি গুপ্তভাবে রাখিয়া দিলাম। স্থির করিলাম, যখন রবার্টস তাঁহার মহাচমূ লইয়া পার্দেবর্গের দিকে অগ্রসর হইবেন, আমিও সেই সময়ে ঐ ৩৫০ জন গুপ্ত সৈনিককে ব্যক্ত করিয়া, হঠাৎ তাঁহার গতিরোধ করিব। আর এইরূপ প্রতিকূলতা করিয়াই, ক্রঞ্জীকে পার্দেবর্গ হইতে সরিয়া পড়িবার অবসর দিব।

"এইরূপ সংকল্প করিয়া, আমার সহযোগী লুবেকে ১০০ মাত্র সৈনিক দিয়া, রবার্টসের সেনামুখে পাঠাইয়া দিলাম; নিজে সেই ৩৫০টি সৈনিক লইয়া, অধিকতর প্রতিকূলতার জন্য প্রস্তুত থাকিলাম। কিন্তু প্রকৃত উদ্দেশ্যসিদ্ধির চেষ্টাপক্ষে তিলমাত্র বিলম্ব বা ঔদাসীন্য করিলাম না। সেনাপতি শীপার্সকে ক্রঞ্জীর কাছে পাঠাইলাম। শীপার্সও নক্ষত্রবেগে গিয়া, আমার নাম করিয়া, ক্রঞ্জীকে জানাইলেন,—'ডিওয়েটের একান্ত অনুরোধে, আপনি এই বেলা পার্দেবর্গ হইতে সসৈন্যে সরিয়া পড়ুন। লর্ড রবার্টস্ ৪০।৫০ হাজার সৈন্য ও বহুসংখ্যক কামান লইয়া আপনাকে ও আপনার সৈন্য সামন্ত ও অনুচর-পরিচরাদিকে বেষ্টন করিতে আসিতেছেন। তাঁহার আসিতে অধিক বিলম্ব নাই।'

"এই স্থলে একটা কথা বলিয়া রাখি। ক্রঞ্জীর পল্টনে অনেক স্ত্রীলোক ছিল। তাহাদের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া আমাকে বড়ই কাতর হইতে হইয়াছিল। সপরিবারে যুদ্ধযাত্রা করা বুরদিগের একটা চিরন্তন রোগ। আমি প্রথম হইতেই

এইরূপ সস্ত্রীক যুদ্ধযাত্রায় নিষেধ করিয়াছিলাম, অনেক আপত্তি করিয়াছিলাম। কিন্তু পাছে বুরসেনানী সৈনিকেরা চটিয়া যায়, এই ভয়ে প্রেসিডেণ্টেরা আমার নিষেধবাক্য শুনিতে পারেন নাই। ফলও হাতে হাতে ফলিল। ক্রঞ্জীকে রমণীকুলের জন্যই বিপন্ন হইতে হইল। সে যাহা হউক, শীপার্সের কথা—আমার পরামর্শ—ক্রঞ্জীর গ্রাহ্য হইল না। তিনি বলিলেন, 'কি! ইংরেজ সৈন্যের ভয়ে পলাইতে হইবে! ইংরেজ পণ্টন দেখিয়া সরিয়া যাইতে হইবে! যাও, কেবল গুলি কর, আর ইংরেজ মার।'

শীপার্স আসিয়া আমাকে হতাশ করিলেন, ক্রঞ্জীর আশু বিপত্তি এবং বুয়র স্বাধীনতার আশু সংহার বিষয়ে চিন্তা করিয়া আমি একান্ত অভিভূত হইলাম; কিন্তু তথনও প্রতিকারচেষ্টার ত্রুটি করিলাম না। লর্ড রবার্টসের রসদ-পণ্টন আসিতেছে, শুনিয়া আমি ১৯শে ফেব্রুয়ারি সেই দিকে অভিযান করিলাম, রসদ-পণ্টনকে আক্রমণ করিলাম, দুই দলে ঘোর যুদ্ধ হইল, যুদ্ধে আমাদেরই জয় হইল, আমরা রবার্টসের ১৬০০ বলদ ও ৪০ জন সৈন্যকে বন্দীও করিলাম। ২০শে ফেব্রুয়ারি বৃটিশ সেনা সমস্ত রসদপত্র ফেলিয়া প্রস্থান করিল। আমরাও তিন শত রসদ বোঝাই গাড়ী, কয়েকখানা ট্রলি এবং অন্যান্য অনেক লটবহর হস্তগত করিয়া, ক্রঞ্জীর উদ্ধারার্থ যাত্রা করিলাম। পথে এক দল বৃটিশ সৈন্য আমাদের সম্মুখে পড়িল, আমার কথায় সেনাপতি সসৈন্যে আত্মসমর্পণ করিলেন; হস্তগত রসদপত্র এবং বন্দিগণের যথোচিত বন্দোবস্ত করিয়া, আমি ক্রঞ্জীর উদ্ধারার্থ যাত্রা করিলাম। ২২শে ফেব্রুয়ারি কিঞ্চিৎ সৈন্য লইয়া পার্দেবর্গের অদূরে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম,

ক্রঞ্জী সসৈন্যে

লর্ড রবার্টসের প্রভূত সেনা কর্তৃক বেষ্টিত হইয়াছেন। দেখিলাম, তিন দিকে মক্ষিকা-প্রবেশেরও স্থান নাই; এক দিকে কতকটা মুক্ত আছে। আমি সৈন্য লইয়া সেই দিকের রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। বাসনা, তথনও ক্রঞ্জী ঐ দিক দিয়া চলিয়া আসিবেন, আর আমি তাঁহার রক্ষা করিব। এইরূপে এক পথ মুক্ত রাখিয়া, আমি আবার ক্রঞ্জীর নিকট দূত পাঠাইলাম। আমার সাহসী ও অদ্ভুত-কর্ম্মা দূত অসাধ্যসাধন করিল, বৃটিশ চমূর মহাব্যূহ ভেদ করিয়া ক্রঞ্জীর কাছে উপস্থিত হইলেন। আমি যে একটা পথ মুক্ত রাখিয়াছি

লইয়া যে ক্রঞ্জী ঐ পথে মুক্তিলাভ করিতে পারেন, তাহা দূত ক্রঞ্জীকে বুঝাইয়া বলিলেন। কিন্তু একগুঁয়ে বৃদ্ধ সেনাপতি কিছুতেই নিজের গোঁ ছাড়িলেন না। যখন অমিতসাহস বিচিত্রকর্ম্মা শীপার্স আসিয়া এই কথা বলিলেন, তখন বুয়রজাতি ও বুয়ররাজ্যের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া, আমাকে অন্ধকার দেখিতে হইল। ২২এ হইতে ২৬এ ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত পথ মুক্ত রাখিয়া, আমি যখন দেখিলাম, আর উপায় নাই; যখন আমাকেও ক্রঞ্জীর দশায় পড়িবার মত হইতে হইল; যখন দেখিলাম, আর তিলমাত্র বিলম্ব হইলেই, আমাকেও লর্ড রবার্টসের প্রভূত সেনা কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইতে হইবে; তখন অগত্যা শোকসন্তপ্তহৃদয়ে সসৈন্যে প্রস্থান করিলাম। ক্রঞ্জী আমার একটা পরামর্শও গ্রাহ্য করিলেন না; অথচ এই জন্যই, আপনি মজিলেন, দেশকেও মজাইলেন। এই চিন্তা আমাকে যে কি মনঃকষ্ট দিল, এখনও দিয়া থাকে, তাহা অন্তর্য্যামী ভগবানই জানেন!

"এইবার ক্রঞ্জী কিছুতেই আমার পরামর্শ শুনিলেন না; নিজের বীরত্ব অপেক্ষা স্বদেশের স্বাধীনতা যে অধিক প্রিয় পদার্থ, তাহা তিনি বুঝিলেন না! আমাদের সর্ব্বনাশ হইল! ক্রঞ্জীর পতনেই সমগ্র বুয়র জাতির পতন হইল। যদি কেবল ক্রঞ্জীই বন্দী হইতেন, তাহা হইলে, ক্ষতি হইত না; ক্রঞ্জীর সঙ্গে সঙ্গে যে বহুসংখ্যক বুয়রবীরকেও বন্দী হইতে হইল, ইহাতেই আমাদের সর্ব্বনাশ হইল। সৈন্য আমাদের হাতে একান্ত অল্প ছিল, যত ভাল ভাল সৈন্যই ক্রঞ্জী লইয়াছিলেন। ক্রঞ্জীর ও তাঁহার প্রভূত বলের আত্ম-সমর্পণে বুয়রবল একেবারেই দুর্ব্বল হইয়া পড়িল; তাহা ছাড়া, এই বিষম বিপত্তি ও বিপর্য্যয়ের সঙ্গে সঙ্গেই যত বুয়র-হৃদয়েও বিপর্য্যয় ঘটিল; যত সাহসী আশায় উৎফুল্ল বুয়রকেও হতসাহস ও হতাশ হইতে হইল। সকলেই যুদ্ধক্ষেত্র ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার জন্য ব্যস্ত হইল। উৎসাহহীন, আগ্রহশূন্য সৈন্য লইয়া, মহাবল বৃটিশ বলের সহিত যুদ্ধ করা যে দুঃসাধ্য হইয়া পড়িল, তাহা আমরা সকলেই বুঝিতে পারিলাম; তাহা আমরা শীঘ্রই দেখিতেও পাইলাম। ক্রঞ্জীর পতনেই বৃটিশের উত্থান হইল।

দ্বিতীয় পর্ব্ব।

পতনে উত্থান।

"ক্রঞ্জীর পতনেই বুয়রবলের পতন হইল; বুয়রবলের পতনেই বৃটিশ-বলের উত্থান হইল। ক্রঞ্জী সসৈন্যে আত্মসমর্পণ করিতে...

এই সংবাদে চারি দিকের বুয়রসেনা, যেন মন্ত্রাহত সর্পের ন্যায়, হীন-বীর্য্য ও হতসাহস হইয়া পড়িল; কিন্তু এই সংবাদে আড়াই লক্ষ বৃটিশ সৈন্য আশা ও সাহসে উত্তেজিত হইয়া উঠিল। পার্দেবর্গে মহাবিপত্তি ঘটিল; ও দিকে লেডীস্মিথও অবোরোধমুক্ত হইল। বৃদ্ধ সেনাপতি জুবেয়ারের মৃত্যু অপেক্ষা লেডাস্মিথের অবরোধমুক্তি আমাদিগকে অধিক আঘাত করিল; বুয়র-বিজয়-লক্ষ্মীকে ইংরেজের অঙ্কশায়িনী করিয়া দিল।

"ক্রঞ্জীর পতন হইতে না হইতেই, বৃটিশ সেনাপতি গটেকার ষ্টরম্বর্গে গিয়া বুয়রবিজয়ে আঘাত করিলেন। এ সংবাদে আমাকে হতবুদ্ধি হইতে হইল। কিন্তু হতবুদ্ধি হইয়া থাকিবার অবসর আমি পাইলাম না। চর-মুখে সংবাদ পাইলাম, বৃটিশ সেনাপতি জেনেরল ব্রাবাণ্ট, প্রভূত সৈন্য লইয়া, অরেঞ্জের দিকে অভিযান করিতেছেন। এই সংবাদ পাইয়া, আমরা কর্ত্তব্য স্থির করিবার জন্য ব্যস্ত রহিয়াছি, এমন সময়ে মহাভয় স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইল। সংবাদ পাইলাম, লর্ড বরার্টস, ৪০৷৫০ হাজার সৈন্য লইয়া, আমাদের অরেঞ্জ রাজ্যের সর্ব্বনাশ করিতে আসিতেছেন; আমাদের রাজধানী বুলুম-ফন্টীনেরই মুণ্ডপাত করিতে আসিতেছেন।

"এখন অরেঞ্জ-অঞ্চলের সমস্ত বুয়র সৈন্যই আমার হস্তে ন্যস্ত হইল। প্রেসিডেণ্ট ষ্টীন স্বয়ং আসিয়া আমাকে ক্রঞ্জীর পদে অভিষিক্ত করিয়া গেলেন। ক্রঞ্জীর পদ পাইলাম, কিন্তু তাঁহার পল্টন পাইলাম না; তাহারা তখন বৃটিশ হস্তে বন্দী। ১৯০০ অব্দের ৭ই মার্চ্চ লর্ড রবার্টস মহাচমূ লইয়া অগ্রসর হইলেন; আমাকেও যথোচিত ব্যবস্থায় মন দিতে হইল। এই সময়েই ট্রান্সভালের প্রেসিডেণ্ট

বৃদ্ধ ক্রুগার

"স্বয়ং আমাদের শিবিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আসিবার সময়ে তাঁহাকে যেরূপ পথক্লেশ সহ্য করিতে হইয়াছিল, যেরূপ বিপত্তিসঙ্কট পোহাইতে হইয়াছিল, তাহা শুনিয়া এবং চিন্তিয়া আমাকে মুগ্ধ হইতে হইল। বৃদ্ধ প্রেসিডেণ্টের স্বদেশভক্তি—স্বজাতিপ্রেম—স্বাধীনতানুরাগ দেখিয়া, আমাকে বিস্ময়বিহ্বল হইতে হইল।

"ক্রুগার আসিয়া আমার সহিত পরামর্শ করিলেন, আমার সমস্ত পরামর্শই তাঁহার গ্রাহ্য হইল। অরেঞ্জ-সেনার কর্ত্তব্যসম্বন্ধে, ক্রুগার ও ষ্টীন, দুই প্রেসি-

ডেণ্টই, আমার মতামত গ্রাহ্য করিলেন। ক্রুগার চলিয়া গেলেন, লর্ড রবার্টসও আসিয়া মডর-নদের তীরে, দশ মাইল জুড়িয়া, সৈন্যসংস্থাপন করিলেন। তাঁহার পঞ্চাশ হাজার পল্টনে মডরভূমি আচ্ছন্ন হইল। আমাকেও স্বল্প সৈন্য লইয়া বাধা বিঘ্নের ব্যবস্থা করিতে হইল; আমিও অন্য তীরে ১২ মাইল স্থানে আমার সৈন্যকে সংস্থাপিত করিলাম। স্বল্পপরিমিত নানা ভাগে বিভক্ত হইয়া, আমার স্বল্প সৈন্য ঐ ১২ মাইল ক্ষেত্রে অবস্থিতি করিতে লাগিল। আমাদিগকে রাজধানী বুলুমফণ্টীনের জন্যই ব্যস্ত থাকিতে হইল। ইত্যবসরে পেক্রসবর্গ বৃটিশ-হস্তে পতিত হইল।

ডিলারে ও দ্বিতীয় বোথা।

"পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমাদের দুই বোথা সেনাপতি-পদে বিরাজ করিতেছিলেন। ট্রান্সভালের প্রধান সেনাপতি লুইস বোথা নেটালের দিকে ছিলেন; জেনারেল ফিলিপ বোথাই মহাবীর ডিলারের সঙ্গে আমাদের বুলুমফণ্টীনের অঞ্চলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের সৈন্য আসিয়াও আমাদের সৈন্য-সংখ্যা কিঞ্চিৎ পুষ্ট করিল। ইহাঁরা ১৮ই মার্চ্চ আমাদের সৈন্যস্থানে উপস্থিত হইলেন; কিন্তু ১৮ই মার্চ্চের মধ্যেই রবার্টসের অসংখ্য সৈন্য আমাদের চারি দিকে নানাবিধ ব্যূহরচনা করিয়া অবস্থিত হইল। বুলুমফণ্টীনের চারি দিকেই যুদ্ধ বিগ্রহ চলিতে লাগিল। এই সময়েই আমাদের বিষম বিপত্তির সূত্রপাত হইল! ইতিপূর্ব্বে ৫ই মার্চ্চ প্রেসিডেণ্ট ক্রুগার ও ষ্টীন যে সন্ধি-প্রস্তাব পাঠাইয়াছিলেন, প্রধানতম বৃটিশ মন্ত্রী

লর্ড সল্সবরি

"তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন; এ সংবাদ আসিয়া আমার কর্ণে প্রবেশ করিল। সংবাদে আমি দুঃখিত হইলাম না। রণক্ষেত্রে প্রথম প্রবেশ করিয়াই, আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, হয় দেশের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিব, না হয় সবংশে বৃটিশ-হস্তে প্রাণ দিব। সন্ধি-প্রস্তাবের প্রথম সর্ত্ত ছিল,

'ট্রান্সভাল ও অরেঞ্জের স্বাধীনতা পূর্ব্ববৎ অক্ষুণ্ণ থাকিবে।'

"যখন এই সর্ত্তই সল্সবরির অগ্রাহ্য, তখন সন্ধি-প্রস্তাব তাঁহার অগ্রাহ্য হইল, শুনিয়া আমি দুঃখিত হইতে যাইব কেন? বরং সংবাদে আমি সন্তুষ্ট হইলাম। ভাবিলাম, সকল বুয়রই এখন স্বাধীনতার জন্য অকাতরে প্রাণ দিবে, সুতরাং বৃটিশের পক্ষে জয়লাভ বড় সহজ হইবে না।

"এইরূপ আশা করিয়া, রাজধানীর রক্ষায় প্রাণপণ করিলাম। কিন্তু অবস্থা দেখিয়া, মনে মনে বুঝিলাম, আমাদের দুই বুয়র রাজ্যই বৃটিশ-হস্তে পড়িবে। আমাদের প্রেসিডেণ্টেরাও ইহা বুঝিলেন। কিন্তু আমরা সকলেই সংকল্প করিলাম, শেষ পর্য্যন্ত দেখিব। 'যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ।' সুতরাং এখন ত কিছুতেই ক্ষান্ত হইব না; আর পরেও যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিব। সমগ্র জগৎকে দেখাইব, কয়েক জন বুয়র মহাবল বৃটিশের সহিত কিরূপ যুদ্ধ করিল, মুষ্টিমেয় বুয়রজাতি স্বাধীনতার জন্য কি কাণ্ড করিল! ইউরোপ আমরিকার সকলকে দেখাইবার জন্য, এ রহস্য সকলকে জানাইবার জন্য, ফিশার, ওয়েসেল্‌স এবং উলম্যান্‌স এই সময়েই

ইউরোপ-যাত্রা

"করিলেন। যাঁহারা বলেন, ইউরোপের সাহায্য পাইবার জন্যই আমাদের প্রতিনিধিপুঙ্গবেরা ইউরোপ-যাত্রা করিলেন, তাঁহারা প্রকৃতের অপলাপ করেন। সাহায্য যে কাহারই কাছে পাইব না, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলাম। আমি ত পরকীয় সাহায্যের আশা এক দিনও করি নাই। ইউরোপ, আমেরিকার সহানুভূতি পাইবার আশা করিয়াছিলাম; সহানুভূতি পাইয়াছি; সমগ্র জগতের সহানুভূতি পাইয়াছি। সাহায্যের আশা করি নাই, সাহায্য পাই নাই।

"এ দিকে আমি বুলুমফণ্টীনের রক্ষার্থ নানারূপ আয়োজন করিলাম; আয়োজনে তাদৃশ ত্রুটিও হইল না। কিন্তু আমাদের অন্যতম সেনানী উইলব্যাকের জন্যই সব পণ্ড হইল। তিনি অতিভয়ে আক্রান্ত হইয়া, বুয়রবিগর্হিত আতঙ্কে অভিভূত হইয়া, বিনা যুদ্ধে পলায়ন করিলেন। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সৈন্যবৃন্দও পলাইয়া গেল। আমাদের পল্‌টন-প্রাচীর ভাঙ্গিয়া গেল; বৃটিশ চমূরও বুলুমফণ্টীন-প্রবেশ সুসাধ্য হইল। আমাদিগকে দুস্তর দুঃখসাগরে ডুবাইয়া, বৃটিশ চমূ, বিনা যুদ্ধে, বুলুমফণ্টীনে প্রবেশ করিল। এইরূপেই স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমি, আমার প্রাণাধিকা রাজধানীর সহিত, বৃটিশহস্তে পতিত হইলেন! বুলুমফণ্টীন বৃটিশ-হস্তে পড়িল, আমাদের প্রেসিডেণ্টও, পাত্রমিত্র ও কাগজপত্রাদি লইয়া, ক্রুনষ্টাটে গিয়া, রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ঐখানেই ক্রুগার, ষ্টীন, ডিলারে, ফিলিপ বোথা প্রভৃতি সকলেই বসিয়া ভবিষ্যৎ পথ স্থির করিবার জন্য পরামর্শ করিলেন। সকলেই

'যুদ্ধে যে পরাজয় হইবে, তাহা নিশ্চিত; কিন্তু স্বাধীনতার জন্য আমাদের সকলকেই প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিতে হইবে।' এ পণ আমার পক্ষে পুরাতন। যাহাই হউক, আমার অরেঞ্জ যখন ইংরেজ-হস্তে পড়িল, আমিও তখন ইংরেজের কেপ-রাজ্যে অভিযান করিবার জন্য দৃঢ়সংকল্প হইলাম।

তৃতীয় পর্ব্ব।

প্রাণপণ।

"যুদ্ধে আমি একান্তই প্রাণপণ করিলাম। সুতরাং ইংরেজ-সেনার বিষম সংখ্যাধিক্য দেখিয়াও, আর ভীত হইলাম না। 'সানা-পোষ্ট' নামক স্থানে, আমি ৩৫০টি সৈন্য লইয়া, বৃটিশ সেনাপতি জেনেরল ব্রডউডের ২০০০ সৈন্যকে আক্রমণ করিলাম। যুদ্ধে আমার জয় হইল; আমার ৩টি সৈন্য নষ্ট হইল, ব্রডউডের ৩৫০ হতাহত এবং ৪৮০ বন্দী হইল; তাঁহার ৭টা কামান এবং ১১৭ গাড়া রসদপত্রাদি আমার হস্তগত হইল। ৪ঠা এপ্রেল 'রেডভার্সক্রুপে' যুদ্ধ হইল; সেখানে বুয়র সেনাপতি জেনেরল ডিভিলীয়ার্স, জেনেরল ফ্লোনম্যান প্রভৃতি আমার সহযোগিতা করিলেন। আমাদের ৫।৬ শত সৈন্য এই যুদ্ধে প্রাণ দিবার জন্য প্রস্তুত হইল; কিন্তু আমাদেরই ভাগ্য প্রসন্ন হইল; প্রথম আক্রমণের পরই বৃটিশ সৈন্য

শ্বেত পতাকা

"দেখাইয়া, আমাদিগকে যুদ্ধে ক্ষান্ত হইতে ইঙ্গিত করিল। শত্রু-পক্ষের শ্বেত পতাকা দেখিলেই, যুদ্ধে ক্ষান্ত হইতে হয়, এ নিয়ম সর্ব্বত্র সর্ব্ববাদিসম্মত। ইউরোপের সার্ব্বদেশিক সমরশাস্ত্রবিশারদেরাই, সভায় বসিয়া, অন্যান্য নিয়মের ন্যায় এই নিয়ম বাহাল করিয়াছেন; এ নিয়ম সকলেরই শিরোধার্য্য হইয়া আসিতেছে। সুতরাং আমরা, যুদ্ধে ক্ষান্ত হইয়া, শান্তভাবে বৃটিশ সৈন্যের দিকে অগ্রসর হইলাম। কিন্তু তৎক্ষণাৎ বৃটিশ সৈন্য হইতে গুলিবৃষ্টি আসিয়া, আমাদিগকে বিব্রত করিল; আমাদের সেনাপতি পেলিসকে প্রাণ দিতে হয়। বৃটিশ পক্ষের এই 'শঠতা' দেখিয়া, আমাদের সমস্ত বুয়র সৈন্যই ক্ষেপিয়া উঠিল; তাহারা দশগুণ সাহসে যুদ্ধ করিতে লাগিল। বৃটিশ পক্ষেরই পরাজয় হইল, বৃটিশ সেনার সেনাপতি হত হইলেন, শতাধিক সৈন্যও হতাহত হইল। আমাদের পক্ষে কেবল ঐ সেনাপতি পেলিসই হত হইলেন, আর ৬ জন মাত্র

সৈন্য আহত হইল। ইংরেজ পক্ষের ৪৭০ জনকে আমাদের হস্তে বন্দী হইতে হইল। দেখিলাম, ইহাদের অধিকাংশই 'রয়াল আইরিষ রাইফল' দলের সৈনিক।

সৈন্যবৃদ্ধি।

"লর্ড রবার্টস যত বুয়রকে অভয় দিয়া বলিয়াছিলেন, 'যে সকল বুয়র, যুদ্ধে বিরত হইয়া, শান্তভাবে স্বগৃহে অবস্থিতি করিবে, তাহাদিগকে আমার সৈনিক সেনানীরা স্পর্শও করিবে না।' এই অভয়-বাক্যে নির্ভর করিয়া, অনেক বুয়রই, যুদ্ধে বিরত হইয়া, স্ব স্ব গৃহে অবস্থিতি করিতেছিল। কিন্তু বৃটিশ সৈনিক সেনানীরা প্রধান সেনাপতির প্রতিজ্ঞায় আঘাত করিতে লাগিলেন; অনেক বুয়রই স্বগৃহে ধৃত ও বন্দীভূত হইয়া বৃটিশ কারাগরে নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। ইংরেজ পক্ষের এই ব্যবহারে যত বুয়র আবার উত্তেজিত হইল, সকলেই যুদ্ধে প্রাণ দিবার জন্য ছুটিয়া আসিতে লাগিল। আমিও, আনন্দিত হইয়া, প্রেসিডেন্ট ষ্টীনকে লিখিলাম, 'লর্ড রবার্টসের কল্যাণে আমাদের সৈন্য-বৃদ্ধি হইতেছে। প্রকারান্তরে লর্ড রবার্টসই আমাদের সৈন্যসংগ্রাহক হইয়া দাঁড়াইয়াছেন।'

"এইরূপে কিঞ্চিৎ বর্দ্ধিতবল হইয়া, আমরা সেনাপতি কর্ণেল ড্যালগেটি এবং জেনেরল ব্রাবাণ্টকে সসৈন্যে অবরুদ্ধ করিয়া ফেলিলাম। কিন্তু ১৬ দিন অবরুদ্ধ থাকিবার পর তাঁহারা মুক্তি-লাভ করিলেন। ইত্যবসরে অরেঞ্জ রাজ্য বৃটিশ সৈন্যে একেবারেই আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। যুদ্ধারম্ভের কিছু কাল পরে ট্রান্সভালের সৈন্য নেটালের দিকে ছিল, অরেঞ্জের সৈন্য অরেঞ্জের দিকে আসিয়াছিল; ইহা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি। এখন দুই রাজ্যের দুই সৈন্যকে প্রকৃত-প্রস্তাবেই দুই ভাগে বিভক্ত হইতে হইল। উভয় রাজ্যের সৈন্য ভাগ হইল, কিন্তু উভয় রাজ্যে সদ্ভাবের ব্যতিক্রম হইল না। ব্যতিক্রমের যে একটা গুজব উঠিয়াছিল, তাহা একান্তই অমূলক। অভিযান আক্রমণে সুবিধা হইবে বলিয়াই, আমরা একমত হইয়া, এইরূপে সৈন্য-স্বাতন্ত্র্যের ব্যবস্থা করিলাম। সিদ্ধান্ত হইল, ট্রান্সভাল-সেনা বৃটিশ চমূর সম্মুখে থাকিবে; অরেঞ্জ-সেনা বৃটিশ সেনার পশ্চাতে থাকিবে; দুই সেনা দুই দিকে থাকিয়া আক্রমণ করিবে। এইখানে একবার বুয়র সৈন্যের সংখ্যা-রহস্যটা সকলের দেখা উচিত।

যুদ্ধে আমাদের কিঞ্চিৎ সৈন্যক্ষয় হইয়াছিল বটে; কিন্তু ক্রঞ্জীর পতনেই সৈন্যসংখ্যা একেবারে কমিয়া গিয়াছিল। যাহারা তাঁহার সহিত বন্দী হইয়াছিল, তাহাদের সংখ্যা নিতান্ত কম নহে। আর ক্রঞ্জীর পতন দেখিয়া, যাহারা একেবারে যুদ্ধে বিরত হইয়াছিল, কিছুতেই উত্তেজিত হয় নাই—কিছুতেই আর যুদ্ধক্ষেত্রে আসে নাই, তাহাদের সংখ্যাও নিতান্ত কম নহে। সুতরাং মে মাসের হিসাবে দেখিলাম,

আমাদের আছে ১৫ হাজার,

"আর ইংরেজের হইয়াছে ২ লক্ষ ৪০ হাজার। তথাপি যুদ্ধে ক্ষান্ত হইলাম না, তথাপি পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা করিলাম না। প্রাণের মায়া আমার কোন কালেই ছিল না। এ সময়ে ত সে মায়া একেবারেই মন হইতে কোথায় চলিয়া গেল! অদৃষ্টে যাহা আছে, ঘটিবে; যতক্ষণ বাঁচিব, ততক্ষণ যুদ্ধ করিব, স্বদেশের ও স্বজাতির স্বাধীনতাকে যত দিন পারি টানিয়া রাখিব; এই সংকল্পই আমার হৃদয়ে একান্ত প্রবল হইয়া উঠিল।

"মের শেষে 'রুডওয়াল' নামক স্থানে এক পল্টন ইংরেজ সৈন্য আমার সম্মুখে পড়িল; যুদ্ধেও বিলম্ব ঘটিল না; এবারও আমার জয় হইল। ইংরেজ পক্ষের ১৫০ জন হতাহত হইল, ৫০০ বৃটিশ সৈন্য আত্মসমর্পণ করিয়া বন্দী হইল। পল্টনের সহিত প্রভূত রসদপত্র ছিল, নানারূপ বহুমূল্য দ্রব্য সামগ্রী ছিল; ১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকার দ্রব্যজাত আমাদের হস্তগত হইল। হইল বটে, কিন্তু আমরা তখন বিব্রত; কাজেই অনেক জিনিসপত্র আমাদিগকে নষ্ট করিয়া ফেলিতে হইল। বন্দী বৃটিশ সৈনিকেরাও যত দূর পারিল, লুটিয়া পুটিয়া আপনাদের সঙ্গে রাখিল।

"কিন্তু এরূপ যুদ্ধে, এরূপ জয়ে—আমরা আমাদের অপ্রসন্ন ভাগ্যকে প্রসন্ন করিতে পারিলাম না। রবার্টসের মহাচমূ ক্রমে ক্রমে আমাদের সমগ্র অরেঞ্জই হস্তগত ও পদদলিত করিতে লাগিল। মে মাসের শেষদিবসে—সেই ভয়ঙ্কর অশুভ দিনে—ত্রান্সভালেরও সর্ব্বনাশ হইল।

জোহানেসবর্গ

"বৃটিশহস্তে নিপতিত হইল, সঙ্গে সঙ্গে বুয়র-হৃদয়ও বিদীর্ণ হইয়া গেল। ৫ই জুলাই, ত্রান্সভালের রাজধানী প্রিতোরীয়াও বৃটিশ সৈন্যের পদদলিত

আমাদের 'মহাবীরচরিতের' পূর্ব্বভাগও এইখানে তিন পর্ব্বে—সমাপ্ত হইল।

মহাবীরচরিতের উত্তরভাগ।

সামান্য সৈনিক ডিওয়েট কিরূপে সহসা সেনাপতি হইলেন; সেনাপতি ডিওয়েট কিরূপে হঠাৎ প্রধান সেনাপতি হইলেন; কিরূপে তিনি প্রথম হইতেই শৌর্য্য সাহসের ন্যায় সমরকৌশলেরও পরিচয় দিতে লাগিলেন; অত্যল্প দিবসের মধ্যেই তিনি কিরূপে সমরকৌশলের পরাকাষ্ঠা দেখাইলেন; অজ্ঞাত-চরিত অপ্রথিতনামা ডিওয়েট কিরূপে অতিস্বল্প দিবসেই জগদ্বিখ্যাত হইয়া উঠিলেন; কিরূপে তিনি মহাবল বৃটিশকেও হতবল করিয়া ফেলিলেন; কিন্তু শেষে জেনেরল ক্রঞ্জার দোষে কিরূপে বুয়র-ভাগ্য চিরদিনের তরে অপ্রসন্ন হইল; তথাপি জন্মভূমিগতপ্রাণ, স্বাধীনতার অদ্বিতীয় উপাসক ডিওয়েট কিরূপে স্বাধীনতারক্ষার চেষ্টা করিলেন; এরূপ অবস্থায়ও তিনি কিরূপে নানা যুদ্ধে কৃতকার্য্যও হইতে লাগিলেন; মহাবীরচরিতের পূর্ব্বভাগেই তাহা সকলে দেখিতে পাইলেন। পূর্ব্বভাগেই ডিওয়েটের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া গেল; পূর্ব্বভাগের তিন পর্ব্বেই তাঁহার বীরজীবনের প্রথম তিন কাল পাঠকের হৃদয়ঙ্গম হইল। উত্তরভাগে অধিক কথা কহিব না, এ ভাগে ডিওয়েট জগদ্বিখ্যাত মহাবীর। কিন্তু বুয়র-ভাগ্য এই ভাগেই দগ্ধ হইয়া গেল। মহাবীর ডিওয়েট এ ভাগে নিজের সৈনাপত্য-কৌশলে ও অসীম অদৃষ্টপূর্ব্ব সাহসে জগৎকে বিস্ময়বিহ্বল করিলেন বটে, কিন্তু শেষরক্ষা করিতে পারিলেন না। উত্তরভাগেই বীরচরিতের উপসংহার হইল। ডিওয়েটের নিজের বিশ্বাস, এ ভাগেই তাঁহার বীর-জীবনের উপসংহার হইলেও ক্ষতি ছিল না। তাঁহার পক্ষে বীর-জীবনের উপসংহার অপেক্ষা বীরচরিতের—বীরকীর্ত্তির—বীরলীলার—উপসংহারই অধিকতর শোচনীয়।

এ শোচনীয় কালের কথা আমরাও অধিক করিয়া কহিব না; যে অভিনয় এখন জগৎশুদ্ধ লোকের নেত্রপথে ও হৃদয়পটে জাজ্জল্যমান হইয়া বিরাজ করিতেছে, সে অভিনয়ের আমরা পুনরাবৃত্তি করিব না। ডিওয়েটের প্রথম বীর-জীবন পাঠকের পরিচিত করাই আমাদের উদ্দেশ্য। সে উদ্দেশ্য সাঙ্গ হইল; কিন্তু সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল কি না, তাহা পাঠকের বিবেচ্য।

কিচেনারের দৈব।

উত্তরভাগের প্রথম ও প্রধান ঘটনা, লর্ড কিচেনারের দৈব রক্ষা। তিনি যে ট্রেণে যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে যাত্রা করিতেছিলেন, সে ট্রেণ বুয়র-সেনার হস্তে পতিত হইয়াছিল। কিন্তু বুয়র-সেনার কেহই জানিত না যে, ট্রেণে লর্ড কিচেনার রহিয়াছেন; এই জন্যই তিনি এ বিপদেও রক্ষা পাইলেন। যখন কিচেনার ট্রেণ ছাড়িয়া অশ্ব-পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া প্রস্থান করিলেন, তখন বুয়র সৈন্য জানিতে পারিল, ঐ কিচেনার পলাইয়া গেলেন। মহাবীর কিচেনারের এরূপ উদ্ধার-বার্ত্তায় মহাবীর ডিওয়েট দুঃখিত হইলেন না, বরং আনন্দিতই হইলেন; বীরমর্য্যাদা বীরেরই হৃদয়ঙ্গম হইয়া থাকে।

উত্তরভাগের দ্বিতীয় প্রধান ঘটনা বুয়রসেনাপতি প্রিন্সলুর বৃটিশ-হস্তে আত্ম-সমর্পণ। প্রিন্সলুর হাতে সৈনাপত্যের ভার পড়ে, ইহা ডিওয়েটের আদৌ অনুমোদিত ছিল না। প্রিন্সলুকে প্রধানতা দিতে তিনি নিষেধই করিয়াছিলেন। আর প্রিন্সলু নিজেই সহস্র সেনার উপর কর্ত্তৃত্ব চালাইতেছেন দেখিয়া, স্বদেশহিত-ন্যস্তজীবন ডিওয়েট একান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ঘোর প্রতিবাদও করিয়াছিলেন। তিনি বুঝাইয়াছিলেন, প্রিন্সলু প্রধানত্ব করিবার উপযুক্ত নহেন; তাঁহার হস্তে প্রাধান্য থাকিলেই, বিভ্রাট ঘটিবে। সেই বিভ্রাট ঘটিল; প্রিন্সলু আত্মসমর্পণ করিয়া, দুর্ব্বল বুয়রকে আরও দুর্ব্বল করিয়া দিলেন।

উত্তরভাগের তৃতীয় ঘটনা

ডিওয়েটের ট্রান্সভাল যাত্রা। অরেঞ্জ প্রদেশে প্রতিকূলতারও সুযোগ রহিল না; রাজ্যের জ্ঞাত অজ্ঞাত সমস্ত অংশই বৃটিশ সৈন্যপ্রবাহে প্লাবিত হইল। ডিওয়েটকে বন্দী করিবার জন্যই সমস্ত বৃটিশ সেনাপতি প্রাণ পণ করিলেন। তাঁহারা আট-ঘাট বাঁধিয়া কাজ করিতে লাগিলেন। সকলেই মনে করিলেন, এইবার কিস্তী দিব, আর ডিওয়েটকে মাত করিব। কিন্তু ডিওয়েট মাত হইলেন না। তিনি বৃটিশ সেনাকে ঘোড়ার চালে ঘুরাইয়া, নিজে ট্রান্সভালের দিকে যাত্রা করিলেন।

কিন্তু জন্মভূমি অরেঞ্জের জন্য তাঁহার স্বদেশহিতৈষী প্রাণ দিবারাত্র কাঁদিতে লাগিল। তিনি ট্রান্সভালের ও দিকে তিষ্ঠিতে পারিলেন না। পথে তত বিপত্তি সঙ্কট সত্ত্বেও আবার অরেঞ্জ-রাজ্যে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। কিন্তু আর তিনি কিছুতেই অরেঞ্জের দগ্ধ ভাগ্য শীতল করিতে পারিলেন না।

নানারূপ বিচিত্র বীরোচিত কার্য্য দেখাইয়া, ডিওয়েট বিস্মিত বুয়রসমাজকে অতি বিস্মিত করিলেন; মিত্রের ন্যায় শত্রুরও প্রশংসা-ভাজন হইলেন; স্বদেশের পুনরুদ্ধারে কিন্তু তিনি আর কিছুতেই কৃতকার্য্য হইলেন না। আমরাও এ সকল অধ্যায় বিনাস্পর্শে ছাড়িয়া দিলাম।

স্বদেশের উদ্ধারে হতাশ হইয়া, ডিওয়েট দক্ষিণবাহী হইলেন। মনে করিলেন, "ইংরেজের কেপরাজ্যে গিয়া, তত্রত্য বুয়রবংশজদিগের সাহায্যে, ইংরেজের রাজ্যেই ইংরেজকে বিপন্ন করিব। তাহা হইলে, ইংরেজসেনা স্বরাজ্যরক্ষায় বিব্রত হইবে। আমিও সেই অবসরে স্বদেশের উদ্ধার-কল্পে একবার প্রাণপণে চেষ্টা করিব; একবার অসাধ্যসাধনের প্রয়াস পাইব।"

দক্ষিণবাহী হইয়া, ডিওয়েট কিঞ্চিৎ সৈন্য সামন্ত লইয়া, কেপরাজ্যে প্রবেশ করিলেন, একবার অকৃতকার্য্য হইয়া আবার প্রবেশ করিলেন। দিন কতক জয়লক্ষ্মীও তাঁহার অনুকূলা হইলেন। দিনকতক সমগ্র কেপরাজ্য কম্পিত-কলেবর হইল, কেপের কম্পে দিন কতক বিলাতকে পর্য্যন্ত কাঁপিতে হইল, দিন কতক চারি দিকেই "গেল গেল" শব্দ উঠিতে লাগিল। কিন্তু পাতার আগুন নিবিয়া গেল! ডিওয়েট কেপে গিয়া কার্য্যতঃ কিছুই করিতে পারিলেন না; তাঁহার পক্ষে কেবল অসীম শৌর্য্য সাহস এবং রণকৌশলের পরিচয় দেওয়াই সার হইল। শেষে তাঁহাকে মহতী বৃটিশ চমূর বিরাট সৈনিক প্রাচীরে পরিবেষ্টিত হইতে হইল। কিন্তু এ সব ঘটনা এখনও সকল নেত্রে বিরাজ করিতেছে, মহাবীর-চরিতের সমগ্র উত্তরভাগই সকলের চিত্তপটে চক্ চক্ করিতেছে। সুতরাং আমাদিগের পক্ষে এ সকল কথার পুনরুক্তি করা আবশ্যক নহে। কেবল একটা ঘটনার কথা একটু বিশেষ করিয়া কহিব। যত বৃটিশ মহারথীকে বঞ্চিত করিয়া, বড় বড় বৃটিশ সেনাপতির চক্ষেও ধূলিপ্রক্ষেপ করিয়া, ৬০ হাজার বৃটিশ পল্টনের প্রাচীর পার হইয়া, অরেঞ্জের অভিমন্যু অপূর্ব্বকর্ম্মা ডিওয়েট কিরূপে সমগ্র জগৎকে বিস্মিত এবং সমগ্র বৃটিশ জাতিকে হতবুদ্ধি করিলেন, তাহাই পাঠককে দুই কথায় দেখাইয়া দিব। ডিওয়েটের সেই বিচিত্র ব্যূহভেদের কথা ডিওয়েটের মুখেই পাঠককে শোনাইয়া দিব।

বিচিত্র ব্যূহভেদেই

আমার বিচিত্র মহাবীরচরিতেরও উপসংহার করিব। ব্যূহভেদের পূর্ব্বেও

করিতে হইয়াছিল। নানা স্থানে কিন্তু বুয়রপক্ষের জয় হইয়াছিল। বুয়র-সেনাপতি মেজ, বেষ্টার, শীপার্স এবং মীয়ার্স সর্ব্বদাই ডিওয়েটের সঙ্গে থাকিতেন। ডিওয়েটকে সৈন্য সেনানী লইয়া, নানা স্থান দিয়া, নানাবিধ গুপ্ত ব্যক্ত পথের অনুসরণ করিয়া, ষষ্টিসহস্রপরিমিত বৃটিশ সৈন্য-ব্যূহের বেষ্টনী হইতে পরিত্রাণ পাইবার উপায় করিতে হইয়াছিল। তিনি নিজে বলিতেছেন, "১৯০২ অব্দের ফেব্রুয়ারী মাসটা আমাকে ক্রমাগত বৃটিশ বটিকা ও অশ্বাদির আক্রমণ সহ্য করিতে হইয়াছিল। মাতের পূর্ব্বে দাবার রাজাকে যেরূপ ঘুরিয়া ফিরিয়া কিস্তী সামলাইতে হয়, আমাকেও সেইরূপ ক্রমাগত কিস্তী সামলাইতে হইয়াছিল। কিন্তু কিস্তী আমি যদিও শেষে বেশ সামলাইয়াছিলাম, তথাপি আমাকে ক্রমাগত কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। কষ্টের প্রধান কারণ, আমাদের পল্টন শিশু ও বালকে পূর্ণ হইয়াছিল। ছয়, সাত, নয়, দশ, একাদশ, দ্বাদশ বৎসরের বালক আমাদের পল্টনে অনেক যুটিয়াছিল। গুণবান্ বৃটিশ বীরপুরুষেরা যত বুয়রজননীর ক্রোড় হইতেই সন্তান কাড়িয়া লইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। পাঁচ সাত বৎসরের শিশুদিগকেও মাতৃক্রোড়চ্যুত হইতে হইয়াছিল। বৃটিশ কারাগারে বন্দী হইয়া থাকা অপেক্ষা আমাদের পল্টনে যুটিয়া ঘুরিয়া বেড়ান শ্রেয়ঃ। এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াই আমরা যত বুয়র শিশু ও বুয়র বালককে পল্টনে আশ্রয় দিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। অনেক বৃদ্ধকেও আমাদের পল্টনে আশ্রয় লইতে হইয়াছিল। এই জন্যই পথে আমাদিগকে বড় অসুবিধা-ভোগ করিতে হইয়াছিল। মধ্যে মধ্যে বৃটিশ গুলির আঘাতে দুই পাঁচটি শিশু বালককে আহত হইতে হইয়াছিল, কখনও কখনও কোন কোন বালক বা শিশুকে প্রাণও দিতে হইয়াছিল।"

এইরূপে তৎকালীন অবস্থার আভাস দিয়া, বৃটিশ বীরদিগের উপর নিষ্ঠুরতার আরোপ করিয়া, রমণীনির্ব্বাসনের ন্যায় শিশুনির্ব্বাসনের অপরাধও বৃটিশ মস্তকে চাপাইয়া দিয়া, ডিওয়েট ১৯০২ অব্দের ২১এ ফেব্রুয়ারি দিবসে উপস্থিত হইয়াছেন। ঐ দিবসে পুনরারম্ভ করিয়া তিনি বলিতেছেন, "২১এ ফেব্রুয়ারী দেখিলাম, আমরা বৃটিশ চমূর বিরাট চক্রব্যূহে অবরুদ্ধ হইয়াছি।

চক্রব্যূহের

• • •

এক অর্দ্ধচক্র—অর্থাৎ সম্মুখ চক্রার্দ্ধ—বেথেলহেম হইতে লিণ্ডলি পর্য্যন্ত বিস্তৃত, অপর অর্দ্ধচক্র—অর্থাৎ পশ্চাৎ চক্রার্দ্ধ—ফ্রাঙ্কফোর্ট হইতে ব্রীদ পর্য্যন্ত

প্রস্তুত। এই চক্র ক্রমেই সংকুচিত হইয়া, আমাদিগকে গ্রাস করিবার উপক্রম করিতে লাগিল। ২২এ ফেব্রুয়ারী সেনাপতি দ্বিতীয় বোথা আসিয়া আমার সহিত যোগ দিলেন। অন্যান্য সেনাপতিরাও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মোটে সসৈন্যে আমরা হইলাম ২ হাজার। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বৃদ্ধ ও বালকের সংখ্যা কম ছিল না। আমাদের প্রেসিডেণ্ট ষ্টীন ও তাঁহার মন্ত্রী ও পাত্র মিত্রাদি সকলেই আমার আশ্রয়ে ছিলেন। আমি দেখিলাম, যদি বৃটিশ সৈন্যচক্র আমাদিগকে চাপিয়া ধরে, তাহা হইলে, আমাদিগকে বন্দী হইতে হইবে; আমার ন্যায় আমার প্রেসিডেণ্ট ও তাঁহার সহযোগীদিগকেও বন্দী হইতে হইবে। এই জন্যই আমাকে অধিক উদ্বিগ্ন হইতে হইল, কিন্তু এই উদ্বেগের জন্যই আমাকে ব্যূহভেদের জন্য প্রাণপণ করিতে হইল।

দেখিলাম, চক্রের সমস্ত পরিধি-ভাগই বৃটিশ সৈন্যে পূর্ণ; সকল সৈন্যই যুদ্ধার্থ প্রস্তুত। কিন্তু বুঝিলাম, এক স্থানে আমাকে ব্যূহ-ভেদ করিতেই হইবে। সুতরাং আর ইতস্ততঃ না করিয়া আমি প্রস্তুত হইলাম। আমার পল্টনে যে কয়েক জন অশ্বসাদী ছিল, তাহাদিগকে অগ্রে দিলাম। অষ্টাশ্বতর-বাহিত আমার সর্ব্বপরিচিত ১৫ মাসের সহগামী গাড়ীখানি অশ্বসাদীদিগের পশ্চাতে রাখিলাম। মধ্যস্থলে বৃদ্ধ ও বালকদিগের শকটগুলি রাখিয়া দিলাম। পশ্চাতে—বাছা বাছা—মৃত্যুভয়রহিত—বুদ্ধিমান সৈনানী ও সৈনিক-দিগকে স্থাপিত করিলাম। আমার পুত্র আইজাক এবং কূটী ও আমাদের সঙ্গে রহিল। আমি অভিযানের আদেশ করিলাম। চক্রের যে স্থান বিদীর্ণ করিয়া যাইব বলিয়া স্থির করিয়াছিলাম, নিকটে গিয়া দেখিলাম, সে স্থান ঘন নিবিড় বৃটিশ সৈন্যপ্রাচীরে সুরক্ষিত। কিন্তু আর আমি ইতস্ততঃ করিলাম না। এই স্থানে—বৃটিশ সেনাপতি রিমিংষ্টোনের রেজিমেণ্টকে ভেদ করিয়া, আমরা চক্র হইতে বহির্গত হইলাম। প্রেসিডেণ্ট ষ্টীন ও তাঁহার সহযোগীরাও আমার সহিত নিঃসৃত হইয়া পড়িলেন। বৃদ্ধ বালকেরাও উত্তীর্ণ হইল। অন্যান্য সেনাপতিরাও, স্ব স্ব সৈন্য লইয়া, আমার অনুসরণ করিলেন। কিন্তু আমাদের কোন কোন সেনানীকে সৈন্য সহ ব্যূহ-মধ্যেই থাকিতে হইল। যাঁহারা আমার মত ব্যূহ-ভেদ করিতে পারিলেন না, তাঁহাদিগকে অগত্যা বন্দী হইতে হইল।

ব্যূহ-ভেদে আমাদিগকে বিলক্ষণ কষ্ট পাইতে হইল। ব্যূহস্থ বৃটিশ

সময়ে একটি ত্রয়োদশবর্ষীয় বালককে বৃটিশ সৈনিকের গুলিতে প্রাণ দিতে হইল। চক্রব্যূহের যে স্থানে আমরা এইরূপে ব্যূহ-ভেদ করিলাম, সেই স্থানটি আমাদের মানচিত্রে "বেবেরীয়া" বলিয়া পরিচিত। বেবেরীয়া বুয়র মানচিত্রে চির-পরিচিত হইয়া রহিল। ১৯০২ খৃষ্টাব্দের ২৭এ ফেব্রুয়ারি আমরা এইরূপে বিরাট বিস্তৃত বৃটিশ সৈন্যচক্রের ভেদ করিলাম; ভেদ উপলক্ষে ভীষণ যুদ্ধ করিতেও বাধ্য হইলাম। ২১ বৎসর পূর্ব্বে "মাজুবা" পাহাড়ে বুয়রদিগকে এইরূপে যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। সে যুদ্ধে বুয়র জাতির জয় হইয়াছিল, এ ব্যূহভেদের যুদ্ধেও আমাদের জয় হইল। কিন্তু সেবার যাহা হয় নাই, এবার তাহা হইল; আমাদের স্বাধীনতা এবার লুপ্ত হইয়াই রহিল।"

পরিশিষ্ট।

এই চক্রব্যূহভেদের সংবাদ অবিলম্বেই সর্ব্ব জগতে প্রচারিত হইয়া পড়িল। ডিওয়েটের এই অসাধ্যসাধন-ব্যাপার দেখিয়া, সমগ্র জগৎ বিস্ময়ে অভিভূত হইল। সর্ব্বত্রই ডিওয়েট ধন্য ধন্য হইলেন। সর্ব্বত্রই ডিওয়েট বর্ত্তমানযুগের অদ্বিতীয় মহাবীর বলিয়া স্বীকৃত এবং ঘোষিত হইলেন; ইংলণ্ডেও ডিওয়েটের প্রশংসাবাদ হইতে লাগিল। সমরশাস্ত্রপারদর্শী নিরপেক্ষ মহাপুরুষেরা স্পষ্টাক্ষরে বলিতে লাগিলেন, "রোমকযুদ্ধে কার্থেজের মহাবীর হেনিবল যাহা করিয়াছিলেন, এ যুদ্ধে মহাবীর ডিওয়েটও তাহা করিলেন। হেনিবল যেরূপ চক্র-ব্যূহের ভেদ করিয়াছিলেন, ডিওয়েটও সেইরূপ চক্রব্যূহের ভেদ করিলেন।"

অনেকের বিশ্বাস, ডিওয়েট যেরূপ স্বল্পমাত্র সৈন্য লইয়া যেরূপ ষষ্টি সহস্র সৈন্যের চক্রব্যূহ বিদীর্ণ করিলেন, হেনিবল এরূপ স্বল্পসৈন্য লইয়া এরূপ ঘননিবিড় চক্রব্যূহ বিদীর্ণ করেন নাই। আর তখন চক্রব্যূহ বাণ ও বর্ষার জন্য দুর্ভেদ্য ছিল, এখন চক্রব্যূহ বন্দুকের গুলি-বর্ষণে দুর্ভেদ্য। দুই ব্যূহে প্রভেদ অনেক। এই প্রভেদ দেখিয়াই অনেকে ডিওয়েটকে হেনিবল অপেক্ষাও উচ্চ বীরাসনে বসাইতে চাহেন।

ব্যূহভেদের সঙ্গে সঙ্গেই বিচিত্র বুয়র-যুদ্ধেরও কার্য্যতঃ উপসংহার হইল। ডিওয়েট প্রেসিডেণ্ট ষ্টীনকে লইয়া ত্রান্সভাল-যাত্রা করিলেন। সেখানে সেনাপতি, দলপতি, প্রেসিডেণ্ট ও সচিবগণের বৈঠক বসিল। বৈঠকে নানারূপ পরামর্শ হইল। আবার সন্ধির প্রস্তাব স্থির হইল, আবার প্রস্তাব

যাহা হইল, তাহা সকলেরই স্মৃতিপটে বিরাজমান। প্রেসিডেন্টদিগের ইউরোপ যাত্রা, বৃটিশ পক্ষের নির্ব্বন্ধরক্ষা, বুয়রদিগের আত্মসমর্পণ প্রভৃতি ঘটনা এ প্রবন্ধের আলোচ্য নহে।

মহাবীরচরিতে মহাবীরের আসন।

মহাবীর বুয়রযুদ্ধে অনেক দেখা গেল। বোথা, ডিলারে, ক্রঞ্জী, ক্রিৎজিঙ্গার প্রভৃতি অনেক মহাবীরকেই দেখিতে পাইলাম। উচ্চ আসন এবং উত্তম আসন সকলের জন্যই পার্থিব সমাজ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। স্বাধীনতার পবিত্র যুদ্ধে যাঁহারা প্রাণ দিয়াছেন, তাঁহারা চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। যাঁহারা প্রাণপণ করিয়াও এখনও জীবিত আছেন, তাঁহারাও চিরস্মরণীয় মধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন। এখনও সকল মহাবীরই স্বদেশহিতের জন্য বদ্ধ-পরিকর। কিন্তু এখন আর যুদ্ধ বিগ্রহে—নরহত্যা শোণিতপাতে—বুয়র-জাতির ও বুয়রদেশের হিতসাধন হইবে না; অদৃষ্টের আদেশে সকলকেই বৃটিশরাজের বশ্যতা মাথায় লইতে হইয়াছে। সকলকেই বৃটিশরাজের প্রজামধ্যে পরিগণিত হইতে হইয়াছে। বুয়র মহাবীরেরাও এখন বৃটিশরাজের অনুগত আশ্রিত হইয়া স্বদেশের ও স্বজাতির হিতে—লুপ্ত সুখের পুনরুদ্ধারে—ভুক্ত দুঃখের তিরোধানে—মনঃপ্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন।

বুয়র পক্ষে মহাবীর সকলেই, উত্তম মহাবীরও সকলেই, তুলনায় শ্রেষ্ঠতা স্থির করা দুঃসাধ্য। যেমন লুই বোথা, তেমনই ডিলারে, যেমন পীট বোথা, তেমনই তোমার কৃৎজীঙ্গার! শ্রেষ্ঠতা সকলেরই দেখিতে পাওয়া যায়, অসাধ্য-সাধনও অনেকেই করিয়াছেন। কিন্তু সমগ্র জগৎ

ডিওয়েটকেই

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন দিয়াছেন। ডিওয়েট নিজে বলিয়াছেন, "আমাদের সেনাপতি-দলে যদি শেষে মতান্তর—ভাবান্তর—'মনান্তর' না হইত; যদি সকলেই এক-মনঃ-প্রাণে—এক সর্ব্ববাদিসম্মত নির্দ্দিষ্ট ক্রমে চলিতেন; যদি স্বীয় গৌরব—স্বীয় স্বাধীনতাকে—হৃদয়ে স্থান না দিয়া, সকল বুয়র সেনাপতিই, বুয়র জাতির গৌরব ও বুয়র জাতির স্বাধীনতারই একান্তমনে পূজা করিতেন; যদি এই সর্ব্বতোমুখী সাধনায় স্থিরসংকল্প ও ধীরসাহস হইয়া চলিতেন; যদি কোন সেনাপতি আত্মপ্রত্যয় বা আত্মশ্লাঘায় অভিভূত না হইয়া, প্রকৃত ও বহুজনসম্মত পথে থাকিয়া যুদ্ধকার্য্য সম্পন্ন করিতেন; তাহা হইলে, ইংরেজ

গণের শৌর্য্যাদিগুণে বৃটিশ-বিজয়-পথ মুক্ত হয় নাই, বুয়র সেনাপতিদিগের মতান্তর মনান্তরেই বৃটিশ-বিজয়-পথ প্রশস্ত হইয়াছে। সেনাপতিদিগের দোষেই বুয়র সৈন্যকেও দুষ্ট হইতে হইয়াছিল। বুয়র সেনার অবাধ্যতা বাড়িয়াছিল, এই মহাদোষেই আমাদের সর্ব্বনাশ শীঘ্র শীঘ্র ঘটিয়াছে। আমাদের দোষেই আমাদের সর্ব্বনাশ হইয়াছে, ইহা ভাবিলে, আমি ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠি। এই আক্ষেপে—এই অনুতাপে—আমার হৃদয় এখন দিবারাত্র জ্বলিতেছে, চিরদিন জ্বলিবে।"

স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিতে হইলেও, ডিওয়েট কাতর হইলেন না। স্বাধীনতা গেল, তিনি রহিলেন, এই আক্ষেপেই ডিওয়েটের হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। কিন্তু তিনি যেরূপ মহাবীর, সেইরূপই মহাবিবেচক।

"গতস্য শোচনা নাস্তি
মৃতস্য মরণং যথা।"

এখন যাহাতে বুয়রজাতি বৃটিশ প্রজা হইয়াও স্বাধীনভাবে সংসারধর্ম্ম করিতে পারে; যাহাতে আপনাদের রাজকার্য্যে আপনারাও অংশ লইতে পারে; যাহাতে আর সমস্ত বৃটিশ প্রজার ন্যায় বুয়র প্রজারাও আত্মশাসন করিবার ক্ষমতা পাইয়া নির্ব্বিঘ্নে দেশের হিতসাধন করিতে পারে; যাহাতে আপনাদের ধর্ম্ম-কর্ম্ম সমস্ত অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, বুয়র জাতি আবার মাথা তুলিতে পারে, মৃতদেহে প্রাণ পাইয়া আবার সজীব হইতে পারে; ডিলারে, বোথা প্রভৃতির ন্যায়, মহাবীর ডিওয়েটও তাহারই চেষ্টা পাইতেছেন। যিনি যুদ্ধে সর্ব্বোচ্চ আসন লইতে পারিয়াছেন, তিনি এখন এই শান্তিকালেও উচ্চতম আসনেরই অধিকারী হইয়া রহিয়াছেন। অতএব, ডিওয়েট সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহাবীর—তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উত্তম মহাবীর। তাঁহার বীর-জীবন আদর্শ জীবন; তিনিও জগতে আদর্শ-বীর। বর্ত্তমান যুগের তিনি অদ্বিতীয় বীর। অদ্বিতীয় স্বদেশভক্ত মহাবীর এখন রাজভক্তিগুণেও অদ্বিতীয়। স্বীয় গ্রন্থের উপসংহারে তিনি সকল বুয়রকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন, "এখন তোমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য রাজভক্ত হওয়া। যাহারা স্বাধীনতা-প্রেমে মুগ্ধ, এখন তাহাদের পক্ষে রাজভক্তিরসে মুগ্ধ হওয়াই শোভা পাইবে।" এ কথাও মহাবীরের কথা। মহাবীর সরলতার অবতার; তিনি যখন যে অবস্থায় পড়েন, তখন সেই অবস্থারই উপযুক্ত কার্য্য করিয়া থাকেন; সেই কার্য্যেই মহত্ত্বের পরিচয় দিয়া থাকেন।

বঙ্কিমচন্দ্র। *

ব্যক্তিবিশেষকে বুঝিতে হইলে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের বিবরণ, তাঁহাদের সহিত পূর্ব্বোক্ত পুরুষের প্রকৃতিগত সাদৃশ্য বিভিন্নতা প্রভৃতির নিরূপণ করিতে হয়। এই কারণেই বঙ্কিমবাবুকে বুঝিতে হইলে তাঁহার সাহিত্যিক পূর্ব্বপুরুষগণের একটু বিবরণ ও তাঁহাদের সহিত বঙ্কিমবাবুর সাহিত্যিক সম্বন্ধের নির্ণয় আবশ্যক।

জগতের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে আমরা একটি সুন্দর নিয়মের ক্রিয়া দেখিতে পাই। তাহা এই,—পৃথিবীর মঙ্গলের জন্য যখন যে বিষয়ের অত্যন্ত প্রয়োজন হইয়াছে, পরমকারুণিক পরমেশ্বরের কৃপায় তখনই তাহার আবির্ভাব হইয়াছে। এই নিয়মের প্রভাব জড়, মানসিক ও আধ্যাত্মিক জগতে একইরূপ দেখিতে পাই। ইংরাজিতে একটি কথা আছে, "Necessity is the mother of invention." কথাটি এই নিয়মের রূপান্তরমাত্র। আমাদের বাহ্য উন্নতির ইতিহাসে একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। পথশ্রম আমাদের নিতান্ত কষ্টকর বোধ হওয়ায় আমরা যথাক্রমে নরযান, পশুযান, বাষ্পীয়যান, বৈদ্যুতিক যান প্রভৃতির আবিষ্কার করিতে লাগিলাম। এই সমস্ত যানের আবির্ভাবে আমাদের পথশ্রম বিদূরিত হইল বটে, কিন্তু আমাদের আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হইল না। সেই কারণেই এখন আমাদের ইহা অপেক্ষাও সুখদায়ক যানের অত্যন্ত প্রয়োজন বোধ হইতেছে; তাই আমরা আকাশযানের আবিষ্কারের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছি; এবং অচিরেই যে তাহাতে সফলকাম হইব, তাহা Santos Dumant বুঝাইয়া দিয়াছেন। মনোরাজ্যের এই বিবর্ত্তনের প্রমাণ আমরা দর্শনের ইতিহাসে দেখিতে পাই। জগৎ-প্রণালীর কারণনির্ণয়ের জন্য ক্যাণ্ট, ফিক্‌টে, শেলিং, হেগেল প্রভৃতির মতের অবতারণা এই অত্যন্ত প্রয়োজনের অন্য নিদর্শন। আর আধ্যাত্মিক জগতের বিবর্ত্তনের সাক্ষী ভগবানের সেই মহাবাক্য,—"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত!" ইত্যাদি। ইহা কোনও হিন্দুকে বুঝাইতে হইবে না;

আমাদের দেশের সাহিত্যের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলেও আমরা উক্ত নিয়মের ক্রিয়া দেখিতে পাই। নিম্নলিখিত প্রবন্ধে তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

---

* বান্ধব-সমিতির অনুষ্ঠিত বঙ্কিমবাবুর সাংবৎসরিক স্মরণ-সভায় পঠিত।

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশী-প্রাঙ্গণে মুসলমান-রাজ-লক্ষ্মীর সহিত বুঝি প্রাচীনতার নিদর্শন অনেক বিষয় আমরা হারাইয়া ফেলিয়াছিলাম! ইংরাজ কর্তৃক বঙ্গবিজয় শুধু রাজ্য-বিপর্য্যয়েই পর্য্যবসিত হয় নাই। পরন্তু তাহাতে আমাদের শিক্ষা, দীক্ষা, চিন্তা প্রভৃতিরও পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। বহুকাল পূর্ব্বে মুসলমানেরা যেমন খাল খনন করিয়া পুণ্য-সলিলা ভাগীরথীর গতি বিভিন্ন খাতে ফিরাইয়া দিয়াছিল; ইংরাজ তেমনই তাঁহাদের ইতিহাস কাব্য দর্শন প্রভৃতির দ্বারা আমাদের মনের গতি ফিরাইয়া দিয়াছেন। মুসলমানের খাল খনন সত্ত্বেও ক্ষীণাবয়বা গঙ্গা যেমন এখনও কালীঘাটের নিম্ন দিয়া প্রবাহিতা হইতেছেন, সেইরূপ ইংরাজের দ্বারা এই মহাপরিবর্ত্তন সংঘটিত হইলেও, আমাদের পুরাতনভাব এখনও সামান্য রহিয়া গিয়াছে, কিন্তু এখনকার গঙ্গার ন্যায় আমাদের চিন্তার মূলস্রোত যে বিভিন্ন পথেই প্রবাহিত হইতেছে, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

সেকালের শেষকবি ভারতচন্দ্র পলাশীযুদ্ধের তিন বৎসর পরে মানবলীলা সংবরণ করেন। ইংরাজ তখন রাজ্যাধিকার করিয়া অস্ত্রবলে শুধু বাহ্য রাজ্যের অধীশ্বর হইয়াছিলেন, তাহা নহে, পরন্তু তাঁহাদের স্বদেশের বিভিন্ন আদর্শবলে তাঁহারা আমাদের মানসিক রাজ্যেও প্রভূত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন।

রামমোহন রায় এই বৈদেশিক প্রভাবের প্রথম ফল। তাঁহার পূর্ব্বে পাট্টা কবুলিয়ৎ প্রভৃতি পারস্যভাষাদুষ্ট একপ্রকার গদ্য ভাষা ব্যতীত বিশুদ্ধ গদ্য বাঙ্গালা ভাষার প্রচলন ছিল না। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে কেরি, ওয়ার্ড, মার্শম্যান প্রভৃতি মিশনরীগণ শ্রীরামপুরে মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিয়া রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি পুস্তক প্রচারিত করেন। এবং ঐ যন্ত্র হইতে তাঁহাদের প্রথম বাঙ্গালা সংবাদপত্র "সমাচারদর্পণ" প্রকাশিত হয়। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে "হিন্দু কলেজ" প্রতিষ্ঠিত হইল। সেখানে শিক্ষিত হইয়া বাঙ্গালী ইংরাজদিগের সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতির পরিচয় পাইল। এই দেশী বিলাতী সংঘর্ষে দেশে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল। আমাদের সেই সময়ের অবস্থা ভূমিকম্পে ভগ্ন সৌধের ধ্বংসাবশেষের সহিত তুলিত হইতে পারে। প্রাচীন আদর্শ, চিন্তা প্রভৃতি নূতনের সংঘর্ষে নিপীড়িত, অথচ নূতন আদর্শ বা চিন্তার সৃষ্টি হয় নাই। তখন এক মহাপুরুষের আবির্ভাবের অত্যন্ত প্রয়োজন হইয়াছিল। রামমোহন রায় এই অত্যন্ত প্রয়োজনের ফল। সমাজ, সাহিত্য ও ধর্ম্ম, এই

নাই; কারণ, উৎকৃষ্টতর বা অন্যতর আদর্শের সাক্ষাৎ পান নাই। সেই আমাদের এক মাহেন্দ্রক্ষণ, যখন ইংরেজের যাহা কিছু ভাল, তাহার তুলনায় আমাদের মন্দ আমরা বুঝিতে পারিলাম। মহাত্মা রামমোহন রায় উক্ত ত্রিবিধ বিষয়ের সংস্কারে মনোনিবেশ করিলেন। মিশনরী প্রভৃতি বিরুদ্ধ ধর্ম্মবাদী-দিগের সহিত তর্কে প্রবৃত্ত হইবার জন্য তাঁহাকে ভাষার গঠন করিয়া লইতে হইল। তর্কের জন্য যে ভাষার সৃষ্টি, তাহার সৌন্দর্য্য-সম্বন্ধে বিশেষ লক্ষ্য রাখিবার প্রয়োজন নাই। রামমোহন রায়ের ভাষা এই নীরস তর্কের ভাষা হইল। এখানে তাহার একটু নমুনা দেখাইতেছি।—

"নিবর্ত্তক যে শাস্ত্রানুসারে পতি বর্ত্তমানে পতির শাসনে স্ত্রীকে থাকিতে হয় সেই শাস্ত্রেই লিখেন পতি মরিলে পতিকুলে তাহার অভাবে পিতৃকুলে তাঁহাদের শাসনে বিধবা থাকিবেক এ ধর্ম্ম রক্ষাতে দেশাধিপতিকে নিয়ন্তা করিয়া শাস্ত্রে কহিয়াছেন তবে স্বামী বর্ত্তমান থাকিলে কি তাহার অবর্ত্তমানে স্বামী প্রভৃতির শাসনত্যাগ ও ব্যভিচারের সম্ভাবনা কদাপি নিবৃত্ত হইতে পারে না যেহেতু অনেক অনেক স্থানে প্রত্যক্ষ দেখিতেছ যে স্বামী বর্ত্তমান থাকিতেও তাঁহার শাসনে স্ত্রী থাকিয়া স্বতন্ত্রা হইতেছে।"

ভাষার তখন নিতান্ত বাল্যাবস্থা। তখন যেন তাহার শারীরিক বা মানসিক সৌন্দর্য্যের বিকাশ হয় নাই। যেন ধূলিধূসরিতা বালিকা প্রথম অস্ফুট দুর্ব্বোধ ভাষা ব্যবহার করিতেছে। সেই বালিকা যেমন যৌবনে শারীরিক ও মানসিক সৌন্দর্য্যে সকলের মনোমোহিনী হয়, ভাষাও তেমনই ক্রমশঃ পরিমার্জ্জিত ও পরিপুষ্ট হইয়া সরস ও সুন্দর হয়, ইহা আমরা ক্রমশঃ বুঝিব।

ধর্ম্ম সম্বন্ধে রামমোহন রায় নূতন যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিলেন। তাঁহার একেশ্বরবাদ এখন অনেক শিক্ষিত বাঙ্গালীর প্রিয় বস্তু।

সমাজ-সংস্কার বিষয়ে রামমোহন রায়কে বিশেষ আয়াস স্বীকার করিতে হইয়াছিল। নরনারী-সম্বন্ধ লইয়া সমাজ। এই সম্বন্ধের স্বরূপ লইয়া মতান্তর আছে। এই সম্বন্ধ আমরা চারি ভাগে বিভক্ত দেখিতে পাই। যথা-ক্রমে মাতৃ-সম্বন্ধ, জায়া-সম্বন্ধ, কন্যা-সম্বন্ধ ও সহোদরা-সম্বন্ধ। কোনও দুই নরনারী-সম্পর্ক প্রকারগত এই চারিটির মধ্যে একটি হইবেই হইবে। মাতৃ-সম্বন্ধ, কন্যা-সম্বন্ধ ও সহোদরা-সম্বন্ধের স্বরূপ লইয়া বিশেষ মতদ্বৈধ নাই।

হয়। তাহার কারণও আছে। বিলাতী সমাজে সেই সম্বন্ধ চুক্তিমূলক, সুতরাং পক্ষদ্বয় স্বাধীন স্বতন্ত্র। দ্বৈতভাব ইহার স্বরূপ। আর বিবাহ যেখানে ধর্ম্মাচরণের অঙ্গীভূত, সেখানে স্ত্রীর সত্তা স্বামীতে একীভূত হইয়া এক পবিত্র একত্বের উৎপাদন করে। অদ্বৈতভাব ইহার স্বরূপ। সুতরাং বিলাতী আদর্শের তুলনায় আমাদের বিবাহপ্রথা ও স্ত্রীজাতির অবস্থা বিশেষ বিসদৃশ বোধ হইবার কথা। কাজেই সর্ব্বপ্রথমে সতীদাহ প্রথা রামমোহন রায়ের হৃদয় আকৃষ্ট করিয়াছিল। তিনি এই প্রথার নিবারণে গবর্মেণ্টকে প্রণোদিত করিয়া উহা রহিত করাইয়া দিলেন।

কিন্তু শুধু আইনের বলে সমাজ-সংস্কার সম্ভব নহে। কুপ্রথাগুলির দোষ সকলকে বুঝাইয়া দিতে হয়। তাই রসিক ঈশ্বর গুপ্ত আবির্ভূত হইলেন। তাঁহার সরস কবিতাগুলি হাস্যরসের অনন্ত ভাণ্ডার। ঈশ্বর গুপ্তের রচনায় রুচি তাদৃশ মার্জ্জিত ছিল না। বহুকাল মুসলমানের অধীনে থাকিয়া আমরা তাঁহাদের রুচি পর্য্যন্ত গ্রহণ করিয়াছিলাম। তাহা হউক, সমাজের পক্ষে যেগুলি দূষণীয়, তিনি সরস ভাষায় নিদারুণভাবে তাহাদের বিচার করিতেন। তাঁহার গদ্য রচনা অনেক স্থলে অনুস্বার-বিসর্গ-বর্জ্জিত সংস্কৃত ভাষা। নমুনা-স্বরূপ নিম্নে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইল।—

"কেন না এইকালে নব নব নয়নবল্লভ পল্লব মঞ্জরী মণ্ডল মণ্ডিত নব নব সুচারু সুন্দর সুরভিফুল্ল ফুলদল সুশোভিত মৃদু মৃদু মলয়ানিল সেবিত মধুপান মত্ত মধুকর নিকর গুঞ্জিত কোকিল কুল কল কূজিত কমনীয় কুঞ্জকাননে কুটিলকুন্তলা কুরঙ্গাক্ষী কুলকামিনী কুল কর সঞ্চালন পুরঃসর বিহার সুখে সুখী হইতে ইচ্ছা হয়।"

ভাষার এইটি কৈশোর অবস্থা। ধূলি কাদা না থাকিলেও কিশোরী যেমন নানাবিধ অলঙ্কার পরিধান করিয়া সাজ সজ্জা দেখাইতে ভালবাসে, এই অনুপ্রাসদুষ্ট ভাষা বুঝি ঠিক সেইরূপ।

সতীদাহ প্রথা নিবারিত হইলে দুইটি বিষয়ে লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। প্রথম, উক্ত প্রথানিবারণের অবশ্যম্ভাবী ফলে পূর্ব্বাপেক্ষা বিধবার সংখ্যা বর্দ্ধিত হইল। কারণ, ইচ্ছায় অনিচ্ছায় পূর্ব্বে যাহারা স্বামীর চিতায় অনুমৃতা হইত, এখন আইনের বলে তাহাদিগকে জীবিতা থাকিতে হইল। দ্বিতীয়, একাধিকপত্নীগ্রহণের ফল বড়ই বিষময় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

হইতে লাগিল। সুতরাং বহুবিবাহ প্রথা পূর্ব্বাপেক্ষা আরও ভয়ঙ্কর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। এই জন্যই পরবর্ত্তী কালে বিধবাদিগের অবস্থা ও বহুবিবাহ এতদুভয় চিন্তার প্রধান বিষয় হইয়া পড়িল। সুতরাং বিদ্যাসাগরের ন্যায় কর্ম্মবীর ও অক্ষয়কুমারের ন্যায় জ্ঞানবীরের আবির্ভাবের অত্যন্ত প্রয়োজন হইল। শারীরিক অসুস্থতানিবন্ধন অক্ষয় বাবু সমাজসংস্কার সম্বন্ধে অধিক পরিশ্রম করিতে পারেন নাই। কিন্তু তিনি আজীবন বিধবাদিগের দুঃখ-দূরীকরণে সম্পূর্ণ যত্নবান ছিলেন। তাঁহার রচনায় আমরা তাহার প্রমাণ পাইয়াছি। তাঁহার ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচনার প্রভেদ নিম্নলিখিত উদ্ধৃত স্থানদ্বয় হইতে বুঝিতে পারা যায়। অক্ষয়কুমার বিধবাবিবাহ প্রবন্ধে লিখিয়াছেন,—

"যিনি দেখিয়াছেন যে সাধ্বীরমণী মাসদ্বয় পূর্ব্বে স্বামিসমাদরে মানিনী ও গৌরবিনী বলিয়া স্ত্রীজনের নিকট প্রসিদ্ধ ছিলেন, সেই স্ত্রী মাসদ্বয় পরে একান্ত অনাথা ও নিতান্ত সহায়হীনা হইয়া দীনভাবে শীর্ণশরীরে সাশ্রুনয়নে দিনপাত করিতেছেন এবং স্বামিসম্পর্কীয়া বিদ্বেষিণী রমণীগণ কর্ত্তৃক উপেক্ষিত ও অশ্রদ্ধিত হইয়া কাতরস্বরে প্রতিবেশীদিগের দয়ার্দ্র হৃদয় বিদীর্ণ করিতেছেন তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করি বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না।"

বিদ্যাসাগর মহাশয় উক্ত বিষয় সম্বন্ধে আক্ষেপোক্তি করিয়া বলিয়াছেন,—

"হা ভারতবর্ষ! তুমি কি হতভাগ্য! তুমি তোমার পূর্ব্বতন সন্তানগণের আচারগুণে পুণ্যভূমি বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত হইয়াছিলে, কিন্তু তোমার ইদানীন্তন সন্তানেরা স্বেচ্ছানুরূপ আচার অবলম্বন করিয়া তোমাকে যেরূপ পুণ্যভূমি করিয়া তুলিয়াছে, তাহা ভাবিয়া দেখিলে সর্ব্ব শরীরের শোণিত শুষ্ক হইয়া যায়।"

জলপ্রপাতে যেমন পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে প্রচণ্ডবেগে জলধারা পর্ব্বততলে পতিত হইয়া বিপুলকায়া নদীরূপে প্রবাহিত হয়, অক্ষয়কুমারের ভাষায় তেমনই একটা দুর্দ্দমনীয়তা প্রচণ্ডতা অনুভব করিতে পারি। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষায় তেজ আছে, প্রচণ্ডতা নাই; সে যেন স্নিগ্ধ গম্ভীর বিপুল বারিধি—মহাসমুদ্র। উভয়েই বর্ত্তমান বাঙ্গালা ভাষার সৃষ্টিকর্ত্তা। উভয়েই তুল্যরূপে আমাদের সমাজসংস্কার কার্য্যে প্রাণপাত করিয়াছিলেন। উভয়ের নিকট আমরা চিরঋণী।

নবোদ্ভিন্ন-যৌবনার যেমন একটা দারুণ তেজ ও আবেগ পরিলক্ষিত হয়, ভাষারও তখন সেইরূপ অবস্থা। ইহার পরবর্ত্তী কালের দুই জন লেখক এই নবযুবতীকে বসনভূষণে সজ্জিতা করিয়াছেন। মধুসূদন দত্ত সে কালের পুরাতন প্রথার বসন ব্যতীত নূতন বসনে যুবতীর কেমন সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি হইতে পারে, তাহাই অমিত্রাক্ষর ছন্দে কবিতা লিখিয়া দেখাইয়া দিয়াছিলেন। আর দীনবন্ধু বাবু নাটক প্রহসনের আকারে রচনায় কিরূপ সৌন্দর্য্য প্রকাশ করা যাইতে পারে, তাহাই দেখাইয়া দেন। বঙ্কিম বাবুর কার্য্য পরে বলিব।

পুরাতন মিত্রাক্ষর ছন্দ ক্রমে "গদ্য কি পদ্য তাহা চৌদ্দর জানা যায়" হইয়া উঠিলেও গত্যন্তর ছিল না। মধুসূদন এই সঙ্কীর্ণতার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহার অমানুষী-প্রতিভা-বলে তিনি দেখাইয়া দিলেন, অমিত্রাক্ষর ছন্দেও কি সুন্দর কবিতা লেখা সম্ভব। যে বৎসর ঈশ্বর গুপ্তের মৃত্যু হইল, সেই বৎসর মধুসূদনের "শর্ম্মিষ্ঠা" প্রথম প্রকাশিত হয়। যেন পুরাতন ছন্দের ঝঙ্কার না মিলাইতে মিলাইতে নূতন সুরে বাঁধা তন্ত্রী বাজিয়া উঠিল। পর বৎসর "পদ্মাবতী" প্রকাশিত হইল। সাহিত্যে নূতন শক্তি সংযোজিত করিয়া কবি সংস্কারকার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। তাঁহার পরবর্ত্তী দুইখানি প্রহসনই ঐ উদ্দেশ্যে লিখিত। একখানিতে "নব্যরঙ্গে"র পাপ ও নির্বুদ্ধিতা, অপরটিতে "প্রাচীন সমাজের" অসাধুতা লাম্পট্য যথাযথ অঙ্কিত হইয়াছিল। তাঁহার এই নির্ম্মম কশাঘাতের ফল পরবর্ত্তী কালে ফলিয়াছে।

ইংরাজরাজের সহিত কতকগুলি ইংরাজ অন্ন চেষ্টায় এ দেশে আসিয়াছিল। তাহারা ক্রমে এই অধঃপতিত জাতির উপর দারুণ অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছিল। যখন আমাদের জাতীয় কলুষের অপনয়নই প্রায় দুঃসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে, তখন কতকগুলি বিজাতীয় আবর্জ্জনা আমাদের সমাজে পুঞ্জীভূত হইল। কাজেই আর এক জন কর্ম্মবীরের অত্যন্ত প্রয়োজন হইল। দীনবন্ধু মিত্র বহুযত্নে একখানি দেশীয় আয়না প্রস্তুত করিলেন। সে স্বচ্ছ দর্পণে কালিমা-মাখা মুখ দেখিয়া "নীল বাঁদর" নিজের স্বরূপ বুঝিয়া বিত্রস্ত হইয়া পড়িল। যে মহাপুরুষ হারকিউলিসের ন্যায় এই বিজাতীয় আবর্জ্জনা পরিষ্কার করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন, তিনি চিরকাল আমাদের পূজ্য হইয়া থাকিবেন, সন্দেহ নাই। বিজাতীয় কলঙ্ক দূর করিয়াই দীনবন্ধু সমাজের দোষগুলির

দোষগুলি জ্বলন্ত অক্ষরে যথাযথ আঁকিয়া দিলেন। কিন্তু এরূপ প্রণালীতে দুইটি আপত্তি হইতে পারে। প্রথম, ইহাতে বিশেষ অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। দ্বিতীয়, পতিত জাতিকে অনবরত তাহাদের অধঃপতনের চিত্র দেখাইলে ক্রমে তাহারা আশাহীন হইয়া পড়ে। কথাটি বিশদরূপে বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

সৃষ্টিকৌশলে সফলতা লাভ করিতে হইলে তিনটি বিষয়ের প্রয়োজন। প্রথম, অভিজ্ঞতা; দ্বিতীয়, সহানুভূতি; তৃতীয়, কল্পনা। অভিজ্ঞতা না থাকিলে লেখা অসম্ভব, সুতরাং উহাকে সাধারণ ধরিয়া বাদ দিতে পারা যায়। দ্বিতীয়, বিষয়ের সহিত সম্পূর্ণ সহানুভূতি থাকা আবশ্যক। তৃতীয়, কল্পনাবলে তাহার উপর রঙ্গ ফলাইয়া লইতে হয়। সহানুভূতি ও কল্পনা উভয়েরই প্রয়োজন। সহানুভূতির আধিক্য হইলে লোকে বাস্তব বিষয়ের সমধিক অঙ্কন করিয়া থাকে; আর কল্পনাশক্তি অধিক হইলে লোকে অবাস্তব সৌন্দর্য্যের অধিক অবতারণা করিয়া থাকে। "এক শ্রেণীর লোকের সহানুভূতি তাঁহাদের ইচ্ছার বা চেষ্টার অধীন, অপর শ্রেণীর লোকের সহানুভূতি তাঁহাদের অধীন নহে, তাঁহারাই সহানুভূতির অধীন। এক শ্রেণীর লোক যখন মনে করেন, তখনই সহানুভূতি আসিয়া উপস্থিত হয়। নহিলে সে আসিতে পারে না। সহানুভূতি তাহার দাসী। অপর শ্রেণীর লোকেরা নিজেই সহানুভূতির দাস, তাঁহারা চান বা না চান সে আসিয়া ঘাড়ে চাপিয়া আছে।" [বঙ্কিম বাবুর দীনবন্ধুর কবিত্ব।]

একটা দৃষ্টান্ত দিব। দুই বন্ধু নদীতীরে গিয়া পরপারের শোভা অঙ্কিত করিতেছিল। এক জন সৈকতভূমি, তদুপরিস্থ তমালবৃক্ষ, তাহার নিম্নে সবৎসা গাভী, পার্শ্বে দণ্ডায়মান কৃষক, আর নদীর উপরে ভাসমান নৌকা, যেখানে যাহা ছিল, ঠিক অঙ্কিত করিয়া লইল। অপরে কোনটাই ঠিক অঙ্কিত করিতে পারিল না, বা করিল না। সে নদীবক্ষে নৌকায় একটি প্রফুল্লাননা সুন্দরী আঁকিয়া দিল। কিন্তু নৌকাখানির আপেক্ষিক পরিমাণ কিছু হ্রস্ব হইয়া পড়িল। তমালের তলে গাভী না আঁকিয়া দূরে নির্ঝরিণী আঁকিয়া তাহার পার্শ্বে একটি ভীত-চকিত-নেত্রা হরিণী আঁকিল। আর যষ্টিহস্ত রাখালের পরিবর্ত্তে তমালবৃক্ষে একটি কোকিল আঁকিয়া দিল, এবং তখন কৃষ্ণপক্ষ হইলেও, পূর্ব্বাকাশে নবেন্দুকলা আঁকিয়া দিল। পূর্ব্বের চিত্রকর

realist। তিনি যাহা ভালবাসিতেন, তাহা এমনই প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিতেন, যাহার জন্য তাঁহার প্রাণ কাঁদিত, তাহার জন্য তিনি এমনই মনোবেদনা অনুভব করিতেন যে, কল্পনা সহানুভূতির নিকট পরাজিত হইত। বঙ্কিম বাবুর সহানুভূতি থাকিলেও তাহা কল্পনার দাসী ছিল। উভয়ের পার্থক্যের অপর কারণ, দীনবন্ধু বাবুর অভিজ্ঞতার আধিক্য। দীনবন্ধু বাবুর ভাষা নূতন পুরাতনের সন্ধিস্থল। সংস্কৃত ভাষা ও সরল ভাষার মিলনস্থল। বলা বাহুল্য, বঙ্কিম বাবু উপরি-বর্ণিত রূপকের Idealist চিত্রকর।

যৌন সম্বন্ধের স্বরূপ-নির্ণয়ে আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি, রামমোহন রায় স্ত্রীজাতির অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া সতীদাহ প্রথার নিবারণ করিয়া গেলেন। উহার অবশ্যম্ভাবী ফলে সমাজে কতকগুলি বিধবার উৎপত্তি হইল। অপরন্তু বহুবিবাহ বড়ই বিসদৃশ বোধ হইল। ঈশ্বর গুপ্ত তাঁহার ওজস্বিনী ভাষায় ব্যঙ্গ করিয়া সমাজের কুপ্রথাগুলির নিবারণের চেষ্টা করিয়া গেলেন। কর্ম্মবীর বিদ্যাসাগর বিধবা-বিবাহ প্রথার প্রচলন দ্বারা ও বহুবিবাহ প্রথার নিবারণ পূর্ব্বক স্ত্রীজাতির উন্নতির চেষ্টা করিয়া গেলেন। ঠিক এমনই সময়ে আর এক জন মহাপুরুষের আবির্ভাবের অত্যন্ত প্রয়োজন হইল। তাঁহাকে বুঝাইতে হইবে যে, আইনের বলে বা বাহ্য রীতি নীতির হঠাৎ পরিবর্ত্তন করিয়া সংস্কার করা অসম্ভব। সমাজ-সংস্কার করিতে হইলে সমাজের নরনারীর মনের উৎকর্ষসাধন আবশ্যক। তাঁহাদিগকে বুঝাইতে হইবে, সুখ দুঃখ মনে—বাহ্য ক্রিয়ায় নহে। তাঁহাকে এই মহাসত্যের প্রচার করিতে হইবে যে, সুখ বাহিরের বস্তু নহে।

"মনেতে বসতি তার পারে সে করিতে
স্বরগে নরক-জ্ঞান নরকে স্বরগ।"—Milton.

এই অত্যন্ত প্রয়োজনের ফল আমাদের বঙ্কিম বাবু। তিনি দেখিলেন, realistic রচনার অপেক্ষা Idealistic রচনায় অধিক ফল হইবে। পতিত জাতির সৌভাগ্যের চিত্র তাহাদের অধঃপতনের চিত্র অপেক্ষা অধিক কার্য্যকর হইবে জানিয়া তিনি নাটক ছাড়িয়া উপন্যাস লিখিলেন। Fact ছাড়িয়া Fiction ধরিলেন। বর্ত্তমান ছাড়িয়া ভবিষ্যৎ লইলেন। বাস্তব ছাড়িয়া অবাস্তবের চিত্র অঙ্কিত করিলেন।

১২৪৫ সালের ১৩ই আষাঢ় বা ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের ২৭শে জুন বুধবার চব্বিশ —

তিনি স্বীয় বংশের পরিচয় দিয়াছেন। বঙ্কিম বাবুর জীবন কীর্ত্তন আপাততঃ আমার উদ্দেশ্য নহে। এই বাঙ্গালায় এমন কে আছে যে তাঁহার জীবন-কাহিনী না জানে?

বঙ্কিমবাবু দেখিলেন, দেশের বড় দুরবস্থা। প্রাচীন আদর্শ ইংরাজী আদর্শের সংঘর্ষে চুরমার হইয়া গিয়াছে, অথচ নূতন আদর্শের গঠন হয় নাই। ভাষা তখনও সর্ব্ব সৌন্দর্য্য লাভ করে নাই। পূর্ব্বে যে রূপকের অবতারণা করিয়াছি, তাহাতে দেখিয়াছি, অচিরোদ্ভিন্নযৌবনার ন্যায় ভাষার একটা তেজ, একটা আবেগ, একটা দুর্দ্দমনীয়তা রহিয়া গিয়াছে। এই কমনীয়তার অভাব দূষণীয়। ভাষাতে একটু মাতৃভাব, একটু সহৃদয়তা, কোমলতা আবশ্যক। তিনি বুঝিলেন যে, উন্নতি করিতে হইলে লোকশিক্ষার প্রয়োজন। সমাজ, সাহিত্য ও ধর্ম্ম, ত্রিবিধ শিক্ষার প্রয়োজন। আচার্য্যের আসন গ্রহণ করিতে হইলে অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধি ও কর্ম্মসূত্রে নানা দেশে নানা লোকের সহিত পরিচয়ে তাহার সুবিধা হইয়াছিল। তিনি শিক্ষার প্রণালী নির্দ্দেশ করিবার সময় বলিয়াছেন,—"সুশিক্ষিত যাহা বুঝিল, অশিক্ষিতকে ডাকিয়া কিছু কিছু শিখাইলে লোক শিক্ষিত হয়······কিন্তু সুশিক্ষিত অশিক্ষিতের সহিত না মিশিলে তাহা ঘটিবে না। সুশিক্ষিতে অশিক্ষিতে সমবেদনা চাহি।"—বঙ্গদর্শন; ১২৮০; অগ্রহায়ণ।

তিনি দেখিলেন, ভাষা সম্বন্ধে লোকের মত ফিরিয়াছে। পূর্ব্বের লোক মোটা কাজ ভালবাসিত, এখন সূক্ষ্ম শিল্প লোকের ভাল লাগে। তিনি বলিতেন, "আগেকার রসিক, লাঠিয়ালের ন্যায় মোটা লাঠী লইয়া সজোরে শত্রুর মাথায় মারিতেন, মাথার খুলি ফাটিয়া যাইত; এখনকার রসিকেরা ডাক্তারের মত সরু ল্যান্‌সেটখানি বাহির করিয়া কখন কুচ্ করিয়া ব্যথার স্থানে বসাইয়া দেয়, কিছু জানিতে পারা যায় না। কিন্তু হৃদয়ের শোণিত ক্ষতমুখে বাহির হইয়া যায়।" ঈশ্বর গুপ্ত ও দীনবন্ধুর তীব্র ব্যঙ্গপূর্ণ সমালোচনা পূর্ব্বের সহিত উপমিত, আর তিনি নিজে শেষোক্ত পথাবলম্বী, তাহা বলা বাহুল্য। বাঙ্গালা ভাষায় সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার সম্বন্ধে বঙ্কিমবাবু বলিতেন, "পূর্ব্বের লোকে ভাবিত সংস্কৃতেই তবে বুঝি বাঙ্গালা ভাষার গৌরব। যেমন গ্রাম্য বাঙ্গালী স্ত্রীলোক মনে করে, শোভা বাড়ুক বা না বাড়ুক, ওজনে ভারি সোনা পরিলেই অলঙ্কার পরার গৌরব হইল। এই শ্রেণীর গ্রন্থকর্ত্তারা

থাকিলেই রচনার গৌরব হইল * * * টেকচাঁদ ঠাকুর এই বিষবৃক্ষের মূলে কুঠারাঘাত করিলেন।"

তাঁহার ভাষা-গঠনের কৈফিয়ৎ তিনি ১২৮৫ সালের বঙ্গদর্শনে "বঙ্গভাষা" শীর্ষক প্রবন্ধে দিয়া গিয়াছেন।

লোকশিক্ষার জন্য কেবল ভাষার সৃষ্টি করিলেই চলে না। পরন্তু "অজিয়ান" আস্তাবলের আবর্জ্জনা দূর করিবার জন্য সহযোগীর প্রয়োজন, তাই তিনি "বঙ্গদর্শন" প্রকাশিত করিয়া এক দল লেখক সংগ্রহ করিলেন। দল গঠন করিয়া তিনি লোকশিক্ষাবিধানে হস্তক্ষেপ করিলেন। কিন্তু আগ্রহসম্পন্ন শিষ্যের প্রয়োজন। সুতরাং প্রথমে তাঁহাকে পাঠক সংগ্রহ করিতে হইল। সভ্যগণ সেকালের যাত্রা শুনিয়াছেন। সেকালের বলিলাম তাহার তাৎপর্য্য এই যে, একালের যাত্রায় থিয়েটারী ঢং প্রবেশ করিয়াছে। যাত্রার আরম্ভে একটা আখড়াই বাজিত। বাদ্যযন্ত্র বাদন করিয়া বাদকেরা সে একটা প্রাণমাতান ব্যাপার করিয়া তুলিত। ইহার উদ্দেশ্য শুধু লোকসংগ্রহ। কয়েক জন বালক নর্ত্তকী সাজিয়া নৃত্য করিত, এবং অপর কয়েক জন বালক একত্র গান গাহিত। ইহার সহিত মূল যাত্রার তাদৃশ সম্বন্ধ নাই। ক্রমে সময় বুঝিয়া জুড়ীরা গাহিয়া লোককে মুগ্ধ করিয়া ফেলিত। এমনও দেখা গিয়াছে যে, যাত্রা ভাঙ্গিবার পর রসজ্ঞ শ্রোতা জুড়ীদিগের মধ্য হইতে গুণবান দুই এক জনকে বাছিয়া লইয়া নিভৃতে সঙ্গীতালাপ করিতেন। বঙ্কিম বাবুর রচনাগুলির মধ্যে এমনই একটা স্তর দেখিতে পাই। দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা ও মৃণালিনী প্রথম স্তরের অন্তর্নিবিষ্ট। অর্থাৎ, কল্পনাপ্রসূত সুন্দর চিত্র অঙ্কিত করিয়া লোকসংগ্রহ করাই ইহাদের উদ্দেশ্য। ইহাই যাত্রার আখড়াই। দ্বিতীয় স্তরে কৃষ্ণকান্তের উইল, চন্দ্রশেখর প্রভৃতি। ইহাতে সহজ কথায় স্থূলভাবে লোকশিক্ষার আরম্ভ হইল। কোনওটিতে সামাজিক, কোনওটিতে ঐতিহাসিক ইত্যাদি বিষয়ের শিক্ষাদানই ইহাদের উদ্দিষ্ট। ইহারাই বালকসঙ্গীত। ক্রমে যখন তাঁহার যশোবিমুগ্ধ অনেক পাঠক জুটিয়া গেল, তখন তিনি তৃতীয় স্তরের পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করিলেন। আনন্দমঠ, সীতারাম, দেবী চৌধুরাণী প্রভৃতি এই স্তরের। তিনি উপন্যাস-চ্ছলে ক্রমে জীবনের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বা ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রভৃতি সূক্ষ্ম সমস্যাগুলির ব্যাখ্যা করিলেন। ইহাই আমাদের জুড়ীর গান। ক্রমে এ গান ভাঙ্গিয়া

সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা শুনিবার জন্য আগ্রহপ্রকাশ করিল। তাই কালোয়াতী গানের ন্যায় তিনি মনস্বী লোকের জন্য ক্রমে উপন্যাস ছাড়িয়া কৃষ্ণচরিত্র, ধর্ম্মতত্ত্বের রচনা করিলেন।

শিক্ষকদল-গঠন, শিষ্যসংগ্রহ ও শিক্ষাপ্রণালী নিরূপিত করিয়া তিনি বিষয় নিরূপণ করিয়া লইলেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ইংরাজি শিক্ষা-প্রভাবে আমাদের সাহিত্যিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক, এই ত্রিবিধ গোলযোগ ঘটিয়াছিল। মাতা, জায়া, কন্যা ও ভগিনী, সমাজের এই চারিটি মূল-বন্ধনী। ইহার মধ্যে বিলাতী আদর্শে জায়া-প্রেমের স্বরূপ লইয়া বিশেষ গোলযোগ ঘটিয়াছিল, ইহা আমরা পূর্ব্বেই বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি। তাই বঙ্কিমবাবু যৌন-সম্বন্ধই তাঁহার পুস্তকের একমাত্র আলোচ্য বিষয় বলিয়া স্থির করিয়া লইলেন। এই জায়াভাবের পূর্ণবিকাশ দেখাইতে হইলে নিরোধক কারণগুলির নিরাকরণ করিতে হয়। ইংরাজিতে যাহাকে বলে deterrant circumstances, এগুলি তাহাই। সুতরাং তাঁহার নায়ক নায়িকা কেহই দরিদ্র নহেন, কেহই অসুন্দর নহেন। সকলেই ন্যূনাধিক ধনশালী ও সুন্দর। কাহারও প্রায় সন্তান-সন্ততি হয় নাই। কারণ, বাৎসল্যভাব জায়াভাব অপেক্ষাও প্রবল। কোনও নায়িকাকেই প্রকৃতপক্ষে শ্বশ্রূ লইয়া সংসার করিতে হয় নাই। কারণ, কন্যাভাব বুঝি জায়াভাবের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। এই জন্যই তাঁহার নায়িকাগুলিতে দুইটি অভাব লক্ষিত হয়। প্রথম, সতীত্বগৌরবের চরম আদর্শ আমরা তাঁহার কোনও নায়িকাতেই দেখিতে পাই না। সতীত্বতেজে সাবিত্রীর ন্যায় মৃতকল্প পতিকে পুনর্জ্জীবিত করিতে পারেন, এমন কোনও নায়িকা তাঁহার গ্রন্থে দেখি নাই। তিনি ঐরূপ চিত্র অঙ্কিত করিলে আমাদের অনেক উপকার হইত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

প্রতিরোধক কারণগুলির এইরূপে নিরাকরণ করিয়া বঙ্কিমবাবু জায়া-প্রেমের বিভিন্ন ছবি অঙ্কিত করিতে লাগিলেন। ইহাতেই তাঁহার বিশেষ কবিত্ব। বিভিন্ন বৃত্তির মূর্ত্তিমান চিত্র অঙ্কিত করাই দুরূহ ব্যাপার। তাহার উপর একই বৃত্তির অর্থাৎ পত্নীপ্রেমের নানারূপ চিত্রের অঙ্কন বাস্তবিকই অমানুষী-শক্তিসাপেক্ষ।

এইরূপ করিবার একটা psychological কারণ কল্পিত হইতে পারে।

সমস্ত নিঃশেষ করিয়া দিয়াছেন, এবং প্রত্যেক স্থলে আমাদের কর্ত্তব্যনির্দ্ধারণ করিয়া গিয়াছেন।

তাঁহার নায়িকাগুলির প্রকৃতির পর্য্যালোচনা করিলে আমরা একটি সুন্দর তথ্যে উপনীত হই। পরকলা-বিচ্ছুরিত সূর্য্যরশ্মিতে সপ্তবর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। শেষ বর্ণদ্বয়ের মধ্যস্থিত বর্ণ কয়টি একটি অপরটির সহিত ক্রমশঃ কেমন মিশাইয়া গিয়াছে। ইহা বস্তুবিজ্ঞানের একটি সুন্দর দৃশ্য। বঙ্কিমবাবুও nature ও art, এই দুইটি সীমার মধ্যে তাঁহার নায়িকাগণকে অবস্থাপিত করিয়াছেন। পূর্ণ nature, শূন্য art,—কপালকুণ্ডলা। সমস্ত nature, সামান্য art,—তিলোত্তমা। আর একটু art, নন্দা। art ও nature সমান,—সূর্য্যমুখী। art বেশী, কমলমণি। আরও বেশী,—বিমলা। nature নিতান্ত কম, art খুব বেশী,—হীরা। nature শূন্য, art পূর্ণ,—পদ্মাবতী। তাঁহার অপর নায়িকাগুলি উল্লিখিত দুই দুইটির মধ্যে অবস্থিত। এইরূপে তিনি nature হইতে art পর্য্যন্ত একটি সুন্দর মালা গাঁথিয়া রাখিয়াছেন। এইরূপ করিবার একটি উদ্দেশ্য ছিল। তিনি লোকশিক্ষা দিবেন, তাঁহার ত আর কোন একটি প্রকারের রমণী-চিত্র অঙ্কিত করিলে চলে না। স্থান কাল অবস্থা প্রবৃত্তি ভেদে যত বিভিন্ন প্রকারের চরিত্রগত বিভিন্নতা হইতে পারে, তাঁহাকে তাহার বিশ্লেষণ করিতে হইবে, এবং প্রত্যেক স্থলেই স্বামীর কর্ত্তব্য স্থির করিয়া দিতে হইবে।

মনস্তত্ত্ববিদেরা একটি কথা বলিবেন। তাঁহারা বলেন, কোন একটি পদার্থের জ্ঞান জন্মিতে হইলে দুইটি বিষয় জানিতে হয়। দুইটি না হইলে একটির জ্ঞান জন্মিতে পারে না। শুদ্ধ লাল বর্ণের গোলক আমরা লালবর্ণের বলিয়া বুঝিতে পারি না, যতক্ষণ লাল ব্যতীত অন্য বর্ণের সহিত তাহাকে দেখি। এই একত্রদর্শন হইতে পার্থক্যজ্ঞান জন্মে। ইহাকেই বলে Law of differentiation। অনেকে বলেন, ইহা সত্য, পরন্তু সাদৃশ্যজ্ঞান নহিলে এ জ্ঞানও জন্মিতে পারে না। অর্থাৎ লালবর্ণ গোলক পূর্ব্বদৃষ্ট লাল গোলকের সহিত বর্ণজাত সাদৃশ্য থাকায় পরিজ্ঞাত হইল। তাহার উত্তরে অপর-মতাবলম্বীরা বলেন, না, তাহা নহে, এখানেও পূর্ব্ব নিয়মের ক্রিয়াবশতঃ জ্ঞান জন্মিতেছে, বা বিষয়জ্ঞান ঐরূপ জ্ঞানসাপেক্ষ। যাহা হউক, আমরা দেখিলাম, যেমন চিত্রে কোন একটি বর্ণ ফুটাইতে হইলে, অপর একটি বর্ণ ফলাইতে

বুঝিয়াছিলেন যে, লোকশিক্ষার সুবিধার জন্য পাপ পুণ্যের চিত্র, সাত্ত্বিক রাজসিক প্রকৃতি, শান্ত চঞ্চল স্বভাব, প্রেমিক অপ্রেমিক হৃদয়, স্বার্থপর নিঃস্বার্থ নরনারী পাশাপাশি রাখিয়া দেখাইতে হইবে। তাহাতে উভয় চিত্রই বেশ ফুটিয়া উঠিবে। এই কারণেই তাঁহার প্রায় সমস্ত পুস্তকেই আমরা dual ছবি দেখিতে পাই। জগৎসিংহের পার্শ্বে ওসমান, তিলোত্তমার পার্শ্বে আয়েসা, নগেন্দ্রের পার্শ্বে দেবেন্দ্র, সূর্য্যমুখীর পার্শ্বে কুন্দ, এ দিকে শ্রী নন্দা রমা, ও দিকে প্রফুল্ল সাগর ও নয়ান, চন্দ্রশেখরের পার্শ্বে প্রতাপ, দরিয়ার পার্শ্বে জেবউন্নেসা, মৃণ্ময়ীর পার্শে পদ্মাবতী, ভ্রমরের পার্শ্বে রোহিণী। এইরূপ ব্যবস্থায় দুইটি উপকার সাধিত হইয়াছে। প্রথম, প্রত্যেকবারেই আমরা দুই তিনটি নূতন ছবি পাইয়াছি। দ্বিতীয়, ছবিগুলি আলো-ছায়ার সমাবেশে বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। এক স্থলে পাপের দণ্ড— অপর স্থলে পুণ্যের উপকার না দেখাইয়া, একই স্থলে যথাক্রমে পাপ পুণ্যের দণ্ড পুরস্কার দেখাইলে সমধিক উপকার হয়। ইহাও উল্লিখিত নিয়মের রূপান্তরমাত্র। অপর একটি উদ্দেশ্যও কল্পিত হইতে পারে। অধঃপতিত জাতির দোষগুলিই অনবরত দেখাইলে তাহারা ক্রমে আশাহীন হইতে পারে। সুতরাং কেবল তাহা না করিয়া তিনি অনেক স্থলে আমাদের সৌভাগ্য বা বাঙ্গালীর ভাবী উন্নতির চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন।

ভালবাসার সুস্পষ্ট চিত্র অনেকগুলি হইলেও মূলতঃ তাহাদের মধ্যে প্রকারগত বিভাগ অধিক হইতে পারে না। চরিত্রগত বিভিন্নতা হইতে প্রধানতঃ দুইটি বিভাগ কল্পিত হইতে পারে। প্রথম, বিরুদ্ধস্বভাব-সম্পন্ন ব্যক্তিদ্বয়ের মধ্যে যে প্রেম, তাহা বৈষম্যনিয়মে বা অনুকরণেচ্ছায় হৃদয়ে সঞ্জাত হয়। দ্বিতীয়, সমভাববিশিষ্ট ব্যক্তিদ্বয়ের মধ্যে যে প্রেম সঞ্জাত হয়। Tennysonএর এনক্ ও অ্যানী পূর্ব্বভাবের, অ্যানী ও ফিলিপ শেষোক্ত প্রকারের প্রণয়ী। মাধবীকঙ্কণের হেমলতা ও নরেন্দ্রনাথ পূর্ব্বভাবের, এবং হেমলতা ও শ্রীশচন্দ্র শেষোক্ত প্রকারের প্রণয়ী।

এইরূপে চরিত্রগত দুইটি বিভাগ কল্পিত হইতে পারে। কিন্তু স্বরূপগত প্রেমের চারিটি বিভাগ কল্পিত হইতে পারে। তাহাদিগকে যথাক্রমে রূপজ, গুণজ, কর্ত্তব্যজ্ঞানজ ও নিষ্কামভাবজ, বলিতে পারা যায়। এইরূপ বিভাগ-কল্পনার কারণও আছে। সাধারণতঃ তিনটি অংশ লইয়াই মানবদেহের অস্তিত্ব ; যথা, শরীর, মন ও আত্মা। ইন্দ্রিয়ভোগের আশায় বা ভোগেচ্ছায়

এবং পরিবর্ত্তনশীল। কারণ, শরীরের বিকার শীঘ্রই জন্মিতে পারে। বুদ্ধিবৃত্তি পরিচালন-সম্ভূত যে প্রেম, তাহাই গুণজ প্রেম। ইহার আপেক্ষিক স্থায়িত্ব অধিক। কারণ, বুদ্ধিবৃত্তির পরিবর্ত্তন একটু সময়সাপেক্ষ। বঙ্কিমবাবু এই সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

"মনের অনেকগুলি ভাব আছে, তাহার সকলকেই লোকে ভালবাসা বলে। কিন্তু চিত্তের যে অবস্থায় অন্যের সুখের জন্য আমরা আত্ম-সুখ-বিসর্জ্জনে স্বতঃ প্রবৃত্ত হই, তাহাকেই ভালবাসা বলে। সুতরাং রূপবতীর রূপভোগলালসা ভালবাসা নহে * * * * এ বৃত্তিও জগদীশ্বর-প্রেরিতা। ইহার দ্বারাও সংসারের ইষ্টসাধন হইয়া থাকে, এবং ইহা সর্ব্বজীবমুক্তকারী। * * * কালিদাস বায়রণ ও জয়দেব ইহার কবি * * * প্রেমবুদ্ধি বৃত্তি মূলক। প্রণয়াস্পদ ব্যক্তির গুণ সকল যখন বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা পরিগৃহীত হয়, হৃদয় সেই সকল গুণে মোহিত হইয়া তৎপ্রতি সমাকর্ষিত ও সঞ্চালিত হয় তখন সেই গুণাধারের সংসর্গলিপ্সা ও তৎপ্রতি ভক্তি জন্মে। ইহার ফল সহৃদয়তা ও পরিণামে আত্মবিস্মৃতি ও আত্মবিসর্জ্জন; সেক্ষপিয়র বাল্মীকি ও আদাম দেস্তাল ইহার কবি।"

বিষবৃক্ষে এ তথ্যটি সুন্দররূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। নগেন্দ্রনাথ ও সূর্য্যমুখীর প্রেম গুণজ, সেই জন্য অপেক্ষাকৃত স্থায়ী। নগেন্দ্র কুন্দের প্রেম রূপজ, তাই তাহাতে অত শীঘ্র বিকার জন্মিয়াছিল।

আত্মবিস্মৃতি ও আত্মবিসর্জ্জনের দৃষ্টান্ত তাঁহার পুস্তকেই আমরা দেখিতে পাই। মতি বিবি মেহের উন্নিসার সহিত বর্দ্ধমানে সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার মনের ভাব জানিয়া লইলেন, অথচ মতি বিবির মনের ভাব অপ্রকাশিত রহিল। তাই কবি বলিলেন,—

"যিনি পরে আত্মবুদ্ধিপ্রভাবে দিল্লীশ্বরেরও ঈশ্বরী হইয়াছিলেন, তিনিও মতির নিকট পরাজিত হইলেন! ইহার কারণ মেহের উন্নিসা প্রণয়শালিনী, মতি বিবি এস্থলে কেবল স্বার্থপরায়ণা।"

আর আত্মবিসর্জ্জনের দৃষ্টান্ত প্রতাপের শেষ কার্য্যে দেখিয়াছি। রূপগুণ বিচার না করিয়া শুদ্ধ কর্ত্তব্যবোধে যে ভালবাসা, তাহাই তৃতীয় শ্রেণীর। ইহার অভাবে কতটা সর্ব্বনাশ হইতে পারে, ভ্রমর-চরিত্রে তাহার আভাস পাই। স্বামীকে ভালবাসিতে হইবে, কেন না, হিন্দু স্ত্রীর কর্ত্তব্য। এইরূপ

কর্ত্তব্য, সুতরাং ভালবাসিব—এরূপ না ভাবিয়া ভ্রমর ভাবিত, "যতদিন স্বামী ভক্তির যোগ্য, ততদিন তাহার ভক্তি।" অর্থাৎ, ভ্রমর স্বামীকে ভালবাসিত স্বামী বলিয়া নহে, তাহার গুণ আছে বলিয়া। এবং এই জন্য গুণের অভাব হইলেই তাহার সর্ব্বনাশ হইল। কিন্তু সংসারে বুঝি ইহাই প্রেমের শ্রেষ্ঠ বিকাশ। আমাদের হিন্দুর দেশে আর একটি মহত্তম আদর্শ ছিল। কালধর্ম্মে তাহা যাইতে বসিয়াছে। সে আদর্শ বুঝি এ জগতে কোথাও বিকশিত হয় নাই। ইহাই শেষ বা নিষ্কাম-ভাবজ প্রেম। কর্ত্তব্যজ্ঞানজ প্রেম শ্রেষ্ঠ, সন্দেহ নাই; কিন্তু ইহাও "ইহা কর্ত্তব্য অতএব করিব" এইরূপ জ্ঞান বা তর্কমূলক। হিন্দুরা ইহা অপেক্ষাও উচ্চতর আদর্শের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভাগবতকার নির্গুণ ভক্তির লক্ষণে বলিয়াছেন,—

মৎ-গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে।
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোহম্বুধৌ॥
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতম্।
অহেতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে॥

এই তর্কবুদ্ধিশূন্য কারণের নির্দ্দেশ না করিয়া আপনার স্বভাবসিদ্ধ আবেগবলে ভালবাসার অস্তিত্ব শুধু আমাদের দেশেই ছিল। ভালবাসি, কারণ, আমার গত্যন্তর নাই। না ভালবাসিয়া আমি থাকিতে পারি না। হিন্দু স্ত্রী স্বামীকে ভালবাসিবে, তাহার রূপ আছে বলিয়া নহে। তাহার গুণ আছে, তাহা বলিয়াও নহে! "এইরূপ করাই কর্ত্তব্য" এইরূপ জ্ঞানজনিত নহে। পরন্তু স্বভাবতঃ ভালবাসিবে। যেমন চৈত্রবায়ুবিতাড়িত বালুকারাশি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইলে অন্তঃসলিলা ফল্গু নদী ক্ষুদ্র রন্ধ্রপথে নিষ্ক্রান্ত হইয়া কুলুকুলু নাদে প্রবাহিত হইবেই হইবে, অথবা যেমন মাধ্যাকর্ষণবলে গঙ্গাপ্রবাহধারা বারিধিবক্ষে ছুটিয়া পড়িবেই পড়িবে, সেইরূপ অনায়ত্তভাবে স্বামীকে ভালবাসা—অর্থাৎ স্বামীকে ভালবাসিবই বাসিব, ইহাই আমাদিগের শ্রেষ্ঠতম আদর্শ। শ্রীধর কথকের একটি গান আছে,—

ভালবাসিবে ব'লে ভালবাসিনে,
আমার স্বভাব এই তোমা বই জানিনে।

ইহাই শ্রেষ্ঠ প্রেমের স্বরূপ। প্রণয়িযুগলের যখন এরূপ অবস্থা হইবে যে, এক জন অপরকে ভালবাসিবেই বাসিবে, এক জনের স্বভাব এইরূপ হইবে

তখনই সেই জীবনমরণব্যাপী প্রেম জন্মিবে। চন্দ্রশেখরেই আমরা ইহার ক্ষীণ আভাস পাইয়াছি। আর মৃণালিনীতে আমরা ইহার উন্মেষ দেখিয়াছি। নিতান্ত নির্ম্মমভাবে তিরস্কৃত হইলেও হেমচন্দ্রের উপর মৃণালিনীর রাগ নাই, অভিমান নাই। তাই গিরিজায়া যখন তাহাকে বলিল, "পাষণ্ড বলিব না? কি দোষে তোমাকে তিনি তবে তিরস্কার করিলেন?" হেমচন্দ্রের এরূপ করিবার অধিকার আছে, মৃণালিনী এ কথা বলিল না; সে শুধু বলিল, "সে আমারই দোষ। আমি গুছাইয়া সকল কথা তাঁহাকে বলিতে পারি নাই, কি বলিতে কি বলিয়াছি।" ইহার ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

লোকশিক্ষা দিতে হইলে আদর্শ চরিত্র অঙ্কিত করিতে হয়। এই আদর্শের স্বরূপ লইয়া কিছু গোলযোগ ঘটে। প্রথম, স্থান কাল অবস্থা ভেদে আদর্শের জ্ঞান বিভিন্নভাবে পরিস্ফুট হয়। হিন্দুর যাহা আদর্শ, মুসলমানের তাহা নহে। কারণ, হিন্দুর শিক্ষা দীক্ষা মুসলমানের শিক্ষা দীক্ষা আচার হইতে বিভিন্ন; সুতরাং আমাদের আদর্শ প্রকৃত হিন্দু আদর্শ হওয়া চাই। কিন্তু তাহাতেও একটি গোলযোগ ঘটিতে পারে। প্রকৃত হিন্দু আদর্শ কি? হলস্কন্ধ শস্ত্রপাণি হইয়া আমাদের আর্য্য পূর্ব্বপুরুষগণ যখন পঞ্চনদের অনার্য্য জাতিকে পদতলে দলিত করিয়া রাজ্যবিস্তার করিয়াছিলেন, তখনকার নরনারীর আদর্শই কি আমাদের জাতীয় আদর্শ? অথবা যখন নৈমিষ অরণ্যে সূত শৌনক আদি ঋষিগণ বেদগানে দিঙ্মণ্ডল পবিত্র করিতেন, সেই সময়ের আদর্শই কি আমাদের আদর্শ? কিংবা আকবর বাদশাহের সময়ের বিকৃত হিন্দু আদর্শ, অথবা ইংরাজ-শাসনের পরবর্ত্তী কালের হিন্দুর আদর্শই আমাদের আদর্শ? সমাজের উন্নতি করিতে হইলে সামাজিক আদর্শের অঙ্কন আবশ্যক। কারণ, সন্ন্যাসীর যাহা আদর্শ, গৃহীর তাহা নহে। গৃহীর যাহা আদর্শ, সন্ন্যাসীর তাহা নহে। এই আদর্শ লইয়া দুইটি বিভিন্ন মত দেখা যায়। প্রথম, রক্ষণশীল দলের কথা; তাঁহারা বলেন, প্রাচীন সীতা সাবিত্রীর আদর্শই আমাদের হিন্দু-সমাজের নারীর আদর্শ করিতে হইবে, এবং করা উচিত। দ্বিতীয়, পরিবর্ত্তনশীল দলের কথা; ইহাঁরা বলেন যে, ইহা অসম্ভব। সাগরসঙ্গমে দাঁড়াইয়া গঙ্গাস্রোতকে যদি বলা যায়, তুমি প্রহতবেগা হইয়া বিপরীত মুখে হরিদ্বারতলে ফিরিয়া যাও, ইহাও যেমন অসম্ভব, সেইরূপ পরিবর্ত্তনশীল সমাজের বিবর্ত্তন বন্ধ করিয়া অনুবর্ত্তনক্রমে

প্রভাবে অবশ্যম্ভাবী জানিয়াও সমাজকে নৈমিষারণ্যবাসী প্রাচীন হিন্দু সমাজের আদর্শে গঠিত করিবার চেষ্টা বিফল হইবে, ইহা সত্য। কিন্তু ইংরাজী শিক্ষার দোষে দেশে তখন এক দল লোক Highlands হইতে একেবারে Nelli Jollyর আমদানী করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। বঙ্কিম বাবু বুঝিলেন যে, এই বিরুদ্ধ শক্তিদ্বয়ের (forces) একটি সমবায়-জনিত শক্তি (resultant) উৎপন্ন হইবে। মহাপুরুষ সমাজের স্পন্দন বড় শীঘ্র অনুভব করিতে পারেন। তাই তিনি সেই মধ্য মার্গের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি সেই প্রাচীন আদর্শ একটু অভিনব ভাবে পরিবর্ত্তিত করিয়া আমাদের জাতীয় আদর্শ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। তিনি positive ও negative উভয় দিক হইতে ইহার নিরূপণ করিলেন। কিন্তু negative অধিক কার্য্যকারী হয়, তাই বেদান্তের নেতিবাদের ন্যায়, তিনি সেই মধ্যমার্গ-বিচ্যুত হইলেই কিরূপ দুর্দ্দশা ঘটে, তাহাই বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন। সূর্য্যমুখী ও ভ্রমরে তিনি এই সমস্ত তথ্য প্রকটিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

সূর্য্যমুখী স্বামীকে বলিতেছেন, "তুমি আমার সর্ব্বস্ব, তুমি আমার ইহকাল, তুমি আমার পরকাল।"

ভ্রমর বলিলেন, "আমি তোমার স্ত্রী শিষ্যা আশ্রিতা প্রতিপালিতা।" এ, প্রেম, এ ভক্তি কেবল হিন্দু স্ত্রীতেই সম্ভবে। বিবাহে স্বামী স্ত্রী একীভূত হইয়া ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত হয়। অপূর্ণ পূর্ণ হয় মাত্র। ইংরাজের বিবাহে চুক্তি আছে, একীকরণ নাই; তাই এ আদর্শ তাহারা জানিতেও পারে না।

কুন্দ নহিলে নগেন্দ্রের জীবন ক্লেশময় হইবে, তাই স্বয়ং উদ্যোগ করিয়া সূর্য্যমুখী উভয়ের বিবাহ দিলেন—স্বামীর সুখ হইবে বলিয়া। ইহাতে তাঁহার রাগ অভিমান নাই; কারণ, সূর্য্যমুখী ভাবিতেন, রাগ অভিমানে তাঁহার অধিকার নাই। এ চরিত্র খাঁটি হিন্দু। কিন্তু কাল বুঝি একটু বদলাইয়াছিল। সাবিত্রী বুঝি দেশী শাটী ছাড়িয়া গাউন পরিয়াছিলেন। কবি সযত্নে তাই গাউন পরার দোষ দেখাইলেন। স্বামীর বিবাহ দিয়া সূর্য্যমুখী সুখী হইবেন ভাবিয়াছিলেন, ফলে অন্যরূপ হইল। তিনি গৃহত্যাগ করিলেন, তাহাতে যন্ত্রণা হইল;—এ যন্ত্রণা ঈর্ষ্যার কষ্ট নহে—স্বামিবিরহে। তাই তিনি আবার ফিরিলেন। হিন্দুমার্গ হইতে বিচ্যুত হইবার বিষময় ফল জ্বলন্ত অক্ষরে বিবৃত হইয়াছে। সাবিত্রী গাউন ছাড়িয়া আবার শাটী পরিলেন।

আমরা আবার খাঁটী হিন্দু রমণীর কথা শুনিলাম। স্বামীর চরণে মাথা রাখিয়া কুন্দ মরিল; সূর্য্যমুখী বলিল, "ভাগ্যবতি! এরূপ অদৃষ্ট যেন আমার হয়।"

ভ্রমরে আমরা negative side দেখিলাম। রোহিণীতে আসক্ত জানিয়া গোবিন্দলালের উপরে ভ্রমরের ক্রোধ ও অভিমান হইল। বুঝি আর একটু বেশী হইল; তাহা ঘৃণা। তাই ভ্রমর লিখিলেন, "যতদিন তুমি আমার ভক্তির যোগ্য, ততদিন আমারও ভক্তি, যত দিন তুমি বিশ্বাসী, ততদিন আমারও বিশ্বাস"। সাবিত্রী এখানেও গাউন পরিয়াছিলেন; তাই ভাবিলেন, স্বামীর দোষ-গুণ-বিচারে তাঁহার অধিকার আছে। কিন্তু গাউনের ভিতর সাবিত্রী ছিলেন, তাই পায়ে ধরিয়া ক্ষমা চাহিলেন। গোবিন্দলাল ক্ষমা করিলেন না; কারণ, তিনি আর সত্যবান নাই। দুর্জ্জয় অভিমানভরে মানিনী গর্জ্জিল; বলিল, "বিনাপরাধে আমাকে ত্যাগ করিতে চাও, কর। কিন্তু মনে রাখিও, উপরে দেবতা আছেন।" সূর্য্যমুখীরও এইরূপ "আমিত্বের" সম্প্রসারণ হইয়াছিল। ফলে সোনার সংসার ছারখারে যাইতে বসিয়াছিল। ভ্রমরের একটু ধর্ম্মের দম্ভ হইল। সে দম্ভ আর গেল না। ফলে সোনার সংসার ছারখার হইয়া গেল। সাবিত্রী আর গাউন ছাড়িতে পারিলেন না, তাই মৃত্যুকালেও ভ্রমর স্বামীকে বলিল, "আশীর্ব্বাদ কর, যেন জন্মান্তরে সুখী হই।" হায় বিদেশী আদর্শ!

দুইটি আদর্শে আমরা কি দেখিলাম? প্রথম, দেখিলাম, হিন্দু আদর্শে কত সুখ, কত শান্তি। দ্বিতীয়, সেই মার্গচ্যুত হইলে কত দুঃখ, কত অশান্তি। তৃতীয়, অবস্থাবিশেষে হিন্দুমার্গে পুনরায় চলিতে পারিলে সুখ শান্তি আবার কেমন ফুটিয়া উঠে। চতুর্থ, যদি তাহা না হয় ত সুখ শান্তি কেমন জন্মের মত ঘুচিয়া যায়।

হিন্দু স্ত্রীর স্বাতন্ত্র্য আদৌ নাই। স্বামীতে সর্ব্বস্ব-অর্পণ তাহার পরম ধর্ম্ম। স্বামীই তাহার ধ্যান—স্বামীই তাহার জ্ঞান—স্বামীই তাহার একমাত্র উপাস্য দেবতা। হিন্দু স্ত্রীর সন্ন্যাসধর্ম্মে অধিকার নাই। অনধিকারচর্চ্চায় কখনও সুফল ফলিতে পারে না। এ কথা বঙ্কিম বাবু dual চিত্র আঁকিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন। দেবী চৌধুরাণীতে ইহার positive, এবং সীতারামে negative চিত্র দেখিতে পাই। নিশি বলিল, "ও সকল ব্রত মেয়েমানুষের নহে। যদি

জন্ত ব্রজেশ্বর নাই, আমার ব্রজেশ্বর বৈকুণ্ঠেশ্বর একই * * * তুমি সন্ন্যাস ত্যাগ করিয়া ঘরে যাও।" বঙ্কিম বাবু প্রফুল্লের মতি ফিরাইলেন। আমরা দেখিলাম, "ত্র্যহস্পর্শ" সত্বেও ব্রজেশ্বর শেষজীবনে কেমন সুখী হইতে পারিয়াছিলেন। কারণ, প্রফুল্ল হিন্দু-রমণীর কার্য্য করিতে পারিয়াছিলেন। ইহাই positive শিক্ষা। এরূপ না হইতে পারিলে কি সর্ব্বনাশ হয়, ইহাই negative sideএর শিক্ষা। শ্রী স্বামীকে ত্যাগ করিয়া আসিলেন। কারণ, কোষ্ঠীর ফলে তিনি "প্রিয়-প্রাণ-হন্ত্রী" হইবেন। সন্ন্যাস শিক্ষা করিলেন। সহধর্ম্মিণী হইতে পারিলেন না। সীতারাম শ্রীকে চাহেন। তিনি মাতার মত স্নেহ, কন্যার মত ভক্তি, স্বামীর মত সেবা সকলই নন্দার নিকট পাইয়াছেন। কিন্তু তথাপি ভাবিতেন, "সহধর্ম্মিণী কই?" শ্রীর চরিত্র অতি উচ্চদরের। তিনি জানিতেন, "স্ত্রীলোকের পুণ্য একমাত্র স্বামি-সেবা।" কিন্তু "প্রিয়-প্রাণ-হন্ত্রী" হইবার ভয়ে শ্রী স্বামী ছাড়িয়া আসিয়াছিলেন। ফলতঃ যে কারণেই হউক, শ্রী সহধর্ম্মিণী হইতে পারিলেন না। ফলে কি হইল? যত দিন সীতারাম আশা করিলেন, শ্রী তাঁহারই হইবে, ততদিন তাঁহার শ্রীবৃদ্ধি হইল। কিন্তু যখন নিতান্তই তিনি শ্রী-ভ্রষ্ট হইলেন—যখন হিন্দুরমণী হিন্দুর আদর্শ পথে চলিতে পারিল না—যখন গৃহিণী নিতান্তই সন্ন্যাসিনী হইল, তখন শ্রীভ্রষ্ট সীতারাম রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া পড়িলেন। ধনে প্রাণে মজিলেন। আমরাও দেখিলাম, সহধর্ম্মিণী না হইলে ধর্ম্মরাজ্য স্থাপিত হইতে পারে না। আবার কোন্ প্রকার হিন্দুরমণীর নিষ্কাম সন্ন্যাসধর্ম্মে অধিকার আছে, জয়ন্তী ও নিশির চরিত্রে তাহা বুঝিতে পারিলাম।

হিন্দুর বিশেষত্ব এই, তাঁহারা পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বীকার করেন। একবার পাপ করিলেই জন্মের মত কেহ যায় না। চন্দ্রশেখরে এ তথ্য আমরা অবগত হইয়াছি।

আদর্শ-চরিত্র-ব্যাখ্যায় তিনি আরও দেখাইয়াছেন যে, হিন্দু-স্ত্রীর আদর্শ ক্রমশঃ স্বামীর আদর্শে গঠিত হইয়া যায়। মনের ও শরীরের বৃত্তিগুলির পরিপুষ্ট অনুশীলনসাপেক্ষ। চতুঃপার্শ্বস্থ বস্তুনিচয় ও ব্যক্তিগণের চরিত্র আমাদের চরিত্রগঠনে বিশেষ সহায়তা করে। প্রকৃতি-পালিতা কপালকুণ্ডলা কখনও সংসারে লালিত হয় নাই। সংসারী জীবকে ভালবাসিতে পায় নাই। তাই সে বিবাহিতা হইয়াও সুখী হইতে পারিল না। কারণ, প্রেমবৃত্তি সহজাত

স্বামীর নিকট যে শিক্ষা পাইয়াছিল, তাহারই ফল গোবিন্দলালকে ভোগ করিতে হইয়াছিল। হিন্দু স্ত্রী স্বচ্ছদর্পণতুল্য। তাহাতে স্বামীর মুখ যথাযথ প্রতিবিম্বিত হইবে। আমাদের দায়িত্ব অন্য জাতি অপেক্ষা গুরুতর। সুতরাং স্ত্রীশিক্ষার পূর্ব্বে আমাদের নিজের শিক্ষার আবশ্যক। তাহাদের সাবিত্রী করিতে হইলে আমাদিগকে সত্যবান হইতে হইবে।

তাঁহার পুরুষচরিত্রগুলির পর্য্যালোচনা করিতে গিয়া সুন্দর তথ্যে উপনীত হওয়া যায়। তিনি দেখাইয়াছেন যে, পুরুষের কত রূপ অপূর্ণতা হইতে পারে। নিস্তেজ অধঃপতিত জাতির উদ্ধার করিতে হইবে। সেই জন্যই বুঝি তাঁহার পুরুষগুলি ন্যূনাধিক কর্ম্মবীর। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, সামাজিক আদর্শ অন্য আদর্শ হইতে বিভিন্ন। এবং সমাজের উন্নতি করিতে হইলে সামাজিক আদর্শ অঙ্কিত করিতে হয়। সামান্য চিন্তা করিয়া দেখিলেই চন্দ্রশেখর ও প্রতাপ ব্যতীত অন্য পুরুষচরিত্রগুলিতে কোনও না কোনও গুরুতর অপূর্ণতা দেখিতে পাওয়া যায়। আনন্দমঠের সন্ন্যাসিগণকে অবশ্য বাদ দিতে হইয়াছে। কারণ, সামাজিক আদর্শ-নিরূপণে আমরা চেষ্টিত। কিন্তু এখন জিজ্ঞাস্য, চন্দ্রশেখর বা প্রতাপ, এতদুভয়ের কেহ আদর্শ চরিত্র কি না? চন্দ্রশেখর-চরিত্রের আলোচনা করিলে দেখিতে পাই, সামাজিকতা সাংসারিকতা তাঁহার বড় অল্প ছিল। তাই তিনি কষ্ট পাইয়াছিলেন। আর যে কর্ত্তব্য-জ্ঞান হইতে আদর্শত্বের প্রধান উপকরণ গৃহীত হয়, প্রতাপে তাহার অল্পতা ছিল। কারণ, রূপসীকে ভালবাসা প্রতাপের অবশ্য-কর্ত্তব্য। সেই জন্য তাঁহার প্রাণবিসর্জ্জনে অধিকার ছিল না। কাজেই আমাদের সামাজিক আদর্শ চন্দ্রশেখরের অপেক্ষা কিছু নিম্নে, এবং প্রতাপের অপেক্ষা কিছু উচ্চে অবস্থিত।

বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে বঙ্কিমবাবুর মত "সাম্য" প্রবন্ধে প্রকাশিত দেখিতে পাই। তিনি লিখিয়াছেন,—

"আমরা বলিব বিধবা-বিবাহ ভালও নহে মন্দও নহে। সকল বিধবার বিবাহ হওয়া কদাচ ভাল নহে, তবে ইচ্ছামত বিধবাগণের বিবাহে অধিকার থাকা ভাল। যে স্ত্রী সাধ্বী, পূর্ব্ব পতিকে আন্তরিক ভালবাসিয়াছিল, সে কখনই পুনর্ব্বার পরিণয় করিতে ইচ্ছা করে না, যে জাতিগণের মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত আছে, সে সকল জাতির মধ্যেও পবিত্রস্বভাববিশিষ্টা স্নেহময়ী

হিন্দুই হউন আর যে জাতীয় হউন পতির লোকান্তরপ্রাপ্তির পর পুনঃ-পরিণয়ে ইচ্ছাবতী হয়েন তবে তিনি অবশ্য তাহাতে অধিকারিণী।”

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রথমে হিন্দু-স্ত্রী-জীবনের প্রকৃত আদর্শ ও উদ্দেশ্য স্ত্রীজাতিকে শিক্ষা দিতে হইবে। তখনও কোন বিধবা যদি পুনঃপরিণয় করিয়া সহধর্ম্মিণী হইবার বাসনা করেন, তাহাতে তাঁহার কি অধিকার থাকা উচিত? এই ঔচিত্য অনৌচিত্যের জ্ঞান সামাজিক আইন বা রাজার আইনের বলে হইবে না, হওয়া উচিত নহে। মনের শিক্ষা আকাঙ্ক্ষা অনুসারে হইবে। তাই তিনি বিষবৃক্ষে দেখাইলেন, হিন্দু-স্ত্রী সধবা হউন, বিধবা হউন, বিধবা বিবাহ করুন বা না করুন, হিন্দুমার্গচ্যুতা বা তৎপথাবলম্বিনী না হইলে কখনও সুখী হইতে পারিবেন না। প্রথম অংশ সূর্য্যমুখীতে দেখিয়াছি। হিন্দুমার্গচ্যুত হওয়ায় তাঁহাকে অত ক্লেশ সহ্য করিতে হইয়াছিল। দ্বিতীয় অংশ কুন্দে দেখিলাম। বিধবা কুন্দ পুনরায় বিবাহ করিয়াও, যাহার দোষেই হউক, ধর্ম্মপত্নী, সহধর্ম্মিণী হইতে পারিল না। তাই কুন্দ ফুল অকালে ঝরিল। সহধর্ম্মিণী-ব্যাখ্যায় বঙ্কিমবাবু নিজেই বলিয়াছেন, “উচ্চ আশায় আশাবতী, হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষার ভাগিনী, কঠিন কার্য্যের সহায়, সঙ্কটে মন্ত্রী, বিপদে সাহস-দায়িনী, জয়ে আনন্দময়ী।” অপরিমিতপ্রেমপূর্ণহৃদয়া কুন্দ নগেন্দ্রকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিত সত্য, কিন্তু কখনও সহধর্ম্মিণী হইতে পারে নাই। হইলে দেখিতাম, এক বৃন্তে দুইটি ফুলের ন্যায় সূর্য্যমুখী কুন্দ কুসুম নগেন্দ্র হৃদয় আলোকিত করিয়া থাকিত। আর হীরায় আমরা তৃতীয়াংশ দেখিয়াছি। বিধবা হীরা বিবাহ না করিয়াও হিন্দুমার্গভ্রষ্টা হইয়াছিল; তাহার প্রায়শ্চিত্ত আমরা দেখিয়াছি।

বহুবিবাহ সম্বন্ধেও বঙ্কিমবাবুর ঐরূপ মত অনুমিত হইতে পারে। তাঁহার মত তিনি আবার dual ছবি দিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন। স্ত্রী সহধর্ম্মিণী হইলে একাধিক স্ত্রী সত্ত্বেও পুরুষ সুখী হইতে পারে, তাহা আমরা প্রফুল্ল গৃহিণী হইবার পরে দেখিয়াছি। কারণ, প্রফুল্লের গুণে সকলেই মুগ্ধ—নয়ান বৌ পর্য্যন্ত। আর সহধর্ম্মিণী না হইতে পারিলে এক স্ত্রী সত্ত্বেও সর্ব্বনাশ ঘটিতে পারে, ইহাই আমরা দেবেন্দ্রের অধঃপতনে বুঝিয়াছি।

সাংসারিক সুখের জন্য নিষ্কাম-ভাবজ প্রেমের প্রয়োজন। তাহাতে সাংসারিক সুখ শান্তি ফুটিয়া উঠে। কিন্তু শুদ্ধ সাংসারিক সুখের জন্য ব্যস্ত

আমাদের দেশের উন্নতিকল্পে মনোনিবেশ করিতে হইবে। স্বদেশের উন্নতি করিতে হইলে স্বদেশপ্রেমিকতা স্বদেশহিতৈষিতা হৃদয়ে জাগাইতে হইবে। কিন্তু স্বদেশ প্রেমিকতা জাগাইয়া এ দেশের উন্নতি করিতে হইলে দুইটি বিষয়ের প্রয়োজন। প্রথম, আত্মসম্মান-জ্ঞান, আত্মশক্তিতে বিশ্বাস; দ্বিতীয়, কর্ম্মপ্রবৃত্তির বিকাশ। অর্থাৎ, আত্ম-সম্মান-জ্ঞান-সম্পন্ন ও আত্মশক্তিতে বিশ্বাসবান্ না হইলে, লোকের দেশহিতৈষিতা বৃত্তির বিকাশ হইবে না, এবং ঐরূপ বৃত্তি সঞ্জাত হইলেও আমাদের কর্ম্মবৃত্তির বিকাশ না হইলে কোনও প্রকৃত উপকার সাধিত হইবে না।

মিথ্যা কলঙ্কে যদি দেশের উপর ঘৃণা থাকে, তাহা হইলে সেই অনুর্ব্বর ক্ষেত্রে স্বদেশ-প্রেমের বীজ উপ্ত হইলেও অঙ্কুরিত হইবে না। তাই মৃণালিনী-রচনার আবশ্যক হইল। সপ্তদশ অশ্বারোহী আমাদের দেশ জয় করে নাই, এই মহাসত্য বুঝাইতে হইলে একটা hypothetical explanation আবশ্যক। তাই পশুপতি-সংবাদের প্রয়োজন হইল। ফল, সপ্তদশ অশ্বারোহীর পশ্চাতে বিশ্বাসঘাতকতার নিশানতলে সম্মিলিত একটি মহতী চমূ আসিয়া আমাদের স্বাধীনতা হরণ করিয়াছিল, ইহা বঙ্কিম বাবু প্রথমে বুঝাইলেন। বাঙ্গালী যখন বুঝিল, সত্য সত্যই তাহারা নিতান্তই ভীরু দুর্ব্বল নহে, একেবারে অপদার্থ নহে, তখন ক্রমশঃ তিনি কিরূপে জাতীয় জীবনের উন্নতি হইতে পারে, তাহার নির্দ্দেশ করিলেন।

উপরে আমরা দেখিলাম, বঙ্কিম বাবু প্রথমে আমাদের আত্মশক্তিতে বিশ্বাসের উৎপাদন করিলেন। কিন্তু আমাদের উন্নতির পথে আর কয়েকটি বিঘ্ন ছিল। জন্মান্তর, কর্ম্মফল, অদৃষ্টবাদ, হিন্দুত্বের বিশেষত্ব। কিন্তু কালে ইহার বিকৃত অর্থ মানবহৃদয় অধিকার করিয়াছিল। তাহার ফলে আমাদের কর্ম্মবৃত্তি হীনবল হইয়া পড়িয়াছিল। তাই তিনি অদৃষ্টবাদের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি লিখিলেন,—

"ললাটলিপির কথা লিখিতেছি না। সে ত অলস ব্যক্তির আত্ম-প্রবোধজন্য কল্পিত গল্পমাত্র। কিন্তু কখনও কখনও যে কোনও ভবিষ্যৎ ঘটনার জন্য পূর্ব্বাবধি এরূপ আয়োজন হইয়া আইসে তৎসিদ্ধিসূচক কার্য্য সকল এরূপ দুর্দ্দমনীয় বলে সম্পন্ন হয় যে, মানসিকী শক্তি তাহার নিবারণে অসমর্থ হয়। * * * ইহাই রূপান্তরে ফেট (fate) ও নেসেসিটী (necessity)

তথা করোমি' শ্লোকার্দ্ধ পাঠ করিয়া অনেকে অদৃষ্টের পূজা করেন। অপর সকলে 'কপাল' বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন।"

জাতীয় স্বাধীনতা আমরা বহুকাল হারাইয়াছি। বিজেতার পদদলনে আমরা ক্রমে মনুষ্যত্ব হারাইয়া নিতান্ত নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছি। তাই বিফল-মনোরথ হইলেই আমরা 'কপালের' দোষের উল্লেখ করিয়া মনকে প্রবোধ দিয়া নিশ্চিত থাকি। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফলে আমরা ক্রমশঃ অপদার্থ হইয়া পড়িয়াছি। ঠিক এমনই দুর্দ্দশাগ্রস্ত জাতির উদ্ধার করিতে হইলে অদৃষ্টবাদের প্রকৃত অর্থ বুঝাইয়া দিতে হয়। সে ব্যাখ্যায় বঙ্কিম বাবু বলিয়াছিলেন, "অদৃষ্টের তাৎপর্য্য যে কোন দৈব বা অনৈসর্গিক শক্তিতে অস্মদাদির কার্য্য সকলকে গতিবিশেষ প্রাপ্ত করায় এমন কথা আমি বলিতেছি না। অনীশ্বর-বাদীও অদৃষ্ট স্বীকার করিতে পারেন। সাংসারিক ঘটনাপরম্পরা ভৌতিক নিয়ম ও মনুষ্যচরিত্রের অনিবার্য্য ফল; মনুষ্যচরিত্র মানসিক ও ভৌতিক নিয়মের ফল; সুতরাং অদৃষ্ট মানসিক ও ভৌতিক নিয়মের ফল; কিন্তু সেই সকল নিয়ম মনুষ্যের জ্ঞানাতীত বলিয়া অদৃষ্ট নাম ধারণ করিয়াছে।"

উপরের ব্যাখ্যা হইতে আমরা বুঝিলাম যে, মানসিক ও ভৌতিক নিয়মের resultantই আমাদের তথাকথিত অদৃষ্ট। ভৌতিক নিয়ম আমাদের ইচ্ছার অনধীন; মানসিক নিয়ম ইচ্ছাশক্তির অধীন। সুতরাং আমাদের নিজের অদৃষ্ট আমরা কতক অংশে পরিবর্ত্তন করিতে পারি। ভৌতিক নিয়মের প্রতিঘাত দ্বারা সামান্য পরিবর্ত্তন সম্ভব হইলেও তাহাও অদৃষ্ট, কেন না, সমবায়জনিত কার্য্যও অজ্ঞাত বটে। অতএব আমরা বুঝিলাম, কর্ম্ম নিরর্থক নহে। "কপাল" বলিয়া একটা দুর্দ্দান্ত দস্যু নাই। কপালকুণ্ডলায় ও অন্যত্র এই কথাই বুঝান হইয়াছে। ইংরাজীতে একটা আছে,—

"Man shall have to work out his own destiny." ইহাই আমাদের কথার প্রতিধ্বনিমাত্র।

শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম শিক্ষা দিবার জন্য ভাগবদ্গীতার কয়েকটি সুন্দর তত্ত্বের বিবৃতি করিয়া তিনি সীতারাম প্রণয়ণ করিলেন। গীতার এই শ্লোকগুলি কবি দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া গ্রন্থারম্ভে উদ্ধৃত করিয়াছেন। বাহুল্যভয়ে এখানে আর পুনরুদ্ধৃত হইল না।

"ধ্যায়তে বিষয়ান্ পুংসঃ" ইত্যাদি শ্লোকগুলি মুখ্যভাবে সীতারাম-চরিত্রে

জয়ন্তীর চরিত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে। বিষয় সম্বন্ধে ধ্যান হইতে আসক্তি, আসক্তি হইতে অভিলাষ বা তৃষ্ণা, তৃষ্ণা হইতে ক্রোধ, তাহা হইতে মোহ মোহ হইতে স্মৃতিভ্রংশ, স্মৃতিভ্রংশ হইতে বুদ্ধিনাশ, বুদ্ধিনাশ হইতে বিনাশ কিরূপে হয়, তাহাই উপন্যাসাকারে কবি সীতারাম-চরিত্রে দেখিয়াছেন। লোককে সাবধান করাই ইহার উদ্দেশ্য। যেমন তুঙ্গ শৃঙ্গ হইতে একবার পতন হইলে মানুষ প্রায় অনায়ত্তভাবে শৃঙ্গ হইতে শৃঙ্গান্তরে পতিত হইতে হইতে অবশেষে ভগ্ন-অঙ্গ হইয়া শিলাতলে বিচূর্ণ হইয়া প্রাণত্যাগ করে, সেইরূপ বিষয়ের ধ্যান হইতে ক্রমশঃ মানুষের কেমন বিনাশসাধন হয়, তাহাই উক্ত চরিত্রে বিশ্লেষিত হইয়াছে।

দ্বিতীয়ার্দ্ধে উদ্ধৃত শ্লোকগুলি জ্ঞান ও কর্ম্মযোগের বিবৃতি। শ্রেষ্ঠ কর্ম্মের লক্ষণে ভগবান বলিয়াছেন,—"কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর।" জয়ন্তী ও শ্রীর চরিত্রে অধিকারভেদে কর্ম্মের বিভিন্নতার দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইয়াছে। জয়ন্তীর যাহা কর্ত্তব্য, শ্রীর তাহা নহে; তাই অনধিকারচর্চ্চায় শ্রীর সর্ব্বনাশ ঘটিল। ইহাই অন্যভাবে প্রফুল্ল-চরিত্রে দেখিয়াছি, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি।

আমরা বুঝিলাম যে, বিষয়াসক্তিবর্জ্জিত হইয়া আমাদিগকে কর্ম্ম করিতে হইবে। বিষ্ণুর উদ্দেশে অনাসক্ত হইয়া কর্ম্মকরণই শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম।

এইরূপে আমাদের আত্মসম্মানজ্ঞান জন্মাইয়া এবং কর্ম্মবৃত্তির বিকাশ করিয়া, তিনি হৃদয়ে স্বদেশ-প্রেমের বীজবপন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

আমাদের শাস্ত্রে সাধনের গুণ বর্ণিত হইয়াছে। প্রথমে যাহা সম্ভবতঃ না ফুটিয়া উঠে, ক্রমে সাধন দ্বারা তাহা সুসিদ্ধ হয়।

বঙ্কিম বাবু দুইখানি পুস্তকে এই আধ্যাত্মিক বিবর্ত্তন বেশ স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন।

বঙ্কিম বাবু কমলাকান্তের দপ্তরে একাদশ অধ্যায়ে দুর্গোৎসব শীর্ষক প্রবন্ধে স্বদেশপূজার উন্মেষ ও আনন্দমঠে তাহার পূর্ণবিকাশ দেখাইয়াছেন। সপ্তমী পূজার দিন কমলাকান্ত ঠাকুর অহিফেনের মাত্রা চড়াইয়া দিয়া প্রতিমা দেখিতেছেন; অহিফেনপ্রসাদাৎ অকস্মাৎ তাঁহার দিব্যচক্ষু হইল; তাই মৃণ্ময়ী মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে অপূর্ব্ব দিব্যমূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। তিনি বলিতেছেন,—

"অকস্মাৎ কালের স্রোত দিগন্ত ব্যাপিয়া প্রবলবেগে ছুটিতেছে, তিনি ভেলায় চড়িয়া ভাসিয়া যাইতেছেন * * * তরঙ্গসঙ্কুল জলরাশির উপরে

ভাসিতেছে, আলোক বিকীর্ণ করিতেছে * * * এই কি মা? হাঁ, এই আমার মা, চিনিলাম, এই-আমার প্রসূতি জননী জন্মভূমি, এই মৃণ্ময়ী মৃত্তিকা-রূপিণী অনন্তরত্নভূষিতা অধুনা কালগর্ভে নিহিতা।"

অহিফেনপ্রসাদাৎ যে দৃশ্য কমলাকান্ত দেখিলেন, সাধনবলে তাহা স্বতঃ মানসপথে উদিত হইতে পারে, ইহাই আধ্যাত্মিক বিবর্ত্তনের মূল সূত্র। এই দ্বিতীয় স্তর আমরা অনন্দমঠে দেখিলাম। "বন্দে মাতরং" গান শুনিয়া মহেন্দ্র বলিল, "এ ত দেশ, এ ত মা নয়।" ভবানন্দ বলিল, "আমরা অন্য মা মানি না—আমরা বলি জন্মভূমিই জননী।"

উপরে আমরা কি দেখিলাম? আমরা দেখিলাম, প্রথমে যাহার জন্য অহিফেন বা stimulant দরকার হইয়াছিল, বিবর্ত্তন-নিয়মে তাহা স্বাভাবিক হইয়া পড়ে। শারীরিক বিবর্ত্তনে পণ্ডিত Herbert Spencer duty ও happinessএর সমন্বয় এইরূপে বুঝাইয়াছেন।

যিনি দেশের উন্নতি করিবেন, তাঁহাকে লোকশিক্ষা দিতে হইবে, ইহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। যদি ভ্রাতায় ভ্রাতায় বিরোধ থাকে, তাহারা যেমন উভয়ে একত্র কোন কাজ করিয়া সাধারণ উপকার করিতে পারে না, সেইরূপে ধর্ম্ম-বর্ণ-জাতি-প্রকৃতিজনিত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে একতা না হইলে দেশের সম্পূর্ণ কল্যাণ হইতে পারে না। কিন্তু দেশের সকল লোক হিন্দু ধর্ম্ম গ্রহণ করিবে, এরূপ আশা করা বাতুলতামাত্র। তাই বঙ্কিম বাবু জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে একটা দেশের ধর্ম্মের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি বুঝাইলেন যে, হিন্দু মুসলমান বিভিন্নধর্ম্মাবলম্বী হইয়াও, পারসীক ও মান্দ্রাজী বিভিন্নবর্ণবিশিষ্ট হইয়াও, ব্রাহ্মণ ও শূদ্র বিভিন্নশ্রেণীনিবিষ্ট হইয়াও, স্বদেশের উদ্ধারকল্পে এক নিশানতলে মিলিত হইতে পারে।

দেশের বর্ত্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ সম্ভবপর উন্নতির বিষয় বুঝাইবার জন্য তিনি মহেন্দ্র সিংহকে তিনটি মূর্ত্তি দেখাইলেন। এই মূর্ত্তিত্রয় দেশের তিন সময়ের চিত্র। এই মূর্ত্তিত্রয় যথাক্রমে জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তি, কালিকা মূর্ত্তি ও দশভুজা মূর্ত্তি। সমাজের এই বিবর্ত্তনের তিনটি স্তরের ব্যাখ্যা বঙ্কিম বাবু স্বয়ং করিয়াছেন। তিনটি মূর্ত্তির ব্যাখ্যায় বঙ্কিম বাবু বলিয়াছেন, মূর্ত্তিত্রয় যথাক্রমে মা যা ছিলেন, মা যা হইয়াছেন, মা যা হইবেন। ইহা শুদ্ধ হিন্দুদিগের জন্য।

আমরা উপরে দেখিয়াছি, অহিফেনপ্রসাদাৎ কমলাকান্ত ঠাকুর যে দৃশ্য

বিবর্ত্তনের মধ্যান্তর। সাধনবলে ঐ ভাব মূর্ত্তিমান হইয়া আমাদের চর্ম্মচক্ষের গোচরীভূত হইতে পারে, ইহাই বিবর্ত্তনের চরম কথা। তাই মহেন্দ্র সিংহ প্রথমে অপর একটি মূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন।

"সর্ব্বোপরি বিষ্ণুর মাথার উপরে উচ্চমঞ্চে বহুলরত্নমণ্ডিত আসনোপবিষ্টা এক মোহিনীমূর্ত্তি, লক্ষ্মী সরস্বতীর অধিক সুন্দরী, লক্ষ্মী সরস্বতীর অধিক ঐশ্বর্য্যশালিনী।"

"মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কে উনি?'

"ব্রহ্মচারী বলিল, 'মা', আমরা যাঁর সন্তান'।"

আমাদের পরম দেবতা বিষ্ণুর মাথার উপর বুঝি ত্রিভুজাকৃতি পরমসুন্দরী "সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা" চিরপ্রফুল্লা চির আনন্দময়ী কি এক মোহিনী মূর্ত্তি মহেন্দ্রের লোচনপথারূঢ় হইয়াছিল। সমুদ্রপরিখাবেষ্টিতা, উত্তালতরঙ্গচুম্বিতবেলাসমন্বিতা, চিরতুহিনমণ্ডিততুঙ্গশৃঙ্গবহুলা, সদামলয়ানিলান্দোলিতশ্যামলবল্লরীশোভিতা, কোকিল-কুল-কলকুঞ্জিতা, শ্যামোজ্জ্বলশস্যালকশোভনা জননী জন্মভূমি! তোমাতে কত সৌন্দর্য্য! কত মহত্ত্ব!

আমরা বুঝিলাম, জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে লোকের স্বদেশধর্ম্ম একটা আছে। আমরা সেই ধর্ম্মসাধন না করিলে কখনও উন্নত হইতে পারিব না। অন্তর্বিরোধ থাকিতে পারে, কিন্তু সেই ত্রিভুজাকৃতি স্বদেশপ্রতিমা আমাদের সকলেরই পূজ্য। ১২৮৮ সালে আনন্দমঠ প্রথম প্রকাশিত হয়। আর গত বৎসর International Congressএর অষ্টাদশ অধিবেশন হইয়াছে মাত্র। অর্থাৎ, আনন্দমঠ প্রকাশিত হইবার তিন বৎসর পরে এই জাতীয় উদ্দীপনার আরম্ভ। আমেরিকার আদর্শে আমরা যখন জাতীয় জীবনের উন্নতিকল্পে একতা দ্বারা দেশের উদ্ধারসাধন করিতে বদ্ধপরিকর হইতেছিলাম, ঠিক তাহার পূর্ব্বেই বঙ্কিমবাবু দার্শনিক যুক্তিগুলি উপন্যাসাকারে গ্রথিত করিয়া আমাদিগকে দেশের ধর্ম্ম বুঝাইয়াছিলেন; অর্থাৎ objective lesson পাইবার পূর্ব্বেই বঙ্কিমবাবু আমাদের subjective side প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন। এবং হয় ত ঐ জন্যই উক্ত বিদেশীয় প্রণালী অত শীঘ্র আমরা গ্রহণ করিতে পারিয়াছি।

যখন এইরূপে, আমরা মিলিত হইতে পারিব, তখন আমরা বঙ্কিমবাবুর শেষবর্ণিত দশভুজা মূর্ত্তি দেখিতে পাইব। তখন "দিগ্‌ভুজা—নানা-প্রহরণ-

বাণী বিদ্যাদায়িনী—সঙ্গে বলরূপী কার্ত্তিকেয়—কার্য্যসিদ্ধিরূপী গণেশ” সমন্বিতা হইবেন। আসুন, আমরা মার দশভুজা মূর্ত্তিকে প্রণাম করি।

কবে আমরা মার এ মূর্ত্তি দেখিব ? উত্তরে বঙ্কিম বাবু আশা দিয়াছেন,—

“যবে মার সকল সন্তান মাকে মা বলিয়া ডাকিবে, তখন উনি প্রসন্ন হইবেন।”

এখনও আমরা মাকে মা বলিয়া ডাকি না ; এখনও জাতিবর্ণবিভিন্নতার জন্য শেষের ধর্ম্মে বিরোধ আমাদের মিটে নাই ; তাই আমরা মা'র কালিকামূর্ত্তি দেখিতেছি। দেখিয়া ভীত হতাশ হইতেছি।

এই বিবর্ত্তন-ব্যাখ্যা বঙ্কিমবাবুর স্থায়ী গৌরবের অন্যতম কারণ। কবির প্রায় প্রত্যেক পুস্তকেই আমরা এক জন ব্রাহ্মণপণ্ডিতের সাক্ষাৎ পাইয়াছি। ইঁহাদের অস্তিত্ব বঙ্কিমবাবুর রচনার বিশেষত্ব। তাঁহার এই গুরুবাদের অর্থ আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিব। মানুষ সমস্তই যদি বিদ্যা বুদ্ধির বলে ও নিজ চেষ্টায় বুঝিতে চেষ্টা করে, তাহা হইলে শিক্ষা প্রায় অসম্ভব হইয়া পড়ে। কারণ, সকলের বুদ্ধি নিজ চেষ্টায় সমস্ত বুঝিতে সমর্থ হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, সকলকেই সেই প্রথম হইতে আরম্ভ করিতে হয়। তাহা না করিয়া অশিক্ষিত যদি শিক্ষিতের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করে, তাহা হইলে অশিক্ষিতের পরম লাভ। শিক্ষিতের বহু আয়াসে অর্জ্জিত জ্ঞান সহজেই শিষ্যের আয়ত্ত হইয়া পড়ে। আবার মনুষ্য-চরিত্রের একটি সুন্দর প্রহেলিকা আছে যে, বাক্য অপেক্ষা চরিত্রের আদর্শে লোকশিক্ষা সুকর হয়। তাই নির্লিপ্ত অথচ সংসারের হিতে রত ব্রাহ্মণের অবতারণার প্রয়োজন হইল। একটি ঘটনায় বঙ্কিমবাবু অমানুষী-শক্তি-সম্পন্ন ত্রিকালজ্ঞ ব্রাহ্মণপণ্ডিতের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতে বাধ্য হয়েন। ঘটনাটি এইরূপ। বঙ্কিম বাবুর পিতা যাদবচন্দ্র একবার মেদিনীপুরে গমন করেন। সেখানে রোগাক্রান্ত হইয়া মানবলীলা সংবরণ করেন। দাহঘাটে সৎকার করিবার জন্য লইয়া যাওয়া হইয়াছে। দাহের উদ্যোগ হইতেছে। এমন সময় সেখানে এক মহাপুরুষ আগমন করিয়া যোগবলে মৃতদেহে প্রাণসঞ্চার করিয়াছিলেন। তিনি ভবিষ্যতে যাদবচন্দ্রের বংশে বঙ্কিম বাবুর ন্যায় মহাপুরুষের জন্ম হইবে, তাহাও বলিয়া গিয়াছিলেন। এটা শুধু কবিকল্পনা নহে। ঘটনাটি তাঁহার মনে চিরকালের জন্য অঙ্কিত হইয়াছিল। তিনি পুরাতন আর্য্য ব্রাহ্মণগণের উপর বিশেষ শ্রদ্ধাবান ছিলেন। তিনি

"দেখ, বিধি-বিধান-ব্যবস্থা সমস্তই ব্রাহ্মণের হাতে ছিল। নিজ হস্তে থাকিতেও তাঁহারা আপনাদের উপজীবিকা সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করিয়াছেন * * * যাহার অপেক্ষা দুঃখের উপজীবিকা আর নাই—ভিক্ষা * * * পৃথিবীতে যত জাতি উৎপন্ন হইয়াছে, প্রাচীন ভারতের ব্রাহ্মণদিগের মত প্রতিভাশালী ক্ষমতাশালী জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক আর কোনও জাতিই নহে।"

আর এক স্থলে লিখিয়াছেন, "হিন্দুধর্ম্মে ব্রাহ্মণগণ সকলের পূজ্য—তাঁহারা যে বর্ণশ্রেষ্ঠ এবং আপামর সাধারণের বিশেষ ভক্তির পাত্র, তাহার প্রধান কারণ এই যে, ব্রাহ্মণগণই ভারতবর্ষে সামাজিক শিক্ষক ছিলেন। তাঁহারাই ধর্ম্মবেত্তা, তাঁহারাই বিজ্ঞানবেত্তা, তাঁহারাই পুরাণবেত্তা, তাঁহারাই দার্শনিক, তাঁহারাই সাহিত্য-প্রণেতা, তাঁহারাই কবি, তাই অনন্তজ্ঞানী উপদেশকগণ তাঁহাদিগকে অশেষ ভক্তির পাত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।"

পতিতদেশের উদ্ধারের জন্য বঙ্কিমবাবু বুঝিলেন, আদর্শ শিক্ষকের প্রয়োজন। ইঁহাদের আচার্য্যের উপযুক্ত শিক্ষা চাহি। ব্রাহ্মণ ব্রহ্মজ্ঞ ও ব্রহ্মনিষ্ঠ না হইলে আচার্য্যের পদবীর অধিকারী হইবেন না। কর্ম্মহীন জ্ঞানহীন ব্রাহ্মণ অতি হেয়, তাই ঠাকুরের উপর তাঁহার অত রাগ দেখিতে পাই।

কিন্তু পতিত হইলেও সাধনবলে উদ্ধার হওয়া সম্ভব। সাধনায় ব্রাহ্মণের ব্রহ্মণ্যের ক্রমবিকাশ সম্ভব। সমাজের উন্নতির বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন রূপের আচার্য্যের প্রয়োজন। এই সমস্ত কথা বুঝাইবার জন্য তিনি সমস্ত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতমণ্ডলীকে একশ্রেণীভুক্ত করেন নাই। তাঁহার ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের মধ্যে স্থূলতঃ চারিটি স্তর নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে।

প্রথম স্তরে অভিরাম স্বামী প্রভৃতির পরিচয় পাই। সমাজের অত্যুন্নত অবস্থায় ওরূপ ব্রাহ্মণেও উপকার সম্ভব। ঐ সকল ব্রাহ্মণ প্রথমতঃ বিশেষ চরিত্রবান্ না হইলেও ক্রমশঃ সাধনবলে উন্নত হইয়াছিল।

দ্বিতীয় স্তরে মাধবাচার্য্য প্রভৃতির সাক্ষাৎ পাই। ইঁহারা পরম জ্ঞানী, কিন্তু স্বয়ং কৃতী, বা কর্ম্মে ব্রতী নহেন। পরন্তু অপরের দ্বারা কর্ম্ম করাইয়া লয়েন। তাঁহার পুস্তকের দ্বিতীয় স্তরেই ইঁহাদের দেখিতে পাই। সমাজের উন্নতি সামাজিক লোক দ্বারা সাধনীয়। তাই মাধবাচার্য্য হেমচন্দ্রকে লইয়া দেশরক্ষায় প্রবৃত্ত।

তৃতীয় স্তরে আমরা সত্যানন্দ প্রভৃতির সাক্ষাৎ পাইলাম। ইঁহারা জ্ঞানী

আমাদিগের অধিক উপকার করিতে পারেন। কারণ, সংসারী জীব সংসারত্যাগী ব্রাহ্মণের কর্ম্মের আদর্শ অনেক স্থলে গ্রহণ করিতে পারে না। তাই দ্বিতীয় স্তরে ব্রাহ্মণগণ কর্ম্মের জন্য পরমুখাপেক্ষী। কিন্তু ধর্ম্মজীবনে এরূপ কার্য্যে কোনও আপত্তি নাই। আমরাও তৃতীয় স্তরের পুস্তকে ইঁহাদের অধিক সাক্ষাৎ পাইয়াছি। ভবানী পাঠক, চন্দ্রচূড় এই স্তরে।

চতুর্থ স্তরে নিষ্ক্রিয় জ্ঞানস্বরূপ ব্রাহ্মণপণ্ডিতের অবতারণা দেখিলাম। সত্যানন্দের গুরু প্রভৃতি।

বঙ্কিম বাবুর শেষ স্তরে আমরা কৃষ্ণচরিত্র প্রভৃতি পুস্তক দেখিয়াছি। ঈশ্বরের মানবিকতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য তিনি ঐ পুস্তকের প্রণয়ণ করেন। শ্রীকৃষ্ণকে তিনি ভগবান—ঈশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, এ কথা তিনি উক্ত পুস্তকের মুখবন্ধে বলিয়া গিয়াছেন। তবে ইহা বিশ্বাসের কথা। তাই যদি কেহ তাহা বিশ্বাস না করেন, তাহা হইলে যুক্তিমার্গ অবলম্বন করিলেও শ্রীকৃষ্ণ আদর্শপুরুষ, এরূপ স্বীকার করা যাইতে পারে। তিনি তাহাই বুঝাইলেন। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্বে বিশ্বাস করিবেন, তাঁহাদের জন্য উক্ত পুস্তক রচিত হয় নাই, ইহা বলাই বাহুল্য। ইংরাজীতে Theology ও Religion বলিয়া দুইটি বিজ্ঞান আছে। সংস্কৃতে সে পার্থক্য নাই, আমাদের দর্শনই সমস্ত। ধর্ম্মতত্ত্বই আমাদের বঙ্গভাষার Theology।

যিনি আচার্য্যের স্থান অধিকার করিয়া আমাদিগকে শিক্ষা দিবেন, তাঁহাকে প্রাচীন ভারতের ব্রাহ্মণের ন্যায় একাধারে সমস্তই হইতে হইবে। আচার্য্য বঙ্কিমের নিজের শিক্ষা হইতে আমরা পূর্ব্বোদ্ধৃত ঐরূপ বাক্যের সার্থকতা উপলব্ধি করিতে পারি। বঙ্কিমবাবু একাধারে সবই ছিলেন—দার্শনিক, নীতিবেত্তা, ঐতিহাসিক, স্বদেশপ্রেমিক, ধর্ম্মাচার্য্য, ঔপন্যাসিক, সমাজ-সংস্কারক, তিনি সবই ছিলেন।

কবির শ্রেষ্ঠ দুইটি লক্ষণ আছে। সৌন্দর্য্যের অনুভূতি এবং অনুভূত সৌন্দর্য্য ভাষায় প্রকাশ করিবার ক্ষমতা। এই দুইটি বঙ্কিম বাবুর প্রচুরপরিমাণে ছিল। জগতে সাধারণতঃ চারি প্রকারের লোক দেখা যায়। কেহ সৌন্দর্য্য অনুভব করিয়া তাহা ভাষায় প্রকাশ করিতে পারেন। কেহ অনুভব করিলেও প্রকাশ করিতে পারেন না। কাহারও রচনার ক্ষমতা থাকিলেও সৌন্দর্য্য অনুভব করিবার ক্ষমতা থাকে না। কাহারও উভয়ই নাই। বঙ্কিমবাবুর

আমি নিজে যাহা বুঝিতে পারি, পরকে তাহা বুঝাইতে পারি না।" বঙ্কিমবাবুর এতদুভয়ই ছিল। তিনি কবির চক্ষে রূপও দেখিতেন, এবং কবির ভাষায় বর্ণনাও করিতে পারিতেন। তিলোত্তমা, আয়েসা, কপালকুণ্ডলা প্রভৃতির বর্ণনায় তাহার আমরা যথেষ্ট পরিচয় পাইয়াছি। বাহুল্যভয়ে তত্তৎস্থল উদ্ধৃত করিলাম না। পদ্যের যেমন ছন্দ নির্ণীত হয়, গদ্যেরও বুঝি তেমনই আছে। এমন কি, পদ্যের যতির ন্যায় গদ্যের ছেদগুলি যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট না হইলে বুঝি পাড়তে কষ্ট হয়। বঙ্কিমবাবুর যে পুস্তকের যেখানে পড়ি না কেন, একটা বিশেষত্ব অনুভব করি। ইহাই তাঁহার রচনার ছন্দ।

ধ্বনির সহিত ভাবের একটি সুন্দর সম্বন্ধ আছে। যেখানে গম্ভীর দুর্দ্দমনীয়তাসূচক ভাব প্রকাশ করিতে হইবে, সেখানে একটু শ্রুতিকঠোর যুক্তাক্ষরপূর্ণ শব্দ ব্যবহার করিলে ভাব সুস্পষ্ট হইয়া থাকে। আর সুললিত সরল ভাব প্রকাশ করিতে হইলে কোমলধ্বন্যাত্মক শব্দ ব্যবহার করিতে হয়। বঙ্কিমবাবু ধ্বনি এবং ভাবের এই সম্বন্ধ বেশ বুঝিতেন। তাঁহার রচনায় ইহার দৃষ্টান্ত পাই।

উত্তাল তরঙ্গসঙ্কুল বারিধি-বর্ণনায় বঙ্কিম বাবু লিখিলেন,—

"গম্ভীর জলকল্লোল তাঁহার কর্ণপথে প্রবেশ করিল। তিনি বুঝিলেন, এ সাগরগর্জ্জন। ক্ষণকাল পরে অকস্মাৎ বনমধ্য হইতে বহির্গত হইয়া দেখিলেন যে, সম্মুখেই সমুদ্র। অনন্তবিস্তার নীলাম্বুমণ্ডল সম্মুখেই দেখিয়া উৎকটানন্দে হৃদয় পরিপ্লুত হইল। সিকতাময় তটে গিয়া উপবেশন করিলেন। ফেনিলে নীল অনন্ত সমুদ্র। উভয় পার্শ্বে যত দূর চক্ষু যায়, তরঙ্গভঙ্গপ্রক্ষিপ্ত ফেনার রেখা স্তূপীকৃত বিমলকুসুমদামগ্রথিত মালার ন্যায় সে ধবল ফেনরেখা হেমকান্ত সৈকতে ন্যস্ত হইয়াছে, কাননকুন্তলা ধরণীর উপযুক্ত অলকাভরণ। নীলজলমধ্যে সহস্র স্থানেও সফেন তরঙ্গভঙ্গ হইতেছিল।"

গম্ভীরনাদী বারিধির সৌন্দর্য্যে কি একটা উৎকট আনন্দ উদ্ভূত হয়, তাহাতে কি একটা ভয়ানকত্ব আছে, তাহা ভাষায় কেমন সুন্দর প্রকাশিত দেখিলাম।

আর একটি বর্ণনা শুনুন,—

"এক পারে উদয়গিরি, অপর পারে ললিত গিরি, মধ্যে স্বচ্ছসলিলা কল্লোলিনী নদী নীল বারিরাশি লইয়া সমুদ্রাভিমুখে চলিয়াছে। গিরিশিখরদ্বয়ে

রঞ্জিত পৃথ্বী অতিশয় মনোমোহিনী দেখা যায়। শিশু যেমন মার কোলে উঠিলে মাকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী দেখে, মনুষ্য পর্ব্বতারোহণ করিয়া পৃথিবী দর্শন করিলে তেমনি দেখে। উদয়গিরি বৃক্ষরাজিপরিপূর্ণ, কিন্তু ললিতগিরি বৃক্ষশূন্য, প্রস্তরময়। * * * চারি দিকে যোজনের পর যোজন ব্যাপিয়া হরিদ্বর্ণ ধান্যক্ষেত্র। মাতা বসুমতীর অঙ্গে বহুযোজনবিস্তৃতা পীতাম্বরী শাটী।"

এ বর্ণনায় কি একটা শান্তিময়ী সৌন্দর্য্যময়ী মাতৃস্বভাবসুলভ কোমলতা অনুভব করি, তাহা ভাষায় বুঝান চলে না। ইহাই ভাষার উপর আধিপত্যের প্রমাণ। একই বিষয় বিভিন্ন বাক্য ও ভাব দ্বারা প্রকাশ করিবার তাঁহার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। ভাষার উপর আধিপত্যের ইহা অন্যতম প্রমাণ।

নগেন্দ্রনাথ বলিতেছেন,—

"সূর্য্যমুখী কি আমার স্ত্রী? সূর্য্যমুখী আমার সব। সম্বন্ধে স্ত্রী, সৌহার্দ্যে ভ্রাতা, যত্নে ভগিনী, আপ্যায়িত করিতে কুটুম্বিনী, স্নেহে মাতা, ভক্তিতে কন্যা, প্রমোদে বন্ধু, পরামর্শে শিক্ষক, পরিচর্য্যায় দাসী। আমার সূর্য্যমুখী এমন কাহার ছিল; সংসারে সহায়, গৃহে লক্ষ্মী, হৃদয়ে ধর্ম্ম, কণ্ঠে অলঙ্কার, আমার নয়নের তারা, হৃদয়ের শোণিত, দেহের জীবন, জীবনের সর্ব্বস্ব, আমার প্রমোদে হর্ষ, বিষাদে শান্তি, চিন্তায় বুদ্ধি, কার্য্যে উৎসাহ, আর এমন সংসারে কি আছে? আমার দর্শনে আলোক, শ্রবণে সঙ্গীত, নিশ্বাসে বায়ু, স্পর্শে জগৎ, আমার বর্ত্তমানে সুখ, অতীতের স্মৃতি, ভবিষ্যতের আশা।"

জগতের বস্তুনিচয় হইতে তিল তিল গ্রহণ করিয়া তিলোত্তমার সৃষ্টি হইয়াছিল। আর উপরে আমরা জড় ও মানসিক জগতের সৌন্দর্য্যসমুদ্রমন্থনসম্ভূত বঙ্কিমবাবুর মানসপ্রতিমা তিলোত্তমা দেখিলাম। সীতারামে নন্দার গুণবর্ণনায়, চন্দ্রশেখরে শৈবলিনীর উন্মত্তাবস্থার উক্তিতে ইহার অন্য দৃষ্টান্ত আমরা পাইয়াছি। বাহুল্যভয়ে উদ্ধৃত হইল না।

এক একটা কথার একটা শক্তি আছে। আমরা অনেক সময় দেখিয়াছি, অনেক স্থলে কোনও একটি বিশেষ শব্দের অভাবে সমস্ত বাক্যটির তাদৃশ শক্তি জন্মিল না। পরন্তু সেই একটি শব্দ ব্যবহৃত হইলেই সেখানকার ভাবটি বেশ ফুটিয়া উঠিত। অন্য কোনও শব্দে সেরূপ উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। বঙ্কিমবাবু বাক্যের শক্তি বুঝিতেন। একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা কথাটি বুঝাইব।

সীতারাম জয়ন্তীকে প্রকাশ্য দরবারে চণ্ডালের দ্বারা বিবস্ত্রা করিয়া বেত্রা-

"জয়ন্তী অপরিম্লানমুখে জনসমারোহকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, রাজাজ্ঞায় এই মঞ্চের উপর বিবস্ত্রা হইব। তোমাদের মধ্যে যে 'সতীপুত্র' হইবে, সেই আপনার মাতাকে স্মরণ করিয়া ক্ষণকাল জন্য এখন চক্ষু আবৃত করুক।"

"সতীপুত্র" কথাটির পরিবর্ত্তে এখানে "ভদ্রসন্তান" "ধর্ম্মাত্মা" প্রভৃতি বাক্যে জয়ন্তীর উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে না। জয়ন্তী এখানে জনসমারোহের মনে মাতৃভাব উদ্দীপিত করিবার ইচ্ছা করিয়াছিল। আমরা গীতায় দেখিয়াছি—অর্জ্জুনকে "পার্থ" "ধনঞ্জয়" প্রভৃতি শব্দে অভিহিত করায় এমনই একটা উদ্দেশ্য কল্পিত হইয়া থাকে।

রূপবর্ণনায় হাস্যরসের অবতারণা আমরা "আশমানী"র বর্ণনায় দেখিয়াছি।

আজকাল এক প্রকারের বিলাতী চিত্র দেখিতে পাই। সেগুলিতে কোনও ব্যক্তিবিশেষের মনের ভাব বা অবস্থাবিশেষ চিত্রিত হয়। তূলিকা-সাহায্যে ভাবটি অল্পে অল্পে ফুটাইয়া দেওয়া হয়। সেই ভাবের নামে তত্তৎ চিত্রের নামকরণ হইয়া থাকে। যথা reverie, day dream, forget me not। আমাদের দেশে এখনও এরূপ চিত্রকর জন্মেন নাই যে, তূলিকা-সাহায্যে মনের ভাবগুলি আঁকিয়া লইতে পারেন। নতুবা তিনি দেখিতেন, বঙ্কিমবাবু ভাষায় ভাবগুলি যথাযথ অঙ্কিত করিয়া তাঁহার জন্য উপাদান সংগ্রহ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। প্রকৃতিপালিতা সরলতা মূর্ত্তি কপালকুণ্ডলায়। মনোরমা-বর্ণনায় আমরা প্রথমে মোহিনীমূর্ত্তি দেখিয়াছি, পরে যথাক্রমে তাহার চিন্তাশালিনী গম্ভীরা মূর্ত্তি, পরে কুপিতা মূর্ত্তি দেখিয়াছি। কুটিলতা-মূর্ত্তি হীরায় দেখিয়াছি। কে জানে, আমাদের কবে সেদিন আসিবে, যেদিন তূলিকাসাহায্যে ঐ ভাবগুলি ছবিতে আঁকিতে পারিব।

ইহা ব্যতীত বঙ্কিমবাবুর অপর একটি অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। কঠিন দার্শনিক তত্ত্বগুলির তিনি অতি সহজ কথায় ব্যাখ্যা করিতে পারিতেন।

"শ্যামা সুন্দরী বলিলেন, 'বল দেখি ফুলটি ফুটিলে কি সুখ?'

"মৃণ্ময়ী উত্তর করিলেন, 'লোকের দেখে সুখ, ফুলের কি?'"

সমালোচক বঙ্কিম বাবু এই অবসরে বলিয়া লইলেন, "ফুলের ফুটিয়াই সুখ। পুষ্পরস পুষ্পগন্ধ বিতরণই তাহার সুখ। আদান প্রদানই পৃথিবীর সুখের মূল। তৃতীয় অর্থ নাই।"

দণ্ড দিবার আমি কে? আমার পাপ পুণ্যের যিনি দণ্ড পুরস্কার করিবেন, রোহিণীর তিনি বিচারকর্ত্তা। বলিতে পারি না, হয় ত তিনিই আমাকে এ কার্য্যে নিয়োজিত করিয়াছেন। কি জানি,

"ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।"

ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

যিনি লোকশিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত, তাঁহার এই শক্তির অত্যন্ত প্রয়োজন। কারণ, সহজ কথায় না বলিলে সাধারণ লোকে এ সকল জটিলতত্ত্ব বুঝিতে পারে না। বঙ্কিম বাবুর এ ক্ষমতা তাঁহার বিশেষত্ব।

আজকাল রুচির একটা ধূয়া উঠিয়াছে। সে সম্বন্ধেও দুই একটা কথা বলিতে হয়। যত দূর অবগত আছি, বঙ্কিম বাবুই ইহার মূল। প্রায় ২৭ বৎসর পূর্ব্বে দীনবন্ধু বাবুর জীবনবৃত্ত লিখিবার সময় তিনি এ বিষয়ের অবতারণা করেন। কিন্তু দীনবন্ধুর রচনার সমালোচনা উপলক্ষে তিনি রুচির একটিমাত্র প্রকার দেখাইয়া গিয়াছেন। কুরুচি দুই প্রকারের হইতে পারে। ভাষাগত কুরুচি, এবং ভাবগত কুরুচি। শুদ্ধ অশ্লীল বা অসভ্যোচিত বা কুশ্রাব্য বাক্য ব্যবহার করাই ভাষাগত কুরুচি। আর ভাষা মার্জ্জিত হউক বা নাই হউক, তাহাতে মনে অশ্লীল বিকৃত আদিরসাত্মক ভাব সঞ্জাত হইলে তাহাকে ভাবগত কুরুচি বলা যাইতে পারে। ভাষার কুরুচি প্রায়ই শুনিতে খারাপ, বা সভ্যসমাজের অনুপযুক্ত। ভাবের কুরুচি প্রায়ই হৃদয়ে কুভাবের উদ্দীপন করে। আর হৃদয়ের ভাবই ইচ্ছারূপে পরিণত হইয়া আমাদিগকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করে। অনেকে বলিবেন যে, ভাষাগত কুরুচিরও এইরূপ শক্তি আছে। আমরা বলিব যে, তত্তৎস্থলে তাহা ভাষা ও ভাব গত উভয়বিধ কুরুচি। তোরাপের উক্তিগুলি বেশ মার্জ্জিত, বা সধবার একাদশী সকল স্থলেই বিশুদ্ধ-রুচিপূর্ণ, এমন কথা আমরা বলিতেছি না। কিন্তু ঐগুলি শুধু ভাষাগত। তোরা-পের মুখে বেদীর উপর উপবিষ্ট উপাচার্য্যের Sermen শুনিলে রুচিবিলাসী হয় ত সন্তুষ্ট হইবেন। কিন্তু তাহাও অতিশয় অস্বাভাবিক হইবে। বঙ্কিম বাবু নিজেই বলিয়াছেন, "রুচির মুখ রক্ষা করিতে গেলে ছেঁড়া তোরাপ, কাটা আদুরী, ভাঙ্গা নিমচাঁদ পাইতাম।" আর ইংরাজী শিক্ষার দোষে দেশে কিরূপ কুরুচির স্রোত বহিয়াছিল, তাহারই যথাযথ চিত্র সধবার একাদশী;

ভাষার অবতারণার একটা কৈফিয়ৎ পাই। বঙ্কিম বাবুর রচনার ভাষা সর্ব্বত্রই পরিমার্জ্জিত, সুসংস্কৃত; কিন্তু ভাবগত কুরুচি দুই এক স্থানে রহিয়া যায় নাই, এমন বলিতে পারি না। রোহিণীর বারুণীতে কলসী পূর্ণ করিবার বর্ণনায়, তাহার জলে ডুবিয়া মৃতকল্প হইবার পর মুখে মুখ দিয়া ফূৎকার-প্রদানে জল বাহির করিবার বর্ণনায়, শান্তির সাহেবের সহিত একত্র অশ্বারোহণের চিত্রে, বিমলার দিগ্‌গজ্ ও কতলু খাঁর সহিত ব্যবহারের সময়, ইন্দিরার তথাকথিত অভিসার-গমনবর্ণনায়, হীরা দেবেন্দ্রের মিলনচিত্রে আমাদের মনে স্বতঃ একটু কুভাব জাগিয়া উঠে। কেহ বলিতে পারেন, ইহা আমাদের মনের দোষ। হইতে পারে। কিন্তু উক্ত রচনাগুলিই মনে কুভাব উদ্দীপিত হইবার নিমিত্ত কারণ, তাহাও অস্বীকার করা চলে না। এবং বাঙ্গলা অন্য উপন্যাসে, যেমন রমেশ বাবুর পুস্তকগুলিতে, আমরা দেখিতে পাই, আমাদের মনের তথাকথিত নৈসর্গিক দোষগুলি প্রকাশিত হইবার অবসর পায় না। প্রকৃতি সুন্দরী বুঝি বড়ই ঈর্ষ্যাবতী, তাই "বাঁকা চাঁদেও" ক্ষুদ্র কলঙ্ক রহিয়া গিয়াছে!

উপরে আমরা কি দেখিলাম? আমরা দেখিয়াছি যে, পতিত দেশের উদ্ধারের জন্য এক জন মহাপুরুষের আবির্ভাবের অত্যন্ত প্রয়োজন হইয়াছিল। সেই অত্যন্ত প্রয়োজনের ফল বঙ্কিম বাবু। স্বয়ং আচার্য্যের শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া তিনি শিক্ষকদল ও সাহিত্য গঠন করিয়া লইয়া উপন্যাসাকারে আমাদের জীবনের সমস্যাগুলি বুঝাইয়া দিয়া কর্ত্তব্যনির্দ্ধারণ করিয়াছেন। এই শিক্ষা ত্রিবিধ; প্রথম, সংসারিক সুখের স্বরূপনির্ণয়; দ্বিতীয়, হিন্দুধর্ম্মসাধনের উপায়নির্দ্দেশ; তৃতীয়, জন্মভূমির উন্নতিসাধনের পন্থা-নিরূপণ। তাই তিনি বুঝাইলেন, স্থায়ী সাংসারিক সুখ লাভ করিতে হইলে নিষ্কামভাবজ প্রেম জন্মাইতে হইবে। কোন প্রণালী অবলম্বন করিলে সে প্রেম জন্মিবে, সেই হিন্দুমার্গচ্যুত হইলে কিরূপে সর্ব্বনাশ ঘটিতে পারে, আমাদের নরনারী-জীবনের প্রকৃত আদর্শ ও কর্ত্তব্য কি, তাহা তিনি কেমন সুন্দরভাবে বিবৃত করিয়াছেন। সামাজিক উন্নতি করিতে হইলে নরনারীকে শিক্ষা দেওয়া অত্যন্ত আবশ্যক। ধর্ম্মের উন্নতি আমাদিগকে স্বয়ং করিয়া লইতে হইবে। তিনি বলিয়াছেন, "হিন্দুকে হিন্দু না রাখিলে কে রাখিবে।" আমাদের উন্নতি বিদেশবাসী বিধর্ম্মীদের অনুগ্রহসাপেক্ষ হইলে হইবে না। ধর্ম্মবলে আমাদের বলীয়ান হইতে হইবে। কিন্তু হিন্দুর প্রত্যেক কার্য্যই ধর্ম্মের অঙ্গীভূত সুতরাং নৈতিক উন্নতি আমাদের ধর্ম্মজীবনলাভের প্রথম সোপান। হিন্দুর হিন্দুধর্ম্ম অপেক্ষা একটা

শ্রেষ্ঠতর ধর্ম্ম আছে; সেটা জন্মভূমিধর্ম্ম। এই ধর্ম্মের উন্নতিকল্পে সমস্ত অন্তর্বিবাদ ভুলিয়া আমাদের দেশের সকল সন্তানের সহিত মিলিত হইতে হইবে। সাধন নহিলে এ সিদ্ধি হইবে না। জন্মভূমিসেবাব্রত এ সাধনের প্রথম সোপান। তাহাতে একতা জন্মিবে। হিন্দুকে সেই শিক্ষা দিবার জন্য গুরুর প্রয়োজন। এই জন্য ব্রহ্মভক্ত, ব্রহ্মনিষ্ঠ কর্ম্মবীর ব্রাহ্মণের প্রয়োজন। এরূপ সাধনা করিলে আমরা যুগপৎ সাংসারিক সুখ ও ধর্ম্মের বিমল শান্তি লাভ করিয়া স্বদেশের উন্নতি করিতে পারিব।

এখন আমরা যদি বঙ্কিম বাবুর উপদিষ্ট শিক্ষাগুলি গ্রহণ করিয়া তন্নির্দ্দিষ্ট পথে বিচরণ করিতে পারি, তাহা হইলে আবার আমাদের অতীত গৌরব ফিরাইতে পারিব। আবার শ্রেষ্ঠজাতিগণমধ্যে শ্রেষ্ঠতম হইতে পারিব।

শ্রীহেমচন্দ্র বসু।

গীতায় ঈশ্বরবাদ।

৮। পাতঞ্জল ও গীতা।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রবন্ধে ন্যায়, বৈশেষিক, মীমাংসা ও সাংখ্যদর্শনের সহিত গীতার সম্বন্ধের আলোচনা করিয়াছি; বর্ত্তমান প্রবন্ধে পাতঞ্জলদর্শনের সহিত গীতার সম্বন্ধ আলোচিত হইবে।

পাতঞ্জলদর্শনের প্রণেতা ভগবান্ পতঞ্জলি। পাতঞ্জলদর্শনে সর্ব্বসমেত ১৯৫টি সূত্র আছে। এই দর্শন চারি পাদে বিভক্ত; ইহাদের নাম যথাক্রমে—সমাধিপাদ, সাধনপাদ, বিভূতিপাদ ও কৈবল্যপাদ। পাতঞ্জলদর্শনের এক প্রাচীন ও প্রামাণিক ভাষ্য প্রচলিত আছে। দার্শনিকসমাজে ইহা "ব্যাসভাষ্য" নামে পরিচিত। বাচস্পতি মিশ্র, "তত্ত্ববৈশারদী" নামে এবং বিজ্ঞানভিক্ষু "যোগবার্ত্তিক" নামে ঐ ব্যাসভাষ্যের উৎকৃষ্ট টীকা রচনা করিয়াছেন। পাতঞ্জলদর্শনের ভোজরাজ-কৃত এক সংক্ষিপ্ত ও উপাদেয় বৃত্তি প্রচলিত আছে। এ সম্পর্কে বিজ্ঞানভিক্ষুর "যোগসারসংগ্রহ"ও উল্লেখযোগ্য।

পাতঞ্জলদর্শনের একটি নাম সাংখ্যপ্রবচন। তাহার কারণ এই যে, ভগবান্ পতঞ্জলি সাংখ্যদর্শনের প্রবর্ত্তক মহর্ষি কপিলের দার্শনিক সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ ও অঙ্গীকার করিয়াছেন। সাংখ্যোক্ত পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব (পুরুষ, প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্র, একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ মহাভূত) এ দর্শনে স্বীকৃত হইয়াছে (১)। কিন্তু পতঞ্জলি এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের উপর আর

---

(১) "পাতঞ্জলদর্শনে সাংখ্যদর্শনোক্ত পদার্থাবলী অবলম্বিত হইয়াছে। অধিকন্তু সাংখ্যদিগের অনঙ্গীকৃত ও প্রত্যাখ্যাত ঈশ্বর পাতঞ্জলদর্শনে অঙ্গীকৃত ও সমর্থিত হইয়াছেন।" —মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার কৃত হিন্দুদর্শন; প্রথম ভাগ; ৩২১ পৃষ্ঠা এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, ব্রহ্মসূত্রে সাংখ্যমতের নিরাস করিয়া সূত্রকার লিখিয়াছেন,—অনেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ, অর্থাৎ, ইহার দ্বারা যোগদর্শনও নিরাকৃত হইল। এরূপ বলার তাৎপর্য্য এই যে, যোগদর্শনে যখন সাংখ্যোক্ত পদার্থাবলী অবলম্বিত হইয়াছে, তখন সাংখ্যনিরাস দ্বারাই, পাতঞ্জলও নিরাকৃত হইল। এই সূত্রের ভাষ্যে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,—"এতেন সাংখ্যস্মৃতিপ্রত্যাখ্যানেন যোগস্মৃতিরপি প্রত্যাখ্যাতা দ্রষ্টব্যা ইত্যতিদিশতি তত্রাপি শ্রুতিবিরোধেন প্রধানং স্বতন্ত্রমেব কারণং মহদাদীনি চ কার্য্যানি অলোক-

একটি অধিক তত্ত্বের প্রচার করিয়াছেন। সে তত্ত্ব ঈশ্বর। ঈশ্বর সাংখ্যোক্ত পুরুষ নহেন (২); তিনি পুরুষবিশেষ। সেই জন্য নিরীশ্বর সাংখ্যদর্শন হইতে পাতঞ্জলদর্শনকে পৃথক করিবার জন্য ইহাকে সেশ্বর সাংখ্য বলা হয়। বস্তুতঃ, পাতঞ্জলদর্শন হইতে ঈশ্বরতত্ত্ব ও চিত্তনিরোধের উপায়ের প্রসঙ্গ উঠাইয়া লইলে সাংখ্যদর্শন হইতে পাতঞ্জলদর্শন বিশেষিত করিবার কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। (৩)

এই ঈশ্বরতত্ত্ব কি? পতঞ্জলি ঈশ্বরের এইরূপ লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—

ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ। [১।২৪]

তত্র নিরতিশয়ং সর্ব্বজ্ঞবীজং। [১।২৫]

স এষ পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ। [১।২৬]

'যে পুরুষ-বিশেষ ক্লেশ, কর্ম্ম, বিপাক ও আশয়ের সম্পর্কশূন্য, তিনিই ঈশ্বর।'

'তাঁহাতে জ্ঞানের চরম উৎকর্ষ। তিনি সর্ব্বজ্ঞ।'

'তিনি (ব্রহ্মাদি) পূর্ব্ব আচার্য্যগণেরও গুরু; কারণ, তিনি কালের অতীত।'

সাধারণ পুরুষ ক্লেশ, কর্ম্ম, বিপাক ও আশয়ের সম্পর্কযুক্ত। ক্লেশ পাঁচ প্রকার;—অবিদ্যা (মিথ্যা জ্ঞান), অস্মিতা, (বিভিন্ন বস্তুতে অভেদপ্রতীতি), রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ (মরণভয়), কর্ম্ম = সুকৃত ও দুষ্কৃত (পাপ পুণ্য);

বেদপ্রসিদ্ধানি করাতে। এ সম্বন্ধে ম্যাক্সমূলর লিখিয়াছেন,—The Sankhya is always presupposed by the Yoga and Yoga is indeed as the Brahmans say, sankhya only modified, particularly in one point, namely in its attempt to develop and systematise an ascetic discipline by which concentration of thought could be attained and by admitting devotion to the Lord as part of that discipline.—Indian Philosophy p. 409 and p. 417.

(২) ব্যাসভাষ্যে ঈশ্বরের প্রসঙ্গ এইরূপে উত্থাপিত হইয়াছে,—"অথ প্রধানপুরুষব্যতিরিক্তঃ কোঽয়ং ঈশ্বরো নাম।" অর্থাৎ এই যে ঈশ্বর, যিনি প্রকৃতি ও পুরুষ হইতে স্বতন্ত্র, তিনি কে?

(৩) If we took away these two characteristic features of the Yoga, the wish to establish the existence of an Isvara against all comers, and to teach the means of restraining the affections and passions of the soul, as a preparation for true knowledge, such as taught by the Sankhya Philosophy, little would seem to remain that is peculiar to Patanjali.—MaxMuller's Indian Philosophy. pp. 412-13

বিপাক = কর্ম্মফল। কর্ম্মের ফল ত্রিবিধ ;—জন্ম, আয়ু ও ভোগ। আশয় = বিপাকের অনুরূপ সংস্কার। সাধারণ পুরুষ এই সকলের সংস্রব এড়াইতে পারে না। অবশ্য মুক্ত পুরুষে ক্লেশাদির কোনরূপ সম্পর্ক থাকে না; কিন্তু মুক্তির পূর্ব্বে তিনিও ক্লেশাদির অধীন ছিলেন। কিন্তু পুরুষবিশেষ ঈশ্বরে কোনকালেও ক্লেশাদির সংস্পর্শ ছিল না। কারণ, তিনি নিত্যমুক্ত। পুরুষ (জীব) যেমন বহু, পুরুষবিশেষ (ঈশ্বর) সেরূপ বহু নহেন। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। ঈশ্বর কালের দ্বারা অবচ্ছিন্ন নহেন। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান, ত্রিকালেরই তিনি অতীত। এই যে ব্রহ্মা, মনু, সপ্তর্ষি প্রভৃতি কল্প মন্বন্তরের প্রারম্ভে শাস্ত্রাদির উপদেশ প্রচার করেন, তাঁহারা সে শাস্ত্রজ্ঞান কোথা হইতে পাইলেন? ঈশ্বরের নিকট হইতে। এই জন্য তাঁহাকে পূর্ব্ব গুরুগণেরও গুরু বলা হইয়াছে।

জগতে পরিমাণের তারতম্য দৃষ্ট হয়। ক্ষুদ্র জলাশয় অপেক্ষা নদীর পরিমাণ বৃহৎ, আবার নদীর অপেক্ষা সমুদ্রের পরিমাণ বৃহৎ। এইরূপ জ্ঞানেরও কমবেশী আছে। মূর্খের অপেক্ষা পণ্ডিতের, এবং পণ্ডিতের অপেক্ষা সুপণ্ডিতের জ্ঞান অধিকতর। যাঁহাতে জ্ঞান পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে, যাঁহাতে জ্ঞানের মাত্রা চরমসীমায় উপনীত হইয়াছে, যিনি সর্ব্বজ্ঞ, তিনিই ঈশ্বর।

অতএব, পাতঞ্জলদর্শনের মতে, তত্ত্ব ২৫টি নহে, ২৬টি। কিন্তু ঐ সকল তত্ত্বের আলোচনা এ দর্শনের মুখ্য বিষয় নহে—ইহারা গৌণ প্রতিপাদ্য মাত্র, আনুষঙ্গিক বা অবান্তর কথা। যোগই পাতঞ্জলদর্শনের মুখ্য বিষয়; সেই জন্যই ইহার অপর নাম যোগদর্শন। বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন,—"ন চৈতানি প্রধানাদিসদ্ভাবপরাণি কিন্তু যোগস্বরূপ-তৎসাধন-তদবান্তরফলং বিভূতি-তৎপরমফলকৈবল্যব্যুৎপাদনপরাণি।" অর্থাৎ, যোগশাস্ত্রের প্রধানাদির প্রতিপাদন মুখ্য বিষয় নহে, কিন্তু যোগের স্বরূপ, সাধন, গৌণ ফল বিভূতি ও মুখ্য ফল কৈবল্যের নিরূপণই যোগশাস্ত্রের তাৎপর্য্য বিষয়।

যোগশাস্ত্রের চারি পর্ব্ব,—হেয়, হেয়হেতু, হান ও হানোপায়। অন্যান্য দর্শনের মত পতঞ্জলদর্শনেরও মতে সংসার দুঃখময়; অতএব হেয়। (দুঃখমেব সর্ব্বং বিবেকিনঃ। হেয়ং দুঃখম্ অনাগতম্। ২।১৫—১৬)। সংসারের নিদান কি? প্রকৃতি পুরুষের সংযোগ; (দৃগ্ দৃশ্যয়োঃ সংযোগো হেয়হেতুঃ)। এই সংসারের অত্যন্ত উচ্ছেদ সম্ভবপর; ইহারই নাম হান। (তদভাবাৎ

সংযোগাভাবো হানং তদ্দৃশেঃ কৈবল্যম্। ২—২৫)। এই হানের উপায় কি? প্রকৃতি পুরুষের নিশ্চল ভেদজ্ঞান (বিবেকখ্যাতিঃ অবিপ্লবা হানোপায়ঃ —২।২৬] (৪)

এই যে প্রকৃতি পুরুষের নিশ্চল ভেদজ্ঞান, যাহা পাতঞ্জলমতে মোক্ষলাভের অদ্বিতীয় পন্থা, সে জ্ঞান অর্জ্জন করিবার উপায় কি? সাংখ্যেরা বলেন যে, তাঁহাদের আবিষ্কৃত পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের সহিত পরিচিত হইতে পারিলেই সেই সম্যগ্‌জ্ঞান লাভ করা যায়। পাতঞ্জলের মতে, সে পরিচয় যথেষ্ট নহে। সেই জন্যই যোগশাস্ত্রের অবতারণা। কারণ পাতঞ্জলির মতে প্রকৃতি পুরুষের নিশ্চল ভেদজ্ঞান-লাভের একমাত্র উপায়—যোগ (৫)। এই যোগ কি?

যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ।

'চিত্তবৃত্তিনিরোধের নাম যোগ।' চিত্তের পাঁচটি অবস্থা লক্ষিত হয়। ক্ষিপ্ত (যখন রজোগুণের আধিক্যে চিত্ত বিশেষ চঞ্চল থাকে), মূঢ় (যখন তমোগুণের আধিক্যে চিত্ত মোহাচ্ছন্ন থাকে), বিক্ষিপ্ত (যখন সত্ত্বগুণের

---

(৪) যথা চিকিৎসাশাস্ত্রং চতুর্ব্যূহং রোগঃ রোগহেতু আরোগ্যং ভৈষজ্যমিতি এবমিদমপি শাস্ত্রং চতুর্ব্যূহমেব, তদ্ যথা সংসারঃ সংসারহেতুঃ মোক্ষঃ মোক্ষোপায় ইতি। তত্র দুঃখবহুলো সংসারঃ হেয়ঃ, প্রধানপুরুষয়োঃ সংযোগো হেয়হেতুঃ, সংযোগস্যাত্যন্তিকী নিবৃত্তির্হানং, হানোপায়ঃ সম্যগ্‌দর্শনম্।—২।১৫ সূত্রের ব্যাসভাষ্য।

অর্থাৎ, "যেমন চিকিৎসাশাস্ত্র রোগ, নিদান, আরোগ্য ও ঔষধ, এই চারি অধ্যায়ে বিভক্ত, সেইরূপ যোগশাস্ত্রও চারি অধ্যায়ে বিভক্ত; যথা সংসার, সংসারের হেতু, মুক্তি ও মুক্তির উপায়; দুঃখবহুল সংসার হেয়, প্রকৃতি পুরুষের সংযোগ সংসারহেতু, সংযোগের অত্যন্তনিবৃত্তি হান। হানের উপায় সম্যগ্‌দর্শন।" ভগবান্ বুদ্ধদেব যে আর্য্য-সত্য-চতুষ্টয় প্রচার করিয়াছেন, যাহা বৌদ্ধধর্ম্মের মূল ভিত্তি, তাহা এই মতেরই প্রতিধ্বনি।

(৫) Granted that this discrimination, this subduing and drawing away of the Self from all that is not Self is the highest object of Philosophy. How it is to be reached? And even when reached, how is it to be maintained? By knowledge chiefly would be the answer of Kapila. By ascetic exercises delivering the Self from the fetters of the body and the bodily senses, adds Patanjali.—MaxMuller's Indian Philosophy. p. 407.

"The chief object it (Yoga) had in view was to realize the distinction between the experiencer and the experienced, or as we shbuld call it between the subject and object.—MaxMuller's Indian Philosophy. p. p. 465—66.

উদ্রেকে চিত্ত কখন স্থির, আবার কখন অস্থির হয়), একাগ্র (যখন ধ্যেয় বস্তুতে চিত্তের একতান প্রবাহ হয়) এবং নিরুদ্ধ (যখন বৃত্তির নিরোধ হইয়া বৃত্তিজনিত সংস্কারমাত্র অবশিষ্ট থাকে)। বিক্ষিপ্ত চিত্তকে "ক্রিয়াযোগের"(৬) দ্বারা একাগ্র করিতে হয়। তখন সাধক প্রকৃত যোগের অধিকারী হন। কারণ, একাগ্র ও নিরুদ্ধ চিত্তই যোগের উপযোগী।

চিত্তের বৃত্তি পাঁচ প্রকার,—প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি। (১।৬ সূত্র)। প্রমাণ ত্রিবিধ,—প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম। বিপর্য্যয়= মিথ্যাজ্ঞান। বিষয় না থাকিলেও শব্দজ্ঞানের প্রভাবে যে বৃত্তি উৎপন্ন হয়, তাহার নাম বিকল্প ; যেমন আকাশকুসুম, নরশৃঙ্গ। নিদ্রা=সুষুপ্তি। স্মৃতি=অনুভূত বিষয়ের স্মরণ। এই পাঁচ প্রকারের অতিরিক্ত আর চিত্ত-বৃত্তি নাই। এই চিত্তবৃত্তির নিরোধ করিতে হইবে। কারণ, চিত্তের সহিত পুরুষের সংযোগ হেতু চিত্তের সমস্ত বৃত্তি পুরুষে উপচরিত হয়। পুরুষ স্বচ্ছ, কেবল, নির্গুণ। যেমন স্বচ্ছ স্ফটিকের নিকটে রক্ত জবা আনিলে স্ফটিক রক্তবর্ণ ধারণ করে, আবার নীল অপরাজিতা আনিলে স্ফটিক নীলবর্ণ ধারণ করে ; বাস্তবিক স্ফটিকের কোনই বর্ণ নাই, তবে উপাধির বর্ণ তাহাতে প্রতিফলিত হয় মাত্র ; সেইরূপ, কেবল নির্ম্মল পুরুষে সুখ দুঃখ মোহ প্রভৃতি চিত্তবৃত্তি উপচরিত হইলে, পুরুষ তাহাদের সহিত তাদাত্ম্য (identificatiom) লাভ করিয়া নিজেকে সুখী দুঃখী মনে করে। বাস্তবিক, পুরুষের সুখ দুঃখ কিছুই নাই। ইহা কেবল বৃত্তির উপরাগমাত্র। যোগের দ্বারা চিত্ত-বৃত্তি নিরুদ্ধ হইলে আর পুরুষে বৃত্তির ছায়া নিপতিত হয় না। তখন পুরুষ নিজের স্বরূপে অবস্থিত থাকেন। "তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানং বৃত্তিসারূপ্যম্ ইতরত্র।" [১।৩—৪ সূত্র]।

এই চিত্তবৃত্তিনিরোধের প্রণালী কি ? পতঞ্জলি ভিন্ন ভিন্ন আট প্রকার

---

(৬) তপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ। [সাধনপাদ ১]

'তপস্যা, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বরপ্রণিধানকে ক্রিয়াযোগ বলে।' স্বাধ্যায়=ওঙ্কারাদি মন্ত্রজপ, বা মোক্ষশাস্ত্র-অধ্যয়ন। ঈশ্বরপ্রণিধান=ঈশ্বরে সমস্ত কর্ম্মের অর্পণ (ফল সন্ন্যাস)। সাধককে ক্রিয়াযোগ অবলম্বন করিতে হয় কেন ? সমাধিভাবনার্থঃ ক্লেশতনূকরণার্থশ্চ [২।২ সূত্র] স হি আসেব্যমানঃ সমাধিং ভাবয়তি ক্লেশাংশ্চ প্রতনূকরোতি (ব্যাসভাষ্য)। 'সেই ক্রিয়াযোগ সম্যক্ অনুষ্ঠিত হইলে সমাধি আনয়ন করে,' এবং অবিদ্যাদি পঞ্চ ক্লেশকে হীনবল করে।'

প্রণালীর উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে যে কোনটির অনুসরণ করিলে চিত্তবৃত্তির নিরোধ করা যাইতে পারে।

১। অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাম্ তন্নিরোধঃ। [১।১২]

'অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা চিত্ত বৃত্তির নিরোধ হইতে পারে।'(৭)

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে। [গীতা]

২। ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্বা। [১।২৩]

অথবা, ঈশ্বরের প্রণিধান হইতে চিত্তবৃত্তির নিরোধ হয়। এই সূত্রের ব্যাসভাষ্য এইরূপ;—কিম্ এতস্মাৎ এবাসন্নতমঃ সমাধির্ভবতি। অথাস্য লাভে ভবতি অন্যোঽপি কশ্চিৎ উপায়ো ন বেতি। ঈশ্বরপ্রণিধানাৎ বা। প্রণিধানাৎ ভক্তিবিশেষাৎ আবর্জ্জিত ঈশ্বরস্তমনুগৃহ্নাতি অভিধ্যানমাত্রেণ, তদভিধ্যানাদপি যোগিন আসন্নতমঃ সমাধিলাভঃ ফলঞ্চ ভবতীতি। (১।২৩ ব্যাসভাষ্য)।

অর্থাৎ, 'এই অভ্যাস বৈরাগ্য হইতেই কি অচিরে সমাধিলাভ হয়, অথবা ইহার প্রাপ্তির পক্ষে আরও কোন উপায় আছে? তদুত্তরে বলা হইতেছে যে, বিশেষ ভক্তিসহকারে আরাধিত হইলে ঈশ্বর সন্তুষ্ট হইয়া 'ইহার অভীষ্ট সিদ্ধ হউক' এই প্রকার সংকল্পসহকারে যোগীর প্রতি অনুগ্রহ করেন। ঈশ্বরের তাদৃশী ইচ্ছা হইলে যোগীর সমাধিলাভ সুলভ হয়।'

৩। প্রচ্ছর্দ্দনবিধারণাভ্যাং বা প্রাণস্য। ১।৩৪ সূত্র।

'অথবা প্রাণের নিঃসারণ ও বিধারণ দ্বারাও (চিত্তবৃত্তির নিরোধ হইতে পারে)।' অর্থাৎ, প্রাণায়ামও সমাধিলাভের অন্যতম উপায়।

৪। বিষয়বতী বা প্রবৃত্তিরুৎপন্না মনসঃ স্থিতিনিবন্ধনী—১।৩৫ সূত্র।

'অথবা, ইন্দ্রিয়বিশেষে ধারণা দ্বারা গন্ধাদি বিষয় সাক্ষাৎকার হইলে চিত্ত স্থির হয়।' অর্থাৎ, নাসাগ্র জিহ্বামূল প্রভৃতিতে ধারণা করিলে যোগী অলৌকিক গন্ধ রূপ রস স্পর্শ শব্দ প্রভৃতির অনুভব করেন, তাহাতে চিত্ত নিবিষ্ট হইয়া যায়। অতএব, চিত্তস্থৈর্য্যের ইহাও অন্যতম উপায়।

৫। বিশোকা বা জ্যোতিষ্মতী—১।৩৬ সূত্র।

'(হৃৎপদ্মে ধারণা করিলে) যে শোক-রহিত জ্যোতির প্রকাশ হয়, তাহার

---

(৭) ভগবান গীতাতে অভ্যাস ও বৈরাগ্যকে চঞ্চল মনের স্থৈর্য্যসম্পাদনের উপায়স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

দ্বারাও চিত্তের স্থিরতা হইতে পারে।' অর্থাৎ, এই জ্যোতির সাক্ষাৎও চিত্তস্থৈর্য্যের অন্যতম উপায়।

৬। বীতরাগবিষয়ং বা চিত্তম্ ১।৩৭ সূত্র।

'অথবা, যাঁহারা বীতরাগ, (বিষয়বিরক্ত) তাঁহাদের বিষয়ে ধ্যান করিলে চিত্ত স্থির হয়'; অর্থাৎ, নিষ্কাম মহাত্মার ধ্যানও চিত্তস্থৈর্য্যের অন্যতম উপায়।

৭। স্বপ্ননিদ্রাজ্ঞানাবলম্বনং বা—১।৩৮ সূত্র।

'অথবা, স্বপ্নজ্ঞান কিংবা নিদ্রাজ্ঞানকে অবলম্বন করিলেও চিত্ত স্থির হয়।' অর্থাৎ, স্বপ্নে মূর্ত্তিবিশেষ কিংবা সাত্ত্বিক সুষুপ্তি বৃত্তিকে আশ্রয় করিয়াও চিত্তস্থৈর্য্য লাভ করা যাইতে পারে।

৮। যথাভিমতধ্যানাৎ বা—১।৩৯ সূত্র।

অথবা, অভিমত যে কোন বিষয়ে ধ্যান করিলেও চিত্ত স্থির হয়। অর্থাৎ, অভিমতধ্যানও চিত্তস্থৈর্য্যের অন্যতম উপায়।

সাধনাবস্থায় যোগীর যোগাভ্যাসের ফলে কতকগুলি অলৌকিক শক্তির সঞ্চার হয়; ইহাদিগকে বিভূতি বা সিদ্ধি বলে। পাতঞ্জলদর্শনের তৃতীয় পাদে এই সকল সিদ্ধির সবিস্তার উল্লেখ আছে। প্রকৃত যোগসাধনার পক্ষে ইহারা সহায় নহে—অন্তরায়।

তে সমাধাবুপসর্গা ব্যুত্থানে সিদ্ধয়ঃ। [সূত্র ৩।৩২ অ]

অর্থাৎ, সমাধিরহিতের পক্ষে এই সকল বিভূতি বলিয়া গণ্য হয়, কিন্তু সমাধিযুক্ত যোগীর পক্ষে ইহারা উপসর্গমাত্র।

এই যোগ অষ্টাঙ্গ।

যমনিয়মাসনপ্রাণায়ামপ্রত্যাহারধারণাধ্যানসমাধয়োঽষ্টাবঙ্গানি। ২।২৯ সূত্র।

"যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি—যোগের এই অষ্টাঙ্গ।" ইহাদের মধ্যে যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম ও প্রত্যাহার বহিরঙ্গ, এবং ধারণা, ধ্যান ও সমাধি অন্তরঙ্গ।

অহিংসা, সত্য, অস্তেয় (চৌর্য্যের অভাব), ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ (বিষয়ের অগ্রহণ)—ইহাদের নাম যম। শৌচ (বহিঃ ও অন্তঃশুদ্ধি), সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বরপ্রণিধান—ইহাদের নাম নিয়ম। পদ্মাসন, বীরাসন প্রভৃতি আসন (স্থিরসুখমাসনম্—২।৪৬ সূত্র)। প্রাণবায়ুর সংযম—প্রাণায়াম (শ্বাসপ্রশ্বাসয়োর্গতিবিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ—সূত্র ২।৪৯)। ইন্দ্রিয়নিরোধের নাম প্রত্যাহার। একদেশে চিত্তের ধারণ বা বন্ধনকে ধারণা বলে (দেশবন্ধঃ চিত্তস্য ধারণা—সূত্র ৩।১)। চিত্তবৃত্তির একতান প্রবাহের নাম ধ্যান।

(তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্—সূত্র ৩।২)। ধ্যান পরিপক্ক হইয়া যখন ধ্যেয়াকারেই পরিণত হয়, চিত্তবৃত্তি থাকিয়াও না থাকার ন্যায় ভাসমান হয়, সেই অবস্থার নাম সমাধি (তদেবার্থমাত্রনির্ভাসং স্বরূপশূন্যমিব সমাধিঃ—সূত্র ৩।৩)। এই সমাধি দ্বিবিধ; সবীজ ও নির্ব্বীজ। সবীজ সমাধিতে চিত্তের আলম্বন থাকে; চিত্তের সূক্ষ্ম সাত্ত্বিক বৃত্তি তিরোহিত হয় না। সেই জন্য সবীজ সমাধির আর একটি নাম সম্প্রজ্ঞাত সমাধি। নির্ব্বীজ সমাধিতে চিত্তের সমস্ত বৃত্তি তিরোহিত হয়, কেবল সংস্কারমাত্র অবশিষ্ট থাকে; সেই জন্য এই সমাধিকে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলে।

বিতর্কবিচারানন্দাস্মিতারূপানুগমাৎ সম্প্রজ্ঞাতঃ। [সূত্র ১।১৭]

বিরামপ্রত্যয়াভ্যাসপূর্ব্বঃ সংস্কারশেষোঽন্যঃ। [সূত্র—১।১৮]

ব্যাসভাষ্যে সমাধির এইরূপ লক্ষণ করা হইয়াছে,—

ধ্যানমেব ধ্যেয়াকারনির্ভাসং প্রত্যয়াত্মকেন স্বরূপেণ শূন্যমিব যদা ভবতি
ধ্যেয়স্বভাবাবেশাৎ তদা সমাধিরিত্যুচ্যতে।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার লিখিয়াছেন,—"যোগ দুই প্রকার, সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত। একাগ্র চিত্তের যোগ সম্প্রজ্ঞাত। কেন না, তৎকালে ধ্যেয় বস্তু সম্যক্‌রূপে প্রজ্ঞাত হয়। নিরুদ্ধচিত্তের যোগের নাম অসম্প্রজ্ঞাত। কেন না, তৎকালে ধ্যেয়বিষয়ক বৃত্তিও নিরুদ্ধ হয় বলিয়া কিছুই প্রজ্ঞাত হয় না। এই দ্বি বিধ যোগের সাধারণ নাম সমাধিযোগ। [হিন্দুদর্শন—৩০।৩১]

সম্প্রজ্ঞাত সমাধি চতুর্ব্বিধ;—সবিতর্ক নির্ব্বিতর্ক, সবিচার ও নির্ব্বিচার; ইহাদিগকে সবীজ বলে। "তা এব সবীজসমাধিঃ"—সূত্র ১।৪৬।

তস্যাপি নিরোধে সর্ব্বনিরোধাৎ নির্ব্বীজঃ সমাধিঃ। [সূত্র ১।৫১]

'তাহারও নিরোধে সমস্ত নিরুদ্ধ হইলে নির্ব্বীজ সমাধি হয়।' এই নির্ব্বীজ সমাধিই পাতঞ্জলের অনুমোদিত যোগ। এই সমাধিসিদ্ধির জন্য পাতঞ্জলদর্শনের অবতারণা।

এই নির্ব্বীজ সমাধি বা যোগ আয়ত্ত হইলে পুরুষের স্বরূপে অবস্থান হয়। তখন পুরুষকে শুদ্ধ মুক্ত বলে। (৮) ইহারই নাম কৈবল্যসিদ্ধি। ইহাই পাতঞ্জলদর্শনের চরম লক্ষ্য।

---

(৮) তস্মিন্নিবৃত্তে পুরুষঃ স্বরূপপ্রতিষ্ঠঃ অতঃ শুদ্ধো মুক্তঃ ইত্যুচ্যতে। ১।৫ সূত্রের ব্যাসভাষ্য।

সত্ত্বপুরুষয়োঃ শুদ্ধিসাম্যে কৈবল্যমিতি। (৯) [সূত্র—৩।৫৫]
তদা সর্ব্বাবরণমলাপেতস্য জ্ঞানস্যানন্ত্যাজ্জ্ঞেয়মল্পম্। [সূত্র ৪।৩১]
পুরুষার্থশূন্যানাং গুণানাং প্রতিপ্রসবঃ কৈবল্যং স্বরূপপ্রতিষ্ঠা বা চিতিশক্তিরিতি।
[সূত্র ৪।৩৪]

অর্থাৎ, সেই সমাধিযোগের অবস্থায় সমস্ত অবিদ্যাদি ক্লেশ ও কর্ম্মরূপ আবরণ হইতে চিত্ত-সত্ত্ব মুক্ত হইলে তাহার সর্ব্বত্র প্রসার হয়। তখন তাহার জ্যোতি সকল স্থানেই পরিব্যাপ্ত হয়। সে অবস্থায় অজ্ঞাত বিষয় কিছুই থাকে না। এইরূপ তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইলে যোগীর পক্ষে প্রকৃতির পরিণাম হইয়া ভোগ বা অপবর্গ জন্মায় না। ইহাই কৈবল্য। ইহাই পাতঞ্জলদর্শনোক্ত মুক্তি। এ অবস্থায় চিতিশক্তির (পুরুষের) স্বরূপে প্রতিষ্ঠা হয়। (১০)

গীতা যোগপ্রণালীর অনুমোদন করিয়াছেন। এমন কি, যোগীকে তপস্বী, জ্ঞানী ও কর্ম্মীর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন।—

তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাৎ যোগী ভবার্জ্জুন॥ [গীতা ৬।৪৬]

'যোগী তপস্বী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এবং কর্ম্মী অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ; অতএব হে অর্জ্জুন! তুমি যোগী হও।'

গীতার ষষ্ঠাধ্যায়ে ধ্যানযোগের সবিস্তার উপদেশ আছে। তাহার

---

(৯) এই সূত্রের ব্যাসভাষ্যে এইরূপ লিখিত আছে,—

"জ্ঞানাদদর্শনং নিবর্ত্ততে, তস্মিন্নিবৃত্তে ন সন্ত্যুত্তরে ক্লেশাঃ, ক্লেশাভাবাৎ কর্ম্মবিপাকাভাবঃ চরিতাধিকারাশ্চৈতস্যামবস্থায়াং গুণা ন পুরুষস্য পুনর্দৃশ্যত্বেনোপতিষ্ঠন্তে, তৎপুরুষস্য কৈবল্যম্, তদা পুরুষঃ স্বরূপমাত্রজ্যোতিরমলঃ কেবলী ভবতি। [৩।৫৫ সূত্রের ব্যাসভাষ্য।]

অর্থাৎ, জ্ঞান জন্মিলে অদর্শন (অবিদ্যার) নিবৃত্তি হয়; তাহার নিবৃত্তি হইলে পঞ্চ ক্লেশের নিবৃত্তি হয়; ক্লেশের নিবৃত্তি হইলে কর্ম্মপরিপাক হইয়া ফল জন্মাইতে পারে না। এই অবস্থায় প্রয়োজন চরিতার্থ হওয়ায় প্রকৃতি আর পুরুষের দৃশ্য হয় না। পুরুষ তখন কেবল (স্বতন্ত্র) হয়; এবং নির্ম্মল জ্যোতিঃস্বরূপে অবস্থান করে।

(১০) Kailvalya, from Kevala, alone, means the isolation of the soul from the universe and its return to itself, and not to any other being, whether Isvara, Brahma, oi any one else.—

MaxMuller's Indian Philosophy. p. 458.

আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, ভগবান পাতঞ্জল-প্রদর্শিত অষ্টাঙ্গ যোগের সাধারণতঃ অনুমোদন করিয়াছেন।—

যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ।
একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ॥
শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ।
নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চেলাজিনকুশোত্তরম্॥
তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ।
উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাদ্ যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে॥
সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ।
সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্॥
প্রশান্তাত্মা বিগতভীর্ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ।
মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ॥ [গীতা; ৬—১০।১৪]
সংকল্পপ্রভবান্ কামাংস্ত্যক্ত্বা সর্ব্বানশেষতঃ।
মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ॥
শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া।
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ॥
যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ॥ [গীতা; ৬—২৪—৬]

স্পর্শান্ কৃত্বা বহির্ব্বাহ্যাংশ্চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুবোঃ।
প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ॥
যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধির্মুনির্মোক্ষপরায়ণঃ।
বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ॥ [গীতা; ৫—২৭।২৮]

'যোগী একাকী নির্জ্জনে অবস্থান করিয়া আশা ও পরিগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া সংযতচিত্তে সতত আত্মার যোগসাধন করিবেন।'

'তিনি পবিত্র দেশে, নাতি-উচ্চ নাতি-নিম্ন স্থানে, কুশ অজিন ও বস্ত্র বিছাইয়া আপনার স্থির আসন সংস্থাপন করিবেন।'

'সেখানে মন একাগ্র করিয়া এবং চিত্ত ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া সংযত করিয়া আত্মশুদ্ধির নিমিত্ত, আসনে উপবেশন করিয়া যোগ অভ্যাস করিবেন।'

'শরীর, মস্তক ও গ্রীবা সরলভাবে ধারণ করিয়া এবং দৃষ্টিকে সকল দিক হইতে আকর্ষণ পূর্ব্বক নাসিকার অগ্রভাগে স্থাপিত করিয়া, স্থিরভাবে অবস্থান করিবেন।'

'যোগী প্রশান্ত, নির্ভয়, ব্রহ্মচারিব্রতধারী ও সংযতচিত্ত হইয়া ভগবানকে স্মর করিয়া ভগবানে চিত্ত সংযুক্ত করিবেন।'

'সংকল্পজ সমস্ত কামনা সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিয়া মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়সমূহকে সকল বিষয় হইতে নিগৃহীত করিয়া যোগ অভ্যাস করিবেন।'

'ধারণার দ্বারা বুদ্ধিকে বশীভূত করিয়া ধীরে ধীরে উপরত হইবেন। মনকে আত্মাতে স্থাপিত করিয়া কিছুই চিন্তা করিবেন না।'

'চঞ্চল অস্থির মন, যথা যথা ধাবিত হইবে, সেখান হইতে তাহাকে প্রত্যাহরণ করিয়া আত্মাতে নিবিষ্ট করিবেন।'

'যে মোক্ষপরায়ণ মুনি বাহ্য বিষয়ের সংস্পর্শ পরিত্যাগ করিয়া ভ্রূযুগলের মধ্যে চক্ষু সংস্থাপিত করিয়া নাসিকার অভ্যন্তরে প্রাণ ও অপানকে সমীকৃত করিয়া, ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধি সংযত করিয়া, ইচ্ছা ভয় ও ক্রোধ পরিহার করেন, তিনিই জীবন্মুক্ত।'

উল্লিখিত শ্লোকে গীতা সংক্ষেপে অষ্টাঙ্গ যোগের উপদেশ করিলেন। শুচি দেশে স্থির আসন সংস্থাপন করিবেন;—ইহা আসনের উপদেশ। নাসার অভ্যন্তরে প্রাণ ও অপানকে সমীকৃত করিবেন,—ইহা প্রাণায়ামের উপদেশ। বাহ্য বিষয়ের সংস্পর্শ পরিত্যাগ করিবেন,—ইহা প্রত্যাহারের উপদেশ। ব্রহ্মচারিব্রতগ্রহণ, পরিগ্রহপরিত্যাগ ইত্যাদি যমের উপদেশ। ইন্দ্রিয়ের বশীকরণ, চঞ্চল মনের সংযমন, আশা-পরিত্যাগ ইত্যাদি নিয়মের উপদেশ। নাসিকাগ্রে দৃষ্টিধারণ, মনকে আত্মাতে সংস্থাপন ইত্যাদি ধারণার উপদেশ। ভগবানে চিত্তস্থাপন, মনের একাগ্রতাসাধন ইত্যাদি ধ্যানের উপদেশ। কিছুই চিন্তা করিবে না, মনকে আত্মাতে স্থাপিত করিবে,—ইত্যাদি সমাধির উপদেশ।

আমরা দেখিয়াছি যে, পাতঞ্জলমতে যোগের চরম অবস্থায় পুরুষের স্বরূপে অবস্থান হয়। পুরুষ চিৎস্বরূপ (দ্রষ্টা দৃশিমাত্রঃ)। তিনি আনন্দঘন নহেন, অতএব পাতঞ্জলোক্ত মুক্তি সুখ দুঃখের অতীত কৈবল্য অবস্থা। ইহাতে দুঃখের নিবৃত্তি হয় বটে, কিন্তু সুখের প্রাপ্তি ঘটে না। গীতা কিন্তু যোগের ফল অন্যরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন। গীতা বলেন,—

সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্‌বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্।
বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ॥

যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে॥
তং বিদ্যাদ্দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্।
স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোঽনির্বিণ্ণচেতসা॥ [গীতা ; ৬—২১।২৩]

'যে অবস্থায় বুদ্ধিবেদ্য, অতীন্দ্রিয় নিরতিশয় সুখের উপলব্ধি হয়, যে অবস্থায় অবস্থান করিলে তত্ত্ব হইতে বিচ্যুতি ঘটে না, যে অবস্থা লাভ করিলে অন্য লাভকে অধিক বোধ হয় না, এবং যে অবস্থায় উপস্থিত হইলে গুরুতর দুঃখও বিচলিত করিতে পারে না, দুঃখের সংস্পর্শশূন্য এই অবস্থার নামই যোগ। নির্ব্বেদশূন্য চিত্তে সেই যোগ নিশ্চয়ের সহিত অভ্যাস করিবে।' অতএব গীতার মতে যোগের অবস্থায় নিরতিশয় সুখলাভ হয়। যোগসিদ্ধ হইলে এই সুখ আরও ঘনীভূত হইয়া ব্রহ্মানন্দে পরিণত হয়।—

প্রশান্তমনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্।
উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্॥
যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ।
সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে॥ [গীতা ; ৬—২৭।২৮]

'প্রশান্তচিত্ত, রজোবিহীন, নিষ্পাপ, ব্রহ্মপ্রাপ্ত যোগী উত্তম সুখ অনুভব করেন।

'নিষ্পাপ যোগী এই প্রকারে নিয়ত আত্মাকে যোগযুক্ত করিয়া অনায়াসে ব্রহ্মসংস্পর্শরূপ অত্যন্ত সুখ প্রাপ্ত হন।'

বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখম্।
স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে॥ [গীতা ; ৫—২১]

'যাঁহার চিত্ত বাহ্যবিষয়ে অনাসক্ত, তিনি আত্মাতে যে সুখ, সেই সুখ অনুভব করেন। এবং ব্রহ্মে সমাধি করিয়া অক্ষয় সুখ প্রাপ্ত হন।

আমরা দেখিয়াছি যে, পাতঞ্জলমতে জীব ও ঈশ্বর ভিন্ন ; যোগের যে চরম অবস্থা নির্ব্বীজ সমাধি, তাহাতে আত্মসাক্ষাৎকার হয় মাত্র। গীতার মতে যোগের দ্বারা ভগবানের সঙ্গ বা সাক্ষাৎলাভ হয়।

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী নিয়তমানসঃ।
শান্তিং নির্ব্বাণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি॥ [গীতা ; ৬—১৫]

'সংযতচিত্ত যোগী এইরূপে আত্মাকে সমাহিত করিয়া আমাতে (ভগবানে) স্থিতিরূপ মোক্ষপ্রধান শান্তি লাভ করেন।'

সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি ।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ ॥ [গীতা ৬-২৯]

'সর্ব্বত্র সমদৃষ্টিশীল, সমাহিতচিত্ত যোগী সমস্ত ভূতে আত্মাকে এবং সমস্ত ভূতকে আত্মাতে অবলোকন করেন'। সমস্ত ভূতে যে আত্মা বিরাজিত, তিনি পরমাত্মা (ভগবান) ভিন্ন আর কে?'

আমরা দেখিয়াছি যে, পাতঞ্জল-প্রদর্শিত যোগ অর্থে সংযোগ নহে—বরং বিয়োগ বা উদ্‌যোগ। ভোজবৃত্তিতে উক্ত হইয়াছে,—

পুংপ্রকৃত্যোর্বিয়োগোঽপি যোগ ইত্যুদিতো যয়া।

'অর্থাৎ, প্রকৃতি পুরুষের যে বিয়োগ বা বিবেক (পার্থক্য), পাতঞ্জল শাস্ত্রে তাহাকেই যোগ বলে।' স্বর্গীয় রাজেন্দ্রলাল মিত্র এই প্রসঙ্গের আলোচনায় লিখিয়াছেন যে, পাতঞ্জল শাস্ত্রে যোগ শব্দে ঈশ্বরের সহিত জীবের সংযোগ বুঝায় না, কিন্তু চিত্তনিরোধের উদ্‌যোগ বা ব্যাপার বুঝায় (১১)।

পুরাণাদি শাস্ত্রগ্রন্থে কিন্তু যোগ শব্দের সংযোগ অর্থই অনুমোদিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, সে সংযোগ, প্রযত্ন বা উদ্‌যোগ ভিন্ন সিদ্ধ হয় না।

আত্মপ্রযত্নসাপেক্ষা বিশিষ্টা যা মনোগতিঃ।
তস্যা ব্রহ্মণি সংযোগো যোগ ইত্যভিধীয়তে ॥—বিষ্ণুপুরাণ ; ৬। ৭। ৩১ ॥

অর্থাৎ, 'আত্মার চেষ্টাসাপেক্ষ যে অসাধারণ মনোবৃত্তি, তাহার ভগবানে সংযোগকেই যোগ বলে।' গীতায় ভগবান্ যোগের যেরূপ পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, এই মতই গীতার অনুমোদিত। কারণ, গীতা যোগীকে মনঃসংযম করিয়া চিত্ত ঈশ্বরে নিহিত করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ।—গীতা ; ৬। ১৪।

---

(১১) "*Yoga* in the Philosophy of *Patanjali* doesnot mean union with God or anything but effort (*udyoga*), pulling oneself together, exertion, concentration. The idea of absorption into the Supreme Godhead forms no part of the *Yoga* theory. *Patanjali* like *Kapila* rests satisfied with the isolation of the Soul and does not pray into the how and where the Soul abides after separation."

"The highest object of the Yogin was freedom, aloneness, aloofness, or self-centeredness."—MaxMuller's Indian Philosophy. pp. 426.

গীতা আরও বলিতেছেন যে, "যোগের ফলে যে শান্তিলাভ করা যায়, তাহা ভগবানে স্থিতির ফল।"

শান্তিং নির্ব্বাণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি ।—গীতা ; ৬। ১৫।

আমরা দেখিয়াছি যে, যোগসিদ্ধির জন্য পতঞ্জলি যে সকল উপায়ের উপদেশ করিয়াছেন, "ঈশ্বর-প্রণিধান" তাহাদিগের অন্যতম। এই উপায়ই যে অদ্বিতীয় উপায়, কিংবা মুখ্য উপায়, পতঞ্জলি তাহা স্বীকার করেন না। যোগী চিত্তবৃত্তিনিরোধের জন্য যেমন অন্যান্য উপায়ের অনুসরণ করিতে পারেন, সেইরূপ ইচ্ছা হইলে ঈশ্বর-প্রণিধানও করিতে পারেন। (১২)

বিক্ষিপ্ত চিত্তকে একাগ্র করিবার জন্য পতঞ্জলি সাধককে 'ক্রিয়াযোগের' অনুষ্ঠান করিতে উপদেশ দিয়াছেন। তপঃ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর-প্রণিধান, ইহাদের নাম ক্রিয়াযোগ। [যোগসূত্র ;—২।১]। আর পতঞ্জলি যে অষ্টাঙ্গ যোগের প্রচার করিয়াছেন, তাহার একটি অঙ্গ নিয়ম। পতঞ্জলির মতে, নিয়ম যোগের বহিরঙ্গ সাধন। নিয়ম পাঁচ প্রকার ;—শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর-প্রণিধান।

শৌচসন্তোষতপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি নিয়মাঃ ।—যোগসূত্র ; ২। ৩২।

অতএব, পতঞ্জলির মতে, ঈশ্বর-প্রণিধান অষ্টাঙ্গযোগের বহিরঙ্গ পঞ্চবিধ নিয়মের অন্যতম। অতএব দেখা যাইতেছে যে, পাতঞ্জলদর্শনে ঈশ্বরের স্থান অতিশয় গৌণ। ঈশ্বরকে বাদ দিলেও এ মতে যোগসিদ্ধির কোনও বিশেষ বাধা হয় না। কারণ, ঈশ্বর-প্রণিধান যোগসিদ্ধির নানা উপায়ের অন্যতম উপায়মাত্র।

আর ইহাও বক্তব্য যে, পতঞ্জলির মতে ঈশ্বর-প্রণিধান অর্থে ঈশ্বরে

---

(১২) I have given this extract in order to show how subordinate a position is occupied in *Patanjali's* mind by the devotion to *Isvara*. It is but one of the many means (not even as the most efficacious of all—p. 426) for steadying the mind, and thus realising that *Viveka* or discrimination between the true man (*Puruska*) and the objective world (*Prakriti*). This remains in the *Yoga* as it was in the *Samkhya*, the Summum Bonum of mankind. I do not think, therefore, that Rajendralal Mittra was right when in his abstract of the *Yoga* (p. lii) he represented this belief in one Supreme God as the first and most important tenet of *Patanjali's* Philosophy.—MaxMuller's Indian Philosophy, pp. 424-5.

চিত্তের আধান নহে—ঈশ্বরে কর্ম্মার্পণমাত্র। ঈশ্বর-প্রণিধানের উপদেশ দিয়া পতঞ্জলি যোগীকে ভগবানের ধ্যান করিতে বলেন নাই, তাঁহাতে কর্ম্মসন্ন্যাস করিতে বলিয়াছেন মাত্র। ব্যাস-ভাষ্যের মতে, "প্রণিধানাৎ ভক্তিবিশেষাৎ আবর্জ্জিত ঈশ্বরস্তমনগৃহ্ণাত্যভিধ্যানমাত্রেণ, তদ্ অভিধ্যানাদপি যোগিন আসন্নতমঃ সমাধিলাভঃ ফলং চ ভবতীতি।"—[১।২৩ সূত্রের ভাষ্য] অর্থাৎ, 'ভক্তিবিশেষের ফলে ঈশ্বর অভিমুখ হইয়া যোগীকে অনুগ্রহ করেন, এবং ইচ্ছা করেন যে, ইহার সমাধিলাভ হউক; তাহার ফলে, যোগীর শীঘ্র সমাধিলাভ হয়।' (১৩)

আমরা দেখিয়াছি যে, গীতার মতে ঈশ্বরে চিত্তসংযোগই যোগ। অতএব, এ মতে ঈশ্বরকে ছাড়িয়া দিলে যোগ একেবারেই অসম্ভব। সেই জন্য গীতাতে যেখানেই যোগের প্রসঙ্গ, সেখানেই ঈশ্বরের উল্লেখ। গীতার মতে তিনিই শ্রেষ্ঠযোগী, যিনি শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া, ভগবানে চিত্ত সংযুক্ত করিয়া তাঁহাকে ভজনা করেন।

> যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
> শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥—[গীতা; ৬। ৪৭।]

গীতা আরও বলেন,—

> যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বং চ ময়ি পশ্যতি।
> তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥
> সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
> সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে॥—[গীতা; ৬—৩০। ৩১।]

'যে আমাকে (ঈশ্বরকে) সকলেতে দেখে, এবং সকলকে আমাতে দেখে, আমি কখনও তাহার অদৃশ্য হই না, এবং সেও কখনও আমার অদৃশ্য হয় না।

'যে যোগী একত্ব অবলম্বন করিয়া সর্ব্বভূতস্থ আমাকে ভজনা করে, সে যে ভাবেই থাকুক না কেন, আমাতেই অবস্থিতি করে।'

---

(১৩) বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন যে, এখানে প্রণিধান অর্থে ভাবনাবিশেষ বুঝিতে হইবে। (ভোজবৃত্তিও এই মতাবলম্বী)। অন্যত্র যে ঈশ্বর-প্রণিধান শব্দে পতঞ্জলি ঈশ্বরে কর্ম্মার্পণ বুঝিয়াছেন, তাহা তিনি স্বীকার করেন। ২।১ সূত্রের ব্যাস-ভাষ্যের মতে, ঈশ্বর-প্রণিধান "সর্ব্বক্রিয়াণাম্ পরমগুরৌ অর্পণম্। তৎফলসন্ন্যাসো বা।" এবং ২।৩২ সূত্রের ব্যাস-ভাষ্যে ঈশ্বর-প্রণিধান—"তস্মিন্ পরমগুরৌ সর্ব্বকর্ম্মার্পণম্।" এবং ২।৪৫ সূত্রের ("সমাধিসিদ্ধিরীশ্বর-প্রণিধানাৎ") ভাষ্যে বলা হইয়াছে, "ঈশ্বরার্পিতসর্ব্বভাবস্য সমাধিসিদ্ধিঃ।"

গীতা আরও বলিয়াছেন যে, যোগী যদি দেহত্যাগকালে ওঁকাররূপ ব্রহ্মমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ভগবানকে স্মরণ করিয়া দেহত্যাগ করে, তবেই পরমগতি প্রাপ্ত হয়।

ওঁম্ ইত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরণ্ মামনুস্মরণ্।
যঃ প্রযাতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্॥

সেই জন্য ভগবান্ গীতাতে এইরূপে চরম যোগের উপদেশ দিয়াছেন ;

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্তৈবং আত্মানং মৎপরায়ণঃ॥ [গীতা ; ৯।৩৪]

অর্থাৎ, 'আমাতে মন অর্পণ কর, আমাকে যজন কর, আমাকে ভজনা কর, আমাকে প্রণাম কর, আমাকেই সার কর ; এইরূপে আত্মাকে যোগ করিলে, আমাতে মিলিত হইবে।'

ভগবানে চিত্তার্পণই যে শ্রেয়োলাভের উপায়, তাহা শাস্ত্রের অন্যত্রও উপদিষ্ট হইয়াছে।—

এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং নিঃশ্রেয়সোদয়ঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন মনো ময্যর্পিতং স্থিরং॥ [ভাগবত ; ৩।২৫।৪১]

'তীব্রভক্তিসহকারে ভগবানে স্থির চিত্তার্পণই ইহলোকে মুক্তির উপায়।'

ন যুজ্যমানয়া ভক্ত্যা ভগবত্যখিলাত্মনি।
সদৃশোঽস্তি শিবঃ পন্থা যোগিনাং ব্রহ্মসিদ্ধয়ে॥ [ভাগবত ; ৩।২৫।১৮]

'বিশ্বাধার ভগবানে ভক্তিযোগ অপেক্ষা যোগীর ব্রহ্মসিদ্ধির পক্ষে শুভ পন্থা আর নাই।'

অষ্টাঙ্গযোগ কিরূপে ভগবানে প্রযুক্ত হইতে পারে, তাহার সবিশেষ উপদেশ বিষ্ণুপুরাণের ষষ্ঠ অংশে খাণ্ডিক্য-জনক-সংবাদে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বহিরঙ্গসাধন দ্বারা চিত্তকে নির্ম্মল ও বাহ্যার্থবিনিবৃত্ত করিয়া একান্তভাবে ভগবানের ধ্যান করিতে হইবে।—

প্রাণায়ামেন পবনৈঃ প্রত্যাহারেণ চেন্দ্রিয়ৈঃ।
বশীকৃতৈস্ততঃ কুর্য্যাৎ স্থিরং চেতঃ শুভাশ্রয়ে॥ [বিষ্ণুপুরাণ ; ৬।৭।৪৫]

'প্রাণায়াম দ্বারা পবন, প্রত্যাহার দ্বারা ইন্দ্রিয় সকল বশীকৃত করিয়া, অনন্তর শুভাশ্রয় ভগবানে চিত্তের একাগ্রতা সম্পাদন করিবে।'

শুভাশ্রয় কে ?

শুভাশ্রয়ঃ স্বচিত্তস্য সর্ব্বগস্য তথাত্মনঃ।
ত্রিভাবভাবনাতীতো মুক্তয়ে যোগিনাং নৃপ॥ [বিষ্ণুপুরাণ ; ৬।৭।৭৫]

অর্থাৎ, 'চিত্তের শুভাশ্রয় একমাত্র শ্রীভগবান্; তিনি ত্রিগুণাতীত, তাঁহার ভাবনা দ্বারা জীব মুক্তিলাভ করে।'

ভাগবতও এই কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতেছেন,—

নিযচ্ছেদ্বিষয়েভ্যোঽক্ষান্মনসা বুদ্ধিসারথিঃ।
মনঃ কর্ম্মভিরাক্ষিপ্তং শুভার্থে ধারয়েদ্ধিয়া॥
তত্রৈকাবয়বং ধ্যায়েদব্যুচ্ছিন্নেন চেতসা।
মনো নির্ব্বিষয়ং যুক্ত্বা ততঃ কিঞ্চন ন স্মরেৎ।
পদং তৎপরমং বিষ্ণোর্মনো যত্র প্রসীদতি॥ [ভাগবত; ২।১।১৮-১৯।]

'বুদ্ধির সহায়ে মনের দ্বারা বিষয় হইতে ইন্দ্রিয় সকলকে প্রত্যাহার করিয়া কর্ম্মাক্ষিপ্ত চিত্তের শুভার্থে ধারণা করিবে।' (শুভার্থে=ভগবদ্রূপে —শ্রীধরস্বামী)

'ধারণার অভ্যাসার্থ প্রথমতঃ ভগবানের মূর্ত্তির এক এক অবয়ব চিন্তা করিয়া দৃঢ়তাসহকারে সমস্ত মূর্ত্তিতে চিত্ত স্থির করিতে হইবে; পরে মন হইতে ভগবানের মূর্ত্তিও পরিহার করিয়া কিছুই চিন্তা করিবে না। সেই বিষ্ণুর পরম পদ, তাহাতেই চিত্তের প্রশান্তি।'

এত দূরে পাতঞ্জলদর্শনের সহিত গীতার সম্বন্ধের আলোচনা সমাপ্ত হইল। বারান্তরে আমরা বেদান্তদর্শনের সহিত গীতার সম্বন্ধ বুঝিতে চেষ্টা করিব।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

প্রকাশ।

ললিতের পত্নীবিয়োগসংবাদ শুনিয়া বন্ধুবান্ধব সকলেই দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিল সত্য, কিন্তু তাহারা মনে করিয়াছিল,—এইবার তাহার কবিপ্রতিষ্ঠালাভের মাহেন্দ্র সুযোগ উপস্থিত।

এক মাস, দুই মাস, তিন মাস।—দেখিতে দেখিতে ষড়ঋতুর আবর্ত্তনের মধ্য দিয়া দীর্ঘ বারটি মাস অতীতের গর্ভে লীন হইয়া গেল, তবুও তাহার হৃদয়োচ্ছ্বাসের কোনও বাহ্যবিকাশ পর্য্যন্ত কেহ দেখিতে পাইল না। না

একটা শোক-কবিতা, না একটা বিষাদ-গাথা, না কোন বৈরাগ্যের ভাব! তখন সকলেই সিদ্ধান্ত করিল যে, গৃহলক্ষ্মীর তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে তাহার কলালক্ষ্মীও তাহাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন।

কিন্তু সেবার পূজার পর,—তখনও প্রোষিতাকুলের প্রত্যাগত প্রিয়তমগণ পুনর্ব্বার বিদেশযাত্রার আয়োজন করেন নাই, বৎসরান্তে সমাগতা 'নাগরী'-গণের সম্ভাষণ সম্বর্দ্ধনা তখনও ফুরায় নাই, পূজোপলক্ষে সুসংস্কৃত ব্রেসলেট বলয় সুন্দরীগণের মণিবন্ধে তখনও অমলিন রহিয়াছে,—এমন সময় বন্ধুবান্ধব সবিস্ময়ে শুনিল, ললিত পশ্চিমে যাইবে। তাহারা পরস্পর হাসাহাসি বলাবলি করিতে লাগিল,—"এইবার আগ্নেয়গিরির প্রচ্ছন্ন অনলকণা সধূম স্ফুলিঙ্গ উদ্গারের আয়োজন করিতেছে। এ পশ্চিম-ভ্রমণের উদ্দেশ্য ক্ষত হৃদয়ের স্বাস্থ্যসঞ্চয়।"

যাত্রার দিন অপরাহ্নে বন্ধুরা তাহাকে বিদায়সম্ভাষণ করিতে আসিল। একান্ত অন্তরঙ্গ গুটি দুই বন্ধু তাহাকে ট্রেণে তুলিয়া দিবার জন্য রহিয়া গেল। নানাপ্রকার কথাবার্ত্তা গল্পগুজব চলিতে লাগিল। এই অবসরে কখন যে তিমিরাবগুণ্ঠনা সন্ধ্যা আসিয়া অজ্ঞাতসারে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, কেহই তাহা ঠাহর পায় নাই। ভৃত্যকে আলোক হস্তে প্রবেশ করিতে দেখিয়া তাহাদের চমক ভাঙ্গিল। তখন সকলে পড়িয়া তাড়াতাড়ি প্রকাশের জিনিসপত্র গুছাইতে আরম্ভ করিল।

আহার করিতে যাইবার সময় ললিত বন্ধুদের সকলকেই টানিয়া লইয়া গেল। একত্র আহারাদি করিয়া সকলে ষ্টেশনের অভিমুখে যাত্রা করিল।

পথে যাইতে যাইতে এক জন জিজ্ঞাসা করিল, "ললিত, ঠিক করিয়া বল, তুমি কবে ফিরিবে?" ঈষৎ হাসিয়া ললিত বলিল, "কেন? ঘরে ত যুবতী স্ত্রী রাখিয়া যাইতেছি না যে, ফিরিবার তাগিদটা খুব বেশী হইবে।"

"যা'তে তাই একটি হয়, সেই চেষ্টাই দেখা যাবে। তুমি ফিরিয়া আসিবার পূর্ব্বেই আমরা পাত্রী স্থির করিয়া রাখিব।"

"পাত্রীর চেয়ে পার ত একটা পাত্র সংগ্রহ করিয়া দাও। আমি জলের গেলাসটা ফেলিয়া আসিয়াছি।"—বলিয়া ললিত হাসিতে লাগিল। এক জন বলিল, "তোমার এখন জহ্নু-পিপাসা। গেলাসের জলে তাহা মিটিবে কি?"

তখন এই প্রসঙ্গ লইয়া খুব হাসাহাসি চলিতে লাগিল। অবশেষে

সকলে যখন বিশেষ চাপাচাপি করিয়া ধরিল, তখন ললিত ঔদাস্যব্যঞ্জকস্বরে বলিল, "বিয়ে আমার ভাগ্যে সইবে না।"

"ননসেন্স!" বলিয়া ললিতের অপর বন্ধুটি একটু নড়িয়া চড়িয়া ভাল হইয়া বসিলেন ও ভর্ৎসনার স্বরে বলিতে লাগিলেন, "তোমার ও সব 'সেণ্টিমেণ্ট্যাল ননসেন্স' রাখিয়া দাও। ও রকম 'সেণ্টিমেণ্ট' কত দেখা গেল! পত্নীবিয়োগে প্রেমের বুক্নি, উদ্ভ্রান্ত চাহনিও অনেক দেখিলাম! কত বিরহী পত্নীশোকে প্রেমের গয়ায় হৃৎপিণ্ড দান করিলেন, আবার তাঁহাকেই নবপরিণীতা পত্নীর প্রেমে বিভোর হইতে দেখিলাম! এমন কি, পুষ্পরথে চড়া ধনুর্দ্ধারীর আগমনবার্ত্তাও লোকের অগোচর রহিল না! কত বিরহী কম্বল সম্বল করিয়া বুকের জ্বালা জুড়াইবার জন্য বনে জঙ্গলে পাহাড়ে পর্ব্বতে ঘুরিয়া বেড়াইলেন, অবশেষে নব বাসরশয্যায় সেই বুকের জ্বালার উপশম হইল!—এ সবই ত দেখা গেল। অবশিষ্ট এক তুমি। ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণের পরিণাম দেখিয়াও শল্য রথিত্ব-গ্রহণে উদ্যত!" বন্ধুদ্বয় হাসিতে হাসিতে বলিল, "সমজদার শ্রোতার অভাবে এমন বক্তৃতাটা মাটী হইয়া গেল।"

এমন সময় গাড়ী গিয়া ষ্টেশনে হাজির হইল। এক জন নামিয়া টিকিট করিতে গেল। ললিত গাড়োয়ানের ভাড়া চুকাইয়া দিয়া অপর বন্ধুটির সহিত জনবহুল ষ্টেশনের দৃশ্যবৈচিত্র্য দেখিতে লাগিল।

ট্রেণ ছাড়িবার অব্যবহিত পূর্ব্বে ললিত গাড়ীতে উঠিল। বন্ধুদ্বয় দরজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিল। অবশেষে বংশীধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুদ্বয় বিষণ্ণমনে ললিতের নিকট বিদায় গ্রহণ করিল। ললিত ছল-ছল চক্ষে যত ক্ষণ দেখা গেল, একদৃষ্টে তাহাদের দিকে চাহিয়া রহিল।

ফিরিবার সময় পথে বন্ধুদ্বয় বলাবলি করিতে লাগিল, "সত্যই ললিত বড় মন্দভাগ্য। অমন প্রতিমার মত সুন্দরী স্ত্রী! আহা, মরিল কি না জলে ডুবিয়া! বিবাহের পর কয় দিনই বা একত্র বাস করিয়াছে! যাই হোক্, ললিত ফিরিয়া আসিলে তাহার একটা বিবাহ দিতে হইবে। তবে যদি প্রবাসী বঁধু ইতিমধ্যেই কোন প্রবাসিনীকে জীবনসঙ্গিনী না করিয়া ফেলেন।"

প্লাটফরম ছাড়িয়া ট্রেণ অনেক দূর আসিয়া পড়িল। তখনও পর্য্যন্ত ললিতের অশ্রুমগ্ন কাতর দৃষ্টি যেন কোন বাঞ্ছিতের অনুসন্ধান করিয়া ফিরিতেছিল।

আশৈশব যে গৃহ তাহাকে সুখদুঃখ, স্নেহমমতার বিচিত্র বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, আজ স্বেচ্ছায় সে তাহার নিকট বিদায় লইয়া আসিয়াছে। তাহার চিত্ত বিচলিত হইয়া উঠিল।

কিন্তু গৃহের সহিত তাহার কিসের বাদ? কিসের যে বাদ, তাহা সে নিজেও বুঝিত না। গৃহ ত তাহার চিরদিনই শূন্য। পত্নী যত দিন জীবিত ছিলেন, তখনও শূন্য ছিল, এখনও শূন্য রহিয়াছে। স্ত্রীর সঙ্গে ঘরকন্না কোন দিনই ত তাহার ভাগ্যে ঘটে নাই। তবু ত গৃহে তাহার মন চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। মনে ভাবিয়াছিল, স্থানপরিবর্ত্তনে বিচিত্রদৃশ্যদর্শনে অশান্ত চিত্ত শান্ত হইবে। সে ভুল বুঝিয়াছিল। পুরাতন আবাস, পুরাতন গৃহ, পুরাতন দৃশ্য—এ সকলই সে পশ্চাতে ফেলিয়া যাইতে পারে। কিন্তু আমরণ-সঙ্গিনী স্মৃতি ত সর্ব্বত্রই তাহার অনুগমন করিবে!

ষ্টেশনের পর ষ্টেশন ছাড়াইয়া ট্রেণ বহু দূর চলিয়া গেল। কত লোক উঠিল, নামিল। কয়েকটি যুবক যাত্রী একান্তে বসিয়া সিগারেট টানিতে-ছিলেন। এক জন তাঁহার স্বল্পাবশিষ্ট সিগারেটটি ফেলিয়া দিয়া আর একটি সিগারেট ধরাইবার জন্য বহু চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছিলেন না। গতিশীল ট্রেণে প্রহত বায়ুর সবেগ ফুৎকারে প্রতিবার তাঁহার উদ্যম ব্যর্থ হইতেছিল দেখিয়া, আর এক জন বলিলেন, "অত বেশী সিগারেট খাওয়া ভাল নয়। অতিরিক্ত সিগারেট সেবনে কি হয়, সেদিনকার খবরের কাগজে দেখেছ ত?" তখন সিগারেট সেবনের অপকারিতা লইয়া বিষম তর্কযুদ্ধ বাধিয়া গেল। ক্রমে সেই তর্ক প্রাসঙ্গিক ও অপ্রাসঙ্গিকভাবে রাজ-নীতি, সমাজনীতি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ে সম্প্রসারিত হইয়া পড়িল। কোথায় কোন কেরাণীকে তাঁহার সাহেব প্রভু অন্যায়রূপে লাঞ্ছিত করিয়াছে, রেলে ষ্টীমারে কোথায় কোন বাঙ্গালী ইংরাজের হস্তে অবমানিত হইয়াছেন, কোথায় কোন বিচারক ইংরাজ আসামীকে অব্যাহতি দিবার জন্য আইনের মর্য্যাদা নষ্ট করিয়াছেন, ইত্যাদি নানা কথার আলো-চনায় গাড়ীখানি যেন দেশীয় সংবাদপত্রে পরিণত হইবার উপক্রম হইল।

ললিত চুপ করিয়া বসিয়া 'প্রবাস-চিত্রে'র পাতা উল্টাইতেছিল, এবং বাক্-সর্ব্বস্ব বাঙ্গালী বাবুদের স্বদেশহিতৈষণার বক্তৃতা শুনিতেছিল। এক একবার তাহার বলিবার ইচ্ছা হইতেছিল যে, দোষ কেবল ইংরাজের নয়, দোষ বাঙ্গালীর। যাহাদের আত্মসম্মানবোধ নাই, তাহাদের আবার অবমাননা

কি? তা ছাড়া, অত্যাচার, অবিচার, উৎপীড়নের সংক্রামকতা যত বাড়ে, ততই মঙ্গল। দুই জন চারি জন করিতে করিতে অত্যাচারের তীক্ষ্ণ অঙ্কুশ যখন ছোট বড় নির্ব্বিশেষে সকলের মস্তকে বিদ্ধ হইতে থাকিবে, তখন যদি এই পক্ষাঘাতগ্রস্ত জাতি রোগমুক্ত হয়। কিন্তু সে আর বলিবার অবকাশ পাইল না। পরবর্ত্তী ষ্টেশনে গাড়ী থামিলে তাঁহার লক্ষ্য বাবুরা সকলেই নামিয়া গেলেন। কতকগুলি নূতন লোক আসিয়া তাহাদের শূন্য স্থান অধিকার করিল। শরতের মেঘ অন্তরে অন্তরে গর্জ্জন করিয়াই থামিয়া গেল।

ট্রেণ ছাড়িলে, ললিত, ঝুলান বেঞ্চের উপর তাহার ক্ষুদ্র শয্যাটি বিছাইয়া, উপরে উঠিয়া একখানি র‍্যাপারে আবক্ষ ঢাকা দিয়া বইখানি হাতে তুলিয়া লইল। কিন্তু পড়া হইল না। অতীত জীবনের সুখ দুঃখের স্মৃতি ও প্রবাসবাসের অকারণ আশঙ্কা তাহার অন্তঃকরণের উপর অধিকার বিস্তার করিল। সে যতই তাহাদের ঠেলিয়া ফেলিতে চেষ্টা করে, তাহারা সজোরে তাহাকে 'সাপটিয়া' ধরে। ললিত পরাস্ত হইল।

ট্রেণের গতির সঙ্গে সঙ্গে ললিতের হৃদয়নিবদ্ধ ভাবনা চিন্তাও সমভাবে ছুটিয়া চলিল। ষ্টেশনে ট্রেণ থামে। জনকোলাহলের বৈচিত্র্যপূর্ণ উচ্ছ্বাসের মধ্যে তাহার ভাবনা চিন্তাও ক্ষণকালের জন্য স্তব্ধ হইয়া থাকে। আবার ট্রেণের গতিরও আরম্ভ হয়, তাহারাও আসিয়া তাহাকে বেষ্টন করে। এইরূপে অপরিত্যাজ্য ভাবনা চিন্তাকে সঙ্গিনী করিয়া, প্রকাশ ষ্টেশনের পর ষ্টেশন অতিক্রম করিয়া চলিল। আজ তাহার বোধ হইতেছিল, কে যেন এতদিন তাহার হৃদয়ের অন্ধকার কক্ষে সুপ্তিসুখে মগ্ন ছিল, গতিশীল ট্রেণের আন্দোলন আলোড়নে জাগিয়া উঠিয়া পঞ্জরকবাটে সবেগে আঘাত করিতেছে। ব্যথায় বেদনায় ললিত কাতর হইয়া পড়িল। অবশেষে নিদ্রার কোমল করপল্লবের অমৃতস্পর্শে শান্তিলাভ করিল।

তখনও ভাল করিয়া ফরসা হয় নাই। বাঞ্ছিতের বাহুপাশবিমুক্তা অভিসারিকার ন্যায় ঊষা তখন সবেমাত্র পলায়নের উদ্যোগ করিতেছে। দিগ্বলয়-কোলে বালভানু তখন নিদ্রিত। নীল আকাশগাত্রে তখনও মুঠা মুঠা তারা ছড়ান রহিয়াছে। কক্ষমধ্যস্থিত উজ্জ্বল আলোক আসন্ন নির্ব্বাণের আশঙ্কায় স্ফটিকাবরণের মধ্যে থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে। [illegible]

কনককান্তি শিশিরসিক্ত শস্যক্ষেত্রসমূহ অনিবিড় কুহেলিকার যবনিকায় সমাচ্ছন্ন।

এমন সময় ললিতের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। চাহিয়া দেখে, ট্রেণ একটা ষ্টেশনে দাঁড়াইয়া আছে। কয়েকটি যুবক হাসির তরঙ্গ তুলিয়া গাড়ীতে আসিয়া প্রবেশ করিল। ললিতের নিদ্রার জড়তা তখনও দূর হয় নাই। সে আবার চক্ষু মুদিল। গাড়ী তখন সচল।

অনতিকাল পরে আবার উচ্ছৃঙ্খল হাস্যধ্বনি ও সঙ্গে সঙ্গে নানাপ্রকার রহস্য বিদ্রূপ। ক্রমশঃ সেই সকল রহস্য বিদ্রূপ ভদ্রলোকের অকথ্য ও অশ্রাব্য ভাষায় পরিণত হইল। এমন সময় একটি নূতন কণ্ঠস্বর তাহাদের উচ্ছৃঙ্খলতা ও অভদ্রতার প্রতিবাদ করিল। কিন্তু কেহই সে প্রতিবাদে কর্ণপাত করিল না। বরং তাহাদের উচ্ছৃঙ্খলতার মাত্রা সমধিক বাড়িয়া উঠিল। তাহাদের স্খলিত জড়িত কণ্ঠস্বর হইতে ললিতের বুঝিতে বাকী রহিল না যে, তাহারা সুরামত্ত।

অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া সে নামিয়া আসিল। নীচে আসিয়া দেখে, সেই মদ্যপ যুবকগণের সম্মুখস্থ বেঞ্চে আর একটি যুবক ও রমণী। যুবকের মুখ ক্রোধে ও লজ্জায় আরক্ত। রমণীর আবক্ষ অবগুণ্ঠনে আবৃত। তদুপরি একখানি রেশমী চাদর সর্ব্বাঙ্গ বেষ্টন করিয়া আছে। তিনি অবনতমস্তকে অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া আছেন।

এই দৃশ্য দেখিয়া, ললিতের বিরক্তি ক্রোধে পরিণত হইল। মদ্যপগণের হাসি ঠাট্টা তখনও অপ্রতিহতভাবে চলিতেছিল। প্রথমতঃ, সে তাহাদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করিল যে, এক জন ভদ্রমহিলার সমক্ষে তাহাদের এ প্রকার আচরণ একান্তই গর্হিত। কিন্তু তাহার সে উপদেশ নবাগতগণের হাস্য-কলরবে বাণের মুখে কুটার মত ডুবিয়া গেল।

বন্ধুবান্ধবমহলে ললিতের শারীরিক শক্তির খুব প্রশংসা ছিল। ইচ্ছা করিলে তখনই সে তাহার পরিচয় প্রদান করিতে পারিত; কিন্তু কি ভাবিয়া সে তাহা করিল না। পরবর্ত্তী ষ্টেশনে ট্রেণ থামিলে সে দ্রুতপদে গাড়ী হইতে নামিয়া গেল। পশ্চাৎ হইতে মদ্যপ যুবকগণ হোঃ হোঃ শব্দে হাসিয়া উঠিল।

অল্পক্ষণ পরেই ললিত 'গার্ডকে' সঙ্গে লইয়া আবার আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাদের দেখিবামাত্র মদমত্ত যুবকগণের উদ্দাম উল্লাসের উপর একটা কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যের যবনিকা পড়িয়া গেল।

ললিতের নির্দ্দেশানুসারে 'গার্ড' তাহাদিগকে নামিয়া আসিবার জন্য ইঙ্গিত করিল। প্রথমে তাহারা একটু ইতস্ততঃ করিতেছিল। কিন্তু পরক্ষণেই সেই টুপীওয়ালার মুখনিঃসৃত অপূর্ব্ব হিন্দী ভাষা শ্রবণ করিয়া বিনা বাক্যব্যয়ে নামিয়া আসিল।

রমণীর অভিভাবক যুবকটি তখন বহু সবিনয় প্রশংসাবাক্যে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ললিত কুণ্ঠিতকণ্ঠে তাঁহাকে বলিল, "আমি আমার কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছি মাত্র। সে জন্য প্রশংসা কেন?"

কথায় বার্ত্তায় ক্রমে প্রভাত হইল। বালার্কের কনক কিরণ স্বর্ণপ্রভ শস্যশীর্ষে ঝিক্‌মিক্ করিতে লাগিল। সেই নবকুঙ্কুমারুণদীপ্ত প্রভাতে ললিত বুঝিল, রমণী সুন্দরী ও যুবতী। যদিও রমণীর সর্ব্বাবয়ব সসঙ্কোচ আবরণে সমাচ্ছন্ন ছিল, তথাপি সেই অনাবৃত, অলক্তাক্ত, রাঙ্গা চরণ দু'খানি তাহার অতুল সৌন্দর্য্যবিভবের সুস্পষ্ট আভাস প্রদান করিতেছিল।

অল্প সময়ের মধ্যেই রমণীর অভিভাবক যুবকের সহিত ললিতের বেশ সৌহৃদ্য জন্মিল। কথাপ্রসঙ্গে বুঝিতে পারিল, রমণী তাঁহার পত্নী। রেলে, ষ্টীমারে বন্ধুত্ব-বন্ধন খুব সুলভ। যাহার সহিত কখনও কোনও পরিচয় নাই, হয় ত সমগ্র জীবনকালেও যাহার সঙ্গে পুনঃসাক্ষাতের সম্ভাবনা বিরল, তাহারও সহিত অতি সামান্য সূত্র অবলম্বন করিয়া বিশ্বাস ও বন্ধুত্বের ভাব প্রগাঢ় হইয়া থাকে।

এই অতর্কিত বন্ধুত্বলাভে ললিত যথেষ্ট সান্ত্বনা প্রাপ্ত হইল। চিন্তার পশরা অনেক পরিমাণে লঘু হইয়া গেল। হাসি গল্পে কথায় বার্ত্তায় তাহারা ষ্টেশনের পর ষ্টেশন অতিক্রম করিয়া চলিল।

মধ্যে মধ্যে ললিত রমণীর রক্তকরবীরকান্তি চরণযুগল ও অবগুণ্ঠনসংবৃত মুখাবয়ব সতৃষ্ণনয়নে দেখিতেছিল, এবং তাহার কল্পনা-নন্দনের কল্পপাদপে সৌন্দর্য্যসুষমার কিশলয় কুসুম বিকশিয়া উঠিতেছিল।

এক একবার প্রান্তরবাহিত 'উদলা' বাতাস আবেগভরে কক্ষমধ্যে প্রবিষ্ট হইতেছিল, কিন্তু রমণীর মুখাবরণ তাহাতে একটুমাত্র ত্রস্ত হইল না। বায়ুর নির্লজ্জ উদ্যম ব্যর্থ করিবার জন্য যেন তিনি সর্ব্বদাই সাবধান!

অন্তঃপুরচারিণীগণ শুদ্ধান্তের সীমা অতিক্রম করিলে সাধারণতঃ যেরূপ একটু স্বাধীনভাব অবলম্বন করেন, ললিত দেখিল, এ রমণীতে তাহার একান্ত

অভাব। পরন্তু, ইনি অধিকতর লজ্জাশীলা, সংযমশালিনী। তাহার বিস্ময়ের মাত্রা বাড়িয়া উঠিল।

পরস্ত্রীর প্রতি এই সাগ্রহ দৃষ্টি সর্ব্বথা নিন্দনীয় হইলেও, সে কিছুতেই তাহার আকাঙ্ক্ষাকে আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছিল না।

রূপের কথা ভাবিতে ভাবিতে ললিত তাহার স্মৃতির শিয়রে আর একখানি রূপের চিত্র দেখিতে পাইল। মনে হইল, যেমনই হউক না, সে রূপে এ রূপে অনেক প্রভেদ। যেন সিন্ধুর কাছে বিন্দু! তার সঙ্গে কি ইহার তুলনা? এ ত মানুষীর রূপ।—প্রাবৃট-তটিনীর মত যৌবনসমাগমে প্রসন্ন। প্রসাধনে পরিমার্জ্জিত। কমনীয়, কিন্তু কামের অস্পৃশ্য নহে। চঞ্চল, পরিবর্ত্তনশীল, অস্থায়ী। আর সে রূপ? সে যে শরতের নবদুর্গার মত। অক্ষয়-যৌবন, চিরপ্রফুল্ল, পবিত্র, দিব্য। কাম্য, কিন্তু কামগন্ধ-বর্জ্জিত। আমরণ, যক্ষের ধনের মত, তাহার স্মৃতিভাণ্ডারে সুরক্ষিত। ছি! সে রূপের কাছে এ রূপ! ধিক্কারে তাহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিল। আপনা হইতে দৃষ্টি অবনত হইয়া গেল। কল্পনার তুলিকা খসিয়া পড়িল।

পরবর্ত্তী ষ্টেশনে ট্রেণ থামিলে, রমণীর স্বামী জল-পানের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। অদূরে এক জন 'পাণীপাঁড়ে' ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। অনেক ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকির পর সে নিকটে আসিল। রমণীর স্বামী তাহার সম্মুখে জলের গেলাস ধরিলেন। কিন্তু সে তাহার 'লোটা'র ভিতর হইতে যে স্রুপেয় বাহির করিল, তাহাতে নির্ব্বিকার দেবতার পিপাসা পরিতৃপ্ত হইতে পারিত, কিন্তু পিপাসী যাত্রীর তাহা স্পর্শ করিতেও প্রবৃত্তি হইল না। তিনি গেলাসটি হাতে করিয়া নামিয়া গেলেন।

ষ্টেশন-গৃহের বাহিরে যাত্রীদিগের জন্য পানীয় জল সংরক্ষিত থাকে। সেখানে গিয়া দেখেন যে, 'পাণীপাঁড়ের' পাণী অপেক্ষা সে জল কোনও অংশে নিন্দনীয় নহে। অগত্যা জলের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া তিনি সোডাওয়াটারের অন্বেষণে ব্যস্ত হইলেন। কিন্তু তাহাও সেখানে সুলভ নহে। অবশেষে 'সোডা-জল' যদি বা মিলিল, কিন্তু বিধাতা তাঁহাকে পানের অবসর দিলেন না। ঘণ্টাধ্বনি ট্রেণ ছাড়িবার বার্ত্তা সকলকে জানাইয়া দিল।

ললিত উদ্বিগ্নচিত্তে তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। দেখিল, অদূরে তিনি দৌড়িয়া আসিতেছেন। সে হস্তসঙ্কেতে তাঁহাকে আরও দ্রুত

আসিবার জন্য ইঙ্গিত করিতে লাগিল। ইত্যবসরে ট্রেন 'পা পা' চলিতে আরম্ভ করিল।

হাঁপাইতে হাঁপাইতে ছুটিয়া আসিয়া যেমন তিনি 'পাদানে' পা দিতে যাইবেন, অমনই এক জন রেলপুলিস তাঁহাকে বাধা দিল। ললিত ও তিনি অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন, কিন্তু বাঙ্গালী যাত্রীর কাছে রেল-আইন কিছুতেই নরম হইল না। ট্রেণ তখন 'পা পা' ছাড়িয়া 'কদম' ধরিয়াছে।

নিরুপায় হইয়া, ললিতের উপর তিনি স্ত্রীর রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিলেন। নিরুপায় দেখিয়া ললিতও তাহা গ্রহণ করিল। কথা হইল, যে ষ্টেশনে সে নামিবে, সেই ষ্টেশনে তাঁহার স্ত্রীকেও নামাইবে। তাঁহাকে টেলিগ্রাম করিবে, ও ষ্টেশন-সান্নিধ্যে তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিবে।

দেখিতে দেখিতে দম্পতিযুগলের মধ্যে সুদূর ব্যবধানের সৃষ্টি করিয়া ট্রেণ দ্রুতবেগে ছুটিয়া চলিল। ললিত মুখ বাহির করিয়া বিহ্বলনয়নে দেখিতেছিল, ভদ্রলোকটি একদৃষ্টে গাড়ীর দিকে চাহিয়া আছেন।

এই শোচনীয় দৃশ্য দেখিয়া, ললিত বড়ই ব্যথিত হইল। তাহার আশঙ্কা হইল, হয় ত রমণী কাঁদিয়া কাটিয়া নিতান্ত অস্থির হইয়া পড়িবেন। কিন্তু তাঁহার বাহ্য লক্ষণে অধীরতা বা ব্যাকুলতার চিহ্নমাত্রও পরিলক্ষিত হইল না।

তাঁহার এই প্রশান্ত ভাবে ললিত আরও বিষণ্ণ হইল। সে ভাবিল, গৃহস্থবধূ লজ্জায় অপরের সমক্ষে ফুকারিয়া কাঁদিতে পারিতেছেন না। হয় ত অবগুণ্ঠনের অন্তরালে অশ্রুর উৎস উথলিয়া উঠিয়াছে। ত্রাসে ও উদ্বেগে না জানি রমণীহৃদয় কতই আকুল হইয়া পড়িয়াছে। সঙ্গে আত্মীয় স্বজন আর কেহ নাই, এমন কি, একটা দাস বা দাসী পর্য্যন্ত নাই। এরূপ অবস্থায় অসহায়া সুন্দরী যুবতী রমণীর চিত্তে কত আশঙ্কার উদয় হইতে পারে!

ললিত রমণীকে অনেক প্রবোধ দিল, অনেক সান্ত্বনা করিল। বলিল, "আপনি ভাবিবেন না। কাল সকালেই আপনি আপনার স্বামীর সাক্ষাৎ পাইবেন। আজ রাত্রে যাহাতে আপনি নিরাপদে নির্ব্বিঘ্নে থাকিতে পারেন, সে জন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।"

সেই কক্ষে আরও তিন চারিটি ভদ্রলোক ছিলেন; তাঁহারাও রমণীকে অনেক প্রবোধ দিলেন।

ললিতের এখন আর সে কৌতূহলদৃষ্টি নাই। যে দৃষ্টি ইতিপূর্ব্বে রমণীর

অবগুণ্ঠনসম্বদ্ধ সৌন্দর্য্য দেখিবার জন্য ঔৎসুক্য প্রকাশ করিয়াছিল, এবং বিফলমনোরথ হইয়া সেই সৌন্দর্য্যসার চরণযুগলের উপর অবলুণ্ঠিত হইতেছিল, সে দৃষ্টি এখন আর নাই।

সন্ধ্যা আসন্ন। মুমূর্ষু সূর্য্যের অন্তিম কিরণে অনুরঞ্জিত নীল আকাশখানি তখন কারুখচিত চন্দ্রাতপের মত দিগ্বলয়ে মিশিয়া ঝুলিতেছে। বিচ্ছিন্ন বিহগদম্পতি সম্মিলনের আকাঙ্ক্ষায় স্ব স্ব নীড়াভিমুখে ধাবিত হইতেছে। কৃষক বালকগণ হস্তস্থিত পাঁচনী দ্বারা কখন উভয়পার্শ্বস্থ শস্য, কখন সম্মুখস্থ গৃহপালিত পশুপালকে তাড়না করিতে করিতে, ক্ষেত্রবীথির মধ্য দিয়া গৃহে ফিরিয়া যাইতেছে। অদূরবর্ত্তী শ্যামমমতাময় পল্লীপট তখন সন্ধ্যার অসিতাঞ্চলের অন্তরালে লুক্কায়িতপ্রায়।

আর ললিত? সে তখন এই অসহায়া যুবতী রমণীকে লইয়া রাত্রিকালে কোথায় যাইবে, কোথায় থাকিবে, সেই চিন্তায় অধীর।

রাত্রি প্রায় আটটার সময় ট্রেণ ললিতের উদ্দিষ্ট ষ্টেশনে পঁহুছিল। সে রমণীকে বলিল, "এই ষ্টেশনেই আমাদের নামিতে হইবে।" নিকটে কোন মুটিয়া দেখিতে না পাইয়া সে নিজেই জিনিসপত্র প্লাটফরমে নামাইয়া রাখিয়া আসিল। তার পর রমণীকে বলিল, "আপনি এইবার নামিয়া আসুন।" সে দরজার পাশে দাঁড়াইয়া তাঁহার অবতরণের অপেক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু রমণী নামিলেন না। যে ভাবে বসিয়াছিলেন, সেই ভাবেই বসিয়া রহিলেন।

অপেক্ষাকৃত উচ্চস্বরে সে পুনরায় তাঁহাকে নামিবার জন্য অনুরোধ করিল। তথাপি তিনি নড়িলেন না। প্রস্তরাসনে প্রতিষ্ঠিত মর্ম্মরমূর্ত্তির মত অচঞ্চল হইয়া রহিলেন।

ললিত মনে করিল, হয় ত ভয় ও ভাবনায় তিনি একান্ত অভিভূত হইয়া পড়িয়াছেন। সে তাঁহাকে বহু সান্ত্বনা ও প্রবোধ দিয়া আবার তাঁহাকে নামিবার জন্য অনুরোধ করিল। তথাপি রমণী পূর্ব্ববৎ নিশ্চল।

অবিলম্বে ট্রেণ ছাড়িবার আশঙ্কায় সে পুনঃপুনঃ তাঁহাকে নামিবার জন্য মিনতি করিতে লাগিল। তাহাতেও রমণীর কোন ভাবান্তর হইল না। তিনি যেমন বসিয়াছিলেন, তেমনই বসিয়া রহিলেন।

ললিত ক্রমশঃ ব্যস্ত হইয়া উঠিল, অধীরকণ্ঠে বলিল, "হয় ত এখনই গাড়ী ছাড়িয়া দিবে। আপনি শীঘ্র করিয়া নামুন। গাড়ী ছাড়িয়া দিলে

আপনিও বিপদে পড়িবেন, এবং আমাকেও মহা বিপদে ফেলিবেন। কাল সকালে আপনার স্বামী আসিয়া আমাকে—" কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই সে দেখিল, রমণী উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন। সে আশ্বস্ত হইল। রমণী অঙ্গের বসন অধিকতর সুসংযত করিয়া অবগুণ্ঠন আরও একটু টানিয়া দিয়া মন্থর-পদে গাড়ী হইতে অবতরণ করিলেন। ললিত আপনাকে মহাবিপন্মুক্ত মনে করিল।

কিন্তু পরক্ষণেই নূতন চিন্তা আসিয়া তাহাকে বেষ্টন করিয়া ধরিল। ভাবিতে লাগিল, কোথায় যাইবে। তাহার গন্তব্য স্থান সে স্থান হইতে অনেক দূর। তাহার সঙ্গিনীর স্বামীকে এই ষ্টেশনেই অপেক্ষা করিবে বলিয়া দিয়াছে। ভাবিয়া চিন্তিয়া অবশেষে ষ্টেশন-সন্নিহিত কোন স্থানে অবস্থান যুক্তিসঙ্গত মনে করিল। কিন্তু সে স্থানই বা কোথায়? রাত্রিকালে এই যুবতী রমণীকে একাকিনী রাখিয়া স্থানান্বেষণই বা কেমন করিয়া করে? ষ্টেশনের 'ওয়েটিংরুমে' থাকিতে পারিত, কিন্তু সেই ছোট ষ্টেশনে তাহারও অভাব। কিছু স্থির করিতে না পারিয়া তাহার চিত্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল।

এমন সময়, ধুতির উপর কালো চাপকান পরা, মাথায় কালো টুপি, হাতে লণ্ঠন—এক ভদ্রলোক আসিয়া তাহাদের নিকট উপস্থিত হইলেন। ললিত পরিচ্ছদে ও পরিচয়ে জানিল, তিনি সেখানকার ষ্টেশনমাষ্টার।

ললিত তাঁহাকে সকল ঘটনা বলিল, এবং এই রাত্রিকালে সেখানে কোন বাসোপযোগী স্থানপ্রাপ্তি সম্ভব কি না, তাহাও জিজ্ঞাসা করিল। ষ্টেশনমাষ্টার আনুপূর্ব্বিক সকল ঘটনা শুনিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, এবং সে রাত্রে তাঁহার বাসায় আতিথ্যগ্রহণের জন্য সবিনয়ে অনুরোধ করিলেন।

ললিত প্রথমতঃ ষ্টেশনমাষ্টারের এই সহৃদয়তা ও সমাদর দেখিয়া পরম পরিতুষ্ট ও আশ্বস্ত হইল। কিন্তু পরক্ষণেই তাহার মনে হইল, তিনি রেল-কর্ম্মচারী! সংবাদপত্রে সে এই শ্রেণীর জীবগণের অনেক পশুবৎ আচরণের কাহিনী পাঠ করিয়াছে। তখন তাঁহার এই অযাচিত অনুগ্রহ তাহার নিকট আশঙ্কার কারণ হইয়া উঠিল। সে সম্মতি অসম্মতি কিছুই প্রকাশ করিল না। তার পর যখন শুনিল যে, সেখানে তাহাদের উপযোগী অন্য কোন স্থান-প্রাপ্তি অসম্ভব, এবং ষ্টেশনমাষ্টার সেখানে সপরিবারে অবস্থান করিতেছেন, তখন অগত্যা তাঁহার আশ্রয়গ্রহণে সম্মত হইল।

ষ্টেশনগৃহের অব্যবহিত পশ্চাতেই ষ্টেশনমাষ্টারের বাসা। দরমার বেড়ায় ঘেরা সদর দরজার সামনে গিয়া 'ঝি—ঝি!' বলিয়া ডাকিবামাত্র একটি বর্ষীয়সী স্ত্রীলোক আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল। তিনি আগে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ললিত ও তাহার সঙ্গিনী রমণী ঝির সঙ্গে তাঁহার অনুবর্ত্তী হইল।

তাহারা আঙ্গিনায় গিয়া দাঁড়াইবামাত্র ষ্টেশনমাষ্টার রমণীকে ঘরের ভিতরে লইয়া যাইবার জন্য ঝিকে আদেশ করিলেন, এবং উঠানে একটা খাটিয়া টানিয়া আনিয়া ললিতকে বসিতে বলিলেন। ললিত সন্দিগ্ধচিত্তে তাঁহার কার্য্যকলাপ নিরীক্ষণ করিতেছিল। অবশেষে কক্ষদ্বারের অন্তরালে শিঞ্জিনী-শব্দ ও একটি শিশুকণ্ঠের "মা—মা—একে—মা?"—ইত্যাদি বিস্ময়সূচক প্রশ্ন শুনিয়া তাহার সন্দেহ অনেক পরিমাণে প্রশমিত হইল। তবুও রেলকর্ম্মচারীর প্রতি সে পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিতে পারিল না।

জলযোগান্তে ললিত, অনিচ্ছাসত্ত্বেও, ষ্টেশনমাষ্টারের সহিত ষ্টেশনে চলিয়া গেল। পুরুষ অতিথির অবস্থানের স্থান সেখানে ছিল না।

তখন ষ্টেশনমাষ্টারের পত্নী অভ্যাগতা রমণীকে লইয়া বাহিরে আসিলেন, এবং ঝিকে মুখ হাত পা ধুইবার জল দিতে বলিয়া নিজে তাঁহার জন্য জলযোগের আয়োজন করিতে গেলেন।

রমণী হাত পা ধুইয়া আসিয়া ঘরের দাওয়ায় বসিয়া পড়িলেন। ষ্টেশনমাষ্টারের স্ত্রী তাঁহাকে ঘরে আসিয়া জলযোগ করিবার জন্য অনেক টানাটানি করিয়াও যখন তুলিতে পারিলেন না, তখন সেইখানেই জলখাবার আনিয়া দিলেন। কিন্তু তাঁহার অনুরোধ সত্ত্বেও আগন্তুক রমণী শুধু জল ভিন্ন আর কিছুই গ্রহণ করিলেন না। আতিথ্যকারিণী অনেক ক্ষোভ প্রকাশ করিলেন। মনে মনে ভাবিলেন, "হয় ত স্বামিবিরহে খাওয়া দাওয়া কিছুই ভাল লাগিতেছে না।" নারীহৃদয় নারীদুঃখে গলিয়া গেল। তিনি তাঁহাকে অনেক সান্ত্বনা করিলেন, এবং প্রাতেই স্বামিসাক্ষাৎ পাইবেন বলিয়া তাঁহাকে আশ্বস্ত হইতে বলিলেন।

তার পর, কোথায় বাপের বাড়ী, কোথায় শ্বশুরবাড়ী, বাপ মা ভাই বোন আছেন কি না, শ্বশুরালয়ে কে কে আছেন, স্বামী কোথায় কি কাজ করেন, কোথায় তাঁহারা যাইতেছিলেন—ইত্যাদি নারীসুলভ নানা প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার অতিথি তাঁহার কথার উত্তর দেওয়া দূরে

থাক্‌, ঘোমটা পর্য্যন্ত খুলিলেন না। তিনি তাঁহাকে ঘোমটা খুলিতে, কথা কহিতে, অত লজ্জা ত্যাগ করিতে—পুনঃপুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন, "এত লজ্জা ত পূর্ব্ববঙ্গের রমণীতেও ক্বচিৎ দেখা যায়!" তিনি স্বামীর সঙ্গে পূর্ব্ববঙ্গে অবস্থানকালে সেখানকার 'চালচলন' সম্বন্ধে কতকটা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিলেন।

বলিয়া কহিয়া যখন কিছুতেই কিছু হইল না, তখন তিনি নিজ হাতে ঘোমটা ফেলিয়া দিলেন, দেখিলেন, দিব্য মুখশ্রী,—পরীর মত সুন্দরী! রমণী রমণীর রূপে মুগ্ধ হইলেন। পরক্ষণেই ঘোমটা আসিয়া স্বস্থান পুনরধিকার করিল।

আহারীয় প্রস্তুত হইলে ষ্টেশনমাষ্টার ও ললিত একত্র আসিয়া আহারাদি করিয়া গেলেন। ষ্টেশনমাষ্টারের পত্নী রমণীকে আহার করিবার জন্য কত ডাকাডাকি, কত সাধাসাধনা, কত অনুনয় বিনয় করিলেন, কিছুতেই তাঁহাকে অন্নের সম্মুখে আনিতে পারিলেন না। অতিথি অনাহারে রহিলেন দেখিয়া পতিপুত্রবতী গৃহস্থের অকল্যাণ-আশঙ্কায় শঙ্কিতা ও ব্যথিতা হইলেন।

সে রাত্রে ষ্টেশনমাষ্টারকে তাঁহার ষ্টেশনের কর্ম্মেই রাত্রিযাপন করিতে হইল। তাঁহার সুন্দরী পত্নী তাঁহার সুন্দরী অতিথিকেই শয্যাভাগিনী করিলেন।

ললিতের জন্যও স্বতন্ত্র শয়নস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু তাহার নিদ্রা আসিল না। শয্যা ত্যাগ করিয়া ষ্টেশনমাষ্টারের গৃহের পশ্চাতে বসিয়া, বেড়াইয়া, সমস্ত রাত্রি বিনিদ্রনয়নে কাটাইয়া দিল। রেলকর্ম্মচারীর চরিত্রের প্রতি অবিশ্বাসেই সে এত সতর্ক হইয়াছিল।

প্রাতে সাতটার সময় রমণীর স্বামী আসিয়া পঁহুছিলেন। ললিত তাঁহার আগমনপ্রতীক্ষায় প্লাটফরমে দাঁড়াইয়াছিল। সে তাঁহাকে তাঁহার স্ত্রীর কুশলসংবাদ জানাইল, এবং সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়া ষ্টেশনমাষ্টারের সহিত পরিচয় করিয়া দিল। রমণীর স্বামী, ষ্টেশনমাষ্টার ও ললিতের নিকট তাঁহার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলেন।

যত ক্ষণ পর্য্যন্ত সেই বিযুক্ত দম্পতিযুগলের পুনঃসাক্ষাৎ না হইল, তত ক্ষণ ললিত সেই ষ্টেশনেই রহিল। তার পর তাঁহাদের নিকট বিদায় গ্রহণ করিল। ষ্টেশনমাষ্টার ও রমণীর স্বামী তাহার অনেক সাধুবাদ করিতে লাগিলেন।

পুনর্মিলনের আশঙ্কায় অধীরচিত্ত বিরহী স্বামী যখন পত্নীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন, তখনও তিনি গাত্রোত্থান করেন নাই। শয্যার প্রতি চাহিয়া দেখেন, পত্নী 'উপুড়' হইয়া উপাধানে মুখ লুকাইয়া শুইয়া আছেন। অঙ্গের বসন আলুথালু। কবরীবিমুক্ত শ্লথকেশরাশি পৃষ্ঠে শয্যায় বিলুণ্ঠিত।

তিনি আশা করিয়াছিলেন, পত্নীর স্বেচ্ছায় উদ্যত ভুজবন্ধনের মধ্যে উভয়ের বিরহ-ব্যথার পর্য্যবসান হইবে। কিন্তু যখন দেখিলেন যে, পত্নী একবার মুখ তুলিয়াও চাহিলেন না, তখন নিজেই ডাকিলেন,—"ভাবিনী!" পত্নী মুখ তুলিলেন না।

"ভাবিনী, আমি এতক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে আছি, তুমি একবার চেয়েও দেখলে না? ছি! লক্ষ্মী আমার—ওঠো।"—বলিয়া তিনি শয্যার দিকে অগ্রসর হইলেন। রমণী উঠিয়া বসিলেন।

তাহার মুখের দিকে চাহিয়া তিনি বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। দেখিলেন, সেই যৌবন-উল্লসিত ঢল ঢল কনক-লাবণ্য কালিমাদিগ্ধ, সেই সদাহাস্যময় অনুরাগ-উৎফুল্ল নয়নদ্বয় তখনও নেত্রজলে অভিষিঞ্চিত হইতেছে। সে রূপের যোলকলা আজ বিষাদমেঘে সমাচ্ছন্ন। তিনি স্বামীর দিকে একবার চাহিয়াই অঞ্চলে মুখ ঝাঁপিয়া দিলেন।

স্বামী মনে করিলেন, তাঁহার বিরহে ও সারা দিন রাত্রি অনাহারে থাকিয়া ভাবিনী এমন শুকাইয়া গিয়াছে। তিনি পত্নীকে সে জন্য কত সস্নেহ তিরস্কার করিলেন, কত অনুরাগস্নিগ্ধ সান্ত্বনা-বাক্য বলিলেন, কত প্রেমপূরিত সম্ভাষণ করিলেন, অপরাধীর মত মিনতি করিলেন, কিছুতেই তাঁহার প্রিয়তমা প্রসন্না হইলেন না। সে কঠোর মৌনব্রত ভাঙ্গিল না। অধীরচিত্তে পত্নীকে আলিঙ্গন করিবার জন্য যেমন তিনি হাত বাড়াইলেন, পত্নী অমনি শয্যার অপর প্রান্তে সরিয়া গেলেন। পরপুরুষের কলুষ স্পর্শ হইতে আপনাকে অব্যাহত রাখিবার জন্য সাধ্বী যেমন ত্রস্তে দূরে সরিয়া যায়, তিনি তেমনই করিয়া সরিয়া গেলেন। স্বামী সিদ্ধান্ত করিলেন—অভিমান। বহু চেষ্টা করিয়াও যখন সে অভিমান ভাঙ্গাইতে পারিলেন না, তখন বিষণ্ণমনে তিনি ষ্টেশনের অভিমুখে ফিরিয়া চলিলেন। যাইবার সময় পত্নীকে বলিয়া গেলেন যে, দশটার সময় ট্রেণ। সেই ট্রেণেই তাঁহাদিগকে যাইতে হইবে। তিনি যেন প্রস্তুত হইয়া থাকেন।

ক্রমে বেলা উঠিল। ষ্টেশনমাষ্টারের আগ্রহাতিশয্যে তিনি স্নানান্তে

কিছু জলযোগ করিয়া লইলেন, কিন্তু তাঁহার পত্নী তখনও অস্নাতা, নিরশনা, শয্যাত্যাগে অসম্মতা।

তখন আর বিলম্ব করিলে চলে না। অল্পক্ষণের মধ্যেই ট্রেণ আসিয়া পড়িবে। অগত্যা পত্নীকে সেই অবস্থায় আসিতে বলিয়া তিনি সদর দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া তাঁহার আগমনপ্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

দশ পনের মিনিট কাটিয়া গেল। তিনি ক্রমশঃ অধীর হইতে লাগিলেন। তখনও তাঁহার পত্নী শয্যাত্যাগ করিলেন না; উপাধানে মুখ লুকাইয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

ষ্টেশনমাষ্টারের স্ত্রী এই অতিথিকে লইয়া বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িলেন। ইনি কোন কথা বলিলেও কাণে তুলেন না; যা করেন, তাও কেমন বেখাপ। স্বামী আসিলেন, তবুও কোন ভাবান্তর হইল না। অধিকন্তু কাঁদিয়াই আকুল! এক একবার মনে করিলেন—পাগলের ছিট নাইত।

শেষে তিনিও বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, "ভদ্রলোক কতক্ষণ বাহিরে দাঁড়াইয়া—আপনার এ কি রকম! কান্নাই বা কেন! স্বামীর সঙ্গে যাইতেছেন, এ ত সুখের কথা। নারী-জন্মে স্বামি-সঙ্গ অপেক্ষা—"

তাঁহার কথা শেষ হইতে না হইতেই রমণী উঠিয়া বসিলেন। উথলিত অশ্রু গঙ্গোত্রী-ধারার মত তাঁহার গণ্ডদ্বয় প্লাবিত করিতেছিল। রমণী বলিলেন, "স্বামী?—কে স্বামী? ও আমার স্বামী নয়।" কি এক মর্ম্মন্তুদ যাতনায় যেন তাঁহার কণ্ঠ অবরুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল।

ষ্টেশনমাষ্টারের পত্নী অবাক্! তাঁহার বিস্ময়বিহ্বল দৃষ্টি রমণীর মুখে সম্বদ্ধ। কিছু ক্ষণ এই ভাবে থাকিয়া পরে বলিলেন, "সে কি!—'কে স্বামী'? আপনি বলেন কি?—কাল রাত্রে আপনি যে ভদ্রলোকটির সঙ্গে এখানে আসিয়াছিলেন, তিনিই ত এই পরিচয় করে দিয়ে গেছেন।"

আগন্তুক রমণী আর ধৈর্য্য রাখিতে পারিলেন না। উদ্বেলিতকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন,—"তবে কি তিনি চলে গেছেন?—কখন গেলেন—কখন গেলেন?" সেই রোদনলোহিত নয়নদ্বয় হইতে যেন উন্মাদের দৃষ্টি বিচ্ছুরিত হইতে লাগিল।

ষ্টেশনমাষ্টারের স্ত্রী ঘৃণায় লজ্জায় মরমে মরিয়া গেলেন। তিরস্কারচ্ছলে বলিলেন, "ছি! কাহার জন্য আপনি এমন করিতেছেন। আপনি না গৃহস্থের বউ?"

রমণীর সর্ব্বাঙ্গ তখন থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল। সেই উন্মাদদৃষ্টি তিরস্কারিণীর মুখের উপর স্থাপিত করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "না—না।—তিনিই আমার স্বামী—তিনিই আমার স্বামী।—আমি কালামুখী—আমার ইহকাল—" আর কথা বাহির হইল না। পতিতা, অনুতাপবিদ্ধা, বেপথুমতী রমণী শয্যার উপর মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন।———

নিত্যপূজা।

যুগযুগান্তর ধরি চক্রনেমিক্রমে
শত আবর্ত্তের মাঝে, জনমে জনমে,
জনপদে শৈল-সিন্ধু-সরিৎ-কান্তারে
তোমারে পূজিয়াছিনু কি কি উপচারে
মনে নাহি অয়ি দেবি জননী আমার!
আজি এই উষালোকতরুণা ধরার
বহু-বট-গিরি-শির গলিত কাঞ্চনে
সদ্যঃ পরিস্নাত স্নিগ্ধ, কৌষেয় বসনে
ব্রাহ্মণবটুর মত স্থির অবিচল!
বাপী হ্রদ সরসীর স্বচ্ছ নীল জল
তরল আনন্দ সম শ্যামা প্রকৃতির;
বিচিত্র কুসুমদাম, জগৎলক্ষ্মীর
পূর্ণ সুধাপাত্র সম; শান্ত সমীরণ
জননী-পরশরূপে পশিছে মরম।
লতাকিশলয়গুলি স্নিগ্ধ শ্যামল
যেন তারা স্নাত পূত পেয়ে শান্তিজল
তপস্বিনী ধরণীর কমণ্ডলু হ'তে!
সব পরিপূর্ণ করি নিখিল জগতে

বিরাজিছে শরতের মৌন নভঃস্থল,
ভিন্নাঞ্জন সম নীল, প্রসন্ন অতল!
ওই অভ্রপোতগুলি দূর নীলিমায়,
বালাতপে রক্তশির, আকাশগঙ্গায়
যেন ঐরাবতশিশু, কুম্ভদেশ'পরে
স্বরগ-সিন্দুর রাগ; পূরব অম্বরে
উষার লাবণ্যহাসি, তরল লীলায়
স্রোতোমুখে ছুটিয়াছে দিগন্তসীমায়।
বনান্ত প্লাবিয়া দূরে বিমল রাগিণী
বিহগের কলকণ্ঠে, দিগন্তরঙ্গিণী
বিলাসিনী দিগ্‌বধূরা যেন গো উল্লাসে
সুকুমার কম্বুকণ্ঠে কম্পিত উচ্ছ্বাসে
গায়িতেছে অয়ি মাতঃ! তোমার বোধন।

হেরি' দেবভোগ্য এত ধ্রুব আয়োজন
ধরণীতে, মহাকাশে, বিশ্বচরাচরে,
ছুটিয়া এসেছি আজ আকুল অন্তরে
তোমার মন্দিরমূলে, ফেলিয়া সুদূরে
মোর ক্ষুদ্র কেলিগৃহ বিশ্ব-অন্তঃপুরে।
নিভৃতে বসিয়া হেথা হে দেবি, জননি,
এ কি এ উৎসবকলা রচিছ আপনি
নিজ নিত্যপূজা তরে! এই সৃষ্টিধারা
বিচিত্রজীবনলীলা চিরকলস্বরা
নিশিদিন ছুটিয়াছে করি' ছল্ ছল্
পূজিয়া বিনীত গর্ব্বে, তব পদতল।

আসিতেছে আসিয়াছে কত নর নারী
ক্ষুদ্র হৃদিকোষে বহি অভিষেকবারি
তোমারি পূজার তরে; দূর্ব্বা, বিল্বদল,
অক্ষত, চন্দনধূপ, স্নিগ্ধ গঙ্গাজল

কত ভক্ত আহরিছে করি প্রাণপণ ;
সংসার-কণ্টকমাঝে বিক্ষতচরণ
হইতেছে অগ্রসর তোমার আশায় ;
সফল, সার্থকজন্মা মানে আপনায়
তোমার দর্শনে কেহ, কেহ বা পরশে।
হে জননি, বিশ্বতন্ত্র উৎসবের রসে
রেখেছ ডুবায়ে, লক্ষকোটি জনস্থান
রেখেছে অখণ্ড করি' তব স্তবগান
অসংখ্য উদাত্ত কণ্ঠে কল্লান্ত ধরিয়া।
তোমারি উৎসবমদে অনিশ মাতিয়া
জনক জননী জায়া অপত্য ভগিনী
দৃঢ় আলিঙ্গনে বাঁধি পালিছে ধরণী।
তুমি একা সনাতনী সাজি বরাভয়ে
রহিয়াছ নিখিলের নিভৃত নিলয়ে
লক্ষ্যহীন, বন্ধহীন শত কোটি প্রাণী
রেখেছ বিরাট স্নিগ্ধ প্রাণবলে টানি'
কেন্দ্রমুখে। প্রতিষ্ঠিত তোমাতে সকলি !
কত বিশ্বপুরোহিত ভরিয়া অঞ্জলি
বিশ্বের মঙ্গল-অর্ঘ্য তোমার চরণে
নিবেদিছে ; কত ঋষি বদ্ধ যোগাসনে
তোমার কল্যাণীমূর্ত্তি করিয়া দর্শন
ভূমা রসে নিশিদিন সমাধি-মগন !
ললিত বরণে কত চিত্রকর-কবি
আঁকিয়াছে, অয়ি রমে ! তব মুখচ্ছবি ;
তোমার সৌন্দর্য্যকণা, হৃদয়স্পন্দন,
অমল অমৃতবাণী, প্রাণ-রসায়ন
কবিরা রেখেছে যত্নে অক্ষয় ভাণ্ডারে,
সনাতন, পুরাতন কান্ত কাব্যাগারে।
কতই বাল্মীকি ব্যাস আসি এ ধরায়
অম্লান পঙ্কজমালা তোমার গলায়

দিয়ে গেছে। 'পূর্ণপাত্র' প্রেমযজ্ঞশালে,—
এ বিশ্বের সতী নারী কত পুরাকালে
প্রাণের আশ্রয়, বল, সর্ব্বার্থ তাহার
পতিপ্রেমে, পূজে গেছে চরণ তোমার!
সীমন্ত-সিন্দুর-বিন্দু সযত্নে মুছিয়া
তোমার চরণতল দিয়াছে রাঙ্গিয়া;
ব্রহ্মাণ্ডের পুণ্যব্রত সকল ব্রাহ্মণ
তোমার অঙ্গনতলে করে বিচরণ
লোকতন্ত্রে শান্তিমন্ত্রে করিয়া দীক্ষিত!
রক্ষাব্রত ক্ষত্রিয়ের বিমল চরিত
রক্ত শতদল সম পাদপীঠে তব
শোভিছে যুগান্ত ধরি; রাজর্ষি সকল
প্রজার মঙ্গলকল্পে সর্ব্বস্ব সম্বল
স'পেছে তোমায় দেবি! রাজরাজেশ্বরি!
কত গার্গী প্রাণপণে দিবসশর্ব্বরী
আজীবন থাকি তব পদে নিবেদিতা
তোমারি বন্দনা গাহি' জগৎ-বন্দিতা!
কত গৃহী সাথে লয়ে' বহুপরিবার,
তোমাতে করিয়ে যোগ সমগ্র তাহার,
কুসুমপরাগলিপ্ত ভৃঙ্গের মতন
করিতেছে হৃদিকোষে মধু-আহরণ!

এ কি হেরি দেবি! তব মন্দিরপশ্চাতে!
ধরণীর ঘন ঘোর সুপ্ত মধ্যরাতে
কত কংস, জরাসন্ধ, ক্রূর দুর্য্যোধন,
বলান্ধ অসুর বৃত্র, প্রমাথী রাবণ,
অকাতরে আপনার হৃদয়শোণিতে
পূজিয়াছে তোমা দেবি! হে বিশ্বপূজিতে!
এ পূজা তান্ত্রিক পূজা, এরা 'বীরাচারী';
এরা এই জগতের গোপন-পূজারী;

মূর্ত্তিমান ধ্বংস সম লুব্ধ, হিংস্র বলে
তোমারে লঙ্ঘিতে গিয়া, তব পদতলে
বন্দী হ'য়ে, বলি দি'য়ে সর্ব্ব পরিবার
তোমারি মহিমা মাতঃ! করেছে প্রচার!
পুতনা, তাড়কা কিংবা শূর্পণখা কত
আসি হেথা ভয়ঙ্করী ভৈরবীর মত
সমগ্র ধরণীখানি খর্পর কপালে
আচ্ছন্ন করিতে গিয়া, সর্ব্ব অন্তরালে
নিজ রক্তে অস্থিমাংসে ও গো বিশ্বরাণি,
নির্ম্মিতেছে অভিনব তব রাজধানী।

প্রাণবলে দেহবলে দেবদৈত্যগণ
সুপ্রতিষ্ঠ করিয়াছে তব সিংহাসন;
পূজে তোমা সবে মিলি' দেবতা অসুরে;
ধূলায় কর্দ্দমে, কেহ কুসুমে কেশরে;
কত অবধূত, কত যতি, ব্রহ্মচারী,
কত কাপালিক, কত চীরদণ্ডধারী
দেবব্রত যোগী, সবে মিলি এ ভূতলে
মহা কুম্ভমেলা তব রচিছে সকলে!
শত বন্ধে আলিঙ্গিয়া এই বিশ্বপুর
তোমার সাধনরত শকুনি, বিদুর।
বিরাজিছ অয়ি ধ্রুবে, অয়ি পরাৎপরে,
সর্ব্বমঙ্গলার মূর্ত্তি বিশ্বপদ্ম'পরে।
রহিয়াছ মহাবটে তৃণস্তম্বে তুমি
শতবাহু প্রসারিয়া এই কর্ম্মভূমি!

আমি দীন, রিক্তাঞ্জলি, অজ্ঞাতে রচিয়া,
রয়েছি বিস্ময়ে মাতঃ তোমায় চাহিয়া!

শ্রীগঙ্গাচরণ দাসগুপ্ত।

ব্রহ্মকুণ্ড।

ব্রহ্মকুণ্ড হিন্দুদিগের একটি সুপ্রসিদ্ধ তীর্থ। প্রতি বৎসর চৈত্র মাসের শুক্লা অষ্টমীতে এই পুণ্যতীর্থে স্নানোপলক্ষে প্রকাণ্ড মেলা বসিয়া থাকে। ব্রহ্মকুণ্ডের পবিত্র সলিলে অবগাহন করিলে সমস্ত পাপ বিদূরিত হয়, ইহাই এতৎপ্রদেশীয় হিন্দুগণের আন্তরিক বিশ্বাস। তাই হিন্দুগণ নির্দ্দিষ্ট দিনে ব্রহ্মকুণ্ডে অবগাহন করিয়া থাকেন।

যে ঘনসন্নিবিষ্ট শৈলশ্রেণী আসামের উপান্তভাগে শ্রীহট্টের পশ্চিম প্রাচীর-রূপে দণ্ডায়মান, তাহার দক্ষিণাংশে, গিরিপাদমূলে, বিবিধ বিচিত্র তরু-গুল্ম-লতায় সমাচ্ছন্ন সমুন্নত সমভূমির মধ্যস্থলে, পুণ্যতীর্থ ব্রহ্মকুণ্ড মধ্যমণির ন্যায় বিরাজমান। এই স্থান আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের সনতলা ষ্টেশনের ছয় মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত। বিলাসিনী বাসন্তীর অনুপম লাবণ্যপ্রভায় বিলসিত, তরু-গুল্ম-বল্লরী-কুঞ্জাবৃত, বসন্ত-প্রসূন-সুরভিত, মলয়-বীজিত, কোকিলকূজিত, ভ্রমরগুঞ্জিত শ্যামল প্রদেশের দৃশ্য কি মধুর, কি লীলাচঞ্চল, কি প্রাণারাম! তাহার মধ্যস্থলে ব্রহ্মকুণ্ডের দৃশ্য কি পবিত্র, কি প্রশান্ত, কি মনোহর!

আজ সিতাষ্টমী তিথি। প্রভাতে সুখময়ী সঞ্জীবনী ঊষার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে নানা দিগ্দেশাগত, বিচিত্রপরিচ্ছদধারী, বিভিন্ন-সম্প্রদায়ের সহস্র সহস্র জনগণের সমাগমে প্রকৃতির সেই নির্জ্জন লীলাকানন অপূর্ব্বভাবে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। বাসন্তীর এই নির্জ্জন কানন আজ অগণ্য মানব, অসংখ্য দোকান পসারী ও বিবিধ দ্রব্যজাতে পরিপূর্ণ।

অতি প্রত্যূষেই যাত্রিগণ দলে দলে ব্রহ্মকুণ্ডের পবিত্র নীরে অবগাহন করিবার জন্য কুণ্ডমধ্যে অবতরণ করিয়া স্নান, সন্ধ্যা ও তর্পণাদি করিতে লাগিল। যাত্রিগণ দক্ষিণ তীর দিয়া অবতরণ করে; এবং স্নানান্তে উত্তর তীর দিয়া উপরে উঠে। পূর্ব্বে উত্তরণ অবতরণ সম্বন্ধে কোনও নিয়ম ছিল না। যাত্রিগণ স্ব স্ব ইচ্ছামত যে কোনও তট দিয়া কুণ্ডে অবতরণ ও উত্তরণ করিত। তিন চারি বৎসর হইল, স্বাধীন ত্রিপুরার রাজকীয় পুলিস কর্ত্তৃক এই নিয়ম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ব্রহ্মকুণ্ড স্বাধীন ত্রিপুরার মহারাজ বাহাদুরের অধিকারভুক্ত, এবং ত্রিপুরা রাজ্যের মোহনপুর থানার অন্তর্গত। মোহনপুর থানার পুলিস ও অন্যান্য রাজকর্ম্মচারিগণ প্রতিবৎসর মেলার সময় শান্তি-রক্ষা ও শৃঙ্খলাবিধানের জন্য ব্রহ্মকুণ্ডে উপস্থিত থাকেন। প্রতি বৎসরই

মেলা বসিবার পূর্ব্বে ব্রহ্মকুণ্ডের তীরভূমি অগ্নিসংযোগে দগ্ধ করিয়া পরিষ্কৃত করা হয়। সুতরাং এই জঙ্গলময় স্থানে মেলা বসিলেও যাত্রিগণকে কোন প্রকার ক্লেশ বা অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না। ব্রহ্মকুণ্ডের উত্তর ও দক্ষিণ অনেক দূর ব্যাপিয়া মেলা বসিয়া থাকে।

ব্রহ্মকুণ্ড একটি বৃহৎ পার্ব্বত্য উৎস। এই কুণ্ডের উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ জনপ্রবাদ প্রচলিত আছে যে, ত্রেতাযুগে মাতৃহন্তা পরশুরাম মাতৃ-হত্যার পর স্বীয় কুঠার দ্বারা এই স্থলে আঘাত করেন, সেই আঘাতেই ব্রহ্মকুণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছে। ব্রহ্মকুণ্ডের আকার ক্ষেপণী বা প্যারাবোলা ক্ষেত্রের ন্যায়। এই ক্ষেপণীর বক্র রেখা কুণ্ডের পশ্চিমোত্তর কোণ হইতে আরম্ভ হইয়া পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে সমাপ্ত হইয়াছে। কুণ্ডের পশ্চিম সীমা সরলরৈখিক। এই সরল রেখা ভেদ করিয়া একটি নাতিপ্রশস্ত, অতি গভীর খাত পশ্চিম দিকে অনেক দূর পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। সেই খাত ও তাহার পাহাড় নিবিড় জঙ্গলে সমাচ্ছন্ন থাকায় আমরা তাহার শেষ সীমার নির্ণয় করিতে পারি নাই। ব্রহ্মকুণ্ডের উত্তর ও দক্ষিণ তীর পরিচ্ছন্ন, বনহীন; পূর্ব্ব ও পশ্চিম তট ভীষণ বন জঙ্গলে সমাচ্ছন্ন। পূর্ব্ব তটের মধ্য দিয়া একটি সঙ্কীর্ণ জলপ্রণালী তটভেদ করিয়া অনেক দূর প্রবাহিত হইয়াছে। আমরা তাহারও উৎপত্তিস্থান নির্ণয় করিতে পারি নাই। এই জলপ্রণালী দিয়া অবিরাম জলস্রোতঃ প্রবাহিত হইয়া কলকল রবে ব্রহ্মকুণ্ডে পতিত হইতেছে। সে ধ্বনি বড়ই প্রাণারাম। পূর্ব্বে যে খাতের কথা বলিয়াছি, তাহা প্রায়ই শুষ্ক থাকে। অধিকপরিমাণে বৃষ্টি হইলে ইহার কিয়দংশে জলপ্রবাহ সঞ্চারিত হয়। এই খাতের কিয়দংশ ব্রহ্মকুণ্ডের অন্তর্ভুক্ত।

ব্রহ্মকুণ্ডের জলভাগের পরিমাণ অন্যূন ২৫৩০ বর্গ ফীট হইবে। ইহার জল সকল স্থানে সমান গভীর নহে। কুণ্ডের মধ্যভাগ অপেক্ষাকৃত অগভীর। উপরের তীরভূমি হইতে বৃহৎ বৃহৎ মৃত্তিকাখণ্ড স্খলিত হইয়া কুণ্ডমধ্যে পতিত হয়; এই কারণে কুণ্ডের আভ্যন্তরীণ প্রান্তভাগের গভীরতার হ্রাস হইয়াছে।

স্নানান্তে যাত্রিগণ তীরে উঠিয়া মেলা দেখিতে যায়, এবং বিবিধ দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া থাকে। এই মেলায় 'ঘিলা' নামক এক প্রকার পার্ব্বত্য লতাজাত ফল পাওয়া যায়। এ অঞ্চলের লোক এই ঘিলা দ্বারা কেশ ও গাত্রাদি মার্জ্জিত করিয়া থাকে। এই ফল অন্যান্য প্রয়োজনেও ব্যবহৃত হয়।

রামকৃষ্ণ গোঁসাইর আখড়া।

ব্রহ্মকুণ্ডে মেলা অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় না। বেলা প্রায় ৯৷১০ টার সময় এখান হইতে উঠিয়া এই স্থানের পাঁচ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত কৃষ্ণপুর গ্রামে রামকৃষ্ণ গোঁসাইর আখড়ায় গিয়া বসে। এই স্থানও স্বাধীন ত্রিপুরার মহারাজ বাহাদুরের অধিকারভুক্ত। এই আখড়াটি অতি বৃহৎ। চারিদিকে এক বর্গ মাইল পরিমিত স্থান প্রাচীরে পরিবেষ্টিত। প্রাচীরের অভ্যন্তরে চারিটি অট্টালিকা-সমন্বিত আখড়া। এই আখড়ার পূর্ব্বে ও পশ্চিমে দুইটি অতি বৃহৎ দীর্ঘিকা। এই সকল অট্টালিকা, প্রাচীর ও দীর্ঘিকা ত্রিপুরার মহারাজগণের সুকীর্ত্তির পরিচয় প্রদান করিতেছে। অট্টালিকা ও প্রাচীর স্থানে স্থানে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। দীর্ঘিকাগুলিও অনেক কালের খনিত বলিয়া বোধ হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ গোঁসাইর কাষ্ঠপাদুকাদ্বয়ই এই দেবালয়ের অধিষ্ঠিত বিগ্রহ। এখানে অন্য কোনও দেব-বিগ্রহ নাই। এই আখড়ায় কয়েক জন বৈষ্ণব মোহন্ত আছেন। তাঁহারা দেবালয়সম্বন্ধীয় যাবতীয় কার্য্যের তত্ত্বাবধান করেন। প্রাচীরের অভ্যন্তরে আখড়ার চতুষ্পার্শ্বে বিস্তৃত ভূমি আছে; তদুৎপন্ন শস্য ও মেলার সময় যাত্রিগণের নিকট হইতে সংগৃহীত অর্থেই দেবসেবার কার্য্য ও মোহন্তগণের ভরণপোষণের ব্যয় সুনির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। এই আখড়ায় স্ত্রীলোকের প্রবেশাধিকার নাই। এ অঞ্চলে কোনও ব্যক্তির গাভী প্রসব করিলে গোবৎসের কল্যাণার্থ রামকৃষ্ণ গোঁসাইর দেবালয়ে তাঁহার সেবার উদ্দেশে দুগ্ধ প্রদত্ত হয়। যাত্রিগণ মেলার পূর্ব্ব দিন এই স্থানে আসিয়া অবস্থিতি করিয়া থাকে; প্রভাতে ব্রহ্মকুণ্ডের উদ্দেশে প্রস্থান করে।

ব্রহ্মকুণ্ডের ন্যায় এখানেও সহস্র সহস্র লোকের সমাগম হইয়া থাকে। পার্ব্বত্য স্ত্রীপুরুষগণও ধর্ম্মোদ্দেশে ব্রহ্মকুণ্ড হইতে এখানে আগমন করিয়া থাকে। এই সকল পার্ব্বত্য জাতির মধ্যে টিপরা ও মেথলীই প্রধান। টিপরা পুরুষদিগের পরিধানে হাঁটু পর্য্যন্ত ধুতি। স্ত্রীলোকদিগের আপাদ বক্ষ বিবিধ বর্ণের বস্ত্রে আবৃত। এই সকল বস্ত্রে অসভ্য টিপ্‌রাগণের উন্নত বস্ত্র-শিল্পের পরিচয় পাওয়া যায়। টিপ্‌রা রমণীগণের প্রকোষ্ঠে রৌপ্য বা পিত্তলের বলয় ও কাচের চুড়ি, কণ্ঠে হার, মস্তকে গোলাকার শালু কাপড়ের ঝালরওয়ালা মকমলের ওড়না। মেথলী পুরুষগণের বেশভূষাও প্রায় টিপরার মত। ইহারা টিপ্‌রাদের অপেক্ষা কিঞ্চিৎ উন্নত। ইহারা নানাবর্ণে রঞ্জিত

বস্ত্র ও গাত্রাবরণাদি ব্যবহার করে। মেথলী স্ত্রীপুরুষগণের কানের ছিদ্র এত বড় যে, ইহারা এক কিংবা দেড় বুরুল পরিমিত রৌপ্য বা স্বর্ণখণ্ড অনায়াসে কর্ণচ্ছিদ্রে ব্যবহার করিয়া থাকে। মেথলী রমণীগণের বেশভূষা অতি মনোরম। ইহাদের দেহকান্তি গৌর, বক্ষঃস্থল হইতে কটিদেশের উপরিভাগ পর্য্যন্ত নীল, পীত, হরিত প্রভৃতি বিচিত্র বর্ণের শাটিনের জামা, পরিধানে বিবিধ বর্ণের রেশমী শাড়ী, হাতে বালা, কাণে রৌপ্যময় বা স্বর্ণনির্ম্মিত অলঙ্কার। মেথলী রমণী প্রকৃতির প্রসাদে স্বভাবতঃই সুন্দরী। ইহাদের সকলেই হৃষ্টপুষ্ট, দেহযষ্টি সর্ব্বদাই লাবণ্যপ্রভায় ঢল ঢল, হৃদয় সততই প্রফুল্ল। ইহারা অতি সরল। টিপ্‌রা ও মেথলীরা স্ত্রীপুরুষনির্ব্বিশেষে অতি পরিশ্রমী। টিপ্‌রাদের চক্ষু ক্ষুদ্র ও নাসিকা অনুন্নত। মেথলীদের চক্ষু টিপ্‌রাদের ন্যায় ক্ষুদ্র নয়, তাহাদের নাসিকাও উন্নত। মেথলীরা পরম বৈষ্ণব।

অপরাহ্নে মেলা ভাঙ্গিয়া গেল। নিকটবর্ত্তী যাত্রিগণ মেলা দেখিয়া স্ব স্ব আবাসে প্রত্যাগমন করিল। দূরবাসী যাত্রিগণের অনেকেই রামকৃষ্ণ গোঁসাইর দেবালয়ে রজনীযাপন করিল। ইহারা রাত্রিযাপনের জন্য দীর্ঘিকার তীরবর্ত্তী বৃক্ষতলে আশ্রয়গ্রহণ করিল। দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা সমাগত হইল। রামকৃষ্ণ গোঁসাইর দেবালয়ে সান্ধ্য আরতি বাজিয়া উঠিল। জ্যোৎস্না কিরণে সেই বটবৃক্ষসঙ্কুল সরোবরকূল, অদূরবর্ত্তী উপবন ও প্রান্তর যেন আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইতে লাগিল। অদূরে শ্যামল রঘুনন্দন গিরিশ্রেণী মেঘের কোলে প্রহরীর ন্যায় দণ্ডায়মান। সঙ্কীর্ত্তনের গভীর রোলে চারি দিক কাঁপিয়া উঠিল। পুরুষগণ আবেগভরে সঙ্কীর্ত্তনে মত্ত হইল। রমণীগণ বটবৃক্ষতলে রাধাকৃষ্ণলীলা গান করিতে লাগিল।

চারি দিকে হরিধ্বনি! বন, উপবন, সরোবর, প্রান্তর পরিপূর্ণ করিয়া সেই হরিধ্বনি অবিরত উত্থিত হইতেছে। এইরূপে রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিল। স্ত্রী পুরুষ দলে দলে যে যেখানে পারিল, গাছের তলে অঞ্চল বিছাইয়া শয়ন করিল। প্রভাতে আমরা সকলেই স্ব স্ব গন্তব্যপথে যাত্রা করিলাম।

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র রায়।

সুপ্তা।

সরম-চকিতা বালা
আজি পড়িয়াছে ধরা,
ঢাকিতে রূপের ভার
আজি আর নাই ত্বরা।
ধন্ম কুহকিনী নিদ্রে!
ভাল দূতী তুই বটে,
তুই না থাকিলে ভাগ্যে
এ শোভা কি দেখা ঘটে!
দেখি দেখি আঁখি ভ'রে—
মেটেনি দেখার সাধ;
উছলিছে রূপ আজি
ভাঙ্গিয়া সরম-বাঁধ!
দৃষ্টির পরশে বালা
হায় যদি জেগে উঠে,
তা' হ'লে ত সুখ-নেশা
এখনি যাইবে ছুটে!
মরি কি শোভার রাজ্য
কিশোরীর তনুখানি!
অলকা অমরাবতী
মোনবতী হার মানি'।
প্রেয়সীর প্রতি অঙ্গে
বসন্ত-উৎসব যেন,—
কে দেখে কে শোনে আহা
নিত্য নিত্য হয় হেন!

শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য।

সহযোগী সাহিত্য।

রুসিয়ায় স্ত্রীজাতির অবস্থা।

রুসিয়ার স্ত্রীলোকদিগের অবস্থা সম্বন্ধে মিষ্টার জেমস্ বার্ণস্ একটি কৌতূহলজনক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। আমরা তাঁহার বক্তব্যের সার নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

অনূঢ় অবস্থা।

রুষদেশে অনূঢ়া কন্যা পিতামাতার ইচ্ছার সম্পূর্ণ অধীন। বয়স অধিক হইলেও তাহার এ অবস্থার পরিবর্ত্তন হয় না। অবিবাহিতা কন্যা জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সংসারে পিতামাতার ইচ্ছার সম্পূর্ণ অধীন হইয়া থাকে। অনূঢ়া কন্যার উপর পিতামাতার অবাধ অধিকার। এ বিষয়ে তাঁহাদের ক্ষমতা কোনরূপে নিয়ন্ত্রিত নহে। তাঁহাদের ব্যবহার যতই কঠোর হউক না কেন, তাহার কোনও প্রতীকার নাই। যদি অনূঢ়া কন্যার কার্য্যকলাপ পিতামাতার প্রীতিপ্রদ না হয়, তাহা হইলে তাঁহারা আইন আদালতের আশ্রয় না লইয়াই তাহাকে স্বভাবশোধক কারাগৃহে বা কোনও মঠে স্বচ্ছন্দে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারেন। বিবাহের পরও কন্যা কিয়ৎপরিমাণে পিতার ইচ্ছার অধীন থাকে। যদি পিতা পীড়িত হয়েন, তাহা হইলে তাঁহার শুশ্রূষার জন্য তিনি কন্যাকে স্বগৃহে আনয়ন করিতে পারেন। পত্নীবিয়োগ হইলে, পিতা তিন মাসের জন্য কন্যাকে স্বগৃহে কর্ত্রীত্ব কার্য্যে নিযুক্ত করিতে পারেন। জামাতার মৃত্যু হইলে, তিনি কন্যাকে নিজগৃহে লইয়া আসিতে, এবং আইন-অনুসারে দৌহিত্রদের অভিভাবক হইতে পারেন। পিতার অনভিমতে কোনও কন্যা বিবাহ করিতে পারে না; কিন্তু কন্যা সম্পত্তিশালিনী হইলে পিতার অনিচ্ছা-প্রকাশের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগ করিতে পারে।

দাম্পত্য।

বিবাহের পর রুষীয় স্ত্রীলোক পিতামাতার অপরিসীম ক্ষমতার পরিবর্ত্তে স্বামীর অপরিসীম ক্ষমতার অধীন হয়। রুষীয় আইন এ বিষয়ে বেশ

স্পষ্টতঃ বলিয়াছেন, "এক কন্যা স্বামী ও জনক-জননী, এই দুই পক্ষের অসীম ক্ষমতার অনুযায়ী কার্য্য কিরূপে করিতে পারে?" সুতরাং পিতা আপন "অসীম" ক্ষমতার সঙ্কোচ করেন, এবং তৎপরিবর্ত্তে স্বামীর "অসীম" ক্ষমতা প্রভাবশালী হয়। এমন কি, স্বামীর অনুমতিপত্র ব্যতীত স্ত্রী নিকটবর্ত্তী কোন নগর দর্শন করিতেও পারেন না। স্বামী একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য অনুমতিপত্র দিয়া থাকেন; এই সময় অতিবাহিত হইলে স্ত্রী গৃহে প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য, অথবা নূতন অনুমতিপত্র লইতে বাধ্য। স্বামী স্ত্রীর বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগ করিতে পারেন, কিন্তু স্ত্রী সে ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত। পুরুষের অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সাক্ষ্যের মর্য্যাদা অল্প। এ সম্বন্ধে আইনের ব্যবস্থা এইরূপ,—

"দুইটি সাক্ষ্য বিভিন্ন হইলে বালকের অপেক্ষা যুবকের ও স্ত্রীলোকের অপেক্ষা পুরুষের সাক্ষ্য বলবত্তর।"

সাধারণ অবস্থা।

রুষীয় কৃষাণদের প্রবাদ এইরূপ,—"সাতটি রমণীর একটি আত্মা।" অপর একটি প্রবাদ এই,—"স্ত্রীলোকের আত্মাই নাই, সামান্য বাষ্পমাত্র আছে।"

স্ত্রীদেহ আত্মার ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ দ্বারা পরিচালিত,—সম্ভবতঃ প্রবাদ-টির এইরূপ অর্থ হইবে। স্ত্রীলোকের বুদ্ধিমত্তা সম্বন্ধে পুরুষের অভি-মত এই,—"উহাদের কেশ দীর্ঘ, কিন্তু মন হ্রস্বায়তন।" রুসিয়ায় জ্যেষ্ঠো-ত্তর কোনও বিধি নাই। পূর্ব্বাধিকারীর মৃত্যুর পর সম্পত্তি পুত্রদের মধ্যে সমাংশে বিভক্ত হয়। পুত্রসন্তান বা অপর পুরুষ উত্তরাধিকারীর অভাবে পূর্ব্বাধিকারীর পত্নী তাহার ব্যক্তিগত অর্থাদির চতুর্থাংশ ও অপর সম্পত্তির সপ্তমাংশ প্রাপ্ত হয়েন, অবশিষ্ট কন্যাদের মধ্যে সমভাবে বিভক্ত হয়। রুষীয় রমণী স্বীয় স্ত্রীধনের সম্পূর্ণ কর্ত্রী; বিবাহ হইলেও এই কর্ত্রীত্বের অপলাপ হয় না। মিউনিসিপাল সভায় ও প্রাদেশিক অধিবেশনের সদস্যনির্ব্বাচনে তাহারাও মতামত প্রকাশ করিতে পারে। এরূপ ব্যাপারে তাহাদের স্বয়ং উপস্থিত হইবার ক্ষমতা নাই; কিন্তু তাহাদের পুরুষ বন্ধু বা আত্মীয়কে প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত করিতে পারে। কিন্তু যত দিন পর্য্যন্ত শিক্ষার উপায় সকল বিশেষরূপে বর্দ্ধিত না হয়, তত দিন পর্য্যন্ত রুষরমণীর প্রকৃত উন্নতির আশা অসম্ভব।

শিক্ষাকেন্দ্রের বিস্তারসঙ্কল্প।

এপ্রিল মাসের "কর্ণহিল ম্যাগাজিন" নামক পত্রে মিঃ সীডনী ওয়েব শিক্ষাকেন্দ্রের সংখ্যা-বাহুল্যের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে একটি সুন্দর যুক্তিযুক্ত প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজের সংখ্যাবৃদ্ধি তাঁহার অভিপ্রেত নহে; যাহাতে মানসিক উন্নতি ও ব্যবসায়-বুদ্ধি সম্যক পরিমার্জ্জিত হয়, মস্তিষ্ক-চালনা করিয়া যাহাদের ভবিষ্যতে দিনপাত করিতে হইবে, তাদৃশ বালকবালিকার বিদ্যালয়ের কথাই তাঁহার বক্তব্য। তিনি অন্যান্য জাতির সহিত ইংরাজের নিম্নলিখিতরূপ তুলনা করিয়াছেন।—

"হল্যাণ্ড ও মার্কিন যুক্তরাজ্যে উচ্চশিক্ষার্থী ছাত্রের সংখ্যা শতকরা পাঁচ জনের হিসাবে বর্দ্ধিত হইতেছে; জার্ম্মানী ও বেলজিয়মে শতকরা ছয় জন; সুইজারল্যাণ্ডে শতকরা সাত জন। ফ্রান্স, ইটালী, অষ্ট্রিয়া ও রুসিয়ায় ছাত্রসংখ্যা বর্দ্ধিত হইতেছে। কিন্তু বৃটিশ যুক্তরাজ্যে উচ্চশিক্ষার্থীর সংখ্যা বর্দ্ধিত হওয়া দূরে থাক, সমভাবেই আছে; এবং কয়েক বৎসরের মধ্যেই কমিতে আরম্ভ করিবে, ইহা নিশ্চিত। তথাপি এখনও এমন বিশ্বাস হয় ত আমাদের অনেকেরই থাকিতে পারে যে, ব্যক্তিগত হিসাবে এক জন ইংরাজ অপরজাতীয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; তথাপি সকল স্বদেশ-ভক্তকেই (যতই "গোঁড়া" হউন না কেন) সুশিক্ষার বিস্তার যে সুফলপ্রদ, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। * * * আমরা এক্ষণে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে উপনীত, ইহা ব্যবসায়চাতুর্য্যের যুগ;—যাহারা ব্যবসায়বুদ্ধির রীতিমত অনুশীলন করিয়াছে, তাহাদের তুলনায়, অপররূপে শিক্ষিত ব্যক্তিবৃন্দের উন্নতিলাভের আশা দুরাশামাত্র।"

মিঃ ওয়েব বেশ বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, তাঁহার প্রস্তাবিত নূতন শিক্ষাকেন্দ্রগুলি অক্সফোর্ড বা কেম্ব্রিজের অনুরূপ নয়। কারণ, তাহা তাঁহার অভিপ্রেত নহে। উদ্দিষ্ট শিক্ষাকেন্দ্রগুলির কার্য্যপ্রণালী স্বতন্ত্র; স্বতন্ত্র শ্রেণীর ব্যক্তিসমূহের শিক্ষালাভ ইহার উদ্দেশ্য। ইহার পর এই নূতন শিক্ষাকেন্দ্রগুলির কতকটা আভাস তিনি দিয়াছেন। অর্থাৎ, এখনকার ন্যায় গ্র্যাজুয়েটগণ মার্জ্জিতরুচি ও অধীতগ্রন্থ ত হইবেনই, অধিকন্তু যত অল্প সময়ের মধ্যে সম্ভব, তাঁহাকে কোন একটা ব্যবসায়ে পরিপক্ব হইতে হইবে।

এই নূতন শিক্ষাকেন্দ্রসমূহ কিরূপে পরিচালিত হইবে, এবং ইহার শিক্ষাপ্রদানের সীমা সম্বন্ধে মিঃ ওয়েব বলেন যে, এগুলি শীঘ্রই বৃহদাকারে

ও বহুল ছাত্রের সমাবেশস্থানরূপে পরিণত হইবে। ইহাদের শিক্ষাদানের আদর্শও খুব উচ্চ হইবে। এই শিক্ষা কার্য্যপ্রসূ হইবে। ছাত্রদিগকে এরূপ শিক্ষা দেওয়া হইবে, যাহাতে ভবিষ্যতে জীবিকা-নির্ব্বাহের উপায়স্বরূপ বিদ্যাসমূহে তাহারা পারদর্শিতা লাভ করিতে পারে। তাহা হইলে, এখনকার পরীক্ষোত্তীর্ণ জনসাধারণ আদৌ যে সকল বিষয়ের কিছু জ্ঞাত নহেন, এরূপ বিষয়সমূহের অধ্যয়ন আরব্ধ হইবে। ব্যাঙ্কসমূহের অধ্যক্ষ ও কেরাণীগণের সমক্ষে প্রত্যহ অক্সফোর্ডের কোন অধ্যাপক টাকার লেন দেন ও হুণ্ডি সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া তাহাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতেছেন, ইহা কল্পনার সুযোগ্য বিষয়, সন্দেহ নাই!

লণ্ডনের প্রয়োজন।

মিঃ ওয়েব বলেন যে, দক্ষিণ কেনসিংটনে যে ১২।১৫ বিঘা খালি জমি পতিত আছে, তাহার উপর (Charlottenburg) একটি সুবৃহৎ টেক্‌নিকাল বিদ্যালয় নির্ম্মিত হউক। লণ্ডনে যে প্রকার শিক্ষা প্রদত্ত হইয়া থাকে, তাহা এরূপ রাজধানীর সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। মহানের আদর্শ যেরূপ অদম্য উৎসাহে অনুপ্রাণিত হওয়া আবশ্যক, অথবা তাহাতে যেরূপ ব্যয় হওয়া উচিত, লণ্ডনের বিদ্যালয়সমূহে তাহার কিছুই নাই। বৈজ্ঞানিক শাখাটির যথারীতি চর্চ্চায় বৎসরে অন্ততঃ পাঁচ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করা উচিত। স্থাপত্য-বিভাগের এখন এতই শৈশবাবস্থা যে, মিঃ ওয়েব উচ্চশিক্ষার্থী ছাত্রগণকে মণ্টেল নগরের ম্যাকগীল্ বিদ্যালয়ে বা জুরিচ্ নগরস্থ—'পলিটেক্‌নীকম'নামক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নের উপদেশ দিয়াছেন। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের যথারীতি সংস্কারে পাঁচ কোটী টাকা ব্যয়িত হইবে। অন্যান্য ক্ষুদ্র শিক্ষাকেন্দ্রগুলির সংস্কার পাঁচ লক্ষ মুদ্রা হইলেই একরূপ হইতে পারে। আমাদের পরবর্ত্তী বংশধরগণের সময় ইংলণ্ডে উচ্চশিক্ষার জন্য অন্ততঃ ১০ কোটী মুদ্রা যদ্যপি ব্যয়িত হয়, তাহা হইলে শিক্ষা কার্য্য সুন্দররূপে চলিবে। তাহা হইলে, সমস্ত ব্রিটিশ রাজ্যের রণপোতের জন্য জিব্রাল্টার, সাইমন্‌স্ উপসাগর প্রভৃতি তিন চারিটি কেন্দ্রে একটা জীবনে যে ব্যয় হয়, মিঃ ওয়েব তাঁহার প্রস্তাবিত উচ্চশিক্ষার জন্য তাহাই ব্যয় করিতে বলেন। এ ব্যয় যে অত্যন্ত অধিক, তাহা নহে। কারণ, রণপোতসংস্কারে অজ্ঞাতনামা কেন্দ্রসমূহে যে ব্যয় হয়, করদাতারা তাহা গ্রাহ্যও করেন না।

মিঃ ওয়েব তাঁহার শিক্ষাকেন্দ্রসমূহ এইরূপে বিভক্ত করিয়াছেন।—

১—কেন্দ্র লণ্ডন, পরিধির ব্যাস ৩০ মাল।

২—ম্যাঞ্চেষ্টার। ২—লিভারপুল।

৩—বার্মিংহাম। ৪—ডার্হাম্ (টাইনের তটস্থ নিউকাস্‌ল ইহার অন্তর্গত হইবে।) এতদ্ব্যতীত ইয়র্কশায়ার, পূর্ব্ব মিডল্যাণ্ড্‌স্। পূর্ব্বে আংলিয়া, দক্ষিণে পশ্চিম প্রদেশসমূহ (বৃষ্টল, এক্সেটার, প্লীমাথ প্রভৃতি); ও দক্ষিণাংশ (রিডিং, সাদাম্পটন্ প্রভৃতি)।

ত্বক্-চিত্রণ।

মনুষ্যদেহে চিত্রাঙ্কণ সম্বন্ধে মিঃ প্যাট্রিক্ ব্রুক্লিন্ "ইংলিশ্ ইলষ্ট্রেটেড্ ম্যাগাজিন্" নামক পত্রের এপ্রিল সংখ্যায় একটি চিত্তাকর্ষক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাঁহার মতে, ত্বকের উপর কারুকার্য্যের প্রথা প্রাচীনগণের মধ্যে প্রচলিত ছিল। থিবস্ নগরীর নিকট একটি রক্ষিত মনুষ্যদেহে তাহার বংশকাহিনী অঙ্কিত ছিল; প্রবন্ধপ্রসঙ্গে ব্রুকলিন্ সাহেব তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। বাইবেলে এ প্রথার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমান সময়ে এই ত্বক্চিত্রণ প্রথা সকল শ্রেণীর মধ্যেই বেশ প্রতিপত্তিলাভ করিতেছে;—ইহার জন্য লেখক বিশেষ দুঃখিত। যত চিত্র মনুষ্যদেহে অঙ্কিত হয়, তন্মধ্যে সর্পাকৃতির সংখ্যাই অধিক;—মনুষ্যগণ কেন যে দেহে চিরজীবনের জন্য সর্পাকৃতি অঙ্কিত করিয়া রাখিতে এত যত্নশীল হইতেছেন, তাহা বুঝিয়া উঠা যায় না। এই প্রথা যদি ক্রমশঃ "ফ্যাশানে" পরিণত হয়, তাহা হইলে সমাজনেত্রী মহিলাগণের অবয়ব সর্প ও অন্যান্য সরীসৃপের প্রতিমূর্ত্তিতে পরিপূর্ণ হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

এই বিদ্যায় মিঃ রাইলী বিশেষ পারদর্শী। তিনি বৈদ্যুতিক সূচীর ব্যবহার করেন, এবং মনুষ্যের বাহুতে ফটোগ্রাফ্ পর্য্যন্ত অঙ্কিত করিয়া দিতে পারেন। জাতীয় হিসাবে ধরিতে গেলে জাপানীরাই এ বিষয়ে শ্রেষ্ঠ, কিন্তু তাহাদের সকল কার্য্যই করনৈপুণ্যে সাধিত হয়। মিঃ রাইলী যে সকল ব্যক্তির দেহের উপর আপনার বিদ্যা প্রকাশ করিয়াছেন, আলোচ্য প্রবন্ধাদিতে তাঁহাদের চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে। রাজনন্দিনী চীমের বাহু একটি সর্প ও একটি প্রজাপতির চিত্রে বিভূষিত। প্রকৃতি যাঁহাদের প্রতি সৌন্দর্য্যদানে

পরাঙ্মুখ, ত্বক্‌চিত্রণ বিদ্যায় আজকাল তাঁহারা ... লাভ করিতেছেন। একটি টিকটিকি ও মক্ষিকা, ক্রিশ্চিয়ান ভিক্‌টরের বাহুর শোভাবর্দ্ধন (?) করিত। মিঃ রাইলী যত চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তন্মধ্যে, স্যাণ্ডো-শিষ্যগণের অন্যতমের শরীরে যেটি অঙ্কিত করিয়াছেন, সেইটিই বৃহত্তম। চিত্রটি আর কিছুই নহে,—একটি পনের ফিট দীর্ঘ সর্প। ইহা জানু হইতে আরম্ভ হইয়া সমস্ত দেহ বেষ্টন পূর্ব্বক গলদেশে শেষ হইয়াছে; বিস্তারিতপক্ষ একটি বাজপক্ষী সর্পটির শিরোদেশ আক্রমণ করিতেছে,—চিত্রের ভাব এইরূপ। দ্বিতীয় চিত্র এক জন ছদ্মবেশিনী জার্ম্মান্‌ সমাজনেত্রী রমণীর;—ইঁহার বাহুযুগল সর্প ও অন্যান্য সরীসৃপের চিত্রে পূর্ণ। এক জন সঙ্গীতব্যবসায়ী ভদ্রলোকের হস্তও এইরূপে চিত্রিত, কিন্তু তাহাতে সর্পের সংখ্যা অধিক। অপর এক ব্যক্তির পৃষ্ঠদেশের মধ্যস্থলে কৃষ্ণ, নীল, রক্ত, হরিৎ, পীত, রক্তাভ ও ধূসর বর্ণে চিত্রিত একটি ড্রাগন্‌ পক্ষী! সুখের বিষয়, তিনি নিজে এই চিত্রটি দেখিতে পান না! জাপানীদের বিদ্যারও একটি উদাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে;—একটি ভদ্রলোকের আপাদমস্তক জাপানী চিত্রে চিত্রিত!

মিঃ রাইলী দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়াছিলেন, এবং অনেক সৈন্য ও সেনানীর দেহ চিত্রিত করিয়াছেন। গুলির আঘাতে বিকৃত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের উপর জটিল চিত্র অঙ্কিত করিয়া গুলির চিহ্ন সহজে দৃষ্টির বহির্ভূত করিয়া দিয়াছিলেন। লর্ড রবার্টসের প্রবল অভিলাষ এই যে, সৈনিকমণ্ডলীর মধ্যে সকলের অঙ্গে রেজিমেণ্টের নাম ও তাহার নম্বর খচিত হয়; তাহা হইলে সনাক্ত করিতে আর কষ্ট হয় না।

মিঃ ক্রুকলীন্‌ বলেন যে, কাহারও অঙ্গে একটি চিত্র চিত্রিত হইলে, তাহার চিত্রাঙ্কনপিপাসা অত্যন্ত বর্দ্ধিত হয়। অতএব, মিঃ ক্রুক্‌লীন্‌ বলিতেছেন, কেহ যেন এ কার্য্যে প্রবৃত্ত না হন।
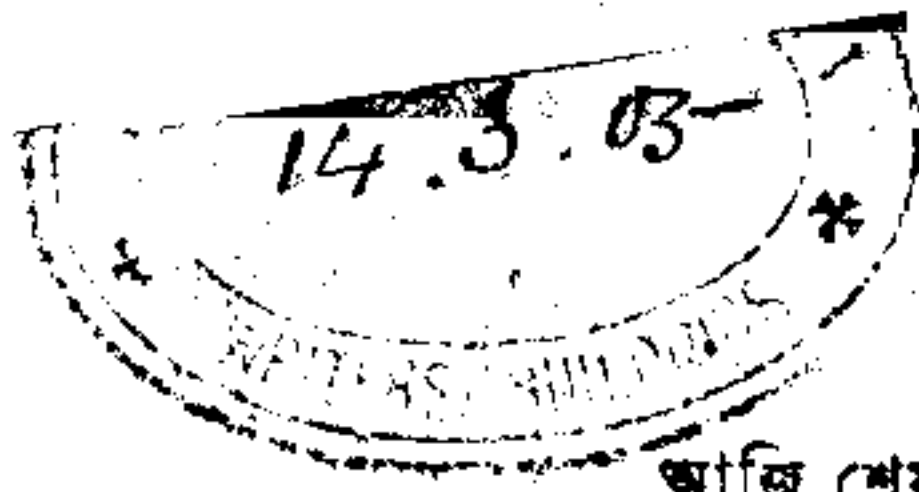
বর্ষশেষ।

আজি শেষ—আজি তব বিদায়ের দিন,
এই মর্ত্তভূমি হতে চির অবসর,—
হে মহাকালের শিশু সুন্দর নবীন!
অপরূপ কোন্ রাজ্যে হবে অগ্রসর
প্রসন্ন প্রমোদ হাস্যে; কা'দের অন্তর
আবার করিবে পূর্ণ আশা বাসনায়?
নব অর্ঘ্যভার বহি' আনন্দমন্থর,
গাহি অভিষেকগান, মরম-বীণায়
তুলিয়া নূতন তান, সুন্দরী সুন্দর
মুগ্ধনেত্রে অনিমেষে চাহি' মুখপানে
বসিবে চরণতলে; কোন শুভ বর
তাদের করিবে দান? লীলা-অবসানে
রেখে যাও সুধাবিন্দু প্রেম-অশ্রুকণা
সঞ্চারিয়া শ্রান্ত প্রাণে নব উদ্দীপনা।

শ্রীমুনীন্দ্রনাথ ঘোষ।